রাজসাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

শ্রীকালীনাথ চৌধুরী

প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড

বাঘা মসজিদ, রাজশাহী

বড় শিব মন্দির, পুটিয়া, রাজশাহী

সূচিপত্র

গ্রন্থ পরিচিত

রাজসাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস-- শ্রীকালীনাথ চৌধুরী প্রণীত। মূল্য ২।।. টাকা। কালীনাথ বাবু রাজসাহীর একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় কৃতবিদ্য কায়স্থ জমিদার। ইনি বহুকাল রাজসাহীতে ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টরের কার্য্য করিয়াছেন। ঐরূপ কার্য্য সময়ে ইনি রাজসাহীর প্রায় সকল স্থানেই গমন করায় এবং তদুপলক্ষে রাজসাহীর সকল ভদ্রলোকের সহিত বিশেষরূপে পরিচিত হওয়ায় সকল স্থানের বিশেষ অবস্থা, ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও জনশ্রুতি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বহুস্থান ভ্রমণ, বহুলোকের সহিত আলাপন, বহুগ্রন্থ অধ্যয়ন দ্বারা রাজসাহী সম্বন্ধে ইঁহার যে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে তাহাই কালীবাবু গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রত্যেক স্থান স্বচক্ষে দর্শন করিয়া প্রত্যেক স্থানের বিশেষ বিবরণ ও অবস্থা স্থানীয় লোকের মুখে অবগত হইয়া ইতিহাস সংকলন করা কয়জন ঐতিহাসিকের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে; আর বলিতে কি, এইরূপে অবধারিত সত্যমূলক ইতিহাস পাঠ করিবার সুবিধাও কম পাঠকের অদৃষ্টে হইয়া থাকে। কালী বাবু যে ভাবে রাজসাহীর ইতিহাস সংকলন করিয়াছেন এভাবে প্রত্যেক জেলার ইতিহাস সংগৃহীত হইলে ভবিষ্যতে দেশের প্রকৃত ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইবার বিশেষ সুবিধা হইবে ইহা স্বীকার করিতে কে কুণ্ঠিত হইবে?

সুবিখ্যাত হণ্টার সাহেবের বাঙ্গালা প্রদেশের ষ্টেটিষ্টিক্স যে প্রণালী অবলম্বনে লিখিত এ গ্রন্থও সেই প্রণালী অবলম্বনে লিখিত-- ইহাতে কেবল রাজসাহী সম্বন্ধীয় বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে হেতু ইহাতে অনেক অনেক অধিক বিবরণ লিখিত হইয়াছে এবং প্রতি বিষয়ের তন্ন তন্ন করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। জেলার মধ্যে ছোট বড় নামিক অনামিক নদ নদী আছে তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ এবং জেলার শিক্ষা, ডাকঘর টেলিগ্রাফ ও রাস্তার আমূল বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। রাজসাহীতে যত প্রকারের জাতি আছে ও যত প্রকারের ধর্ম্ম আছে প্রত্যেক জাতির উৎপত্তি ও পরিণতি বিবরণ ও প্রত্যেক ধর্ম্মালোচনাকারিগণের সংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে, কোন গ্রামে কত পণ্ডিত ছিলেন, কে কি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন কে কোন্ বিষয়ে কতদূর পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন, জেলার মধ্যে কোথায় কত রাজবংশ আছে তাহাদের ধারাবাহিক নাম ও প্রদত্ত হইয়াছে। দেশের মৃত্তিকার অবস্থা, ফসলের অবস্থা, বাণিজ্য ব্যবসায়ের অবস্থা সমস্তই বিশদরূপে

প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত হইয়াছে এক কথায় আমরা এইমাত্র বলিতে পারি রাজসাহী সম্বন্ধে যা কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় তাহা সমস্তই ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে রাজসাহীর যাঁহারা অধিবাসী, রাজসাহীব বিষয় জানিতে যাঁহাবা সামান্য মাত্রও বাগ্র তাঁহাদিগকে এ গ্রন্থ পাঠ করিতে আমবা বিশেষ অনুবোধ কবি। রাজসাহীর শাসন ও শিক্ষা ভার যাহাদের হস্তে অর্পিত আছে তাহাদিগকে আমবা এগ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি, রাজসাহীব যাঁহারা রাজা ও জমিদার তাঁহারা এগ্রন্থ পাঠে নিজেব সমস্ত অবস্থা ও আপন আপন পারিবারিক অবস্থা জানিতে পাইবেন। সাধাবণ পাঠক ইহাতে জ্ঞান ও আনন্দ একত্রে লাভ করিবেন। হায় দেশেব এমনি দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে যা এই দেশের অধিকাংশ লোক নাটক নভেল ব্যতীত অন্য কোনরূপ গ্রন্থ পড়িতে ইচ্ছা প্রকাশ করে না। তাঁহাবা জানে না, তাহারা বুঝে না-যে মানব জীবনের সত্য ঘটনা কল্পনা প্রসূত ঘটনা হইতেও বিস্ময়কব এবং অধিক চিত্তাকর্ষক। বাঙ্গালা ভাষাব সমগ্র পাঠক নভেল খুঁজিযা দেখুন একটী বাণী ভবানী একটী মহারাণী শবৎসুন্দরীর চিত্র তাহাতে মিলিবে না। যে সকল অলৌকিক কীর্ত্তি কলাপে এই দুই পুণ্যময়ী দেববালার জীবন উদ্ভাসিত তাহাব কল্পনা করিতেও অলৌকিক প্রতিভাব আবশ্যক হয় তাই বলিতেছি গ্রন্থখানি, ইতিহাস হইলেও নভেল নাটক অপেক্ষা অনেক সুন্দব চিত্র ইহাতে অঙ্কিত আছে। বাজসাহী বাসী[illegible]ব তো কথাই নাই বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে থাকা কর্ত্তব্য।

Truth is stranger than fiction এগ্রন্থে তাম্র ফলকাদিব বিষয় যাহা অর্পিত হয় নাই তৎসমস্ত পরিশিষ্টে লিখিত হইবে এমত আশা কবিবাব আমাদের সঙ্গত কাবণ আছে।

হিন্দুরঞ্জিকা, ২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮।

HOOGLY.

The 5th July, 1901

শ্রী কালীনাথ চৌধুরী

রাজসাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

উপক্রমণিকা

রাজসাহীর প্রাচীনত্ব।— রাজসাহী অতি প্রাচীন স্থান। ইহার প্রাচীনত্ব বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এই স্থান ক্রমান্বয়ে হিন্দু মুসলমান ইংরাজদিগের শাসনাধীন হইয়াছে। মহাভাবতে উত্তর "গো-গৃহের" উল্লেখ আছে। সেই "গো-গৃহ" রাজসাহী প্রদেশেব উত্তরভাগে ছিল। আবাব বঙ্গরেলওয়ে ষ্টেসন পাঁচবিবি হইতে পূর্ব্ব মুখে ১২ মাইল পথ যাইলে উত্তর মাগুবা এবং ঐ মাগুরা হইতে দক্ষিণ পূর্ব্ব মুখে ৫ মাইল যাইলে বিরাট নগর। এই নগর মৎস্যদেশীয় নবপতি বিরাট স্থাপিত কবেন। এই বিরাট নগবে পাণ্ডবগণ অজ্ঞতবাস করেন। এই নগবেব দুই মাইল দক্ষিণে বিরাট বাজাব সেনাপতি কীচকের বাসভবন ছিল। ইহার অনতিদূরে মহাভাবতীয় "যমীবৃক্ষ" স্থান। বাজসাহী "মৎস্য" দেশেব অন্তর্গত এবং রাজসাহী যে মৎস্যদেশাধিপতি বিরাটের বাজ্য ছিল, এবিষয়ে কাহারও সন্দেহ হইতে পাবে না। মৎস্যদেশাধিপতি বিরাটেব অধিকাব অনেকদিন গত হইয়াছে; কিন্তু তাহার ধ্বংস কাহিনী এখনও পুরাণে ও ইতিহাসে কীর্ত্তিত হইতেছে। যে পাণ্ডবগণের বীরত্বে ভারত কেন, সমগ্র পৃথিবী কম্পিত হইযাছিল; সেই পাণ্ডবগণেব অজ্ঞাত বাসে– বিবাট বাজ্যেব অন্তর্গত বাজসাহী প্রদেশ পূণ্য-ভূমি বলিয়া কীর্ত্তিত হইতেছে। বিবাটের বাজভবনের ধ্বংসাবশেষ এবং তন্নিকটবর্ত্তী কীচকের বাসভবন বাজসাহী প্রদেশে বিদ্যমান থাকিয়া পাণ্ডবগণের অতীত গৌবব গাথা পৃথিবীতে কীর্তিত হইতেছে। দিল্লীর সম্রাট আকবরের সময়ে... কবিয়াছিলেন, তন্মধ্যে "তাহিরপুব" ও "সাঁতুল" রাজসাহীব অর্ন্তগত "তাহিরপুব" ও "সাঁতুল" বাজাদ্বয় একাদশ ভৌমিক মধ্যে দুইটা ভৌমিক বাজা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই বাজসাহী বরেন্দ্র ভূমিব অন্তর্গত। পদ্মা নদী এবং করতোয়া ও মহানন্দা নদীর মধ্যস্থিত প্রদেশ ববেন্দ্রভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। এই বরেন্দ্র ভূমিতে অনেক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের বাস। বাবেন্দ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণগণেব কৌলিন্য প্রথানুসারে তাহিরপুব "অস্তাচল" এবং শুশুঙ্গ "উদয়াচল" বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, রাজা বিবাটের সময় হইতে প্রসিদ্ধ সেনবংশীয় বাজাদের সময় পর্য্যন্ত রাজসাহী হিন্দু বাজাব শাসনাধীন ছিল; তাহার পর মুসলমান বাজা রাজসাহী অধিকৃত করেন। .. গাব জাইগীব মোগলসম্রাট সাজাহান-প্রদত্ত। আমরুল পরগণার অন্তর্গত "নবাবের তাম্বু" নামে একটা গ্রাম আছে। ইহা কথিত আছে যে রাজসাহী জরীপ সময় বাজা তোডরমল্ল ঐ গ্রামে নিজ তাম্বু স্থাপিত করেন। মোগলবংশীয় সম্রাটের শাসনাধীনও রাজসাহী ছিল। হিন্দু ও মুসলমান শাসনকালেব রাজসাহীর কোন ধাবাবাহিক ইতিহাস পাওয়া কঠিন। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ইংরেজবা মুসলমানদিগকে পবাভব করিয়া এপর্য্যন্ত বাজসাহীব অধিস্বামী হইয়া রহিয়াছেন। সুতরাং ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দ হইতে রাজসাহীর ইতিহাস লিখিত হইল। কিন্তু ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেব যে কোন ঘটনা জানা যাইবে, তাহার উল্লেখ করা যাইবে।

রাজসাহীব নাম।— পদ্মা নদীর দক্ষিণে "নিজ চাকলা বাজসাহী" নামে একটী ভূভাগ বাজসাহী প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। ইংরেজদের অধিকাব সময়ে বোধ হয় ঐ চাকলার নামে

রাজসাহী জেলার নাম হয়। কেহ কেহ বলেন এই ভূখণ্ডে অনেক রাজার বাসস্থান। এইজন্য জেলার নাম "রাজসাহী" হয়। পূর্ব্বের নামই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

রাজা মানসিংহের সহিত রাজসাহী নামের ব্যুৎপত্তি আছে বলিয়া কালীপ্রসন্ন বাবু উল্লেখ করিয়াছেন। রাজসাহী নাম "শাহী" রাজা মানসিংহের প্রদত্ত বলিয়া কথিত। (১) এ অনুমান ... অনেক বৈষম্য দৃষ্ট হয়।

বর্ত্তমান রাজসাহীর সীমা।— রাজসাহীর উত্তরে দিনাজপুর ও বগুড়া; পূর্ব্বে বগুড়া ও পাবনা; দক্ষিণে নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ; পশ্চিমে মুর্শিবাবাদ ও মালদহ মহামান্য গ্রাণ্ট সাহেব বলেন যে, বঙ্গদেশের মধ্যে অথবা ভারতবর্ষ-মধ্যে পূর্ব্বে রাজসাহী একটা বিস্তৃত জেলা ছিল।

এলাকা।— যে সময় মুর্শিদকুলি খাঁ বাঙ্গালার নবাব ছিলেন, সেই সময়ে উদিত (উদয়) নারায়ণ এক বিস্তীর্ণ জমিদারী শাসন করিতেন। সমগ্র "রাজসাহী চাকলা" তাঁহাব দ্বারা-শাসিত হইত। তাঁহার জমিদারী পদ্মা নদীর উভয় পারে বিস্তৃত ছিল। বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ, বীবভূম, সাঁওতাল পরগণা এবং রাজসাহী বিভাগস্থ বগুড়া, পাবনা, মালদহ প্রভৃতি জেলার অধিবাসী উদিত (উদয়) নারায়ণকে রাজস্ব প্রদান করিত। তাঁহার সমস্ত জমিদারীর নামই "বাজসাহী" ছিল। এই সমস্ত রাজসাহী জমিদারী নাটোরের প্রসিদ্ধা মহারাণী ভবানীব অধিকৃত হয়। বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদের অধিকাংশই সেই বাজসাহী চাকলার অন্তর্গত ছিল। এক্ষণে মুর্শিদাবাদ ও বীবভূম জেলায় রাজসাহী নামে পরগণা দৃষ্ট হয়।

ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীব কর্ত্তৃত্ব সময়ে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ হইতে রাজসাহী জেলার অন্তর্গত স্থানসমূহের অনেক পরিবর্ত্তন হয়। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাজসাহী এরূপ একটী বৃহৎ ও প্রধান জেলা ছিল যে, উহার পশ্চিমসীমা ভাগলপুর ও পূর্ব্বসীমা ঢাকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পদ্মা নদীর দক্ষিণে 'নিজ চাকলা রাজসাহী' নামে একটী ভূভাগ রাজসাহীর অন্তর্গত ছিল। সেইস্থান এক্ষণে জেলা মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, যশোহর, বীরভূম ও বর্দ্ধমানেব অন্তর্গত। কিন্তু পদ্মা নদীর উত্তর ভাগে যে লস্করপুর ও তাহিরপুর পরগণা এক্ষণে রাজসাহীব অন্তর্গত, তাহা পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদ জেলার অধীন ছিল।(১) ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে চিবস্থায়ী বন্দোবস্ত-সময়ে রাজসাহী জেলা হইতে অনেক স্থান বাহির হইয়া যায়। তথাপি উহাব পূর্ব্বসীমা ব্রহ্মপুত্র এবং পশ্চিম সীমা গঙ্গা ছিল। এপ্রকার একটী বিস্তৃত জেলা একজন মাজিষ্ট্রেটেব শাসন করা কঠিন ছিল। সুতরাং চুরি, ডাকাইতি এত বেশী হইত যে জেলার আয়তন আরও সঙ্কুচিত করা আবশ্যক হইয়াছিল। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬ বৎসরের মধ্যে নিম্নলিখিত স্থানগুলি বাজসাহী হইতে বাহির করিয়া মালদহ, বগুড়া ও পাবনা এই তিনটি নূতন জেলার সৃষ্টি হয়।

(১) ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে রাজসাহী হইতে থানা রোহনপুর ও চাঁপাই এবং দিনাজপুব ও পূর্ণিয়া হইতে কতকগুলি স্থান লইয়া মালদহ একটী নূতন জেলা হইয়াছে।

(২) ১৮২১ খৃষ্টাব্দে রাজসাহী হইতে থানা আদমদিঘি, নওখিলা, সেবপুর ও বগুড়া এবং রঙ্গপুর হইতে দুই থানা এবং দিনাজপুরের তিন থানা বাহির করিয়া লইয়া নতুন বগুড়া জেলা স্থাপিত হইয়াছে।

(৩) আবার প্রায় ৮ বৎসর পর, রাজসাহী হইতে থানা সাহজাতপুব, খেতুপাড়া, রায়গঞ্জ, মথুরা ও পাবনা লইয়া পাবনা জেলার সৃষ্টি হয়। যশোহর জেলা হইতে কতকগুলি স্থান বাহির করিয়া লইয়া নূতন পাবনা জেলায় ভুক্ত করা হয়।

এইরূপে জেলার আয়তন কমাইয়া দুইটী মাত্র মহকুমা রহিল, সদব ও নাটোর। ১৮৮২

---

(1) Hunter's Statistical Accuunt.

খৃষ্টাব্দে নওগাঁ মহকুমা স্থাপিত হওয়ায় জেলার আয়তন আবার বৃদ্ধির সূত্রপাত হইল। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে জেলা দিনাজপুর হইতে সমগ্র থানা মহাদেবপুর ও জেলা বগুড়া হইতে আদমদিঘি ও নবাবগঞ্জ থানার কিয়দংশ রাজসাহী জেলায় ভুক্ত হইয়া নওগাঁ মহকুমার অধীন হইয়াছে।

নিম্নলিখিত ১৪টী থানা লইয়া রাজসাহী জেলা গঠিত ঃ—

থানা	মহকুমা
(১) বোয়ালীয়া।	সদর মহকুমা।
(২) চারঘাট।	
(৩) পুঁঠিয়া।	
(৪) গোদাগাড়ী।	
(৫) তানোর।	
(৬)বাগমারা।	
(৭) নাটোর।	নাটোর মহকুমা।
(৮) লালপুর (বিলমাড়িয়া)	
(৯) বড়াই গ্রাম।	
(১০) সিংড়া।	
(১১) পাঁচুপুর।	নওগাঁ মহকুমা।
(১২) নওগাঁ।	
(১৩) মহাদেবপুর।	
(১৪) মাঁদা।	

আয়তন ও লোকসংখ্যা।— সময় সময় জেলার আয়তন যেরূপ হইয়াছে তাহা নিম্নে দেখান গেল ঃ—

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে	...	...	১২,৯৯৯ বর্গমাইল।
১৭৮৬ "	...	...	১২,৯০৯ "
১৮৭২ "	...	...	২,২৩৪ "
১৮৯১ "	...	...	২,৩৩০ "
১৮৯৭ "	...	...	২,৫৯৮ "

পূর্ব্বাপেক্ষা এখন জেলার আয়তন প্রায় একপঞ্চমাংশ।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে জেলার জনসংখ্যা ১০৬৪৯৫৬ ছিল। ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দের জনসংখ্যাব রিপোর্টে লোকসংখ্যা ১৩১০৭২৯ ছিল। কিন্তু ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের জনসংখ্যার রিপোর্টে লোকসংখ্যা ১৩১৩৩৩৬ হয়। আয়তন পরিবর্ত্তনে লোকসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধিও হইয়াছে। কিন্তু পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী।

সাধারণ বিবরণ।— রাজসাহী একটী বিস্তৃত জেলা। এইজন্য ভিন্ন ভিন্ন অংশের আকৃতি, প্রকৃতি, শস্য, জলবায়ু প্রভৃতি ভিন্ন প্রকার। সাধারণত ভূমি উর্ব্বরা। শস্যক্ষেত্র নিম্ন। নদীর তীরে গ্রামসমূহ বৃক্ষ শ্রেণীতে শোভিত। উত্তর ও পশ্চিম ভাগে মালদহ, দিনাজপুর, ও বগুড়া জেলার সংলগ্নস্থান বরেন্দ্র ভূমি। এই বরেন্দ্র ভূমি সমতল নহে— উচ্চ ও নীচ; এবং ইহার মৃত্তিকা অনেক স্থানে রক্তবর্ণ; বৃক্ষ অতি কম, কেবল স্থানে স্থানে তালবৃক্ষ দেখা যায়। পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিক পর্য্যন্ত বিল। পশ্চিমে মাদার বিল, পূর্ব্বে চলনবিল এবং উত্তরে রক্তদহের বিল। মাঁদার বিল ও রক্তদহের বিল হইতে বরেন্দ্র ভূমি আরম্ভ। বর্ষাকালে অর্থাৎ জুলাই মাস হইতে নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত জেলাটীর প্রায় সকল স্থান জলে পরিপূর্ণ থাকে। বর্ষাকালে বিলের মধ্যে

এক একটী গ্রাম এক একটী দ্বীপের ন্যায় জলে চারিদিকে বেষ্টিত হয়। নদীর তীবে গ্রাম সমূহেব জলবায়ু সাধারণতঃ স্বাস্থ্যকর; কিন্তু বিলের নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর। পদ্মানদী স্ফীত হইয়া জলপ্লাবনে গ্রাম সমূহ প্রপীড়িত হয়। ১৮৩৮ ও ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের জলপ্লাবন বিখ্যাত।

নদী।— বড় ছোট নদী ও জলাশয় দ্বারা জেলা আবৃত। এই সকল নদী দ্বারা যেন একখানি জাল বুনিয়া সমস্ত জেলাকে আবৃত করিয়াছে। জেলার প্রায় সকল স্থানেই সকল সময় নৌকাপথে যাতায়াত করা যায়। প্রধান প্রধান নদীগুলির উল্লেখ করা গেল।

(১) পদ্মানদী।— ভাগীরথী হইতে বহির্গত। জেলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম ভাগে অবস্থিত। সকল সময় বিশেষতঃ বর্ষাকালে এনদী ভয়ঙ্কর দেখায়। বর্ষাকালে এই নদীব তরঙ্গ দেখিলে প্রাণ উড়িয়া যায়। যে স্থানে বৃহৎ চর হইয়া শস্য হইতে লাগিল কিছু দিন পরে আবার সেই স্থানে, সে চব নাই, সে বৃক্ষ নাই, সে শস্য নাই, কেবল অতলস্পর্শ জলরাশি। এই নদীর রেতী মৃত্তিকা এত উর্ব্বব যে, চরে প্রচুর পরিমাণে ধান্য, কলাই, পটল, তরমুজ প্রভৃতি জন্মে। ইহার তীরে প্রধান নগব গোদাগাড়ী, বামপুর-বোয়ালিয়া, সরদহ, রাজাপুর, লালপুর, দামুকদিয়া, ও সাঁড়া।

(২) মহানন্দা।— হিমালয় পর্ব্বত হইতে বহির্গত। জেলার পশ্চিমদিক দিয়া প্রবাহিত। বাসুদেবপুব দিয়া গোদাগাড়ীর নিকট পদ্মা নদীতে পতিত হইয়াছে। পূর্ণিয়া ও মালদহ জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। এনদী বিস্তৃত ও গভীর। বোঝাই নৌকা অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারে।

(৩) আত্রাই।— তিস্তা বা ত্রিস্রোতা নদী হইতে বহির্গত। এনদী অতি পবিত্র ও প্রসিদ্ধ। দিনাজপুর হইয়া রাজসাহী জেলায় প্রবিষ্ট। দিঘাপতিয়ার অনতিদূরে বাক্‌সর গ্রামের নিকট বদ্ধ। নূতন জোলা অথবা পুঁঠিয়ার জোলা নাম গ্রহণে লালোরের পূর্ব্বদিক দিয়া পুনরায় আত্রাইতে মিশিয়া বিলচলনে পতিত হইয়াছে। আবার সেই জোলা সেরকোলের নিকট আত্রাই হইতে পৃথক হইয়া কলম দিয়া বিলচলনে মিশ্রিত হইয়াছে। আত্রাইব তীবে প্রধান নগর— মহাদেবপুর, কালিকাপুব (মাঁদা পুলিশ ষ্টেসন), প্রসাদপুর বান্দাইখাড়া, আত্রাই রেলওয়ে ষ্টেশন, সাহেবগঞ্জ (মোহিনীমোহন বায়ের জমিদারী কাছারী। খাজুরা, ডাঙ্গাপাড়া, আত্রাইকুলা, লালোর। এই নদীর উপব উত্তর-বঙ্গ রেলওয়ের একটী লৌহসেতু আছে। সেতু হইতে আত্রাই ষ্টেসন অতি নিকট।

(৪) বড়ল।— সবদহের নিকট পদ্মা নদী হইতে বহির্গত হইযা হুড়াসাগরে পতিত। কেবল বর্ষার সময় নৌকায় যাতায়াত করিতে পারা যায় অন্য সময় সরদহব-নিকট মুখ বন্ধ থাকে। ইহাব তীরে বা নিকটে প্রধান গ্রাম—চারঘাট, আড়ানী, পাকা, গালিমপুর, মালঞ্চি (বেলওযে ষ্টেসন ধুপৈন (এই গ্রামের নিকট নন্দকুজা নদীর মুখ), ওয়ালিয়া, জোয়াড়ী, হবিপুর, চাটমহর, নুন নগব (এই স্থানে বিলচলনের সহিত মিশ্রিত)। এই নদীব উপব উত্তব বঙ্গ বেলওয়েব লৌহ সেতু আছে। সেতু-হইতে মালুঞ্চি ষ্টেসন অতি নিকট।

(৫) মুষাখাঁ।— বড়ল নদীর একটী শাখা। আড়ানীব অনতিদূবে বড়ল নদী হইতে বহির্গত। আত্রাই নদীতে বাক্‌সরের নিকট মিশ্রিত। কেবল বর্ষার সময় নৌকা যাতাযাত করে। ইহার তীরে বা নিকটে প্রধান গ্রাম—পুঁঠিযা রাজধানী, ঝলমলিয়া হাট, মধুখালী, ভাবনী, ছাতনী, বেলঘরিয়া, দিঘাপতিয়া রাজধানী।

(৬) নারদ।— এক্ষণ মুষাখাঁ নদীর শাখা। পূর্ব্বে পদ্মা নদী হইতে রামপুব বোয়ালীয়াব নিকট দিয়া বহির্গত হইয়া প্রসিদ্ধ নাটোর নগব দিয়া প্রবাহিত। পুঠিয়ার নিকট নারদের মুখ বন্ধ। নারদ নদী ধরাইল গ্রাম দিয়া গুনাইঘাড়াব নিকট আত্রাই নদীব সহিত মিশ্রিত। গুনাইঘাড়াব মুখ হইতে নাটোব নগর পর্য্যন্ত বর্ষাকালে নৌকা যাতায়াত করিতে পারে।

(৭) নাগর।— করতোয়া নদীর একটী শাখা, বগুড়া জেলা হইতে রাজসাহী প্রবিষ্ট। তেমুখ-নওগাঁও গ্রামের নিকট যমুনা বা গুড় নদীতে পতিত। নাগর নদীর গাঙ নিতান্ত বক্র।

সকল সময় নৌকা যাতায়াত করিতে পারে। নদীর তীরে প্রধান গ্রাম— পতিশর, কুসুম্বী, চাঁপাপুর, ধুপচাঁচিয়া। সুলতানপুর— বগুড়া রেলপথ এই নদী পাব হইয়া গিয়াছে।

(৮) যমুনা।— দিনাজপুর হইতে আসিয়া প্রথমে বালুভরা, নওগাঙ, কাশীমপুব ও ভবানীপুর গ্রামের নীচ দিয়া প্রবাহিত হয়। ভবানীপুরের নিকট আত্রাই ও যমুনা একত্রিত হইয়া আত্রাই রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকট যমুনা পূর্ব্বদিকে এবং আত্রাই দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইতেছে। আত্রাই ষ্টেসন হইতে যমুনা নদী গুড় নদী বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং গুমানীব নিকট বিলচলনে পতিত হইয়া পাবনা জেলায় প্রবিষ্ট। এই নদীর তীরে প্রসিদ্ধ গ্রাম গুড়নই ও কলম।

(৯) বারানই।— মাঁদার বিল হইতে বহির্গত হইয়া পিপরুল গ্রামের মধ্যে কালীগঞ্জ নামক হাটের নিকট আত্রাই নদীতে পতিত। আবার মাঁদা বিল হইতে বদ্দীপুবেব দাঁড়া দ্বারা বেজোড়া গ্রামের নিকট আত্রাই নদীর সহিত মিশ্রিত। রামপুরবোয়ালীয়া হইতে নওহাটা ১০ মাইল দূর। এই নওহাটা বারানই নদী-তীরে। এই স্থান হইতে নদী বেশী গভীর। ইহা অপ্রশস্ত কিন্তু অত্যন্ত গভীর। এই নদীর তীরে প্রসিদ্ধ তাহিরপুর-রাজার বাসস্থান। বাগমাবা পুলিশ ষ্টেসনও এই নদীর তীরে। এই নদীব উপর উত্তর বঙ্গ রেলওয়ের নলডাঙ্গার লৌহ সেতু নির্ম্মিত আছে। এই সেতু হইতে মাধনগর ষ্টেসন অতি নিকট।

বিল।— জেলায় ছোট বড় অনেক বিল আছে তন্মধ্যে বিলচলন বৃহৎ এবং সকল সময নৌকায় যাতায়াত কবা যায়। বিলচলনের আয়তন প্রায় ১৫০ বর্গ মাইল। নাটোব হইতে বগুড়া পর্য্যন্ত যে বাস্তা আছে, সেই রাজপথের উপর সিংড়া থানা। সেই সিংড়া হইতে বড়ল নদীব তীরে পাবনা জেলার অন্তর্গত চাটমহর পর্য্যন্ত বিলচলন ২৯ মাইল বিস্তৃত। বর্ষা ব্যতীত অন্য সময় বিলের- আয়তন হ্রাস হয়। মাঁদা, রক্তদহ এবং সতীর বিলও নিতান্ত ছোট নহে।

নৌকাপথে বাণিজ্য।— অনেক নদ, নদী ও বিল থাকায় এ জেলার বাণিজ্য প্রধানতঃ জলপথে চলে। শকটে বাণিজ্য দ্রব্য যাতায়াত অতি কম। পদ্মা নদীর তীবে সুলতানগঞ্জ ও গোদাগাড়ী অঞ্চল হইতে পশ্চিম বরেন্দ্রের চাউল চালান হয়। গোবিন্দপুর, কতলোব, হাতিয়ানদহ, সাঐল, আঞ্চখকোট, গাঙ্গৈল, বরবাড়ী, ধরাইল, তেমূল নওগাঁ, সিংড়া, সেবকোল প্রভৃতি স্থানেব লোকেরা নৌকাপথে ধান্য, চাউল ও পাটেব ব্যবসা কবে। আজ কাল পাট ও তামাকের ব্যবসাও কম নহে।

মৎস্য।— রাজসাহী মহাভারতোক্ত ও মৎস্যদেশের অন্তর্গত; সুতরাং রাজসাহীতে মৎস্য প্রচুব। এমন গ্রাম বা এমন নগর নাই যেখানে কেবল জেলে বাস করে না। গ্রাম গ্রাম একত্র করিয়া মোট জেলায় ৭ কি ৮ হাজার ঘর জেলে বাস করে। মোট ২৩,০০০ কি ২৪,০০০ জেলের বাস রাজসাহী জেলায় হইবে। ইহা ব্যতীত চণ্ডাল ও মুসলমান জাতীয় মৎস্যজীবী "ধাওয়া" নামক কতকগুলি লোক হাতাস, চলনবিল প্রভৃতিব নিকট বাস করে। ইহাদের সংখ্যাও ২৪,০০০ কি ২৫,০০০ হইবে। ইহারা বিলে ও ধান্যক্ষেত্রে মৎস্য ধরে। বোয়ালীয়া, পুঠীয়া, নাটোর, সরদহ, লালপুর, কলম প্রভৃতি স্থানে মৎস্য বেশী পবিমাণে বিক্রয় হয়। পদ্মা নদীতে ও বড়ল নদীতে প্রচুর পরিমাণে ইলীস মৎস্য পাওয়া যায়। রাজসাহী জেলায় মৎস্যের দর এত কম যে কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের ন্যায় সেরদরে বিক্রয় হয় না।

ফল।— ফলের মধ্যে আম্র ও কাঁঠাল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। জেলার উত্তর ও দক্ষিণভাগে কাঁঠাল বেশী; পূর্ব্ব ও পশ্চিমভাগে কাঁঠাল কম। বাগা ও রামপুব বোযালীয়ার নিকটবর্ত্তী স্থানে এবং মাধনগরের আম্র ভাল এবং এই সব স্থানে প্রচুর পবিমাণে পাওয়া যায়। বাগার আম্রই অতি প্রসিদ্ধ। সমুদ্র নিকটবর্ত্তী স্থানেব ন্যায় নারিকেল বৃক্ষ সকল স্থানে হয় না। বোয়ালীয়া ও পুঁঠিয়াতে প্রচুর পরিমাণে নারিকেল জন্মে। বেল, জাম, নেবু, কলা, আনারস প্রভৃতি ফলও কম নহে। অধুনা অনেক স্থানে লিচু ফলও জন্মিতেছে।

চাষপদ্ধতি।— বিলে বা বিলের নিকটবর্ত্তী স্থানে বোরো ধান্য হয়। বরেন্দ্রে, রোপা, আর ভড়ে মোটা বুনা আমন ধান্য জন্মে। পলী ভূমিতে হরিদ্রা ও আখ জন্মে। পদ্মা ও বড়ল নদীর চরে নীল হয়। তাহিরপুর ও লস্করপুর পরগণায় তুঁতের চাষ বেশী; কিন্তু তুঁতের চাষ ক্রমে কমিয়া আসিতেছে। কেবল নওগাঁ মহকুমায় গাঁজার চাষ।

১৩১৩৩৩৬ লোকসংখ্যা মধ্যে ৪২৬,২৭৮ জন কৃষক। কৃষকের অবস্থা সাধাবণতঃ ভাল ছিল; কিন্তু কৃষক বিলাসপরায়ণ হওয়ায় দিন দিন হীন অবস্থায় পতিত হইতেছে। রাজসাহীতে কৃষিকার্য্য লাভজনক তাহার আব সন্দেহ নাই। রাজসাহীব অনেক ভদ্রলোক চাকর দ্বারা বা বর্গা প্রণালীতে কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে এবং সুখস্বচ্ছন্দে বাস করে। এইজন্য বাজসাহীর ভদ্রলোক মধ্যে চাকুরী ব্যবসায়ী অতি কম।

কৃষি।— ধান্যই প্রধান— আউশ ও আমন। ইহারা রোপা ও বুনা। বরেন্দ্র ভূমিতে বোপা ও ভড় অর্থাৎ নিম্নস্থানে বুনা ধান্য হয়। যে স্থানে স্বভাবতঃ পূর্ব্বেই বর্ষা হয়, সেই স্থানেই বোরো ধান্য হয়। নিকটে পানি না থাকিলে বোরো ধান্য হয় না। পাট চাষও আজ কাল কম নহে। অনেক স্থানে ধান্যের জমিতে পাট চাষ করিতেছে।

প্রায় শতকরা	৬০	...	আমন ধান্য
" "	২২	...	আশু "
" "	৫	...	বোবো "
" "	১৩	...	অন্যান্য শস্য।
	১০০		

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ১৪,৩৩৩ একর জমিতে পাট চাষ হয়; এক্ষণে ধান্য চাষের, জমি কম হইয়া পাট চাষের জমি প্রায় দেড়গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে।

রাজসাহীতে নীল ও রেশম যথেষ্ট জন্মে। ১৮৯৮—৯৯ খৃষ্টাব্দে নীল ১,০৬২ মণ এবং রেশম ১৫৫,৪২২ পাউণ্ড উৎপন্ন হয়।(১)

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত "রেবিনিউ সর্ভে" হয়। জরিপ শেষ হওয়ার সময় জেলার আয়তন, প্রায় ৩০০০ বর্গমাইল ছিল, তন্মধ্যে অর্দ্ধেকের বেশী জমিতে চাষ হইত, অবশিষ্ট জমি চাষের অনুপযুক্ত বা পতিত ছিল। কিন্তু এক্ষণে জেলার আয়তনের এক চতুর্থাংশ জমি পতিত আছে কি না সন্দেহ।

গাঁজার চাষ।— রাজসাহী জেলার কেবল নওগাঁও মহকুমায় গাঁজা জন্মে। এই চাষে ব্যয় পরিশ্রম বেশী। গাঁজার জমির প্রধান সার খোল। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ১২০০ বিঘা বা ৪০০ একর জমিতে গাঁজাব চাষ হয়। কিন্তু ১৮৯৭—৯৮ খৃষ্টাব্দে ২১০৮ বিঘা জমিতে গাঁজার চাষ হয় এবং ৫৭৯৩ মণ গাঁজা উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ১৮৯৮—৯৯ খৃষ্টাব্দে ১৫৩১ বিঘা জমিতে গাঁজার চাষ হয় এবং ৫,৪১৭ মণ গাঁজা উৎপন্ন হইয়াছে। এই ২৫/২৬ বৎসরে গাঁজার জমির চাষ প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। দুবলহাটী রাজ্যেই গাঁজার চাষ বেশী। এই ২১০৮ বিঘা জমির মধ্যে প্রায় ১৮০০ বিঘা জমি দুবলহাটী রাজ্যের অন্তর্গত ১৮৯৮—৯৯ খৃষ্টাব্দে ৫৮৬৭ মণ গাঁজা নওগাঁ

---

(1) "The Production of indigo is practically limited in Rajshahi, only a few maunds being manufactured in the District of Rangpur The two small factories that exist in Dinagepur did not work during the year. The outturn of indigo in Rajshahi was 1,062 maunds against 781 maunds and, 29 seers in the preceding year. The yield of silk was 155,122 lts against 135,881 lbs in the previous year "—Administration Report of the Rajshahi Division for 1898-99

হইতে ভাবতবর্ষের নানাস্থানে প্রেরিত হয়। (১)

বাঙ্গালা	...	৪৬৭২
উড়িষ্যা	...	২৫৫
আসাম	...	৫৪৫
কুচবিহার	...	৬৭
উত্তর পশ্চিম প্রদেশ	...	৩২৮
		৫৮৬৭

উপরের তালিকায় ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে বঙ্গদেশে গাঁজা বেশী পরিমাণে প্রচলিত।

পান।— পবগণে তাহিরপুর ও তপ্পে চাপলায় পান জন্মে। সাঁচী পানই সুখাদ্য। মাধনগর রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে উত্তব প্রদেশে প্রতিদিবস বিস্তর পান বিক্রয়ার্থ যায়।

পরিচ্ছদ।— সাধারণতঃ ধূতি, চাদর ও পীরাণ ব্যবহার করিতে দেখা যায়। বামপুরবোয়ালীয়া ও নাটেরে বালাপোষের ব্যবহার আছে। হিন্দু রাজাদিগের সময় হইতে ক্রমে পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তন হইতেছে। আজ কাল কৃষকের পরিচ্ছদেবও বিস্তব পরিবর্ত্তন।

বাসগৃহ।— সহরে ও রাজা জমিদারদিগের গৃহ প্রায় ইষ্টকনির্ম্মিত। বাঁশ ও খড়নির্ম্মিত গৃহই অধিক। বরেন্দ্রভূমিতে মৃত্তিকানির্ম্মিত দেওয়াল হয়। আজ কাল অনেক টীনেব ও খাপবার গৃহ স্থানে স্থানে প্রস্তুত হইতেছে। রাজসাহীব "উলুখড়ের ছাওয়া বেঁকান ঘর, যাহাতে বাঁশের ছেচার বেড়া, দেখিতে সুন্দর।"(২) এই বেঁকান ঘরকে রাজসাহীতে 'বাঙ্গালা ঘর" বলে। রাজসাহীর বাঙ্গালা ঘর ও আটচালা অতি সুন্দব।

শিল্প।— রেশমের সূতা প্রস্তুত জন্য ওযাটসন কোম্পানীব অনেক কুঠী আছে। সরদহের কুঠিই প্রধান। ডাকারা, চারঘাট, মীরগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে মটকার ধুতি চাদব প্রস্তুত হয়। কলমে ও বুধপাড়ায় নানাবিধ কাঁসা ও পীত্তলের বাসন প্রস্তুত হইয়া থাকে। চিলমাবী ও খাগড়ার থাল, গেলাস, বাটা আর্দির ন্যায় কলমে থাল আদি প্রস্তুত হইতেছে। কলমে এত কাঁসারী আছে যে

---

(1) "Ganja is cultivated in a tract of country about 64 square miles in area lying within THANAHS Nauguon and Mohadevpur in the Naugaon Sub-Division of the Rajshahi district In consequence of the destruction of the plants in the nurseries by heavy rains, the areas under the crop decreased from 2108 Bighas to 1531, the number of cultivators growing the drag from 1882 to 1834, and the produce from 5793 maunds to 6417 The average out-turn of the crop was 3 maunds 20 seers per bigha against 2 maunds 30 seers in the previous year "

"The total quantity of Ganja exported from Nugaon was 5867, maunds against 5966 in the preceding year. The distribution of the export was a follows -

Bengal	4,672
Orissa	255
Assam	545
Cooch Behar	07
North-West Provinces	328
	5,807

—Administration Report of the Rajshahi Division for 1898-99

(2) "The cottage of Bengal, with its trim curved thatched roof and cane walls, is the best looking in India "

- The Elphinston's History, of India

(তাহারা দিবা রাত্রি এরূপ কার্য্য করে যে) তাহাদের কার্য্যের শব্দে আগন্তুক ব্যক্তির রাত্রিতে নিদ্রা হওয়া কঠিন। রামপুরবোয়ালীয়াতে একটী রেশমী স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। ইহার নাম "জুবিলী ইন্ডষ্ট্রিয়াল স্কুল"। রাজসাহী জেলার বোর্ডের সাহায্যে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে এই বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই অল্প সময় মধ্যে জাপান, ইতালী, ইংলন্ড এবং ভারতের স্থানে স্থানে ইহার উপকারিতা অনুভূত হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ের বিবরণ যথাস্থানে বিবৃত করা যাইবে।

ব্যবসা ও বাণিজ্য।— জেলাতে কাপড়, কার্পাস, চিনি, ঘৃত, শালকাঠ, লবণ, মশলা আদি আমদানী হয় এবং জেলা হইতে ধান্য, চাউল, হরিদ্রা, রেশম, নীল, পাট ও গাঁজা রপ্তানী হয়। জেলায় যে কেবল কৃষিকার্য্যের সুবিধা এমত নহে; ব্যবসা বাণিজ্যেরও যথেষ্ট সুবিধা। রাণী ভবানীর সময়ে রাজসাহী রাজ্যে কার্পাস ও পট্টবস্ত্রের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। ইংরেজ, ফরাসী এবং ওলন্দাজ বণিকগণ রাজসাহীর অনেক স্থান হইতে কার্পাস ও পট্টবস্ত্র সুলভ মূল্যে ক্রয় করিয়া ইউরোপে বিক্রয়জন্য প্রেরণ করিতেন। আবার আবশ্যকমত ক্রয় করিতে পারেন, এই বিবেচনায় বণিকগণ তন্তুবায়গণকে "দাদন" অর্থাৎ অগ্রিম কতক মূল্য প্রদান করিতেন। ১৩০৪ শকের ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের "সাহিত্যে" লিখিত আছে :— "ইংরেজেরা লিখিয়া গিয়াছেন, প্রত্যেক আড়ং হইতে তাঁহারা বৎসরে ১৪৮১০০ খণ্ড বস্ত্র ক্রয় করিতে পারিতেন। রাজপুরুষেরা বলেন যে, রাণীভবানীর রাজ্যে বিংশতি লক্ষ লোকের বসতি ছিল। যে রাজ্যে বিংশতি লক্ষ লোকের পরিধেয় বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া লক্ষ লক্ষ বস্ত্র ইউরোপীয় বণিকের নিকট বিক্রীত হইত, সে রাজ্যে প্রজার লক্ষ্মীশ্রী কিরূপ ছিল? সে রামও নাই— সে অযোধ্যাও নাই; এখন রাজসাহীতে বিলাতী কাপড়েরই একাধিপত্য।" বিলাতী কাপড় সুলভ মূল্যে বিক্রয় হওয়াতে, তন্তুবায়গণ নিজ ব্যবসা ত্যাগ করিয়া কেহ কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিয়াছে এবং কেহ বা অন্য ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে। এজেলার পাঁচুপুর থানার অন্তর্গত পাঁচুপুরনিবাসী বেণী সাহা ও বাহারু সাহা, বিলমাড়িয়া (লালপুর) থানার অন্তর্গত বাগার নিকট হরি সাহা এবং লালোরের নিকট হাতীযানদহের বক্সু প্রামাণিকের ব্যবসাই প্রধান। ইহারা ব্যবসা বাণিজ্যে বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন।

হাট, বাজার ও মেলা।— হাট ও মেলার সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। বারইয়ারী কালীপূজা যে যে স্থানে হয়, প্রায় সেই সকল স্থানেই মেলা হয়। মেলার আয় দ্বারা কোন কোন স্থানে বারইয়ারী কালীপূজা হয় এবং কোন কোন স্থানে পূজার ব্যয় সংকুলান হইয়া যথেষ্ট অর্থ অবশিষ্ট থাকে। দৈনিক বাজার অল্প স্থানেই হয়। রামপুরবোয়ালিয়া, নাটোর, সবদহ, চারঘাট, পুঁঠিয়া, দিঘাপতিয়া, হাতিয়ানদহ, কলম, নওগাঁ, প্রভৃতি স্থানে দৈনিক বাজার হয়। হাটের সংখ্যা অনেক; তন্মধ্যে তাহিরপুর ও নওগাঁয়ের হাট প্রসিদ্ধ। প্রধান প্রধান মেলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রকাশ করা গেল।

(১) প্রেমতলী।— ইহাকে ক্ষেতরের মেলা বলে। রামপুর-বোয়ালিয়ার ১০ কি ১২ মাইল পশ্চিম। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে মেলা হয়। চৈতন্যদেব গৌড় যাওয়া উপলক্ষে এই মেলা হয়।

(২) মাঁদা।— মাঁদার বিলের ধারে। চৈত্র মাসের শুক্লা নবমী তিথিতে মেলা আরম্ভ হয়। রামচন্দ্রের পূজা হয়। নাটোরের রাজা সেবাইত। এই মেলার সময় বহুদূর হইতে অনেক লোকের সমাগম হয়; বৈরাগীর সংখ্যাই বেশী।

(৩) কুজাইল।— যমুনা নদীর তীরে। কাশীমপুর গ্রামের নিকট। বারইয়ারী কালীপূজা

উপলক্ষে মেলা হয়। প্রায় এক মাস মেলা থাকে।

(৪) নওগাঁ, কালীতলা।— যমুনা নদীর তীরে। নওগাঁ মহকুমার নিকট। দুবলহাটী রাজাদ্বারা এ মেলা স্থাপিত। এ মেলা প্রায় ২০ দিন থাকে। কুজাইলের মেলার সময় এই মেলা আরম্ভ হয়।

(৫) ভবানীপুর।— যমুনা নদীব তীরে। শুকটীগাছা হাটের নিকট। বারইয়ারী কালীপূজা উপলক্ষে মেলা হয়। প্রায় ১৫ দিন মেলা থাকে।

(৬) বুধপাড়া।— লালপুরে বিলমাড়িয়া থানার নিকট। দুর্গোৎসব পরে দীপান্বিতা উপলক্ষে যে শ্যামাপূজা হয়, সেই সময় এই মেলা হয়।

(৭) বাগা।— এটা মুসলামনের মেলা। বমজান ইদ উপলক্ষে মেলা হয়।

ইহা ব্যতীত রথযাত্রা উপলক্ষে তাহিবপুর, বলিহার ও দুবুলহাটির মেলাও কম প্রসিদ্ধ নহে। পুঠিয়ার বথের মেলা সর্মধিক প্রসিদ্ধ।

প্রথম অধ্যায়
জাতি বিবরণ

রাজসাহী জেলায় প্রধানতঃ হিন্দু ও মুসলমান এই দুই জাতির বাস। হিন্দু জাতিকে নিম্নের আট শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে ঃ—

(১) ব্রাহ্মণ।	(২) ক্ষত্রিয়।
(৩) বৈশ্য।	(৪) বৈদ্য।
(৫) কায়স্থ।	(৬) নবশাক বা জল-আচরণীয় হিন্দু।
(৭) জল-আচরণীয় হিন্দু অথচ নবশাক নহে।	(৮) জল-অনাচরণীয় হিন্দু।

পুরাকালে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণ ব্যতীত পঞ্চম বর্ণ ছিল না। প্রথম তিন বর্ণেব মাতৃগর্ভে প্রবেশহেতু এক জন্ম এবং সংস্কার হইয়া যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন বলিয়া আর এক জন্ম হয়। এই হেতু ঐ প্রথম ত্রৈবর্ণ দ্বিজ বলিয়া পবিচিত। শূদ্রেব কেবল মাতৃগর্ভে প্রবেশকে এক জন্ম বলিয়া "একজ" নামে খ্যাত। শূদ্রেবা যজ্ঞোপবীত ধারণ করে না। এই চারি জাতি ব্যতীত বৈদ্য, কায়স্থ, নবশাক প্রভৃতি যে জাতিগুলি দেখা যায় ইহারা শূদ্রজাতির অন্তর্ভূত কি প্রথম তিন বর্ণেব অন্তর্গত ইহা তর্কবিতর্কের কথা। যদি বৈদ্য ও কায়স্থ শূদ্রজাতি মধ্যে পবিগণিত না হয়, তবে তাহারা কি প্রথম তিন বর্ণেব কোন একটী বর্ণ হইতে উৎপন্ন? তবে কি তাহারা বর্ণসঙ্কব? এ প্রশ্নগুলির ঠিক মীমাংসা কবা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। অতি প্রাচীনকালে আর্য্যজাতিদেব মধ্যে প্রথমে জাতিভেদ ছিল না বলিয়া সাধারণেব প্রতীতি হয়। প্রথমে সকল জাতিব মধ্যে পরস্পব আহার, বিহার, উপবেশন প্রচলিত ছিল। সমাজেব কাজ কর্ম্ম সুবিধামত চালাইবার জন্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চাবি শ্রেণীতে আর্য্যজাতি বিভক্ত হয়। ব্রাহ্মণের বেদন্ত হইয়া জ্ঞান ও ধর্ম্ম শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন। এইরূপে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ এবং পবেপরে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র জাতিব সৃষ্টি হইয়া জাতিভেদ হইল। জাতি ভেদ হওয়ার পরেও উচ্চ জাতিয়েরা নীচজাতির কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারিতেন। ইহাও নিয়ম ছিল যে নীচ জাতীয়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি বুদ্ধিমান হইলে তাহাকে সংস্কাব করিয়া যজ্ঞোপবীত ধাবণ কবান হইত এবং ঋষিরা তাহাকে বেদ অধ্যয়ন করাইয়া ব্রাহ্মণ করিতেন। ইহাতে এই বলা যাইতে পারে যে, শূদ্র ও যদি ব্রাহ্মণের ন্যায় জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক হইত, তবে সে শূদ্রও ব্রাহ্মণেব ন্যায় সম্মানিত হইত। (১) "যাহারা বেদহীন ও আচারভ্রষ্ট হইয়া সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান ও সকল দ্রব্য ভক্ষণ করে তাহারাই শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হয়"। (২) এই মহাভারতীয় বাক্যেব উপর নির্ভব করিলে, ইহা বলা যাইতে পারে যে পুরাকালে আর্য্যসন্তান বেদহীন আচার ভ্রষ্ট

---

(১) "তখন আবো নিযম ছিল যে নীচ জাতীব লোক উচ্চ জাতির মত কাজ কবিতে পাবিলে তিনিও উচ্চ জাতি হইতেন। আবাব, উচ্চ জাতিব লোক নীচ কাজ কবিলে সেও নীচজাতি মধ্যে গণ্য হইত; অর্থাৎ একজন শূদ্র যদি ব্রাহ্মণেব মত আচবণ কবিতেন, তাঁর মত ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িতেন ও দেবারাধনা কবিয়া জীবন কাটাইতেন, তিনিও ব্রাহ্মণপদ পাইতেন এবং ব্রাহ্মণ জাতিব মধ্যে গণ্য হইতেন। ব্রাহ্মণ সন্তান আবাব যদি মাদক সেবনাদি অপকর্ম্ম করিত সেও শূদ্রেব মধ্যে গণ্য হইত।"— প্রিযনাথ মল্লিক প্রণীত বাঙ্গালাব ইতিহাস।

(২) মহাভাব্তীয় উদ্যোগ পর্ব্বান্তর্গত প্রজাগব পর্ব্ব, ৩৬ অধ্যায়— 'কাযস্থ বংশাবত্রা' সংগৃহীতা দ্বাবা উদ্ধৃত।

হইলেই শূদ্র এবং সদ্‌গুণানুসারে ও ব্যবসানুসাবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। অধুনা আর্য্যজাতি পূর্ব্বের ন্যায় বেদজ্ঞ না হওয়ায় এবং কালক্রমে জাতিভেদ দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পূর্ব্বের ন্যায় জ্ঞান চর্চ্চা বিহীনে, সকল জাতিরই হীন অবস্থা এবং জাতিভেদেরও বেশী বাড়াবাড়ি হইয়াছে। অতএব নানা জাতিব ও বর্ণের সৃষ্টি এবং নানা পরিবর্ত্তন জন্য কোন বিষয়ে ঠিক মীমাংসায় উপনীত হওয়া কঠিন।

এই রাজসাহী জেলায় ১৫০০ বা ১৬০০ ব্রাহ্মণেব বাস। সাধারণতঃ রাজসাহীব ব্রাহ্মণদিগকে পাঁচশ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পাবে, যথা— (ক বাবেন্দ্র, খ) বাঢ়ী, (গ) বৈদিক, (ঘ) বর্ণ, (ঙ) কনৌজ। রাজা আদিশূরের পুত্রেষ্টি যাগ সম্পন্ন জন্য কান্যকুব্জ হইতে দক্ষ, ভট্টনারায়ণ, শ্রীহর্ষ, বেদগর্ভ ও ছান্দড় নামে সাগ্নিক, বেদজ্ঞ ও সৎক্রিয়াশালী পঞ্চ ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আসিয়া প্রদত্ত পঞ্চ গ্রামে বাস করেন। ইহাঁদের বংশধরেরা কতকগুলি বাঢ়দেশে ও কতকগুলি ববেন্দ্রভূমে বাস করেন। যাঁহারা বরেন্দ্রভূমে বাস করিতে লাগিলেন, তাঁহারা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ হইলেন।

(ক) বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ— এই শ্রেণী ব্রাহ্মণ প্রায়ই ধনী। জেলাব বড় বড় রাজা জমিদাব প্রভৃতি এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। তাহিরপুর, পুঠিয়া, নাটোর, বলিহার, চৌগ্রাম, লালোর, কাশীমপুর, পান্‌শীপাড়া, জোয়াড়ী, দাবীকুশী, আটগ্রাম, ইসলামগাতী, খাজুবা প্রভৃতি স্থানেব রাজা ও জমিদারেরা এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। বর্ত্তমান আয়তন অপেক্ষা পূর্ব্বে এই জেলার আয়তন পাঁচ গুণ বেশী ছিল। এইরূপ বৃহৎ জেলা ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে তাহিরপুর, পুঠীয়া, নাটোর প্রভতি বাজার হস্তে ছিল। মহাবাণী শরৎসুন্দরীর জীবনচরিতে শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় লিখিয়াছেন যে— "বাজসাহী জেলার বর্ত্তমান আয়তন সঙ্কীর্ণ হইলেও অনেক স্থানে বরেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্ব পুরুষদিগেব বসতি-চিহ্ন, অদ্যাপি লুপ্ত হয় নাই। কুলজ্ঞ গ্রন্থে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের যে সকল সমাজেব উল্লেখ আছে তাহাব অধিকাংশ বর্ত্তমান বাজসাহী জেলার সীমা মধ্যে দেখা যায়। তবে দীর্ঘকালে নামেব অপভ্রংশ মাত্র হইয়াছে; যথা— মধ্যগ্রাম (মাঝ গ্রাম), গুড় নদী (গুড়নই), গুণিগাছা, ভাদুড়ী (ভাতুড়িয়া), মধুগ্রাম (মৌগ্রাম), বালষষ্টিক (বালশাটিয়া), মঠগ্রাম (মঠগাঁ), গঙ্গাগ্রাম (গাঙ্গইল), বিশাখ (বিশা), রানীহারি (বায়না), কুড়মুড়ি (কুড়মইল বলিহার), শীতলী (শীতলাই), তালড়ী (তানোর), দেবলী (দেউলা), নিদ্রালী (নিন্দাইল), কালিগ্রাম (কালির্গা), খর্জ্জুরী (খাজুরিয়া), পঞ্চবটী (পাঁচবাড়িয়া), চম্পটী (চামটা), বোড়গ্রাম (বড়াইর্গা), করঞ্জ (করঞ্জা), বোথড়ী (বোথড়), ইত্যাদি নাম ও সমাজের চিহ্ন দেখা যায়।" সুষেণাদির পুত্রগণ (১) বরেন্দ্রভুমিতে একশত গ্রাম (গাঁই) প্রাপ্ত হইয়া বাস করেন। ইহাঁরাই বারেন্দ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত। এই বাবেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ প্রধানতঃ তিন শাখায় বিভক্ত, যথা— (১) কুলীন, (২) সিদ্ধ শ্রোত্রিয়, (৩) কষ্ট শ্রোত্রিয়। কোন্ শাখায় কতগাঁই তাহাব তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল ঃ—

সংখ্যা	শাখা	কোন শাখায় কত গাঁই।
১	কুলীন	৮
২	সিদ্ধ শ্রোত্রিয়	৮
৩	কষ্ট শোত্রিয়	৮৪
	মোট	১০০

(১) সুবেগাদি পঞ্চ ব্রাহ্মণ— নানাযণ ভট্ট, সুষেণ.. ।
কেহ কেহ কুলীন বলেন।
. তিষ্ঠা তীর্থ দর্শনং।
. . কুললক্ষণম্।
* ইহাদেব মধ্যে কাশ্যপ গোত্রীয় সুবেণেব বঙশোদ্ভব .

কুলীন ব্রাহ্মণ— এই বারেন্দ্র শ্রেণী কুলীন ব্রাহ্মণের ৮ গাঁই, যথা— মৈত্র, ভীম, রুদ্র ও সাধু (বাগচী), সংযামিনী (সান্যাল), লাহিড়ী, ভাদুড়ী ভাদড়া (১)। কুলশাস্ত্রবিশারদ উদয়ণাচার্য্য ভাদুড়ী বারেন্দ্র শ্রেণী কুলীন ব্রাহ্মণগণের দোষ গুণ বিচার করিয়া তাহাদিগকে আটপটীতে বিভক্ত করেন, যথা— (১) নিরাবিল, (২) ভূষণা, (৩) রোহিলা, (৪) ভবানীপুর, (৫) বেণী, (৬) আলেখানী, (৭) কুতুবখানী, (৮) জোনালী। এইরূপ কৌলীন্যপ্রথা বল্লালসেনের সময় হইতে প্রচলিত। কিন্তু বল্লালসেনের অধিকারের পূর্ব্বে, ঠিক এই প্রকার না হউক, কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত হইতেছিল। মনুব কন্যা দেহুবতি। এই দেবহূতির সহিত কর্দ্দম মুনির বিবাহ হইয়া নয়টী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। এই নয় কন্যার বিবাহ নয় ব্রহ্মষির সহিত হওয়ার সময় কৌলীন্য প্রথা প্রথমে প্রচলিত হয়। বল্লালসেন নবগুণ (২) বিশিস্ট ব্রাহ্মণকে কুলীন করেন এবং অবশিষ্ট ব্রাহ্মণকে গুণানুসারে সিদ্ধ শ্রোত্রিয় ও কষ্ট শ্রোত্রিয় করেন। বর্ত্তমান প্রথানুসারে ব্রাহ্মণগণের সেই গুণ না থাকিলেও কুলীন ও শ্রোত্রিয় বলিয়া কথিত হন। এইরূপ বংশগত কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত হওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে এবং বল্লালসেনেরও এইরূপ উদ্দেশ্য ছিল না। কৌলীন্য প্রথায় যেমন দোষ আছে, তেমন গুণও আছে। সমাজবন্ধনীর শিথিলতাতেই দোষের ভাগ বৃদ্ধি হইয়াছে। এই বল্লালসেন প্রচলিত কৌলীন্য প্রথানুসাবে খাজুরা, চৌগ্রাম, বর্ত্তমান তাহিরপুব (বংশ), পাটুল, বলিহার প্রভৃতি স্থানের কুলীন ব্রাহ্মণ নিবাবিল পটীভূক্ত এবং ইহারাই সমাজে শ্রেষ্ঠ।

সিদ্ধ শ্রোত্রিয়।— সিদ্ধ শ্রোত্রিয়ের ৮ গাঁই যথা— করঞ্জ, নন্দনাবাসী, ভট্টশালী, লাড়ুলিমচম্পটী, ঝম্পটী, (ঝামাল কামদেব (কামদেবতা), আদিত্য যাঁহারা কন্যা গ্রহণে ও কন্যা সম্প্রদানে বিশেষ সাবধান ছিলেন, তাঁহাবাই উৎকৃষ্ট শ্রোত্রিয় হইলেন। চম্পটী, নন্দনাবাসী প্রভৃতি গাঁই অতি প্রসিদ্ধ শাণ্ডিল্য গোত্রীয় নন্দনাবাসী (গাঁই, গ্রামেব মৌনভট্ট বংশ প্রসিদ্ধ মুক্তাবলী" প্রণেতা কুল্লুকভট্ট বেং তাহিরপুর রাজবংশের আদিপুরুষ কংস নারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন।

কষ্ট শ্রোত্রিয়।— যাঁহারা কন্যাগ্রহণে ও সম্প্রদানে নিতান্ত অসাবধান, তাঁহারাই কষ্ট শ্রোত্রিয হইতেন। এই কষ্ট শ্রোত্রিয়ের ৮৪ গাঁই। ইহাদের মধ্যে ৮ ঘর প্রসিদ্ধ যথা ঃ— শ্রীহবি, বাইগাঁই, কুড়িমুড়িয়া, গোস্বা, খঞ্জরী, বিশি, উচ্চরিক ও জামরিক। স্বর্ণদেব শীহরি গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া কষ্ট শ্রোত্রির আখ্যা প্রাপ্ত হন। বাইগাঁই রাঢ়িশ্রেণী ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও দেখা যায়।

বারেন্দ্রশ্রেণী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কোন্ গোত্রে কতগাঁই, তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল ঃ—

সংখ্যা	গোত্রের নাম	গ্রামের সংখ্যা (গাঁই)
১	কাশ্যপ	১৮
২	শাণ্ডিল্য	১৪
৩	বাৎস্য	২৪
৪	ভরদ্বাজ	২৪
৫	সাবর্ণ	২০
		১০০

গোত্রীয় নারায়ণ ভট্টের বংশোদ্ভব সাধু, রুদ্র, লোকনাথ (১) ও বাৎস্য গোত্রীয় ধরাধরের বংমোদ্ভব লক্ষ্মীধর, জয়মণি মিশ্র, বল্লালের নিকট কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। অবশিষ্ট সমুদয় শ্রোত্রিয় বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়।

রাজসাহীতে নাটোর (রাজবংশ), পানশীপাড়া, ইশলামগাঁতী, আটগ্রাম প্রভৃতি স্থানের শ্রোত্রিয় অতি প্রসিদ্ধ।

কোন ব্যক্তির সহিত কোন একটী কন্যাব সম্বন্ধ নির্ণয় (করণ) হইবার পর, দৈবাৎ যদি বিবাহের পূর্ব্বেই বরের মৃত্যু হয়, তবে ঐ অবিবাহিতা কন্যাকে অন্যপূর্ব্বা কহে। বারেন্দ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণগণ মধ্যে এই অন্যপূর্ব্বা বিবাহ প্রচলিত আছে বটে; কিন্তু যে ব্রাহ্মণ এই কন্যাকে বিবাহ করে, সে সমাজে অতি ঘৃণিত হইয়া থাকে এবং উৎকৃষ্ট কূলে আদান প্রদান করিতে পারে না। এই দোষ নিবারণ জন্য এক্ষণে বিবাহের অব্যবহিত পূর্ব্বে করণ হয়।

কাপ (কাচ)।— রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণগণ মধ্যে কাপ নাই। বারেন্দ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণগণ মধ্যে কাপের সৃষ্টি হয়। সাধারণ কথায় কুলভ্রষ্ট ব্যক্তিকে কাপ বলা যায়। শান্তিপুর নিবাসী নৃসিংহ লাড়ুলী সিদ্ধ শ্রোত্রিয় ছিলেন না। তাঁহার কন্যাকে কুলীন শ্রেষ্ঠ মধু মৈত্রেয় বিবাহ করিলে, মধুব পূর্ব্ব পত্নীর গর্ভজাত সন্তানগণ, পিতা নীচ বংশের কন্যা গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল এবং বাটীর মধ্যস্থলে বেড়া দিয়া পৃথক বাস কবিতে লাগিল। ধেঁই বাগচি মৈত্রেয়র ভগিনীপতি। ধেঁই বাগচি, তাঁহার পত্নীর অনুরোধে, মধু মৈত্রের বাটীতে তাহার পিতাব একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ উপলক্ষে আসিয়া দেখিলেন, মধুর পুত্রগণ চণ্ডীমণ্ডপেব মধ্যস্থলে বেড়া দিয়া পৃথক বাস করিতেছেন। ধেঁই বাগচির নানা উপদেশে পুত্রগণ পিতার সহিত একত্রিত হইল না। তৎপর ধেঁই বাগচি মধুর পুত্রগণকে বলিলেন, তোরা বাটীর মধ্যস্থলে বেড়া দিয়া এ একটী "কাচ" করিয়াছিস। এই "কাচ" শব্দ হইতে "কাপ" হইল। মধু মৈত্রের প্রথম বনিতার তিন পুত্র রক্ষতাই, নন্দাই গদাই এই তিন সহোদর কূলভ্রষ্ট কাপ হইলেন। তাহারা বারি-বিন্দু প্রক্ষেপণ দ্বারা অন্যেকেও কাপ কবিয়া লইতে লাগিল। মধু মৈত্রেযও সমাজে পতিত অবস্থায় আছেন। কিন্তু রাজা কংস নারায়ণ মধু মৈত্রব . তাঁহার সমাজের মর্য্যাদা বক্ষা করিলেন। রাজা কংস নারায়ণ . করিলেন, কিন্তু নৃসিংহ লাড়ুলীর ও রাজা কংসনারাযণের দৌহিত্র . . প্রতিষ্ঠিত থাকিলেন। এই সময় হইতে কুশবারি সংযুক্ত না .. হইয়া শয়নে, ভোজনে, স্পর্শে, বারি-বিন্দু প্রক্ষেপে কুলীনের কুলপাত .. বলিয়া স্থির হইল। কাপের সহিত শ্রোত্রিয়ের বৈবাহিক সম্বন্ধ হইল, .. স্বধর্ম্মে পুষ্ট রহিলেন। এ বিষয় তাহিরপুর ও নাটোব রাজবংশের ইতিহাসে বিস্তারিতরূপে বিবৃত হইবে।

কাপগণের অনেক শাখা। প্রধানতঃ তিন শাখা প্রসিদ্ধ যথা— (১) বার্ব্বকাবাদ, (২) সুলতান প্রতাপ, (৩) গঙ্গাতীর। প্রথম দুই শাখা— রাজসাহী প্রদেশের (রাজসাহী ও পাবনা জেলার) অন্তর্গত এবং তৃতীয় শাখা মুর্শিদাবাদের অধীন।

(১) হরিপুর, লালুর (লালোর), কাশীমপুর, হাঁসপুর প্রভৃতি স্থানগুলি বার্ব্বকাবাদ সমাজের অধীন।

(২) বাক্, কাবারি, কোলা, নয়াবাড়ী, ক্ষেতুপাড়া প্রভৃতি স্থানগুলি সুলতান প্রতাপ সমাজের অধীন।

(৩) খাগড়া ব্যাসপুর, আচার্য্যপাড়া প্রভৃতি স্থানগুলি গঙ্গাতীর সমাজেব অধীন।

রাজসাহী প্রদেশের কাপ মধ্যে হরিপুর, লালুর কাশীমপুরের চৌধুরীরা, হাঁসপুরের ভট্টাচার্য্যেরা, ক্ষেতুপাড়ার রায়েরা এবং কাশীমপুরের লাহিড়ীবংশীয়েবা বিশেষ প্রসিদ্ধ। কাপ

(১) সাধু, রুদ্র, ও লোকনাথ এই তিন ভ্রাতা পীতাম্ববেব পুত্র। লোকনাথ লাহি়ি বাগচি গাঁই নামে পবিচিত।

ক্রমাগত কুলীনে কন্যাদান করিতে পারিলেই কাপের মর্য্যাদা বৃদ্ধি হইল।

বারেন্দ্র কুলীন ব্রাহ্মণ কুলভ্রষ্ট হইলে কাপ হন এবং কুলীন বলিয়া আর গৌরব রাখিতে না পারিলেও কুলকার্য্যদ্বারা সর্ব্বদা তাজা থাকেন; কিন্তু রাঢ়ী কুলীন ব্রাহ্মণ কুল ভঙ্গ করিলে, তিন পুরুষ পর্য্যন্ত কিয়ৎপরিমাণে কুলীনের মর্য্যাদা রক্ষা কবিয়াও কুলকার্য্যদ্বারা আর তাজা থাকিতে পারে না।

(খ) রাঢ়ী ব্রাহ্মণ।— পুত্রেষ্টি যাগ সম্পন্ন জন্য আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে সাগ্নিক বেদজ্ঞ পাঞ্চালীর ... পঞ্চব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আনেন। তাঁহাদের দক্ষ, ভট্ট নাবায়ণ শ্রীহর্ষ, বেদগর্ভ ও ছান্দড়। ইহাদেব সন্তান সন্তুতিদের . কেহ বরেন্দ্রভূমে বাস করেন। যাঁহারা বাঢ় দেশে বাস করিতেন তাঁহারা রাঢ়ী ব্রাহ্মণ হইলেন। কিন্তু হন্টার সাহেব বলেন যে মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণ সময় রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণেরা পশ্চিম বাঙ্গালা হইতে আসিয়া রাজসাহী জেলায় বাস করে: রাজসাহী বরেন্দ্রভূমি এবং হন্টার সাহেবের "বাঙ্গালা" বোধ হয় বাঢ়দেশ। এই দুই প্রদেশ পদ্মা নদী দ্বারা বিচ্ছেদ হইয়াছে। মহারাষ্ট্রীয়দের পক্ষে পদ্মানদী পার হইয়া রাজসাহী আক্রমণ করা কঠিন বিবেচনায়, পশ্চিম-বাঙ্গালা হইতে রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণ যে রাজসাহীতে নির্দ্দেশ করেন, তাহা হন্টার সাহেবেব অসঙ্গত কথা বলিয়া বোধ হয় না। কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণ মধ্যে দক্ষের ১৬, ভট্টনারায়ণেব ১৬, শ্রীহর্ষের ৪বেদগর্ভের ১২ এবং ছান্দড়ের ৮ সন্তান জন্মে। অতএব রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণেরা বলেন, "পঞ্চ গোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই তাহা ছাড়া ব্রাহ্মণ নাই।" বারেন্দ্রশ্রেণী ব্রাহ্মণেব একশত গাঁই এবং ইহাদের আদিপুরুষ সুষেণ প্রভৃতি পঞ্চ ব্রাহ্মণ। সুষেণ ও কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তান। (১) "কালক্রমে যখন ভ্রাতৃগণ মধ্যে অপ্রণয় ও বিদ্বেষ জন্মিল তখনই রাঢ়ী ও বারেন্দ্রগণ পরস্পর পৃথক হন। ফলে যাঁহারা পৃথক হইলেন, তাঁহারা পুনর্ব্বার রাজাব নিকট নিজ নিজ ব্যবহার আরও কতকগুলি গ্রাম প্রাপ্ত হইলেন। সেই গ্রামগুলি বরেন্দ্র ভূমির মধ্যে নির্দ্দিষ্ট হইল; সুতরাং উহা রাঢ়দেশের ছাপ্পান্ন গ্রাম নামমালাব মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না।" (২) রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণগণের ৫৬ গাঁইমধ্যে আটগাই নবগুণবিশিষ্ট এবং কুলীন বলিয়া প্রসিদ্ধ। যথা— বন্দো. চট্ট, মুখুটী, শাণ্ডিল, পুতিতুণ্ড, গাঙ্গুলি, কাঞ্জিলাল, কুন্দগ্রামী। এই আট বংশে সর্ব্বসমেত দশজন কুলীন হইলেন। ইহাদের অধস্তন সন্তানগণ মধ্যে পালধি, যাশী, বটব্যাল প্রভৃতি বংশগুলি অষ্টগুণবিশিষ্ট হওয়াতে শ্রোত্রিয় বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল। আবাব আদান প্রদানে অসাবধান থাকায় দীর্ঘাঙ্গী, ঘণ্টেশ্বরী বংশ গৌণ কুলীন বলিয়া পরিচিত হইল। এই রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণগণের শাখায় কত গাঁই তাহা নিম্ন তালিকায় জানা যাইবে।

সংখ্যা	শাখা	কোন
১	কুলীন	৮
২	শ্রোত্রিয	৩৪
৩	গৌণ কুলীন	১৪
		৫৬

কুলীনেরা কুলীনের সঙ্গে আদান প্রদান করিবেন এবং কুলীন শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ করিতে পারিবেন কিন্তু শ্রোত্রিয়ের কন্যা দান করিতে পারিবেন না, যদি করেন, তাঁহারা কুলভ্রষ্ট হইয়া বংশজ নামে পরিচিত হইবেন যাঁহারা বংশজ হইলেন, তাঁহাবা মর্য্যাদায় গৌণ কুলীনেব সমতুল্য হইলেন।

এই রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণগণেব সংখ্যা রাজসাহীতে অতি অল্প। রাজসাহীতে আড়ানী, পাঁকা,

(১) কেহ কেহ বলেন সুবেণাদি পঞ্চ ব্রাহ্মণকে আদিশূব কান্যকুব্জ হইতে আনেন।

(২) শ্রীযুক্ত পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি প্রণীত ... নির্ণয।"

কামারগাঁ, দমদমা, বান্দাইখারা, মহাদেবপুর, প্রভৃতি স্থানে অল্প সংখ্যক রাঢ়ী শ্রেণী ব্রাহ্মণ বাস করে। পাঁকার রাঢ়ী ব্রাহ্মণেরা পুঁঠিয়া রাজার গুরুবংশ। মহাদেবপুরের ও ডিহিবিসার জমিদারগণ বাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণ।

(গ) বৈদিক ব্রাহ্মণ— আদিশূর যে ৫জন ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে আনেন বৈদিক ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের বংশীয় নহে। ইহারা বঙ্গদেশের আদিম নিবাসীও নহে। ইহাদেব বল্লালসেন প্রদত্ত কৌলীন্য মর্য্যদা না থাকলিেও ইহাদেব কোন একপ্রকার কৌলিন্য মর্যাদা আছে। যাহাবা সৎক্রিয়ান্বিত তাহারাই কুলীন বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাদের গাঁই নাই; কিন্তু ইহাদের মধ্যে অনেক গোত্র আছে তন্মধ্যে শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, বাৎস্য প্রভৃতি ২৪টি গোত্র প্রসিদ্ধ। ইহা কথিত আছে যে, বল্লালসেনের কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত হইবার পর সাগ্নিক ব্রাহ্মণেব অভাব হইলে বাজা শ্যামলবণ কান্যকুব্জ হইতে ৫জন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আনেন। তাহাদেবই বংশে বৈদিক ব্রাহ্মণেব উৎপত্তি হয়। এই বৈদিক ব্রাহ্মণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য। পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ হইতে এবং দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণ কেশরীবংশীয় বাজাদের সময় রাজসাহীতে আইসেন। পাশ্চাত্য বৈদিকেরা আবার দুইভাগে বিভক্ত। রাজশাহীতে কোঁয়াড়ী। ইহাদের জোঁয়াড়ীর অপভ্রংশে কোয়াড়ী একটী গ্রাম .. বাজসাহীতে আছে এবং সেই গ্রামেব বৈদিক ব্রাহ্মণরা প্রসিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে শাণ্ডিল্য, সাবর্ণ, ভবদ্বাজ, বশিষ্ঠ ও মৌদগল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ কুলীন। বাজসাহীতে বৈদিক শ্রেণী ব্রাহ্মণেব সংখ্যা অতিকম। কোয়াড়ী (জোয়াড়ী), লালুর, বান্দাইখারা, প্রভৃতি স্থানে অল্প সংখ্যকমাত্র বাস করেন। ইহারা প্রায়শঃ দাসত্ব স্বীকার করে না। কেহ কেহ গুরুর কার্য্য ও যাজকের কার্য্য নির্ব্বাহ কবিযা থাকে।

(ঘ) বর্ণ ব্রাহ্মণ— রাজসাহী জেলায় এ ব্রাহ্মণের সংখ্যা অতি কম। নীচ শূদ্রের যাজক কার্য্য কবিয়া ইহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহারা অপকৃষ্ট শূদ্রের দান গ্রহণে পতিত হয। এ শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা নিতান্ত দরিদ্র।

(ঙ) কনৌজ ব্রাহ্মণ— এ ব্রাহ্মণের সংখ্যা এত কম যে দুই শতেব বেশি হইবে না। ইহাবা কান্যকুব্জাগত পশ্চিমা ব্রাহ্মণ বলিয়া পবিচয় দেন। ইহাদেব অনেকে পশ্চিম দেশ হইতে কন্যা আনিয়া বিবাহ করেন এবং পশ্চিম দেশীয় ব্রাহ্মণগণের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ আছেন। ইহাদের অনেক স্ত্রীলোক হিন্দিতে স্বামীর সহিত কথোপকথন করেন। ইহাদের বীতিনীতি প্রায বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণগণের ন্যায় এবং ইহাদের পুব্োহিতও বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ। ইহারা উত্তর কি পশ্চিম ভারত হইতে আসিয়া সম্ভবতঃ বাণিজ্য উপলক্ষে মুসলমানদের রাজত্ব সময় হইতে রাজসাহীতে বাস করিতেছেন। ইহাদেব অবস্থা মন্দ নহে। ইহাদের সামান্য ভূ-সম্পত্তি আছে এবং ইহারা বাণিজ্যও করিয়া থাকে।

উপরের লিখিত ব্রাহ্মণগণ ব্যতীত "সারসতী" ও "মধ্য শ্রেণী" ব্রাহ্মণ আছে বলিয়া কথিত। কিন্তু এই দুই প্রকাব ব্রাহ্মণ রাজসাহী জেলায় দেখা যায না। সুতরাং তাহাদের বিবরণ লেখা এস্থানে নিষ্প্রয়োজন।

(২) ক্ষত্রিয়— পৌরাণিক মতে ইহারা ব্রহ্মাব বাহু হইতে জাত হয় বলিয়া ব্রাহ্মণেব নীচে ও অন্যান্য বর্ণের উপরি ভাগে আসন প্রাপ্ত হন। পুরাকালে এই জাতিই রাজা এবং যুদ্ধব্যবসায়ী ছিল। পরশুরাম পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় কবেন। ইহার পর কোন কোন ক্ষত্রিয়-পত্নীরা বংশরক্ষার্থে ব্রাহ্মণগণ দ্বারা সন্তান উৎপাদন করিয়া লন। এই ব্রাহ্মণঔরসজাত ক্ষত্রিয়গণ ভ্রষ্টক্ষত্রিয় বলিয়া কথিত (১) এইরূপ ক্ষত্রিয় ভিন্ন প্রকৃত ক্ষত্রিয়ের ঔরসজাত ক্ষত্রিয় অতিবিরল। রাজসাহী জেলায় যাহাদের ক্ষত্রিয় বলা যায়, তাহারা দুই কি তিন শতের বেশী

(১) ক্ষত্রিয় ঔবসজাত ক্ষত্রিয় অপেক্ষা ব্রাহ্মণ ঔবসজাত ক্ষত্রিয় নিকৃষ্ট— মহাভাবত, সভাপর্ব্ব।

হইবে না। ইহারা পশ্চিম ভারত হইতে আসিয়া এজেলায় বাস করে। ইহাদের অধিকাংশ ধনী মহাজন। ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ও বৈশ্যানীর গর্ভে যে পুত্র জন্মে, তাহাকে “রাজপুত” বলে। রাজপুত ও ঘাটওয়াল বর্ত্তমান ক্ষত্রিয় জাতির অন্তর্ভূত বলিয়া কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই জেলায় “রাজপুতের” সংখ্যা প্রায় ১৫০০ বা ১৬০০ হইবে। ইহারা প্রায়ই দ্বারবানের কার্য্য করে “ঘাটওয়ালের” সংখ্যা প্রায় ২০০ হইবে। ইহারা প্রায়ই চৌকীদারের কার্য্য নির্ব্বাহ করে।

(৩) বৈশ্য।— পৌরাণিক মতে এই জাতি ব্রহ্মার উরু হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ইহারা দ্বিজ বলিয়া কথিত ছিল। ইহাদের জাতীয় ব্যবসা কৃষি, বাণিজ্য ও কুসীদব্যবহার। বঙ্গদেশীয় বৈশ্যগণের শূদ্রের ন্যায় আচার ব্যবহার। বঙ্গে প্রকৃত বৈশ্য অতি বিরল। মাড়ওয়ারী এই জাতির অন্তর্গত বলিয়া পরিচিত, কিন্তু মাড়ওয়াড়ীরা নিজে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। রামপুরবোয়ালীয়াতে কতকগুলি মাড়ওয়ারী ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য বাস করে। ইহাদের সংখ্যা ২০০ কি ২৫০ মাত্র হইবে।

(৪) বৈদ্য।— ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণ ব্যতীত পঞ্চম বর্ণ নাই। ইহা ব্যতীত সকল জাতি সঙ্কর জাতি বলিয়া পরিচিত। স্কন্দপুরাণমতে অম্বাকুলোদ্ভব বৈশ্যকন্যা বীরভদ্রার গর্ভে বেদমন্ত্রের বলে ধন্বন্তরি জন্মগ্রহণ করেন। বেদমন্ত্রবলে বালকের জন্ম হয় বলিয়া “বৈদ্য” এবং অম্বাকুলে জন্ম হয় বলিয়া “অম্বষ্ঠ”, এজাতির নাম “বৈদ্য” বা অম্বষ্ঠ” হইল। ধন্বন্তরি অশ্বিনীকুমারের মানুষী কন্যা সিদ্ধবিদ্যার পাণিগ্রহণ করিয়া, ধরাতলে চিকিৎসাবিশারদ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন। সিদ্ধবিদ্যার গর্ভে এবং ধন্বন্তরির ঔরসে সেন, দাস ও গুপ্ত এই তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তিন জনের বংশধরেরা বৈদ্যজাতিরূপে বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া পড়ে। পৌরাণিক মত ছাড়িয়া দিয়া পুরানের সারভাগ গ্রহণ করিলে, ইহা প্রতীতি হইবে যে ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভজাত পুত্র “বৈদ্য” বা “অম্বষ্ঠ” হইয়া বৈশ্য হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। ইহা মনুর ব্যবস্থানুসারে সিদ্ধান্ত। ইহাদ্বারা ইহাও প্রমাণিত হইল যে বৈদ্যেরা শূদ্রজাতীয় নহে; এবং বৈশ্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। ইহাদের মধ্যে যাহারা উপনীত, তাহারা ১৫ দিন অশৌচ যাহারা উপনীত নহে, তাহারা একমাস অশৌচ গ্রহণ করেন। কোনস্থলে ইহাদের আচার ব্যবহার প্রায় ব্রাহ্মণসদৃশ এবং কোনস্থলে কায়স্থের মত। ইহাদের জাতীয় ব্যবসা চিকিৎসা এবং ইহারা স্মৃতিশাস্ত্র পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া থাকে। আদিশূর, বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন, রাজবল্লভ প্রভৃতি রাজগণ এই বংশোদ্ভুত। “দানসাগর” নামক গ্রন্থে সেনবংশের তাম্রশাসনে ও প্রস্তরফলকে ইহা প্রতিপন্ন হইবে যে বল্লালসেন চন্দ্রবংশীয় বক্ষ-ক্ষত্র-কুলোদ্ভব বিজয়সেনের পুত্র। (১) ইহাতে বৈদ্যজাতিকে ক্ষত্রিয় বলিলেও বলা যাইতে পারে। এই বৈদ্যজাতি সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা— (১) বঙ্গজ, (২) রত্নম (৩) পঞ্চকোটী। রাজসাহীর বৈদ্যগণ বঙ্গজ শ্রেণীভুক্ত। ইহাদের অনেকে যশোহর জেলার অন্তর্গত সেনহাটী সমাজভুক্ত। যদিও ইহারা চিকিৎসক বলিয়া পরিচিত ইহাদের অনেকেই চাকুরী করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করেন। প্রায় সকলেরই অবস্থা ভাল। রাজসাহীতে ইহাদের সংখ্যা প্রায় ১১০০— ১২০০ হইবে। বেলঘরিয়া, পুঁঠিয়া, মরকী প্রভৃতি গ্রামে বৈদ্যের বাস।

(৫) কায়স্থ কি শূদ্র?— অগ্নিপূরাণ মতে ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ বাহু হইতে ক্ষত্রিয়. উরু হইতে বৈশ্য এবং পাদপদ্ম হইতে শূদ্রমণি উৎপন্ন হয়। শূদ্র ব্রাহ্মণের সেবা করিবে। শূদ্রমণির পুত্র হীম, হীমের পুত্র প্রদীপ এবং প্রদীপের পুত্র কায়স্থ। এই পুরাণমতে শূদ্রমণি হইতে কায়স্থের উৎপত্তি হইল। এই কায়স্থমণির তিন বিখ্যাত পুত্র— চিত্রগুপ্ত, চিত্রসেন ও বিচিত্র বীর্য জন্মগ্রহণ করেন। চিত্রগুপ্ত স্বর্গে গমন করিয়া যমের সভায় লেখক হইয়া আছেন। বিচিত্র নাগলোকে গমন করেন। চিত্রসেন পৃথিবীতে বংশ বিস্তার করেন। চিত্রসেনের দুইপক্ষ— একপক্ষ হইতে করণ ও

(১) বল্লালসেনকে কেহ বৈদ্য, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ কায়স্থ বলিয়া প্রতিপন্ন করেন।

অনুকরণ এবং অপর পক্ষ হইতে ঘোষ, বসু, মিত্র, গুহ, দত্ত, করণ ও মৃত্যুঞ্জয় এই ৭ জন পুত্র জন্মিল। আবার করণ হইতে ঘোষ, সিংহ, মিত্র, দাস, দত্ত এই পাঁচ জন পুত্র। অনুকরণ হইতে দেব, কর, পালিত, সেন, সিংহ,দাস, গুহ, নন্দী, চাকা। এই নয়জন পুত্র জন্মে। এই বংশ হইতে ৭২ ঘর কায়স্থ উৎপন্ন হয়। (১) কিন্তু অন্যান্য পুরাণ মতে চিত্রগুপ্ত দেবই চতুর্দ্দশ যম বলিয়া প্রসিদ্ধ। যমতর্পণের মন্ত্রে ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে পিতামহ ব্রহ্মা আপন শরীর হইতে , ধর্ম্মরাজ, বৈবস্বত, চিত্রগুপ্ত প্রভৃতিকে উৎপন্ন করেন (২) তর্পণ তৃপ্=প্রীতকরা অনট্) পিতৃপুরুষদিগেব প্রীতির নিমিত্ত জলদান করাকে বুঝায়। এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকল জাতিই তর্পণ করিয়া থাকে। উচ্চজাতি অধস্তন জাতির প্রীতির জন্য স্বপিতৃ লোকের পূর্ব্বে অপর লোকে জল দান করিতে কোন মতে পারে না। অতএব চিত্র গুপ্ত শ্রেষ্ঠ এবং মাননীয়। "এই চিত্রগুপ্তের পুত্র চৈতরথ দেব। ইনি চিত্রকূট পর্ব্বতের রাজা ছিলেন। গৌতম ঋষি ইহাব উপনয়ন সংস্কার করিয়াছেন।" (৩) মহারাষ্ট্র প্রদেশীয় চিত্রগুপ্ত বংশজ কায়স্থগণেব ৪১টী উপাধি আছে, তন্মধ্যে গড়করী, রণদিবে, বিবাদে ও চৌবল উপাধি দেখা যায়। "গড়করী" শব্দে দুর্গরক্ষক "রণ-দিবে" শব্দে রণবিজয়ী; "বিবাদে" শব্দে বাজদূত, "চৌবল" শব্দে চারি প্রকাব সৈন্যের নায়ক বুঝায়। "কায়স্থ বংশাবলীব" সংগৃহীতা বলেন— পরাশবীয় কুলার্ণবে কায়স্থ শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ লিখিত হইয়াছে যে ক— শব্দে প্রজাপতি, আয শব্দে বাহু, স্থ— শব্দে স্থিত, অর্থাৎ ব্রহ্মার বাহুতে স্থিত থাকিয়া উদ্ভূত। এই হেতু কাযস্থ বলিয়া কীর্ত্তিত। যথা ঃ—

---

(১) "আদৌ প্রজাপর্তেজাতা মুখ্যাদ্বিপ্রাঃ সদাবকাঃ।
বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিযাজাতা উর্ব্বোবৈশ্যা বিজজ্ঞিযে ॥১
পাদতশ্চশূদ্রাঃ সম্ভূতাস্ত্রিবর্জ্জসাচ সেবকাঃ।
হীমনামা সুতস্তস্য প্রদীপ-স্তস্য পুন্দ্রকঃ ॥২
কায়স্থ স্তস্য পুন্দ্রোভূস্বভুব লিপিকাবকঃ।
কায়স্থস্য ত্রয়ঃ পুত্রাঃ বিখ্যাতা জগতীতলে॥৩
চিত্রগুপ্তইশ্চত্রসেন্যে বিচিত্রশ্চভব্বেবচ।
চিত্রগুপ্তো-গতঃ স্বর্গে বিচিত্র্যে নাগ-সন্নিধ্যে॥৪
চিত্রসেনো পৃথিব্যাং বৈ ইতিশাস্ত্রঃ প্রচক্ষতে।
বসু ঘোষো-গুহো মিত্র্যে দত্তঃ কবণ এবচ।
মৃত্যুঞ্জযা-নুকবর্ণৌ চিত্রসেনসুতা ভুবি॥৫
মৃত্যুঞ্জযা০দুদ্ভূতা দেবসেনশ্চ পালিতঃ।
সিংহশ্চৈব তপাপশ্চাদজাতাশ্চবসু সংখ্যকাঃ ॥"৫
অগ্নিপুরাণ।

(২) যমায ধর্ম্মবাজাব মৃভাবে চান্তকায চ।
বৈষস্বতায কালায সর্ব্বভূতক্ষয়ায চ॥
ঔড়ম্ববায় দশ্নাব নীলায পয়মোষ্টিনে।
বৃক্ষোদরায চিত্রায চিত্রগুপ্তায বৈ নমঃ॥
নম গুর্পণ।

(৩) "বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়াজান্তা কাযস্থা জগতীতলে।
চিত্রগুপ্তঃ স্থিতঃ স্বর্গে বিচিত্র্যে ভূমিমণ্ডলে ॥
চৈত্রবথঃ সুতস্তুস্য যশস্বী কুলদীপকঃ ॥
ঋষিবংশে সমুদ্ভূতো গৌতম নাম সত্তমঃ ॥
তস্য শিষ্যে মহা প্রাজ্ঞঃ চিত্রকূটা-চলাধিপঃ।
বৈদানাং আগন্তম্ভশাখা ॥"

কঃ প্রজাপতি ব্যাধ্যাত আরো বাহুস্তথৈব চ।
তত্রস্থস্তং সমুদ্ভূতঃ কায়স্থ ইতি কীর্ত্তিতঃ ॥

বাহুজাত ক্ষত্রিয় সমাজ হইতেই চিত্রগুপ্ত নামে একজন লেখাপড়ার আবিষ্কার করিয়া, কায়স্থ আখ্যায় স্বতন্ত্র বিভাগে বিভক্ত হইয়াছেন; সুতরাং কবি কল্পনার দ্বারা ঐরূপ ব্যাখ্যা হইয়াছে। কায়স্থ শব্দেব প্রকৃত ব্যাখ্যা "কায়েস্থিত।" (১)

ভরতেব দেশ বলিয়া আমাদের বাসস্থানকে "ভারতবর্ষ" বলে। এক সময়ে এদেশ কেবল জঙ্গলে পবিপূর্ণ ছিল। কোন কোন স্থানে দুই এক ঘর ভীল, খন্দ, সাঁওতালদের মত অসভ্য জাতীয় লোক বাস করিত। অতি পূর্ব্বকালে এসিয়ার মধ্যদেশে "আর্য্য" নামে একজাতি বাস করিতেন। তাঁহারা সময়ে সময়ে দলে দলে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া অন্য দেশে বাস করেন। তাঁহাদেব এক দল ইউরোপে প্রবেশ কবেন, একদল পাবশ্য দেশও ছাড়িয়া আইসেন এবং তৃতীয় দল সিন্ধু নদী পার হইয়া পঞ্জাবে আসিয়া উপস্থিত হন। ইহাঁরাই সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর নিকটবর্ত্তী ব্রহ্মাবর্ত্ত নামক জনপদে বাস কবিতে লাগিলেন। ইহারাই ভারতবর্ষের আর্য্য জাতি। ইহারাই আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ। ইংবেজ, ফরাসী, জর্ম্মাণ প্রভৃতি ইউরোপীয় লোকেরা এবং আরবীও পারসী প্রভৃতি এসিয়া-দেশবাসীরাও আর্য্যবংশসম্ভূত। অতএব বর্ত্তমান ইংরেজ, ফরাসী, মুসলমান, পারসী, হিন্দু সকলেই এক জাতি ছিল। এই ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা স্বীকার করিলে, সকলেই বলিতে পারে যে আর্য্যদিগেব মধ্যে প্রথমে জাতিভেদ ছিল না। এই আর্যজাতিরা গুজরাট হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত তাঁহাদের আধিপত্য স্থাপন করিয়া, সেই দেশকে আর্য্যাবর্ত্ত নাম দিলেন। এই বঙ্গবাসীরাও আর্য্য সন্তান। আর্য্যজাতিরা স্বভাবতঃ ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা এদেশে আসিযাবধি আদিমবাসীদের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়া, নিজে সকল সময় যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারিবেন না, এই বিবেচনায় তাঁহারা পুরোহিত নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। রাজ্য বিস্তাবেব সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধকার্য্য ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং তজ্জন্য আর্য্যেরা নিজ বাস স্থান ছাড়িয়া দূবদেশে অনেক সময় থাকিতে লাগিলেন। দেবকার্য্য ও পরিবারের ভরণপোষণ জন্যও কৃষিকার্য্য আবশ্যক হইয়া উঠিল। আর্য্যজাতির কৃষি প্রিয় কার্য্য ছিল। যাহারা যুদ্ধে পটু নহে, তাহারাই বাটীতে থাকিয়া কৃষি ও বাণিজ্য এবং যাগ-যজ্ঞাদি নির্ব্বাহ করিতেন। এই সময় সমাজের এরূপ অবস্থা দাঁড়াইল যে একজাতি থাকিলে কাজকর্ম্মের সুবিধা হয় না। অতএব কালক্রমে আর্য্যজাতির মধ্যে যাঁহাবা পুরোহিত অর্থাৎ বেদজ্ঞ জ্ঞানী এবং যাগ যজ্ঞের ভার গ্রহণ করিলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ; যাঁহারা যুদ্ধ করিয়া শত্রু হইতে দেশ রক্ষা কবিবার ভার গ্রহণ করিলেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয়, এবং যাঁহারা ব্যবসা-বাণিজ্য করিবার ভার লইলেন, তাঁহারা বৈশ্য বা বণিক নাম প্রাপ্ত হইলেন। ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধে পরাজিত করিয়া যে সকলকে বন্দী করিয়া আনিতে লাগিলেন, তাহাবা কৃষ্ণবর্ণ শূদ্র (২) নাম প্রাপ্ত হইল। প্রভুর সেবা করা এবং কৃষিদ্বারা তাহাকে প্রতিপালন করা শূদ্রের কর্ত্তব্যকর্ম্ম নির্দ্ধারিত হইল। এখন বলা যাইতে পারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য আর্য্যবংশ-সম্ভূত, শূদ্র বা দাস আর্য্যবংশ সম্ভূত নহে। এইত জাতিভেদের সৃষ্টি হইল। এইরূপে জাতিভেদেব সৃষ্টির পর হইতে ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধবিদ্যায় এত পটু হইলেন যে সমুদয় রাজ্য তাঁহাদের করতলস্থ।

পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণেরা যুদ্ধে অনভ্যাসবশতঃ তাদৃশ যুদ্ধ-নিপুণ ছিলেন না। আবার ব্রাহ্মণেরা

---

(১) কায়স্থবংশাবলী।
(২) শ্রীমদ্ভাগবত।

স্বয়ং অস্ত্রধারণ না করিয়া ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তখন ক্ষত্রিয়েরা প্রবল এবং ব্রাহ্মণেরা হীনবল হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ে সংগ্রাম হইতে লাগিল। ভুজবলে ক্ষত্রিয়েরা এবং তপবলে ও ব্রাহ্মণ্য বলে ব্রাহ্মণেরা তেজস্বী হইয়া উঠিলেন। আবার এই সময়ে পরশুরাম ক্ষত্রিয়বংশও প্রায় ধ্বংস করেন এবং তদপরে ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়ার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিয়া ক্ষত্রিয় বংশ বিস্তার করেন। পরশুরাম ক্ষত্রিয় রাজা চন্দ্রসেনকে নিহত করিয়া ক্ষত্রিয় জাতিকে যেমন দুর্দ্দশায় পতিত করেন, হাহা নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে প্রতিপন্ন হইবে।

তথাশ্রমে মহাভাগ সগর্ভা স্ত্রী সমাগতা।
চন্দ্রসেনস্য রাজর্ষেঃ ক্ষত্রিয়স্য মহাত্মনঃ।
তন্মে ত্বং প্রার্থিতং দেহি হিংসেয়ং তাং মহামুনে।
ততো দালভ্যঃ প্রত্যুবাচ দদামি তব বাঞ্ছিতং ॥

স্কন্দ পুরাণ।

রাজা চন্দ্রসেন নিহত হইলে পর, তাঁহার গর্ভবতী পত্নী মহর্ষি দালভোর শরণাপন্ন হইলেন। পরশুরাম জানিতে পারিয়া, ঋষির নিকট হইতে রাজমহিষীকে প্রার্থনা করেন। ঋষি বলিলেন, শাস্ত্রে ইহা লিখিত আছে যে স্ত্রী ও বালক অবধ্য। অতএব স্ত্রীলোককে ক্ষমা করা উচিত। পরশুবাম ক্ষমা করিলেন এবং বলিলেন যে রাজমহিষীব গর্ভজাত সন্তান কায়স্থ নামে পরিচিত এবং ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইবে। এই সময় হইতে চন্দ্রসেনের পুত্র "কায়স্থ" নামে খ্যাত এবং ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম বর্জ্জিত হইলেন। মহর্ষি দালভ্য কায়স্থকে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম হইতে বর্জ্জন কবিযা চিত্রগুপ্তের ধর্ম্ম প্রদান করেন। এই ঘটনাব পর হইতে চন্দ্রসেন বংশ ও চিত্রগুপ্ত বংশ এক হইয়া গিয়াছে। "মহর্ষি দালভোব অনুগ্রহে কায়স্থগণ ধার্ম্মিক, সত্যবাদী, সদাচার পরায়ণ হইয়ছেন।" (১) এইবিপ্লব সময়ে সকল জাতির বিশেষতঃ ক্ষত্রিয় জাতির আচাব-ব্যবহার, রীতিনীতি, ক্রিয়াকলাপ, নাম উপাধি ও সামাজিক নিয়মাদির ব্যতিক্রম ঘটিল। অতএব এই সময় হইতে অনেক ক্ষত্রিয় পরশুরামের ভয়ে বা ব্রাহ্মণের উৎপীড়নে শূদ্রের মত আচার গ্রহণ কবিলেন। তপবলে ব্রাহ্মণেরা তেজস্বী হইলে, তাহারা ক্ষত্রিয়দের উপর প্রাধান্য স্থাপন করিলেন। তখন ক্ষত্রিয় রাজারা ব্রাহ্মণের উপদেশ ভিন্ন কোন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন না। অতি প্রাচীনকালে জাতি ভেদ সৃষ্টি হওয়ার পরেও, বেদানুযায়ী সকল কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। পূরা-শাস্ত্র প্রণয়নের পর হইতেই, বৈদিক ক্রিয়া-কলাপ অনেক শিথিল ভাব অবলম্বন করিল এবং হিন্দু শাস্ত্র ক্রমে জটিলরূপ ধাবণ করিল। যখন ব্রাহ্মণের প্রাধান্যই বেশী, এবং ক্ষত্রিয়ের কোন প্রাধান্যই নাই, তখন ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণের অনুগত এবং দাস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আবার ব্যবস্থানুযায়ী জাতিভেদ একবারে দৃঢ়ীভূত হইয়া গিয়াছে। ইহার অনেক পরে সেন বংশীয় রাজাদের সময়ে বরেন্দ্রভুমিতে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদদের মধ্যে কৌলীণ্য প্রথা প্রচলিত হয়। নবগুণ বিশিস্ট হইলেই কি ব্রাহ্মণ, কি কায়স্থ, কি বৈদ্য কুলীন হইল। এস্থলে জাতি ভেদে নবগুণেব তারতম্য হইল না। এই নয়টা গুণ মধ্যে একটা গুণ আবৃত্তি। আবৃত্তি শব্দে বেদপাঠ বুঝাইত। শূদ্রের যে কেবল বেদপাঠের অধিকার নাই এমত নহে; বেদ পাঠ শু[illegible]বও অধিকার নাই। (২) এমতাবস্থায় কায়স্থ ক্ষত্রিয় না হইলে কিপ্রকারে নবগুণের অন্তর্গত আবৃত্তি (বেদপাঠ) কায়স্থের কুলীনদের পক্ষেও সম্ভব হইল? সেনবংশীয় রাজাদেব সময় পর্যন্ত কায়স্থ ক্ষত্রিয়ের ন্যায় সম্মানিত হইতেন।

---

(১) ঢাকুর গ্রন্থ।

(2) "A Brahmin must not read the veda, even to himself, in the presence of a Sudra "- Elphinstone's History of India, Book I Chapter'I

উপরে যাহা যাহা ব্যক্ত করিয়াছি তাহার বলে, আমরা বলিতে পরি যে আদিতে কায়স্থ ত্রিবর্ণের সেবক ছিল না। "বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতা কায়স্থা জগতীতলে। চিত্রগুপ্তঃ স্থিতঃ স্বর্গে বিচিত্রো ভুমিমণ্ডলে" এই প্রাচীন ঋষি-বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া বলিতে পারা যায় যে, কায়স্থ ক্ষত্রিয় চিত্রগুপ্ত বংশোদ্ভব। "কায়স্থ শব্দ জাতি বাচক নহে, উহা লিপি-ব্যবসায়ী ক্ষত্রিয়দিগের উপাধি মাত্র। কালক্রমে ঐ উপাধিই জাতিগত হইয়া কায়স্থগণ এক স্বতন্ত্র জাতিতে পরিগণিত হইয়াছেন। এইরূপে চিত্রগুপ্ত বংশজ কায়স্থ-শ্রেণী গঠনের পব পরশুরামের বিপ্লব সময়ে চন্দ্রসেন রাজর্ষির সন্তানও কায়স্থ আখ্যাগ্রহণ করিয়া চিত্রগুপ্ত বংশধরদিগের শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।" (১) আরও প্রতীতি হয় যে, এককালে কায়স্থ ঋষিব শিষ্য হইয়া উপনয়ন সংস্কাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যুদ্ধকার্য্যে নিবিষ্ট হইয়াছিলেন, লিপিকর ছিলেন এবং জ্যোতির্ব্বিৎ ও রাজকর্ম্মচাবী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। আদিশূরের সময় পঞ্চ কায়স্থ পঞ্চ ব্রাহ্মণের সঙ্গে আইসেন। এ সময়ও কায়স্থ-কুলদীপিকার "এতেষাং রক্ষনার্থায় আগাতোহস্মি তবালয়ে" বচনে কায়স্থ রক্ষক বলিয়া কথিত। এই কায়স্থগণ সম্বন্ধে দেবীবর নিজ গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন যে, "আব কয়েকজন ব্যক্তির ব্রাহ্মণের চিহ্ন ছিল না, তাহাবা অসি কবচ ধনুর্ধারী হইয়া অশ্বারোহণে বীরবেশে আগমন করাতে রাজার মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। তজ্জন্য তিনি একি একি বলিয়া ভয়ে অন্তঃপুবে পলায়ন করিলেন।" (২) দেবীবরের মতে কান্যকুব্জাগত কায়স্থগণ বক্ষক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইতেছে। রঘুনন্দনের প্রাদুর্ভাবে বঙ্গীয় কায়স্থগণেব সম্মান খর্ব্ব হইলেও, "ব্রাহ্মণকুলের চুড়ামণি নবদ্বীপাধিপতি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়বাহাদুর তাঁহাব অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী যজ্ঞ সময়ে সভামণ্ডপে কাযস্থদিগকে ক্ষত্রিয়ের আসন প্রদান করিয়াছিলেন।" (২) "কায়স্থ ব্রাহ্মণের দাস।" যে প্রভুর সেবা করে, যে প্রভুকে শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করে, যে প্রভুর আদেশ প্রতিপালন করে, সেই তাহার দাস। ব্রাহ্মণের সহিত কায়স্থের যে দাসত্বসম্বন্ধ, সে আর্থিক সম্বন্ধ নহে, সে পারমার্থিক সম্বন্ধ। সে সম্বন্ধ পৃথিবীর অকিঞ্চিৎকর অর্থদ্বাবা সৃষ্টি হইবার নহে। কাযস্থ ব্রাহ্মণের সেবা করিবে বলিয়া শিষ্য, শত্রুহস্ত হইতে যাগ যজ্ঞাদি রক্ষা করিবে বলিয়া ক্ষত্রিয় এবং আদেশ প্রতিপালন কবিয়া ভক্তিপ্রদর্শন কবিবে বলিয়া মোক্ষাভিলাষী হইয়া থাকে। মনু বলিয়াছেন, "বর্ণানাং ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ!" এবাক্য কায়স্থের শিরোধার্য্য। যে ব্রাহ্মণের শরণাগত হইলে পরব্রহ্ম ঈশ্ববেব জ্ঞানলাভ করিয়া মুক্তিপথে দণ্ডায়মান হওয়া যায়, সেই ব্রাহ্মণেব দাস হওয়া কায়স্থের গৌরবের কথা। কোন বৈদিক ক্রিয়া কলাপের সময় কায়স্থ নিজ নামের পবে দাস শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে, সে বেতনভোগী চাকরের চিহ্ন নহে; সে ব্রাহ্মণেব ও দেবতার প্রতি ভক্তির চিহ্ন। যে ব্রাহ্মণের প্রতি সগব, যুধিষ্ঠিব, ভীষ্ম প্রভৃতি ক্ষত্রিয় মহাত্মাগণ বিশেষ ভক্তি-প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই ব্রাহ্মণের দাসত্ব স্বীকার করা চিত্রগুপ্ত বংশোদ্ভব কায়স্থের প্রার্থনীয় এবং প্রশংসনীয়। এখন বঙ্গদেশে সে ব্রাহ্মণও নাই, সে কায়স্থও নাই,— সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই। সুতরাং কলির ব্রাহ্মণ সমাজেই কায়স্থগণ শূদ্র বলিয়া পরিচিত হইতেছেন। এই কলির কায়স্থ তমোগুণবিশিষ্ট শূদ্রবৎ; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কায়স্থ যে শূদ্র নহে, তাহা হারিতবচনে প্রমাণিত হইবে।

"গঙ্গা ন তোয়ং কনকং ন ধাতুস্তৃণং ন দর্ভঃ পশবো ন গাবঃ।
প্রজাপতেঃ কায়সমুদ্ভবাচ্চ কায়স্থ বর্ণা ন ভবন্তি শূদ্রাঃ ॥
হারিত বচনং।

(১) কায়স্থ বংশাবলী।

(২) "কাযস্থ বংশাবলী"— ১৩ পৃষ্ঠা।

গঙ্গা জল নহে; কনক ধাতু নহে; কুশ তৃণ নহে; গো সকল পশু নহে; এবং প্রজাপতির কায় হইতে সমুদ্ভূতহেতু কায়স্থ শূদ্র নহে।

মহারাজ আদিশূরের পুত্রেষ্টি ভাগ সম্পন্ন জন্য যে পঞ্চ গোত্রীয় পঞ্চ ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে আইসেন, তাঁহাদের রক্ষক (১) হইয়া গৌতম গোত্রীয় দশরথ বসু, সৌকালীন গোত্রীয় মকরন্দ ঘোষ, কাশাপ গোত্রীয় দশরথি গুহ, বিশ্বামিত্র গোত্রীয় কালিদাস মিত্র এবং মৌদগল্য গোত্রীয় পুরুষোত্তম দত্ত, এই পঞ্চ কায়স্থ তাঁহাদের সহিত আগমন করেন। যাগ সমাপন হইবার পর যেমন ব্রাহ্মণেরা স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন, তেমনই পঞ্চ কায়স্থও তাঁহাদের সহিত স্বদেশে ফিরিয়া যান। কিন্তু স্বদেশীয় কান্যকুব্জ সমাজে অপবিগৃহীত হওয়ায়, সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ পুনরায় বঙ্গদেশে আগমন করেন। দ্বিতীয়বার আসিবার সময়ে তাঁহাদের সঙ্গে নাগ ও নাথ উপাধিধারী আর দুইজন কায়স্থ আইসেন। এই ৭ জন কায়স্থ কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে আগমনের পূর্ব্বে গৌড়দেশে কতকগুলি কায়স্থ ছিল বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই দৌড় দেশীয় কায়স্থ মধ্যে বসু উপাধির কায়স্থ ছিল না। কান্যকুব্জাগত কায়স্থেব গৌড় দেশীয় কায়স্থের সঙ্গে কোন প্রকার সংস্রব ছিল বলিয়া বোধ হয় না। এই দুই প্রকারেব কায়স্থ ৯৯ উপাধিধারী ছিল। এই সমুদয় কায়স্থগণকে বল্লাল সেন চারি ভাগে বিভক্ত করেন। এক ভাগ বঙ্গে, দ্বিতীয় ভাগ দক্ষিণ রাঢ়ে, তৃতীয় ভাগ উত্তর রাঢ়ে এবং চতুর্থ ভাগ গৌড় দেশের বরেন্দ্র ভুমিতে বাস করেন। সেই সময় হইতে কেবল কানাকুব্জাগত কায়স্থদিগের বংশধরগণের মধ্যে কেহ বঙ্গে এবং কেহ দক্ষিণ রাঢ়ে বাস করেন। কিন্তু গৌড়দেশীয় কায়স্থ ঐ চারি খণ্ডে বাস করিয়া বঙ্গজ, দক্ষিণ রাঢ়ীয় উত্তর রাঢ়ীয় ও বারন্দ্র এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হন। ইহাদের কুলের নিয়ম ভিন্ন ভিন্ন।

বঙ্গজ কায়স্থ।— ঐ ৯৯ পদ্ধতির কায়স্থবংশ মধ্যে যাহারা বঙ্গে বাস করেন, তাহারা কানাকুব্জাগত কায়স্থগণের বংশধর। তাঁহাদিগের গুণানুসারে কৌলিন্য মর্যাদা প্রদান করেন। এই নিয়মানুসারে বসু, ঘোষ, গুহ ও মিত্র উপাধিধারী কায়স্থ বঙ্গের কুলীন হইলেন। দত্ত, নাগ, নাথ ও দাস উপাধিধারী কায়স্থ মধ্যল্য, এবং সেন, কর, দাম, পালিত, চন্দ্র, পাল, রাহা, ভদ্র, ঘর, নন্দী, দেব, কুণ্ডু, সোম, বক্ষিত, অঙ্কুর, সিংহ, বিষ্ণু, আঢ্য এবং নন্দন এই ১৯টা উপাধিধারী কায়স্থ মহাপাত্র নামে পরিচিত হইল। অবশিষ্ট সর্ব্বগুণ বিহিন কায়স্থগণ যথা— হোড়, স্মর, ধরণী, আইচ, শূর, শর্ম্মা, বর্ম্মা, গুপ্ত প্রভৃতি দ্বিসপ্ততি বংশ "বাহাত্তরে কায়স্থ" বলিয়া কীর্ত্তিত হন। বল্লাল সেনের কৌলিন্যপ্রথা প্রচলিত হওয়ার'পরে, বঙ্গজশ্রেণী কায়স্থগণের মেল বদ্ধ এবং তাহাদের মধ্যে কুলপ্রথার পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহার বিস্তারিত বিবরণ লিখা বাহুল্য বিবেচনায় এ ক্ষুদ্র পুস্তকে সন্নিবেশিত হইল না। এই সম্বন্ধে কেবল দুই একটী কথা উল্লেখ করা গেল কুলিনের সম ঘরে কন্যাদান ও কন্যাগ্রহণ করাই উত্তম কার্য্য। কুলিনের সকল সন্তান পিতার মত কুলমর্যাদা পাইয়া থাকেন, যদি আদান প্রদানে কুলভ্রষ্ট না হইয়া থাকেন। বল্লাল সেনের পর "বংশজ" নামে একটী শ্রেণী গঠিত হয়। যাহারা কুলীনের বংশজাত অথচ কুলহীন, তাহারাই "বংশজ" নামে প্রসিদ্ধ হইল।

দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ।— কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সঙ্গে যে পঞ্চ কায়স্থ বঙ্গদেশে আইসেন, তাঁহাদের বংশধরগণ মধ্যে কেহ বঙ্গে এবং কেহ দক্ষিণ রাঢ়ে বাস করেন। যাঁহারা দক্ষিণ রাঢ়ে বাস করেন, তাঁহারাই দক্ষিণবাঢ়ী কায়স্থ আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন। এই কায়স্থদের একজন রাঢ়ে এবং কয়জন বঙ্গে বাস করেন– তাহার তালিকা দেওয়া গেল।

---

(১) "এতেসাং রক্ষণার্থ আগতোহস্মি তবালযে।"
কায়স্থ-কুলদীপিকা।

সংখ্যা	কান্যকুব্জাগত পঞ্চ কায়স্থ	মোট পুত্র	দক্ষিণ রাঢ়।			
১	মকবন্দ ঘোষ	২	১	(১) ভবনাথ (ক)	১	(১) সুভাষিত (ক)
২	দশবথ বসু	২	১	(১) কৃষ্ণ (খ)	১	(১) পরম (খ)
৩	কালিদাস মিত্র	২	১	(১) শ্রীধর (গ)	১	(১) অশ্বপতি (গ)
৪	বিবাট বা দাশরথি গুহ	২	১	বিরাজ (গ)	১	(১) নারায়ণ (ঘ)
৫	পুরুষোত্তম দত্ত	২	১	নারায়ণ (ঙ)	১	(১) অর্ক (ঙ)

(ক) "সম্বন্ধ নির্ণয়ে" ভবনাথ মকরন্দ ঘোষের পুত্র বলিয়া স্থির হইয়াছে কিন্তু "কায়স্থ বংশাবলীতে" মকরন্দ ঘোষের সুভাষিত ও পুরুষোত্তম, এই দুই পুত্র লিখিত আছে। ভবনাথ পুরুষোত্তমের পুত্র। এই ভবনাথে বংশধরগণ দক্ষিণ রাঢ় সমাজে ঘোষবংশীয় কুলীন।

(খ) কৃষ্ণ বসুর তিন প্রপৌত্র, শুক্তি, মুক্তি, অলঙ্কার। সুক্তি ও মুক্তি রাঢ়ভূমে বাস করেন। অলঙ্কার পুনর্ব্বার বঙ্গে আগমন করেন। শুক্তি মুক্তির বংশধরগণ দক্ষিণ রাঢ় সমাজে বসুবংশীয় কুলীন।

(গ) দক্ষিণ রাঢ় সমাজের মিত্রগণ শ্রীধরের বংশধর। অশ্বপতির বৃদ্ধ প্রপৌত্র জয়ী মিত্রের ঔরস পুত্র না হওয়াতে "পোষ্য পুত্রে কুল নমঃ এই নিয়মানুসারে বঙ্গসমাজে জয়ী মিত্রের বংশের কুল নাই।

(ঘ) বিরাজ বিরাটের পুত্র নহে। বিরাটের একজন অধস্তন সন্তান। "কায়স্থ বংশাবলীতে" বিরাজের কোন উল্লেখ নাই। দক্ষিণ রাঢ় কনাজের বিরাজের বংশধর কুলীন নহে। কিন্তু বঙ্গজ কায়স্থসমাজে নারায়ণের বংশধরগণ গুহবংশীয় কুলীন।

(ঙ) "সম্বন্ধ নির্ণয়ে" পুরুষোত্তমের নারায়ণ নামে এক পুত্র ছিল বলিয়া কীর্তিত হয়; এবং পুরুষোত্তম বা তাহার বংশধরগণ মধ্যে কেহ বঙ্গে যান। ...লীতে" দেখা যায় যে পুরুষোত্তমের অন্যতম পুত্র ... নারায়ণ দত্ত হাবড়া জেলার অর্ন্তগত বালী গ্রামে বসবাস করিতেন।

... ঘোষ বসু মিত্র কুলের অধিকারী।
... অভিমানে বালীর দত্ত যায় গড়াগড়ী ॥"
... বালীর মীব দত্ত নারায়ণের বংশধর।

... কায়স্থসমাজে ঘোষ, বসু ও মিত্র কুলমর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। . . মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন না। এই দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজে দত্ত ও গুহ এই দক্ষিণ রাঢ়ী ও বঙ্গজ কায়স্থের আচাব, ব্যবহার, রীতি, নীতি প্রায় এক প্রকাব। তবে যে সামান্য বিভিন্নতা কোন কোন স্থলে দেখা যায়, তাহা ভিন্ন ভিন্ন দেশে বাস জনাই। আজি কালি বঙ্গজ সমাজের সঙ্গে দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজের কায়স্থগণ বৈবাহিকসূত্রে সম্বন্ধ বিস্তারের সূত্রপাত করিতেছেন। ইহা অযুক্তিব কথা নহে, যেহেতু দক্ষিণ রাঢ়ী ও বঙ্গজ কায়স্থগণের আদি বংশের কোন পার্থক্য দেখা যায় না।

উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ।— উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থগণ কানাকুব্জাগত পঞ্চ কায়স্থের বংশধরগণ বলিয়া পরিচয় দেন না। ইহাঁরা গৌড় দেশীয় কায়স্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাঁদের মধ্যে বল্লাল সেনের কৌলিন্য প্রথা প্রচলিত নাই। এই শ্রেণী কায়স্থ সর্ব্বসমেত সাড়ে সাত ঘর। এই সাড়ে সাত ঘরে করণকারণ হয়। এই শ্রেণী কায়স্থ মধ্যে দুই প্রকার ঘোষ এবং দুই প্রকার দাস আছে। এক শ্রেণীর ঘোষ সৌকালীন গোত্র আর এক শ্রেণীর ঘোষ শাণ্ডিল্য গোত্র। এক শ্রেণীর

দাস মৌদ্গল্য গোত্র এবং আর এক শ্রেণীর দাস কাশ্যপ গোত্র। আবার ভরদ্বাজ গোত্রীয় সিংহ এক পোয়া এবং মৌদগল্য গোত্রীয় কর এক পোয়া। দুই শ্রেণীর ঘোষ ২, দুই শ্রেণীর দাস ২, মিত্র ১, সিংহ ১, দত্ত ১, সিংহ ।০, কর ।০, এই মোট ৭।।০ ঘর উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ আছে। এই ৭।।০ ঘর মধ্যে সৌকালীন গোত্রীয় ঘোষ এবং বাৎস্য গোত্রীয় সিংহ শ্রেষ্ঠ। ইহাদের আচার ব্যবহার বঙ্গজ বা দক্ষিণ রাঢ়ীর বা বারেন্দ্র কায়স্থদের অপেক্ষা অনেক প্রভেদ।'

বারেন্দ্র কায়স্থ।— এই গ্রন্থের স্থানান্তরে বারেন্দ্র কায়স্থের উৎপত্তিব বিষয় বর্ণন কবা হইয়াছে। ইহাঁদের কানাকুজাগত পঞ্চ কায়স্থের বংশধর বলিয়া পরিচিত করা কঠিন। কিন্তু ঢাকুর গ্রন্থে ইহা লিখিত আছে যে "সিদ্ধ সাধ্যভাবে সাতটি বংশ লইয়া যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই সামাজিকগণই উপনিবেশি বারেন্দ্র কায়স্থ। ইহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ কান্যকুব্জ দেশ হইতে গৌড় দেশে আগমন করেন। বরেন্দ্র আদি নিবাসী আচার ভ্রষ্ট কায়স্থদের সহিত ইহাদের সংস্রব নাই।" যে পঞ্চ কায়স্থ কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে প্রথম বার আগমন করেন, তাঁহাদের উপাধি ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র ও দত্ত। যাহারা দ্বিতীয়বারে ঐ পঞ্চ কায়স্থ সঙ্গে বঙ্গদেশে আইসেন তাহাদের উপাধি নাগ ও নাথ। কিন্তু বারেন্দ্র কায়স্থ মধ্যে ঘোষ, বসু, গুহ ও মিত্র উপাধি দেখা যায় না; কেবল নাগ ও দত্ত উপাধি দেখা যায় এবং তাঁহারা বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজে কুলীন নহে। দত্ত বংশের আদি পুরুষ পুরুষোত্তম। সেই পুরুষোত্তম দত্তের বংশসম্ভূত যে বারেন্দ্র কায়স্থের দত্ত, তাহারও কোন প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না। ঐরূপ নাগবংশেরও কোন প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না। সম্ভবত গৌড়দেশীয় কায়স্থগণের বংশধরেরা বরেন্দ্রভূমে বাস নিবন্ধন বারেন্দ্র কায়স্থ বলিয়া পরিচিত। উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থগণেব ন্যায় বারেন্দ্র কায়স্থের বল্লালী মর্যাদা নাই। পদাঙ্কুল পঞ্জিকাতে ইহা লিখিত আছে যে ভৃগু নন্দী, নরহরি দাস ও মুরারী চাকী বল্লাল সেনের রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া ববেন্দ্র প্রদেশে আইসেন এবং শৌল-কুপায় নাগবংশীয় জমিদারদিগের সাহায্যে বারেন্দ্র কাযস্থ সমাজ সংস্থাপিত করেন। এই ভৃগু, নরহবি ও মুরারীর বংশধবগণ বরেন্দ্র ভূমে (রাজসাহী, বগুড়া পাবনা, মুরশীদাবাদ জেলা) ব্যাপিয়া পড়েন। রাজসাহী বিভাগ বারেন্দ্র কায়েস্থের প্রধান স্থান। এই বারেন্দ্র কায়স্থের সংখা সর্ব্বসমেত সাড়ে সাত ঘর, যথা— দাস, নন্দী, শর্ম্মা, নাগ, সিংহ, দেব, দত্ত; তন্মধ্যে দাস, নন্দী ও চাকী এই তিন ঘর কুলীন। ইহা কথিত আছে " শর্ম্মা" পূর্ব্বে নাপিত ছিল, তাহাকে কৌলীন্য মর্য্যাদা দিয়া অর্দ্ধঘর কুলীন করা হয়। এই "শর্ম্মা" সম্বন্ধে ঢাকুর গ্রন্থে যেরূপ প্রতিবাদ করা হইয়াছে তাহা এখানে উদ্ধৃত করা গেল। "কেহ কেহ এই সমাজকে সাড়েসাত ঘর বলেন এবং ঈর্ষাপরবশ হইয়া এই সমাজের অযথা কলঙ্ক ঘোষণা করিয়া থাকেন। ইহার কারণ এই যে 'নরসুন্দর শর্ম্মা' নামে একজন নীচবৃত্তি পরায়ণ কায়স্থ বহুদিন ভৃগুনন্দীর বৈতনিক ভৃত্য ছিল। যৎকালে ভৃগুনন্দী প্রভৃতি সমাজ বন্ধন করেন সেই সময় শর্ম্মা, সমাজপতিদিগকে বলেন, আমি আপনাদিগের আশ্রয়ে বহুকাল আছি এবং যাহা অনুমতি করিতেছেন তাহাই সম্পাদন করিতেছি কিন্তু আপনাদিগের দ্বারা আমার কিছুই উন্নতি হইল না। অতএব আমি আর এখানে থাকিব না। শর্ম্মার এই কথা শুনিয়া সমাজপতিগণ কৌতূক করিয়া বলেন আচ্ছা তোমাকেও আমরা সমাজে গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধভাবাপন্ন করিব। শর্ম্মা এই কথা সর্ব্বত্র প্রচার করাতে প্রবল প্রতাপ জটাধব নাগ মহাশয় তাহাকে দূর করিয়া দেন। শ্রুত হওয়া যায় নাটোর ডাঙ্গাপাড়া (১) গ্রামে শর্ম্মাব বংশ আছে। শর্ম্মা যে সমাজে গৃহীত হয় তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।" শর্ম্মা বাহাত্তরে কায়স্থের অন্যতম উপাধি (২) আমাদের বিশ্বাস বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজ সাতঘর।'

---

(১) ডাঙ্গাপাড়া— বাজসাহী জেলার অন্তর্গত।

(২) "কাযস্থ বংশাবলী" ও শব্দকল্পদ্রুম।

নরহরিদাস, ভৃগুনন্দী মুরারী চাকী ও জটাধর নাগের বংশ বিস্তার বর্ণন করিলে রাজসাহী প্রদেশের বারেন্দ্র কায়স্থের ঐতিহাসিক বিবরণ অনেক জানা যাইবে।

নরহরিদাসের বংশ।— নরহরির তিন পুত্র। তাঁহাব কনিষ্ঠ পুত্র বগুড়ায় বাস করেন। এই নরহরি দাসের বংশধরেরা ময়দান দিঘি, চৌপাকিয়া, পাবনা, মালঞ্চি, কেচুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, প্রভৃতি স্থানে বসতি বিস্তার করেন। ইহাদেব অনেকেই সুশিক্ষিত।

ভৃগুনন্দীর বংশ।— ভৃগুনন্দীব কালু ও মাধব দুই পুত্র। ইহারা পাবনা জেলার অন্তর্গত পোতাজিয়া গ্রামে বাস করেন। তদপর কালুব একটা সন্তান পোতাজিয়াব নিকট অষ্টমণিষা গ্রামে বাস করেন। কালু ও মাধবের বংশধরেরা পোতাজিয়া, অষ্টমনিষা প্রভৃতিস্থানে বাস করিয়া বিখ্যাত হয়। এই বংশের গোবিন্দ রায় নামক একজন পোতাজিয়া গ্রামে একটা বৃহৎ নবরত্ন নির্ম্মাণ করেন। সেই জন্য ইহার বংশধবেরা "নবরত্ন পাড়াব রায়" নামে প্রসিদ্ধ। এই বংশীয় রূপরাম বায় নামে একজন পাবসী ও আরবী ভাষায় বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন কাশীপুব এবং স্থানীয় জমিদার অধীন কোন প্রধান পদে রূপরাম ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পব ইনি পোতজিয়া ত্যাগ করিয়া বাজসাহীর অন্তর্গত দিঘীতে বাসভবন নির্দ্দেশ করেন। পোতাজিয়া কাশীপুর প্রভৃতি ২৭ থানায় ইহাদের সম্পত্তি ছিল।

মুরারী চাকীর বংশ।— মুরারী চাকীর দুই স্ত্রী প্রথম বনিতার সন্তানেরা অষ্ট মণিষা, মেদবাড়ী, কেচুয়াডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে বাস কবিত। শেষ পক্ষের বনিতাব সন্তানেরা দুর্ল্লভপুর, ঢাকচোর, দিলপসার এ বাস করেন।

জটাধর নাগের বংশ।— জটাধর নাগের সন্তানেরা গাঁড়াদহ, সবগ্রাম প্রভৃতি স্থানে বাস করেন। জটাধর নাগেব সন্তানদের মধ্যে সরগ্রামের নাগবংশই শ্রেষ্ঠ। ইহারা সোনাবাজু পরগণার বিখ্যাত জমিদার ছিল। এই বংশের রূপরাম নাগ সমাজে বিশেষ সম্মানিত হন।

জটাধর নাগের বংশের এক ব্যক্তি রাজসাহী জেলার অন্তর্গত ডাংগাপাড়া গ্রামে বাস করেন। ডাঙ্গাপাড়াদিগের একটী বিস্তৃত জমিদারী লাভ করিয়া, ইনি বিশেষ বিখ্যাত হন। ইহাঁর বংশধরেরা সমাজে বিশেষ পরিচিত এবং গৌরবান্বিত। এই বংশে অনেকে সুশিক্ষিত। ইহাদের ডাঙ্গাপাড়াদিগরের জমিদারী এখনও আছে। ইহারা ডাঙ্গাপাড়ার চৌধুরী বলিয়া পরিচিত। ইহাঁরা চৌদ্দ চৌধুরীর এক চৌধুরী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

গশবাড়ীর নাগবংশও বিশেষ মাননীয়।

তাড়াশের জমিদার বংশ।— তাড়াশ বিলচলনের নিকটবর্তী গ্রাম। পূর্ব্বে এই গ্রাম রাজসাহী প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। এইক্ষণ এই গ্রাম পাবনা জেলার অন্তর্গত। চড়িয়াব দেব বংশোদ্ভব বলরাম নামক এক ব্যক্তি বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। এই ব্যক্তি নাটোর রাজ সংসারে প্রধান কার্য্য কারক ছিলেন। এই সময় কুসুম্বী পরগণা প্রভৃতি বিস্তর জমিদারী লাভ করেন। "ধনেনকুল" এই বাক্যের সার্থকতা লাভ করে। সুতরাং সমাজে বিশেষ পরিচিত হইলেন। রাজসাহী ও পাবনা জেলায় বিস্তৃত জমিদাবী লাভ করিয়া তাড়াশ গ্রামে বাস নির্দ্দেশ করেন। তাড়াশের ঘব প্রধান জমিদারগণ এই বলরাম রায়ের বংশ। ...

... অন্তর্গত বর্দ্ধন কুঠীর জমিদার দেব বংশীয়। এই বংশে এক ব্যক্তি মানসিংহের সময় রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। ঐ ... বংশেব কাকিনার জমিদাবও কুলীন নহে। কিন্তু বিস্তৃত জমিদারী .. লাভের ফলে সমাজে তার বংশ প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।

... বরেন্দ্র শ্রেণী কায়স্থগণের আচার ব্যবহার, সামাজিক রীতিনীতি রাঢ়ীয় শ্রেণী কায়স্থগণের সঙ্গে কোন অংশে মিলনাই। রাজসাহীতে বঙ্গজ কায়স্থদের বাস; অবশিষ্ট কায়স্থ

সমুদয় বারেন্দ্র শ্রেণী। এইসব স্থানে আচারভ্রষ্ট কায়স্থও কম নহে। ইহারা বারেন্দ্র শ্রেণী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। কিন্তু বারেন্দ্র শ্রেণী সদাচারী সদ্বংশজাত কায়স্থগণের সহিত ইহারা আহার-ব্যবহার করণকারণ কিছুই করিতে পারে না। তাহা প্রায়ই অশিক্ষিত। রাজসাহীতে সর্ব্ব সমেত বারেন্দ্র কায়স্থ ১০০০ ঘরের কম হইবে না। ডাঙ্গাপাড়া, মাঝগ্রাম, বারিয়াহাটী, ঢাকচোর, ছাতারপাড়া, করচমাড়িয়া, মুরাদপুর, প্রভৃতি স্থানে সদাচারী সদ্বংশজাত ধনী বারেন্দ্র কায়স্থের বাস। ইহাদের অনেকেই সুশিক্ষিত।

(৩) নবশাখা বা নবশায়ক।— শূদ্রজাতি নয় শাখায় বিভক্ত বলিয়া এই জাতির নাম নবশাখ হয়। তিলী, মালী, তামুলী, গো, নাপিত, গোছারী, কামার, কুমাব, পুঁটুলী, এই নয় জাতি নবশাখ, আধ্যায় পরিচিত। (১) ইহাদের ব্যবসার অনুযায়ী জাতি নির্ণয় করা হইয়াছে। অতিপুরাকালে আর্য্যজাতিবা যাহাদের পরাজিত করিয়া বন্দী করেন, তাহারা আচারভ্রষ্ট শুদ্র আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া ত্রৈবর্ণের কার্য্যে নিযুক্ত হয়। তখন সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যবসায়ী জাতিবৃত্ত প্রয়োজন হইল। সে সময় ত্রৈবর্ণের নীচে শূদ্র ভিন্ন অন্য জাতি ছিল না। সুতরাং শূদ্রগণের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ী লোকের সৃষ্টি হইল। এই আচারভ্রষ্ট শূদ্রগণ মধ্যে যাহারা ত্রৈবর্ণের সেবায় বা সংস্রবে জ্ঞান লাভ করেন, তাহারা শূদ্র মধ্যে উৎকর্ষ লাভ করিয়া সম্মানিত হইতে লাগিলেন এবং যাহারা অজ্ঞানই রহিল বা নিকৃষ্ট কর্ম্মে রত হইল, তাহারা নিকৃষ্ট শূদ্র শ্রেণীতে পবিগণিত হইল। এই অপেক্ষাকৃত জ্ঞানী শূদ্রগণ উল্লিখিত নয় শাখায় বিভক্ত হইয়া ব্যবসানুযায়ী নবশাখা বলিয়া পরিচিত হইল। ইহাই বেশী সম্ভব। কিন্তু "সম্বন্ধ নির্ণয়ের" গ্রন্থকার পণ্ডিত প্রবর লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় নবশাখের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করেন। "যৎকালে মহাবীব পরশুবাম পৃথিবীকে এক বিংশতি বার নিঃক্ষত্রিয়া করেন তৎকালে এই কয়েক জাতির সাহায্য লইয়া তিনি ক্ষত্রিয় বংশের ধ্বংস করিতে সমর্থ হন। ইহাদিগেরই সাহায্যে পরশুরামের প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হয় (অর্থাৎ ক্ষত্রিয়কূলের বিনাশ বিষয়ে ইহারা শায়ক (বাণ) স্বরূপ হয়)। ইহারা পূর্ব্বে কায়স্থের তুল্য ছিল না; ঐ সময়াবধি কায়স্থের তুল্য হয়। পরশুবাম দ্বারা সমাজ মধ্যে এতাদৃশ মর্য্যাদা পাইয়াই ইহারা ক্ষত্রিয়দিগের বিরুদ্ধে উত্থান করিয়া ছিল।" এই উদ্ধৃত অংশ পৌরাণিক কথা। ইহার সারাংশ গ্রহণ করিলে, ইহা প্রতীত হইবে নবশাখ শূদ্রজাতি এবং ক্ষত্রিয়ের নীচ বলিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে উত্থান হয়। এস্থলে ইহাও বলা হইত, তাহা হইলে কায়স্থ ও ক্ষত্রিয়ের ধ্বংস জন্য পরশুরামকে সাহায্য করিত। আবার "শায়ক" শব্দের সহিত "নব" শব্দ সংযোজিত কবিলে "নবশায়ক" হইল। তবে কি "নবশায়ক" শব্দে "নূতনবাণ" কি "নয়বাণ" বুঝাইবে? "নবশায়ক" শব্দে নূতনবাণ বা নয়বাণ বুঝাইতে পারে। শূদ্রেরা নূতনবাণ গ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, বা শূদ্রের নয়শ্রেণী একত্রিত হইয়া যুদ্ধ করে এই হেতু ইহারা নবশায়ক বা নবশাক নাম ধারণ করিল। অতএব উদ্ধৃত অংশের উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়া নবশাক না বলিয়া নবশায়ক বলিলেও কোন বিশেষ ক্ষতি দেখিনা। আবার বিদ্যানিধি মহাশয় বলিয়াছেন নবশাখেরা "সুচ্ছূদ্র বলিয়া পরিগণিত।" আমরা বিদ্যানিধি মহাশয়ের পক্ষ সমর্থন করিতে পারিলাম না। ধরণীকোষ মতে সচ্ছূদ্র কেবল ক্ষত্রিয়কেই বুঝায়। ইহা নিম্ন উদ্ধৃত শ্লোকে প্রমাণ হইবে।—

'সচ্ছূদ্র মসীশদেব কায়স্থশ্চ শ্রীবৎসজঃ।
অম্বষ্ঠো মাধূরীভট্টঃ সূর্য্যধ্বজশ্চ গৌড়কঃ ॥"

---

(১) গোপ মালী তথ্য তৈলী তন্ত্রী মোদক বারুজী।
কুলাল কর্ম্মকাবশ্চ নাপিত্যে নবশায়কা:।

[ধরণী মতে কায়স্থ ক্ষত্রিয় এবং ক্ষত্রিয় সুচ্ছূদ্র। আবার স্কন্দপূরাণ মতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, সচ্ছূদ্র এবং ইহারা শালগ্রামশীলা স্পর্শ করিতে সক্ষম। এবিষয় নিম্নবচনে প্রমাণ হইবে ঃ—

ব্রাহ্মণ ক্ষত্র বৈশ্যানাং সচ্ছূদ্রনা মথাপিবা।
শাত্রগ্রামেহ ধিকারোস্তি নচান্যাষাং কদাচন॥"

নবশাখযে সচ্ছূত্র নহে তাহার সন্দেহ রহিল না। নবশাখ শূদ্রজাতীয়। কিন্তু ইহারা ভাল শূদ্র এবং ইহাদের স্পর্শীয় জল সকল জাতিই পান করিতে পারে। "নবশাখেরা কায়স্থ সদৃশ সদাচার সম্পন্ন। ইহাদিগের পুরোহিত ও কায়স্থদিগের পুরোহিত এক।" (১) একথা কতদূর ঠিক তাহা আমরা বলিতে পারি না। পূর্ব্ববঙ্গে যে সকল বঙ্গজ কায়স্থ বসতি করিতেছেন, তাহাদের এবং সেই দেশবাসী নবশাখ বিধবা রমণীদের আচার ব্যবহার ও ক্রিয়া কলাপ দেখিলে "নবশাখেরা কায়স্থ সদৃশ সদাচার সম্পন্ন" বলা ভ্রমপদ হইবে। বঙ্গজ কায়স্থ সমাজে বিধবা রমণীদের আচার ব্যবহার ঠিক ব্রাহ্মণ বিধবা রমণীর ন্যায়। বঙ্গের কায়স্থ বিধবা রমণী ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত-চারিণী। পক্ষান্তরে নবশাখ বিধবা রমনীগণেরা ব্রহ্মচর্য্য ব্রতচারিণী নহে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই স্বেচ্ছাচারিণী। এইরূপে কায়স্থ ও নবশাখ পুরুষদের আচার ব্যবহারে অনেক প্রভেদ আছে। পূর্ব্ববঙ্গে নবশাখেরা বঙ্গজ কায়স্থদের ব্রাহ্মণের ন্যায় সম্মান করিয়া থাকে। কিন্তু রাজসাহীতে এরূপ ভাব দেখা যায় না। এজেলায় নবশাখদের মধ্যে অনেক বিধবা রমণী ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত চারিণী নহে এবং পুরুষেবাও যথেষ্ট আচার ভ্রষ্ট। রাজসাহীর নবশাখেরা কায়স্থদের ব্রাহ্মণের ন্যায় সম্মান করে না। ইহার কারণ এই যে রাজসাহীতে বাবেন্দ্র কায়স্থের আচার ব্যবহার বঙ্গজ কায়স্থেব সদৃশ নয় বলিয়াই নবশাখেরা রাজসাহী কায়স্থদের বঙ্গজ কায়স্থদের ন্যায় সম্মান কবে না। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের কাল হইতে নবদ্বীপ এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের নবশাখদের আচার ব্যবহাব দক্ষিণ রাষ্ট্রীয় কায়স্থ সদৃশ দেখা যায়। আমবা স্বীকার কবি নবশাখের শিক্ষা, জ্ঞান, সভ্যতা, ধন, ও সম্মান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদেব আচার ব্যবহারের সঙ্গে পরিবর্ত্তন হইতেছে। এমতাবস্থায়ও দেখিতে পাওয়া যায় যে অনেক স্থলে বঙ্গজ কায়স্থের ও নবশাখের পুরোহিত এক নহে। অনেক বঙ্গজ কায়স্থ ও নবশাখের পুরোহিত দ্বাবা ক্রিয়া কলাপ নির্ব্বাহ করান না। পক্ষান্তরে ইহাও দেখা যায় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থেব পুরোহিত এক। তাই বলিয়া কি কায়স্থ ব্রাহ্মণ সদৃশ হইতে পারে?

(১) তিলী।— তিলশস্য বিক্রেতাকে আদিতে তিলী জাতি বলিত এক্ষণ ব্যবসায়ী জাতিকে তিলী বলে। বাজসাহীতে পাচুপুর, গোবিন্দপুর হাতিয়ানদহ, আড়ানী মালঞ্চি প্রভৃতি স্থানে তিলী জাতীয় অনেক ধনী লোক আছে। তিলী জাতির মধ্যে দিঘাপতিয়ার রাজা প্রসিদ্ধ। এই তিলী জাতিতে প্রায়শই দবিদ্র নাই। এই জাতির আর একটা শ্রেণী তেলী নামে কথিত আছে। ইহারা তৈলবিক্রেতা। কোন কোন স্থানে তেলী জলাঅনাচরণীয় জাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ।

(২) মালী।— ইহারা মালকার নামে প্রসিদ্ধ। ইহাদের ব্যবসা পুষ্পচয়ন করা এবং মালা গ্রন্থন দেওয়া। অধুনা ইহারা বিবাহ, চূড়াকরণ প্রভৃতি মাঙ্গলিক কার্য্যে শোলার মুকুট ও ফুল প্রস্তুত এবং দেব প্রতিমাদি চিত্র করিয়া থাকে।

(৩) তামুলী।— ইহাদের আদি ব্যবসা পান বিক্রয় করা। এই রাজসাহীতে গোয়ালকান্দী ও আমরাইল গ্রামে যে তামুলী আছে তাহারা জমিদার। তামুলীরা কুসীদ জীবী। ইহা কথিত আছে যে তামূলীরা এত বেশী হারে সুদ গ্রহণ করিত যে অধমর্ণেরা এত বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট

(১) সম্বন্ধ নির্ণয়।

হইয়াছিল যে প্রায় ৬৫ কি ৭০ বৎসর পূর্ব্বে "তামূলী লুট" নামে একটা বৃহদাকারে বড়গাছীতে তামূলীর বাড়ী লুট হয়। বড়গাছী রামপুরবোয়ালীয়া হইতে প্রায় ১২ মাইল উত্তর। তাহিরপুর পরগণার প্রজারাই বেশী প্রপীড়িত হয়। ইহারা ও অন্যান্য প্রজারা লুট করে। খত, খাতা ও যাবতীয় কাগজ পত্র অগ্নিসাৎ করে। এই ঘটনা হইতে তামুলী জাতিকে সেক্সপিরারের সাইলক (Shylock) বলিলে অত্যুক্তি হইত না। এক্ষণ তামুলী জাতির কুসীদ ব্যবসায় উন্নতি নাই। (এক্ষণ প্রায় সকল জাতিই কুসীদজীবী।

(৪) গোপ শব্দার্থে গো রক্ষককে গোপ বলে। বঙ্গের দক্ষিণ ভাগে সদ গোপকে গোপ বলে। ইহাদের সাধারণ ব্যবসা কৃষি। হুগলী জেলাতে অনেক সদ্বংশজাত শিক্ষিত সদ্গোপের বাস। কিন্তু ঐ দেশে যাহাদের গোয়ালা বলে তাহারা নবশাখ নহে এবং তাহারা অনাচরনীয়। রাজসাহীতে যাহাদের গোপ বলে তাহারা দধি দুগ্ধ ব্যবসায়ী এবং তাহারা জল আচরণীয়। রাজসাহীতে দক্ষিণ দেশের ন্যায় গোয়ালা নাই। দক্ষিণ দেশ সদৃশ সদ্গোপ এজেলায় অতি অল্প সংখ্যক। ইহাদের ব্যবসা কৃষি। ইহাদের কুটুম্ব হুগলী, বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় আছে।

(৫) নাপিত।— ইহাদের ব্যবসা ক্ষৌর কার্য্য। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ সময় মধুনাপিত তাঁহার মস্তক মুণ্ডন করে। এই সময় হইতে, মধুনাপিতের বংশধরেরা ক্ষৌব কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মোদকাদি প্রস্তুত এবং বিক্রয় করে। রাজসাহীর অন্তর্গত কলম, ডাযা প্রভৃতি গ্রামে কতিপয় গ্র-ধূবংশীয় নাপিত আছে।

(৬) গোছালী।— ইহারা পান প্রস্তুত করে এবং বিক্রয় করে। ইহাদেব সাধারণতঃ "পানতীয়া" বা বারুই বলে। গুচ্ছ শব্দে আঁটি বুঝায়। যে পানেব আঁটি বা গুচ্ছ বাঁধে তাহাকে গোছালী বলা যায়।

(৭) কামার।— ইহারা লৌহদ্রব্য প্রস্তুত এবং বিক্রয় করে।

(৮) কুমার।— ইহারা মৃন্ময় ঘটাদি প্রস্তুত এবং বিক্রয় করে।

(৯) পুঁটুলী।— গন্ধবণিক, শঙ্খবণিক, তন্তুবায়, (১) ময়বা, এই কয়েক জাতি পুঁটুলী বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাদের ব্যবসায়ী দ্রব্য পুঁটুলী বাঁধিয়া বিক্রয় করিতে হয়; এইজন্য ইহাদেব পুঁটুলী বলে।

(৭) **জল আচরনীয় হিন্দু অথবা নবশাখ নহে**।— জল আচরণীয় হিন্দুব মধ্যে কতকগুলি জাতি আছে যাহাদের জল এজেলায় প্রচলিত আছে অথচ তাহাবা নবশাখ নহে, যথা—(১) কৈবর্ত্ত, (২) দধি দুগ্ধ ব্যবসায়ী গোপ (গোয়াল)। কৈবর্ত জাতির উল্লেখ বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণে দেখা যায়। রাম বনবাস সময় কৈবর্ত্তরাই তাঁহাকে গঙ্গানদী পার করিয়াছিল। এটী পুরাতন জাতি। "কৈবর্ত্তেদাস দাস-ধীবরৌ", এরূপ কৈবর্ত্য রাজসাহীতে নাই। কৈবর্ত্তগণ দুই ভাগে বিভক্ত যথা— (১) হেলে কৈবর্ত্ত (২) জেলে কৈবর্ত্ত। যাহাবা কৃষি কর্ম্ম ও দাসবৃত্তি কবে, তাহারা হেলে কৈবর্ত্ত। যাহারা মৎস্য ধরে এবং নাবিকের কার্য্য করে, তাহারা জেলে কৈবর্ত্ত। রাজসাহীতে দ্বিতীয় শ্রেণীর কৈবর্ত্ত নাই। এই জেলাব হেলে কৈবর্ত্তই সমুদয়। ইহাবা জল আচরণীয় কিন্তু ইহাদের পুরোহিতের জল ব্যবহার নাই। দধি দুগ্ধ ব্যবসায়ী গোপ (গোয়ালাদের) এবং তাহাদের পুরোহিতের জল প্রচলিত আছে। এই দধি দুগ্ধ ব্যবসায়ী গোপ দুই ভাগে বিভক্ত যথা— একভাগ দুগ্ধ মন্থন করিয়া মাখন প্রস্তুত কবে; ইহাদের কাড়িয়া গোয়াল বলে এবং ইহারা কৃষিকর্ম্মও করে। অপরভাগ দধিমন্থন করিয়া মাখন প্রস্তুত করে; ইহাদের বারেন্দ্র বা বাথানীয়া গোপ বলে। ইহারা পূর্বে একটী বিস্তৃত মাঠে বহুসংখ্যক গাভী রাখিয়া দধি

---

(১) এক শ্রেণী তন্তুবায় আছে, যাহারা নবশাখ বলিয়া পবিচিত নহে এবং তাহাবা জলআচবণীয় জাতি নহে।

দুগ্ধের ব্যবসা করিত। কৃষি কার্য্যের উন্নতিতে গাভী পোষণের জন্য মাঠ আর পাওয়া যায় না। যে মাঠে গাভীগণ থাকিত, তাহাকে বাথান বলিত। এক্ষণ রাজসাহীতে আর বাথান নাই। এক্ষণ গ্রাম গ্রাম হইতে দুগ্ধ ক্রয় করিয়া ব্যবসা করে।

কৈবর্ত্তের সংখ্যাই বেশী। কৈবর্ত্ত প্রায় ৬০,০০০ কি ৭০,০০০; গোয়ালা প্রায় ৯০০০ কি ১০,০০০ হইবে। কৈবর্ত্ত প্রায়ই কৃষক। গোয়ালা ও কৈবর্ত্তের অবস্থা সাধারণতঃ মন্দ নহে। রাজসাহীর উত্তর ও দক্ষিণ ভাগেই কৈবর্ত্তের সংখ্যা শ্রেণী। পদ্মানদীর তীরবর্ত্তী বেঙ্গগাড়ী গ্রামে যে সকল কৈবর্ত্ত আছে। তন্মধ্যে ভৌমিক বংশীয়েরা শিক্ষিত। ইহাবা জমিদার ও বাণিজ্য ব্যবসায়ী।

(৮) জল অনাচারণীয় হিন্দু।—এই প্রকার হিন্দুর মধ্যে নানা শ্রেণী। রজক, হেলে রজক, তাঁতী, যোগী, শুঁড়ী বা সাহা, ছুতার, চণ্ডাল, জালিয়া, হকার প্রভৃতি অনাচরণীয় হিন্দুর বাস। হেলে রজক ও সাহা জাতির মধ্যে কতক গুলি ধনী মহাজন ও জমিদার আছে। ইহাদের সংখ্যা অতি কম। পুরাণ শাস্ত্র প্রণয়নেব সময় হইতে হিন্দু সমাজ হীন অবস্থায় পতিত। এসময় হইতে দেশীয় অসভ্য জাতিদের আর্য্যগণ বিবাহাদি করিতে লাগিলেন বা দ্বিজাতীরা অসবর্ণা ভার্য্যা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল, সুগী, হেলেরজক প্রভৃতি নীচ জাতি সকলের উৎপত্তি হইল। ইহারাই সঙ্কর জাতি বলিয়া একটী সাধারণ নাম ধারণ করিল। রাজসাহীতে সঙ্কর জাতি নিতান্ত কম নহে।

রাজসাহীতে বৈষ্ণবের সংখ্যা প্রায় ১৪ হাজার বা ১৫ হাজার হইবে। ইহারা কোন জাতির অন্তর্গত নহে। মহাত্মা চৈতন্যদেবের সময় হইতে এই জাতির উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ভেদাভেদ নাই। অধুনা অধিকাংশই ভিক্ষা ব্যবসায়ী। কেহ কেহ অন্য ব্যবসা করে এবং লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া চাকুরী ও করিয়া থাকে।

মুসলমান।— রাজসাহী জেলাব মোট লোক সংখ্যার তিন ভাগেব অধিক মুসলমান, প্রায় এক ভাগ হিন্দু। রাজসাহীর মুসলমান সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত কবা যাইতে পারে। এক শ্রেণীব মুসলমান কোবাণের প্রকৃত ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া থাকে। অপর শ্রেণী মুসলমান উভয় হিন্দু ও মুসলমান দেবতাকে কোন কোন স্থানে সমান ভাবে ভক্তি কবে। প্রথম শ্রেণী মুসলমানের সংখ্যা অতিকম। ইহাদের মধ্যে অনেকেই সুশিক্ষিত। দ্বিতীয় শ্রেণী মুসলমানের রীতি নীতি ও ধর্ম্মপ্রণালী কোন কোন অংশে ইতর হিন্দুব ন্যায়। ইহাতে এই বিশ্বাস করা যাইতে পারে যে, ইহারা পূর্ব্বে ইতর হিন্দু ছিল, মুসলমান বাজত্ব সময় ইহারা মুসলমান হয়। ইহারা প্রায়ই অশিক্ষিত। আজি কালি এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মুসলমান মধ্যেও শিক্ষা বিস্তার আরম্ভ হইয়াছে। মুসলমান মধ্যে যদিচ জাতিভেদ নাই, তথাপি দ্বিতীয় শ্রেণীর মুসলমানদিগকে ৫ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা ঃ—

(১) কৃষক।— এই শ্রেণী মুসলমানের মধ্যে অনেকে ভদ্রবংশীয়। ইহাদের ব্যবসা অতি পবিত্র। রাজসাহীর কৃষকদের অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ কোবাণের প্রকৃত ধর্ম্ম আচরণ করেন। আজ কাল কৃষক সন্তানেরাও সুশিক্ষিত হইতেছে।

(২) বার মাসিয়া।— ইহাদের নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই। প্রায় নৌকাই ইহাদের বাসস্থান। সূঁচ, সূতা, চিরণী, আয়না ইত্যাদি দ্রব্য লইয়া হাটে ও গ্রামে গ্রামে বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

(৩) জোলা।— ইহারা মোটা কার্পাস বস্ত্র এবং মোটা মশারী প্রস্তুত করে। ইহাদের সংখ্যা নিতান্ত কম।

(৪) নলুয়া।— ইহারা নলের দড়মা প্রস্তুত করে এবং কেহ কেহ সময়সময় কৃষিকার্য্যও করে।

(৫)ঢুলী ও বেহারা।— রাজসাহী জেলার দক্ষিণ ভাগে কতকগুলি মুসলমান আছে। তাহারা বিবাহ আদিতে ঢোল বাজায় এবং পালকী বহন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

বার মাসিয়া, জোলা, নলুয়া, ঢুলী ও বেহারা, এই প্রকার নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানদের সহিত প্রথম শ্রেণীর বা কৃষকশ্রেণী ভদ্রবংশজাত মুসলমানেব বিবাহ বা আহারাদি প্রচলিত নাই। এই সকল নিম্ন মুসলমানের ও ব্যবসা কোন কোন অংশে ইতর হিন্দুর সমান। মুসলমান রাজত্বকালে কতকগুলি ইতর হিন্দু মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী হয়। নিম্ন শ্রেণী অনেক কৃষক মুসলমানদেব আচরণ, নীতি ও ধর্ম্ম প্রণালী দেখিয়া সম্পূর্ণ সম্ভব যে নিম্ন শ্রেণী ও কতকগুলি কৃষক শ্রেণীর মুসলমান ইতর হিন্দুর বংশধর হইবে। ইহাদের মধ্যে অনেকে ইতর হিন্দুদের আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মপ্রণালী ত্যাগ করিয়া প্রকৃত মুসলমানের আচার ব্যবহাব গ্রহণ কবিতেছে।

মুসলমান অধিকাংশই কৃষক। নাটোর, বাগা, বাঘধনী, তারাটীয়া প্রভৃতি স্থানে কতিপয় মুসলমান জমিদার আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধর্ম্ম

১৮৯১ খৃষ্টাব্দের জন সংখ্যায় ধর্ম্মানুসারে রাজসাহীর মনুষ্যদের যেরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা নিম্নে দেখান যাইতেছে ঃ—

(১) হিন্দু	...	...	২৭৮,৯৩৮
(২) মুসলমান	...	...	১০৩৩,৯২৭
(৩) খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী	...	...	১০৫
(৪) পারশী	...	...	১
(৫) বৌদ্ধ ও জৈন	...	...	৪৬
(৬) অসভ্য জাতী	...	...	২৯৮
(৭) অন্যান্য	...	...	২১
	...	...	১৩১৩,৩৩৬
মোট জন সংখ্যার শতকরা প্রতি			
হিন্দু	...	...	২১.২২
মুসলমান	...	...	৭৮.৭২
অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী	...	...	.০৬
			১০০

পূর্ব্বের তালিকায় ইহা— প্রতিপন্ন হইতেছে যে হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী লোকই প্রায় সমস্ত। আবার হিন্দুর তিন গুণেরও বেশী মুসলমান। রাজসাহী জেলায় মুসলমান অধিক এবং মুসলমানেরা প্রায়ই চাষী; এবং জমিদার, ব্যবসায়ী ও বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ প্রায় হিন্দু। ইহাতে এই প্রমাণিত হয়, যে কেবল বাহুবলে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে এমত নহে। রাজসাহী এবং পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমান সংখ্যার বৃদ্ধির অন্য কারণ হইতে পারে। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় যে কারণ নির্দেশ করিয়াছেন তাহাই সঙ্গত বোধ হয় "অনার্য্যজাতিগণ পশ্চিম হইতে তাড়িত হইয়া, পূর্ব্ব বাঙ্গালায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল এবং তন্নিমিত্ত তৎপ্রদেশস্থ অধিবাসীরা বহুপরিমাণে অনার্য্য বংশ সম্ভূত বলিয়া হিন্দু সমাজে অতি নীচ শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছিল। এরূপ হীনাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া মুসলমানদিগের সময়ে দেশের রাজার সহিত সমধর্ম্মা হইতে তাহারা উৎসাহ-সহকারে ইচ্ছাপূর্ব্বক যাইবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে।"(১)

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের জনসংখ্যা শতকরা ২১.৯ জন হিন্দু এবং ৭৭.৭ জন মুসলমান ছিল। এই বিংশতি বৎসরে হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা কমিয়াছে এবং মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা বেশী হইয়াছে। হিন্দু মুসলমান হইয়া যে সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে এমত নহে; স্থানে স্থানে "ম্যালেরিয়া"দোষে ব্রাহ্মণ ভদ্রের অনেক বংশের ধ্বংস দেখা যাইতেছে। রাজসাহীর কৃষক মুসলমানদিগের অবস্থা উন্নত।

হিন্দু।— হিন্দুদিগের ধর্ম্ম বেদ হইতে উৎপন্ন। বেদই হিন্দু ধর্ম্মের মূল। বেদের অপর নাম

(১) বাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস।

শ্রুতি। ঈশ্বর প্রমুখাৎ শ্রুত বলিয়া ইহার অন্য নাম শ্রুতি। সমুদয়ে চারি বেদ— (১) ঋগ্বেদ, (২) যজুর্ব্বেদ, (৩) সামবেদ, (৪) অথর্ব্ববেদ। বেদের দুই অংশ—(১) জ্ঞানকাণ্ড, (২) কর্ম্মকাণ্ড। এই চতুর্ব্বেদ দ্বারা সর্ব্ব ধর্ম্ম বৃদ্ধি প্রাপ্ত; এবং বর্ণাশ্রমাদির নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই বেদোক্ত যোগ যজ্ঞাদিরূপ কর্ম্ম সকল দ্বারা মরণ ধর্ম্মশীল মানবগণ পুণ্যবল হইয়া স্বাধ্যায়, ধ্যান, তপস্যা, দয়া ও দানাদি কর্ম্মদ্বারা জিতেন্দ্রিয় ছিলেন এবং দেবতুল্য ছিলেন। অতি পূর্ব্বকালে অর্থাৎ সত্যযুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ স্ব স্ব আচারের অনুবর্ত্তী হইয়া নিজ নিজ বিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠানপূর্ব্বক প্রায় সকলেই মুক্তির পথ প্রাপ্তি জন্য বিশেষ যত্নবান হইতেন। সত্যযুগ অতীত হইলে, ধর্ম্মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইতে লাগিল। তৎকালে মানবগণ বৈদিক কর্ম্ম সম্পাদনে অসমর্থ হইতে লাগিল। এমতাবস্থায় স্মৃতিরূপ বেদার্থযুক্ত শাস্ত্র সকল প্রকাশ হইল। এই শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মদ্বারা দুঃখ, শোক, রোগপ্রদ পাপ হইতে, তপস্যা স্বাধ্যায় বিষয়ে দুর্ব্বল মানবগণ পরিত্রাণের পথ অবলম্বন করেন। সঙ্গে সঙ্গে নানা ইতিহাসযুক্ত পুরাণ সকল প্রকাশ পাইল। তৎপর দ্বাপরযুগ উপস্থিত হইলে মনুষ্যের স্মৃত্যুক্ত সুকৃতি ত্যাগ হইল; ধর্ম্মার্দ্ধ লোপ পাইল। মনুষ্য মনোব্যথা ও ব্যাধিদ্বারা আকুল হইল। তখন ব্যাসাদিরূপে সংহিতা শাস্ত্রের প্রকাশ হইল। তৎপর পাপরূপী, সর্ব্বধর্ম্ম বিলাপকারী ও দুষ্ট কর্ম্ম প্রবর্ত্তক কলিযুগ আগমন করিলে, বেদ, স্মৃতি ও পুরাণাদি কার্য্যের লোপ হইতে লাগিল। যুগধর্ম্ম প্রভাবে স্বভাবতই মনুষ্যগণ অতি দুর্ব্বৃত্ত ও সর্ব্বদা পাপকারী হইতে লাগিল। তখন বেদোক্ত জ্ঞান ও কর্ম্মকাণ্ডের চর্চ্চা প্রায় একবারে বিলুপ্ত হইতে লাগিল। সেই কালে বঙ্গদেশে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সংখ্যা একবারে কম হইয়া পড়িল। তখন নানা তন্ত্রের প্রকাশ পাইতে লাগিল।

রাজসাহী জেলাব হিন্দুরা তিনভাবে বিভক্ত যথা— ১ বৈদান্তিক, (২) পৌরাণিক. (৩) তান্ত্রিক। বৈদান্তিক হিন্দুরা পুরাকালের হিন্দুদিগের মতাবলম্বী এবং তাহাদিগের আচার পবিত্র। অতি অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণেরা এই মতাবলম্বী। হিন্দু সমাজে ইহাদের সম্মান বেশী; কিন্তু ইহারা বড়ই দরিদ্র। রাজসাহী জেলার অধিকাংশ হিন্দু পৌরাণিক মতাবলম্বী। ইহারা বৈষ্ণবসম্প্রদায়। এই বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বীরা দুই আগে বিভক্ত যথা—(১) পশ্বাচার, (২) যোত্যাচার। পশ্বাচারেরা আমিশভোজী এবং সুতরাং ঘৃণিত। যোত্যাচারেরা নিরামিশভোজী। যোত্যাচারীদের পঞ্চ শাখা, যথা— (১) গরি, (২) ভারত, (৩) নাড়া, (৪) বাউল, (৫) দরবেশ। ইহাদের মধ্যে গীর ও ভারতীর মতে স্ত্রী গ্রহণ করা নিষিদ্ধ এবং সাংসারিক কার্য্যে নির্লিপ্ত। কিন্তু কার্য্যে দেখা যায় যে অর্থোপার্জ্জনে বিরত নহে। যদিচ ইহারা বিবাহ করে না, তথাপি অনেকেই কোন না কোন প্রকার স্ত্রী গ্রহণ করিয়া থাকে। অপর দুই সম্প্রদায় নাড়া ও বাউল বৈরাগী বলিয়া খ্যাত। ইহাদের কতকগুলি ভিক্ষুক এবং কতকগুলি দোকানদার। ১৬০০ শতাব্দীতে চেতন্যদেব স্বীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করেন। নাড়া ও বাউলেরা চৈতন্যদেবের শিষ্য। ইহারা এবং অন্যান্য শিষ্যেরা চৈতন্যদেবকে বিষ্ণুর অবতার বরিয়া স্বীকার করেন। ইহারা স্বাধীন। এই স্বাধীনতাদ্বারা তাহারা অনেক দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। ইহাদের স্ত্রীলোকেরাও স্বাধীন। বৈরাগিণীদের আচার ব্যবহার হিন্দু স্ত্রীলোকদের হইতে অনেক বিভিন্ন। ইহারা নিজের ইচ্ছানুযায়ী পতি স্থির করিয়া লয় এবং ইহাদের বিধবা বিবাহে বাধা নাই। দরবশেরাও ভিক্ষুক কিন্তু ইহারা চৈতন্যদেবকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া অর্চ্চনা করে না।

বেদে নিরাকার ঈশ্বরের ধ্যান, মনন, অর্চ্চনা বর্ণিত হইয়াছে। অজ্ঞ মানবের হিতার্থ সেই বেদের সার ভাগ লইয়া তন্ত্রসমূহের সৃষ্টি হইয়া আগমোক্ত কার্য্যের বিধান হইয়াছে। যেমন মনুষ্যমধ্য তত্ত্বজ্ঞানী শ্রেষ্ঠ, যেমন বেদগণের মধ্যে শিব শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ সমুদয় আগমশাস্ত্রের মধ্যে

মহানির্ব্বাণতন্ত্র শ্রেষ্ঠ। এই মহানির্ব্বাণতন্ত্রে রূপ-কল্পনা করিয়া পরমব্রহ্মেরই উপাসনা বর্ণিত হইয়াছে। শিব দুর্গাকে বলিতেছেন যে সেই "পরমব্রহ্ম সকল প্রাণীর একমাত্র কারণ এবং হেতুভূত হওয়াতে সেই পরমব্রহ্ম হইতে আমরাও জাত হইয়াছি। ব্রহ্মা সেই পরমেশ্বর কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া লোক সকলকে সৃষ্টিকরণহেতু স্রষ্টা বলিয়া কথিত হইয়াছেন। তাঁহারই ইচ্ছাপ্রযুক্ত বিষ্ণু এই জগৎকে পালন করাতে পালয়িতা বলিয়া কথিত হইয়াছে। তাঁহারই ইচ্ছায় সংহাব করণ প্রযুক্ত শিব জগতে সংহারকর্ত্তা বলিয়া কথিত হইয়াছে। সেই পবমাত্মা অন্তর্য্যামী। তাঁহাবই আদেশে ব্রহ্মা সৃষ্টি করিতেছেন, তাঁহারই আদেশে বিষ্ণু পালন কবিতেছেন, তাঁহারই আদেশে শিব সংহার করিতেছেন, তাঁহারই আদেশে সূর্য্য তাপ দান করিতেছেন, তাঁহারই আদেশে বায়ু বাতাস দান করিয়া জগৎ শীতল করিতেছেন, এইরূপ সকল দেবতাই তাঁহারই দ্বারা সৃষ্টি হইয়া তাঁহারই আদেশমত আপন আপন কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।" এই আগমোক্ত প্রণালীতে যাহারা শক্তিকে পরমব্রহ্মজ্ঞানে উপাসনা করেন, তাহাবই প্রকৃত তান্ত্রিক। কিন্তু যাহারা কেবল পৌত্তলিকজ্ঞানে সৌভাগ্য ইচ্ছায় দুর্গাকে উপাসনা কবে, তাহারা প্রকৃত তান্ত্রিক নহে। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে এক স্থানে লিখিত আছে যে শিব দুর্গাকে উল্লেখ করিয়া পরমব্রহ্মের স্তব করিয়াছিলেন। "তুমি সাক্ষাৎ পরমব্রহ্মের পরম প্রকৃতি অর্থাৎ শক্তি। তুমি নিরাকাব হইয়াও সাকারা।" দুর্গাকে শক্তিরূপে কল্পনা করিয়া পরমব্রহ্মজ্ঞানে উপাসনা করিবে। এই তান্ত্রিকদেব মত। তান্ত্রিক মতের উপাসনা 'একপ্রকারে কঠিন, আব এক প্রকাবে নিতান্ত সহজ। চিত্তশুদ্ধি করিয়া এবং মন পবিত্র করিয়া, একাগ্রচিত্তে উপাসনা করিলে, উপাসনা প্রণালী নিতান্ত সহজ হয়। বর্ত্তমানে তান্ত্রিকেরা যেরূপ প্রণালীতে উপাসনা করে, তাহাতে তত্ত্বজ্ঞনের আশা নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বর্ত্তমানে অধিকাংশ তান্ত্রিকদেব বাহ্যিক আড়ম্বরই যথেষ্ট। রাজসাহীতে তান্ত্রিকমতেব উপাসকও কম নহে। পূর্ব্বে বাজসাহী দেশেব অধিকাংশ লোকই শাক্ত মতাবলম্বী ছিল। ১৩০৪ শকের ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের 'সাহিত্যে' রাজসাহীতে শাক্তমতের বিশেষ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। 'নদীয়া ও নাটোর রাজবংশ শাক্তমতাবলম্বী বলিয়া, রাজসাহী ও কৃষ্ণনগর অঞ্চলে রাজানুকম্পায় তন্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপের প্রাধান্য সংস্থাপিত হইয়াছিল। তদুপলক্ষে সুরাব উপাসনাই প্রধান হইয়া উঠিয়াছিল। একজন লিখিয়া গিয়াছেন যে— 'রাজসাহী শাক্তসমাজের লীলাভূমি; ইহার গ্রামে গ্রামে শক্তিপূজা প্রচলিত ছিল; এবং তদুপলক্ষে সুরাব উপাসনা বিশেষরূপ চলিত হইয়াছিল।' রাজসাহী প্রদেশে অদ্যাপিও শক্তিমতেবই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়।" আজি কালি রাজসাহীব শাক্তসম্প্রদায়ের অনেকে, সুরাপাণে বিরত দেখা যায়। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যের মধ্যে শক্তিউপাসক দেখা যায়। অন্য হিন্দুদেব মধ্যে প্রায়ই শক্তিউপাসক দেখা যায় না। সাধারণ লোকদিগের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম্মেবই প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। রাজসাহীতে তান্ত্রিক হিন্দুদের অবস্থা ভাল, এবং তাহারা সমাজে সম্মানিত। নাটোর বাজবংশীয় পুণ্যবতী হারাণী ভবানীর পুত্র মহারাজা রামকৃষ্ণ তান্ত্রিকমতে যোগী ছিলেন। রাজা হইয়াও তাঁহার বিষয় বাসনা ছিল না। তিনি রাত্রিতে শ্মশানে শ্মশানে যোগসাধন করিয়া ফিরিতেন। তাঁহার উত্তবসাধক সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত। করতোয়া নদীতটে ভবানীপুরের পীঠস্থানে সাধক প্রবর রাজা রামকৃষ্ণ তপস্যা করিতেন। এক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার যজ্ঞকুণ্ড, তপস্যাসন পঞ্চমুণ্ডি বিদ্যমান আছে। বাক্সারের শ্মশানেভূমিও তাঁহার তপস্যা স্থান ছিল। মহারাজা রামকৃষ্ণই প্রকৃত তান্ত্রিক উপাসক, প্রকৃত তান্ত্রিক মতের যোগী।

মুসলমান।— মধ্য এসিয়ায় "আর্য্য" নামে এক জাতি ছিল। এই আর্য্য তাদের মধ্যে কেহ ভারতবর্ষে এবং কেহ আরবদেশে যাইয়া বাস করেন। এই কথা বিশ্বাস করিলে, ভারতবর্ষীয় হিন্দু সন্তান এবং আরবীয় মুসলমানসন্তান আর্য্যজাতিসম্ভূত বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। আচারভেদ ও ধর্ম্মভেদ হওয়াতে, তাহারা ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইয়া পড়িলেন। হিন্দুরা মুসলমান জাতিকে যবন বা

ম্লেচ্ছনামে প্রসিদ্ধ করেন। যবনেব উৎপত্তিবিষয়ক নানামত দেখা যায়। মহাভারতে দেখা যায়, নহুষতনয় যযাতি নামে ভারতবর্ষে এক ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। তিনি শুক্রের শাপে জরাগ্রস্ত হন। তাঁহার পাঁচ পুত্র যথা— (১) যদু, (২) তুর্ব্বসু, (৩) দ্রুহ্যু, (৪) অনু, (৫) পুরু। যদু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ এবং পুরু সর্ব্বকনিষ্ঠ। যোতি ক্রমে পাঁচপুত্রকে ডাকিয়া জবাব সহিত পাপভোগ করিতে আদেশ কবেন। প্রথম চারিপুত্র অস্বীকার করায়, কণিষ্ঠ পুত্র পুরু পিতাব আদেশ শিবোধার্য্য কবিয়া জরার সহিত পাপগ্রহণ কবিলেন। ঐ চারিপুত্রকে যযাতি শাপ দিলেন এবং পুরুকে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে অনুমতি দিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র যদুকে যযাতি এই শাপ দিলেন যে যাহারা মাংসাশী, পশুধর্ম্মী ও ম্লেচ্ছ, তুমি তাহাদের বাজা হইবে। যাহারা অসভ্য এবং যাহাদের আচার কুৎসিত, ইহাদিগকে আদি সভ্য হিন্দুরা বিধর্ম্মী ম্লেচ্ছ বা যবন বলিত। ইহাও কথিত আছে যে যদুব এক সন্তান শ্বেতদ্বীপং অর্থাৎ ইংলন্ডে বাস করেন। পুরানেব মতও ভিন্ন। যে সময় বিশ্বামিত্রের সহিত বশিষ্ঠের যুদ্ধ হয়, সেই সময় বিশ্বামিত্রের সমস্ত সৈন্য পবাভব করিবাব মানসে বশিষ্ঠের গাভীর যোনিদ্বার হইতে কতকগুলি লোক বাহির হয়। তাহাবাই পরে যবন নামে খ্যাত হয়। যোনি হইতে জাত বলিয়া যবন হইল। আবার বিষ্ণু পুরাণে ইহা বর্ণিত আছে যে, সগর বাজা কোন বিশেষ অপরাধ জন্য কতকগুলি লোকের মস্তক মুণ্ডন করিয়া তাহাদিগকে ভারতবর্ষ হইতে বাহির করিয়া দেন; তাহাবাই পরে যবন নাম ধারণ কবে। মুসলমানদেব উৎপত্তি পৌরাণিক মতে বা মহাভারতের মতে সকল শ্রেণীব লোকের বিশ্বাস যোগ্য না হইবাবই সম্ভব। হিন্দুবা যাহাকে বিধর্ম্মী, কুৎসিতাচারী জ্ঞান কবিয়াছিলেন, তাহাবাই সম্ভবতঃ যবন বা মুসলমান নামে অভিহিত হইলেন। আদিতে আরব দেশীয় লোকেরা পৌত্তলিক ছিল। আবব দেশে মহম্মদ নামে একজন নবীর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একেশ্বরবাদী। তিনি পৌত্তলিক ধর্ম্ম রহিত করিয়া এক ঈশ্ববের উপাসনা প্রচলিত করেন। যাহাবা মহম্মদের এই মত অনুসরণ কবেন, তাহাদিগকে তিনি মুসলমান অর্থাৎ প্রকৃত বিশ্বাসী নাম দেন।

যবনাক্রান্তেব পব হইতে ভারতবর্ষে মুসলমানের বাস। বাজসাহীতে যে সকল যবন দেখা যায়, তাহাদেব মধ্যে অনেকে পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বী। বাঙ্গালাব ইতিহাস পাঠে জানা যায় কোন হিন্দু অর্থেব লোভে, কোন হিন্দু মুসলমান সবকারে চাকুরীব প্রলোভনে, কোন হিন্দু ভুসম্পত্তির আশায়, কোন হিন্দু সুন্দরী মুসলমান রমণীরত্ন লালসায়, কোন হিন্দু রাজাব সহিত সমধর্ম্মা হইয়া সম্মানিত হইবার অভিলাষে; স্বীয় হিন্দুধর্ম্ম পবিত্যাগ করিয়া মহম্মদের ধর্ম্ম গ্রহণ কবেন এবং কোন কোন হিন্দুকেও মুসলমানেবা কৌশলে ও বলে মুসলমান করেন। এই জাতিভ্রষ্ট হিন্দুগণকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যাহারা উচ্চ জাতীয় হিন্দু ছিল পবে মুসলমান হয় তাহারা প্রায়ই উচ্চশ্রেণীর মুসলমান হইল; এবং যাহারা নীচ শ্রেণী হিন্দু ছিল, পরে মুসলমান হয়, তাহারাা প্রায়ই কৃষক এবং তাহারাই নিম্নশ্রেণীব মুসলমান হইল। যাহারা উচ্চশ্রণীর মুসলমান তাহারা সকলেই একেশ্বর বাদী এবং তাহারা কোরাণের আদেশে সকল কার্য্য কবেন বলিয়া পরিচিত। উচ্চশ্রেণী মুসলমানেবা একেশ্বর বাদী, কিন্তু রাজসাহীতে উচ্চশ্রেণীর মুসলমানের সংখ্যা অতি কম; এবং নিম্নশ্রেণীর পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বী মুসলমানই বেশী। নিম্নশ্রেণীর মুসলমানেরা পীরের সিন্নী দেয়, পীরের বাঁশ ও গঙরা আদি করিয়া সেবা ও পূজা করে। আবাব কেহ কেহ উচ্চশ্রেণী মুসলমানদের ন্যায় দিবা রাত্রিতে পাঁচবার নমাজ করে এবং রোজাআদিও করে।

অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী এত কম যে তাহাদের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মই বাজসাহী জেলার প্রধান আলোচ্য বলিয়া তাহারই উল্লেখ করা গেল।

তৃতীয় অধ্যায়
নগর ও গ্রামের বিবরণ

১৮৯১ খৃষ্টাব্দের জন-সংখ্যায় রাজসাহী জেলায় ৫,২১৯ নগর ও গ্রাম ছিল। দিনাজপুর জেলায় মহাদেবপুর থানাব অন্তর্গত ৪৪৪ গ্রামে রাজসাহী জেলার নওগাঁ মহকুমার ভুক্ত হইয়াছে। বগুড়া জেলার অন্তর্গত কতকগুলি গ্রাম ও রাজসাহী জেলার নওর্গা মহকুমার সামিল হইয়াছে। রাজসাহীতে ৫৬৬৩ নগর ও গ্রামেরও বেশী আছে। সকল নগর ও গ্রামের বিবরণ লিখা এই ক্ষুদ্র পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে। প্রধান প্রধান নগর ও গ্রামের বিববণই দেওয়া গেল।

(নগর)

রাজসাহী জেলায় দুইটীমাত্র নগর আছে, যাহাদের লোকসংখ্যা ৫ হাজারের বেশী। এই দুই নগর, রাজপুরবোয়ালীয়া ও নাটোর। এই দুই নগরে মিউনিসিপাল নিয়ম প্রচলিত আছে।

রামপুরবোয়ালীয়া।– চারিশত কি পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে বোয়ালীয়ার প্রায় চারি মাইল দক্ষিণভাগে মহানন্দা নামে একটী নদী ছিল। তাহাব কিছু দূর দক্ষিণে পদ্মা নদী প্রবাহিত হইয়া সরদহের নিকট, পদ্মা ও মহানন্দা একত্রিত হইয়াছিল। কালে দুই নদী এক হইয়া পদ্মা নদী নাম ধারণ করে। বোয়ালীয়ার নিকট মহানন্দার নাম লুপ্ত হয়। বর্ত্তমান বোয়ালীয়া নগর পদ্মা নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত। "বর্ত্তমান বোয়ালীয়া নগরীতে ৭০ বৎসরের পূর্ব্বে, দুই চারি ঘর রেশম ব্যবসায়ী ব্যতীত, কোন ভূম্যধিকারীর নিবাস চিহ্ন লক্ষিত হয় না। খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে ওলন্দাজেবা বোয়ালীয়াতে একটী কুঠী নির্ম্মাণদ্বারা, রাজসাহী অঞ্চলে রেশমের ব্যবসায় আরম্ভ করেন পরে ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানী এই কুঠী ওলন্দাজদিগের নিকট ক্রয় করেন। সম্প্রতি তাহা "বড়কুটী" নামে ওয়াট্‌সন কোম্পানীর সম্পত্তি।" (১) নারদ নদীর মুখ বন্ধ হইয়া নাটোর অস্বাস্থ্যকর স্থান হইলে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে নাটোর হইতে রামপুরবোয়ালীয়াতে রাজসাহী জেলার সদর আফিস উঠিয়া আইসে। সেই হইতে বোয়ালীয়াতে জেলাব সদর আফিসসমূহ আছে এবং নাটোর মহকুমা হইয়াছে। বোয়ালীয়া পূর্ব্বে বাণিজ্য স্থান ভিন্ন কোন পুরাতন রাজবংশ বা বিশিষ্ট ভদ্রবংশীয়ের বাস ছিল না। নাটোর হইতে জেলার সদর আফিস বোয়ালীয়াতে উঠিয়া আসিবার পর হইতে স্থানের গৌরব ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। জেলা স্কুল স্থাপিত হওয়ার পর ঐ স্কুলে কলেজেব চারিটী শ্রেণী প্রতিষ্ঠিত হইয়া উচ্চ শিক্ষাব যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। তাহিরপুরের ষ্টেটের সাহায্যে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে একটী "সদাব্রত" স্থাপিত হইয়া দৈনিক আহার, মাসিক দান ও পৌষমাসের সংক্রান্তির দিন বার্ষিক দান দিবার নিয়ম হইয়াছে; তদ্দ্বাবা দরিদ্রদিগের মহোপকার হইয়াছে। ধর্ম্মরক্ষার্থ হিন্দুরা "ধর্ম্মসভা" এবং ব্রাহ্মেরা "ব্রাহ্মসভা" স্থাপিত করিয়াছেন। দীন দরিদ্র রোগীদিগের চিকিৎসা জন্য দিঘাপতিয়া ষ্টেটের সাহায্যে "দাতব্য চিকিৎসালয়" স্থাপিত হইয়াছে। এই নগরটীর দৃশ্য অতি সুন্দর কিন্তু সময় সময় পদ্মানদীর দৌরাত্ম্যে নগরের সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া যায়। নগরের লোকসংখ্যা ২২ হাজারেরও বেশী।

---

(১) শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় প্রণীত মহাবাণী শরৎসুন্দবীব জীবন চরিত।

নাটোর।– বর্ত্তমানে রাজসাহী জেলার একটী মহকুমা; কিন্তু ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত, এই স্থানে জেলার সদর আফিস ছিল। এই নগরটী নারদ নদীর তীরে এবং রামপুর বোয়ালীয়া হইতে ৩০ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। এই নগরের নিকট দিয়া উত্তর বঙ্গ রেলপথ দার্জ্জিলিং গিয়াছে। এই স্থানে অনেক রাজা ও জমিদারের বাস। বিখ্যাত নাটোর রাজবংশের বাসস্থান এই নগবে। নাটোর রাজবাটী চারিদিকে "চৌকি" বা পরিখা দ্বারা বেষ্টিত। ইহা কথিত আছে, যে স্থানে রাজবাটী ও নাটোর সহর অবস্থিত সে স্থান পূর্ব্বে "ছাইভাঙ্গার" বিল বলিয়া পরিচিত ছিল। ১৮ শতাব্দীতে নাটোর রাজবংশ ক্রমে ক্রমে ক্ষমতাশালী হইয়া রাজসাহী জেলার প্রায় সমুদয় স্থান অধিকৃত করে। দশশালা বন্দোবস্ত সময় দানশীলা দীন দুঃখী পালয়িতা প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভবানী নাটোর বংশ উজ্জ্বল করিয়া, এই নগরে বাস করিতেন। যে নাটোর রাজবংশের রাজত্ব প্রায় সমস্ত রাজসাহী এবং অন্যান্য জেলারও ভুরি ভূরি ভূমি অধিকৃত ছিল, এইক্ষণ সেই বংশের রাজত্ব আকৃতিতে চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছে; কিন্তু সম্মানে সর্ব্বোচ্চ এখনও আছে। নাটোর মহারাজার সাহায্য প্রদত্ত একটী উচ্চশ্রেণী ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া দরিদ্র সন্তানদিগের মহোপকার হইয়াছে। আবার দিঘাপতিয়া রাজার সাহায্যে একটী "দাতব্য চিকিৎসালয়" স্থাপিত হইয়া দীন দুঃখী রোগীদের প্রাণ রক্ষার উপায় হইয়াছে। নাটোর স্বাস্থ্যকর স্থান নহে। নগরের জলবায়ু কোন প্রকারেই ভাল নহে। তথাপি এই নগরে ১০ হাজার লোকের বাস। নাটোরের নিকটবর্ত্তী হরিশপুর আমহাটী, ভাবণী, প্রভৃতি অনেক ভদ্রপল্লী আছে।

গ্রাম।

(১) নওগাঁ।– ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে এইস্থানে একটী মহকুমা স্থাপিত হয়। যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত। এই স্থান উত্তরবঙ্গ রেলওয়ের সান্তাহার (সুলতানপুর ষ্টেশন হইতে তিন মাইল দূর। এস্থানের হাট অতি প্রসিদ্ধ, এবং একটী প্রসিদ্ধ বাণিজ্য স্থান। ইহা গাঁজার জন্য বিখ্যাত। এই নওগাঁ হইতে প্রায় সমুদয় ভারতবর্ষে গাঁজা রপ্তানী হয়। এখানে মিউনিসীপাল নিয়ম প্রচলিত হয় নাই। বিদ্যা শিক্ষার জন্য উচ্চশ্রেণীর একটী ইংরেজী বিদ্যালয় এবং দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসা জন্য একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে। মহকুমা স্থাপিত হইবার পর হইতে স্থানের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। কালে ইহা একটী সুন্দর নগরে পরিণত হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

(২) বলিহার।– ঐ স্থান ববেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের একটী প্রধান সমাজ। কুলজ্ঞ গ্রন্থে ইহার নাম "কুড়মুড়ি" বা "কুড়মৈল" বলিয়া পরিচিত। আত্রাইনদী হইতে প্রায় ৮মাইল দূর। এই গ্রামে বলিহার পরগণার রাজাদের বাড়ী। এই পরগণার এক অংশের জমিদার রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত দিনহাটার নিয়ত কাল বাস করেন। রাজা কৃষ্ণেন্দ্রনারায়ণের সাহায্যে একটী মধ্যশ্রেণী ইংরেজী স্কুল স্থপিত হইয়াছে।

(৩) দুবলহাটী।– এ গ্রামটী বিলের মধ্যে; নওগাঁ হইতে ৫ মাইল দূর। এখানে বাব্বকুপুর পরগণার রাজার বাস। রাজা হরনাথের সাহায্যে একটী মধ্যশ্রেণী ইংরেজী স্কুল (১) স্থাপিত হইয়াছে।

(৪) মহাদেবপুর।– আত্রাই নদীর তীরে; বলিহার হইতে ৫ কি ৬ মাইল দূর। রাঢ়ী শ্রেণী ব্রাহ্মণ জমিদারদিগের বাস।

---

(১) বর্ত্তমানে উচ্চশ্রেণী স্কুলে পরিণত হইয়াছে।

(৫) মাঁদা।– মাঁদার বিলের তীরে, আত্রাই নদী হইতে প্রায় ৬ মাইল দূর। এই স্থান রামনবমীর মেলার জন্য প্রসিদ্ধ। এই স্থানে মাঁদা পরগণার জমিদারদিগের কাছারী আছে।

(৬) তালন্দ।– মাঁদাব বিলেব শেষ ভাগে দক্ষিণদিকে এবং তানোর থানার প্রায় ৪ মাইল উত্তরে। ধনী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদারদিগের বাস। ইহাদের দ্বারা একটী মধ্যশ্রেণী স্কুল স্থাপিত হইয়াছে।

(৭) তাহিরপুর।– বাবাহী (বাবানই) নদী তীরে। এই নদীব পূর্ব্ব তীরে রামরামা গ্রামে তাহিবপুরে প্রসিদ্ধ ভৌমিক বংশেব রাজধানী ছিল। এই স্থানে বিখ্যাত রাজা কংস নারায়ণের বাস ছিল। এই বামবামাব পশ্চিমে বারানই নদীর অপব পারে তাহিরপুরেব বর্ত্তমান রাজবাটী। তাহিরপুর বাগমাবা থানাব প্রায় ৫ মাইল পূর্ব্বে এবং উত্তব বঙ্গ রেলওয়ের মাধনগর ষ্টেসন হইতে প্রায় ৬ মাইল পশ্চিম। এই স্থানের হাট অতি প্রসিদ্ধ।

(৮) দিঘাপতিয়া।–নাটোরেব ২ মাইল উত্তব। এই গ্রামে দয়ারাম রায়ের বংশধর দিঘাপতিয়া রাজার বাস। জেলার মধ্যে এই বাজার জমিদাবী সকলেব অপেক্ষা বেশী। এই বাজাব রাজত্ব রাজসাহী, বগুড়া, পাবনা, ফবিদপুব, মুবশীদাবাদ, যশোহর, হুগলী, হাবড়া, প্রভৃতি জেলায় বিস্তৃত। বাজবাটীর চারিদিকে "চৌকি"-বা পবিখা আছে, রাজবাটীব সম্মুখেই দৈনিক বাজাব হয। স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয়েব অভাব নাই।

(৯) লালুর।– আত্রাই নদীর তীবে। এই গ্রামে বারেন্দ্র শ্রেণী কাপ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেব বাস। এ স্থানে বারইয়ারী কালীপুজা আদিও প্রসিদ্ধ। এ স্থানেব চৌধুবীগণ চৌদ্দ চৌধুবীব একতর বংশীয় বলিয়া কথিত হয়।

এই চৌধুরী জমিদাবগণ আপাল (১) সবস্বতীর বংশ সম্ভূত। আপাল কুলজ্ঞ ছিলেন। ইহাব কৃলশাস্ত্রেব অভিজ্ঞতাই ভূসম্পত্তি লাভর প্রধান কাবণ।

(১০) জোয়াড়ী।– বড়ল নদীর তীরে। এই গ্রামে কতকগুলি সদ্বংশজাত বাবেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদাবগণের বাস। বৈদিক ব্রাহ্মণগণেরও একটী প্রধান সমাজ।

(১১) কলম।– বিলচলনের নিকট। বাজসাহী জেলায় এই গ্রামের ন্যায় বৃহৎ গ্রাম আব নাই। বহুতর কাঁশারী, কুমার ও জালিয়ার বাস। ইহা একটী বাণিজ্য স্থান। কলমেব বারইয়ারী কালীপূজা অতি প্রসিদ্ধ। অতি পূর্ব্বকালে এই গ্রামে প্রায় ৪০/৫০ ঘর ব্রাহ্মণ ছিলেন। প্রায় প্রত্যেক ঘরে সংস্কৃত চতুষ্পাঠী ছিল। অধ্যাপকগণ মধ্যে অনেক কবি ছিলেন। সংস্কৃতের আলোচনা এত বেশী ছিল যে কলম দ্বিতীয় নবদ্বীপ বলিয়া খ্যাত ছিল। রাজসাহীব জজ আদালতের প্রধান উকীল বাবু ভুবনমোহন মৈত্র মহাশয়ের বৃদ্ধ প্রপিতামহ রাধানাথ একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। দিঘাপতির রাজবংশেব আদি পুরুষ দয়াবাম রায়ের আদি বাস এই কলম গ্রামে ছিল।

(১২) সিংড়া।– নাগর নদী দুই দিক দিয়া গুড় নদীর সহিত একত্রিত হইয়াছে— এক দিকে তেমুখের নিকট, অপর দিকে তাজপুব দিয়া সিংড়ার নিকট। সিংড়া এই নদীর সঙ্গম স্থান। এই স্থানে পুলিশ ষ্টেশন। রামপুর বোয়ালীয়া হইতে বগুড়া পর্য্যন্ত যে রাজপথ আছে, তাহার এক পার্শ্বে পুলিশ ষ্টেসন। সিংড়া একটী বাণিজ্য স্থান। শালকাঠ এই স্থানে বিক্রয় হয় এবং এস্থানের হাটও প্রসিদ্ধ।

(১৩) চৌগ্রাম।– সিংড়া হইতে চারি মাইল উত্তর। এই গ্রামে চৌগ্রাম পরগণাব

(১) কেহ আবাল বলে। তাহিবপুবের বাজা ইন্দ্রজিতেব সহিত সুসঙ্গেব মল্লিক জানকীবল্লভেব কন্যাব বিবাহ হয়। এই বিবাহে আপাল কুলজ্ঞ মধ্যস্থ ছিলেন।

জমিদারের বাস। মহারাণী ভবানী কৃত যে "জাঙ্গাল" অর্থাৎ পথ ভবানীপুরের তীর্থ স্থান পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হয়, তাহা চৌগ্রাম হইতে এক প্রহরের পথ হইবে।

(১৪) পতিশর।– নাগব নদীর তীরে। কালীগাঁও পরগণাব জমিদারের সদর কাছারী। কলিকাতার ঠাকুর বাবুরা এই পরগণার জমিদার।

এই পতিশরের অনতিদূরে ১০১টা পুস্করিণী আছে। ইহা কথিত আছে যে মাতার উদ্ধার জন্য কোন ব্রাহ্মণ জমিদার এক দিবসে ১০১টা পুকুর খনন করেন। ইহার কোন কোনটীতে জল থাকে না। ১০১টা পুষ্করিণী এক দিবসে উৎসর্গ করাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

(১৫) কালীগঞ্জ।– নাগর নদীর তীরে। কুসুম্বী পরগণাব সদব কাছারী। এই পরগণা তাড়াশের জমিদারের অধিকৃত। এই স্থানের হাটও প্রসিদ্ধ। এই তাড়াশবংশীয় রামবায নাটোরের রাজার দেওয়ান ছিলেন।

(১৬) করচমাড়িয়া।– পতিশর বা কালীগঞ্জ হইতে প্রায় ২ মাইল দূর। বারেন্দ্র কায়স্থ জমিদার নিমাই সরকারের বাস ছিল। ইহার বংশধরেরা এক্ষণে রামপুর বোয়ালীয়াতে বাস করিতেছেন।

(১৭) কাশীমপুর।– যমুনা নদীব তীবে। এই গ্রামের চৌধুরীগণ চৌদ্দচৌধুরীর এক চৌধুরী বংশীয় বলিয়া পরিচিত। ইহারা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রধান কাপ। মৃত কালী লাহিড়ীর ভ্রাতুস্পুত্র বায় গিরীশচন্দ্র লাহিড়ী বাহাদুরের বাস স্থান। এ বংশও কাপ প্রধান। উত্তর বঙ্গ রেলওয়ে রাণিগঞ্জ স্টেশন হইতে প্রায় ৩ মাইল দূর।

(১৮) আটগ্রাম।– যমুনা নদীর তীরে। নিরাবিলপটীর শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের বাস। মহারাজা রামকৃষ্ণকে এই বংশ হইতে দত্তক গ্রহণ করা হয়।

(১৯) ভবানীপুর।– এই গ্রামের নিকট আত্রাই ও যমুনা নদীর সঙ্গম স্থান। উত্তব বঙ্গ রেলওয়ে আত্রাই ষ্টেসন হইতে ৩ মাইল দূর। এই গ্রামে বঙ্গজ শ্রেণী কায়স্থ জমিদাবগণেব বাস। ইহারা শূরবংশীয় কায়স্থ। ইহারা ভুলুয়ার রাজা লক্ষণ মাণিক্যের বংশধব বলিয়া পরিচয় দেন। রাজা লক্ষণ মাণিক্য দ্বাদশ ভৌমিকের এক ভৌমিক।

(২০) পাঁচুপুর।– গুড় নদীর তীরে। উত্তর বঙ্গ রেলওয়ে আত্রাই ষ্টেসন হইতে ২ মাইল দূর। এই গ্রামে অনেক ধনবান তিলির বাস। একটী বাণিজ্য স্থান। এই গ্রামে পুলিশ ষ্টেসন।

(২১) পাথাইল ঝাড়া।– এই স্থানে আত্রাই নদী যমুনা হইতে বিভিন্ন হইয়া খাজুরা দিযা প্রবাহিত। এই স্থানে কলিকাতা হাইকোর্টের জমির উদ্দীন দাস মোহিনীমোহন রায়ের আমরুল পরগণার সদর কাছারী ও ফরাশী একটী সাহেবের রেশম কুঠী আছে। ইহার অনতিদূরে আত্রাই রেলওয়ে স্টেশন এবং রেলীব্রাদর্সের পাটের কারবার স্থান।

(২২) খাজুরা।– আত্রাই নদীর তীরে কুলজ্ঞ গ্রন্থে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের যে সকল সমাজ আছে, তন্মধ্যে "খর্জ্জুরী" অধুনা খাজুরা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই গ্রামে অনেক ধনবান কুলীন ব্রাহ্মণগণের বাস।

(২৩) ইসলামগাঁতী।– গুড়নদীর তীরে। সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ জমিদারের বাস।

(২৪) গুড়নই।– বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের একটী প্রসিদ্ধ সমাজ। এই গ্রাম গুড়নদীর তীরে অবস্থিত বলিয়া, গুড়নই নামে খ্যাত। এই গ্রামের মৈত্রেয় বংশীয়েরা সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ।

(২৫) বিশা।– আত্রাই নদীর তীরে। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের একটী প্রসিদ্ধ সমাজ বলিয়া খ্যাত। কুলজ্ঞ গ্রন্থে এ গ্রাম "বিশাখ" বলিয়া পরিচিত।

(২৬) ডাঙ্গাপাড়া ।– আত্রাই নদীর তীরে। এই গ্রামের বারেন্দ্র কায়স্থ চৌধুরীগণ চৌদ্দ চৌধুরীর একতর বংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে অনেকে সুশিক্ষিত।

(২৭) বান্দাইখাড়া ।– আত্রাই নদীর তীরে। একটী বাণিজ্য স্থান। নওগাঁ ও মহকুমা স্থাপিত হওয়ার সমসাময়িক কালে বান্দাইখাড়া পুলীশ ষ্টেসন নওগাঁওতে উঠিয়া যায়।

(২৮) ক্ষেতর ।– গৌড়ে যাইবার সময় চৈতন্যদেব এইস্থানে অবস্থিতি করেন। তাঁহার স্মরণার্থ একটী মন্দির প্রস্তুত হয়, তাহাতেই গৌরাঙ্গের মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। প্রতি বৎসর একটী মেলা হয়। এই মেলায় বৈরাগীর সমাগমই বেশী। রাজপুরবোয়ালীয়ার পশ্চিম। এইস্থানে নরোত্তম ঠাকুরের মহোৎসব প্রসিদ্ধ।

(২৯) বাঘা ।– লালপুর (বিলমাড়িয়া) থানার অন্তর্গত। এইস্থানে একটী সুন্দর মসজিদ আছে। ইদের সময় এইস্থানে মেলা হয়। এই মসজিদ রক্ষাজন্য এবং অন্যান্য ব্যয় জন্য মোগলসম্রাট সাহজাহান বহুতর নিষ্কর ভূমি দান করেন। উদ্বৃত্ত আয় হইতে মুসলমান বালকদের ধর্ম্মশিক্ষা হয়।

(৩০) কুসুম্বী ।– মাঁদা থানার অন্তর্গত এবং কালীগাঁয়ের নিকট এই গ্রামে একটী পুরাতন জলাশয় আছে, উহার এক পার্শ্বে জঙ্গল মধ্যে একটী মন্দির আছে। ইহা কথিত আছে যে মজুমদার বংশীয় জনৈক হিন্দুর দ্বারা উহা নির্ম্মিত হয় এবং সেই হিন্দু মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করে। মন্দির প্রস্তরদ্বারা এরূপ ভাবে প্রস্তুত যে মন্দিরের গঠনে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ভাবই লক্ষিত হয়। এক্ষণ মুসলমানের মসজিদ বলিয়া পরিচিত। ইদের সময় সেস্থানে "কোরবাণী" হয়।

(৩১) পুঁঠিয়া ।– "দক্ষিণে নারদ, পূর্ব্বে মুষাখাঁ, উত্তরে হোজা, এই নদীত্রয়ের বেষ্টনের মধ্যে রাজসাহী জেলার প্রধান নগর রামপুর বোয়ালীয়ার ৮ ক্রোশ পূর্ব্বদিকে পুঁঠিয়া গ্রাম। বারেন্দ্র শ্রেণীর প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ ভূম্যধিকারী বংশের বসতির জন্য পুঁঠিয়া বিখ্যাত। চতুর্দ্দশ খৃষ্টাব্দের শেষ অথবা পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দের প্রথমেই পুঁঠিয়া রাজধানীর গঠন হয়। এই গ্রামে, রাজধানীর সংস্রবে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য এবং গোপ ইত্যাদি নবশাখের পুরুষানুক্রমিক বসতি আছে"। (১) রাজাদের কৃত অনেক দেবমন্দির ও দেবালয় স্থাপিত আছে এবং উচ্চশ্রেণী ইংরাজী স্কুলও আছে। এই গ্রামে অনেক শিক্ষিত লোকের বাস।

(৩২) গোদাগাড়ী ।– পদ্মানদীরতীরে। বর্গীর হেঙ্গামার সময় এই গ্রামে নবাব আলিবর্দ্দী বাস ভবন নির্ম্মাণ করেন এবং এই গ্রামে "কেল্লা বারুই পাড়া" নামে একটী দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। (২)

(৩৩) সুলতানগঞ্জ ।– পদ্মা ও মহানন্দার সম্মিলন স্থান। নবাব আলিবর্দ্দী এই গঞ্জ স্থাপিত করেন বলিয়া ইহার নাম "সুলতানগঞ্জ" হয়।

(৩৪) হরিণা ।– এই গ্রাম কলমের নিকট। এই গ্রামের ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা অর্দ্ধকালীর সন্তান বলিয়া পরিচিত। ইহারা মিতড়ার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বংশসম্ভূত। হিন্দু সমাজে ইহাদের সম্মান যথেষ্ট।

(১) মহারাণী শরৎসুন্দরীর জীবনচরিত।

(২) শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রের প্রণীত "সিরাজদ্দৌলা"।

চতুর্থ অধ্যায়

শিক্ষা, ডাকঘর, টেলিগ্রাফ অফিস ও রাস্তা

যে কোন বিষয় অভ্যাস করি কিম্বা অন্যের নিকট উপদেশ পাইয়া থাকি, তাহাকে শিক্ষা বলা যায়। আমরা জন্মগ্রহণ করিয়া কিছুই জানিতে পারিনা। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমরা প্রথমে মাতা পিতা, তদপর অন্যান্য মানবের নিকট হইতেও নানা উপায়ে ক্রমে নানা বিষয় অভ্যাস করিতে শিখি এবং উপদেশ প্রাপ্ত হই। এই নানা বিষয় এবং নানা উপদেশ বহুবিধ ভাষায় ও গ্রন্থে শিখিবার প্রয়োজন হয়। যেমন আহার না করিলে শরীর ক্রমে পুষ্ট, কান্তিযুক্ত ও বলশালী হয় না, তেমনই নানাবিধ বিষয়ের শিক্ষা ও উপদেশ লোক প্রমুখাৎ ও নানা ভাষার গ্রন্থে প্রাপ্ত না হইলে মানবের মানসিক প্রবৃত্তিগুলি পরিপুষ্ট, মার্জ্জিত বা কার্য্যক্ষম হয় না। অভ্যাস ও উপদেশের বলে মানব সংসারে শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত হয়। শিখিবার ইচ্ছা মানব হৃদয় মাত্রেই নিহিত রহিয়া আছে। সুতরাং কোন না কোন প্রকার শিক্ষা মানব প্রাপ্ত হয়। তবে কাল ও অবস্থা ভেদে সকল মানব সকল বিষয় শিক্ষা করিয়া শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত হইতে পারেনা। কেহ সংস্কৃত ভাষায়, কেহ গ্রিক ভাষায়, কেহ লাটীন ভাষায়, কেহ ইংরেজী ভাষায়, কেহ দর্শনশাস্ত্রে, কেহ জ্যোতিষ শাস্ত্রে, কেহ বিজ্ঞান শাস্ত্রে, কেহ অঙ্ক শাস্ত্রে, কেহ সাহিত্যে কেহ কৃষি বিদ্যায়, কেহ শিল্প কার্য্যে, কেহ স্থাপত্য বিদ্যায়, কেহ যুদ্ধ বিদ্যায়, কেহ সঙ্গীত বিদ্যায় পণ্ডিত হয়। এইরূপে মানবের শিক্ষা।

এই স্বাভাবিক শক্তি বলে পুরাকালে পিতা মাতা বালক বালিকাদের সমান ভাবে লেখা পড়া, জ্ঞান, ধর্ম্ম ও নীতি শিখাইবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন। মধ্য এসিয়া হইতে একদল আর্য্য জাতি ভারতবর্ষে আসিয়া বাস করে। এই আর্য্য জাতিরা ভারতবর্ষের আদিম বাসীদের অপেক্ষা অনেক সভ্য। এই আর্য্য জাতির ভাষা সংস্কৃত। আর্য্য সন্তানেরা, ধর্ম্ম, নীতি, রাজকার্য্য, ব্যবসায়, বাণিজ্য, কৃষি, শিক্ষা, যুদ্ধ বিদ্যা, সকল বিষয়ই বেশ ভাল জানিতেন এবং সংস্কৃত ভাষায় সকল বিদ্যা শিক্ষা দিতেন। এই সংস্কৃত একটি অতি প্রাচীন পবিত্র সম্পূর্ণ ভাষা। একজন ইউরোপীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত সংস্কৃত ভাষাকে কিরূপ উচ্চ আসন দিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত অংশে পরিচয় পাওয়া যাইবে। (১) সংস্কৃত অতি উৎকৃষ্ট ভাষা। "সংস্কৃত ভাষায় কি সরল, কি বক্র, কি মধুর, কি কর্কশ, কি ললিত, কি উদ্ধত, সর্ব্ব প্রকার রচনাই সমান সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়া উঠে" (২) পুরাকালে ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষা যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহা ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। ভারতের দর্শনশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, বিজ্ঞানশাস্ত্র, অঙ্কশাস্ত্র, স্থাপত্যবিদ্যা, সাহিত্য, বেদবেদান্ত প্রভৃতি উচ্চ শিক্ষার বলে আর্য্য ঋষিরা ভারতকে আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম, নীতি ও সভ্যতার শ্রেষ্ঠ আসনে উপনীত করিয়া গিয়াছেন। ভারতের ঋষি ও পণ্ডিতেরা আদিকাল হইতে ঐ দেব ভাষায় কথোপকথন ও লৌকিক ব্যবহার নির্ব্বাহ করিতেন। অতএব আদিম নিবাসীরাও ঐ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। বেদ হইতে মনু পর্যন্ত, মনু হইতে

(1) The Sanskrit language is"of a wonderful structure; more perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more exquisitaly Refined than either."- Sir W. Jones, Asiatic Researches, Vol. I.p. 422.

(২) হরিমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত সাহিত্য রত্নাবলী।

পুরাণ পর্য্যন্ত, পুরাণ হইতে তান্ত্রিক সময় পর্যন্ত, তান্ত্রিক সময় হইতে বৌদ্ধদের সময় পর্য্যন্ত, যেমন আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম, নীতি ও সভ্যতার পরিবর্ত্তন হয়, তেমনই সংস্কৃত ভাষারও বিস্তর পরিবর্তন হয়। অশোক রাজার রাজত্ব সময়ের একশত বৎসরেরও অধিককাল পরে প্রাকৃত ভাষার সৃষ্টি হয়। সংস্কৃত ভাষার অপভ্রংশে প্রাকৃত ভাষা রাজা বিক্রমাদিত্যের সময়ে প্রচলিত হয়। ঐ প্রাকৃত ভাষা হইতে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্ট হইবার সময় হইতে বা উহার ন্যূনাধিক একশত বৎসর পূর্ব্ব হইতেই, সংস্কৃত ভাষা সর্ব্বসাধারণের ভাষা বলিয়া পরিচিত ছিল না। তখন কথোপকথন আদি সংস্কৃত ভাষায় রহিত হইয়া তৎসময়ের প্রচলিত ভাষায় কথোপকথন আদি হইতে লাগিল। এখন বাঙ্গালা ভাষাতেই কথোপকথন আদি সম্পন্ন হয়।

এমন দুর্দ্দিনে ভারতের স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চারও হ্রাস হইতে লাগিল। সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চার হ্রাসে বঙ্গদেশে বাঙ্গালা ও যাবনিক রাজভাষার চর্চ্চার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বঙ্গদেশ যবনাক্রান্ত হওয়ার পরেও পাঠানদিগের রাজত্বকালে বাঙ্গালার সাহিত্য, দর্শন, নীতি ও ধর্ম্ম শাস্ত্রের যেরূপ উন্নতি হইয়াছিল তাহা চণ্ডী দাসের "পদাবলী," বিদ্যাপতির কবিত্ব, বসুবংশ গুণবাজ খাঁর 'শ্রী শ্রীকৃষ্ণ বিজয়," রূপ সনাতনের ধর্ম্মভাব ও সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থ, স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের স্মৃতিশাস্ত্র প্রণয়ন, "চিন্তামণি দীধিতি" প্রণেতা রঘুনাথ শিরোমণির ন্যায় শাস্ত্র বিচারের প্রাধান্য, মহাপ্রভু চৈতন্য দেবের সংস্কৃতে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রেম-ভক্তির তরঙ্গ, বৃন্দাবন দাসের "চৈতন্য ভাগবত," কৃষ্ণদাস কবিরাজের "চৈতন্যচরিতামৃত," উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী, পুরন্দর বসু ও পরমানন্দ রায়ের কুলশাস্ত্র প্রণয়নে প্রকাশ পাইতেছে এবং আজিও বঙ্গদেশকে গৌরবান্বিত করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু এ ভাব আর অধিক দিন স্থায়ী রহিল না। ক্রমে বঙ্গদেশ যবনের পদানত। রাজ দরবারে যবন ভাষারই প্রাধান্য। সুতরাং বঙ্গবাসীরা বিশেষতঃ কায়স্তেরা নিজ নিজ সন্তানকে মুসলমান রাজদরবারের কর্ম্মোপযোগী করিবার জন্য যখন ভাষা শিক্ষা দিবার যত্ন করিতে লাগিলেন। যবন ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ সন্তানেরা যবন ভাবাপন্নও হইতে লাগিলেন এবং মুসলমান ও কায়স্থের হস্তেই পারসী ভাষায় (যবন ভাষা) রাজকার্য্য নির্ব্বাহের ভার অর্পিত হইতে লাগিল। রাজসাহী বঙ্গদেশের অন্তর্গত; সুতরাং রাজসাহীতেও ঐ প্রথা প্রচলিত হইল।(১)

সেনবংশীয় রাজাদের সময়েও রাজসাহীতে ব্রাহ্মণগণ মধ্যে কেবল সংস্কৃত ভাষাই শিক্ষা হইত। মুসলমান রাজত্বকালেও যাঁহারা মুসলমান রাজদরবারে দাসত্ব করিবার প্রয়াসী হইতেন অথবা মুসলমান রাজদরবারের সংস্রবে থাকিবার আবশ্যক মনে করিতেন অথবা কোন কারণে বাঁধ্য হইতেন, তাঁহারা সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও পারস্য ভাষা শিক্ষা করিতেন। বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত ভাষার একটী শাখা বিশেষ। (২) এই বাঙ্গালা ভাষা প্রাকৃত ভাষাসম্ভূত। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে বাঙ্গালা ভাষা বর্ত্তমান কালের ন্যায় উন্নতি লাভ করিয়াছিল না। সংস্কৃত মৈথিল, কান্যকুজ, হিন্দি, পারসী প্রভৃতি মিশ্রিত বাঙ্গালাই বেশী প্রচলিত ছিল। রাজসাহীতে রাজা, জমিদারের বাসই বেশী; অতএব রাজভাষা শিক্ষা দেওয়ারই বেশী প্রয়োজন হইয়া উঠে। তথাপি ইংরাজরাজত্ব সময় পর্য্যন্তও রাজসাহীতে বহুবিধ সংস্কৃত "চতুষ্পাঠী" ছিল। সাঁতুল,

(1) "In the parts of Hindoostan when the Mogul System was fully in the use of the Persian language has thrown public business into of Museulmans and Cayeta"- Elphenisone's History of India

(2) "The five Northern languages, those of the Punjab, Cononj, MB (or North Behar), Bengal and Guzerat are, as we may infer form Colebrooke branches of the Sauskrit altered by the mixture of * foreign words and new inflexions, much as Italian it form Latin"- The * Elphistones History of India, book III, Chaptar V.

তাহিরপুর, পুঁঠীয়া, নাটোর ও দিঘাপতিয়া বংশের রাজাদের রাজত্ব সময়ে তাঁহাদের রাজ্যে বিস্তর "চতুষ্পাঠী" ছিল এবং ঐ চতুষ্পাঠীগুলি রক্ষা জন্য রাজারা বহু অর্থ ও ভূমি ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়া গিয়াছেন। ইহার নিদর্শন এখনও রাজসাহীতে এবং অন্যান্য জেলার অনেক স্থানে বিদ্যমান আছে। ইহা কথিত আছে যে রাজসাহী প্রদেশের চতুষ্পাঠী রক্ষার জন্য মহারানী ভবানী বৃত্তি দান করিয়া যান এবং এই দান স্থির রাখিবার জন্য জেলার কালেক্টর সাহেবের সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত হয় যে, বার্ষিক রাজস্বের সহিত রাণীর বার্ষিক বৃত্তিদানের টাকা সংযোজিত হইল। বৃত্তিদানের টাকার সহিত নির্দ্ধারিত রাজস্ব মহারাণী ভবানী কালেক্টর সাহেব সমীপে বার্ষিক দাখিল করিবেন এবং কালেক্টর সাহেবযোগে চতুষ্পাঠীর পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারিত বৃত্তি পাইবেন। এই প্রকারে মহারাণীর জমিদারীর রাজস্ব বদ্ধিত হারে নির্দ্ধারিত হয়। কিন্তু এক্ষণে সে সকল চতুষ্পাঠী প্রায় না থাকায় এবং চতুষ্পাঠীর আদি পণ্ডিতের উত্তরাধিকারী জীবিত না থাকায় বা অন্য কোন কারণে মহারাণী ভবানীর প্রদত্ত বৃত্তি রহিত হইয়া গিয়াছে। (১) ইহার বিস্তৃত বিবরণ যথাস্থানে লিখিত হইবে।

এই সময় সাধারণ বাঙ্গালা শিক্ষার জন্য স্থানে স্থানে "সরকার" (যাহারা পরে "গুরুমহাশয়" বলিয়া পরিচিত) জমিদারী ও মহাজনী কার্যানির্ব্বাহ উপযোগী শিক্ষা দিতেন। জমিদারের পাটওয়ারী, আমান, শুমারনবীশ, জমানবীশ প্রভৃতিও পাঠশালার কার্য্যও নির্ব্বাহ করিতেন। গুরুমহাশয়ের মাসিক ৫ টাকার বেশী আয় ছিল না। স্বতন্ত্র পাঠশালা গৃহ ছিল না। গুরুমহাশয় নিজগহে, কি কোন চণ্ডীমণ্ডপে, কি কাহার বৈঠকখানার পাঠশালার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, হুগলী, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলার ন্যায় রাজসাহীতে প্রকৃত উপযুক্ত "গুরুমহাশয়ের" পাঠশালার প্রথা প্রচলিত ছিল না। এ প্রণালীর শিক্ষা রাজসাহীতে নিতান্ত কম ছিল।

উপরের লিখিত চতুষ্পাঠীতে দর্শনশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, বিজ্ঞানশাস্ত্র, অঙ্কশাস্ত্র, সাহিত্য, ব্যাকরণ এবং কোন কোন স্থানে বেদ বেদান্ত পড়ান হইত। সেকালের রাজসাহীর পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে পুঁঠিয়া রাজবংশের আদিপুরুষ জ্যোতিষশাস্ত্রবেত্তা বৎসাচার্য্য, রাজা কংসনারায়ণের আদিপুরুষ পুরুষোত্তম বেদান্তী এবং তাঁহার সহোদর কুল্লকভট্ট (২) ও উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর পাণ্ডিত্যে রাজসাহীর গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে তাহার আর সন্দেহ নাই। কুল্লুক স্বকৃত মন্বার্থ মুক্তাবলী নামক টীকায় কেবল যে তাঁহার বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য ও স্থির গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন এমত নহে; একজন সংস্কৃতজ্ঞ ইউরোপীয় পণ্ডিত ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশান্তর্গত টীকাকারগণ মধ্যে কুল্লুককে সর্ব্বোচ্চ আসন দিয়াছেন। ইহা রাজসাহী প্রদেশের পক্ষে অসীম

(1) "The Ranee Bhowani is stated to have been the founder of all the endowments refered to, and the mode that she adopted of giving effect her wishes was to arrange with the Colleetor of the District for a fixed useg the annual assessment to which her estates were liable, the in use bing eaual to the various endowments which she established and cash were to be paid in perpetuity through the Collector Her estates, it is puted, thus became burdened with a permanent increase of annual assess. to Government, which increase continues to be paid from the successive or of the estates to whom they have descended or by whom they have been lehaned, while the endowments have been discontinued to the heirs and essentative of those on whom they were originally bestowed "- Adam's report on Education.

(২) কুল্লুক ভট্ট গুয়াকারায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি মৌনভট্টির বংশ সম্ভূত কুল্লুকভট্ট সম্বন্ধে Sir W Jones বলিয়াছেন :— "At length appeared Kullaha Bhattya a Brahmin of Bengal, who after a painful course of study, and the colla of numerous manuscripts produced a work, of which it may, peaha-pa be very truly, that it is the shortest yet the most luminous, the least ostertal yet the most learned, the deepest yet the most agreeable commertary imposed on any author ancient or modern, European or Asiatic"

গৌরবের কথা। এস্থলে আর কতকগুলি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের গুণকীর্ত্তন করা প্রয়োজন বোধ করিলাম। যে যে পণ্ডিতগণ রাণী ভবানী প্রদত্ত দানপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং হইতেছেন তাহারও কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা যাইবে।

থানা চৌগ্রামের অন্তর্গত তাজপুর গ্রামে একটী প্রসিদ্ধ চতুষ্পাঠী ছিল। উহার অধ্যাপক শ্রীপতি বিদ্যালঙ্কার ছিলেন। এই চতুষ্পাঠী রক্ষাজন্য মহারাণী ভবানী বাষিক ৯০ টাকা দান করিতেন। শ্রীপতি বিদ্যালঙ্কারের মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র চন্দ্রশেখর তর্কবাগীশ ঐদান ভোগ করেন। আবার চন্দ্রশেখবের পরলোক গমনপর, তাঁহার তিন পুত্র কাশীশ্বর বাচস্পতী, গোবিন্দরাম সিদ্ধান্ত এবং হররাম ভট্টাচার্য্য ঐ বৃত্তির উত্তরাধিকারী হন। ইহাদের বৃত্তি রহিত হইলে রেভিনিউ বোর্ডের অনুরোধক্রমে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে বৃত্তি দিবার জন্য গবর্ণমেন্ট আদেশ করেন। কিন্তু এক্ষণে বৃত্তি রহিত হইয়া আছে।

প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে রাজসাহী জেলার অন্তর্গত আদদিঘার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বংশে পণ্ডিতপ্রবর গদাধর ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। বগুড়াব নিকট কোন একটী গ্রামে গদাধরের জন্ম হয়। ইনি রাজসাহী ত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে বাস করেন। নবদ্বীপে বিখ্যাত পণ্ডিত প্রবর ভুবন বিদ্যারত্ন ধরের বংশসম্ভূত। গদাধর ন্যায়শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিবাদ ও শক্তিবাদ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই সকল গ্রন্থ বঙ্গদেশের ন্যায়শাস্ত্রের চতুষ্পাঠীতে আদরের সহিত প্রচলিত আছে।

প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে রাজসাহী জেলার অন্তর্গত বুড়িরভাগ গ্রামে পুরুষোত্তম দেব তর্কালঙ্কার জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পাণিনি ব্যাকরণের বৃত্তি প্রস্তুত করেন। ঐ বৃত্তি 'ভাষা বৃত্তি" নামে প্রসিদ্ধ। বেলঘরিয়া নিবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত প্রবর শিবচন্দ্র সিদ্ধান্ত অতি শ্রদ্ধার সহিত উক্ত "ভাষা বৃত্তি" অধ্যয়ন করেন এবং তাঁহার নিজ চতুষ্পাঠীতে প্রচলিত করিয়া ছাত্রবৃন্দদের রীতিমত শিক্ষা দিতেন। পালিনি ব্যাকরণ অতি প্রাচীন গ্রন্থ। (১) এই ব্যাকরণ অত্যন্ত দুরূহ অথচ সম্পূর্ণ। ইহাতে শব্দ, ধাতু, বিভক্তি, প্রত্যয, সন্ধি, সমাস প্রভৃতি যেরূপ বিস্তৃতভাবে লিখিত আছে, সেরূপ কোন ব্যাকরণে লিখিত হয় নাই। এই ব্যাকরণ সুচারুরূপে অধ্যয়ণ করিলে, সংস্কৃত ভাষার শিক্ষাও উৎকৃষ্ট হয়। বেদের ভাষা এত কঠিন, যে অনেক শব্দের বা পদের ব্যাখ্যা পাণিনি ব্যাকরণের সাহায্য ব্যতিরেকে করিতে পারা যায় না। বেদের ভাষা শিক্ষার জন্য পাণিনিতে একটী পরিচ্ছেদ আছে। "ভাষা-বৃত্তি" প্রণয়নে এই দুরূহ ব্যাকরণ শিক্ষার এত সুবিধা হইয়াছিল এবং তাহাতে তর্কালঙ্কার এত বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিল যে শিবচন্দ্রের ন্যায় বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত অবশ্যই গ্রন্থের সমাদর করিবেন।

রাজসাহী জেলার অন্তর্গত মাটিকোপা গ্রামে রমানাথ তর্কপঞ্চানন জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি একজন প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন। ইহার প্রণীত কোন গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায় না। ইনি মহারাণী ভবানীর সময় বর্ত্তমান কেয়া উঁহার বৃত্তি ভোগ করিতেন।

রাজসাহী জেলার অন্তর্গত নাটোরের নিকট আমহাটী গ্রামে কালিকাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী নামে নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত জনৈক ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করেন। এই রাজসাহী জেলার মাটিকোপা গ্রামের প্রসিদ্ধ চতুষ্পাঠীতে তিনি অধ্যয়ন করেন। ইহাঁরই একজন অধস্তন সন্তান গদাধর সিদ্ধান্ত পাণিনি ব্যাকরণে এবং স্মৃতিশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া উঠেন। ইনি ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে প্রাতঃস্মরণীয় মহারাণী ভবানীর অনুগ্রহে নিজ বাটী আমহাটীতেই একটী চতুষ্পাঠী স্থাপিত করেন,

(1) "Panni he earliest extant writer on the Grammar, is so anciant as the mixed up with the fabulous ages His works and those of his successors eatablished a system of grammar the most complete that ever was emblemed in arranging the elements of human speech"- Ebbanisone's History idia, book III, Chapter V.

এবং মাসিক ১০ টাকা বৃত্তি ব্যতীত সেকালে মহারাণীর নিকট হইতে প্রভূত সাহায্য প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহার প্রণীত কোন গ্রন্থ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। তাঁহারই পৌত্র শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় মহারাণী প্রদত্ত মাসিক ১০ টাকা বৃত্তি এখনও বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রাপ্ত হইতেছেন এবং পূর্ব্বপুরুষের অক্ষয় কীর্ত্তি স্থির রাখিয়াছেন।

রাজসাহী জেলার অন্তর্গত নাটোরের নিকট আমহাটী গ্রামে কাশীকান্ত ন্যায় পঞ্চানন নিজ বাটীতে এক চতুষ্পাঠী স্থাপিত করেন। তাঁহার চতুষ্পাঠীতে মহারাণী ভবানী মাসিক ১০ টাকা বৃত্তি দান দিতেন। ন্যায়পঞ্চানের পরলোক গমনের পর বৃটিশ গর্ব্বর্ণমেণ্ট আমলে ঐ বৃত্তি বহিত হয়।

রাজসাহী জেলার অন্তর্গত চৌগ্রামেব নিকট "বেড়ে" গ্রামে রুদ্রকান্ত ছট্টাচার্য্যের এক চতুষ্পাঠী ছিল। এই চতুষ্পাঠীতে মহারাণী ভবানী মাসিক ৫ টাকা বৃত্তি দিতেন। ভট্টাচার্য্যের পরলোক গমনের পর বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আমলে ঐ বৃত্তি রহিত হয।

রাজসাহী জেলার অন্তর্গত পুঁঠিয়া নিবাসী ঈশানচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ সংস্কৃত সাহিত্য ও ব্যাকবণে একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার প্রণীত কাব্য চন্দ্রিকার টীকা অতি প্রসিদ্ধ।

প্রায় ৬০/৭০ বৎসর পূর্ব্বে রাজসাহী জেলার অন্তর্গত বেলঘরিয়া গ্রামে শিবচন্দ্র সিদ্ধান্ত নামে একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন। ইহার নাম শিব আবার আকৃতিতেও ঠিক শিবের ন্যায় ছিলেন। স্বদেশে সাহিত্যে, ব্যাকরণ, স্মৃতি প্রভৃতি অনেক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পুঁঠিয়ার রাজা নারায়ণ রায়ের সাহায্যে নিজ পুঁঠিয়াতেই চতুষ্পাঠী স্থাপিত করেন। শিবচন্দ্র একজন শ্রুতিধর ছিলেন এবং পাঠাবস্থা হইতে তাহার অতিশয়-সুমিষ্ট ও পবিত্র শ্লোক রচনা করিবার শক্তি হয়। নানা শাস্ত্র অধ্যায়ন করিয়াও শিবচেন্দ্রর জ্ঞান পিপাসার শান্তি হইল না। ব্রাহ্মণের বেদ বেদান্ত শিক্ষাই প্রধান। অতএব বেদবেদান্ত অধ্যয়ন জন্য টোল ত্যাগ করিয়া তিনি বারাণসী ধামে গমন করেন। তথায় তিনি অনেকদিন বেদাদি অধ্যায়ন করিয়া একজন বেদজ্ঞ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হন। বারাণসী হইতে প্রত্যাগমন করিয়া নিজ জন্মস্থান বেলঘরিয়া গ্রামেই তিনি চতুষ্পাঠী করিলেন। ইনি বেদান্ত আদি নানা শাস্ত্রে একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। ইহার কবিতা ও বিচারশক্তি অতি প্রশংসনীয়। লেখক অনেক বার ইহার শাস্ত্র বিচার সময় কোন কোন সভায় উপস্থিত ছিল। ইহার শাস্ত্রীয় বিচার প্রণালী অতি সুন্দর এবং ন্যায়সঙ্গত। ইনি অনেকগুলি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রসিদ্ধ।

(১) সিদ্ধান্ত চন্দ্রিকা, (২) সুধাসিন্ধু, (৩) কাশিনী নাম্নী রুদ্রাধ্যায়ের টীকা, (৪) বিদ্বন্মনোরঞ্জন কাব্য, (৫) বাসুদেব বিজয় কাব্য, (৬) কালীয়দমন কাব্য। এই সকল গ্রন্থগুলি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ মত খণ্ডন করিয়া শিবচন্দ্র যে "বিধবা বিবাহ খণ্ডন পুস্তক লিখেন, সেই পুস্তক পাঠে ইহা বেশ প্রতীত হয় যে তিনি নানা শাস্ত্রে একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। আবার কাব্যাদিতেও তিনি বেশ রসিকতার পরিচয় দিয়াছেন। (১)

রাজসাহী জেলা ব্যতীতও অন্য জেলার সংস্কৃত চতুষ্পাঠীতে মহারাণী ভবানী বৃত্তি দিয়া যশস্বিনী হইয়াছেন। বীরভুম জেলার একটী পণ্ডিত রাণী ভবানী প্রদত্ত বার্ষিক ১০০ টাকা বৃত্তি পাইতেন। রাণীর মৃত্যুর পর বৃত্তি রহিত হয়। (২)

(1) "Ramkanto Sarvabbom, a logician and Siva Chandra Sidhanta, a Vedantic, both highly reputed and both apparently profound in the branches of learning to which they have devoted themselves"- Mr Adam's Report on Education

(2) In the District of Bearbhoom, "one teacher now dependent on occasional presents, formarly had an annual allowance of Rs 100 from Rani Bhowani which has been discontinued since her death "- Adam's Report on Education "

যে সময়ে মহাত্মা আডাম সাহেব রাজসাহীর শিক্ষা বিষয় অনুসন্ধান করেন, সে সময়ে চতুষ্পাঠীর পণ্ডিতগণের এই বিশ্বাস ছিল যে শিক্ষার উন্নতি জন্য গবণমেণ্ট পক্ষ হইতে অনুসন্ধান হইতেছে এবং গবর্ণমেণ্ট কিছু করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। এই পণ্ডিতগণ অতি সরল, বাসগৃহ ও পরিচ্ছদ নিতান্ত সামান্য; কিন্তু তাহারা পাণ্ডিত্যে ও মন পবিত্রতায় উচ্চাসন প্রাপ্ত হন। আডাম সাহেব পণ্ডিতগণকে ইংল্যান্ডের এবং স্কটলণ্ডের কৃষকদের ন্যায় অসভ্য বলিয়াও তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করিয়াছেন। কোন কোন বিষয়ে আমরা অডাম সাহেবের সহিত ঐক্য হইতে পারি না। বিদেশীয়ের চক্ষুতে পণ্ডিতগণ পরিচ্ছদে ও বাসগৃহে অসভ্য হইতে পারে; কিন্তু তাঁহাদের সংস্কৃতের ভাষায় ও ব্যাকরণের পাণ্ডিত্যে; দর্শন ও ন্যায় শাস্ত্রের গবেষণার ও বেদের তত্ত্বানুসন্ধানে ধর্ম্মের ও জ্ঞানের জ্যোতিঃ সর্ব্বত্র বিকীর্ণ করিয়াছে এবং যাহারা ধর্ম্ম ও জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ, তাহারাই প্রকৃত সভ্য। গৃহ ও পরিচ্ছদ বাহ্যিক সভ্যতার লক্ষণ। ধর্ম্ম ও জ্ঞানই আভ্যন্তরিক সভ্যতার লক্ষণ। নিম্নে উদ্ধৃত অংশ পাঠে আডাম সাহেবের মত জানা যাইবে। (১)

মহারাণী ভবানীর রাজত্বের পরে কিছু দিন রাজসাহীতে সংস্কৃত চর্চা বিলুপ্ত প্রায় দেখা যায়। কিন্তু এই উনবিংশতি শতাব্দীর প্রারম্ভে শিবচন্দ্র সিদ্ধান্তের বেদবেদান্তের জ্ঞানে রাজসাহীর নষ্ট গৌরবকে কিয়দংশে উদ্ধার করিয়াছিল। অধুনা রাজসাহীতে সেরূপ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের অভাব। রাজসাহী আর সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের গৌরব করিতে পারে না।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে প্রাকৃত ভাষা বাঙ্গালা ভাষার জননী। সংস্কৃত ভাষার অপভ্রংশে প্রাকৃত ভাষার সৃষ্টি। রাজা বিক্রমাদিত্যের সময়ে প্রাকৃত ভাষা প্রচলিত ছিল। ক্রমে পরিবর্ত্তনে বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি হয় এবং ভাষার সঙ্গে সঙ্গে দেবনাগর অক্ষর হইতে বাঙ্গালা অক্ষরেব উৎপত্তি হয়। বঙ্গভাষার আদি গ্রন্থকার কে তাহা নির্ণয় করা নিতান্ত কঠিন। কিন্তু মহাপ্রভূ চৈতন্য দেবের আবির্ভাবের প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস নিজ নিজ গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাদের গ্রন্থাবলী বঙ্গভাষার আদিগ্রন্থ বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। কেহ কহ বলেন লাউসেনের মনসার গানই আদিগ্রন্থ। ১৪৮৫ খৃস্টাব্দে চৈতন্যদেবের জন্ম হয় এবং ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অন্তর্দ্ধান হয়। তাঁহাব সময় হইতেই বঙ্গভাষার অনেক পরিবর্ত্তন হয়। কিন্তু সেকালে এই বঙ্গভাষার উন্নতিস্রোত রাজসাহীতে প্রবাহিত হয় নাই। চৈতন্যদেব গৌড়ে গমনকালে রাজসাহীস্থ এক ক্ষুদ্র অংশমাত্র স্পর্শ করেন। রাজসাহীতে তান্ত্রিক মতেরই প্রাধান্য স্থাপিত হয়। সুতরাং চৈতন্যেব প্রেম জলদক্ষরে প্রকাশ করিবার জন্য রাজসাহীর ব্রাহ্মণ

(1) "All were willing to believe and desirous to be assured that Government intended to do some thing, as the fruit of the present enquiry, for the promotion of learning,- a duty which is in their minds constantly associated with the obligations attaching to the rulers of the country The humblene and simplicity of their characters, their dwellings and their apparel, Forcibly contrast with the extent of their acquirements and the refinement of their feelings I saw men not only unpretending, but plain and simple in their manners, and although seldom, if ever offensively course, yet reminding me of the very humblest classes of English and Scotish peasantry living constantly half naked and realizing in this respect descriptions of savage life, inhabiting lets which if we conneet moral consequences with plysical causes, might be sepposed to have the effect of stunting the growth of their minds, or in which only the most contracted minds might be supposed to have room to dwell- and yet several of these men are adopts in the sublities of the profoendest grammar of what is probably the most philosophical language in existence, but only prnctically skilled in the Niceties of its usage, but also in the principles of its structure, familiar with all the varieties and applications of their national laws and literature and indulging in the abstrusest and most interesting disquisitions in logical and ethical philosohy. They are in general shrewd, discrinminating and mild in their demeanor "- Adam's report on Education.

মধ্যে তাঁহার কোন শিষ্যের নাম পাওয়া যায় না। তাঁহার প্রধান প্রধান শিষ্যগণ বঙ্গভাষার বিস্তর উন্নতিসাধন করিয়া যান। গোবিন্দ দাস, জীব গোস্বামী, রূপসনাতন প্রভৃতির লেখনীতেই বঙ্গভাষা উন্নতশালিনী হয়। এই শিষ্য সম্প্রদায় মধ্যে "চৈতন্যদেবের ৮২ বৎসর পরে রাজসাহী জেলার অন্তর্গত বুধরী গ্রামে বৈদ্য জাতীয় পরমানন্দ গুপ্তের ঔরসে এক গোবিন্দ দাস জন্মগ্রহণ করেন।" (১) ইহাঁর প্রণীত গ্রন্থের নাম পদমালা। ইহার পদাবলী বাঙ্গালা ও হিন্দীভাষায় মিশ্রিত। এই গোবিন্দদাসের পর রাজসাহীতে কোন প্রসিদ্ধ বঙ্গকবির পরিচয় পাওয়া যায় না। একখণ্ড "উৎসাহে" রাজসাহীর প্রাচীন গ্রাম্য কবিতার নিদর্শন পাওয়া যায়। ঐবিষয় যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। "জয়গোবিন্দ গোস্বামী মহাশয়ের বাড়ী নাটোরের নিকটবর্ত্তী বাজুরভাগ গ্রামে ছিল। হাস্যরসের কবিতায় ইনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এদেশে তাঁহার রচিত অনেক কবিতা মুখে মুখে প্রচলিত আছে। তাঁহার যে সকল কবিতা আমি সংগ্রহ করিয়াছি তন্মধ্য হইতে হারু নাপিতের কবিতা পাঠাইলাম। অনুমান ৩০ বৎসর হইল ইহার প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে। রাজসাহীর অন্তর্গত উঁপেলসর গ্রামে গোস্বামী মহাশয় তাঁহার ভগিনীর বাড়ীতে গিয়াছিলেন। হারু নাপিত তাঁহাকে যেরূপ ক্ষৌরি করে তাহাতে তিনি নরসুন্দরজিকে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন।"

উঁপেলসরের নরসুন্দর নামটী তার হারু।
পাশস্পর্শ্বের যত নাপিত সকল হতে মারু ॥
লোক মুখেতে নাম রটিল শব্দ গেল দূরে।
নিত্য রুধির ভোজন করে হারুনাপিতের ক্ষুরে ॥
ক্ষুর হয়েছে কালের খাঁড়া সর্ব্বলোকের হন্তা।
নরুণ নিলে জ্ঞান যেন ভালুকের হাতে খন্তা।"

বিস্তার হইবে বিধায় কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল। ইহাতে প্রাচীন গ্রাম্যকবিতা এবং সেকালের গ্রাম্যভাষার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

এই উনবিংশতি শতাব্দীর শেষভাগে "রাজসাহী নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণদাস জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকার সম্পাদক থাকিয়া রচনা-শক্তির বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। তৎপ্রণীত সভ্যতার ইতিহাস একখানি প্রশংসার্হ গ্রন্থ।" (২) "জ্ঞানাঙ্কুর" বঙ্গদর্শনের ন্যায় প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকা ছিল। এই পত্রদ্বারা বঙ্গভাষার বিস্তর উপকার সংসাধিত হইয়াছে। এই জ্ঞানাঙ্কুরে নূতন নূতন বিষয় লিখিত হইত এবং অনেক অজ্ঞাত ও অশ্রুতপূর্ব্ব তত্ত্বের আবিষ্কার ও আলোচনা হইত। কিন্তু এইরূপ উন্নতশালী পত্রিকার অকালমৃত্যুতে রাজসাহীর নিতান্ত দুর্ভাগ্য। রামপুর বোয়ালীয়া হইতে ২/৩ বৎসর হইল "উৎসাহ" নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। এই পত্রিকায় নূতন বিষয় অতি সুন্দর ভাষায় লিখিত হইতেছে। "উৎসাহ" অতি প্রশংসনীয় পত্রিকা। বোয়ালীয়াতে "হিন্দু রঞ্জিকা" নামে এক প্রাচীন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে। এস্থলে বলিহারের রাজা কৃষ্ণেন্দ্র রায়ের নাম উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি রাজা এবং স্কুল বা কলেজে রীতিমত শিক্ষা প্রাপ্ত না হইয়া নিজ অধ্যবসায়ে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করেন। "সুখভ্রম," "সীতাচরিত," "এখন আসি" ও "স্বভাব নীতি" প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। প্রথম দুইখানি পদ্যে এবং শেষ দুইখানি গদ্যে রচিত। তাঁহার কবিতা লিখিবার শক্তি যে একবারে ছিল না তাহা আমরা বলিতে পারি না। রাজসাহী জেলার অন্তর্গত তাহিরপুরের নিকট

(১) হরিমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত "সাহিত্য রত্নাবলী"
(২) হরিরঞ্জন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত "সাহিত্য মৃত্যুবলী।"

শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়ের জন্মস্থান। ইনি একজন সুলেখক। ইহার প্রণীত গ্রন্থগুলিও প্রশংসনীয়।

রাজসাহীতে চিকিৎসা বিদ্যালয়েরও অভাব ছিল না। বৈদ্যজাতিরা সংস্কৃত ভাষায় এই বিদ্যাশিক্ষা করিত। বৈদ্য বেলঘরিয়া, হাজরা-নাটোর, হরিদা-খলসী ও থাঐপাড়া গ্রামের চিকিৎসা বিদ্যালয়ই প্রসিদ্ধ। আডাম সাহেব বলেন যে সময়ে ২৯৭ জন ধাত্রী ছিল। "তাহারা অনভিজ্ঞ ছিল না।"(১)

ইংরাজ রাজত্বের অব্যবহিত পূর্ব্বে রাজসাহীতে উচ্চজাতীয়দের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা এবং কোন কোন স্থলে পারশ্যভাষা শিক্ষা ভিন্ন সাধারণ প্রজাগণের কোন প্রকার বিদ্যাশিক্ষার সুবন্দোবস্ত ছিল না। নিম্নশ্রেণী হিন্দুদের মধ্যে পাটওয়ারী, তহশিলদার বা আমিনের কার্য্য জন্য কোন কোন ব্যক্তি শিক্ষিত হইত এবং এই শ্রেণীর লোকেরাই প্রায় পাঠমালার কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। উচ্চজাতীয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে এরূপ শিক্ষার প্রচার একবারে যে ছিল না তাহাও বলা যায় না।

স্বাধীন পাঠানদিগের সময়ে বঙ্গদেশে রঘুনন্দন, কুল্লুকভট্ট, চৈতন্যদেব প্রভৃতি প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু মোগল সম্রাটের অধীনে বাঙ্গালার সুবাদারদের সময়ে ঐ রূপ প্রতিভাশালী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন নাই। এই বঙ্গেশ্বরদের সময়ে মুকুন্দরাম, কাশীদাস, ভারত চন্দ্র প্রভৃতির জন্ম হইলেও, তাঁহারা রঘুনন্দন, কুল্লুকভট্ট, চৈতন্যদেব প্রভৃতির সমকক্ষ হইতে পারে না। মোগল রাজস্ব সময়ে প্রজাগণের শিক্ষায় কোন সুবন্দোবস্ত ছিল না। সে সময়ে সংস্কৃত ভাষার যে উন্নতি দেখা যায়, তাহা হিন্দু জমিদারগণের টোল, চতুষ্পাঠীতে ভূমি ও অর্থ দানের ফল। এ সময় যবন রাজার শিক্ষা বিস্তারের যত্ন ছিল না। আবার মোগল সম্রাট বঙ্গদেশ হইতে বহুদূরে বাস কবেন এবং সুবাদারগণই বঙ্গদেশের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা। সুবাদারগণের অধীনে জমিদারগণের ক্ষমতাও প্রচুর। বঙ্গের সুবাদার ও জমীদারগণ নিজ নিজ রাজ্য শাসনে ব্যস্ত। প্রজার শিক্ষা দিবার জন্য ব্যস্ত নহে। এইরূপ অবস্থায় মুসলমান রাজত্বের শেষ সময় এবং ইংরাজ অধিকারের কেবল প্রারম্ভে বাজ্য শাসনের সুবন্দোবস্ত না হওয়া পর্যন্ত জমিদাবগণের ও মহাজনগণের অত্যাচার বৃদ্ধি হইল, চুরী ডাকাইতি বেশী হইতে লাগিল; স্থানে স্থানে দস্যু দলের সৃষ্টি হইতে লাগিল; আবার নবাগত পুলিশের দারগা, জমাদার, বরকন্দাজগণের অত্যাচারে প্রজাগণ অস্থির হইয়া পড়িল। চোর ডাকাইতের অত্যাচারও বরং ভাল; কিন্তু আবার দারগা, জমাদার ও বরকন্দাজগণকে উৎকোচ দেওয়া নিঃস্ব প্রজার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিল। সাধারণ অশিক্ষিত প্রজাগণ আরো বেশী অস্থির হইল। জমিদারগণের অত্যাচারে, মহাজনের পীড়নে, পুলিশের শাসনে প্রজাগণ ভীত হইতেছিল কেন? সুবাদারের অশ্বারোহী, জমিদারের সিপাহী, পুলিশের লাল পাগড়ী ও চাপরাশ দেখিয়াই সে সময় প্রজাগণ ঘরে লুকাইতে লাগিল কেন? এ সময় সাধারণ প্রজাগণের এত আতঙ্ক হইয়াছিল কেন? সর্ব্বসাধারণ প্রজাগণের মূর্খতা এবং অনভিজ্ঞতাই ইহার প্রধান কারণ। প্রজাগণকে শিক্ষিত করিলে, তাহারা সমুদয় বুঝিতে পারিবে এবং অন্যায় অত্যাচারের দায় হইতে মুক্তি পাইবার জন্য রাজদ্বারে উপস্থিত হইবার সাহসী হইবে। ইংরেজ গবর্ণমেন্টের রাজস্বের প্রারম্ভেই এই কথার আন্দোলন উপস্থিত হইল। প্রজার দুঃখ সমূহ তৎকালিক বৃটিশ রাজপ্রতিনিধির কর্ণগোচর হইল। কি উপায়ে সাধারণ প্রজাকে শিক্ষা দেওয়া যায় তাহার যুক্তি হইতে লাগিল।

এইরূপ যুক্তি হইতে হইতে কিছুকাল অতীত হইল। এই কাল মধ্যে হেষ্টীংসের সময়

(1) Mr Adam's Report on Education

কলিকাতায় মাদ্রাসা স্থাপিত হয় এবং ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে "এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল" নামক প্রসিদ্ধ সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার চারিবৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে মিঃ মে-নামক একজন মিশনরী প্রথমে চুঁচুড়ায় বাঙ্গালা স্কুল স্থাপিত করিবার সূত্রপাত করেন। বঙ্গদেশে শিক্ষা বিস্তারের এই সূত্রপাত হইল। বড়লাট লর্ড আমহার্স্ট সময়ে দেশে দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য একটী কমিটী স্থাপিত হয়। তদপর বড় লাট বেন্টিক বিখ্যাত লর্ড মেকলে সাহেবের সহায়তায় এ দেশীয় প্রণালীতে শিক্ষা বিস্তাবের এরূপ ব্যবস্থা করেন যে, যাহাতে দেশীয় ভাষা অধিক শিক্ষা হয়। এই গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের আমলে দেশীয় লোকদের বিদ্যা শিক্ষা প্রণালী পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত হয়। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে বিলাতেব মহাসভাব আদেশ অনুসারে ভারতবাসীদের বিদ্যা শিক্ষার্থ এক লক্ষ টাকা ব্যয় নির্দ্ধারিত হয়। এই টাকা মঞ্জুব হওয়ার পর স্থানে স্থানে সংস্কৃত, পারস্য ও আরবীয় ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে লাগিল। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে ইংরেজী ভাষা ও ইউরোপীয় বিদ্যার অনুশীলন জন্য সকলেরই অনুরাগ ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই বিষয় শিক্ষা কমিটীর গোচর করা হইল। তদপর এ বিষয় গবর্ণর জেনেরল বাহাদুবের সভায় বাদানুবাদ হইয়া ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে এই স্থির হইল যে এদেশীয় লোকদের ইউরোপীয় বিদ্যা শিক্ষা দেওয়াই বৃটিশ গবর্ণমেন্টের প্রকৃত উদ্দেশ্য। সুতরাং ইতঃপূর্ব্বে ভারতবাসীদের বিদ্যা শিক্ষার জন্য যে এক লক্ষ টাকা মঞ্জুব হইয়াছে, তাহা এই ইউরোপীয় শিক্ষার জন্য ব্যয় হইবে। কিন্তু এই নিয়ম হইবার পূর্ব্বে সংস্কৃত, পারস্য ও আরবীয় ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য যে সকল বিদ্যালয় স্থাপিত হয়িাছে, তাহাদের ব্যয় গবর্ণমেন্ট স্বতন্ত্র দিবেন।

এইরূপ প্রণালীতে কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানীয় লোকদের সন্তানগণের বিদ্যা শিক্ষারই সুবিধা হইল। জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে প্রজাগণকে শিক্ষিত না করিতে পাারিলে পূর্ব্বের লিখিত অত্যাচার হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করা কঠিন। অতএব ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে দেশীয় শিক্ষার প্রকৃত অবস্থা প্রত্যেক জেলায় কিরূপ জানিবার জন্য এবং প্রথমে কি উপায়ে দেশীয় শিক্ষা সর্ব্বত্র বিস্তার করা যাইতে পারে, তজ্জন্য বড়লাট উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক, মহাত্মা উইলিয়ম এডাম সাহেবকে গবর্ণমেন্ট পক্ষ হইতে কমিশনর নিযুক্ত করেন। (১) এই প্রথমে জেলায় জেলায় দেশীয় শিক্ষা বিস্তারের সূত্রপাত হইল এবং রাজসাহী প্রজাপুঞ্জের সৌভাগ্য প্রসন্ন হইবারও সূত্রপাত হইল। মহাত্মা এডাম এই কার্য্যের উপযুক্ত পাত্র ছিলেন। তাঁহার রিপোর্ট বড়লাট বাহাদুর সমীপে পৌছিল, শিক্ষার সুব্যবস্থা হইবে। মহাত্মা এডাম দেখিলেন যে প্রত্যেক জেলার প্রত্যেক থানায় স্বয়ং যাইয়া দেশীয় শিক্ষা ও সামাজিক অবস্থার অনুসন্ধান করা নিতান্ত অসম্ভব। অতএব প্রত্যেক জেলার কোন একটী প্রধান থানা বা প্রধান নগরে স্বয়ং যাইয়া তথাকার দেশীয় শিক্ষা ও সামাজিক অবস্থার বিষয় সংগ্রহ করিয়া আদর্শ স্বরূপ সমস্ত জেলার শিক্ষা অবস্থা বুঝা যাইতে পারে। তাঁহার অনুসন্ধান এত পরিপক্ক ও গভীর ছিল যে প্রত্যেক জেলার শিক্ষার প্রকৃত অবস্থা স্থির করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই প্রণালী অনুসারে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে এডাম সাহেব স্বয়ং রাজসাহী আসিয়া নাটোরকে আদর্শ স্বরূপ নির্দ্দেশ করিলেন। নাটোরে প্রথমে রাজসাহী জেলার সদর অফিস ছিল এবং এক্ষণে রাজসাহীর একটী প্রধান মহকুমা। অতএব নাটোরের অবস্থা জানিতে পারিলে রাজসাহী জেলার শিক্ষা ও সামাজিক অবস্থা বিশেষরূপ জানা যাইবে। যে সময়ে এডাম সাহেব রাজসাহী জেলা পরিদর্শনে আইসেন, সে সময়ে নাটোরে কোন

(1) Mr. WilliamAdams first step was "to know with all atainable accuracy the present state of instruction in the native institutions and native society " The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review

সুবন্দোবস্ত ইংরেজী স্কুল ছিল না। "এডাম সাহেব বলেন নাটোরে বাঙ্গালা স্কুল ১০টী এবং তাহাদের ছাত্রসংখ্যা ১৬৭; ছাত্রগণ ১০ হইতে ১৬ বৎসর বয়স সময় স্কুলে ভর্ত্তী হয়। শিক্ষকগণ যুবক এবং সরল প্রকৃতির পুরুষ; কিন্তু দরিদ্র এবং অনভিজ্ঞ, তাহারা এই কার্য্যে সম্মান মনে করেন।" (১) নাটোরে পারস্য ও আরবীয় ভাষাও শিক্ষা হইত। "নাটোরে পারস্য স্কুল চারিটী এবং তাহাদের ছাত্রসংখ্যা ২৩। ছাত্রগণ সাড়ে ৪ হইতে ১৩ বৎসর বয়স সময় স্কুল ভর্ত্তি হয়। ১৭ বৎসর বয়সের পর আর স্কুলে থাকে না। বিদ্যা বুদ্ধিতে বাঙ্গালা স্কুলের শিক্ষক অপেক্ষা পারস্য স্কুলের শিক্ষক শ্রেষ্ঠ, কিন্তু ধর্ম্মভাবে বাঙ্গালা স্কুলেব শিক্ষকই শ্রেষ্ঠ।" (২) পারস্য স্কুলের শিক্ষকের মাসিক আয় ৭ টাকা। আরবীয় ভাষা শিক্ষা জন্য যে স্কুল ছিল, সে সমুদয়ে কোরাণ পড়ান হইত। এ শ্রেণীর স্কুলের সংখ্যা ১১ এবং ছাত্রসংখ্যা ৪২। ছাত্রগণ ৭ হইতে ১৪ বৎসর বয়স সময় পর্যন্ত স্কুলে ভর্ত্তী হয় এবং ১৮ বৎসর বয়সের পর আর স্কুলে থাকেনা। ইহাদের শিক্ষকগণ অনুপযুক্ত। বাঙ্গালা স্কুল অপেক্ষা পারস্য স্কুলের শিক্ষার বৃহৎ এবং উদার ভাব লক্ষিত হয়।" (৩)

এডাম সাহেবের সময়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত ছিল না, জমিদারেরা পুত্রের ন্যায় কন্যাকে শিক্ষা দিতেন। অনেক সময়ে কন্যাকেও জমিদারী কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য লেখা পড়া করিতে হইত। রাণী সূর্য্যমণি, তারাঠাকুরঝি প্রভৃতি লেখা পড়া মন্দ শিক্ষা করেন নাই।(৪)

পুরুষ ও স্ত্রীলোক, বালক ও যুবা, সমুদয় লোকের শিক্ষার অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া এই মীমাংসা হইল যে তৎকালে রাজসাহী জেলায় গড়ে শতকরা ৭.৭৫ জন বালক বালিকা শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে এবং অবশিষ্ট শতকরা ৯২.২৫ জন বালক বালিকা শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে না। (৫) ইহাতে স্পষ্ট অনুমিত হইবে যে অবস্থা ও কাল বিবেচনা করিয়া সে সময় রাজসাহীতে শিক্ষার অবস্থা ভাল ছিলনা ও নিতান্ত মন্দ ছিল না। নিম্নশ্রেণী লোকদের মধ্যে যে একবারে শিক্ষা প্রচলিত ছিল না তাহাই বেশী অনুমিত হয়। "বাঙ্গালার সমুদয় জেলা মধ্যে এডাম সাহেবের রাজসাহী গড়ে একটা আদর্শ জেলা বলা যাইতে পারে।" (৬) স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয় বলিয়াছেন যে "রাজসাহী একটী একবারে অনুন্নত জেলা নহে। আবার যে একবারে মূর্খের জেলা তাহাও বলা যাইতে পারে না। এই জেলায় পরিশ্রমী এবং বুদ্ধিমান লোকের বাস ছিল এবং বর্ত্তমানেও আছে। এই জেলা বড় বড় প্রধান রাজা জমিদারগণের বাসস্থান বলিয়া গৌরব

---

(1) The Rajan of Rajshahi, Calcatta Review

(2) "The Persian Schools in Natore are four in number, containing twenty three scholars, who enter School at an age varying from four and a half to thirteen years and leave it at an age varying from twelve to seventeen The whole time stated to be spent at school varies from four to eight years The teachers intellectually are of a higher grade than the teachers of Bengali Schools, although that grade is not high compared with what is to be desired and is attainable. Morally, they appear to have as little notice as Bengali teachers of the Salutary infiuence they might exercise on the dispositions and characters of their pupils "- Mr Adam's Report on Education.

(3) "On the whole, the course of persian instruction has a more comprehensive character and a more liberal tendency than that persued in the Bangali Schools "- Mr Adam's Report on Education.

(4) The number of principal zeminders in the District is about fifty or sixty of whom more than a half are females and widows Of these, two viz, Ranees Sorjamani and Kamalmoni Dasi are alleged to poseess a competent knowldge of Bengali writing and accounts; while some of the rest are more imperfectly instructed and others are wholly ignorant "- Mr Adam's Report on Education

(5) The Rajae of Rajshahi, Calcutta Review

(6) বর্ত্তমান পাবনা জেলার অন্তর্গত শিতলাই গ্রামে ইহাঁর নিবাস। রাজসাহী জেলার তাঁর অনেক জমিদার আছে।

করে। ইহা একটী রেশম আদির প্রধান বাণিজ্যস্থান।" (১) রাজসাহীতে শিক্ষা-বিস্তার না করিলে চুরি ডাকাইতী প্রভৃতির অত্যাচার হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করা কঠিন; এবং রাজ্যও নিরাপদ নহে। "জ্ঞান কেবল শক্তি নহে কিন্তু রাজ্য রক্ষার একটী প্রধান উপায় এবং মূর্খতা দুর্ব্বলতার একটী প্রধান উপাদান, যদ্দারা রাজ্য বিপদে পতিত হয়।" এই সত্যের উপর নির্ভর করিয়া গবর্ণমেন্ট শিক্ষা-বিস্তার জন্য বিশেষ যত্নবান হইলেন।

এডাম সাহেব গবর্ণমেন্টে রিপোর্ট দিবার সমসাময়িককালে অর্থাৎ "১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ২০ জুন তারিখে বোয়ালীয়ায় একটী জেলাস্কুল স্থাপিত হইল এবং বাবু সারদা প্রসাদ বসু মহাশয় তাহার হেডমাস্টার নিযুক্ত হইলেন। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে এই স্কুলে মোট ১৭১ জন ছাত্র ছিল, তন্মধ্যে ১৬৪ জন হিন্দু, ৫ জন খৃষ্টান এবং ২ জন মুসলমান। এই জেলাস্কুল হইতে কলিকাতার ছোটআদালতের জজ বাবু কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেষ্ট বাবু শিবপ্রসাদ সান্ন্যাল, কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল বাবু মোহিনীমোহন রায় এবং বাবু কিশোরীমোহন রায় প্রভৃতি শিক্ষিত হইয়া নিজ নিজ নাম ও যশ বিস্তার করেন। ইহার কিছুদিন পর অর্থাৎ ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে দরিদ্র বালকদের শিক্ষাব জন্য বায় লোকনাথ মৈত্র বাহাদুর (২) অবৈতনিক একটী ইংরাজী বাঙ্গলা স্কুল স্থাপিত করেন। এই বিদ্যালয় আজ পর্যন্ত জীবিত থাকিয়া ভুরি ভূরি দরিদ্র বালকদের শিক্ষা প্রদান করিতেছে। এ একটী অক্ষয় কীর্ত্তি। এরূপ নিঃস্বার্থভাবে কীর্ত্তি স্থাপনই দেশের মঙ্গল। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে নাটোর মহকুমার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট নিজে নাটোরে একটী ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত করেন এবং ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে সেই বিদ্যালয় "দিঘাপতিয়া প্রসন্ননাথ একাডেমীর" সহিত সংযোজিত করেন। আজিও সেই বিদ্যালয় জীবিত থাকিয়া 'প্রসন্ননাথ উচ্চশ্রেণী ইংরাজী স্কুল' নামে পরিচিত; এবং এই বিদ্যালয় হইতে শত সহস্র বালক প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ.এ; বি,এ; এম, এ; বি,এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে। মফস্বলে রাজা প্রসন্ননাথই প্রথমে উচ্চশিক্ষার এবং রায় লোকনাথ মৈত্র বাহাদুরই প্রথমে মধ্যশ্রেণী ইংরাজী শিক্ষাব বীজ রোপণ করেন। সে সময়ে রায় লোকনাথ মৈত্র বাহাদুর মধ্যশ্রেণী ইংরাজী স্কুল স্থাপিত করেন। সেই সময়ে গবর্ণর জেনেরল লর্ড হার্ডিঞ্জ স্থানে স্থানে একশত একটী বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়া বঙ্গভাষার শিক্ষাবিষয়ে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন। সেই বঙ্গবিদ্যালয় গুলি 'হার্ডিঞ্জ স্কুল' নামে পরিচিত হইল। যে সময়ে এরূপ জনরব যে শিক্ষাবিস্তার জন্য জমিদারগণ গবর্ণমেন্টকে বিশেষ সাহায্য করিতেছেন না, সে সময়ে রাজা প্রসন্ননাথ রায় বাহাদুর এবং রায় লোকনাথ মৈত্র বাহাদুর সেই জনরব অমূলক করিয়া, রাজসাহীতে শিক্ষা বিস্তারের অগ্রদূত হইয়াছিলেন। এইরূপ কার্য্য গবর্ণমেন্টের অবগতিতেও রাজসাহীর ভাগ্যে "হার্ডিঞ্জ স্কুল" প্রাপ্তি ঘটিল না বটে; কিন্তু রাজসাহীতে বড় বড় রাজা জমিদরগণের বাসস্থান বলিয়া শিক্ষা বিস্তারের ব্যাঘাত হইল না। রাজা প্রসন্ননাথ রায় বাহাদুরের "প্রসন্নাথ একাডেমী" প্রতিষ্ঠার সময় নাটোরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট সভার সভাপতি হইয়া আহূত রাজা জমিদারগণকে উল্লেখ করিয়া যে বক্তৃতা দেন তাহাতে তিনি বলেন, "দেশের মঙ্গল জন্য সকলেরই শিক্ষা বিস্তার করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং কেবল শিক্ষাদ্বারাই মানবের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইবে"। (১) এই বাক্যে রাজসাহীর রাজা জমিদারগণ উৎসাহিত হইয়া গবর্ণমেন্ট হইতে আর্থিক সাহায্যের উপর নির্ভর না করিয়া নিজ নিজ প্রজাগণের উপকার জন্য শিক্ষা বিস্তারে মনোনিবেশ করিলেন।

লর্ড হার্ডিঞ্জের পর লর্ড ডালহাউসী গবর্ণর জেনারলের পদে নিযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে

(1) The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review

(১) ভাবতবর্ষেব ইতিহাস।

আগমন কবেন। তাঁহার ভাবতবর্ষে আগমনের পর হইতেই পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের শিক্ষা এবং দেশীয ভাষায় প্রজাপুঞ্জকে শিক্ষা দিবার জন্য তিনি যত্নবান হইলেন। "এইরূপে গবর্ণর জেনেরল এদেশীয় লোকের বিদ্যা শিক্ষার্থ নানা উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে ১৮৫৪ অব্দেব জুলাই মাসে তদানীন্তন অনুশাসনী, সভার অধিপতি মহোদয় সার চার্লস উডের নিকট হইতে একখানি পত্রিকা প্রাপ্ত হইলেন। এই সুপ্রসিদ্ধ লিপিখানি যে ভারতবর্ষীয় লোকের পক্ষে বিদ্যা শিক্ষার সনন্দপাত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে, তাহা যথার্থ। এই পত্রে ইহা উপদিষ্ট আছে যে, প্রত্যেক প্রেসিডেন্সিতে এক একটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবে এবং দেশস্থ সমুদায় কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়েব অন্তর্ভুক্ত হইযা, নানাবিধ পরীক্ষার্থ ছাত্রদিগকে শিক্ষা দান করিবে। ছাত্রদিগের বিদ্যার পুবস্কাব দিবাব ও কৃতিত্বের তারতম্য অবধারণ কবিবার নিমিত্ত, বিশ্ববিদ্যালয়ের, অধ্যক্ষ বি.এ. এবং এম.এ; বি,এল এবং ডি,এল; এম, বি এবং এম. ডি প্রভৃতি উপাধি প্রদান কবিবেন। উক্ত পত্রিকায ইহা আরও নির্দ্দিষ্ট আছে যে, সাধারণের শিক্ষা বিধানার্থ সরকাব হইতে অর্থ সাহায্য বিতরণ কবিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবে। সাহায্য দান প্রণালী দুইটী মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে। ইহা দ্বারা অপর সাধারণের মধ্যে অনেক পরিমাণে জ্ঞান জ্যোতি বিকীর্ণ করিবাব সোপান হইয়াছে এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কিরূপে একটী মহৎ কার্য্য সম্পন্ন কবিতে হয়, তদ্বিষয়ে এ দেশীয় লোক ক্রমশঃ শিক্ষা পাইতেছেন। গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে বঙ্গদেশের যাদৃশী শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, কোন পরাধীন রাজ্যে কখন এত অল্পকালের মধ্যে সেরূপ উন্নতি দৃষ্ট হয় নাই। ইউরোপীয় বিদ্যাশিক্ষা যে এই অদৃষ্টপূর্ব্ব অভ্যুদযের প্রধান কাবণ, তাহাতে সন্দেহ হইতে পাবে না"। (১) এইরূপ সাহায্য দান প্রণালী বাজসাহীর শিক্ষা বিস্তারেব বেগ অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়া বাজা জমিদারগণ ও সাধাবণ লোক সমূহকে আবও উৎসাহিত করিল। এই প্রণালীতে কেবল যে রাজসাহীব বাজা জমিদার প্রভৃতি উৎসাহিত হইয়াছিল এমত নহে, সমগ্র বঙ্গদেশেই বাজা জমিদাব প্রভৃতি উৎসাহিত হইয়া শিক্ষাবিস্তাবের জন্য যত্নবান হন। ১৮৫৫ এবং ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে সাহায্যদান প্রণালী কার্য্যে পরিণত হয়। সে সময়ে সমগ্র বাঙ্গালা দেশে ১৪৫ বিদ্যালয এবং তাহাতে ১৩,২২৯ ছাত্র শিক্ষাপ্রাপ্ত হইত। কিন্তু সাহায্যদান প্রণালী প্রচলিত হইবার পর ১৮৬৬—৬৭ খৃষ্টাব্দে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৪৫ হইতে ২,৯০৭ এবং ছাত্রসংখ্যা ১৩,২২৯ হইতে ১২১১০৮ বৃদ্ধি হয়। কিন্তু রাজসাহীতে নিম্নশ্রেণীর স্কুল ৬২ এবং তাহাতে ১৯৮৪ জন ছাত্র শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছিল। ইতিপূর্ব্বে জমিদারগণের উপব যে গুরুতব দোষ অর্পিত হইয়াছিল, তাহা অনেক পরিমাণে এসময় খণ্ডন হইল। সাহায্য-দানপ্রণালী প্রচলিত হইবার পর বাবু মথুরানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একজন ডেপুটী কলেক্টর রাজসাহীতে অনেক দিন ছিলেন। তিনি বাজসাহী জেলাস্কুল কমিটীব সম্পাদক ছিলেন এবং তাঁহার সরল ও অমাযিক স্বভাবগুণে জেলার বাজা জমিদারগণ তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। রাজসাহীর রাজা ও জমিদারগণের শিক্ষাবিস্তারের পরামর্শদাতা মথুর বাবুই ছিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোন রাজা, জমিদার নূতন স্কুল স্থাপনে অগ্রসর হইতেন না। সুতরাং রাজসাহীর অনেক ইংরাজী ও বাঙ্গালা স্কুল অদ্যাপি মথুর বাবুর যত্নের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই সাহায্যদান প্রণালীতে উচ্চ এবং মধ্যশ্রেণীস্থ প্রজাপুঞ্জকে শিক্ষাপ্রদান করিবার যথেষ্ট সুবিধা হয়, কিন্তু এই প্রণালীতে নিম্নশ্রেণী প্রজাপুঞ্জকে শিক্ষা প্রদানের কোন বিশেষ সুবিধা হইল না।

বাঙ্গালার প্রধান লেপ্টেনান্ট গবর্ণর সার ফ্রেডরিক হ্যালিডেব পর সারজন গ্রান্ট ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালাব ছোট লাট হইলেন। এই গ্রান্ট সাহেবই ভাবতকে নীলকর সাহেবদেব অত্যাচাব হইতে বক্ষা করিয়া পাঠশালাসমূহে পরিবর্তন কবেন এবং বাঙ্গালায় নিম্নশিক্ষা

বিস্তারের পথ প্রদর্শন করেন। স্যার সিসিল বীডন সাহেব লেপ্টনান্ট গবর্ণব হন। তিনি বাবু ভুদেব মুখোপাধ্যায়ের সাহায্যে নিম্নশিক্ষা বিস্তারের পথ প্রশস্ত করেন। এই প্রণালীতে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী প্রেসিডেন্সী, বর্দ্ধমান বিভাগে, এতেই নিম্নশিক্ষার সুবিধা হইল। এসময়ও রাজসাহীর নিম্নশ্রেণীর প্রজাপুঞ্জের ভাগ্য প্রসন্ন হইল না। রাজসাহীর দক্ষিণভাগে পদ্মানদীর অপর পারে কলিকাতা, যশোহর, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থান লইয়া নিম্নশিক্ষা বিস্তারজন্য বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় পাঠশালাসমূহের ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত হইয়া বর্দ্ধমান, নদীযা, যশোহর, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে গুরুমহাশয় প্রস্তুত করিবার জন্য ট্রেনীং স্কুল স্থাপিত করেন। সেই শিক্ষিত গুরু মহাশয়েরা গ্রামে গ্রামে পাঠশালা স্থাপন করিতে লাগিলেন। সেই ভূদেব বাবুর অধীনে কেবল পাঠশালা পরিদর্শন জন্য স্বতন্ত্র ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত হইল। এই প্রণালী অনুসারে পদ্মানদীব উত্তরভাগে রাজসাহী প্রদেশে নিম্নশিক্ষাবিস্তার জন্য ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে বাবু কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় পাঠশালাসমূহের ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত হইলেন। ঐ সালের ২৫শে আগষ্ট তাবিখে তিনি কার্য্যভাব গ্রহণ করিয়া গবর্ণমেন্টের আদেশমত ভূদেব পাঠশালা প্রণালী শিক্ষার জন্য তাঁহাব বিভাগে যান। ২৭শে সেপ্টেম্বর প্রত্যাগমন করিয়া নিজ বিভাগে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হন। রাজশাহীতেই তাঁহার সদর আফিস হয়। গবর্ণমেন্ট আদেশমত বাজশাহী, দিনাজপুর ও বঙ্গপুর এই তিন জেলায় ভূদেব পাঠশালা" স্থাপিত করিতে তিনি আরম্ভ করিলেন। এই সময় হইতে রাজসাহীর নিম্নশ্রেণীস্থ প্রজাপুঞ্জের ভাগ্য প্রসন্ন হইল। কাশী বাবু "ভূদেব পাঠশালা" প্রণালীতে বালক বালিকা উভয়দের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের ভার প্রাপ্ত হন। বালক পাঠশালাব শিক্ষক প্রস্তত জন্য ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর তারিখে রাজসাহী ট্রেনীং স্কুল স্থাপিত হইল। আবার বালিকা পাঠশালাব শিক্ষয়ত্রী প্রস্তুত জন্য গবর্ণমেন্টের এবং নাটোরের ছোট তরফেব রাজা চন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের সাহায্যে "ফিমেল নর্ম্মাল স্কুল" নামে একটী ট্রেনীং স্কুল খোলা ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে স্থাপিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ফিমেল নর্ম্মাল" দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। আবার গুরুমহাশয় প্রস্তুত জন্য যে ট্রেনিং স্কুল স্থাপিত হয তাহা পশ্চাৎ স্কুলের পণ্ডিত প্রস্তুত জন্য পরিবর্তিত হইয়া উচ্চ শ্রেণী নর্ম্মাল স্কুল নাম হয়। রাজসাহীতে অনাবশ্যক বিধায এই বিদ্যালয় অবশেষে রঙ্গপুরে উঠিয়া যায়। এই প্রকারে কাশীকান্ত বাবু নিজে ডেপুটী হইয়া গ্রামে গ্রামে যাইয়া রাজসাহীতে অনেক পাঠশালা স্থাপিত কবেন এবং সে পাঠশালার অবস্থাও ভাল ছিল। কোন কোন পাঠশালায় ১৫০ জন ছাত্র হয় এবং কোন কোন গুরুমহাশয়েব মাসিক আয ২০/২৫ টাকার কম ছিল না। কাশী বাবু ১৮৬৫—৬৬ খ্রীষ্টাব্দের রিপোর্টে বলিযাছেন যে "তাঁহার বিভাগ সর্ব্বসাধরণের শিক্ষার প্রকৃত ভূমি।" (১) ১৮৭০—৭১ খ্রীষ্টাব্দে এই নিয়ম হয় যে পাঠশালাব স্বতন্ত্র ইন্‌স্পেক্টর ও ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর থাকিবে না। এই নিয়মানুসাবে বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় স্কুল ও পাঠপশালাসমুহের ইন্‌স্পেক্টর হইয়া রাজসাহী বিভাগ তাঁহার অধীন হইল। তখনও রাজসাহীতে পাঠশালার অবস্থা উন্নত। কিন্তু নাটোর ও বোয়ালীয়া সারকেল ব্যতীত রাজসাহীর সমুদয় পাঠশালায় মধ্যশ্রেণী লোকের অল্প সন্তানেরাই অধ্যয়ন করিত; নিম্নশ্রেণী লোকদের সন্তানগণই বেশী। সে সময় পাঠশালা প্রণালীতে পাঠশালা হইতে কোন পরীক্ষা দিবাব নিয়ম ছিল না। অতএব পরীক্ষা দেওয়ান আবশ্যক হইলে, পাঠশালা হইতেও মধ্য-বাঙ্গলা পরীক্ষা দিবার জন্য ছাত্রগণ প্রস্তুত হইত। সুতরাং এই শ্রেণীর পাঠশালা মধ্য-বাঙ্গলা স্কুলের ন্যায়; এবং উপযুক্ত শিক্ষকেরও প্রয়োজন। উপযুক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন হইলেই, জমিদার, তালুকদার এবং অবস্থাপন্ন ধনীলোকদের সহানুভূতির আবশ্যক। সে সময ইহাঁদেরও

(1) "My own division is peculiarly the lead of the masses"- Education Report for 1865-66

গবর্ণমেন্টের পাঠশালার উচ্চতর শিক্ষা দিবার ঝোঁক বেশী ছিল। (১) নাটোর ও বোয়ালিয়া সারকেলের কুজীপুকুর, সোইড়, হালসা, ভবানীপুর, নন্দনগাছী প্রভৃতি উন্নত পাঠশালা হইতে মধ্য-বাঙ্গলা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অনেক ছাত্র প্রথম শ্রেণী নর্ম্যাল স্কুলের ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষাতে কৃতকার্য্য হয়। ইহারা সকলেই মধ্যশ্রেণীর স্কুলের প্রধান পণ্ডিতের পদ প্রাপ্ত হন। ২/১ জন স্কুলসমূহের সব-ইন্‌স্পেক্টরের পদও প্রাপ্ত হন।

গ্রে সাহেবের পরে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে সার জর্জ্জ কাম্বেল সাহেব বাঙ্গলার লেপ্টনান্ট গভর্ণর হন। তিনি উচ্চ শিক্ষার বিরোধী ছিলেন, কিন্তু নিম্ন—শিক্ষায় অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। তাঁহারই সময়ে বাঙ্গলায় নিম্ন-শিক্ষার যুগান্তর উপস্থিত হয়। তিনি বাঙ্গলায় নিম্ন-শিক্ষার একটী নূতন সংশোধিত নিয়ম প্রচলিত করেন এবং গ্রামে গ্রামে নিম্ন-শিক্ষা বিস্তার জন্য প্রত্যেক জেলায় যথেষ্ট টাকা মঞ্জুর করেন। পাঠশালার সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সব ইন্‌স্পেক্টরের নূতন পদেরও সৃষ্টি হইল। "ভূদেব পাঠশালার" মাসিক ৫ টাকা সাহায্য দিবার নিয়ম ছিল, কিন্তু "সার জর্জ্জ কাম্বেল পাঠশালার" ১৷৷০ টাকা হইতে ৫ টাকা পর্যন্ত সাহায্য দিবার নিয়ম নির্দ্ধারিত হয়। ১৮৭১—৭২ খৃষ্টাব্দে স্কুল ২৫৭ এবং তাহাতে ছাত্র ৬৬৪৬; এবং ১৮৭২—৭৩ খৃষ্টাব্দে স্কুল ২৬৪ এবং তাহাতে ছাত্র ৮৭০৪ জন অধ্যয়ন করিত। ২৬৪ স্কুল মধ্যে ২২৫ পাঠশালা। ৬ বৎসরে ৬২টী হইতে রাজসাহীতে ২২৫ পাঠশালা হয়। ঐ সময়ে গুরুমহাশয়দের উপযোগিতারও বিচার রহিল না। এই নূতন নিয়মে রাজসাহীতে পাঠশালার সংখ্যা বৃদ্ধি হইল কিন্তু প্রত্যেক পাঠশালার ছাত্র সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া গেল এবং গুরুমহাশয়দের উপযোগিতারও হ্রাস হইল। এইরূপ অবস্থা কম বেশী সকল জেলারই হইল। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে সার রিচার্ড টেম্পল সাহেব বাঙ্গলার লেপ্টনান্ট গবর্ণর হন। তাঁহার সময়ই এই অনুপযুক্ত গুরুমহাশয়দের শিক্ষার জন্য প্রত্যেক জেলায় ট্রেনীং স্কুল স্থাপিত হয় এবং পাঠশালার উন্নতি জন্য উচ্চপ্রাইমারী পরীক্ষা দিবার নিয়ম প্রচলিত হয়। নিম্নপ্রাইমারী পবীক্ষা ইহার পূর্ব্বেই প্রচলিত হয়। ৫ টাকার পাঠশালা হইতে উচ্চপ্রাইমারী এবং ৩ টাকার পাঠশালা হইতে নিম্নপ্রাইমারী পরীক্ষা দিবার নিয়ম প্রচলিত হইল। ৫ টাকার পাঠশালাকে ডি পাঠাশালা" অথবা ইনটরমিডিএট": স্কুল বলিয়া পরিচিত হয়। এক্ষণে প্রাথমিক শিক্ষা দুই ভাগে বিভক্ত যথা—(১) উচ্চপ্রাথমিক, (২) নিম্নপ্রাথমিক। রাজসাহীর মধ্যে নাটোর বিভাগে "ডি পাঠশালা" অথবা "ইন্‌রমিডিএট" স্কুলেরই অবস্থা উন্নত হয়। এ জেলায় "৩ টাকার পাঠশালা" অর্থাৎ নিম্নপ্রাথমিক স্কুলের শিক্ষা উচ্চ প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষার ন্যায় উন্নত ছিল না। এইরূপে ১৮৭২ খৃস্টাব্দ হইতে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার ভার জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের প্রতি অর্পিত ছিল। তিন বৎসরে এ জেলায় স্কুলেব সংখ্যা ও ছাত্র সংখ্যা যেরূপ" ছিল তাহা নিম্নে দেখান গেল ঃ—

(1) "Hare accordingly the pathsalas are attended by a smaller percentage of the middle classes than in other districts The teachers of these pathsalas therefore are not called upon to teach their pupils the vernacular scholarship course, or anything beyond the three Rs there are exceptions here and there, but the above is the rule Where exceptions have occured, as in the Nattor and Boulea circles, they have been owing to the care taken of the pathsalas by the Deputy-Inspectors in providing them with patrons in the parsons of well-to-do Talukdars and Tradesmen secured such patronage, the gurus generally endeavour to teach higher than where such patronage is wanting Indeed it seems to be a point pretty well established in the history of educational administration, that patronage, whether of Government, or of wealthy and Influential individuals has in all countries a tendency to raise the standard of Education in primary Schools,"- General Report on Public Instruction for 1871-72

বৎসর	স্কুলের সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা
১৮৮৪-৮৫	৬০০	১৬৭৭৯
১৮৮৫-৮৬	৭৫৯	১৭৫৪৮
১৮৮৬-৮৭	৬৮২	১৬২৫

প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে যদিচ মাজিস্ট্রেট সাহেব সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন তত্রাচ জেলার ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টরের পরামর্শ মত জেলার প্রাথমিক শিক্ষার যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। শিক্ষা সম্বন্ধে ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টরই ম্যাজিস্ট্রেটের দক্ষিণ-হস্ত ছিল। ১৮৮৬—৮৭ খৃষ্টাব্দে "স্বতন্ত্র শাসন প্রণালী" রাজসাহীতে প্রচলিত হইল। এই "স্বতন্ত্র শাসন প্রণালী" প্রচলিত হইবার অব্যাহতি পূর্ব্বে জেলার অনুন্নত স্থান ব্যতীত সমুদয় স্থানের নিম্ন প্রাথমিক পাঠশালা "পুরস্কার প্রথার" অধীন ছিল। ম্যাজিস্ট্রেটের হস্ত হইতে শিক্ষা কার্য্য জেলার বোর্ড হস্তে অর্পিত হইলে, 'পুরস্কার প্রথা" রহিত হইয়া মাসিক "বৃত্তিপ্রথা" প্রচলিত হয়। এই নিয়মে প্রায় ৭০০ পাঠশালা হইতে প্রায় ৩০০ পাঠশালা হইল। মাজিস্ট্রেটের সময় জেলার ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর প্রকৃত প্রস্তাবে জেলার শিক্ষাকার্য্য নির্ব্বাহ করিত কিন্তু "স্বতন্ত্র শাসন প্রণালী" প্রচলিত হইলে পর সে ক্ষমতা রহিল না। বোর্ডের আদেশমত জেলার মধ্য ও প্রাথমিক শিক্ষাকার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। জেলার "পুরস্কার প্রথা" রহিত করা এবং "বৃত্তি প্রথা" প্রচলিত করা গবর্ণমেন্টের নিয়মের বহির্ভূত বলিয়া, পুনরায় এক বৎসর পরেই "পুরস্কার প্রথা" প্রচলিত হইল এবং উচ্চ প্রাথমিক পাঠশালার "বৃত্তিপ্রথাই" রহিল। "পুরস্কার প্রথা" প্রচলিত হওয়ায় আবার স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি হইল। ১৮৯৮—৯৯ খৃষ্টাব্দে রাজসাহী জেলার স্কুল ৬১২ এবং ছাত্রসংখ্যা ১৯৭২৪। মোট ৬১২ স্কুলের মধ্যে ৫০০টী পাঠশালা। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে, এই ৬৫ বৎসরে স্কুলের সংখ্যা যেরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বলিখিত বিবরণ পাঠেই জানা যাইবে।

রাজসাহী জেলা অপেক্ষা বর্দ্ধমান, হুগলী প্রভৃতি জেলায় প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা অনেক বেশী এবং দেশীয় শিক্ষা অনেক ভালরূপে হয়; কিন্তু বর্দ্ধমান, হুগলী প্রভৃতি জেলা অপেক্ষা রাজসাহীর অনেক নিম্নপ্রাথমিক পাঠশালায় ইউরোপীয় প্রণালীর শিক্ষা উৎকৃষ্ট হয়। এ বিভিন্নতার কারণ এই যে রাজসাহীতে যে সকল গুরু মহাশয় দেখা যায় তাহাদের অধিকাংশ ইউরোপীয় প্রণালীর স্কুলের ছাত্র এবং দেশীয় মতের শিক্ষায় নিতান্ত অনভিজ্ঞ। পুরাতন গুরুমহাশয় ইউরোপীয় প্রণালীতে শিক্ষিত হইলে বা ইউরোপীয় প্রণালীর স্কুলের ছাত্রেরা দেশীয় প্রণালীমতে রীতিমত শিক্ষিত হইলে বঙ্গদেশের উপযুক্ত গুরুমহাশয় হইতে পারে। দেশীয় প্রণালীতে উত্তমরূপ শিক্ষা দিতে না পারিলে প্রকৃত কৃষকদের পাঠশালায় সন্তান পাঠাইতে অগ্রসর হইতে দেখা যায় না। কৃষকদের প্রয়োজনমত পাঠশালায় শিক্ষা প্রদান করিলে প্রাথমিক স্কুলের যথেষ্ট উন্নতি হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই।

এপর্যন্ত নিম্নশিক্ষার বিষয় বলিতেছিলাম। পুনরায় উচ্চশিক্ষার কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। গবর্ণর জেনেরল লর্ড মেও বাহাদুর দেশের উচ্চশিক্ষা উঠাইয়া দিতে চাহিলে মহামান্য গ্রে সাহেব তাহার খুব প্রতিবাদ করেন। তাঁহার প্রতিবাদেই উচ্চশিক্ষা একবারে উঠিয়া গেল না বটে, কিন্তু সেই হইতেই গবর্ণমেন্ট উচ্চশিক্ষার্থে বেশী উৎসাহ না দিয়া নিম্নশিক্ষাতে বেশী অর্থব্যয় করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু এঘটনাতে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী উন্নত স্থানেরই বিশেষ অসুবিধা বোধ হইতে লাগিল। দেশীয় রাজা, জমিদার, মহাজন ধনী, ক্ষমতাশালী

প্রভৃতিরা নীরব রহিলেন না। তাঁহারা উচ্চশিক্ষার স্রোতে প্রবাহিত জন্য বেশী অগ্রসর হইলেন। এই ঘটনার কিছুকাল পরেই অর্থাৎ ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে রাজসাহী জেলাস্কুলে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষীয় শ্রেণী সংযোজিত করিয়া দ্বিতীয় শ্রেণী কলেজে পরিণত করিবার জন্য দুবলহাটীর রাজা হরনাথ রায় বাহাদুর তাঁহার জমিদারী মধ্যে বার্ষিক ৫০০০্ টাকা আয়ের সম্পত্তি গবর্ণমেন্টকে দান করেন। লর্ড মেওর পর লর্ড নর্থব্রুক গবর্ণর জেনারেলের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া উচ্চাঙ্গের ইংরাজী শিক্ষার উৎসাহ দিতে লাগিলেন। অতএব রাজা হরনাথের মহৎকার্য্য গবর্ণমেন্ট অনুমোদন করিলেন। ইহার কিছুদিন পরেই "রাজসাহী এসোসিয়েসনের" পক্ষ হইতে দিগাপতিয়ার রাজা প্রমথনাথ বাহাদুরে সাহায্যে ও উদ্যোগে ঐ কলেজে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী সংযোজিত করিয়া প্রথম শ্রেণী কলেজে পরিণত হয়। রাজা হরনাথ রায় বাহাদুর মফস্বলে উচ্চ শিক্ষার বীজ প্রথমে ছড়ান। কিন্তু তাঁহার পুত্র রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুর সেই বীজ হইতে পুষ্ট ও পরিপক্ক ফল শোভিত অত্যুচ্চ বৃক্ষ উৎপাদন করিলেন এবং সেই বৃক্ষের সুস্বাদু ফল জেলার সর্বত্র বিতরণ করিলেন। রাজা প্রসন্ননাথকে অনুকরণ করিয়া রাজসাহীর অন্যান্য রাজা বা প্রধান লোকেরা উচ্চ শিক্ষার বীজ জেলার স্থানে স্থানে ছড়াইতে অগ্রসর হইলেন। এই রাজসাহী কলেজের দুবলহাটীর রাজা হরনাথ, দিঘাপতিয়ার রাজা প্রমথনাথ, পুঁটিয়ার রাজা যোগেন্দ্রনাথ রায়, মহারাণী শরৎসুন্দরী এবং তাহার পুত্রবধু রানী হেমন্তকুমারী দেবী প্রচুর অর্থদান করেন। এই কলেজের সহিত দুইটি (হোস্টেল) ছাত্র নিবাস সংযোজিত আছে। একটী দিঘাপতিয়ার রাজা প্রমদানাথ রায় প্রতিষ্ঠিত করেন এবং আর একটী পুঁঠীয়ার রানী হেমন্তকুমারী দেবী প্রতিষ্ঠিত করেন। এই মহৎ কার্য্য জন্য রাজসাহী বাসীরা উল্লিখিত রাজা ও রানীদের নিকট ঋণী। যাহারাই ধনের সার্থকতা করিয়া জন সমাজে যশস্বী হইয়াছেন। জেলায় ক্রমান্বয়ে যে যে উচ্চ শ্রেণীর স্কুল মফস্বলে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে প্রকাশিত হইল ঃ—

(১) ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে দিঘাপতিয়ার রাজা প্রসন্ননাথ ইংরেজী স্কুল স্থাপিত করিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্টিত হইবার পাঁচ বৎসর পূর্বেই এই দিঘাপতিয়া স্কুল স্থাপিত। এ জেলায় এ একটী লব্ধ প্রতিষ্ঠ উচ্চ শ্রেণীর স্কুল। ইহার খ্যাতি অনেক দিন হইতে এবং অনেক দূরে বিস্তৃত। স্কুলগৃহটির এবং তৎসঙ্গে যাবতীয় কাগজপত্র অগ্নিভস্মীভূত হওয়াতে প্রথম হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকার ফল জানা কঠিন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ হইতে ৫৪ জন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। এই ৮ বৎসর গড়ে প্রতি বৎসর ৭ জন ছাত্র উত্তীর্ণ। এই স্কুল প্রায় প্রতি বৎসর জুনীয়ার বৃত্তি প্রাপ্ত হয়। (২) পুঁঠীয়ার রাজা পরেশ নারায়ণ রায় বাহাদুর ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে পুঁঠীয়াতে একটী মধ্যশ্রেণী বাঙ্গলা স্কুল স্থাপিত করেন। সেই স্কুল ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে মধ্য ইংরেজী এবং ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে উচ্চ শ্রেণী ইংরেজী স্কুলে পরিণত হইয়া আছে। এই উনবিংশতি বৎসর মধ্যে ৫২ জন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। প্রতি বৎসর ৩ জন উত্তীর্ণ।

(৩) নাটোরে আদিতে একটী লব্ধ প্রতিষ্ঠ মধ্যশ্রেণী বাঙ্গলা স্কুল ছিল। নাটোরের মুসলমান জমিদার রশিদ এ স্কুলকে মধ্যশ্রেণী ইংরেজীতে পরিণত করেন। এরপর নাটোর মিউনিসিপালিটীর সাহায্যে ও যত্নে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ঐ স্কুল উচ্চ শ্রেণীতে পরিণত হইয়া আছে। সম্প্রতি এই বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার নাটোরের মহারাজা গ্রহণ করিয়াছেন। এটী এক্ষণ নাটোর মহারাজার স্কুল। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ছাত্র প্রথম প্রেরিত হয়। এই চতুর্দ্দশ বৎসরে ৫১ জন ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, তন্মধ্যে ৪৩ জন ছাত্র ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ৭ বৎসরে উত্তীর্ণ। পূর্ব্ব সাত বৎসরে ৮ জন এবং শেষ সাত বৎসরে ৪৩ জনে উত্তীর্ণ হইয়াছে। এবং

অনেকে জুনীয়ার বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। মফস্বল স্কুলের মধ্যে এই স্কুল হইতেই মুসলমান ছাত্র বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমানে স্কুলের অবস্থা উন্নত।

(৪) নওগাঁতে মহকুমা স্থাপিত হইবার দুইবৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে গাঁজা অফিসের প্রধান কর্ম্মচারী সবডেপুটী বাবু কৃষ্ণধন বাগচীর যত্নে এবং উদ্যোগে একটি উচ্চ শ্রেণীর ইংরেজী স্কুল স্থাপিত হয়। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের যত্নে একটী ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ প্রস্তুতের উদ্যোগ হইতেছে। স্থাপিত হইবার ২/৩ বৎসর পর প্রবেশিকা পরীক্ষায় ছাত্র প্রেরিত হয়। এই ১২/১৩ বৎসরে ২২ জন ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

(৫) এক বৎসরের অধিককাল হইল উকীল ও স্থানীয় ভদ্রলোকদের যত্নে ও উদ্যোগে বোয়ালীয়াতে "বোয়ালীয়া একাডেমী নামে একটী উচ্চশ্রেণী ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ে খাজুরা নিবাসী ‾মিদার বাবু জীবন্তিনাথ খাঁ এক হাজার টাকা দান করিয়া পিতা ভোলানাথ খাঁর নাম চিরস্মরণীয় করেন। অতএব এই বিদ্যালয় "ভোলানাথ একাডেমী" বলিয়া প্রসিদ্ধ।

এই সকল উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী স্কুলও রাজসাহী কলেজ স্থাপিত হওয়াতে রাজসাহী জেলার উচ্চ শিক্ষার স্রোত অতিবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। আবার উত্তর বঙ্গ রেলওয়ে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর রাজসাহী বাসীদের নিকট কলিকাতা ১০ দিনের পথ হইতে কয়েক ঘণ্টার পথ হইল। ইহাতে উচ্চ শিক্ষার স্রোত আরো দ্বিগুণ বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই সুযোগে রাজা জমিদারগণের সন্তানেরা রাজসাহীকে উপেক্ষা করিয়া কলিকাতায় আরো উৎকৃষ্ট শিক্ষা পাইবে বলিয়া কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইহার জাজ্জল্য প্রমাণ দিঘাপতিয়া রাজবংশ। রাজসাহীতে বড় রাজাদিগের মধ্যে দিঘাপতিয়া বংশের কুমারগণ যেরূপ সুশিক্ষিত হইয়াছেন এরূপ দৃষ্টান্ত রাজসাহীতে কেন অনেক জেলায় অতি বিরল। এখন রাজসাহীতে বি,এ; এম,এ; বি,এল অনেক। তজ্জন্য আমরা রাজসাহীর গৌরব করিনা; কিন্তু রাজ সন্তানেরা যে বি,এ; এম,এ হইতেছেন বা সুশিক্ষিত হইতেছেন, ইহাই রাজসাহীর গৌরব। ইহা হইতে রাজসাহীতে আর একটী গৌরবের স্থল এই যে,— একটী ছাত্র রাজসাহী কলেজ হইতে প্রবেশিকা ও এফ,এ, পরীক্ষা দিয়া কলিকাতায় অধ্যয়ন করে এবং বি,এ; এম,এ, অতি সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হওয়ার পর "রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলার" হইয়াছেন। ইহাঁর নাম বদুনাথ সরকার; ইহাঁর জন্মস্থান রাজসাহী। ইনি একটী সম্ভ্রান্ত জমিদার সন্তান। তিনি আজ কলেজের অধ্যাপক। এডাম সাহেবের সময় যে রাজসাহী অশিক্ষিত লোকের বাসস্থান বলিয়া পরিচিত হয়, অথচ রাজসাহীবাসীরা বুদ্ধিমান বলিয়া পরিচিত ছিল; বিনা যত্নে এবং কালের দুর্ব্বিপাকে সেই রাজসাহীবাসীদের বুদ্ধি লুক্কাইত ছিল। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের যত্নে ও সুশাসন বলে এবং রাজানুগ্রহে, আজ সেই বুদ্ধি প্রচার পাইতেছে। ইংরেজীতে না হউক সংস্কৃতিতে রাজসাহীর এক কালে হীন অবস্থা ছিল না। যে কুল্লুক ভট্টকে মহাত্মা সার উইলিয়াম জোন্স সাহেব ইউরোপে ও এশিয়ার টীকাকারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছেন, তাহার জন্মস্থান রাজসাহী প্রদেশ। সেই দিনের কথা মনে করিলে তখন রাজসাহী প্রদেশের কি উন্নত অবস্থা? তখন রাজসাহী পণ্ডিত সমাজ, তখন রাজসাহী সভ্যতার শিরোমণি, তখন রাজসাহী ধর্ম্মস্থান, তখন রাজসাহী আর্য্য জাতির গৌরব স্থান। আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপাধিধারীদের জন্য আমরা গৌরব করিতেছি; কিন্তু ইহাঁরা কুল্লুক ভট্টের ন্যায় পণ্ডিতগণের সমকক্ষ হইতে পারেন না। যে আর্য্য সন্তানের নাম ইউরোপ ও এসিয়ায় বিস্তৃত এবং সম্মানিত, তাহার জন্যই আমরা গৌরব করিতে

পারি। সেকাল অনেক দিন গত। ইহা কি কালের বিচিত্র গতি না রাজসাহীর ভাগ্যের দোষ? হিন্দু রাজাদের পর হইতে আমাদের ভাগ্য অপসন্ন হয়। দেশ যবনাক্রান্ত হইতেই আর্য্য জাতির সভ্যতা, পাণ্ডিত্য, ধর্ম্ম ও জ্ঞান লোপ পাইতে লাগিল। মুসলমান রাজ্যের ধ্বংসের পর হইতে আর্য্য জাতিরা ধীরে ধীরে সভ্যতা, পাণ্ডিত্য ও ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হইতেছেন। পুনরুদ্ধারের প্রধান কারণই ব্রিটীশ গবর্ণমেন্টর যত্ন, সুশাসন, দয়া এবং সাহায্য। এ দুর্দ্দিনে কৃপাবান ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট রক্ষা না করিলে আর্য্য জাতির উপায়ান্তর নাই। (১) এই ঊনবিংশতি শতাব্দীতেও সংস্কৃত জন্য রাজসাহী গৌরব করিতেন, তাহারই উন্নতি জন্য দয়াবান গবর্ণমেন্ট বিশেষ সাহায্য করিতেছেন। তথাপি রাজসাহীর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা নিজ নিজ সন্তানকে ইউরোপীয় শিক্ষা দিবার জন্য লালায়িত। পুরাকালে রাজা জমিদারগণ সংস্কৃত পণ্ডিতদের টোল চতুষ্পাঠীর ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ভূমি বা অর্থ যথেষ্ট দান করিতেন। এক্ষণে সে প্রথা প্রায় রহিত। অতএব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা উপায়ান্তর না দেখিয়া দাসত্বের উপযোগী করিবার জন্য নিজ নিজ সন্তানকে অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা দিতেই অগ্রসব হইতেছেন। ইহাই রাজসাহীর দুর্ভাগ্য।

যে বিজ্ঞান শাস্ত্রের ও শিল্পবিদ্যার স্রোত আজ বঙ্গদেশে প্রবাহিত তাহা পুরাকালে ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতিরা কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক সকলকেই শিক্ষা দিতেন। সেকালে সাধারণ বিজ্ঞান ও শিক্ষা হিন্দুদিগের প্রতি গৃহে শিক্ষা হইত। হিন্দুর গৃহে গৃহে যুবতী সূচিকা ও চিত্রকর; বৃদ্ধ মাতা চিকিৎসক ছিলেন। সেকালে যুবতীরা সংসারে আবশ্যকীয় সূচের কার্য্য নির্ব্বাহ কবিতেন এবং ঘট পটাদিও চিত্র করিতে পারিতেন। বালক বালিকাদিগের সামান্য ব্যাধিতে সেকালের মাতা এখনকার কালের বঙ্গদেশের মাতার ন্যায় কথায় কথায় দৌড়িয়া ডাক্তারের বাটীতে যাইতেন না। সামান্য ব্যাধির ঔষধ তাহাদের মুখে এবং পেটরা পুঁটলীতেই থাকিত। ইহা ব্যতীত আর্য্য স্ত্রীলোকেরা গণিত ও জ্যোতিষশাস্ত্রেরও রীতিমত শিক্ষা করিয়াছেন। লীলাবতী ও খনার কথা মনে করিলে এক্ষণকার আর্য্য পুরুষদের লজ্জা হইবে। যে জাতীর মধ্যে বিজ্ঞান শাস্ত্র ও শিল্প বিদ্যার চর্চ্চা নাই, সে জাতীর উন্নতির আশা কোথায় এবং সে জাতীর শিক্ষাই বা কোথায়? পূরাকালের কথা মনে করিলে আজ আর্য্যাজতীরা দেশীয় বিজ্ঞান ও শিল্পে মূর্খ। তথাপি দেশীয় শিক্ষা যাহা আছে, তাহা উৎসাহ বিহীনে লুপ্ত প্রায়। দেশীয় শিল্পের উন্নতিতেই ভারতের উন্নতি।

আজি দেশীয় বিজ্ঞান ও শিল্প অভিধানের শব্দের ন্যায় লোক মুখে উচ্চারিত। আজ ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প বিদ্যারই স্রোত ভারতবর্ষে প্রবল বেগে প্রবাহিত। আজি কালি ইউরোপ মহাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্পে শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং দয়াবান ব্রিটীশ গবর্ণমেন্ট সেই ইউরোপীয় বিজ্ঞান শাস্ত্র ও শিল্পবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য স্থানে স্থানে কলেজ ও স্কুল স্থাপন করিয়া ভারতবাসীদের মহোপকার করিতেছেন। বঙ্গদেশে বিস্তর বিএ; এম,এ; দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ হইবার জন্য লালায়িত হইয়াও দাসত্ব পাইতেছেন না। তথাপি নিজ নামের শেষে শুষ্ক বিএ, এম,এ, উপাধি সংযোজিত করিবার জন্য ধন, প্রাণ, মন সমর্পণ করিতেছেন। বিএ, এম,এ পরীক্ষা দিয়া কৃতবিদ্য হওয়া নিতান্ত ভাল, কিন্তু জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ জন্য, সংসারের সমৃদ্ধি লাভের জন্য এবং জাতীয় উন্নতি জন্য বিজ্ঞান শাস্ত্র ও শিল্প বিদ্যায় অনুশীলন করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। দাসত্ব করাই বিদ্যা শিক্ষার মুল তন্ত্র মন্ত্র হওয়া উচিত নহে। এই

(1) "Our nation has been debased by continous alian rule and can only look up to a pateriat Government such as ours for help and guidance,"- The Indian Empire, December 16th 1899.

সম্বন্ধে আমাদের মহাত্মা বড়লাট লর্ড কর্জ্জন যাহা বলিয়াছেন, তাঁহার সেই সারগর্ভ উপদেশে ভারতবাসীদের বিশেষতঃ বঙ্গবাসীদের চৈতন্য হওয়া উচিত।(১)

এই বিজ্ঞান শাস্ত্র ও শিল্প বিদ্যায় তরঙ্গ সকল দেশে প্রবাহিত হইতেছে এবং ব্রিটীশ গবর্ণমেন্টের অভিপ্রায়ে সকলেই উৎসাহিত হইতেছে। এমন সময়ে শিক্ষিত দেশ হিতৈষী ভদ্র মণ্ডলীর যত্নে এবং রাজসাহী জেলার বোর্ডের সাহায্যে '১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস (২) রামপুর বোয়ালীয়াতে একটী রেশমী স্কুল স্থাপিত হয়। এই বিদ্যালয়টী "ডায়মণ্ড জুবিলী ইন্ডষ্ট্রীয়াল স্কুল' নামে প্রসিদ্ধ হয়। এই বিদ্যালয়ে জেলা বোর্ডের সাহায্য থাকিলেও কার্য্য নির্ব্বাহিকা একটী সভা আছে। বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং ভাইশচেয়ারম্যান, বোয়ালীয়া মিউনিসিপালটীর চেয়ারম্যান, রাজসাহী কলেজের প্রিন্সীপাল এবং অন্যান্য ভদ্রলোক এ সভার সভ্য। জজের উকিল বাবু অক্ষয় কুমার মৈত্র বি,এল, এই সভার সম্পাদক। তিনি যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে এই বিদ্যালয়ের উন্নতি জন্য চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাকে আমি ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। এ মহৎ কার্য্যের উপযুক্ত পাত্রই অক্ষয় বাবু। স্বয়ং কালেক্টর মি. নন্দকৃষ্ণ বসু এম,এ; সি,এস, এই বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করিয়া জনসাধারণের প্রীতির ভাজন হন। যে স্থানে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা দিঘাপতিয়ার রাজা প্রমদানাথ রায় বাহাদুরের অধিকার। তিনি এই স্থানের নিজ স্বত্ব দেশ হিতকর বিদ্যালয়ের জন্য দান করিয়াছেন। রাজসাহীর অন্যান্য মহাত্মারাও এই বিদ্যালয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। যে যে মহাত্মা যত টাকা সাহায্য করিয়াছেন তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল। নাটোর মহারাজা— ৫০০০৲ রায় কেদারপ্রসন্ন সাহিত্য বাহাদুর— ১৫০০০৲ রাণী হেমন্তসুন্দরী দেবী— ৬০০০৲ দুবলহাটীর রাণীদ্বয় ২০০০৲ রাণী মনোমোহিনী দেবী— ৫০০০৲ চৌগ্রামের রাজা রমণীকান্ত রায়— ৫০০৲ ভুবনমোহন মৈত্র জজের উকিল— ৩০০০৲ এই প্রচুর সাহায্যে ইহা বেশ প্রমাণ হইবে জেলার রাজা জমিদারগণের এই বিদ্যালয়ের উন্নতি জন্য বিশেষ যত্ন আছে। গবর্ণমেন্টের কৃষি বিভাগ হইতেও এই বিদ্যালয়ে সাহায্য দেওয়া হয়। এই বিদ্যালয় হইতে গুটিপোকার বীজ প্রস্তুত করা এবং দেশ বিদেশ পাঠান হইতেছে, সুতা রং করা এবং সুতা প্রস্তুত করিয়া মট্‌কার কাপড় বুনান এইসকল কার্য্য শিক্ষা হইতেছে। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক বাবু সীতানাথ গুহ। ইনি কৃষিবিভাগের শিক্ষিত পুরুষ। দুই বৎসর হইল এই বিদ্যালয় স্থাপিত। এই অল্পকাল মধ্যে ইহার যশ ও নাম এত বিস্তৃত হইয়াছে যে এই বিদ্যালয় হইতে গুটীপোকার বীজ জাপান, ইতালী, ইংলণ্ড এবং ভারতের নানা স্থানে প্রেরিত হইতেছে। (৩) ইহাই বর্ত্তমান রাজসাহীর গৌরব। অক্ষয় বাবু ঠিক বলিয়াছেন যে বাঙ্গালার জেলাগুলি মধ্যে উৎকৃষ্ট রেশম প্রস্তুত জন্য রাজসাহী

---

(1) It is a good thing to be a scholar, but it is on the whole, a more important thing to be able to succeed in the battle of life, than it is to attach the initials B A. to one's name "- The Viceroy's reply to the Galin" Maharaja's Speech, on the occssion of the opening of the New College and Hospital at. Gwaliar dated lst December 1899 Quoted from the "Month" Vol 1

(২) ম্যাজিস্ট্রেটের এডমিনিসট্রেসন রিপোর্টে "জানুয়ারী ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে" লিখিত আছে কিন্তু অক্ষয় বাবু "ডাইরেক্টর অব পাবলিক ইনষ্ট্রাকসন" নিকট ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ ফেব্রুয়ারী তারিখে যে পত্র লিখেন, তাহাতে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে কার্য্যারম্ভ লিখিত আছে।

(3) "The Sericultural School at Rampore Boalea supplied crcoon seetsto Japan, Italy, England and to several places in India A cocoon reading room has been constructed and arrangements are being made for bulding a workshop"- The Indian Empire, December 26th 1898

একটী প্রসিদ্ধ জেলা ছিল। (১) এই গ্রন্থের অনেক স্থলে বলা হইয়াছে যে মহারাণী ভবানীর রাজসাহী রাজ্যে বিস্তর রেশম ও কার্পস বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া ইউরোপের বণিকদের দ্বারা দেশ বিদেশে প্রেরিত হইত। এই রেশমের কার্য্য নির্ব্বাহার্থ কোন ইউরোপী যন্ত্র ছিল না, কেবলি হস্ত ও দেশীয় যন্ত্র দ্বারা নির্ব্বাহিত হইত কিন্তু শিল্পের প্রকৃত উন্নতি সাধন মানসে অক্ষয় বাবু ইউরোপীয় ও দেশীয় উত্তম বস্ত্র প্রয়োগে রেশম কার্য্য শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন। এই নূতন বিদ্যালয়ে রাজসাহীর পুরাতন গৌরবের পুনরুদ্ধারের সূত্রপাত বলিতে হইবে। মহারাণী ভবানীর সময়ের ন্যায় রাজসাহীতে পুনরায় পট্টবস্ত্র ও কার্পাস বস্ত্রের গৌরব বৃদ্ধি হইলে, রাজসাহী বাসীদের সুখ সমৃদ্ধির পরাকাষ্ঠা হইবে তাহার আর ভুল নাই। সে দিন কি আমাদের ভাগ্যে হইবে? রাজসাহীর রাজা জমিদারগণ অধ্যবসায় ও যত্ন করলে এবং অবশ্যকীয় অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত না হইলে রাজসাহীর সেই শুভদিন অবশ্যই হইবে। তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। আমাদের জানা উচিত যে নিম্নশ্রেণী কৃষকেরা তিন টাকার পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষা করিবে এবং মধ্য ও উচ্চশ্রেণীয়েরা বিজ্ঞান শাস্ত্র ও শিল্প বিদ্যালয় গূঢ়তত্ত্বে পটু হইয়া স্বদেশের ও স্বজাতির সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবে। (২) রাজা ও জমিদারগণ বিজ্ঞান শাস্ত্র ও শিল্পবিদ্যায় শিক্ষিত হইলে নিজ প্রজাগণকে ঐ বিদ্যাশিক্ষায় উৎসাহিত করিয়া তাহাদের সুখ সমৃদ্ধি করিতে পারেন এবং টেলীমেকসের মেনটরের ন্যায় তাহাদের উপদেষ্টা হইয়া প্রজা হিতকর কার্য্যের যশ লাভ করিতে পারেন। পুরাকালে মনুর বিধানানুসারে রাজাকে কৃষি বিদ্যা, বাণিজ্য ব্যবসা ও শিল্পবিদ্যায় গূঢ়তত্ত্ব শিক্ষা করিতে হইত। (৩) রাজার জ্ঞানের উপর প্রজার সুখ সমৃদ্ধি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। প্রজার সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করাই রাজা জমিদারগণের কর্ত্তব্য; কিন্তু তাহাদিগকে *পীড়ন করিয়া ও তাহাদের রক্ত শোষণ করিয়া নিজ কোষ পূরণ করা রাজা জমিদারগণের কর্ত্তব্য* কর্ম্ম নহে। প্রজাকে সমৃদ্ধিশালী করাই রাজা জমিদারগণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। বেহার অঞ্চলের প্রজা-হিতৈষী মহামান্য রাজা রামপাল সিংহ এবং ঢাকা জেলার অন্তর্গত তেওতা গ্রামের জমিদার রায় পার্ব্বতী শঙ্কর চৌধুরীর ন্যায় রাজসাহীর রাজা জমিদার দেশীয় শিল্পের উন্নতি সাধনে যত্নবান হইলে প্রজার সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই।

ডাকঘর— নিম্নলিখিত পোষ্টআফিসগুলি রাজসাহী জেলার অন্তর্গত।

১	আড়ানী	১৬	ডাঙ্গাপাড়া	৩১	মালঞ্চী
২	ইসলাম গাঁতী	১৭	তাহিরপুর	৩২	মাঁদা
৩	ওয়ালীয়া	১৮	তানোর	৩৩	মহাদেবপুর
৪	কলম	১৯	তালন্দ	৩৪	মাধনগর
৫	কাজলা	২০	দিঘাপতিয়া	৩৫	রাজাপুর
৬	কাশীমপুর	২১	দি আত্রাই	৩৬	রাণীনগর

(1) Rajshahye was looked upon in the last century as one of the best silk producing districts of Bangal The silk industry, in those days, represented rearing of silk-worms, reeling, bleaching, dying and weaving of silk fibre and printing of silk fabrics- all carried on as handicraftes under the old system of the rule of thumh."- A. letter dated the 5th February 1900 from Bahu Akshoy Kumar Maitra B L., to A. Pedlar Esq F B S Director fo Public Institution, Bengal.

(2) "The masses should be taught the three R's, and the middle and upper classes should be well grounded upon the mystaries of the Sciances and arts to benefit them to act, as monitors and guides of the all and sundry."- The Indian Empirs, December 26th 1898.

(3) "From the people he is to learn the theory of agriculture, commerce and other practical arta."- Elphinatone's History of India, Book I, Chapter II.

৭	কালীগাঁও	২২	দুর্গাপুর	৩৭	লালপুর
৮	কুশম্বী	২৩	দুবলহাটী	৩৮	লালুর
৯	খাজুরা	২৪	নওহাটা	৩৯	বড়াইগ্রাম
১০	গোপালপুর	২৫	নাটোর	৪০	বাগমারা
১১	গোদাগাড়ী	২৬	নওগাঁও	৪১	বলিহার
১২	ঘোড়ামারা	২৭	পতিশর	৪২	বালুভরা
১৩	চারঘাট	২৮	পাকুড়িয়া	৪৩	বেলঘরিয়া
১৪	চৌগ্রাম	২৯	পাঁজরভাঙ্গা	৪৪	বোয়ালীয়া
১৫	জোয়াড়ী	৩০	পুঁঠীয়া	৪৫	শরদহ
				৪৬	সিঙ্গড়া

গোপালপুর, মালঞ্চী, নাটোর, মাধনগর, আত্রাই, রাণীনগর, এই ছয়টী রেলওয়ে ষ্টেশন এবং টেলিগ্রাফ আফিশ রাজসাহী জেলার অন্তর্গত। ইহা ব্যতীত বোয়ালিয়া, ঘোড়ামারা, নাটোর, দিঘাপতিয়া, পুঁঠীয়া ও নওগাঁও প্রভৃতি স্থানে গবর্ণমেন্ট টেলিগ্রাফ অফিস আছে। নাটোর হইতে বোয়ালীয়া ৩০ মাইল এবং সুলতানপুর রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে নওগাঁও ৩ মাইল দূর।

রাস্তা। রাজসাহীতে অনেক নদী ও বিল থাকায় বোধ হয় হিন্দু রাজাগণ-সময়ে বাণিজ্য জলপথে চলিত। সুতরাং হিন্দু রাজার সময়ে রাজ পথের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। মুসলমানদিগের সময়েও রাজপথ অতি বিরল ছিল। রাজসাহীতে মুসলমানদের সময়ে একটা মাত্র রাজবর্ত্ম দেখা যায়। "একটা রাস্তা বর্দ্ধমান হইতে বীরভূমের মধ্য দিয়া কাশিমবাজার হইয়া শ্যামপুর বোয়ালিয়ার অনতিদূরবর্ত্তী হাজরাহাটী দিয়া করতোয়া কুলস্থ ঘোড়াঘাট হইয়া ব্রহ্মপুত্রের অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে" (১) মহারাণী ভবানীর "জাঙ্গাল" একটা রাজপথ চৌগ্রামের কিছুদূর হইতে ভবানীপুরের পীঠস্থান দিয়া করতোয়া নদী অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। মহারাণী ভবানী পুকুর খনন আদি পুণ্য কার্য্যে যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়াছেন, তখন রাজপথ প্রস্তুত জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন বা অর্থব্যয় করিতে পারিতেন। কিন্তু সে সময় রাজসাহীর অনেক স্থান ঘন জলাকীর্ণ থাকায় জলপথে গমনাগমন ভিন্ন রাস্তায় যাতায়াত প্রায় ছিল না। অতএব সে সময়ে রাস্তার প্রয়োজনও কম ছিল। রাজসাহীর বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া ইহাও প্রতীতি হয় যে, বর্ত্তমান দিনাজপুর ও বগুড়া হইতে ক্রমে দক্ষিণভিমুখে পদ্মা নদীর তীর পর্যন্ত, বিস্তর নদ, নদী, বিল, খাল ছিল এবং এখনও আছে। এজন্যই বোধ হয় সে সময়ে রাস্তা অল্প মাত্র ছিল। ক্রমে নদ, নদী, বিল, খাল মৃত্তিকায় পরিপূর্ণ হইয়া ভুমি উচ্চ হইতেছে; এবং রাস্তারও প্রয়োজন হইতেছে। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের রাজত্বে এখন রাজসাহীতে অনেক রাজপথ তন্মধ্যে কতকগুলিতে কি বর্ষা কি গ্রীষ্ম সকল ঋতুতেই গমনাগমন চলে এবং কতকগুলি বর্ষার সময়ে জলাকীর্ণ থাকে। বোয়ালিয়া হইতে শরদহ, চারঘাট, লালপুর, অরণকোলা দিয়া পাবনা পর্য্যন্ত একটী রাজপথ। বোয়ালিয়া হইতে পুঁঠীয়া, নাটোর, দিঘাপতিয়া, সিঙ্গড়া ও বগুড়া পর্যন্ত একটী রাজপথ। বোয়ালিয়া হইতে গোদাগাড়ী একটা রাজপথ। গোদাগাড়ী হইতে দিনাজপুর একটা রাস্তা; আবার গোদাগাড়ী হইতে মালদা আর একটা রাস্তা। বোয়ালীয়া হইতে নওহাটা দিয়া নওগাঁও একটা রাস্তা এই রাজপথগুলি প্রসিদ্ধ।

(১) রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস।

পঞ্চম অধ্যায়

ভূসম্পত্তি

রাজসাহী জেলার ভূসম্পত্তি প্রধানতঃ পাঁচ প্রকার যথা ঃ—

(১) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিদারী।

(২) গবর্ণমেন্ট খাস মহাল।

(৩) নিষ্কর ভুমি।

(৪) যে সকল ভূসম্পত্তির নির্দ্দিষ্ট কর জমিদারকে দেওয়া হয়।

(৫) কম বেশী সর্ত্তের ভূসম্পত্তি।

(১) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিদারী, (২) গবর্ণমেন্ট খাসমহাল।–

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে এইরূপ জমিদারীর বা ষ্টেটের সংখ্যা ১৭১৭ ছিল। ১৮৯৮-৯৯ খৃষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ষ্টেট ১৫৪১ অচিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ষ্টেট ২৩, এবং খাসমহাল ২৬, মোট ষ্টেটেব সংখ্যা ১৫৯০। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি খারিজা তালুক বলিয়া প্রসিদ্ধ। দশ-শালা বন্দোবস্তের পূর্ব্বে কোন কোন পরগণা হইতে কোন কোন জমিদার কোন ডিহি বা গ্রাম খারিজ করিয়া ব্যক্তি বিশেষকে দেওয়ায় খারিজা তালুকের সৃষ্টি হয়। গবর্ণমেন্ট রাজস্ব না পাওয়ায় লোকশানী মহাল বলিয়া, যে সকল ভূসম্পত্তি নিলাম করিলেও অন্য কেহ ক্রয় না করে, গবর্ণমেন্ট তাহা নিজ তহশীল ভুক্ত করিয়া রাখেন। ঐ সকল ভূসম্পত্তির জমিদার নিজ গবর্ণমেন্ট। নদীর গর্ভ হইতে যে সকল চরের উৎপত্তি হয়, সেই সকল ভূসম্পত্তিই প্রকৃত খাসমহাল। এপ্রকার ষ্টেট অল্প ও ক্ষুদ্র।

(৩) নিষ্কর ভুমি।-- ১৮৯৮-৯৯ খৃষ্টাব্দে নিষ্কর ভূমিব সংখ্যা ১৮৩৭। এইরূপ ভূসম্পত্তি দশ প্রকার যথা ঃ— (ক) আয়মা, (খ) মদৎমাস (গ) দেবোত্তর (ঘ) ব্রহ্মোত্তর, (ঙ) পীরপাল; (চ) মহাত্রাণ, (ছ) ভোগোত্তব (জ) চাকরাণ ভুমি (ঝ) হেবা, (ঞ) জায়গীর। এই নিষ্কর ভুমি ধর্ম্মার্থ এবং ব্যক্তি বিশেষের বা বংশ বিশেষের উপকারার্থ দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি নিষ্কর ভূমি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পুর্বে এবং কতকগুলি পরে রেকর্ড হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি নিষ্কর ভূমি হিন্দু প্রদত্ত এবং কতকগুলি মুসলমান প্রদত্ত। লালপুর ও নাটোর থানার অন্তর্গত মুসলমান প্রদত্ত নিষ্কর ভূমিই বেশী।

(ক) আয়মা।— আয়মা ভুমি নিষ্কর অথবা সামান্য কর গ্রহণে মৌলবী অথবা ধার্ম্মিক মুসলমানকে অথবা কোন ধর্ম্মার্থ অথবা দরিদ্রের উপকার জন্য মোগল সম্রাটেরা দান করিয়া যান। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সময় হইতেও মুসলমানেরা ঐ মোগল সম্রাট প্রদত্ত আয়মা ভূমি ভোগ দখল করিয়া আসিতেছে। রাজসাহীতে বাঘার আয়মা ভূমিই বৃহৎ। এই আয়মা ভুমি মোগল, সম্রাট সাহাজাহান প্রদত্ত। বাঘার খোন্দকারেরা পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ভোগ দখল করিয়া আসিতেছে।

(গ) দেবোত্তর।– এই নিষ্কর ভুমি হিন্দুদের দেবতাদিগের সেবার জন্য প্রদত্ত।

(ঘ) ব্রহ্মোত্তর।– এই নিষ্কর ভুমি ব্রাহ্মণগণের প্রতিপালন জন্য প্রদত্ত হইয়াছে।

(ঙ) পীরপাল।– পীরপাল ভূমি প্রায় মুসলমান গ্রামেই আছে। পীরেব দরগা, মস্‌জিদ আদি রক্ষা জন্য এই পীরপাল ভূমি প্রদত্ত হইয়াছে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে হিন্দু জমিদাবেরা দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর, ভোগোত্তব ও মহাত্রাণ ভূমি হিন্দুদিগকে দান করেন এবং আর কতকগুলি মোগল সম্রাট প্রদত্ত। নাটোর রাজবংশের দানশীলা মহারাণী ভবানী দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর আদি ভূমি বিস্তব দান করিয়া যান। রাজসাহী প্রদেশের ব্রাহ্মণগণের অল্প বিস্তর কিছু ব্রহ্মোত্তর ভূমি নাই, এরূপ ব্রাহ্মণ অতি বিরল। প্রাচীনকালে হিন্দু রাজারা ক্ষত্রিয় ও কায়স্থকে যে ভূমি দান করিতেন তাহাকে "মহাত্মারণ" বলিত। "মহত্মারণ" শব্দের অপভ্রংশে "মহাত্রাণ" প্রচলিত হয়।

(চ), (ছ) ভোগোত্তর ও মহাত্রাণ।– এই নিস্কর ভূমি স্বজন বন্ধুবান্ধব এবং সম্মানিত ভদ্রলোকদিগের প্রতিপালন জন্য জমিদার কর্ত্তৃক প্রদত্ত। মহাত্রাণ ভূমি পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ভোগ দখল করিতে পারা যায়, কিন্তু ভোগোত্তর ভূমি ব্যক্তিগত এবং যে ব্যক্তিকে দেওয়া হয় সে তাহার জীবন পর্য্যন্ত ভোগ দখল করিতে পারে।

(জ) চাকরাণ ভূমি।– পাইক, সরদার, নাপিত, খানসামা প্রভৃতির কার্য্যের জন্য বেতন না দিয়া নিস্কর ভূমি দেওয়া হয়। যে ব্যক্তিকে যে কার্য্যের জন্য নিস্কর ভূমি দেওয়া হয়, সে ব্যক্তি সে কার্য্য না করিলে, অপর ব্যক্তিকে এই ভূমি প্রদানে সেই কার্য্য করাইয়া লওয়া হয়। ভূমিব আদর ক্রমে বৃদ্ধি হওয়ায় এ প্রথা ক্রমে রহিত করিয়া জমিদারেরা বেতন ভোগী চাকর বাখিতে প্রস্তত হইয়াছেন।

(৪) যে সকল ভূসম্পত্তির নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব জমিদারকে দেওয়া হয়।– এইরূপ ভূসম্পত্তি ১৭ প্রকার যথা ঃ— (১) পত্তনী, (২) দর পত্তনী, (৩) দরাদর পত্তনী, (৪) দরদীরাদীব পত্তনী, (৫) ছে-পত্তনী, (৬) সিকিমী তালুক বা জোত, (৭) কায়েমী জোত, (৮) মৌরসী জোত, (৯) মোকররী জোত, (১০) মৎ কদমী জোত, (১১) ইস্তীমুরাবী জোত, (১২) পুর্ব্বোক্ত ছয় প্রকার জোতের দরজোত স্বত্ত্ব, (১৩) মৌরসী ইজারা, (১৪) দর মৌরসী ইজারা, (১৫) চক জমা, (১৬) দরচক জমা, (১৭) রাইতওয়ারী। এই প্রকার ভূমি মধ্যে পত্তনী তালুক শ্রেষ্ঠ। পত্তনী তালুক জমিদারীর মতই, কিন্তু পত্তনীর রাজস্ব গবর্ণমেন্টকে না দিয়া জমিদারকে দিতে হয় এবং রাজস্ব বাকীর জন্য নিলাম হইলে পত্তনী স্বত্ত্বের লোপ পাইতে পারে। ১৮১৯ খৃস্টাব্দের পূর্ব্বে অতি অল্প পত্তনী তালুক রাজসাহীতে ছিল ১৮১৯ সালের ৮ আইন প্রচলিত হওয়ার পর হইতে বাজসাহীতে অনেক পত্তনী তালুকের সৃষ্টি হয়। সিকিমী, কায়েমী, মৌরসা প্রভৃতি ভূসম্পত্তির অধিকারীরা এক নির্দিষ্ট জমায় পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ভোগ দখল করিয়া থাকে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর হইতে এইরূপ ভূসম্পত্তির সৃষ্টি হয়। দীর্ঘকাল এক জমায় ভোগ দখল সর্ত্তে "রাইতওয়ারী' ভূসম্পত্তির জমা বৃদ্ধি না হইয়া কৃষক শ্রেণীর লোকেরা স্বভাবতঃ দখল করিয়া থাকে।

(৫) কমি বেশী সর্ত্তের ভূসম্পত্তি।– এরূপ ভূসম্পত্তির রাজস্ব চিরকাল এক হারে আদায় হয় না। রাজস্ব কখন বেশী কখন কমি হয়। এরূপ সম্পত্তি নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ—

(১) ইজারা।– কায়েমী স্বত্ববান মালেক নিজ স্বত্ব কিছু দিনের জন্য অন্য ব্যক্তিকে কোন নির্দ্দিষ্ট জমায় অধিকার দেয়। সেই কাল অতীত হইলে পূর্ব্ব জমায় বা বেশী জমায় বা কমি জমায় পুনরায় বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারে। ইহাকে মেয়াদী ইজারাই বলিয়া থাকে।

(২) দর-ইজারা।– ইজারদারের অধীন যে ইজারা তাহাকে দর ইজারা বলে।

(৩) দরাদর ইজারা।– দর-ইজারাদরের অধীন যে ইজারা তাহাকে দরাদর ইজারা বলে।

(৪) জেন্মাদারী।– কিছু কালের জন্য কোন ব্যক্তির নিকট নির্দ্ধারিত জমার জেন্মা রাখাকে জেম্মাদারী বলে।

(৫) দখিলকারী স্বত্ব।– কৃষকেরা বহুকাল দখল ভোগ করাতে জমীর স্বত্ব তাহাদিগের প্রতি বর্ত্তে। এই স্বত্বযুক্ত ভূমি রাজসাহীতে অধিক। সাধারণতঃ ইহা হস্তান্তর করা যায় না। কোন কোন জমিদার হস্তান্তরে বাধা দেয় না এবং কোন কোন জমিদার বাধা দেয়। ইহার অধীন প্রজাকে "কোরফা" প্রজা বলে। "কোরফা" প্রজার স্বত্ব নিতান্ত দুর্ব্বল।

(৬) মিয়াদী পাট্টা।– নির্দিষ্ট কালের জন্য নিজ স্বত্ব পাট্টা করিয়া দেওয়া।

(৭) জমিদারের ইচ্ছানুরূপ প্রজা।– জমিদার ইচ্ছা করিলে জমি ছাড়াইয়া লইতে পারে কিন্তু দখিলকারী স্বত্বাধিকারকে জমির দখল হইতে জমিদার ইচ্ছানুরূপ উচ্ছেদ করিতে পারে না। কিন্তু জমার কোন তারতম্য নাই।

(৮) হুজরী জোত।– এইরূপ জোতের খাজানা-তহশীলদার বা গোমস্তাকে না দিয়া একবারে জমিদারের নিকট দাখিল করে।

(৯) আধি বা বর্গা।– জমির উৎপন্ন ফসলের অর্দ্ধেক যাহার যে জমি সে পায় এবং অপরার্দ্ধ যে জমি চাষ ও বুনানী করে সে পায়।

(১০) খাসখামার বা নিজ জোত।– নীলের কুঠীয়াল সাহেবেরা জমিদারের নিকট মহাল ইজারা লইয়া ইজারার সময় এই প্রকার জোত (১) সৃষ্টি করে। লষ্করপুর পরগণায় এইরূপ জোতই প্রায় দেখা যায়।

রাজসাহীতে কমি বেশী সর্ত্তের সম্পত্তিই বেশী। যদি সময় সময় জরিপ জমাবন্দী করিয়া জমিদার প্রজার নিকট হইতে বৃদ্ধি হারে কর আদায় করিয়া থাকে, তথাপি কম বেশী সর্ত্তের ভূসম্পত্তির লাভ বেশী এবং কৃষকেরা এইক্ষণে বহুতর নজর দিয়া জমিদারের নিকট জোত পত্তন হইতেছে জমিদারী অপেক্ষা এইরূপ ভুসম্পত্তিতে লাভ বেশী, যেহেতু এক বিঘা জমিতে যে শস্য উৎপন্ন হয় তাহা জমিদারের রাজস্বের এক বিংশতি অংশেরও কম, অথচ কাহার সহিত বিবাদ বা কলহ করিতে হয় না। কৃষকদিগের পক্ষে এইরূপ ভূসম্পত্তি যেরূপ লাভজনক, ভদ্রলোকদিগের পক্ষে সেরূপ নহে। আবার ভদ্রলোকদিগের জমিদারের নিকট অপমান সহ্য করিতে হয়। আজি কালি রাজসাহীতে অনেকে অর্থলাভ অপেক্ষা অপমান লঘু জ্ঞান করে। ইহা অশিক্ষিত ভদ্রলোকদের পক্ষেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

(১) "নিজ জোতের প্রকৃত ব্যবহারিক অর্থ, নিজের আবাদি ভূমি। কিন্তু কৃষকের নীলকরদিগের সম্বন্ধে ইহার অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিত। তাহাবা বলিত যে, প্রজার চতুর্দ্দশপুরুষের ভোগের ভূমি, যদি নীল উৎপন্নের যোগ্য হয়, তবে সেই ভূমি নীলকরদিগেব 'নিজ জোত' এবং তাহার অন্য লিখিত দলিল না থাকিলেও, নীল বৃক্ষের মূল ও নীলের চারাই আদালতে গ্রাহ্য অমোঘ দলীল।"— শ্রীযুক্ত গিরীশ চন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় কৃত মহারাণী শরৎ সুন্দরীর জীবন চরিত।

ষষ্ঠ অধ্যায়
রাজসাহী রাজ্য শাসন ও রাজস্ব

রাজসাহী প্রদেশ মৎস্য দেশের অন্তর্গত। এই মৎস্য দেশের রাজা বিরাট ছিলেন। তাঁহার রাজধানী বিরাট নগর, উত্তর বঙ্গ রেলওয়ে ষ্টেসন পাঁচবিবি হইতে প্রায় ১৭ মাইল দূর। এই নগরে বাস করিয়া, মহারাজ বিরাট স্বীয় শ্যালক সেনাপতি বলবান কীচকের সাহায্যে মৎস্য দেশান্তর্গত রাজসাহী প্রদেশের কেবল যে কর গ্রহণ করিতেন এমত নহে; রথযূথপতি বলবান ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মার রাজ্যে, মৎস্যরাজ বিরাট সেই সেনাপতি কীচকের বাহুবলে বারংবার নানা প্রকার উৎপাত করিতেন। যে সময় বিরাট নগরে পঞ্চ পাণ্ডবগণ অজ্ঞাত বাস করেন, সেই সময় কীচক দ্রৌপদীর রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া সেই ললনার কেশাকর্ষণ করিয়া অপমান করাতে মহাবীর ভীমসেন সেই ক্রুর-স্বভাব নিষ্ঠুর পাপাত্মাকে বধ করেন। কীচকের নিধন বার্ত্তা শ্রবণে সুশর্ম্মা সসৈন্যে বিরাটরাজ্য আক্রমণ করেন। কেবল পাণ্ডবগণের বাহুবলেই মৎস্যদেশাধিপতি মহারাজ বিরাট উপস্থিত বিপদ হইতে বিমুক্ত হইয়া গো-ধন রক্ষা করেন এবং নিজ মঙ্গল লাভ করেন। সেই অবধি বিরাটরাজ পাণ্ডবগণের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইয়া বন্ধুতা স্থাপন করেন। বিরাট রাজার সময় হইতে সেন বংশীয় রাজাদিগের সময় পর্য্যন্ত যে হিন্দু-রাজগণ রাজসাহী প্রদেশের কর গ্রহণ করিতেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। বখ্‌তীয়ার লক্ষণ সেনকে পরাজিত করার পর হইতে বঙ্গদেশ মুসলমান রাজার অধিকৃত হয়। এই সময় হইতে মুসলমান সম্রাটেরা রাজা জমিদারগণকে শাসনাধীন রাখিয়া রাজসাহীর কর গ্রহণ করিতেন। কিন্তু ১৪০৫ খৃষ্টাব্দে এক জন হিন্দু রাজা গণেশ (১) বা কংস বাঙ্গালার অধিপতি হন এবং ৯/১০ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার পুত্র জিতমল মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া জেলালুদ্দিন মহাম্মদ সা নাম ধারণ করেন। (২) রাজা গণেশ বা কংস এবং তাহার পুত্র ও পৌত্র ৪০ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহাদের রাজ্য করতোয়া নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পুনরায় বঙ্গদেশ মুসলমানদের অধীন হইল। আকবরের সময়ে রাজা তোড়লমল্ল "ওয়াশীল তুমার জমা" নামক হিসাব প্রস্তুত করেন। এই হিসাবে বঙ্গভূমি ১৯ সরকারে ও ৬৮২ মহলে বিভক্ত হয়। এই সময় হইতে বঙ্গদেশের রাজস্ব আদায় কিয়ৎ পরিমাণে সুবন্দোবস্ত হয়। আবার আকবরের সময়ে বঙ্গদেশ "বার ভূঁইয়া" নামক জমিদারেরা অতি পরাক্রমশালী ছিল। এই "বার ভূঁইয়া" মধ্যে শাঁতুল, তাহিরপুর ও পুঁঠীয়া রাজগণ রাজসাহীর অন্তর্গত ছিল। ইহাদের দেওয়ানী ও ফৌজদারী দুই প্রকার ক্ষমতাই ছিল। ইহাঁদের সৈন্য, গড় আদি ছিল। ইহাঁরা মোগল সম্রাটকে কর দিতেন।

১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে শোভা সিংহ নামক বর্দ্ধমানের জনৈক জমিদার রহিম খাঁ নামক এক পাঠানের সহিত একত্রিত হইয়া বিদ্রোহী হন এবং হুগলী অধিকার করেন। এই সুযোগে ইংরাজেরা "ফোর্ট উইলিয়াম" নামক দুর্গ নির্ম্মাণ করিবার ছল পান। শোভা সিংহ শত্রুর

(১) গণেশ ভাড়াড়িয়া ও দিনাজপুরের জমিদার ছিলেন। মহাত্মা রমেশচন্দ্র দত্ত বলেন ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দে গণেশ বাঙ্গলার রাজা হন।

(2) "Amonng the usurpers was Raja Kans. Hindu Zeminder. His son embraced the mohammadan religion."- Appendix, on the states formed on the dissolution of the Empire of Delhi - Elphinstone's Hisotyr of India

অস্ত্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। রহিম খাঁকে দমন করিবার জন্য আরঙ্গজীবর পৌত্র আজিমওসান, ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার সুবাদার হন। রহিম পরাজিত ও নিহত হইলে বাঙ্গালায় শান্তি স্থাপিত হইল। এদিকে ইংরেজরা ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে আজিমওসানের নিকট হইতে কলিকাতা, গোবিন্দপুর ও সূতানুটী ক্রয় করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ অধিকৃত করিবার সূত্রপাত করিলেন। সেই আজিমওসানের শাসন কালে ১৭০১ খৃস্টাব্দে মুরশিদ কুলি খাঁ বা জাফর খাঁ নামক এক ব্যক্তি বাঙ্গালার দেওয়ান ছিলেন। মুরশিদ ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু পরে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মুবশিদকুলী খাঁ নাম ধারণ করেন এবং স্বীয় কার্য্যক্ষতার গুণে আরঙ্গজীবের প্রিয়পাত্র হন। এই মুরশিদকূলী খাঁর কৌশলেই রাজধানী ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে উঠিয়া আইসে। অবশেষে সম্রাট ফেরক সিয়ারের সময় সেই মুরশিদ বাঙ্গালার সুবাদার হন।

নাটোর রাজবংশের আদিপুরুষ রঘুনন্দন প্রথমতঃ পুঁঠীয়া রাজসংসারে সামান্য কর্ম্মে নিযুক্ত হন। পরে পুঁঠীয়ার রাজা দর্পনারায়ণ তাঁহাকে পুঁঠীয়ার রাজসরকারে উকিল নিযুক্ত করিয়া প্রথমে ঢাকায় তারপরে মুর্শিদাবাদে নবাব দরবারে পাঠাইয়া দেন। মুর্শিদাবাদে নবাব দরবারে রঘুনন্দন স্বীয় বুদ্ধিকৌশলে ক্রমে "নাএব কানুনগোর" পদ এবং "রায় রায়ান" উপাধি প্রাপ্ত হন। এই সময় রঘুনন্দন মুরশিদকুলী খাঁর প্রিয়পাত্র হইয়া তাঁহার অনুগ্রহে অনেক জমিদারী লাভ করেন। তাঁহার সমস্ত জমিদারী তাঁহার ভ্রাতা রামজীবনের নামে গৃহীত হইয়া ছিল।

ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকে ইংরাজ, ফরাসী, ওলোন্দাজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকগণ বাণিজ্যবিস্তার ছলে রত্ন প্রসবিণী ভারতভূমিকে অধিকার করিবার জন্য মনে মনে সংকল্প করিতেছিলেন। এই সময় আরঙ্গজীবনের পৌত্র আজিমঊসান বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা হইলেও, মুরশিদকুলী খাঁ বাঙ্গালাব প্রকৃত কর্ত্তা ছিলেন। তখন মুর্শিদাবাদে তাঁহার রাজধানী। তাঁহাবই দৌহিত্র সৈয়দ রেজা খাঁ বাঙ্গালার দেওয়ানী করিতেন। ইহাদের দুই জনেবই অযথা অত্যাচারে হিন্দু জমিদারগণ অত্যন্ত প্রপীড়িত এবং ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। লজ্জা, অপমান ও কষ্টে জমিদারগণ নিজ নিজ মৃত্যু কামনা করিতে লাগিলেন। এই সময় রাজসাহীর জমিদার রাজা উদিত (উদয়) নারায়ণ নিজ বীরত্ব প্রকাশ করিতেছিলেন।

রাজা উদিত (উদয়) নারায়ণ রাজ মুর্শিদাবাদের বড় নগরের নিকটস্থ বিনোদ লালা নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। উদিত নারায়ণকে কেহ কায়স্থ কেহ ব্রাহ্মণ বংশীয় বলেন। যে সময় মুর্শিদকুলী খাঁ বাঙ্গালার নবাব হইয়া মুর্শিদাবাদে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময় উদিত নারায়ণের প্রতি এক অতি বিস্তীর্ণ জমিদারী শাসনের ভার ছিল। সমগ্র রাজসাহী চাকলা তাঁহার দ্বারা শাসিত হইত। তাঁহার জমিদারী পদ্মানদীর উভয় পারে বিস্তৃত ছিল। বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ, বীরভুম, সাঁওতাল পরগণা, রাজসাহী, বগুড়া, মালদহ, পাবনা জেলার অধিবাসীগণ ও রঙ্গপুর ও দিনাজপুর জেলার কতক অধিবাসীগণ তাঁহাকে রাজস্ব প্রদান করিত। তাঁহার সমস্ত জমিদারীর নাম রাজসাহী। বহু বিস্তৃত জমিদারী বিনা গোলযোগে শাসন করায় এবং সুচারুরূপে শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করায়, নবাব মুরশিদ কুলী খাঁ তাঁহার প্রতি প্রথমে অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁহার প্রতি নবাব এইরূপ কিছূদিন সন্তুস্ট ছিলেন। চিরকাল কাহার সমান যায় না। উদিত নারায়ণেব ভাগ্যলক্ষ্মী ক্রমে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। তাঁহার সৌভাগ্যের ক্রমেই হ্রাস দৃষ্টি হইতে লাগিল অবশেষে বাঙ্গালা ১১২০ সাল অর্থাৎ ১৬২৯ খৃষ্টব্দে রাজসাহীর জমিদার উদিত নারায়ণ নবাবের কর্ম্মচারীগণের অত্যাচরে উৎপীড়িত হইয়া নিজ অনুচরবর্গ সমবেত করিয়া বিদ্রোহী হন এবং যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সুলতান-বার পর্ব্বতে প্রস্থান করেন। নাটোর বংশের আদিপুরুষ রঘুনন্দন তাঁহাকে ধৃত করিয়া বন্দী করিয়া আনিলে, তাহার পুরস্কার স্বরূপ তাঁহার ভ্রাতা রামজীবনকে

সমগ্র রাজসাহীর জমিদারী প্রদান করা হয়। (১)

রামজীবন এই বিস্তৃত জমিদারী প্রাপ্ত হইয়া ছাইভাঙ্গার বিল বেষ্টিত নাটোর গ্রামে চৌকি বা পরিখা খনন করিয়া নিজ রাজধানী স্থাপিত করিলেন। সম্ভবতঃ ১৬২৯ খৃষ্টাব্দ হইতে সমগ্র রাজসাহী নাটোর বংশোদ্ভব রাজাদের অধিকৃত হয়। আরঙ্গজীবের সময়ই বাঙ্গালাদেশে বর্গীর হাঙ্গামা উপস্থিত হইয়া বঙ্গদেশে অরাজকতা দেখা দিল। এই সময় নবাব আলিবর্দ্দি মোগল সম্রাটকে কর প্রদানে তাচ্ছিল্য করিতে লাগিলেন এবং জমিদারগণও স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আলীবর্দ্দীর পর সিরাজদ্দৌলা নবাব হইলেন আবার সিবাজদ্দৌলাব অধঃপতনের পর, জমিদারগণ ইংরেজদের হস্তে পতিত হইলেন। সে সময় রাজসাহীর রাজ্য মহারাণী ভবানীব হস্তে ছিল। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাঙ্গালার দেওয়ানী প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার শাসন ভার গ্রহণ করিলে, রাজসাহী ইংরাজ শাসনের অধীন থাকিযা নাটোর রাজাদের অধিকৃত ছিল। এই সময় হইতে এবং পরে অনেক বৎসর পর্যন্ত সমগ্র রাজসাহী জমিদারী এক ব্যক্তির হস্তে ছিল এবং সেই ব্যক্তি কেবল ইংরেজ গবর্ণমেন্টকে রাজস্ব দিবার জন্য দায়ী ছিলেন। ১৭৭৮—৭৯ খৃষ্টাব্দে ও রাজসাহী বিখ্যাতা মহারাণী ভবানীর হস্তে অর্পিত ছিল। তিনি ইংরেজ গবর্ণমেন্টকে বার্ষিক সিক্কা ২,২৮৫,৬৪৯ টাকা রাজস্ব প্রদান করিতেন। মহারাণী ভবানী ক্রমে রাজস্বের অনেক টাকা বাকী করিলেন। (২) কিছু দিন গবর্ণমেন্ট সেই রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া খাসে কর আদায় করিতে লাগিলেন অথবা বাজস্ব আদায় জন্য ব্যক্তি বিশেষকে চুক্তি করিয়া দিলেন। এই প্রণালী অবলম্বনে রাজস্ব কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইল। অবশেষে রাণী তাঁহার পোষ্য পুত্র রাজা রামকৃষ্ণকে সমুদয় জমিদারী অর্পণ করিলেন। ১৭৯০ খৃস্টাব্দে দশশালা বন্দোবস্তের সময় রাজা রামকৃষ্ণ সমুদয় রাজসাহী রাজ্য সিক্কা ২,৩২৮,১০১ টাকা জমায় বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন। কিন্তু ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় রাজার অধীনস্থ্ তালুকদারেরা স্বাধীন ভাব অবলম্বন করিলে এবং রাজাকে রাজস্ব না দিয়া গবর্ণমেন্টের খাজানাখানায় একবারে রাজস্ব দিতে লাগিল। ইহাতে এই ফল হইল যে ১৮০০—১৮০১ খৃষ্টাব্দ জেলায় সর্ব্বশুদ্ধ ১৬০৩ ভিন্ন ভিন্ন জমিদার হইল। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে পদ্মানদীর দক্ষিণ ভাগে নিজ রাজসাহী নামক স্থান মুর্শিদাবাদ ও অন্যান্য জেলার সামিল হওয়ায় রাজসাহী জেলার রাজস্ব কমিয়া সিক্কা ১,৪৭১,৪৫০ টাকা হয়। ১৮৫০-৫১ খৃষ্টাব্দে রাজসাহী জেলার তৌজিভুক্ত ৪৫৫০ জমিদার এবং তালুকদার সিক্কা ১,১৭৬,৫১৬ টাকা জমায় ১৮১৩ সংখ্যক জমিদারী বা ষ্টেট দখল করেন। জেলার আয়তন কমিয়া যাওয়ায় ১৮৭০-৭১ খৃষ্টাব্দে তৌজিভুক্ত জমিদাবী বা ষ্টেট ১৮১৩ স্থানে ১৭২১ হয় এবং রাজস্ব কোম্পানি ১,০২৯,০৩১ টাকা স্থির হয়। ১৮৯৮—৯৯ খৃষ্টাব্দে গবণমেন্ট রাজস্ব পথকর সমেত ১২০২১৪২ টাকা ছিল।

সময় সময় জেলার আয়তন হ্রাস বৃদ্ধি হওয়াতে রাজস্বেরও কমিবেশী হইয়াছে। যে রাজসাহী প্রদেশ এক ব্যক্তির হস্তে ছিল, সেই রাজসাহীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহুতর তালুকদারের হস্তে অর্পিত হওয়াতে প্রজার কর ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। ইহাতে দরিদ্র প্রজার রক্ত-শোষণ করিয়া তালুকদারদিগেরই পুষ্টি লাভ হইতেছে।

রাজসাহী জেলা পরগণা অনুসারে বিভক্ত হইয়া, পরগণা বা তদন্তর্গত ডিহি, প্রত্যেক জমিদার বা তালুকদারের হস্তে অর্পিত হয়। সেই জমিদার বা তালুকদার জেলার কালেক্টরীতে নিজ নিজ রাজস্ব কিস্তি মত দিতে আরম্ভ করিলেন। জেলার আয়তন হ্রাস বৃদ্ধি হওয়ায় পরগণার

(1) Calcutta Review, 1878
(2) Huntar's Statistical Account Rajshahi

সংখ্যাও কমিবেশী হইয়া থাকে। ১৮৭০—৭১ খৃষ্টাব্দে রাজসাহী জেলা নিম্ন ৪৮ পরগণায় বিভক্ত হইয়াছিল। (১)

(১) **আমরুল**।– আয়তন ৬৪,৪৯৯ একর অথবা ১০০.৭৮ বর্গ মাইল। এই পরগণায় ৫ ডিহি যথা ঃ— (১) ব্রজপুর ও ভাগ সুন্দর (জমিদার কাশীম বাজারের রাজা, পত্তনীদার মোহিনী মোহন রায়), (২) রাম-রামা (বর্ত্তমানে নাটোর রাজা ছোটতরফ), (৩) সেরকোল (নাটোর মহারাজা বড়তরফ), (৪) বিশা (ফরাশ ডাঙ্গা গুদল পাড়া নিবাসী জমিদার), (৫) বাকা (সন্তোষের জমিদার)। এই পরগণায় ৪৯ ষ্টেট।

(২) **বাজুরাস**।– আয়তন ৮৮৮৫ একর অথবা ১২.৬৩ বর্গ মাইল। এই পরগণায় ৫ ষ্টেট।

(৩) **বাজুরাস-মহবৎপুর**।– আয়তন ৫৫২৪ একর অথবা ৮.৬৩ বর্গ মাইল। এই পরগণায় ১৪ ষ্টেট।

(৪) **বলিহার**।– আয়তন ১৮০১৩ একর অথবা ২৮.১৫ বর্গ মাইল। এই পরগণার ৮ ষ্টেট। জমিদার বলিহারের রাজা।

(৫) **বান্দাইখাড়া**।– আয়তন ৯৯৩২ একর অথবা ১৫.৫২ বর্গ মাইল। এই পরগণায় ৪ ষ্টেট। জমিদার— মহাদেবপুরের জমিদারগণ ও কাশীমপুরের রায় বাহাদুর জমিদার প্রভৃতি।

(৬) **বনগাঁও জায়গীর**।– আয়তন ১৪,২৪৭ একর অথবা ২২.২৬ বর্গমাইল এই পরগণায় ৬ ষ্টেট।

(৭) **বন গাঁও খালসা**।– আয়তন ৩৩,৯৩২ একর অথবা ৫৩.০২ বর্গ মাইল এই পরগণার ২২ ষ্টেট।

(৮) **বার্ব্বকপুর**।– আয়তন ৬৩,৭৪৭ একর অথবা ৯৯.৬০ বর্গ মাইল এই পরগণায় ৩৯ ষ্টেট। কোন কোন গ্রামে গাঁজা জন্মে। জমিদার দুবলহাটির রাজা।

(৯) **বড়বড়িয়া**।– আয়তন ৫৭১৩ একর অথবা ৮.৯৩ বর্গমাইল। এই পরগণায় ৬ ষ্টেট। জমিদার করচমাড়িয়ার সরকার প্রভৃতি।

(১০) **তপ্পে বিয়াস**।– আয়তন ৭৬০৫৪ একর অথবা ১১৮.৮৩ বর্গমাইল। এই পরগণায় ৭৮ ষ্টেট।

(১১) **চাঁদলাই**।– আয়তন ৫৯.৯১৭ একর অথবা ৯৩.৬২ বর্গমাইল। এই পরগণায় ৫৮ ষ্টেট।

(১২) **তপ্পে চাঁপিলা**।– আয়তন ২৪৯,৪৯৯ একর অথবা ৩৮৯.৮৪ বর্গমাইল। এই পরগণায় ৯৫ ষ্টেট।

(১৩) **চৌগাঁও**।– আয়তন ২৯,৪৮৭ একর অথবা ৪৬.০৭ বর্গমাইল। এই পরগণায় ৬৫ ষ্টেট। জমিদার রমণীকান্ত রায় বি,এ।

(১৪) **চীনাসো**।– আয়তন ১৩১৮৫ একর অথবা ২০.৬০ বর্গমাইল। এই পরগণায় ৩৭ ষ্টেট।

(১৫) **ছিণ্ডাবাজু**।– আয়তন ১৯,৬৪৩ একর অথবা ৩০.৬৯ বর্গমাইল। এই পরগণায় ২৮ মৌজা।

(1) Huntar's Statistical Account Rajshahi.

(১৬) **দক্ষিণ জোয়াড়**।– আয়তন ১৩০৮৭ একর অথবা ২০.৪৫ বর্গমাইল। এই পরগণায় ১৫ স্টেট।

(১৭) **ধামীন**।– আয়তন ২৪১৯৮ একর অথবা ৩৭.৮১ বর্গমাইল। এই পরগণায় ৪৩ স্টেট।

(১৮) **দিঘা**।– আয়তন ১৭,৫২৬ একর অথবা ২৭.৩৮ বর্গমাইল। এই পরগণায় ২৩ স্টেট।

(১৯) **গঙ্গারামপুর**।– আয়তন ৭০৮২ একর অথবা ১৯.০৫ (?) বর্গমাইল। এই গরগণায় ২০ স্টেট।

(২০) **গয়াহাটা**।– আয়তন ৬৬১০ একর অথবা ১০.৩৩ বর্গমাইল। এই গরগণায় ১১ স্টেট।

(২১) **গোপীনাথপুর**।– আয়তন ৫৯২৭ একর অথবা ৯.২৬ বর্গমাইল। এই পবগণায় ৩৬ স্টেট।

(২২) **গোরের হাট বা গরের হাট**।– আয়তন ৩৭,২৭৬ একর অথবা ৫৮-২৪ বর্গমাইল। এই পরগণায় ৪৩ মৌজা।

(২৩) **গোবিন্দপুর**।– আয়তন ৪৬,৩৩০ একর অথবা ৭২.৩৯ বর্গমাইল। এই গরগণায় ৫২ স্টেট।

(২৪) **হাণ্ডিয়াল**।– আয়তন ১৩,৪১৬ একর অথবা ২০.৯৬ বর্গমাইল। এই পরগণায় ৫ স্টেট।

(২৫) **হুসুরপুর**।– আয়তন ১৫,২২৯ একর অথবা ২৩.৮০ বর্গমাইল। এই পবগণায় ২৪ স্টেট।

(২৬) **ইছলামপুর**।– আয়তন ১৬২৭ একর অথবা ২.৫৪ বর্গমাইল। এই পরগণায় ৫ স্টেট।

(২৭) **জাহাঙ্গিরাবাদ**।– আয়তন ১৮৪ একর অথবা .২৯ বর্গমাইল। এই পরগণায় ১ স্টেট মাত্র।

(২৮) **জিয়াসিন্ধু**।– আয়তন ৭৬৬১২ একর অথবা ১১৯.৭০ বর্গমাইল। এই পরগণায় ২০ স্টেট।

(২৯) **কালীগাঁও**।– আয়তন ৪১১০৫ একর অথবা ৬৪.২২ বর্গমাইল। এই পরগণায় ২৫ স্টেট।

(৩০) **কারীগাঁও কালীসকা**।– আয়তন ৫২৩৫৭ একর অথবা ৮১৮১ বর্গমাইল। এই পরগণায় ২৪ স্টেট।

(৩১) **কাশীমপুর**।– আয়তন ৪৪৮২ একর অথবা ৭.০০ বর্গমাইল। এই পরগণায় ৩ স্টেট।

(৩২) **কাটার মহল**।– আয়তন ১৩০৭১৪ একর অথবা ২০৪.২৪ বর্গমাইল। এই পরগণায় ১৮০ স্টেট।

(৩৩) **কাজীহাটা**।– আয়তন ১৮৭৬২ একর অথবা ২৯.৩২ বর্গমাইল। এই পরগণায় ৬ স্টেট।

(৩৪) **খাসতালুক**।– আয়তন ৪৪০০ একর অথবা ৬.৮৭ বর্গমাইল। এই গরগণায় ২ স্টেট।

(৩৫) **তপ্পে কুশম্বী**।– আয়তন ২৪৪৭৯ একর অথবা ৩৮.২৫ বর্গমাইল এই পরগণায় ৩৭ স্টেট।

(৩৬) **লস্করপুর**।– আয়তন ২৯৭,৯৬৪ একর অথবা ৪৬৫.৪২ বর্গমাইল। এই পরগণায় ২৯৯ স্টেট।

(৩৭) **মালঞ্চী**। আয়তন ৬৭৪৪ একর অথবা ১০.৫৪ বর্গমাইল। এই পরগণায় ২৫ স্টেট।

(৩৮) **মেহমনসাহী**।– আয়তন ৭০৩৫ একর অথবা ১০.৯৯ বর্গমাইল।

(৩৯) **মুহম্মিদপুর**।– আয়তন ৪১,৪৯১ একর অথবা ৬৪.৯৩ বর্গমাইল। এই পরগণায় ৫৬ স্টেট।

(৪০) **নীজামপুর**।– আয়তন ১২৫ একর অথবা .২০ বর্গমাইল। এই পরগণায় ২ স্টেট।

(৪১) **প্রতাপবাজু**।– আয়তন ১৯২৭০ একর অথবা ৩০.১১ বর্গমাইল। এই পবগণার ২ স্টেট।

(৪২) **রোকনপুর**।– আয়তন ৪৮২৪০—একর অথবা ৭৫.৩৭ বর্গমাইল। এই পরগণায় ২ স্টেট।

(৪৩) **শীরশাবাদ**।– আয়তন ৫৫৬ একর অথবা .৮৭ বর্গমাইল। এই পরগণার ১ স্টেট।

(৪৪) **সোণাবাজু**।– আয়তন ১১৫ ১৮০ একব অথবা ১৮০.২৮ বর্গমাইল। এই পরগণায় ৮৯ স্টেট।

(৪৫) **সূজানগর**।– আয়তন ১১১৩০ একব অথবা ১৭.৩৯ বর্গমাই·ল : এই পরগণায় ২৪ স্টেট।

(৪৬) **তাহিরপুর**।– আয়তন ৮২৯৪৪ একর অথবা ১২৯.৬০ বর্গমাইল। এই পরগণায় ৪৩ স্টেট।

(৪৭) **তারাগুণীয়া**।– আয়তন ৬৪৭ একর অথবা ১.০১ বর্গমাইল। এই পরগণায় ১৮ স্টেট।

(৪৮) **তেগাছী**।– আয়তন ৫১৮২৪ একর অথবা ৮০.৯৭ বর্গমাইল। এই পরগণাায় ৯৬ স্টেট।

সপ্তম অধ্যায়
রাজসাহীর রাজা ও জমিদার

মহাভারতীয় বিরাট নগরের ভগ্নাবশেষ, সেনাপতি কীচক বধের নর্ত্তনাগার, অজ্ঞাতবাস সময় পাণ্ডবগণ স্থাপিত দেব মন্দির, মহাভারতীয় 'সমী" বৃক্ষের স্থান নয়নপথে পতিত হইবা মাত্র সহসা এই প্রশ্নের উদয় হয় "যে মৎস্য দেশান্তর্গত বারেন্দ্রভূমি বাজসাহী প্রদেশ পাণ্ডবগণের বাসে পুণ্য ক্ষেত্র বলিয়া অদ্যাপিও কীর্ত্তিত হইতেছে, এবং যে প্রদেশের সীমা এককালে ভাগলপুর হইতে ঢাকা পর্যন্ত এবং রঙ্গপুর (ঘোরাঘাট) হইতে বীরভূম ও বীরকিটি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল; সেই বিস্তৃত রাজসাহীর অতীত বৃত্তান্ত স্মৃতি পথে উদিত হইলে আমাদের হৃদয় এক অভিনব আনন্দে পরিপূরিত হয় কেন"? এ প্রশ্নের উত্তর— দীর্ঘকাল বিদেশে বাস করার পর স্বদেশ প্রতিগমনে স্বদেশের অতীত বৃত্তান্ত শ্রবণে বা কীর্ত্তনে আমরা যেরূপ আনন্দ অনুভব করি. সেইরূপ রাজসাহীর রাজা ও জমিদারগণের অতীত বৃত্তান্ত কীর্তন করিব বলিয়া আমাদের আনন্দের সীমা রহিল না। প্রাচীন রাজসাহী— প্রাতঃস্মরণীয়া লক্ষ্মীস্বরূপা মহারাণী ভবাণীর বাসভবন; যোগী রাজা রামকৃষ্ণের যোগ স্থান; বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের কৌলিন্য প্রথানুযায়ী প্রধান সমাজ ভূমি; নানাবিধ শস্য ক্ষেত্র ও "উৎকৃষ্ট রেশম" (১) উৎপন্ন স্থান;— সে পূর্ব্বতন রাজসাহীর কীর্ত্তিকলাপ কীর্ত্তন করা স্বদেশহিতৈষিতা প্রবৃত্তিতে মানবকে চালিত কবিয়া থাকে। কিন্তু হায়! দুঃখের বিষয় যে রাজসাহীর জমিদারগণেব ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত লুক্কায়িতভাবে আছে অথবা কোন স্থানে অতীত বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিবার প্রণালী অজ্ঞাতভাব ধারণ করিয়াছে। এরূপ স্থলে প্রকৃত ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত প্রকাশ করা অত্যন্ত কঠিন। লুক্কায়িত ধন কতক পরিমাণে প্রকাশিত হইলে রাজসাহী বাসীরা অবশ্যই আনন্দ অনুভব করিবেন।

রাজসাহী রাজা ও উপাধি বিহীন সম্ভ্রান্ত জমিদারগণের সমাজক্ষেত্র।(২) কাহার রাজ উপাধি আছে কাহার উপাধি নাই। কিন্তু সম্মানে কি রাজদ্বারে, কি জাতীয় সমাজে অনেকেই উচ্চ আসন গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তকলাপ এরূপ ছিল যে রাজসাহীতে তাঁহাদের নাম যশঃ সর্ব্বজন পরিচিত ছিল। কালের গতি বিচিত্র। কালেই সকল ধ্বংস হয়। অনেক প্রাচীন বংশ ধ্বংস হইয়াছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইতিবৃত্তিও লোপ হইয়াছে। কেবল মাত্র লোক প্রমুখাৎ বংশের নাম কীর্ত্তিত হইতেছে।

রাজসাহীতে তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণের বংশ এবং সাঁতুলের রাজবংশ আদিও প্রসিদ্ধ ছিল। বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিকের অন্তর্গত এই দুইটী "ভৌমিক"—তাহিরপুর ও সাঁতুল। (৩) এই প্রাচীন বংশই ধ্বংস হইয়াছে।

নাটোর রাজবংশের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে পুঁঠীয়া রাজবংশের উৎপত্তি ইতিহাসে কীর্ত্তিত হইয়াছে। বার্ব্বকপুর পরগণার রাজা বা জমিদার ও অনেক পুরাতন ঘর বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং

(1) Grunt's Analysis of Finances of Bengal

(2) "There is a conclave of Rajas and untitled noblemen in Rajshahi Most of the families repersented by them have decayed but they at one time were large Zumiudars and perfomed important functions "- "The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review "

(৩) "বঙ্গেব দ্বাদশ ভৌমিকেব পরিচয় এই ঃ—

তাহিরপুর ও সাঁতুল রাজবংশের অভ্যুদয়েরও পূর্ব্বে দুবলহাটী রাজবংশের স্থিতি বলিয়া কথিত আছে। কিন্তু দুবলহাট রাজা একটী ক্ষুদ্র ও অপরিচিত জমিদারী এবং জমিদার নিম্ন জাতীর শূদ্র বলিয়া তাহার নাম লুক্কায়িত ছিল। নাটোরের রাজবংশ এত প্রসিদ্ধ যে সমগ্র ভারতবর্ষে ইহার খ্যাতি ও নাম অদ্যাপি বর্ণিত হইতেছে। সামান্য অবস্থা হইতে একটী অতি বিস্তৃত রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া মানব-মণ্ডলী শাসনাধীন হইয়াছিল তাহার নাটোর বংশই জাজ্জল্য প্রমাণ। রঘুনন্দন এই নাটোর বংশের ভীত্তি স্থাপন করেন। ইহা কথিত হয় যে কোন ব্যক্তি অল্প সময় মধ্যে অতিশয় ঐশ্বর্য্যবান হইলে লোকে তাহাকে বলিয়া থাকে এ ব্যক্তির "রঘুনন্দনী বাড়"। নাটোর বংশের রাজত্ব সময় তাহিরপুর, পুঠীয়া ও দুবলহাটী রাজবংশ ব্যতীত প্রায় সমুদয় রাজা, জমিদার নাটোর রাজের অধীন থাকিয়া পরে ক্রমে স্বাধীন ভূম্যধিকারী হইয়া উঠিয়াছেন।

আত্রাই ও করতোয়া নদীর মিলন স্থানের নিকট সাঁতুল রাজার প্রাচীন রাজধানীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্টি গোচর হয়। ইহার নিকটে সাঁতুলের বিল নামে একটী বিস্তৃত জলাশয় বিদ্যমান আছে। সাঁতুলের বিল প্রসিদ্ধ বিলচলনের সহিত সংযোজিত। পূর্ব্বে বিলচলনের পথ ব্যতীত উত্তর বঙ্গে বাণিজ্যতরী গমনাগমনের অন্যপথ ছিল না। একজন ব্রাহ্মণ জমিদার সাঁতুলের রাজা ছিলেন। রাজাগণেশ বা কংশের সময় সাঁতুল রাজ্যের সৃষ্টি হয়। তপ্পে ভাদুড়া ভাতুড়িয়া ও তদন্তর্গত ২৪১৯৭ টাকার বার্ষিক রাজস্বের ১৩ পরগণা তাহার অধিকৃত ছিল। আত্রাই নদীর উভয় পার্শ্বে ভাতুড়ীয়া প্রদেশ। উড়িষ্যা সুবা বাঙ্গালার অধীন। উড়িষ্যা লইয়া এই সুবে বাঙ্গালা ২৪ সরকারের বিভক্ত। এই ২৪ সরকারের, সরকার, মাহমুদাবাদের অথবা সরকার বাজুয়ার অধীন সাঁতুল রাজা; এই রাজ্যের বার্ষিক রাজস্ব আইন আকবরীতে ২৯০৭২৭ দাম লিখিত আছে। (১) যে সময় আরঙ্গজিবের পৌত্র আজিম ওসসান বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা

(১) চন্দ্রদ্বীপে বাজা কন্দর্পনাবাযণ বায়; (২) যশোহবে মহাবাজ প্রতাপাদিত্য; (৩) ভুলুয়াতে বাজা লক্ষ্মণ মাণিক্য। ইনি শূরবংশীয় কায়স্থ ছিলেন। (৪) বিক্রমপুবে চাঁদ রায়; কেদার বায: ইহাবা ঘৃতকৌশিক গোত্রীয় দে বংশীয় কাযস্থ ছিলেন। (৫) চাঁদ প্রতাপ পবগণাতে চাঁদগাজি; (৩) ভূষণাতে মুকুন্দবাম রায; ইহাব বিববণ "আকবর নামা" নামক পাবসীগ্রন্থে বিশেষ রূপে বর্ণিত আছে। (৭) খিদবপুরে ইসা খাঁ মসনদ আলি; ইসাখাঁর বংশধরগণ ময়মনসিংহ জেলাব অধীন। হয়বৎনগব জঙ্গলবাড়ীতে বাস কবেন। ইহার বিষয় আকবব বাদসাহেব সময়ে লিখিত "ছযবল মতখরীন" নামক পারসী গ্রন্থে উল্লেখ আছে। (৮) ভাওয়ালে ফজলগাজি; ইহাব নবম পূর্ব্বপুরুষেব নাম পালয়ান সাহা। ইনি দিল্লী হইতে আসিয়া ভাওয়ালের রাজা শিশুপালকে পবাজয় করিয়া তথাকার অধীস্বর হন। (৯) সাতৈলে রাজা রামকৃষ্ণ; সাতৈল, এক্ষণে পাবনা জিলার চাটমহব স্টেশনেব অধীন। নাটোবের বাজা রামকৃষ্ণর পূর্ব্ব পুরুষ বাজা বঘুনন্দন উক্ত সাতৈলেব রাজা রামকৃষ্ণেব সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করেন। (১০) রাজসাহী জিলাব অধীন
পুঠীয়াব রাজা; নাটোরের বাজা বামকৃষ্ণব পূর্ব্বপুরুষ বাজা রঘুনন্দন পূর্ব্বে ইহাব অধীনে কোন ক্ষুদ্র কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। (১১) উক্ত জিলাব অধীন তাহীরপুরেব বাজা; এই বাজবংশেব বাজা কংসনারাযণ বাবেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের নিয়াবিল পটীব নিযম বন্ধন করেন এই বংশের শেষ বাজার নাম শিবপ্রসাদ। (১২) দিনাজপুবেব রাজা ঃ— এ বংশে রাজা গণেশ বায অতিশয় বিখ্যাত ছিলেন। ইহারা উত্তব রাঢ়ীয় কায়স্থ।
"এই সকল ভুঞা বা রাজা মুসলমানদিগের বাজ্যারম্ভকালে কখনও তাঁহাদিগের বশীভূত কখনও বা স্বাধীনতাচাবী হইতেন। যখন বশীভূত হইতেন, তখন তাহারা নবাবকে কিঞ্চিৎ রাজস্ব মাত্র প্রদান কবিতেন, কিন্তু বাজ্যশাসন সম্বন্ধীয় সমুদায় ক্ষমতাই তাঁহাদের কর্ত্তৃত্বাধীন থাকিত। তাঁহাদের সৈন্য, দুর্গ, বিচারালয় ইত্যাদি রাজত্বের সমস্ত লক্ষণই ছিল। পরে যখন তাঁহারা মুসলমানদিগের একান্ত বশীভূত হইলেন, তখনও তাঁহাবা এই সকল রাজলক্ষণহীন হইয়াছিলেন না। তখন সময়ে সময়ে তাঁহাবা নবাবেব পক্ষ হইয়া সৈন্য, গজ, কামান ও নৌকা প্রর্ভতি দ্বারা যুদ্ধের সহায়তা করিতেন"।— কায়স্থ বংশাবলী—

(1) Vide "Taksim Jama"- Ayan Akbari, ৪০ দামে এক টাকা।

সেই সময় সীতানাথ সাঁতুলের রাজা। তখন তাঁহার বয়স প্রায় ৫০/৬০ বৎসর। সুতরাং বিষয় কার্যের সমস্ত ভার তাঁহার কনিষ্ঠ রামেশ্বরের প্রতি অর্পিত হয়। রামেশ্বর অতি বলবান এবং তাহার প্রতাপে উত্তর বঙ্গ কম্পিত হইয়াছিল। রামেশ্বর অতি চতুর ছিলেন। রামেশ্বর জ্যেষ্ঠের অনুগত ছিলেন এবং রাজা সীতানাথও অতিসুধীর ও ধার্ম্মিক এবং কনিষ্ঠের প্রতি তাঁহার অসাধারণ স্নেহ ও বিশ্বাস। 'সীতানাথ দুই বিবাহ করেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র ছিল না। কেবল কনিষ্ঠ রামেশ্বরের এক পুত্র। পুত্রের নাম রামকৃষ্ণ। রাণী সর্ব্বাণীই এই রামকৃষ্ণের পত্নী। সীতানাথের শেষাবস্থায় তাঁহার কনিষ্ঠ রামেশ্বর নিতান্ত অবিশ্বাসের কার্য্য করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠের হৃদয়কে দগ্ধ করেন। সেই শোক ও দুঃখে রাজা সীতানাথ পরলোক গমন করেন। রামেশ্বরের অকর্ম্মই সাঁতুল রাজ্যের ধ্বংসের মূল কারণ; এবং রামেশ্বরের প্রতি আত্ম বিশ্বাসই রাজা সীতানাথের সর্ব্বনাশের হেতু হইয়াছিল।

সাঁতুল ভৌমিক প্রাচীন বংশ এক কালে লোপ পাইয়াছে। এই বংশের শেষ রাণী সর্ব্বাণীর মৃত্যুর পর, তাঁহার ভাতুড়িয়া প্রভৃতি বিস্তৃত রাজ্য নাটোর বংশের রঘুনন্দনের হস্তগত হইয়াছিল। "বাঙ্গালা, ১১১৭ সালে (১৭১০ খৃষ্টাব্দে) আধুনিক রাজসাহী জেলার অন্যতম প্রধান পরগণা ভাতুড়িয়া, ব্রাহ্মণ জমিদার সান্তোল রাজ) রামকৃষ্ণের পত্নী সর্ব্বাণী দেবীর মৃত্যু হইলে তাঁহাদের এক মাত্র উত্তরাধিকারী কৃষ্ণরামের ভ্রাতুষ্পুত্র বলরাম জন্মান্ধ ও বধির উল্লেখে জমিদারী কার্য্য পরিচালনে সমর্থ বলিয়া ঐ বিস্তীর্ণ জমিদারীব কার্য্যভার তৎকালীন একমাত্র সমর্থ রঘুনন্দনের হস্তে পড়িল।" (১) সাঁতুলের রাণী সর্ব্বাণী করতোয়া নদীতটে যে মহাপীঠের আবিষ্কার করেন তাহা দর্শন করিবার জন্য অনেক যাত্রী যাইত। রাণী সর্ব্বাণী কৃত দেবমন্দির আদির জীর্ণ সংস্কার রাণীভবানী কবিয়া দেন। ইহাও কথিত আছে যে সাঁতুলের রাজবংশ "পঞ্চপাতকী" বলিয়া প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ ইহাও বলিয়া থাকেন যে এই মহাপাপ আশ্রয় করার পর হইতে সাঁতুল রাজবংশ ধ্বংসের সূত্রপাত হয়।

'বারাহী, এখন বারীনই নামে প্রসিদ্ধ। এই বারাহী নদীর পূর্ব্বতীরে রামবামা গ্রামে তাহিবপুরের বিখ্যাত ভৌমিক বংশের রাজধানী ছিল। বারাহী এখন নিতান্ত সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছে। রামবামার পশ্চিমে বারাহীর অপর পারে তাহেরপুরের বর্ত্তমান রাজবাটী"। (২) সুশুঙ্গ রাজবংশর পুর্ব্বপুরুষ মধ্যে বুদ্ধিমন্ত হাজরা নামে এক জন বলবান ও সাহসী পুরুষ জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার বল, বিক্রম ও কৌশলের পরিচয় পাইয়া দিল্লীর সম্রাট তাহাকে বঙ্গদেশের পূর্ব্ব দ্বারের জমাদার নিযুক্ত করেন এবং খাঁ ও সিংহ উপাধি দেন। পূর্ব্ব দ্বার-রক্ষা জন্য তাহাকে সৈন্য সামন্ত রাখিতে হইত। সেই ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য সম্রাট আসাম ও বাঙ্গালার নিকটবর্ত্তী স্থান সুশুঙ্গ রাজাকে দেন। এই বুদ্ধিমন্ত খাঁর সময় তাহিরপুরে বিজয় লস্কর (৩) নামে এক জন বীরপুরুষ বর্ত্তমান ছিলেন। ইনি বঙ্গের পশ্চিম দ্বারের জমাদার। সুশুঙ্গরাজ পূর্ব্ব দ্বার রক্ষক এবং তাহিরপুর রাজ পশ্চিম দ্বার রক্ষক বলিয়া সুশুঙ্গ রাজ্য "উদয়াচল" এবং তাহিরপুর রাজ্য "অস্তাচল" নাম ধারণ করে। এই পশ্চিম দ্বার রক্ষার জন্য বিজয় লস্করকে দিল্লীর সম্রাট ২২ পরগণা এবং সিংহ উপাধি প্রদান করেন। ইহা দ্বারা সৈন্যগণ প্রতিপালিত হইত। রাজবাটী রামবামায় ছিল এবং সেই স্থানে সৈন্য সামন্ত সহিত গড় আদি ছিল। এই বিজয় সিংহের পুত্র উদয়নারায়ণ বারেন্দ কুলীন ব্রাহ্মণগণ মধ্যে নিরাবিল পটীর প্রথম সৃষ্টিকর্ত্তা। যে সময় রূপ গোস্বামী গৌড়ের বাদসাহর প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, সেই সময় বাদসাহ সমস্ত রাজ্য উদয়নারায়ণের

(১) "উৎসাহ," শ্রাবণ ১৩০৫।

(২) শ্রীযুক্ত গিবীশচন্দ্র লাহিড়ী প্রণীত মহারাণী শরৎসুন্দরীর জীবন চবিত।

(৩) বিজয় লস্কর ভট্টনারায়ণ বংশ বস্তুত।

নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া কেবল তাহিরপুর পরগণা মাত্র প্রদান করিলেন। সরকার বার্ব্বকারাদের অধীন তাহিরপুর। এই তাহিরপুরের ৫০৫৮২৫ দাম বার্ষিক রাজস্ব ছিল। (১) এই উদয়নারায়ণের পৌত্রই প্রসিদ্ধ রাজা কংস নারায়ণ নান্নাসী গ্রামী (নন্দনবাসী) পুরুষোত্তম বেদান্তীর বংশে রাজা কংস নারায়ণ জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। ইতি নন্দনীবাসী, সিদ্ধ শ্রোত্রিয়। কুলীনগণের আশ্রয় দাতা বলিয়া বারেন্দ্র সমাজে পদ গৌরবে কেহই ইহার সমকক্ষ ছিলেন না। কুলশাস্ত্র-বিশারদ উদয়নাচার্য্য এই নিয়ম করেন যে কুলীন কন্যা শ্রোত্রিয়ে প্রদান রহিত হইবে এবং কুলীনদিগের বিবাহ কুশবারি সংযুক্ত প্রতিজ্ঞা না করিয়া কেবল বাগদানে সম্পন্ন হইবে না। আবার তাঁহার প্রথম পক্ষীয় বণিতার ছয় পুত্রের সহিত একত্রে শয়নে ও ভোজনে কুলীনের কুলপাত হইতে লাগিল। এই ঘটনা হইতে অনেক কুলীনের কুলপাত হইতে লাগিল। কুলীনগণ ঐ ছয় ভ্রাতার ব্যবহারকে "কাচ" (ছল) বলিয়া স্থির করিলেন। এই "কাচ" হইতে "কাপ" শব্দ প্রসিদ্ধ হইল। উদয়নাচার্য্যের নিয়মে কুলীন বংশ লোপ হইবার আকার দেখিয়া রাজা কংসনারায়ণ বহুব্যয়ে সমস্ত কুলীন ও কাপকে একত্রিত করিয়া, এই নিয়ম প্রচলিত করেন যে কাপ কুলীনে কন্যা আদান প্রদান, কি কুশবারি সংযুক্ত বাগদান, প্রতিজ্ঞা ভিন্ন কুলীনের কুলপাত হইবে না। আবার কাপদূষিত শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ করিলে সেই শ্রোত্রিয় উৎকর্ষ লাভ করিবেন। ইহাও বিধি হইল যে কাপ ও কুলীন শ্রোত্রেয়ের কন্যা গ্রহণ করিতে পারিবেন। এই নিয়মে কাপ কুলীনে আহার ব্যবহার প্রচলিত হইল এবং তাঁহার নিজ বংশের কন্যা কাপে প্রদান করিয়া তিনি সকলের নিকট অতি প্রশংসনীয় ও বারেন্দ্র সমাজে অতি প্রসিদ্ধ হন। রাজা কংসনারায়ণ বারেন্দ্র কুলের মুলাধার ছিলেন। রাজা কংসনারায়ণের প্রপৌত্র "রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের কন্যার সহিত নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনন্দনের জ্যেষ্ঠ সহোদর মহারাজা রামজীবনের ঔরস পুত্র রাজকুমার কালিকাপ্রসাদের বিবাহ হয়। কালিকা প্রসাদের নাম, কালুকোঙর বলিয়া ইতিহাসে লিখিত"। (২) তাহিরপুর পরগণার দশ আনা অংশ রাজা কংসনারায়ণের বংশের পরিচয় স্বরূপ। এই বংশের শেষ রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় ছিল। তাঁহার পুত্রসন্তান ছিল না। তাঁহার একমাত্র অবিবাহিতা কন্যা উমাদেবীকে রাখিয়া তিনি পরলোক গমন করেন। আনন্দীরাম রায়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। আনন্দীরাম রায়ের মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতা বিনোদরাম রায় ঐ দশ আনা অংশের উত্তরাধিকারী হইলেন বিনোদরাম রায় অতিশয় বুদ্ধিমান ও চতুর পুরুষ ছিলেন। এই বিনোদনাম রায় বর্ত্তমান তাহিরপুর রাজবংশের আদিপুরুষ। ইনি ভাদুড়ীবংশীয় নিরাবিলপটীর কুলীন। তাহিরপুর পরগণার বিশিষ্ট ছয় আনা অংশ হস্তান্তরিত হইয়াছে ; এই অংশের একটী দত্তক পুত্র ছিলেন। কিছু দিন হইল তিনিও ইহ সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। (৩) বিনোদরাম রায়ের বংশধবেরা বর্ত্তমান তাহিরপুর রাজবংশের আলোচ্য বিষয়। বীরেশ্বর রায় নামক জনৈক বিনোদরাম রায়ের পুত্র। ইহার দুই পুত্র চন্দ্রশেখরেশ্বর রায় ও মহেশ্বর রায়। বীরেশ্বর রায় ব্যয়ে সাবধান ছিলেন না। তিনি অনেক টাকা ঋণ রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র চন্দ্রশেখরেশ্বর রায় বুদ্ধিমান ও ধার্ম্মিক ছিলেন। ইনি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। ইহাঁর বুদ্ধি-কৌশলে এবং রাজকার্য্য নৈপুণ্যে ইনি পিতৃ-ঋণ অতি অল্পকাল মধ্যে পরিশোধ করিয়া পিতাকে ঋণ পাপ হইতে মুক্ত করেন। ইনিই পিতার সৎপুত্র। ইহারই যত্নে ও সাহায্যে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে একটী 'সদাব্রত" রামপুর বোয়ালীয়াতে স্থাপিত হইয়া দৈনিক আহার, মাসিক দানও পৌষমাসের সংক্রান্তির দিন, দিবার নিয়ম হইয়াছে। চন্দ্রশেখরেশ্বর রায়, অতি বিনয়ী, প্রজার প্রিয় এবং রাজকার্য্যে দক্ষ

(1) Vide "Taksim Jama"- Ayan Akbari,
(২) "উৎসাহ," ভাদ্র ১৩০৪।
(৩) শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র লাহিড়ী প্রণীত "শহাবোণী শরৎসুন্দরীব জীবন চরিত"

ছিলেন। ইহার ভ্রাতৃস্নেহ নিতান্ত প্রশংসনীয় ছিল। মহেশ্বর রায় বড় বুদ্ধিমান ছিলেন না; কিন্তু জ্যেষ্ঠের প্রতি তাঁহার অতিশয় ভক্তি ছিল। চন্দ্রশেখরেশ্বর ও মহেশ্বর রায়ের রাজা উপাধি না থাকিলেও প্রজারা রাজা বলিত। (১) চন্দ্রশেখরেশ্বর রায়ের একপুত্র শশীশেখশ্বর রায়; এবং মহেশ্বর রায়ের চারি পুত্র, জগদীশ্বর, তারাকেশ্বর বিশ্বেশ্বর ও কাশীশ্বর, তন্মধ্যে তারকেশ্বর ও বিশ্বেশ্বর এখন জীবিত আছেন। মহেশ্বর রায়ের বেশী সন্তান বলিয়া ভ্রাতৃস্নেহ নিবন্ধন চন্দ্রশেখরেশ্বর রায় অর্দ্ধাংশ জমিদারী দেওয়া ব্যতীত আরও প্রায় ৫০০০ টাকার ভূসম্পত্তি কণিষ্ঠের পুত্রগণকে দিয়া যান তথাপি মহেশ্বর রায়ের পুত্রগণ রাজ্য শাসন রীতিমত করিতে নাপারায় ঋণ গ্রস্থ হইলেন এবং জমিদারীর অনেকাংশ হস্তান্তরিত হইল। কিন্তু শশীশেখরেশ্বর রায় শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান। ইনি নিজগুণে গবর্ণমেন্ট হইতে রাজা বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়া নাম ও যশ বিস্তার করিয়াছেন। এখন রাজাবাহাদুর বেঙ্গল কাউনসীলের মেম্বর পদে নিযুক্ত আছেন এবং রাজদরবারে বিশেষ প্রতিপন্ন। সাধারণের হিতকর কার্য্যে ইনি এক জন প্রধান উদ্‌যোগী পুরুষ। রাজকুমার কলেজ স্থাপনের জন্য একজন প্রধান অধ্যক্ষ; জমিদার পঞ্চায়িত সভার প্রতিষ্ঠাতাই রাজা শশীশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর। ইনি পিতার ন্যায় নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বিনয়ী ও সদালাপী। আমরা আশা করি ইহাঁর দ্বারা স্বদেশের অনেক উপকার হইবে।

(1) "There are several Zemindars in Rajshahi who call thamselves Rajas they have certainly not men enabled by the Goverment, but they possess large landed proporties, on strength of which their Retainers and Rayats address them as Rajas Among them may be mentioned Hara Nath Chaudhuri of the Suri caste, commonly called Raja of Dubalhati Maheswar Raja, a high caste Brahmin commonly called Raja of Taherpur, and Ruhini Kanto Rai also a Brahmin, commonly called Raja of Chaugana"- The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review

অষ্টম অধ্যায়
পুঁঠীয়ার রাজবংশ

লস্করপুর পরগণা– উড়িষ্যা সুবে বাঙ্গালার অধীন। উড়িষ্যা লইয়া এই সুবে বাঙ্গালা ২৪ সরকারের বিভক্ত, তন্মধ্যে বার্ব্বকাবাদ সরকারের অন্তর্গত লস্করপুর পরগণা। বার্ব্বকবাদ সরকারকে অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য, গজ ইত্যাদি যুদ্ধ সময়ে দিল্লীর সম্রাটকে সাহায্য করিতে হইত। এই লস্করপুর পরগণার বার্ষিক রাজস্ব ২৫৫০৯০ দাম ছিল। (১) লস্করপুর পরগণা পদ্মানদীর উভয় পার্শ্বেস্থিত। এই পরগণার অধিকাংশ গ্রাম বর্ত্তমানে রাজসাহী জেলার অন্তর্গত এবং অল্পসংখ্যক গ্রাম পদ্মানদীর দক্ষিণ পার্শ্ব নদিয়া ও মুরশীদাবাদ জেলায়স্থিত। ১৩০৫ সালের শ্রাবণ মাসের "উৎসাহে" শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন যে "কোম্পানীর প্রথম আমলে— ওয়ারেণ হেষ্টীংসের সময় পর্য্যন্ত লস্করপুর পৃথক কালেক্টরী ছিল। উল্লিখিত সময় পর্য্যন্ত নিজামত রেকর্ডে লস্করপুরের কালেক্টরের নিকট হইতে মুরশীদাবাদ নিজামত এজেন্টের নিকট পত্রাদি দেখা যাইতেছে।" নাটোর বংশের অভ্যুদয়ে রাজসাহী ও লস্করপুর কালেক্টরী এক হইয়া রাজসাহী জেলা নামে পরিচিত হইল। লস্করপুর বর্ত্তমান পুঁঠীয়া রাজবংশের প্রধান জমিদারী। পুঁঠীয়ার রাজারা "ঠাকুর" (২) নামে পরিচিত। পুঁঠিয়ার রাজবংশ প্রাচীন রাজবংশ বলিয়া ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে। এই ঠাকুর বা রাজারা পুঁঠিয়ায় বাস করেন। পুঁঠীয়া নাটোর ও রামপুরবোয়ালীয়ার প্রায় মধ্যস্থানে অবস্থিত। ইহা কথিত আছে যে এই বিস্তৃত লস্করপুর পরগণা মুরশীদাবাদ সরকারের জনৈক লস্কর খাঁর জায়গীর পুঁঠীয়ার ঠাকুরেরা প্রাপ্ত হন। এই পরগণার অন্তর্গত আলাইপুর গ্রামে লস্কর খাঁ বাস করিতেন। এই লস্কর খাঁর জায়গীর ও তাহিরপুরের আটাআনা অংশ সহ সর্ব্বশুদ্ধ ২২ পরগণার মহাল লইয়া বর্ত্তমান লস্করপুর পরগণার আয়তন গঠিত হয়। (৩) বর্ত্তমানে পুঁঠীয়া বংশীয়ের হস্তে সমুদয় লস্করপুর নাই; কিয়দংশ নানা কারণে হস্তান্তরিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে লস্করপুর পরগণায় অনেক জমিদার, তন্মধ্যে পাঁচ আনা ও চারি আনার অংশের জমিদারদ্বয়ই শ্রেষ্ঠ। লস্করপুর পরগণার অংশ ব্যতীত ইহাদের অন্যান্য জমিদারীও কম নহে।

পুঁঠীয়া রাজবংশের উৎপত্তি– পুঁঠীয়ার রাজাগণ বারেন্দ্রশ্রেণী কুলীন ব্রাহ্মণ। ইহাঁদের আদিপুরুষ বাগচি বংশীয় সাধু। সাধু হইতে পঞ্চদশ পুরুষের পর, শশধর পাঠক নামে এক জন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করেন। শশধর পাঠকের একমাত্র পুত্র বৎসাচার্য্য (বৎসরাচার্য্য)। (৪) এই বৎসাচার্য্যই পুঁঠীয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি তন্ত্র ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে একটী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি গৃহী হইয়া, বিষয় বাসনা শূন্য ছিলেন এবং ঋষির ন্যায় কালযাপন করিতেন।

---

(1) Vide Taksim Janna- Ayan Akbari

(2) "The Thakurs or as they are commonly called the Rajs of Putia,**

(৩) "বৎসারাচার্য্যেব (বৎসরচার্য্য) সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র পুষ্করাক্ষ, তাহিরপুবের ভৌমিক রাজাদিগেব বাজধানী রামরামা গ্রামেই সর্ব্বদা থাকিতেন। ভাগ্য প্রসন্ন হইলে চারিদিক হইতে নানা বিভব আসিয়া থাকে। এই সময়ে তাহিরপুবের রাজারা দুই সহোদর ছিলেন, এবং ছোট রাজা, পুষ্করাক্ষকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তাঁহার কোনও সন্তান সন্ততি ছিল না, সেই নিমিত্ত অতি নির্ব্বিঘ্নহৃদয়ে অসার সংসারের মায়া ত্যাগ করিয়া বারাণসী ধামে গমন করেন। যাইবার সময় তাঁহার অর্দ্ধঅংশ-সম্পত্তি স্নেহ ভাজন পুষ্করাক্ষকে প্রদান করেন।"— শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র লাহিড়ী প্রণীত মহারাণী শরৎসুন্দরীর জীবন চরিত। "হস্তবুদ" দেখিয়া ইহা অনুমিত হয় যে তাহিরপুরের ছোট রাজার নাম "শিবেন্দ্রনারায়ণ।"

(৪) কুলুজ্ঞ গ্রন্থ।

বৎসাচার্য্যের সাতটী পুত্র, তন্মধ্যে নীলাম্বর, পীতাম্বর এবং পুষ্করাক্ষ জীবিত ছিল এবং অপর চারটী পুত্রের অকাল মৃত্যু হয়। (১) বৎসাচার্য্য জীবনের শেষ ভাগে সন্ন্যাসীর ন্যায় গৃহে বাস করিতেন।"

পুঁঠীয়া রাজবংশের অভ্যুদয় সম্বন্ধে একটী জনশ্রুতি, আছে। অতি প্রাচীনকালে পুঁঠীয়া (২) আশ্রমে বৎসাচার্য্য (বৎসরাচার্য্য) নামে ঋষির ন্যায় এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি যাগ, যজ্ঞ, তপস্যায় তাঁহার অধিকাংশ সময় যাপন করিতেন। তাঁহার বিষয় বাসনা একবারে ছিল না। অধিকাংশ সময় তিনি নির্জ্জনে বাস করিতেন। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে মোগল সম্রাট আকবর (৩) বাঙ্গালা জয় করিলে মোগল শাসন বিস্তার করেন। তিনি তাঁহার সমগ্র সাম্রাজ্য পঞ্চদশ প্রদেশ বা সুবায় বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক প্রদেশে এক এক সুবাদার (সীপাহ্ ছালার) নিযুক্ত করেন। সুবাদারদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত ছিল ঃ— ১। সৈনিক বন্দোবস্ত, ২ বিচার ও শান্তিরক্ষণ। ৩। রাজস্ব আদায়। এই পঞ্চদশ সুবা মধ্যে, বারটী হিন্দু স্থানে এবং তিনটী দাক্ষিণাত্যে ছিল। বিজয়পুর ও গলকুণ্ডা অধিকারের পর, শেষোক্ত তিনটী সুবা-স্থলে ছয়টী সুবা হইল। আকবরের সময় অতীত হইলে সুবা বা প্রদেশের কর্ত্তার উপাধি "সীপাহ্ ছালার" স্থলে "সুবাদার" হইল। এবং প্রত্যেক প্রদেশ বা সুবার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ জন্য এক জন "দেওয়ান" উপাধিধারী কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইল। (৪) এই পঞ্চদশ সুবা মধ্যে বাঙ্গালা একটী সুবা

---

(১) মহাত্মা কিশোরীচাঁদ মিত্র কলিকাতা রিবিউতে "The Rajas of Rajshahi" শীর্ষক প্রবন্ধে বৎসরাচার্য্যের আশ্রম পুঁঠীয়ার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় মহারাণী শরৎসুন্দরীর জীবন চরিতে লিখিয়াছেন যে "পুঁঠীয়ার প্রায় চারি মাইল পূর্ব্বদিকে চন্দ্রকলা-গ্রামে বৎসাচার্য্যের (বৎসরাচার্য্যের) নিবাস ছিল।" কোন নবাব সরকারের বা কোম্পানীর আমলের রেকর্ডে জানা যায় না যে চন্দ্রকলা হইতে আসিয়া কোন্ সময় পুঁঠীয়ায় রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল।

* দিল্লীর বাদসাহ হইতে পীতাম্বর "সহর মণ্ডল" উপাধি প্রাপ্ত হন।

(২) "উক্ত প্রবাদের মূল অন্বেষণ করিলে দেখা যায়, দর্পনারায়ণ হইতে চারি পুরুষ উর্দ্ধেই এক সময়ে সুযোগে পুঁঠীয়ার ঠাকুর বংশ জমিদারী লাভ করেন। চারি পুরুষ ১২০ বৎসর ধরিলে এবিপ্লব বাদসাহ আকবরের সময়ে ঘটে, ইহা স্পষ্টই অনুমিত হইবে। সুতরাং কৃষ্ণনগরের রাজাবংশের আদিপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের মত পুঁঠীয়ার রাজারাও তাঁহাদের জমিদারীর জন্য হিন্দু রাজা টোড়রমল্ল বা মানসিংহের নিকট ঋণী, ইহা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।"— উৎসাহ শ্রাবণ ১৩০৫।
কিন্তু শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় মহারাণী শরৎসুন্দরীর জীবন চরিতে লিখিয়াছেন যে দিল্লীশ্বর ঘিয়াস উদ্দীন টোগলগের সময় পুঁঠীয়ার রাজ্যলাভ হয়। ১৩২৪ খৃষ্টাব্দে ঘিয়াস উদ্দীন বাঙ্গালার আইসেন। লাহিড়ী মহাশয়ের লিখা মত দর্পনারায়ণ হইতে চার পুরুষ উর্দ্ধে ২৫২ বৎসর রাজত্ব করা অসম্ভব বোধ হয়। অতএব আকবরের সময়েই এই বিপ্লব সম্ভব।

(3) The Elphinistona's History of India, Book IX, Chapter, III

(৪) Probably Raja Todar Mal or Raja Man Sing **
উৎসাহের লেখকের মতো রাজা টোডরমল্ল বা রাজা মানসিংহই সম্ভব। কিন্তু গিরীশচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় মহারাণী শরৎসুন্দরীর জীবন চরিতে লিখিয়াছেন যে সুবাদার বখর খাঁর বিদ্রোহ দমন জন্য দিল্লীশ্বর (ঘিয়াস উদ্দীন টোগলগ) স্বয়ং আগমন করেন। এবং ঢাকা নগরের অভিমুখে যাত্রা-সময় পুঁঠিয়ার অনতিদূরে চন্দ্রকলা গ্রামে তিনি শিবির সন্নিবেশিত করেন। কিন্তু মহাত্মা কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের এবং উৎসাহের লেখক মহাশয়ের মতে দিল্লীর সম্রাট স্বয়ং আগমন করার উল্লেখ নাই। কিন্তু ঘিয়াস উদ্দীন স্বীকার করিলে এলফিনিসটনের ভারত ইতিহাসে বাঙ্গালার বিদ্রোহ দমন জন্য সম্রাটের বাহিনী গমনের উল্লেখ আছে। আকবর বাদসাহ স্বীকার করিলে রাজা টোডর মল্ল বা ধর্ম মানসিংহকে সৈন্য সমেত বাঙ্গালায় পাঠানের কথা ইতিহাসে উল্লেখ আছে।

(৫) শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় মহারাণী শরৎসুন্দরীর জীবন চরিতে লিখিয়াছেন যে "দিল্লীশ্বর লোক মুখে বৎসরার্য্যের অদ্ভুত ক্ষমতার বিষয় অবগত হইয়া, আচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার ভবিষ্যৎ ভাগ্য সম্বন্ধে দুইটা প্রশ্ন করেন। আচার্য তদুত্তরে বলেন যে,— বঙ্গদেশ পুনরায় সম্রাটের শাসনাধীন হইবে; অবাধ্য সুবাদার স্বকর্মেই থাকিবেন। আর এক বৎসরের মধ্যেই সম্রাটের আয়ুষ্কাল শেষ হইবে। তিনি কোন আত্মীয়ের ষড়যন্ত্রে অপঘাতে মৃত্যুর বশীভূত হইবেন।" এলফিনিসটনের ইতিহাসে দেখা যায় যে ঘিয়াস উদ্দিন টোগলগ অপঘাত মৃত্যুর বশীভূত হন, কিন্তু আকবরের রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যু হয়।

বা প্রদেশ ছিল। আবার বাঙ্গালা আঠার প্রদেশ বা সুবায় আকবর বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক প্রদেশে জন সুবাদার নিযুক্ত করেন। এই সুবাদারদিগের এই কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল যে রাজস্ব আদায় করিয়া বাঙ্গালার প্রধান সুবাদার যোগে সম্রাট সমীপে প্রেরণ করিতে হইত। কিন্তু সুবাদারেরা একত্রিত হইয়া স্বাধীন হইয়া উঠিলেন এবং দিল্লীর সম্রাট সমীপে রাজস্ব প্রদানে বিরত হইয়া সম্রাটের বিরুদ্ধে উত্থান করিলেন। সম্রাট বিদ্রোহ দমন জন্য কতকগুলি উপযুক্ত সৈন্য সমেত এক জন সুদক্ষ সেনাপতিকে (২) বাঙ্গালায় প্রেরণ করেন। সেনাপতি বৎসরাচার্য্যের সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিলে, তাঁহাকে বৎসরাচার্য্য সৈন্য সমেত তথায় আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। সেনাপতি বৎসরাচার্য্যকে বিস্তারিত জ্ঞাপন করিলে, তিনি তাহাকে বিদ্রোহ দমনের উপায় বলিয়া দিলেন। (৩) সেনাপতি কৃতকার্য্য হইলে পুরস্কার স্বরূপ ঋষিকে কিছু ভূসম্পত্তি দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই সময়ে লস্করপুরের জায়গীরদার লস্কর খাঁ নিঃসন্তান পরলোক গমন করিলে, দিল্লীর সম্রাটের অনুমতি লইয়া সেনাপতি, লস্করপুর বৎসবাচার্য্যাকে পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করেন। ঋষি বৎসরাচার্য্য জমিদারীকে তৃণবৎ জ্ঞান করেন; সুতরাং তাঁহার পুত্র পীতাম্বর জমিদারী গ্রহণ করেন। পীতাম্বর বুদ্ধিমান এবং প্রতিভাশালী ছিলেন। তিনি দিল্লীর সম্রাটেব অনুগ্রহ লাভ করিয়া লস্করপুর পরগণার অধীশ্বর হইলেন। সম্রাটের মৃত্যুর অল্প দিন পরেই পীতাম্বর প্রাণত্যাগ করেন। সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুস্করাক্ষও নিঃসন্তান ইহলোক ত্যাগ করেন। সুতরাং নীলাম্বরই সমস্ত সম্পত্তির অধীশ্বর হইলেন। পুঁঠীয়ার বর্ত্তমান রাজারা সেই নীলাম্বরের বংশধর। পুঁঠীয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বৎসরাচার্য্য এখন দেববৎ পূজিত হইয়া আসিতেছেন। যেহেতুক তাঁহার কাষ্ঠ-পাদুকা এখনও দেবতার ন্যায় নিত্য পূজ্য গহণ করিয়া থাকে।

পুঁঠীয়া রাজ বংশাবলী।— বৎসরাচার্য্য হইতে পুঁঠীয়া বংশে যে যে ব্যক্তি রাজ্যভার গ্রহণ করেন বা বংশোদ্ভব তাহাদের নামের তালিকা নিম্নে লিখিত হল ঃ—

১	সরাচার্য্য	২৩	লক্ষ্মীনারায়ণ	৪১	নামনারায়ণ
২	ভাস্বর	২৪	রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ (স্ত্রী) সূর্য্যমণি পতির মৃত্যুর পর সম্পত্তির অধিকারিণী)	৪২	রামনারায়ণ
৩	স্বর (তস্যপুত্র)	২৫	আনন্দনারায়ণ	৪৩	তারকনারায়ণ
৪	কান্ত (ঠাকুব)	২৬	জগন্নারায়ণ	৪৪	কেদারনারায়ণ
৫	রামচন্দ্র	২৭	কৃষ্ণনারায়ণ	৪৫	যাদবনারায়ণ
৬	নাবায়ণ	২৮	গোলোকেন্দ্রারায়ণ	৪৬	শ্রীনারায়ণ রায়
৭	দর্পনারায়ণ	২৯	ভূপেন্দ্রনারায়ণ	৪৭	যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় (স্ত্রী মাহরাণী শরৎসুন্দরী দেবী পতির মৃত্যুর পর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী)

* ইহাঁরা রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন।

* আরঙ্গজীবেব পৌত্র আজিম ওসমানের সময় রামচন্দ্র বর্ত্তমান। রামচন্দ্র-জলবিহার উপলক্ষে সাতুলে যান। সাতুলেব ছোট রাজা রামেশ্বব এই রামচন্দ্রেব সহিত নিজ কন্যা লীলাবতীর বলপূর্ব্বক বিবাহ দেন। সাতুলের রাজবংশ পঞ্চপাতকী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। সুতরাং এই বিবাহ হইতে পুঠীয়া রাজবংশের গাঁচুড়িয়া দোষ স্পর্শে। এইজন্য কুলজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন "সাধুর ভরাতল পুঁঠীয়াতে গলই জাগে"।

৮	জয়নারায়ণ	৩০	মহেশনারায়ণ	৪৮	দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়
৯	প্রেমনারায়ণ	৩১	গিরীশরারায়ণ	৪৯	ভুবেন্দ্রনারায়ণ রায়
১০	চন্দ্রনারায়ণ	৩২	ঈশ্বরনারায়ণ	৫০	গোপালেন্দ্র নাবায়ণ রায়
১১	প্রতাপনারায়ণ	৩৩	ঈশাননারায়ণ	৫১	বৈকুণ্ঠনারায়ণ
১২	অনুপনারায়ণ	৩৪	রামনারায়ণ	৫২	অঙ্গেশনারায়ণ রায়
১৩	কিশোরীনারায়ণ	৩৫	মধুরেন্দ্রনারায়ণ	৫৩	কাশীনারায়ণ রায়
১৪	ব্রজেন্দ্রনারায়ণ	৩৬	রানী ভুবনময়ী দেবী রাজা জগন্নারায়নের বিধবা বণিতা	৫৪	কুমার জ্যোতীন্দ্র নারায়ণ রায় (শ্রী রাণী হেমন্তকুমারী দেবী পতির মৃত্যুরপর সম্পত্তির উত্তরাধিকারীণী)
১৫	নরেন্দ্রনারায়ণ	৩৭	হরেন্দ্রনারায়ণ		
১৬	মদননারায়ণ	৩৮	ভৈরবেন্দ্রনাবায়ণ রায়		
১৭	রূপেন্দ্রনারায়ণ	৩৯	পরেশনারায়ণ রায়		
১৮	প্রাণনারায়ণ ঠাকুর	৪০	রমেশনারায়ণ		
১৯	কেশবনারায়ণ				
২০	গোকুলনারায়ণ রায়				
২১	ভুবনেন্দ্রনারায়ণ				
২২	রুদ্রনারায়ণ				

পুঁঠীয়া বংশের রাজাগণ।– বৎসরাচার্য্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র পীতাম্বর (১) সাংসারিক কার্য্যে নিতান্ত পটু ছিলেন। তিনি দিল্লীর সম্রাটের অনুগ্রহ লাভ করিয়া লস্করপুর রাজ্যের ভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহার এবং সর্ব্ব কণিষ্ঠ পুস্করাক্ষের নিঃসন্তান মৃত্যুর পর, তাঁহার কণিষ্ট ভ্রাতা নীলাম্বর উভয়েই সমস্ত রাজ্যভার গ্রহণ করেন এবং লস্করপুর পরগণার কর বৃদ্ধি কবিয়া, রাজ্যের অনেক উন্নতি সাধন করেন। নীলাম্বরের কণিষ্ঠ পুত্র আনন্দরাম তাঁহার পিতা জীবিত থাকিতেই দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হন; কিন্তু নীলাম্ববের জ্যেষ্ঠ পুত্র রতিকান্ত সর্ব্বসাধারণের কোন অপ্রিয় কার্য্য করায় পিতৃরাজ্যের অধিকারী হন নাই এবং "ঠাকুর" নামে সর্ব্বজন নিকট পরিচিত হইয়া উঠিলেন। রতিকান্ত হইতে পুঁঠীয়ার রাজ্যরা "ঠাকুর" নামে পরিচিত হইতে লাগিলেন। (২) রতিকান্তের পুত্র রামচন্দ্র*। রামচন্দ্র কর্তৃক "রাধাগোবিন্দের"

---

1. "On the death of Pitambar, his younger brother Nilambar, suceeded him in his Estate "- The Rajas of Rajshahi, Culcutta Review.
"বৎসাচার্য্যেব সাতটী পুত্র :— নীলাম্বব, পীতাম্বব, এবং পুস্কবাক্ষ ব্যতীত, আব চাবি পুত্রেব অকাল মৃত্যু হয়"।— শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র লাহিড়ী প্রণীত মহারাণী শবৎকুমাবীর জীবন চরিত।
লাহিড়ী মহাশয় নীলাম্বরকে বৎসাচার্য্যেব জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং মিত্র মহাশয় পীতাম্ববের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিযাছেন। মিত্র মহাশযেব লিখাই যেন সঙ্গত বলিযা বোধ হয়।

2. "His son Ratikanto in consequence of certain unpopular acts, did not inherit the title of Raja but was known among the people as "Thakur" a title which still distinguishes the family"- The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review

সেবা স্থাপিত হয়। রাধাগোবিন্দের নিত্য পূজা ও ভোগের বন্দোবস্ত এখনও অতি সুন্দর। প্রতিদিন ১/০ আতপ তণ্ডুল এবং তদুপযোগী নানাবিধ উপকরণ দ্বারা প্রতিদিন ভোগ হইয়া থাকে। রামচন্দ্রের তিন পুত্র— নরনারায়ণ দর্পনারায়ণ এবং জয়নারায়ণকে জীবিত রাখিয়া পরলোক গমন করেন। নরনারায়ণ ঠাকুরের সময় নাটোর বাজবংশের স্থাপনকর্ত্তা রঘুনন্দনের পিতা কামদেব লস্করপুরের অন্তর্গত বারুইহাটী গ্রামের তহশীলদার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। রামচন্দ্রের তিন পুত্র হইতে পুঁঠীয়া রাজবংশের সকলেরই নামে "নারায়ণ" সংযুক্ত হয়। নবাব মুর্শিদ কুলীখাঁর সময় রামচন্দ্রের তিন পুত্র বর্ত্তমান ছিলেন।

দর্পনারায়ণের সময় কামদেবের পুত্র রঘুনন্দনের সৌভাগ্য লক্ষ্মী সুপ্রসন্না হইলেন। দর্পনারায়ণের নিত্য পূজার পুষ্প সংগ্রহ করিবার কার্য্যে রঘুনন্দন নিযুক্ত ছিলেন। এই সামান্য কার্য্য হইতে তিনি নবাব সরকারে পুঁঠীয়া রাজার পক্ষে উকীলের কার্য্যে নিযুক্ত হন। এইরূপ নবাব দরবারে উকীল বা মুকতীয়ার নিযুক্ত করিবার প্রথা জমিদাবগণ মধ্যে প্রচলিত ছিল। (১) রঘুনন্দন নাটোর রাজ্য স্থাপন করেন। ইহার বিবরণ যথা স্থানে লিখিত হইবে।

লর্ড করণওয়ালীসের সময় আনন্দ নারায়ণ লস্করপুর পরগণার রাজা ছিলেন। আনন্দ নারায়ণের সঙ্গে লস্করপুর পরগণার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ১৮৯৫৯২।০ টাকা জমায় সম্পন্ন হয়। আনন্দ নারায়ণের একজন উত্তরাধিকারী রাজেন্দ্র নারায়ণ ইংরাজ গবর্ণমন্ট হইতে "রাজা বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন। এই রাজেন্দ্র নারায়ণ পুঠীয়ায় চারি আনা অংশের রাজা ছিলেন। যাহাকে সাধারণতঃ চারি আনা অংশ বলে তাহা প্রকৃত ।১৩— ক্রান্তির অংশ। এই রাজ্য রাজেন্দ্র নারায়ণেব সঙ্গে, তেমুখের নিকট তাজপুর গ্রাম নিবাসী হরিনাথ সান্ন্যালের কন্যা সূর্য্যমণি দেবীর বিবাহ হয়। বিবাহের অল্পকাল পরেই রাজা পরলোক গমন করিলে, তাঁহার বিধবা পত্নী সূর্য্যমণি পতির সম্পত্তির অধিকারিণী হইলেন। রাণী সূর্য্যমণি একজন বুদ্ধিমতী এবং জমিদারী কার্য্যে সুবিজ্ঞা বলিয়া পরিচিতা ছিলেন। তিনি মহিলা হইয়া যেরূপ সুচারুরূপে কাজ কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন, সেরূপ রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পুঁঠীযা বংশের অনেক রাজাই সক্ষম হন নাই। পুঁঠীয়াবংশের ভূবনেন্দ্র নারায়ণ একজন ক্ষমবান পুরুষ ছিলেন। লস্করপুর পরগণার অংশ ব্যতীত তিনি অনেক জমিদারী ক্রয় করেন। তদপর বাঙ্গালা ১২১৪ সালে ভুবনেন্দ্র নারায়ণের পুত্র জগন্নারায়ণ নিম্নলিখিত জমিদারী খরিদ কবিয়া নিজ রাজ্য ভুক্ত কবেন ঃ—

"এই বংশ, রাজোপাধি ও বিস্তৃত সম্পত্তি ভোগ কবিলেও, বহুপুরুষ পর্য্যন্ত বৎসাচার্য্যেব সদাচার ও যোগ-নিষ্ঠা প্রচলিত ছিল। সেই জন্য, ইহাব পুত্র রতিকান্তকে দেশস্থ লোকে পুজনীয় "ঠাকুর" নামে অভিহিত কবিয়াছিলেন। পবে বঙ্গেব সুবাদাব কর্তৃকও ঐ উপাধি অনুমোদিত হয; সেই হইতে পুঁঠীয়ায় রাজবংশকে সাধাবণে ঠাকুব নামে অভিহিত করিযা থাকে।"— শ্রীযুক্ত গিবীশচন্দ্র মহাশয প্রণীত শবৎসুন্দরীর জীবন চবিত। মিত্র মহাশয বলেন সাধারণেব অপ্রিয় কার্য্য জন্য এবং লাহিড়ী মহাশয বলেন ধর্ম্ম-নিষ্ঠায় পবিচয় স্বরূপ বতিকান্তকে "ঠাকুব" উপাধি দেওযা হয। ঐ বৈষম্যেব মীমাংসা কবা কঠিন।

(1) "It was the custom, as observved, in the fifth Report of the select-committee on the affairs of East India Company, for the land- holders of distinction and other principal inhabitants to maintain in propertion to other rank, an intercourse with the ruling power, and in person or by Vakil or Agent to be in constant attendance at the seat of Government or with the officers in authority over the district where their lands or their concerns were situated To ertabilish an interest at the Durbar and to procure the protection of some powerful patron, were to them objects of the unceasing solicitude "- The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review

* "ভবানীপুরী অবসাদ প্রাপ্ত কুলীনগণকে নিষ্কৃতি করেন"— গৌড়েব্রাহ্মণ।

(১) ময়মনসিংহ জেলার পরগণা পুকরিয়া।
(২) রাজসাহী জেলায় পরগণা কালীগাঁও কালীসপা এবং কাজিহাটা।
(৩) জেলা নদীয়ার ভবানন্দ দিয়াড়।

এইরূপে আয় বৃদ্ধি করিয়া জগন্নারায়ণ বারাণসী ধামে দেবমন্দির আদি প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং একটী ঘাট ও অতিথিশালা নির্ম্মাণ করিলেন। ফল্‌গুনদীর তীরে আর একটী অতিথিশালা প্রস্তুত করিয়া দেন। বাঙ্গালা ১২১৬ সালে তিনিও "রাজা বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন। বাঙ্গালা ১২২৩ সালে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার বিধবা পত্নী পুঁঠীযায় শিবস্থাপন করিয়া তদুপলক্ষে বহুতর পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণকে নিস্কর ভূমি দান কবেন। এই হিন্দু মহিলা দীন দুঃখীকে শীতকালে শীত বস্ত্র দিতেন এবং বর্ষাকালে গো ও মনুষ্যকে যথোচিত আহার দিতেন। এই প্রশংসিতা হিন্দুরমণীর নাম রাণী ভুবনময়ী দেবী।

তদ্‌পরে পুঁঠিয়া বংশীয় জনৈক ভৈরবেন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইনি অত্যন্ত বাবু ছিলেন এবং ইহাঁর বিষয় বুদ্ধি নিতান্ত কম ছিল। নিজ মূর্খতা এবং কুসংসর্গ দোষে তাঁহাব ধর্মক্ষয় হয়। নানা কারণে তাঁহার বিস্তর ঋণ হয়, সেই ঋণ পরিশোধ জন্য তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি হস্তান্তরিত করিতে হয়। শেষকালে দীঘাপতিয়ার রাজা প্রসন্ননাথ রায় বাহাদুরের সাহায্যের উপর নির্ভব করিয়া তাহার এবং তাহার পত্নীর জীবন রক্ষা হয়।

পরেশনারায়ণ রায় রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের বংশ-সম্ভূত। ইনি যোগেন্দ্রনারায়ণ বায়ের সম-সাময়িক রাজা। পরেশনারায়ণ অপ্রাপ্ত বয়সে কোর্ট অব ওয়ারডসের অধীন থাকিয়া ইংরেজী শিক্ষা করেন। বিদ্যাশিক্ষা শেষ না হওয়ার পূর্ব্বেই তাঁহাকে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে হয়। তিনি রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন না। এই অল্পকাল মধ্যে নিজ পুঁঠিয়া, রামপুরবোয়ালিয়া এবং তাঁহার নিজ জমিদারী মধ্যে কাপাসিয়া, জামরা, বাণেশ্বর, আড়ানী প্রভৃতি স্থানে বিস্তর স্কুল স্থাপিত করিয়া প্রজাপুঞ্জের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার করেন। পুঁঠীয়ার উচ্চ শ্রেণী ইংরেজী স্কুল তাঁহারই নাম এখনও ঘোষণা করিতেছে। ইনি সদাচারী নিষ্ঠাবান্ রাজা ছিলেন।

যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় রাজা জগন্নানারায়ণ রায়ের পৌত্র। বাঙ্গালা ১২৪৭ সালের জ্যৈষ্ঠমাসে যোগেন্দ্রনারায়ণের জন্ম হয়। তিনি অল্প বয়সে পিতৃহীন হইলে, তাঁহার সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ারডসের অধীন হয়। সম্পত্তি ওয়ারডসের অধীন হওয়ার পর তাঁহার বিদ্যা শিক্ষা জন্য জেলায় কালেক্টর সাহেবের আদেশে তাঁহাকে রামপুরবোয়ালীয়ায় আনাইয়া রাজসাহী জেলা স্কুলের নিম্নশ্রেণীতে প্রবিষ্ট করান হইল। রাজসাহী জেলা স্কুলে দুই কি এক বৎসরের জন্য তিনি লেখকের সমপাঠী ছিলেন। (১) তদপরে সুশিক্ষিত ডাক্তর রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অধীনে কলিকাতা "ওয়ারডস-ইন্‌স্টিটিউসনে" (২) বিদ্যাশিক্ষার জন্য তাহাকে প্রেরিত হইল। যদিচ তিনি বুদ্ধিমান ছিলেন, তথাপি বিষয় চিন্তায় ও নানা কারণে তিনি বিদ্যাশিক্ষায় বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই। সুতরাং বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় পূর্ব্বেই, তিনি বাঙ্গালা

(১) লেখক সমপাঠী ছিল বলিয়া, তাঁহার চরিত্র ও তাঁহার সম্পত্তি আদি সম্বন্ধে অনেক জানেন।
(২) এই "ইনষ্টিউসনে" থাকিয়া বাজসাহী জেলার অন্তর্গত পুঁঠীযাব কুমাব পরেশ নাবায়ণ রায়, যোগেন্দ্রনাবায়ণ রায় এবং দিঘাপতিয়ার কুমার প্রমথনাথ বায় বিদ্যা শিক্ষা কবেন। ইহাঁদের মধ্যে দিঘাপতিয়াব কুমাবই সুশিক্ষিত হন।

১২৬৭ সালে (১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে) স্বহস্তে সমস্ত জমিদারীর শাসনের ভার গ্রহণ করেন। (১) বাঙ্গালা ১২৪৭ সাল হইতে ১২৬৬ সাল পর্য্যন্ত, যোগেন্দ্রনারায়ণের বাল্যক্রীড়া, বিদ্যাশিক্ষা ও উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়। পিতা শিশুসন্তান রাখিয়া পরলোক গমন করিলে, সেই শিশুর বিদ্যাশিক্ষার অনেক বিঘ্ন ঘটে। শিশুকালে পিতার মৃত্যু হওয়ায় যোগেন্দ্রনারায়ণ এক মাত্র পুত্র বলিয়া মাতার স্নেহের পুত্তলি হইলেন। পিতার পরলোক গমনের পরেই যদিচ সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ারডসের অধীন হইয়াছিল, তথাপি প্রায় ১৪.১৫ বৎসর পর্য্যন্ত পুঁঠীয়া রাজধানীতে রাখিয়াই শিক্ষার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। সুতরাং পাঠের উন্নতি অধিক না হওয়ায়, তাঁহার বিবাহের পর শিক্ষার জন্য রামপুরবোয়ালিয়াতে তাঁহাকে আনা হইল। বিদ্যাশিক্ষায় অধিক উন্নতি লাভ না করিলেও যোগেন্দ্র নারায়ণ মাতার নিকট হইতে নেপোলীয়নের ন্যায় দয়া, উদারতা, সাহস তেজস্বীতা এবং রাজ-কার্য্য কৌশল অনেক পরিমাণে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। বাঙ্গালা ১২৬২ সালে যোগেন্দ্রনারায়ণ ১৫ বৎসর বয়ক্রমে পতিত হইলেন। ঐ সালের বৈশাখ মাসে পুঁঠীয়া-নিবাসী হরিনাথ সান্ন্যালের (২) পৌত্রী এবং ভৈরবনাথ সান্নালের কন্যা শরৎসুন্দীর সহিত যোগেন্দ্রনারায়ণের বিবাহ হয়। সে সময় শরৎসুন্দরীর বয়ঃক্রম কেবল সাড়ে পাঁচ বৎসর মাত্র। এই উদ্বাহ কার্য্য নির্ব্বাহ হইবার অল্প কাল পরেই, যোগেন্দ্রনারায়ণের মাতা দুর্গা সুন্দরী পরলোক গমন কবেন। তাঁহার মাতার মৃত্যুর পর, বালিকা শরৎসুন্দরী পতির গৃহে বাস করিতে থাকেন।

(১) "১২৪৭ বঙ্গাব্দেব জ্যৈষ্ঠ মাসে যোগেন্দ্র নাবাযণেব জন্ম হয। সুতবাং ১২৬৫ বঙ্গাব্দেব জ্যৈষ্ঠ মাসে তাঁহাব পূর্ণ আঠাব বৎসব উত্তীর্ণ হইযাছিল। তৎকালেব আইনে আঠাব বৎসব বযসই বয়ঃপ্রাপ্তকাল র্দির্দ্দিষ্ট ছিল। সে স্থলে তাঁহাব ১২৬৭ বঙ্গাব্দেব বৈশাখ মাসে সম্পত্তি লাভ কবিবার কারণ কি? তৎসম্বন্ধে তাঁহাব সম্পত্তিব তৎকালীয মেনেজব শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমাব মজুমদার (যিনি এক্ষণে কলিকাতা মহামান্য হাইকোর্টে কতিপয় জমিদাবেব পক্ষে মোক্তাবী করিয়া থাকেন) বলেন যে, যোগেন্দ্রনাবায়ণের কোষ্ঠি দৃষ্টে ১২৬৫ বঙ্গাব্দই তাহাব প্রাপ্ত বয়স্ক কাল নির্ণীত হইযা বাজসাহীব কলেক্টব কর্তৃক ঐ সময পর্যন্ত সমস্ত সম্পত্তি ইজাবা বিলি হইযাছিল। পরে যোগেন্দ্রনাবাযণ যে সমযে কলিকাতা শিক্ষাশাস্ত্রে প্রবেশ কবেন, সে সমযে ডাক্তাব বাজেন্দ্রলাল মিত্র বোর্ড অব বেভিনিউতে (Board of Revenue) বিপোর্ট কবেন যে, যোগেন্দ্রাবায়ণেব শাবীবিক গঠন ও দন্তাদি দৃষ্টে প্রকৃত বযঃক্রম অপেক্ষা অধিক প্রতিপন্ন কবা হইয়াছে এবং তাঁহাব বিবেচনায ১২৬৬ বঙ্গাব্দেব পৌষ মাসে পূর্ণ বযস্ককাল অনুভব হয; ঐ কাল পর্যন্ত শিক্ষাগাবে না থাকিলে, তাঁহার সুশিক্ষায ব্যাঘাত হইবে। বোর্ড অব বেভিনিউ হইতে বাজেন্দ্র বাবুব অনুমানই অকাট্য প্রমাণরূপ গৃহীত হইযা ১২৬৬ বঙ্গাব্দেব পৌষ মাসই বয়ঃপূর্ণের কাল নির্ণীত হয। বাজেন্দ্র বাবু একজন বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ ছিলেন; এবং গ্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে আজীবন লেখনী চালনা কবিতেও ক্রটি করেন নাই। যদি সমুদয কার্য্যে এইরূপ অভিজ্ঞতা পবিচালনা করিয়া থাকেন, তবে বঙ্গদেশেব বড়ই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন যে, রাজেন্দ্র বাবু যোগেন্দ্রনাবাযণেব সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিব চাতুর্য্যে জ্বালাতন হইয়া প্রস্তাবিত উপাযে শাস্তি দিযাছিলেন। কিন্তু গবর্ণমেন্টেব আইনে গুরুতব অপরাধের বন্দীকেও নিয়মিত কালের অতিবিক্ত এক ঘণ্টা কাল কারারুদ্ধ বাখিলে গুরুতব অপবাধ হয়। সেই গবর্ণমেন্টেব প্রধানত রাজস্ব কর্ম্মচারী, কোন প্রমাণের বলে কোষ্ঠী অগ্রাহ্য করিয়া, তাঁহাকে এক বৎসব অধিককাল, শিক্ষাগাবরূপ কাবাগারে আবদ্ধ রাখিযাছিলেন, তাহা জ্ঞান বুদ্ধিব অতীত।"

"১২৬৬ বঙ্গাব্দেব পৌষ মাসে পুর্ণ বযস্কেব কাল হইলেও, ভগ্ন বৎসবে হিসাব নিকাশেব গোলযোগ হয বলিয়া, কালেক্টব চৈত্র মাস পর্যন্ত যোগেন্দ্রনারাযণের হস্তে সম্পত্তি দিয়াছিলেন না। এই কালক্টর বিখ্যাত মিঃ টেলাব, যোগেন্দ্রনাবাযণেব রাজসাহী জেলায় ইজাবাদাব গবাটসন্ কোম্পানীব বোযালিয়ায কুঠিব কর্ম্মাধ্যক্ষ মিঃ কূববণ সাহেবেব কন্যাকে বিবাহ কবিযা নীল বিদ্রোহেব সময অনেক সুকীর্ত্তি কবিযযাছিলেন।"— শ্রীযুক্ত গিবীশচন্দ লাহিড়ী মহাশয প্রণীত মহারাণী শরৎসুন্দরীব জীবন চরিত।

(২) হবিনাথ সান্ন্যাল নিজ কন্যা সূর্য্যমণিকে রাজা বাজেন্দ্র নাবাযণের সঙ্গে বিবাহ দেওযাব পর তাজপুব হইতে পুঁঠীযাব বাস করেন এবং কন্যাব সাহায্যে অনেক জমিদাবী ক্রয করেন।

রাজগৃহে জন্য কোন অভিভাবিকা না থাকায়, যোগেন্দ্রনারায়ণ, হরসুন্দরী নাম্নী তাঁহার বিধবা মাতুলানীকে আনিয়া শরৎসুন্দরীর নিকট অভিভাবিকা স্বরূপ রাখিয়া ছিলেন। "ইনি ব্যতীত যোগেন্দ্রারায়ণের মাতার সহোদরা ভগিনী, শিবসুন্দরী দেবীও অনেক সময় শরৎসুন্দরীর নিকট থাকেন। শরৎসুন্দরী, ইহাঁদের দুই জনকে মাতার ন্যায় ভক্তি করিতেন।" (১) এবং ইহাঁদের নিকট অনেক পরিমাণে দেবীব ন্যায় নিজ চরিত্র গঠন করেন। এই সময় বোর্ড অব রেভিনিউয়ের আদেশ মত যোগেন্দ্রনাবায়ণকে বোযালীয়া হইতে কলিকাতা "ওয়াডবস ইনস্টিটিউসনে" থাকিয়া শিক্ষা প্রাপ্তি জন্য প্রেরিত হইল। কলিকাতার শিক্ষাব কাল অতীত হওয়ার পর ১২৫৭ সালে (১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে)" (২) নিজ সম্পত্তির ভাব গ্রহণ কবিয়া সাধ্বী, সুশীলা ও পতিভক্তি পরায়ণাপত্নীর সহবাসে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। এই সুখ দীর্ঘকাল স্থায়ী রহিল না। যোগেন্দ্রনারায়ণের বিবাহের পূর্ব্বেই তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি কোট অব ওয়ারডসের তত্ত্বাবধানে হয়। সেই সময় তাঁহাব যাবতীয় ভূসম্পত্তি ইজারা বিলি হইয়াছিল। রাজসাহী ও নদীয়া জেলার সম্পত্তি রবার্ট ওয়াটসন কোম্পানীর সহিত এবং মৈমনসিংহেব সম্পত্তি মিঃ কে, রার্ডি সাহেবের সহিত ইজারা বন্দোবস্ত হইয়াছিল। কোর্ট অব ওয়ারডস হইতে নাবালিকের স্টেট তত্ত্বাবধান জন্য মেনেজার নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তিনি নির্ব্বিবাদে কেবল দুই ইজারদারদেব নিকট হইতে কিস্তি মত রাজস্ব আদায় করিয়া গবর্ণমেন্টের বাজস্ব দিতেন এবং সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। এই ইজারা বন্দোবস্তই যোগেন্দ্রনারাযণের অকাল মৃত্যুব কারণ হইয়াছিল। ওয়াটসন কোম্পানী নীলকর। লস্করপুর পরগণার অন্তর্গত পদ্মা, বড়াল, খাঁ ও নারদনদীর অনেক চরে নীল জন্মিতে পারে এবং রাজসাহী মুর্শিদাবাদ ও নদীয়াব অনেক স্থানে ওয়াটসন কোম্পানীর অনেক নীল কুঠী আছে। এই নীল কুঠীব উন্নতি জন্য ওযাটসন কোম্পানীর যোগেন্দ্রনারায়ণের রাজসাহী ও নদীয়ার সম্পত্তি ইজারা লওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল। বাঙ্গালা ১২৫৯ সাল হইতে বাঙ্গালা ১২৬৫ সাল পর্যন্ত ওয়াটসন কোম্পানীর সহিত যোগেন্দ্রনারায়নের রাজসাহী ও নদীয়াবসম্পত্তি ইজারা ছিল। ইজাবাব কাল অতীত হইলেও, "নিজ-জোত" (৩) নামে কতগুলি ভুমি ওয়াটসন কোম্পানী আপন দখলে রাখিযাছিলেন। প্রজারা, নিজ নিজ জোঁতের ভূীমতে নীল বূনানী করার জন্য কোম্পনীর নিকট অগ্রিম দাদন গ্রহণ কবিয়া, এগ্রিমেন্ট বা চুক্তিনামা লিখিয়া দিত। এই এগ্রিমেন্ট "সাটা" নামে খ্যাত। এই "নিজজোত" ও "সাটা" প্রজাদের অত্যাচারের কারণ হইয়া উঠিল। এই সুত্রে প্রজাদের ও ওয়াটসন কোম্পনীর বিবাদ আরম্ভ হইল, যোগেন্দ্রনারায়ণের রাজ্যভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই 'সাটা' দ্বারা প্রজারা প্রপীড়িত হইয়াছিল। তাঁহার রাজ্যভার গ্রহণেব পবে প্রজারা বীতিমত বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। যোগেন্দ্রনারায়ণও নিজ প্রজাদের রক্ষা জন্য তাহাদেব উচ্ছৃঙ্খলতায় যোগ দিলেন এবং প্রাণপণে সাহায্য কবিতে লাগিলেন। সুতরাং নীলকরদের দখল জন্য তিনি প্রাণ, ধন, সম্পত্তি অর্পণ করিলেন; (৪) সুতরাং এই প্রতিজ্ঞা পালন জন্য, আহার নিদ্রা এক প্রকার

---

(১) শ্রীযুক্ত গিবীশচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় প্রণীত মহাবাণী শরৎসুন্দবীব জীবন চরিত।

(২) লেখক ইহার দুই বৎসর পব অর্থাৎ ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিক্ষা পবীক্ষায় উত্তীর্ণ হয। ইহাতে এই অনুমিত হয যে যোগেন্দ্রনাবায়ণ হিন্দু স্কুলেব সম্ভবতঃ দ্বিতীয বা তৃতীয শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন কবিযাছিলেন।

(৩) "নিজ জোতের" ব্যাখ্যা পূর্ব্বে কবা হইযাছে।

(৪) "তাঁহাব হৃদয়, প্রদীপ্ততেজে— দুর্দ্দম উৎসাহে পবিপর্ণ; তিনি এই কার্য্যে আপনাব সমস্ত সম্পত্তি— সমস্ত অর্থ, এমন কি, প্রাণ পর্য্যন্তও দিবেন বলিযা শপথ কবিযাছিলেন। অতএব প্রাণেব প্রতি অণুমাত্রও মমতা রহিল না।"— শ্রীযুক্ত গিবীশচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় প্রণীত মহাবাণী শবৎসুন্দবীব জীবনচবিত।

ত্যাগ করিলেন। (১) দিবা রাত্রি মধ্যে ৩ কি ৪ ঘণ্টার অধিক নিদ্রা যাইতেন না। তিনি নিজ ক্ষমতাগুণে অনেক পরিবার নীল করের হাত হইতে নিজ দুঃখী প্রজাদের উদ্ধার করেন কিন্তু সম্পূর্ণরূপে তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে সক্ষম হন নাই। এই কৌশল অবলম্বন করিয়া ধীরে ধীরে প্রজার দুঃখ নিবারণের চেষ্টা ও যত্ন করিলে তিনি কিছু দিন জীবিত থাকিতে পারিতেন এবং রাজ্য ভোগ করিতে পারিতেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতেই প্রজা সমূহের কষ্টের অবসান হইল না। তিনি জীবিত থাকিলে কি হইত বলা যায় না। এই কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য দুশ্চিন্তা শরীরে প্রবেশ করিয়া, যেগেন্দ্রনারায়ণের শরীর পতন হইল। নানা রোগ তাঁহাকে আক্রমণ করিল। আবার সুরার (২) আশ্রয়ে রোগগুলি বৃদ্ধি পাইতেছিল। অত্যন্ত কাতর হইলে, তাঁহাকে বোয়ালীয়ায় আনা হইল, কিন্তু শরৎসুন্দরী দেবী পুঁঠিয়া রাজধানীতেই থাকিলেন। জেলাব সিবিল সার্জ্জন যোগেন্দ্রনারায়ণকে চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু চিকিৎসায় কোন ফল না হইয়া ক্রমে জ্বব, প্লীহা, যকৃৎ, অরুচি ও অজীর্ণ প্রভৃতি রোগ এরূপভাবে আক্রমণ করিল যে তাঁহার আর প্রাণে বাঁচিবার আশা রহিল না। "তিনি সকল আশা, সকল ভরসা, সকল দুঃখ, সকল সন্তাপ লইয়া যৌবনের প্রথম উদ্যমে অতৃপ্ত জীবনে, ১২৬৯ বঙ্গাব্দের ২৯শে বৈশাখ তারিখে একুশ বৎসর এগার মাস বয়সে ইহধাম ত্যাগ করিলেন। সে সময়ে বোয়ালীয়ায় কর্ম্মচারী ও সাধারণ ভৃত্য ব্যতীত তাঁহার মৃত্যুকালে আত্মীয় বলিতে আর কেহই ছিল না।"(৩)

বোয়ালীয়ায় বিদ্যা শিক্ষার সময় যোগেন্দ্রনায়ারণ সমপাঠীদের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার সুশীলতা, উদাবতা ও মহত্ত্বের পবিচয লেখক স্বয়ং পাইয়া কৃতার্থ মনে করিয়াছিল। তাঁহার সাহস ও নির্ভীকতা নিতান্ত প্রশংসনীয়। কোন অপরিচিত ভদ্রলোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তাঁহার প্রতি তিনি যেরূপ সৌজন্য ও নম্রতা দেখাইতেন তাহাতে সেই ভদ্রলোক যথেষ্ট প্রীতি লাভ করিতেন। পবের দুঃখ মোচনে তিনি নিতান্ত ব্যগ্র হইতেন। তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং কার্য্যে বীরের ন্যায় ছিলেন। যাহা প্রতিজ্ঞা করিতেন তাহা পালন জন্য নিজ প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতেন। বিষয় কার্য্যে তাঁহার বুদ্ধি অধিক ছিল। "প্রজাবা আমার প্রাণাপেক্ষা সহোদর ভ্রাতা।" (১)— এই বাক্যেব প্রত্যেক কথায় প্রত্যেক অক্ষরে, তাহার মহৎ চরিত্রেব এরূপ প্রমাণ যে তাঁহাকে, সুরাপান দোষে কলঙ্কিত করা আমাদের উচিত নহে। যাঁহার গুণের ভাগই বেশী এবং যাহার কেবলমাত্র একটী দোষ, তাঁহাকে রাজাদের মধ্যে উচ্চ আসন অনায়াসে দেওয়া যাইতে পাবিত; কিন্তু শয়নে ও ভোজনে অপরিমিতাচার দোষ আশ্রয় করিয়া ঐশ্বরিক নিয়ম লঙ্ঘন করার জন্য তাঁহাকে আমবা উচ্চ আসন দিতে কুণ্ঠিত হইলাম। জীবনকে রক্ষা করিয়া মানবের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম— সকলই উপার্জ্জন করা উচিত। তিনি দীর্ঘজীবী হইলে, প্রজারা তাঁহাকে যে পিতা অপেক্ষা বেশী ভক্তি কবিত তাহার আর কোন, সন্দেহ নাই। তিনি কেবল ২/৩ বৎসব মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই অল্পকাল মধ্যেই প্রজারা তাঁহাকে ভয় না করিয়া ভক্তি করিত। ইহা রাজার চরিত্রের একটী মহদ্‌গুণ। মোটের উপর বলিতে যোগেন্দ্রনারায়ণ "দাতা, সত্যপ্রতিজ্ঞ, পরোপকাবী বুদ্ধিমান,

---

(১) 'সে সময়ে এই দুশ্চিন্তায় তাঁহাব আহাব নিদ্রা দূবের কথা, পবিত্র হৃদযা প্রণযিনীশবৎসুন্দবীও তাঁহার হৃদয় হইতে স্থানচ্যুতা হইলেন।"— শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র লাহিড়ী মাহশয় প্রণীতমহাবানী শবৎসুন্দবীব জীবনচবিত।

(২) যোগেন্দ্রনারাযণ কলিকাতা "ওযারাস ইনস্টিটিউসনে" থাকা সময় সুরা পান করা অভ্যাস করেন বলিয়া লোকের বিশ্বাস। কিন্তু বোযালীযাই পাঠ্যবস্থার সময লেখক সমপাঠী ছিল এবং অনেক সময়ে সহবাসে কালযাপন করিযাছে; তথাপি সে সময় কোন দিন সুবাপান কবা বলিয়া দৃষ্ট হয নাই।

(৩) শ্রীযুক্ত গবীশচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় প্রণীত মহাবাণী শবৎসুন্দবীর জীবনচরিত।

স্বাধীনচেতা" (১); কিন্তু অপরিমিতাচারী। তিনি প্রজা হিতৈষী ছিলেন। তাঁহার অভাবে লস্করপুর পরগণার প্রজারা পিতৃহীন হইয়া বহুতর শোক প্রকাশ করিয়াছে।

যোগেন্দ্রনারায়ণ মৃত্যুর সময় তাঁহার ত্রয়োদশ বৎসর বয়স্কা পত্নীর হস্তে যাবতীয় সম্পত্তির ভার ন্যস্ত করিয়া দেন এবং ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে রানী শরৎসুন্দরীর গুণের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে বিস্তৃত রাজ্য শাসনের উপযুক্ত পাত্রী জ্ঞান করিয়াছিলেন। রাজসাহীর কালেক্টর মিঃ রয়েলস্ সাহেবের রিপোর্ট অনুসারে বাঙ্গালা ১২৭২ সালে প্রায় ১৫ বৎসর বয়সে শরৎসুন্দরী কোর্ট অব ওয়ার্ডস হইতে যাবতীয় সম্পত্তির ভার গ্রহণ করেন। তদপর বাঙ্গালা ১২৭৩ সালের মাঘ মাসে শরৎসুন্দরী দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। তিনি এই উপলক্ষে ব্রাক্ষ্মণ ও দীনদুঃখীকে বিস্তর দানাদি করিয়াছিলেন। দত্তকের নাম রাখিলেন, যতীন্দ্রনারায়ণ। ১২৮১ সালের মাঘ মাসে দত্তকের উপনয়ন এবং বাঙ্গালা ১২৮৭ সালের ফাগুন মাসে বিবাহ হয়। দত্তকের পত্নীর নাম হেমন্ত কুমারী দেবী। উপনয়ন ও বিবাহ উপলক্ষেও "সংস্কৃত শাস্ত্র ব্যবসায়ী পণ্ডিতদিগেব ও দীন দুঃখীর সাহায্যার্থ লক্ষাধিক টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল।" (১) শরৎসুন্দরীব জীবন বৃত্তান্ত বিস্তাবিতরূপে লিখিতে গেলে স্বতন্ত্র আর একটী গ্রন্থাকার ধারণ করিবে তাহার আর সন্দেহ নাই। "কুলশাস্ত্রদীপিকা গ্রন্থে এবং "বঙ্গবাসী" সংবাদপত্রে মহারাণী শবৎসুন্দরী সম্বন্ধে যে যে কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলেই তাঁহার জীবনেব সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং তাঁহাব গুণরাশির কীর্ত্তন করা হইবে। তাঁহার গুণ এত বেশী যে সহস্র মুখে বহুকাল কীর্ত্তন করিলেও তাহা শেষ হইবাব নহে। সুতরাং উদ্ধৃতাংশ ব্যতীত আবো কিছু বলিবার আশা বহিল।

রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ লোকান্তরিত হইলে তৎপত্নী শ্রীমতি মহাবাণী শরৎসুন্দরী দেবী রাজ্যাধিকার লাভ কবেন। ইনিও তৎকালে অল্প বযস্কা ছিলেন। দৈবের প্রতিকূলে বিধির বিপাকে এই পুণ্যশীলা ও প্রাতঃস্মবণীযা, রমণীকে অকালে জীবনের প্রথম ভাগেই নিদারুণ বৈধব্য দশায় নিপতিত হইতে হইল। ইনি স্বীয় মহামুল্যবান্ জীবনকে তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানে নিয়ত ধর্ম্ম কার্য্যে, দেব সেবায় এবং তীর্থ পর্য্যটনে সময়াতিবাহিত করিতে কৃত সঙ্কল্প হইলেন। গয়া, কাশী, প্রয়াগ এবং শ্রীবৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ পর্য্যটন করতঃ বারাণসীতে প্রত্যাগমনকালে ইহাঁব জনক তথায় মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। রাণী শবৎসুন্দরী বারাণসীতে মহা সমারোহে পিতৃ শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সমাপনান্তে পুঁঠীয়াতে প্রত্যাগমন করতঃ রাজত্ব ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। অন্যান্য অপবিণামদর্শী ও প্রজাপীড়ক ভূম্যধিকারিগণের ন্যায় ইহাঁব হৃদয় ও অন্তঃকবণ পাষাণ নির্ম্মিত নহে। ইনি অপত্য স্নেহে প্রজাবৃন্দের দুঃখ মোচন ও সুখ বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। ইহাঁর দানশীলতা ও পরোপকারিতা জগদ্বিখ্যাত। অনেক স্থানে দরিদ্র বৃন্দেব চিকিৎসার্থ দাতব্য ঔষধালয় এবং দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত দেশে বিপুল অর্থ প্রদান করতঃ লোকেব অন্নকষ্ট নিবারণে নিয়তই যত্নবতী। ১৮৭৭ সালে দিল্লীর দরবারে ইনি মহারাণী উপাধি প্রাপ্ত হইযাছেন।"

"মহারাণী শ্রীমতী শরৎসুন্দরী দেবী সমস্ত বঙ্গ সাম্রাজ্যের রমণীকুলের শিরোভুষণ। ইনি মহারাণী ভবানীর ন্যায় লোকমণ্ডলীর প্রাতঃস্মরণীয়া। ইন বরেন্দ্রভুমির গৌরব ও অত্যুজ্জল রত্ন স্বরূপা। ইহাঁর বিশুদ্ধ চরিত্র, পবিত্র দেব ভাব, দানশীলতা ও সহানুভূতি জগজ্জনের অনুকরণীয় আদর্শ। ইনি প্রতিদিন শত শত অনাথা চিবদুঃখিনী বিধবাগণেব ভরণপোষণ করেন। রোগ জরাগ্রস্ত মুমূর্ষু দুঃখিনীগণের মৃত্যুশয্যা পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া স্বয়ং তাহাদিগের সেবা ও শুশ্রষা করিয়া থাকেন। নারী চরিত্র কতদূর উৎকৃষ্টতা লাভ করিতে পারে, মানবীয় কুপ্রবৃত্তি নিচয় ধর্ম্ম

(১) শ্রীযুক্ত গরীশচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় প্রণীত মহারাণী শবৎসুন্দরীর জীবনচবিত।

চর্চ্চার মহীয়সী শক্তিতে কতদূর পর্য্যন্ত নিস্তেজ হইতে পারে, ইনি তাহার জীবিত দৃষ্টান্ত স্থল। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়াও আহার, বিহার এবং ভোগ বিলাসাদিকে পদতলে দলিত করতঃ বিশুদ্ধ ধর্ম্মের জন্য, পরোপকারের জন্য আপনার জীবনকে উৎসর্গ করিয়াছেন। এই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে বঙ্গীয় ললনাগণ, পরণ-পরিচ্ছদ এবং ভোগ বিলাসে অনুক্ষণ নিরতা রহিয়াছেন; কিন্তু পবিত্র চরিতা মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবী, পূর্ণ যৌবনা ও অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়াও, প্রাচীনা ভারত মহিলাগণের গৌরবের স্থল। ইনি সতীত্ব, ধর্ম্মনিষ্ঠা, ত্যাগ স্বীকার ও বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ প্রভৃতি সদ্‌গুণের মহাদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন। কি ইংরেজ, কি বঙ্গবাসী, কি হিন্দুস্থানী, সকলেই এক বাক্যে এক হৃদয়ে ইহাঁর যশোকীর্ত্তন করিতেছেন।" (১)

'নূতন বৎসবের প্রথম দিনে মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবী বিষয় ভার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে শুভ সংবাদ নহে। অলৌকিক ধর্ম্মভাব এবং দান শীলতাব জন্য বঙ্গদেশে শরৎসুন্দরী প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়াছেন। হিন্দু সন্তানের চক্ষে তিনি পবিত্রা-আর্য্য-নারীকুলেব আদর্শ স্বরূপ। অন্য ধর্ম্মাবলম্বীগণও এক বাক্যে তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। এরূপ বিশ্বজনীন ভক্তি-প্রীতি যাঁহার পুবস্কার, তাঁহাব জীবনী আলোচনায় পূণ্য আছে।"

"১২৬৫ সালের আশ্বিন মাসে মহারাণী জন্ম গ্রহণ কবেন। নিজ পুঁঠীয়াতেই তাঁহাব পিত্রালয়। পিতা স্বর্গীয় ভৈরবনাথ সান্নাল মহাশয় পুঁঠিয়ার একজন সম্ভ্রান্ত জমিদার। তিনি গোঁড়া হিন্দু ছিলেন; হিন্দু ধর্ম্মোক্ত সকল ক্রিয়াকলাপেব অনুষ্ঠান বার মাস তাঁহার গৃহে হইত; আজিও হইয়া থাকে। মহারাণীর মাতা (২) অদ্যাপি জীবিতা আছেন। যে সকল রমণীয় গুণ তাঁহার চরিত্রেব ভূষণ, সচরাচর একাধারে তাহা প্রায় দেখা যায় না। পিতা মাতার সাধুজীবনের দৃষ্টান্ত কেমন কার্য্যকর, তাঁহাদের মহত্ব, তাঁহাদেব ধর্ম্ম ভাব, সন্তানে কতদূব বিকশিত হইতে পারে, মহারাণী শবৎসুন্দবী তাহার উজ্জ্বলতম প্রমাণ।"

অতি অল্প বয়সে মহারাণীব বিবাহ হয়। তাঁহার বয়স তখন ছয় বৎসর; স্বামী স্বর্গীয় রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ তখন দ্বাদশ বর্ষীয় বালক মাত্র। (৩)

পশ্চাৎ শুনা যায়, বিবাহেব পূর্ব্বে একজন গণক মহারাণীর বৈধব্য গণনা করিয়াছিল। ত্রয়োদশর্ষ বয়সে তাঁহার বৈধব্য ঘটে। পিতামহী গণকের গণনা ব্যর্থ করিবার উদ্দেশে স্থিব করিয়াছিলেন, বেশী বয়সে পৌত্রীর বিবাহ দিবেন। বলা-বাহুল্য তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। পরিণত হইলে বুঝি বঙ্গ সমাজ মহারাণী শরৎসুন্দরীর নাম কখন শুনিতে পাইত না। যাহা হউক, কিন্তু তাহা হইলে বুঝি দেবী শরৎসুন্দরী জীবনে সুখী হইতে পারিতেন। পবিত্রময়ী মহাবাণী শবৎসুন্দরীর গার্হ্যস্থ জীবন কেবল দুঃখময়। বাল্যে বিধবা, যৌবনে পিতৃহীনা, হায়! জীবনের সকল ভাগই তাঁহার কেবল দুঃখময়। চির দুঃখিনী সীতার চিত্র মনে করিয়া যে জাতি অনুদিন পবিত্রতায় অশ্রু বিসর্জ্জন করেন, সাধ্বী শরৎসুন্দরীর দুঃখ যন্ত্রণাময় জীবনের ইতিহাস বাস্তবিক সে জাতির অর্জ্জনীয় সামগ্রী।"

"১২৭২ সালে শরৎসুন্দরীর হস্তে বিষয় ভার অর্পিত হয়। সেই অবধি কিরূপ প্রশংসা এবং দক্ষতার সহিত তিনি উহা চালাইয়া আসিয়াছেন, এখানে তাহার পরিচয় দিতে হইবে না। গত

(১) কুলশাস্ত্র দীপিকা।

(২) মহাবাণীর মাতাব নাম দ্রবময়ী। দ্রবময়ী অতি সুশীলা গুণবতী বলিয়া পুঁঠীয়াতে খ্যাতি লাভ করেন।

(৩) বিবাহের সময় বাজা যোগেন্দ্রনারায়ণের ১৫ বৎসব বয়স ছিল।

বৎসর হইতে তাঁহার কাশীবাসের কথা হইতেছে। সেই অবধি তিনি ইদানীন্তন বিষয় কার্য্যে অনেকটা হতাদর হইয়া ছিলেন।"

"দিল্লীর দরবারের সময় শরৎসুন্দরী "মহারাণী" উপাধি লাভ করেন, কিন্তু তিনি খেলাত গ্রহণ করেন নাই। গবর্ণমেন্টকে সেই উপলক্ষে জানাইয়া' ছিলেন তিনি বিধবা, সে সম্মান তাঁহাব গ্রহণীয় নহে। মহারাণীর দান এত বিস্তৃত এবং তাহা সাধারণেব এত পরিচিত যে তাহার উল্লেখ মাত্রই এখানে যথেষ্ট। কিন্তু তিনি অতি গোপনে নিজের আমলাদেরও অজ্ঞাতে যে সকল দান করেন, আজিকার এই বাহ্যাড়ম্বরেব দিনে তাহার কিছু পরিচয় দিতে হইতেছে। আজি পর্য্যন্ত প্রায় ৪/৫ লক্ষ টাকা দান কবিয়াছেন। প্রাতে শয্যাত্যাগ করিবার কিছু পরে বৈষয়িক কাগজপত্র দেখা এবং সংবাদপত্র পাঠ করা তাঁহাব একটা দৈনিক নির্দিষ্ট কার্য্য। সেই সময পবিচিত দুঃখী স্ত্রীলোক, বালক এবং বালিকাগণ আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া বসে; কেহ কাঁদিতেছে, ঘবে খাবাব নাই, কাহাবও কাপড় নাই, কাহারও ছেলেব ব্যারাম চিকিৎসা হয় না। সকলেই দুঃখেব কান্না কাঁদিতেছে, শুনিতে শুনিতে মহাবাণী চক্ষের জল মুছিতেছেন। সকলেরই অভাব মোচন করিতে হইবে, কাহাকেও বিমুখ করা হইবে না। বাজবাটীতে অবশ্য চিকিৎসকেব অভাব নাই, ইঙ্গিত মাত্রেই দুঃখিনীর ছেলেটীব চিকিৎসা হইতে পারে। কিন্তু মহাবাণী অতি গোপনে তাহার হস্তে উপযুক্ত অর্থ দিয়া ডাক্তাব আনাইয়া চিকিৎসা করাইতে উপদেশ করেন।"

"কোমল বয়সে স্বামীব যত্নে মহারাণী সামান্য লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। তাহার পব নিজের যত্ন ও অধ্যবসায়েব গুণে সেই শিক্ষা বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিযাছে। তাঁহার নিজের একটী লাইব্রেরী আছে। এদেশে যে কোন সুশিক্ষিতের পক্ষে সেইরূপ পুস্তক রাশির সংগ্রহ সুখ্যাতির কথা। গত বৎসর পর্য্যন্ত মহাবাণী প্রায় সকল বাঙ্গলা সাময়িক পত্র গ্রহণ ও পাঠ করিতেন। অনেক বাঙ্গালা গ্রন্থকার তাঁহার উৎসাহ ও অর্থানুকূল্য লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহাব প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় সমূহ (১) তাঁহার সাহায্যাধীন বিদ্যার্থী নিরাশ্রয় ভদ্র সন্তানগণ তাঁহার বিদ্যোৎসাহিতার প্রমাণ। সেই সব ভদ্র সন্তানের প্রতি তাঁহার স্নেহ এবং যত্ন মনে করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। রাজসাহী কলেজের সুন্দর গৃহগুলি, রেইল প্রভৃতি তাঁহাদের দুই স্ত্রী পুরুষের অক্ষয় কীর্ত্তি। অন্তঃপুরে বসিয়াও ভারতবর্ষের উন্নতির সূচনা মাত্রে তাঁহার মনে কেমন আনন্দ, কেমন উৎসাহ জন্মে। আত্ম-শাসন প্রণালী উপলক্ষে গত বৎসর পুঠীয়ায় বিরাট সভা তাহার উদাহরণ। সেই সভার পর্দার অন্তরালে মহাবাণী স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। বোধহয় অনেকেই জানেন যে আত্ম-শাসন সম্পর্কে এদেশে সেই প্রথম সভা।"

"মহাবাণী শরৎসুন্দরী হিন্দু ধর্ম্মে অনন্ত বিশ্বাসবতী। তাঁহার জীবন হিন্দু ধর্ম্মময়— হিন্দু শাস্ত্রের সকল অনুশাসন তিনি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়া থাকেন। বাল-বিধবা সেই আবল্য, যথা-শাস্ত্র ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়া আসিতেছেন। এই কঠোব ধর্ম্ম-ভাবের বলে তাঁহার স্বাস্থ্য চিরদিনের মত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সেবার গঙ্গাসাগর হইতে ফিরিয়া কলিকাতায় প্রাণ সংশয়রূপে পীড়িতা হন। সেই অবধিই প্রাপ্ত অসুস্থ। কিন্তু অসুখের কথা সহজে কেহ জানিতে পাবে না। সর্ব্বদা অনাবৃত্ত হর্ম্ম্যতলে বসিয়া থাকা তাঁহার নিয়ম। পীড়ার কষ্ট অসহ্য না হইলে আর শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করেন না। সুতরাং পীড়া গুরুতর হইয়া না দাড়াইলে কখন তাঁহাব চিকিৎসা হইতে পায় না। নিরাশ্রয়া বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যা সংখ্যার

(১) লালপুব মধ্য-শ্রেণী ইংবাজী স্কুল, পুঁঠীয়া মধ্য শ্রেণী বাঙ্গালা স্কুল, মধুখালী মধ্যশ্রেণী বাঙ্গালা স্কুল; ইহা ব্যতীত অনেক স্কুল ও পাটশালায মাসিক সাহায্য ছিল।

অনেকগুলি বারমাস তাঁহারা মহারাণীকে ঘেরিয়া বসেন ও নানা প্রকার গল্প করেন। রাত্রে প্রকাণ্ড চাতালে সকলের মধ্যস্থলে সামান্য শয্যায় শয়ন করেন। পালঙ্ক নাই, ইস্প্রিংয়ের গদী নাই, দুগ্ধ ফেননিভ শয্যা নাই, মেঝের উপর সেই সামান্য শয্যাতেই মহারাণী সন্তুষ্ট।"

"এক্ষণে কিছুদিন মধ্যে মহারাণী বোধ হয় কাশীবাস করিবেন। তিনি যে খানেই থাকুন, সমগ্র ভারত-বাসীরও প্রীতি তাঁহার সহগামিনী হইবে।"(১)

মহারাণী শরৎসুন্দরী কেবল যে দীন দুঃখীকে দান এবং স্বধর্ম্ম, কার্য্যে সমস্ত কাল যাপন করিতেন এমত নহে। তিনি বিস্তৃত সম্পত্তিব তত্ত্বাবধান কার্য্যও অতি নিপুণ ও দক্ষ ছিলেন। বাঙ্গালা ১২৭২ সাল হইতে বাঙ্গালা ১২৯০ সাল পর্যন্ত আঠার বৎসর তাঁহার হস্তে সম্পত্তি তত্ত্বাবধায়নের ভার ছিল এই কাল মধ্যে তিনি সম্পত্তির অতি সুবন্দোবস্ত করেন এবং প্রায় দশ লক্ষ টাকাব সম্পত্তি ক্রয় কবিয়া পতির সম্পত্তির সহিত সংযোজিত কবেন। তিনি প্রজাগণকে এরূপ স্নেহ সহকারে পালন করিতেন যে প্রজাবা তাঁহাকে মাতাব ন্যায় ভক্তি কবিত এবং সন্তুষ্ট হইয়া বৃদ্ধিহারে জন্ম দিতে স্বীকৃত হইয়াছিল। এই ১৮ বৎসর মধ্যে তাঁহার সম্পত্তির আব প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি হয়। যে ওয়াটসন কোম্পানীর সহিত তাঁহার পতি রাজা যোগেন্দ্রনাবায়ণ বিবাদ করিয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন, তিনি সম্পত্তিব ভাব গ্রহণ কবিয়া সেই কোম্পনীর সহিত সন্ধি করেন এবং কোন স্থলে আদালতের আশ্রয়ে অতি কৌশলে মীমাংসা করিয়া নির্ব্বিবাদী হন এবং পরম সুখে প্রজা পালনে রত ছিলেন। মহারাণীর অমায়িকতা ও সদগুণে শত্রুগণও বশীভূত হইত। ১২৮১ সালের দুর্ভিক্ষে মহাবাণী প্রজাগণকে মাতার ন্যায় আহার যোগাইয়া ছিলেন এবং অশক্ত অনেক প্রজাব বাকী খাজানা মধ্যেও অনেক টাকা মাপ দিয়া সাধাবণেব শত সহস্র ধন্যবাদের পাত্রী হইয়াছিলেন।

বাজা মহারাজা উল্লেখে মহাত্মা বড়লাট লর্ড কর্জ্জন বাহাদুরের কথায় বলিতে গেলে মহাবাণী শবৎসুন্দরী নিজের সুখেব জন্য রাজস্ব সংগ্রহ কবিতেন না; কিন্তু প্রজাব মঙ্গলেব জন্য। তিনি নিজ-প্রজার যেমন প্রভু ছিলেন তেমনই দাসও ছিলেন। (২) এই আদর্শ দৃষ্টে বঙ্গদেশেব মহাবাজা, রাজা, জমিদারগণ প্রজাপালন করিলে প্রজাগণের সুখেব ইয়ত্তা থাকে না। এইরূপ আদর্শেব মহারাজা, বাজা, জমিদাব আজি কালি ভারতে অতি বিবল। আজি কালি প্রায় মহারাজা, বাজা, জমিদাবগণ নিজের সুখেব জন্য নিজ কুটুম্ব প্রতিপালন জন্য, ইংবাজী ধরনেব নূতন বিলাসিতা, জন্য, প্রজাব রক্ত শোষণ করিয়া নিজ নিজ কোষ পূরণ করিযা আনন্দিত হন। ধর্ম্মাভাবেব অভাবেই প্রজাগণের দুঃখ হইতেছে। জমিদাবগণ প্রজাগণেব সুখে সুখী এবং দুঃখে দুঃখী হইলে, প্রজাগণ ও জমিদারগণের সুখ দুঃখের ভাগী হইবে তাহার আব সন্দেহ নাই।

বাঙ্গলা ১২৯০ সালে তাঁহাব দত্তক পুত্র, কুমাব যতীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন। মহাবাণী শবৎসুন্দরী মাতৃভক্ত, বৎসল পুত্রের হস্তে সম্পত্তিব ভার অর্পণ কবিয়া কাশীধামে গমন করিলেন। কুমার রাজ্যভাব গ্রহণ করিয়াও মাতার বিনা আদেশে বা বিনা পরামর্শে কোন কার্য্য করিতেন না। কিন্তু তাঁহাকে অতি অল্পকাল রাজস্ব করিতে হইয়াছিল। মহারাণী কাশীধাম গমন কবিবার অল্প দিন পবেই মাতৃভক্ত কুমাব মাতৃদর্শনে কাশীধামে গমন করেন। তথায় তাঁহার পীড়া উপস্থিত হয়। বাঙ্গলা ১২৯০ সালের ফাল্গুন মাসে ছয় মাস গর্ভবর্তী

(১) "বঙ্গবাণী" ১২৯০ সাল ১৬ই বৈশাখ।

(২) গোয়ালীয়রে বড়লাট বাহাদুব বলিযাছেন ঃ—
"He must be the servant, as well as the master of his people He must learn that his revenues are not secured to him for his own gratification, but for the good of his subjests."- The Indian Empire, 5th December 1599

পত্নী রাখিয়া কুমার কাশী লাভ কবেন। তদপর বাঙ্গলা ১২৯১ সালের আষাঢ় মাসে মহারাণীব পুত্রবধূ হেমন্তকুমারী দেবী এক কন্যা প্রসব কবেন। পুত্রেব পবলোক গমনের পর মহাবাণী তাঁহার পুত্রবধূর আত্মীয়গণকে সমাদরে নিকটে রাখিতেন। এসময় হইতে পুত্রবধূব সহিত তাঁহার মনান্তর ঘটাইবাব জন্য দুইটী দল সৃষ্টি হইল। মহারাণী তাহা জানিতে পারিয়া কিছু দিন তীর্থযাত্রা উপলক্ষে বাজ কার্য্যের সংস্রব ত্যাগ কবিতে ইচ্ছা কবেন, যদিচ কুমারেব মৃত্যুর পর মহারাণীর হস্তে রাজকার্য্যেব ভার অর্পিত ছিল। বাঙ্গালা ১২৯২ সালেব পৌষ বা মাঘ মাসে মহারাণী তীর্থ পর্যটনে বহির্গত হইলেন। অযোধ্যা, চিত্রকূট, দণ্ডকাবণ্য, নৈমিষ্যাবণ্য, কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বাব, কনখল, জ্বালামুখী, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ পর্যটন কবিয়া বৈশাখ মাসে কাশীধামে ফিবিয়া আসিলেন। প্রায় সকল তীর্থ দর্শনে নিজে পদব্রজে ১০/১২ ক্রোশ পথ গমন কবিয়া কাতর হইলেও তিনি ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইয়া কোন যানে পবমসুখে যাইবার প্রয়াস পান নাই। আত্মীয ও কর্মচারীদেব কৌশলে পুত্রবধুর সহিত মহাবাণীর যে মনান্তর চলিতেছিল তাহা তীর্থ হইতে ফিরিয়া আসিয়াও নির্ব্বাপিত হইতে দেখা গেল না। তখন মহবাণী ১২৯৩ সালে পুঁঠীয়া আগমন কবিয়া অনেকের অনিচ্ছায় সম্পত্তি বধূরাণীর বয়ঃপ্রাপ্ত কাল পর্যন্ত "কোর্ট অব ওয়ার্ডসের" তত্ত্বাবধানে লইবার জন্য স্বয়ং রাজসাহীর কালেক্টরেব নিকট আবেদন করেন। গবর্ণমেন্টের আদেশের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। বিধবা বাণী হইযাও ব্রহ্মচারিণী বেশে দিন যাপন করিতেন এবং অনিয়মে নানা রোগের উৎপত্তি হইয়াও তিনি ঔষধ সেবন করিতেন না। অর্শ, অম্লপিত্ত, উদবাময়, জ্বর প্রভৃতি বোগের ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া তিনি একরূপ শয্যাগত হইলেন। এরূপ শরীরেও তাঁহাব নিয়মিত ধর্ম্ম কর্ম্মেব বাদ ছিল না বা তিনি কস্ট বোধ কবিতেন না তখন আর তিনি পুঁঠীযায় থাকিতে পাবিলেন না। তিনি ঐরূপ কাতর শবীবে কাশীধামে প্রত্যাগমন করেন। কাশীধামে যাইবাব পবও তাঁহার আব রোগ সমূহ হইতে আরোগ্য লাভের আশা বহিল না। এই সময়ে অর্থাৎ মৃত্যুব পূর্ব্ব দিন টেলিগ্রাম পাইয়া জানিতে পারিলেন যে সম্পত্তি "কোট অব ওয়ার্ডসের" অধীন হইবে না। এই সংবাদ পাইবাব পব ১২৯৩ সালের ২৫শে ফাল্গুন তারিখে মহাবাণী কাশীলাভ কবিয়া পূণ্যধামে গমন করেন। তাঁহাব কাশী প্রাপ্তির পব পুত্রবধূ রাণী হেমন্তকুমারী দেবী সম্পত্তির ভার গ্রহণ কবেন।

রাণী হেমন্তকুমাবী দেবী পতির সম্পত্তির ভার গ্রহণ করার অব্যবহিত পরে তাঁহার আত্মীয়-স্বজন ষ্টেটের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া বসিলেন। রানী অল্প বয়স্কা এবং বিষয়-কৌশলতাও তাঁহার তাদৃশ ছিল না। এমতাবস্থায় ভূসম্পত্তির শাসনকার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ না হওয়াবই কথা। মহাবাণী শরৎসুন্দরীব দয়া, অমায়িকতা এবং সুশাসনেব পর রাজ্যের বিশৃঙ্খলভাব অনেক শত্রুব সৃষ্টি হইতে লাগিল। রাজা যোগেন্দ্রনরায়ণ রায়ের মাসীর পুত্র জয়নাথ চক্রবর্তীকে শত্রুপক্ষীয়েবা এই বলিয়া উত্তেজিত করেন যে সম্পত্তির প্রকৃত উত্তবাধিকারী এখন মাসীব পুত্র, যেহেতুক শাস্ত্রেব বিধানানুসারেই যোগেন্দ্রনারায়ণের দত্তক বাখা হয় নাই। শত্রুদলের এইরূপ উত্তেজনায় এবং অনাযাসলব্ধ একটা বৃহৎ রাজ্য লাভের আশায় জয়নাথ রাজসাহীর জজ আদালতে দত্তক পুত্র অসিদ্ধিব মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিলেন। জয়নাথের মৃত্যুর পর আদালতে দত্তক পুত্র সিদ্ধ হইল। জয়নাথের উত্তরাধিকাবগণ মোকদ্দময় পরাজিত হইল বটে কিন্তু এই মোকদ্দমার অযথা প্রচুব অর্থ ব্যয় হইয়া গেল। মোকদ্দমাব পব হইতেই স্বজন বন্ধুবান্ধবদের পূর্ব্বের মত কর্তৃত্ব রহিল না, এবং রাজ্য শাসনকার্য্যও অনেক ভাল হইল। বর্ত্তমানে যেরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে, তাহাতে রাজ্যের শুভ লক্ষণই দৃষ্ট হইতেছে।

পুঁঠীয়ার রাজ মহিলা– আর্য্যজাতিব মধ্যে অনেক সাধ্বী পতিব্রতা, পুণ্যবতী, দয়াবতী

এবং দানশীলা মহিলা ধনীর অট্টালিকায় এবং দরিদ্রের কুটীরে ছিল এবং বর্ত্তমানে আছে। কিন্তু এক মহিলাতে সকল গুণ থাকা বিরল। কেহ হয়ত পতিব্রতা কিন্তু দয়াবতী ও দানশীলা নহে, আবার কেহ হয়ত দয়াবতী ও দানশীলা কিন্তু পতিব্রতা নহে। আবার রাজ রমণীর রাজকার্য্যের পটুতা সকল স্থলেও দৃষ্ট হয় না। পুঁঠীয়া রাজবংশ ধর্ম্মের, পুণ্যের সংসার বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। এ বংশের মহিলাদেব দেবচরিত্র নিতান্ত প্রশংসনীয়। এই পুঁঠীয়া রাজবংশে রাজা বাজেন্দ্রনারায়ণের স্ত্রী বাণী সূর্যমণী দেবী, রাজা জগন্নারায়ণের পত্নী রাণী ভুবনময়ী দেবী, এবং বাজা যোগেন্দ্র নবায়ণেব পত্নী মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবীর কীর্ত্তিকলাপ এরূপ বিস্তৃত এবং প্রসিদ্ধ যে নাম ও যশে বংশের গৌরব সমগ্র ভারতে ব্যাপিয়া আছে। এই তিনটী রমণী মধ্যে মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবী যেরূপ বালবিধবা হন এরূপ অপর কেহই নহে। যদিচ রাণী সূর্য্যমণী অল্প বয়সে বিধবা হইয়া পতির ত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হওয়ার পর সুকৌশলে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ কবেন, তথাপি মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবীর ন্যায় রাণী সূর্য্যমণী বা রাণী ভূবনময়ী কেহই যশস্বিনী হইতে পারেন নাই। সুতরাং মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবীর গুণকীর্ত্তনে হিন্দু মহিলার সহিত পতিব কিরূপ সংস্রবে থাকিতে হয় এবং হিন্দু মহিলার কি কর্ত্তব্য তাহাই প্রকাশ পাইবে।

মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবী পুঁঠীয়া নিবাসী একজন সম্ভ্রান্ত জমিদার ভৈরব নাথ সান্ন্যালের কন্যা ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই এই কন্যার হৃদয় দয়া উদারতায় পরিপূর্ণ ছিল, যদিচ পিতৃগৃহে কোনরূপ লেখাপড়া শিক্ষা করেন নাই। ইহাঁর প্রায় ছয় বৎসর বয়সের সময় রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়ের সহিত বিবাহ এবং তিনি প্রায় ১৩ বৎসর বয়সে বিধবা হন। তাহাব পর প্রায় ২৫ বৎসর তিনি জীবিতা ছিলেন। পতিগৃহে আসিয়া বিধবা হইবার পূর্ব্বে পতির ভালবাসা ও যত্নে সামান্য লেখাপড়া শিক্ষা করেন এবং পতির পরলোক গমনের পর সেই সামান্য শিক্ষা ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া তাহার নির্ম্মল জ্ঞান এবং পবিত্র দেবচরিত্রের এত উৎকর্যতা লাভ করে যে তাঁহাকে সামান্য মানবী না বলিয়া দেবী বলিলে অত্যুক্তি হয না। আর্য্যজাতিব বিবাহের প্রণালী এত উৎকৃষ্ট যে পতিপত্নী উভয়ে ধর্ম্ম-বন্ধনে সম্বন্ধ থাকিয়া পরস্পর পবস্পরের সহিত ধর্ম্মপালন করিবে। কিন্তু হায়! ভারতের কি দুর্দ্দশা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে এবং উনবিংশতীর সভ্যতা ও বিলাসিতার দুর্দ্দমণীয় অত্যাচারে, এই ধর্ম্ম বন্ধনী ক্রমে শিথিল হইয়া যাইতেছে। এই ভাবতের দুর্ভাগ্য! এমন দুঃসময়ে সেই রমণী শৈশবকাল হইতে যৌবনেব অতীতকাল পর্য্যন্ত এক মনে, এক হৃদয়ে, এক আত্মায় পতির প্রিয়কার্য্য সাধনে, নাবী ধর্ম্ম প্রতিপালনে, স্বধর্ম্ম রক্ষণে, দীন-দুঃখীর দুঃখমোচনে এবং প্রজাগণকে পুত্রবৎ প্রতিপালনে, নিজ অনিত্য দেহকে বিসর্জ্জন দিয়াছেন। স্বামী স্ত্রীলোকদিগের তীর্থ তপস্যা, বান, ব্রত এবং গুরু। অতএব নাবী সর্ব্বাত্মকরণে পতি সেবা কবিবে।" (১) আর্য্যজাতির বিবাহ বন্ধন এইরূপ যে স্বামীর অভাবেও সম্বন্ধ ছিন্ন হয় না। পতি জীবিত থাকিতে স্ত্রী সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার সেবা কবিবে এবং নিয়ত পতিব্রতা সাধ্বীভাবে থাকিয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিবে; আবার পতির অভাব হইলে ব্রহ্মচারিণী বেশে সেই পতিকে ধ্যান করিয়া মনে মনে তাঁহারই চরণ পূজা করিবে এবং দেবর্চ্চনা, দয়া ও দান ধর্ম্মদ্বারা চিত্তকে পবিত্র রাখিবে। "যে ভার্য্যা পতির প্রিয় ও হিতকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন এবং সদাচারী ও সংযতেন্দ্রিয়া হয়েন, তিনি ইহলোকে কীর্ত্তি ও পবলোকে অনুপম সুখ প্রাপ্ত হয়েন।"

---

(১) "নৈব এতান্যাং নিয়মো ভর্ত্তুঃ শুশ্রুষণং বিনা
ভর্ত্তৈব যোষিতাং তীর্থং তপোদানং ব্রতং গুরুঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা নাবী পতি সেবাং সমাচবেৎ
পত্যুঃ প্রিয়ং সদা কূর্য্যাৎ বচসা পবিচর্য্যযা।"
মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

(১) নারী কোন কালে স্বাধীন নহে। বিবাহের পূর্ব্বে নারী পিতার অধীন, বিবাহ হইলে পতিব অধীন, এবং পতির অভাবে পুত্রের অধীন। সেইরূপ মহারাণী শরৎসুন্দরীও স্বাধীন ছিলেন না। বিবাহের পূর্ব্বে তিনি পিতার অধীন, বিবাহের পব পতির অধীন এবং পতির অভাবে তিনি সকল জগতের— প্রজার, দীন ও দুঃখীর—দাস ও অধীনা ছিলেন। এই আদর্শের নারীই মহারাণী শবৎসুন্দরী দেবী ছিলেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহাব জীবিতকাল পর্য্যন্ত এরূপ পতি প্রাণা, পতিব্রতা, সাধ্বী, দয়াশীলা ও দানশীলা রমণী ভারতে দৃষ্টিগোচর হয় না। রাজরাণী হইয়া মৃত্তিকা যাঁহার শয্যা ছিল; হস্ত যাঁহার বালিশ ছিল। এক মুষ্টি আতপ তণ্ডুল যাঁহার জীবন রক্ষার প্রধান উপাদান ছিল। পতি ও দেবসেবায় যাঁহার শবীব অর্পিত হইয়াছিল, যাঁহার অতুল ধনবাশি দীন দুঃখীর সেবায় নিয়োজিত ছিল, যাঁহার যাবতীয় ধর্ম্ম ও কর্ম্ম, নিষ্কাম ও নিঃস্বার্থ ভাবে নির্ব্বাহিত হইয়াছিল, তাঁহাকে আমি কেন; জগতের সকলেই এক বাক্যে বলিবে যে তিনি মানবী নহে; তিনি দেবী। তিনি নিশ্চয়ই মুক্তি-লাভ করিয়া ব্রহ্মলোকে বাস করিতেছেন। যত দিন এজগতে চন্দ্রসূর্য্য বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন তাঁহার কীর্ত্তিও এজগতে জীবিত থাকিবে।

---

(১) "পতি প্রিয়হিতে মুক্ত স্বাচারা সংসতেন্দ্রিয়া।
ইহ কীর্ত্তিমবাহোতি প্রেত্য চানুপমং সুখম্।"

নবম অধ্যায়
নাটোর রাজবংশ

নাটোর রাজবংশের উৎপত্তি– আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে যে পঞ্চ গোত্রীয় পাঁচজন ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আনেন, তন্মধ্যে কাশ্যপ গোত্রীয় সুষেণমণি একজন। এই সুষেণাদির পুত্রগণ বরেন্দ্রভূমে একশত গ্রামে বাস করেন। সুষেণ বংশেব মতু নামক এক ব্যক্তি মৈত্র উপাধি প্রাপ্ত হন। মতু ও তাহার সন্তান কুলীন ছিল। ঐ বংশে জীবর মৈত্র (১) নামক ব্যক্তি কুলচ্যুত হন। নাটোর বাজবংশের আদিপুরুষ কামদেব মৈত্র ঐ জীবব মৈত্রেব বংশধব। ঐ কামদেবের পুঁঠীয়ার রাজবংশের নবনাবায়ণ ঠাকুরের অধীনে পবগণে লস্করপুরে অন্তর্গত বাব্রইহাটী গ্রামের তহশীলদার ছিল। কামদেবের তিন পুত্র;— রামজীবন, বঘুনন্দন, ও বিষ্ণুরাম। তিন ভ্রাতা বাজধানীতে থাকিয়া তৎকালোপযোগী লেখাপড়া শিক্ষা করিতেন। এই সময় আরঙ্গজীব দিল্লীব সম্রাট ছিলেন।

রঘুনন্দনের উন্নতি– এই তিন ভ্রাতার মধ্যে রঘুনন্দন বুদ্ধিমান এবং প্রতিভা গুণ সম্পন্ন ছিলেন। ইহা কথিত আছে তিনি পুঁঠীয়া বাজসংসাবে দেবপূজার পুষ্প সংগ্রহ করিবার জন্য নিযুক্ত ছিলেন। এই জনশ্রুতি আছে যে এক দিবস ক্লান্ত হইয়া বঘুনন্দন পুষ্পোদ্যানে শয়ন করিয়া আছেন। একটী সর্প ফণা বিস্তার করিয়া তাঁহকে সূর্য্যের রশ্মি হইতে রক্ষা করিতেছেন। এটী রাজচিহ্ন বলিয়া প্রবাদ। রাজা দর্পনারায়ণ রায় এই সংবাদ পাইয়া রঘুনন্দনকে ডাকিলেন। রঘুনন্দন উপস্থিত হইলে রাজা দর্পনারায়ণ বলিলেন, "বঘুনন্দন তোমাব রাজচক্রবর্ত্তীর চিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে; তুমি রাজচক্রবর্ত্তী হইলে আমাব বংশধরকে কখন রাজ্যচ্যুত করিতে পরিবে না; এই প্রতিজ্ঞা কর।" রঘুনন্দন স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে তিনি বাজা হইবেন। সুতরাং তিনি সহজে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, "আমাব দ্বারা পুঁঠীয়া রাজবংশের কোন অনিষ্ট হইবে না।" এই ঘটনাব পর হইতে বঘুনন্দনের ভাগ্য প্রসন্ন হইল। রাজদরবারে বঘুনন্দনের বুদ্ধি ক্রমে বিকাশ পাইতে লাগিল। রঘুনন্দনকে বুদ্ধিমান ও কার্য্যদক্ষ জানিয়া রাজা-দর্পনারায়ণ রায় ঢাকার নবাব দববারে তাঁহাকে মোক্তার বা উকীল (২) নিযুক্ত করিয়া পাঠান। সেই সময় এই প্রথা ছিল যে নবাব দরবারে কোন রাজা বা জমিদারের পক্ষে মোক্তার বা উকীল না থাকিলে তাহার রাজ্য রক্ষা হইত না। পুঁঠীয়া রাজার পক্ষে উকীল হওয়াই বঘুনন্দনের উন্নতির সোপান হয়।

রঘুনন্দন মুরশীদাবাদে– এসময় মুর্শিদকুলী খাঁ বাঙ্গালা, বিহার উড়িষ্যার নবাব। তাঁহার রাজধানী ঢাকায় (জাহাঙ্গীর নগরে) ছিল। ঢাকায় যাওয়ার পর হইতে মুর্শিদকুলী খাঁ রঘুনন্দনের বুদ্ধিমত্তা ও কার্য্যদক্ষতার গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিশেষ অনুগ্রহ করিতে লাগিলেন। রঘুনন্দনের পরামর্শেই কুলী খাঁ দেওয়ানী কার্য্যালয় প্রভৃতি ঢাকা হইতে মুরশীদাবাদে উঠাইয়া আনেন।

রঘুননন্দনের "নাএব কানুনগোর" এবং "রায় রায়াণ" পদ প্রাপ্তি– মুসলমান রাজ্যের আইন কানুন রঘুনন্দন অতি শীঘ্র শিক্ষা করিয়া বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন এবং নবাবের

---

(১) জীবব মৈত্রেব সমাজ অঙ্গারো।

(২) এই গ্রন্থেব অষ্টম অধ্যায় পুঁঠীয়া বাজবংশেব ইতিহাসে উকীল বাখিবাব প্রথা বিস্তৃত রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

যাবতীয় কর্ম্মচারিদের সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহাদের অনুগ্রহ লাভ করিলেন। বিশেষতঃ প্রথম কানুনগোর মত, এত উৎকৃষ্ট হইয়াছিল যে রঘুনন্দনের ন্যায় সুযোগ্য কর্ম্মচারী অতি বিরল। রঘুনন্দনের গুণে ও কর্ম্মদক্ষতায়, প্রধান কানুনগো দর্পনারায়ণ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে "নায়েব কানুনগোর" পদে নিযুক্ত করিলেন। কানুনগো সমগ্র সুবার ভূসম্পত্তির রেজেষ্ট্রাব, পরগণা ও মৌজার সীমা, রাজস্ব সম্বন্ধীয় কার্য্য, ভূমি সম্বন্ধীয় প্রথা ও নিয়ম প্রভৃতি কানুনগোর দপ্তরের রিপোর্ট অনুসারে নবাব ও দিল্লীর সম্রাট আদেশ দিতেন। বৎসর অন্তবে যাবতীয় রাজস্বের একটী হিসাব কানুনগোকে প্রস্তত, মহব এবং স্বাক্ষর কবিয়া প্রথমে নবাবেব এবং পবে দিল্লীর সম্রাট সমীপে পাঠাইতে হইত। এই কনুনগোদের দস্তখতী কাগজ ভিন্ন বাজসাহী খাল্‌সা দপ্তরে সুবার দেওযানেব নিকাশ দিয়া নিয়ম ছিল না। প্রথম কানুনগো দর্পনারায়ণ এবং দ্বিতীয় কানুনগো জয়নারায়ণকে দস্তখত জন্য অনুরোধ করা হইল কিন্তু কেহই দস্তখত করিল না। দর্পনারায়ণ ও জয়নারায়ণ নিকাশী কাগজে দস্তখত না কবায় নবাব মুশিদকুলী খাঁ বিপন্ন হইয়া বঘুনন্দনের সাহায্য প্রার্থনা কবেন। রঘুনন্দনও কানুনগোব মহব ও দস্তখত সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় ১৩০৪ শকের বৈশাখ মাসের "সাহিত্যে" যাহা লিখিয়াছেন তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। "আজিমওশ্বানের সহিত মুর্শিদকুলীখাঁর মনোমালিন্যের পর কুলী খাঁ হিসাব লইয়া স্বয়ং বাদসাহ দরবারে গেলে সকল কথা পবিস্কাব কবিয়া বলিবার অবসব পাইবেন এই চিন্তাব আজিমওশ্বানের মুখ শুকাইল। তিনি কানুনগোগণকে শাসন করিয়া দিলেন যে নিকাশী কাগজে দস্তখত না কবেন। কানুনগোদ্বয় উভয় সঙ্কটে পড়েন। এদিকে কানুনগোর সহী না পাইয়া কুলীখাঁ মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল; অবশেষে অনন্যোপায় হইযা রঘুনন্দনের স্মরণাগত হইলেন। বঘুনন্দনেব চেষ্টায় একজন কানুনগোর দস্তখতযুক্ত হিসাব ও উপঢৌকন লইয়া তিনি সম্রাটের নিকট গমন করেন। দাক্ষিণাত্য যুদ্ধে তখন অর্থেব বড়ই অনটন, কুলীখাঁও বহু অর্থ লইয়া উপস্থিত, কাজেই একজন কনুনগোর দস্তখত খবরেই আসিল না।" নির্ব্বিঘ্নে নিকাশী কাগজ বাদসাহর সরকারে দাখিল হইল। এই কার্য্যের পব হইতে বঘুনন্দনেব ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয। দেওয়ান ভূপতি রায়ের মৃত্যুব পর কানুনগো দর্পনারায়ণ দেওয়ানী কার্য্যেব ভাব গ্রহণ কবেন। কিছুদিন পর দর্পনারায়ণ পরলোক গমন করিলে, রঘুনন্দন দেওয়ান হন এবং "বায়রায়াণ" উপাধি প্রাপ্ত হন "বায়রায়াণ": উপাধি বর্ত্তমান রাজা বাহাদুরের সমান। "বাযরায়াণ" সুবার প্রধান কর্ম্মচাবী এবং দেওয়ানেব নিম্নপদ। দেওয়ান সুবার নবাবেব প্রতিনিধি স্বরূপ। দেওয়ান পদ বহু সম্মানের। নবাব রাজ্যশসনে দুর্ব্বল। শিখিল হইলে দেওয়ানই সর্ব্বময় কর্ত্তা। পক্ষান্তবে নবাব কার্য্য দক্ষ হইলে দেওয়ান নবাবেব অধীন থাকিয়া তাঁহাব আজ্ঞানুসারে নায়েব স্বরূপ বাজ্য শাসন করিতে সক্ষম। (১) এক্ষণ বঘুনন্দন নবাব কুলী খাঁব "রায়রায়ণ" এবং "দেওযান"—সর্ব্বময় কর্ত্তা। রঘুনন্দনেব নিকট কুলী খাঁ ঋণী এবং তাঁহারই যত্নে বাদসাহ দববাবে নিকাশ হইতে অব্যাহতি পান। নবাব কুলীখাঁ রাজস্ব বন্দোবস্তে প্রবৃত্ত হইলে রঘুনন্দন তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিতে লাগিলেন। "মুর্শিদকুলী খাঁর সুবিখ্যাত বাজস্ব বন্দোবস্তে দেওয়ান রঘুনন্দন তঁহার দক্ষিণ হস্ত; প্রতিভা ও কর্ম্মকুশলতায় তিনি কুলী খাঁব

---

(1) "His Excellency evinced his gratification and gratitude by appointing Reghu Nandan as Rai Rayan and Dewan The Rai Rayan is the principal officer of the Province next to the Dewan and the Dewan represented the Nawab in all matters of detail regarding the Government These posts opened to him a vista of greatness and enabled him to reap a rich harvest of rupees The Dewanship was especially a post of great importance and honour It clothed its incumbent with the powers of the Nawabs In the case of weak minded Nawabs the Dewan was the defacto Nawab, and in the case of strong minded Nawabs, he was the Naib or Sub-Viceroy and enjoyed and exercised an authority second to that of his master "- The Rajas of K... hahi, Calcutta Review

উপযুক্ত সহকারী" ছিলেন।(১)

রঘুনন্দনের রাজ্যলাভ– ঢাকা হতে মুরশীদাবাদে রাজধানী সংস্থাপনের পর মুর্শিদকূলী খাঁ বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন এবং রাজস্ব নির্দ্ধাবণ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। এই বৃহৎ কার্য্যে "রাযরায়াণ" রঘুনন্দন তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইয়া উঠিলেন। সমুদয় দেশ ১৩টী চাকলা, ৩৪ সরকার ও ১৬৬০ পরগণায় বিভক্ত হয়। এই বন্দোবস্তে বঙ্গের বার্ষিক বাজস্ব ১৪২৮৮১৮৬ টাকা নির্দ্ধারিত হয়। এই রাজস্ব আদায়ের ভার নবাব মুর্শিদকুলী খাঁব দৌহিত্রীপতি সৈয়দ রেজা খাঁর প্রতি অর্পিত হইল। রাজস্ব আদায়ের জন্য সৈয়দ রেজা খাঁ জমিদাবগণেব প্রতি বিশেষ দৌরাত্ম্য আরম্ভ করেন। তাঁহাব দৌরাত্ম্য একপ অসহ্য হইয়া উঠিল যে কোন জমিদারের প্রাণ বিয়োগ হইল, কেহ বন্দী হইল এবং কেহ নির্ব্বাসিত হইল। জমিদারগণের উত্তবাধিকারক্রমে জমিদারী দখল রাখিবার প্রথা থাকা সত্ত্বেও, রাজস্ব বাকীর জন্য তাহাদেব জমিদাবী অন্য নূতন জমিদারেব সহিত বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। (২) এইরূপে নূতন নূতন জমিদাব সৃষ্টিকরা আবশ্যক হইল। ইহাই নাটোর রাজবংশের বাজ্যলাভের মূল সূত্র। নূতন নূতন জমিদার সৃষ্টির সময়, দেওয়ান রঘুনন্দন নিজ বুদ্ধি কৌশলে নির্দ্ধারিত রাজস্ব নিরুদ্বেগে আদায় কবার ভানে আপন ভ্রাতা রামজীবনের নামে নূতন নূতন জমিদারী বন্দোবস্ত করিয়া দিতে লাগিলেন। রামজীবনও বাহুবলে প্রবল প্রতাপের সহিত রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া নবাব সরকাবেব বীতিমত দাখিল করিতে লাগিলেন বলিয়া তাঁহার প্রতি নবাব ও দিল্লীব সম্রাট সন্তুষ্ট হইলেন। ইহাই বাজ্য বিস্তারের সুযোগ হইল। নিম্নে সেই সকল জমিদারী প্রাপ্তির বিবরণ লিখিত হইল ঃ—

১। বাঙ্গালা ১১১৩ সালে পরগণা বাণগাছীর বিখ্যাত জমিদার গণেশবাম ও ভগবতীচরণ চৌধুরী, রাজস্ব প্রদান করিতে না পরায় বাজ্যচ্যুত হন। সেই পরগণা বাণগাছী দেওয়ান রঘুনন্দন কৌশল ক্রমে নিজ জ্যেষ্ঠ রামজীবনের নামে বন্দোবস্ত করিয়া দেন। নাটোর বংশের এই প্রথম রাজ্যলাভ।

২। বাঙ্গালা ১১১৭ সালে পরগণা ভাতুড়িয়ার সাঁতুল রাজা বামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর, তাঁহার উত্তবাধিকাবী তাঁহার পত্নী রাণী সর্ব্বাণী ছিলেন। রাণী সর্ব্বাণীর নামে দেওয়ান রঘুনন্দন সাঁতুল রাজ্যের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। রাণী মৃত্যুর পর দেওয়ান রঘুনন্দনের ভ্রাতা রামজীবন ভাতুড়িয়া পরগণার জমিদার হইলেন।

৩। উদিত (উদয়) নারায়ণ সমগ্র রাজসাহীর জমিদার ছিলেন। স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র বলেন যে বাঙ্গালা ১২২১ সালে দেওয়ান রঘুনন্দনের ভ্রাতা রামজীবনের নামে উদয়নারায়ণের সমগ্র জমিদারী বন্দোবস্ত হয়; (৩) কিন্তু শ্রীযুক্ত কালী প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, (৪) "বিস্তীর্ণ রাজসাহীর জমিদারী ও রঘুনন্দন রামজীবন এবং কালুকোঙ্কর— এই দুই নামে বন্দোবস্ত করিয়া লন"। (৫) বাঙ্গালা ১১২২ সালে নবাব নলদাহ পরগণা রামজীবনকে প্রদান করেন।

৪। উদয়নরায়ণের রাজসাহী জমিদারী রামজীবনের হস্তগত হইবার কিছুদিন পরে, যশোহরের জমিদার সীতারাম, ফৌজদার আবুতারবকে বধ কবার অপরাধে ধৃত হইয়া বন্দী

(১) "উৎসাহ" শ্রবণ শক ১৩০৫।

(1) The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review

(3) The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review

(৪) এই বাজসাহী বাজ্য কি প্রকাবে রামজীবনেব হস্তগত হয তাহা এই গ্রন্থেব "বাজস্ব" নামক অধ্যায়ে বিধৃত হইযাছে।

(5) The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review

হন। কিন্তু সীতারাম কারাগারে মৃত হওয়ায় তাহার জমিদারী পবগণা ভূষণা, ইব্রাহিমপুর প্রভৃতি ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে দেওয়ান রঘুনন্দনের ভ্রাতা রামজীবনের প্রতি অর্পিত হইল।

৫। স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয় বলেন যে বাঙ্গালা ১১৩১ সালে বঘুনন্দনেব মৃত্যু হয়। (১) তাঁহার মৃত্যুর পর হাবিলী, মাহমুদপুর, সাহুজাঁহান, তুঙ্গী এবং স্বরূপপুর প্রভৃতির জমিদারগণ কিশোর খাঁ, সমসের খাঁ, এনাএত খাঁ এবং পরগণা পূকরীখার জমিদার ইছফিণ্ডেব বেগ নরহত্যা অপরাধে বন্দী হন, এবং নবাব তাহাদেব জমিদারী বাজেয়াপ্ত কবিয়া বামজীবনকে অর্পণ করেন।

৬। ইহাব কিছুদিন পর জালালপুরের জমিদার এনাএত উল্লা রাজস্ব বাকি ফেলিয়া নবাব সবকারে সেই বাকি রাজস্ব পরিশোধ করার মানসে বামজীবনের নিকট তাহার জমিদাবী বিক্রয় কবে। এইরূপে একটা বিস্তৃত রাজ্য রামজীবনের অধিকৃত হইল।

নাটোর রাজবাটী নির্ম্মাণ– লস্কবপুব পরগণার অধীন তরফ কানাইখালীর অন্তর্গত নাটোরে রাজবাটী নির্ম্মাণ হয়। যে স্থানে রাজবাটী নির্ম্মিত হয় সেই স্থান ছাইভাঙ্গানামক বিল বলিয়া পরিচিত ছিল। রাজবাটীর চারিদিকে চৌকি বা পরিখায় বেষ্টিত। এইরূপ রাজবাটী "নির্ম্মাণ করিয়া প্রবল প্রতাপে রাজজীবন রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে নবাবেব অনুগ্রহে দিল্লী হইতে তিনি ২২ খান খেলাত এবং "রাজা বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

নাটোর রাজ্যের সীমা– রামজীবনের সময় বাজসাহী জমিদারী বাঙ্গালার মধ্যে আয়তনে সর্ব্বপ্রধান ছিল। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে "ইহার তদানীন্তন পরিমাণ বারহাজার বর্গ মাইলেরও অধিক"। (১) ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে লস্করপুর পরগণা, তাহিরপুর পরগণা ও বাবর্বকপুর পরগণা ব্যতীত বর্ত্তমান সমগ্র রাজসাহী, পাবনা ও বগুড়া এবং ফবিদপুর, ঢাকা, যশোহর, সাঁওতাল পরগণা, ভাগলপুর, মুরশীদাবাদ, বীবভূম, দিনাজপুর মালদহ এবং রঙ্গপুরের কিয়দংশ রামজীবনের অধিকৃত ছিল। স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয় বলেন যে "ইহা সাধারণতঃ ৫২ লক্ষের জমিদারী"। (২) শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে "সর্ব্বসমেত ১৩৯ পরগণার ইহার সদর জমা ১৬৯৬০৮৭ টাকা খালসা সেরেস্তার লিখিত হয়। কিন্তু শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় "সাহিতে" নিম্নলিখিত পরগণায় রামজীবনের রাজ্য বিভাগ করেন ঃ

১। রাজসাহী প্রদেশ	৬৮	পরগণা
২। ভাতুড়িয়া	৩০	"
৩। ভূষণা	২৯	"
৪। বাজে মহাল	১২	"
	১৩৯	"

মোট ১৩৯ পরগণার রাজস্ব ১৭৪১৯৮৭ টাকা ছিল। ইহা অনুমান করা যায় যে এই বিস্তৃত রাজ্যে প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা বার্ষিক মুনাফা ছিল। এইরূপ বিস্তৃত বৃহৎ রাজ্যের স্থাপনকর্ত্তা প্রতিভাসম্পন্ন রঘুনন্দন; তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু রামজীবন এবং তাঁহার দেওয়ান দয়ারাম রায়ের সুশাসনে ঐ রাজ্যের গৌরব, নাম ও যশঃ বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

রঘুনন্দনের সময় জমিদারী– এসময় জমিদারী তিন শ্রেণীতে বিভক্ত যথা ঃ– (১) জঙ্গলবুড়ী, (২) ইস্তীকালী, (৩) আহকামী।

---

(১) "উৎসাহ", শ্রাবণ, সন ১৩০৮।

(2) The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review

(১) **জঙ্গলবুড়ী**– পতিত অনাবাদী ভূমি। জমিদার পরিশ্রম দ্বারা জমি হাসিল করিয়া নিষ্কর বা সামান্য করে বন্দোবস্ত করিয়া লয়।

(২) **ইস্তীকালী**– ফশলী উত্তম জমি। কিন্তু জমিদার রাজস্ব বাকি ফেলে বা অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু বা উত্তরাধিকারী বিহীন বা রাজ বিদ্রোহী হইলে অন্য জমিদার সম্রাট নিকট ঐ ভূসম্পত্তি সনদ করিয়া লয়।

(৩) **আহকামী**– জমিদারেব বিনা দোষে এবং নবাবের কর্ম্মচারীদের চাতুরী ও কৌশলে নবাবের বা সম্রাটেব আদেশে যে জমিদাবী হইতে জমিদাব বাজ্যচ্যুত হয় তাহা নবাবেব কর্ম্মচারী নিজ নামে বা আত্মীয়েব নামে বন্দোবস্ত করিযা লয়।

বঘুনন্দন যে সকল জমিদারী তাঁহার ভ্রাতা রামজীবনের নামে বন্দোবস্ত করিয়া লয তাহা দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীভূক্ত জমিদারী।

রামজীবনেব সামাজিক পদ গৌরব– সামান্য অবস্থা হইতে রাজ-উপাধি প্রাপ্ত হইযা এবং বৃহৎ বাজ্যেব অধিপতি হইয়াও রামজীবন সামাজিক পদ গৌরবকে উপেক্ষা করিতে পাবেন নাই। বৈষযিক পদ গৌরব অপেক্ষা সামাজিক পদ গৌরবও কম নহে। সুতবাং বামজীবন সামাজিক পদ গৌবব বৃদ্ধির জন্য বিশেষ যত্নবান হইলেন।

কুল্লুক ভট্টেব সময় কাশ্যপ গোত্রীয় ভাদুড়ী বংশে তর্ক শাস্ত্রে বিশারদ বৃহস্পতি আচার্য্যের ঔরসে উদয়নাচার্য্য নামক এক ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ কবেন। তিনি বরেন্দ্র ভূমিতে একটী নূতন সমাজ সংস্কার আবম্ভ কবিয়াছিলেন। তাঁহার দুই স্ত্রী। তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে ছয় পুত্র এবং মধু মৈত্রের দুই পুত্রের সহিত তিনি মিলিত হইয়া এক নূতন দল গঠিত করিলেন। কিন্তু বিচারে ও প্রতিদ্বন্দ্বীতায় পবাস্ত হইয়া এই নূতন দল "কাপ" (১) নামে প্রসিদ্ধ হইল। কাপেব সঙ্গে কন্যা আদান প্রদানে কুলীনেব কূলচ্যুত হইতে লাগিল। এমন কি কাপেব সঙ্গে আহবে, শয়নে ও উপবেশনেও কুলীনের কুল নষ্ট হইতে লাগিল। সুতবাং কাপে সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সমাজেব এই অবস্থা দেখিয়া তাহিরপুরের বিখ্যাত মৈত্রীয় রাজা কংসনারায়ণ মধ্যস্থ হইলেন এবং কতকগুলি নূতন নিয়ম প্রচলিত করিয়া দিলেন। এই নূতন নিয়মে শ্রোত্রীয় ববে কন্যা দান কবিলে কাপ শ্রোত্রীয হইবে এবং শ্রোত্রীয় হওয়ার পর কুলীন বরে কন্যাদান কবিলে সেই ব্যক্তি সিদ্ধশ্রোত্রীয হইবে। ইহাও নিয়ম লইল যে কুশ বাবি সংযুক্ত না হইলে কাপেব স্পর্শে কুলীনের কুলপাত হইবে না। এনিযমে কুলীন ও কাপ উভয়েরই সুবিধা হইল। ইহা পূর্ব্বে উল্লেখ কবা গিযাছে যে নাটোব বংশের আদি পুরুষ কামদেব জীবন মৈত্রের বংশধব এবং সেই জীবন মৈত্র কুলচ্যুত হইযা কাপ দলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্ত রাজা কংসনাবায়ণেব সাময়িক প্রচলিত নিয়মানুসারে জীবন মৈত্রের বংশধব কাপ হইয়াও পবে শ্রোত্রীয় ববে কন্যা দানে শ্রোত্রীয় হন। এইক্ষণ রামজীবন ও রঘুনন্দন সিদ্ধ শ্রোত্রীয় হইবার জন্য চেষ্টা কবিতে লাগিলেন। বাজা কংসনারায়ণ কুলীনের আশ্রয়দাতা ছিলেন। সুতরাং বারেন্দ্র সমাজে পদগৌববে তাঁহাব সমান কেহই ছিল না। তাঁহার বংশধবগণেরও সেই পদগৌরব ছিল। বামজীবন ও বঘুনন্দনের সময় বাজা কংসনারায়ণেব প্রপৌত্র রাজা লক্ষ্মীনাবায়ণ তাহিরপুরে রাজত্ব করিতেন। সেই লক্ষ্মীনারায়ণেব কন্যার সহিত বামজীবনের পুত্র কালিকাপ্রসাদ বা "কালুকোঙরেব" বিবাহ জন্য রঘুনন্দন ও রামজীবন প্রস্তাব করিলেন। ভবিষ্যতে "কালুকোঙর" রাজসাহীর মহাবাজা হইবেন, তখন কন্যাদানে লক্ষ্মীনারায়ণ সম্মতি প্রদান করিলেন। অতি সমরোহে এই বিবাহ সম্পন্ন হইল। এই বিবাহে নাটোর বংশের সামাজিক পদগৌরব বৃদ্ধি হইল।

(১) এই গ্রন্থে "কাপেব" উৎপত্তি বিষয়ে বিস্তাবিতরূপে পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

রামজীবন ও দয়ারাম নাটোরে, রঘুনন্দন মুরশীদাবাদে– রামজীবন নাটোরের রাজ-বাটীতে বাস করিতেন এবং রাজ-কার্য্য সম্পন্ন জন্য দিঘাপতিয়া রাজ-বংশেব আদি পুরুষ অসাধারণ বুদ্ধিমান দয়ারাম রায় তাঁহাব দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। স্বর্গীয় কিশোবীচাঁদ মিত্র মহাশয় বলেন যে "রঘুনন্দন নাটোর রাজ্য সৃষ্টি করেন এবং দযাবাম রাজা দৃঢ়ীভূত করেন। রঘুনন্দন নাটোর রাজ্যের ক্লাইব এবং দয়রাম হেস্টীংশ ছিলেন।" (১) আমরা বলি রামজীবন ধনরক্ষক বা কুবেব। যদিচ রঘুনন্দন মুবশীদাবাদে থাকিয়া মুশিদকুলী খাব প্রসাদাৎ নাটোর রাজ্যেব ভিত্তি স্থাপন করেন, তথাপি বামজীবন ও দয়াবামের বুদ্ধি কৌশলেব সাহায্যে তাহা রক্ষা করিয়া উন্নতি সাধন করেন। নাটোর রাজ্যের মূল বঘুনন্দন তাহাব আব ভুল নাই। বামজীবনেব বাস-স্থান নাটোর এবং বঘুনন্দনের বাসস্থান গঙ্গাতীরে বড়নগব বা বীরনগব ছিল।

রামজীবন ও রঘুনন্দন– রামজীবন ও রঘুনন্দন দুই ভ্রাতা। বামজীবন বড় ও রঘুনন্দন মধ্যম। বামজীবন ও রঘুনন্দনেব ভ্রাতৃপ্রেম অকৃত্রিম। রঘুনন্দনেব জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতাব প্রতি ভক্তি আদর্শনীয়। রামজীবনেব বঘুনন্দনের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রেম প্রশংসনীয়। রঘুনন্দন আইনজ্ঞ এবং বাজস্বসচিব ছিলেন। রামজীবন জমিদারী-কার্য্যে দক্ষ ছিলেন। রঘুনন্দনেব বুদ্ধিকৌশল ও প্রতিভা অসাধারণ এবং রামজীবনের সাহস ও কার্য্যকুশলতা অসীম। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন যে "রামজীবনের বীরত্ব, সাহস, ধর্ম্মশীলতা, এবং রঘুনন্দনের বুদ্ধি, কৌশল, প্রতিভা এবং ভ্রাতৃপ্রেম একত্রিত হওযাই নাটোর রাজবংশের বিস্তীর্ণ রাজ্যলাভেব মুল কাবণ।" দয়ারামের পরামর্শে বামজীবন বিস্তীর্ণ রাজ্যেব তিনটী প্রধান রাজধানী, (১) নাটোর, (২) বড়নগর, (৩) সেরপুব স্থাপন করিয়া জমিদারী কার্য্য-কুশলতার পবিচয় দিয়াছেন। রামজীবনেব সংস্কৃত শিক্ষায় বিশেষ উৎসাহ ছিল। (২)

রামজীবন, রঘুনন্দন ও বিষ্ণুরাম– ইহাঁরা তিন ভ্রাতা এবং তিন জনই একান্নভুক্ত। বাঙ্গালা ১১৩১ সালে (১৭২৫ খৃষ্টাব্দে) রঘুনন্দনেব মৃত্যু হয়। সেই সময় বামজীবনের একমাত্র পুত্র কালিকাপ্রসাদ (কালুকোঙর) পরলোক গমন করেন। ইহার কিছুদিন পরে রঘুনন্দনের একমাত্র শিশু পুত্রেরও মৃত্যু হয়। রঘুনন্দনেব উত্তরাধিকারী রহিল না এবং বামজীবনের একমাত্র পুত্র কালিকাপ্রসাদেরও মৃত্যু হইল। কেবল বিষ্ণুবামের দেবী প্রসাদ নামে এক পুত্র রহিল। কেহ দত্তক পুত্র রাখিবার জন্য বামজীবনকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন এবং কেহ বিষ্ণুবামেব পুত্র দেবী প্রসাদকেই রাজ্যদান করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। অবশেষে দত্তক পুত্র রাখাই স্থিব হইল। রসিকরায়ের কনিষ্ঠ পুত্রকে রামজীবন দত্তক পুত্র বাখিলেন। এই দত্তক পুত্র নাটোর বাজবংশের দ্বিতীয় রাজা বামকান্ত নামে প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমান বাজসাহী জেলাব অন্তর্গত পরগণা চৌগ্রাম ও বর্ত্তমান রঙ্গপুব জেলাব অন্তর্গত পরগণা ইসলমাবাদ পুরস্কার স্বরূপ রামজীবন রসিককে দিলেন। রসিকের পুত্র কৃষ্ণকান্ত চৌগ্রামে রাজবাটী নির্ম্মাণ করেন। ইহারই প্রপৌত্র রাজা রমণীকান্ত রায় বিএ, শাস্ত্র, ধীর, মিতব্যাযী ও পণ্ডিত বলিয়া পবিচিত। এই দত্তক পুত্র বাখার পর হইতে দেবী প্রসাদ রাজা প্রার্থনা করেন। দত্তক পুত্রকে রাজ্যের ।√০ আনা অংশ এবং ভ্রাতুষ্পুত্র দেবীপ্রসাদকে ।√০ আনা অংশ দিতে রামজীবন স্বীকার করেন। কিন্তু দেবী প্রসাদ তাহাতে সম্মত না হওয়ার সমগ্র রাজ্য দত্তকপুত্র রামকান্তের প্রতি অর্পিত হইল।

(1) Rajas of Rajshahi, Calcutta Review

(২) রামজীবনেব সভাসদ প্রসিদ্ধ নৈবাযিক শ্রীকৃষ্ণ শর্ম্মা ১৬৪৫ শকে (১১৩০ বাঙ্গালা) "পদাঙ্কদূত" প্রস্তত কবেন। এই গ্রন্থ প্রণয়নে বামজীবন বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ কবেন। শ্রীকৃষ্ণ শর্ম্মাব জন্মস্থান সম্ভবতঃ বাজসাহী প্রদেশ। "পদাঙ্কদূতেব" পদাবলীব ভাব স্থানে স্থানে শ্রীকৃষ্ণ বিবহে প্রপীড়িত হইযা নিজ মনোভাব প্রণীত গ্রন্থে প্রকাশ কবিযাছেন।

স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয় বলেন ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে রাজা রামজীবন পরলোক গমন করেন; কিন্তু শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় রাজা রামজীবনের মৃত্যুর তারিখ ১৭৩০ খৃষ্টাব্দ নির্দ্দেশ করেন। সে সময় রামকান্ত অপ্রাপ্ত বয়স্ক। রাজা বামজীবনের মৃত্যু সময়, তাঁহার রাজ্যেব ভাব তাঁহার প্রিয়বন্ধু ও উপদেষ্টা দয়ারামের হস্তে সমর্পিত হইল। রামকান্তের অপ্রাপ্ত বয়ক্রমকালে অর্থাৎ ১৭৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৩৪ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত দয়ারাম এরূপ সুকৌশলে রাজ্যরক্ষা করেন যে দেবী প্রাসাদ নানাপ্রকার বাধা বিঘ্ন দিয়াও কোন ফল পাইল না। রামকান্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বৃদ্ধ মন্ত্রী দয়ারাম রাজকার্য্য হইতে অবসব গ্রহণ করিয়া দিঘাপতিয়ায় রাজবাটী নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন বটে; কিন্তু তিনি রামকান্তেব মন্ত্রীপদে নিযুক্ত বহিলেন।

দয়ারাম রায়– নাটোর রাজ্যের সহিত দয়ারামের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে তাহাকে নাটোব রাজবংশের ইতিহাস হইতে পৃথক করা নিতান্ত কঠিন। নাটোর রাজবংশের ইতিহাস লিখিতে গেলে দয়ারামের প্রতিভা ও বুদ্ধি কৌশলের বিষয় না বলিয়া ক্ষান্ত হওয়া যায় না। নাটোর বাজবংশের ইতিহাসে যেখানে উল্লেখ না করিলে নয় সেই স্থানেই কেবল তাঁহার নাম উল্লেখ করা যাইবে। কিন্তু দিঘাপতিয়া বাজবংশেব ইতিবৃত্ত লিখিবাব সময় দয়ারামেব ইতিহাস বিস্তৃতরূপে লিখিত হইবে।

রাজা রামকান্তের রাজ্যভার গ্রহণ– ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে হইতে বামকান্ত স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করিতে আরম্ভ করিলেন। স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয় বলেন যে "পিতাব রাজ্য অধিকার সময় বামকান্তের বয়ঃক্রম ১৮ বৎসর ছিল। তিনি একটী ধার্ম্মিক মনুষ্য ছিলেন। দেবতাদের পূজা ও ধর্ম্ম কার্য্যে তিনি দিনপাত করিতেন। কিন্তু সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে তিনি জানিতেন না।" (১)

রামকান্তের সময় রাজ্যলাভ– রাজা রামজীবনের মৃত্যুর পর দেবীপ্রসাদ, রাজ্য প্রাপ্তি জন্য নবাব দরবারে বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। সে সময় সুজা খাঁ মুরশীদাবাদের নবাব। স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয় বলেন ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে নবাব জমিদারী স্বরূপপুর এবং পাতিলাদহ রামকান্তকে অর্পণ করেন। (২) ইহাও দয়ারামের কৌশল। এখন দেবীপ্রসাদ বুঝিতে পারিলেন যে দয়ারামের কৌশলে নবাব সুজাখাঁর নিকট কোন ফল হইবে না। সেই সময় পাতিলাদহ পরগণার ৭০০০৲ টাকার বেশী আদায় হইত না, কিন্তু ঐ জমিদারী মহামান্য প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহোদয়ের হস্তে আসিলে, উহার আদায় বার্ষিক তিন লক্ষ টাকারও বেশী হয়।

রামকান্তের সময় রাজ্যবিভাগ– নিম্নলিখিত গবগণায় নাটোর রাজ্য বিভক্ত হয় ঃ—

রাজসাহী প্রদেশ	৭৮ পবগণা
ভাতুড়িয়া	২৩ "
ভূষণা	২: "
বাজেমহাল	৪২ "
	১৬৪ পবগণা

এই ১৬৪ পরগণা মোট বার্ষিক রাজস্ব ১৮৫৩৩২৫ টাকা ছিল। রাজা রামজীবনের সময় অপেক্ষা ২৫ পরগণা এবং ১১১৩৮ টাকা। রাজস্ব বেশী। তথাচ রামকান্তের বিষয় বুদ্ধি ছিল না বলিয়া তিনি পরিচিত হইয়াছিলেন।

(1) When Ram Kanta succeeded to the Raj, he was 18 years old He was a pious man and devoted his time to the performance of the Puja and religious duties, but he had no capacity for business."- The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review

(2) The Rajas of Rajshahi, Calcutta, Review

রামকান্তের বিবাহ– বর্ত্তমান বগুড়া জেলার অন্তর্গত ছাতানী গ্রাম নিবাসী আত্মারাম চৌধুরীর ঔরসে জয়দুর্গার গর্ভে এক পরমাসুন্দরী ও সুলক্ষণ সম্পন্না কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। সেই কন্যার নাম ভবানী। তাঁহার সহিত রাজা রামকান্তের বিবাহ হয়। বিবাহেব সময় ছাতানী গ্রামে রাজা রামজীবন উপস্থিত ছিলেন। স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয় বলেন যখন বালিকার বয়স ১৫ বৎসর তখন পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হয। (১)

রাজা রামকান্ত ও রাণী ভবানী– রামকান্তের বিষয় বুদ্ধি ছিল না। তিনি লোক চিনিতে পারিতেন না। কে শক্র আব কে শক্র নয় তাঁহার তাহা জানিবার ক্ষমতা ছিল না। বাণী ভবানী অসাধারণ বুদ্ধিমতি ছিলেন। তাঁহার বিষয় বুদ্ধি যেমন তেমনই ধর্ম্মভাবও অদ্ভুত। এরূপ গুণসম্পন্না স্ত্রীর নিয়ত সহবাসে তাঁহাব গুণ জানিতে না পাবায় রামকান্ত সামান্য বুদ্ধি বহিত বলিয়া পরিচিত। তাঁহাব স্ত্রীর গুণেও বুদ্ধির পরিচয় পাইলে তাঁহার বাজ্যের বিশৃঙ্খলা কখনই হইত না। যে রমণী ভারতে দেবী বলিয়া পূজার্হ হইয়া থাকেন, তাঁহার পবামর্শে রামকান্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিলে তাঁহাকে কিছু কালের জন্য বাজ্যচ্যুত হইয়া কষ্ট পাইতে হইত না এবং বৃদ্ধ মন্ত্রী দয়ারামেব সহিতও বিবাদ ঘটিত না।

দয়ারামের সহিত রামকান্তের বিবাদ– সুজাখাঁর পর সরফবাজ মুবশীদাবাদে নবাব হইলেন। সরফরাজ নবাব হইয়া জগৎশেঠের পুত্রবধুকে অপমান করিলেন। জগৎশেঠ জমিদারদেব আশ্রয়স্থল। জগৎশেঠ জমিদারগণকে উত্তেজিত করিলেন। সমুদয় জমিদাব নবাব সরফরাজ খাঁর বিপক্ষ হইল। গিরিয়ার প্রান্তরে সরফরাজখাঁকে সম্মুখ যুদ্ধে নিহত করিয়া ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে আলিবর্দ্দী খাঁ বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব হইলেন। এই সময় রাজা রামকান্ত নবাব সরকারে অনেক রাজস্ব বাকি ফেলিলেন। বৃদ্ধ মন্ত্রী দয়রাম রামকান্তকে বলিলেন রাজকার্য্য নিতান্ত অসতর্কতা ভাবে নির্ব্বাহ হইতেছে এবং দেখাইয়া দিলেন যে সর্ব্বাগ্রে নবাব সবকারে ঠিক সময় ও কিস্তিমত রাজস্ব দাখিল করা নিতান্ত আবশ্যক। ইহার অন্যথায় রাজ্য ভ্রষ্ট হইতে হয়। রামকান্ত দয়ারামের নিঃস্বার্থহিত বাক্যের মর্য্যাদা রক্ষা করা দূরে থাকুক, ববং তাঁহার বাক্যে নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। প্রথমতঃ তিনি তাঁহাব উপদেশ গ্রহণ করিলেন না, এবং দ্বিতীয়তঃ যে দয়ারামকে “দাদা” বলিয়া সম্বোধন করিতেন, তাহাকে অপমান ও তাচ্ছিল্য করিলেন। দয়ারাম রাজা রামজীবনের পরম বন্ধু ও বিশ্বাসী মন্ত্রী ছিলেন। চাটুকারদের দ্বাবা পরিবেষ্টিত হইয়া বামকান্ত পিতাব বিশ্বাসী সুযোগ্য বৃদ্ধ মন্ত্রীকে শক্ররূপে পবিগৃহীত করিলেন। অবশেষে ‘দয়ারামকে মন্ত্রীর পদ হইতে চ্যুত করিলেন। পতির এরূপ কার্য্য গর্হিত এবং রাজ্যের অনিষ্টকর জানিয়াও, রাণীভবানী পতির কার্য্যের প্রতিবাদ করা অধর্ম্ম জ্ঞানে বিবত ছিলেন। এইরূপ অসম্ভবনীয় অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া এবং যুবরাজকে শিক্ষা দিবার জন্য, দয়ারাম মুরশীদাবাদে নবাব আলবর্দ্দীখাঁর সমীপে উপস্থিত হইযা বামকান্তর রাজকার্য্যেব শিথিলতা ও রাজস্ব বাকির বিষয়ে বিস্তারিত তাঁহাকে জ্ঞাত করাইলেন। দয়ারামের প্রতি নবাবেব বিশেষ বিশ্বাস ছিল। সুতরাং দয়ারামের কথা বিশ্বাস করিয়া নবাব রামকান্তকে রাজ্যচ্যুত করিলেন এবং বিষ্ণুরামের পুত্র দেবী প্রসাদকে রাজ্য অর্পণ করিলেন। এই সময় দেবীপ্রসাদ ও সুজাখাঁর নিকট কোন ফল না পাইয়া সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিলেন। রামকান্ত দয়ারামের সহিত বিবাদ করাতে দেবীপ্রসাদের সুবিধা হইল। দেবী প্রসাদ রাজ্য অধিকাব করিলে, বামকান্ত রাণীভবানীসহ নাটোর রাজবাটী ত্যাগ করিয়া মুরশীদাবাদে জগৎশেঠের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

রামকান্তের পুনরায় রাজ্য প্রাপ্তি– রামকান্ত ও রাণীভবানী শেঠভবনে সমাগত হইলে,

---
(1) The Rajas of Rajshahi, Calcutta Rewiew

জগৎশেঠ প্রাণপণে তাঁহাদের রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তি জন্য বিশেষ যত্নবান হইলেন। এদিকে রামকান্ত ও বাণীভবাণীর অর্থেব অভাবে বড়ই কষ্ট উপস্থিত হইল। এইরূপে কষ্টে দিন যাপন করিতেছেন। এক দিন দালানের ছাদের উপর রামকান্ত ইতস্ততঃ বেড়াইতেছেন এবং চিন্তা কবিতেছেন, এমন সময়ে পাল্‌কীতে চড়িয়া দযাবাম নবাব বাড়ী হইতে নিজ বাস স্থানে যাইতেছেন। দয়ারামকে দেখিযা বামকান্ত অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "দয়ারাম দাদা আর কতদিন কষ্ট ভোগ কবিব।" এই কথায় দযাবামের দয়াব উদ্রেক হইল; বিশেষতঃ রাণীভবানীর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা থাকায় সেই দিন হইতে দয়ারাম বায় বাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য যত্নবান হইলেন। পুনবায় বাজ্য বামকান্তকে দিবার জন্য নবাব সবকাবে দয়াবাম কৌশল জাল বিস্তাব কবিলেন; তাহাব কৌশলেই রামকান্তেব পুনবায় রাজ্য লাভ হইল। আবাব জগৎশেঠও আলিবর্দ্দীকে প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত করাইতে ত্রুটি করিলেন না। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ সমস্ত জ্ঞাত হইয় পুনরায় বামকান্তকে রাজসাহী রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত কবিয়া দিলেন। দয়াবামও পুনবায় মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হইলেন।

বর্গীর হাঙ্গামা– মহারাষ্ট্রীযদের বাঙ্গলা আক্রমণকে "বর্গীর হাঙ্গামা" বলে। রামকান্ত ও বাণী ভবানী যখন বাজসাহী রাজ্যেব পুনবায অধিকাব লাভ করিলেন, সেই সময় হইতে মহাবাষ্ট্রীযদেব আক্রমণের সূত্রপাত হইল। বাঙ্গলা দেশ এরূপ ধন ধান্যে পরিপূর্ণ যে "সোনার বাঙ্গালা" বলিয়া পরিচিত। সুতরাং শিবাজীব অনুচবেবা পঙ্গপালেব ন্যায় বাঙ্গালার দিকে ধাবিত হইল। এই সময় মহাষ্ট্রীয়দেব অত্যাচাব হইতে প্রজাগণকে রক্ষা কবিবাব জন্য দয়াবাম সৈন্য সামন্তের সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য যত্নবান হইলেন।

রাজা রামকান্তের সন্তান-সন্তুতি– বাণী ভবানীর গর্ভে বামকান্তব দুইটী পুত্র এবং একটী কন্যা জন্মে। পুত্রদ্বয় অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয। কেবল রাজ-কুমারী তাবাকে বাখিয়া এবং দত্তক পুত্রেব অনুমতি দিয়া বাঙ্গালা ১১৫৩ সালে (১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে) বামকান্ত পবলোক গমন কবেন। বাণী ভবানী রাজসাহী রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বরী হইলেন।

মহারাণী ভবানীর রাজসাহী রাজ্যে অধিকার– বাজা বামকান্তেব মৃত্যুব পব, বাণী ভবানী রাজসাহী রাজ্যের ভাব গ্রহণ করিলেন। বাজসাহীব অন্তর্গত খাজুরা গ্রাম নিবাসী রঘুনাথ লাহিড়ীব সহিত কন্যা তাবার বিবাহ হয়। বাণী ভবানী জামাতাব হস্তে রাজ্য ভার সমর্পণ করিবেন বলিয়া নবাব দববাবে রঘুনাথেব নাম জারি করাইয়াছিলেন। রাজ্যের ভাবও জামাতার প্রতি অর্পিত হইয়াছিল; কিন্তু বাঙ্গালা ১১৫৮ সালে জামাতাব মৃত্যু হওয়ায়, রাণী ভবানী স্বয়ং বাজ্যভাব পুনরায় গ্রহণ কবিতে বাধ্য হইলেন।

রাণী ভবানীর রাজ্যচ্যুত– ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে নন্দকুমাবের চক্রান্তে বাণী ভবানী বাজ্যচ্যুত হন এবং নবাব নাটোর রাজ্যেব ভাব দেবীপ্রসাদের পুত্র গৌবীপ্রসাদেব প্রতি অর্পণ করেন। কয়েক মাস মত্র গৌরীপ্রসাদ নাটোব রাজ্যের অধিকাবী ছিলেন। তদপর পুনরায় বাজ্য মহারাণী ভবানীব প্রতি অর্পিত হইল।

রাণী ভবানীর গুণ– রাণী ভবানী একটী অসাধাবণ বুদ্ধিমতী হিন্দু রমণী। ইহার জমিদারী কার্য্যকুশলতা এবং বিবেচনাশক্তি এত প্রশংসনীয় ছিল যে, হলওয়েল সাহেব বলেন "এই হিন্দু বমণীর যশঃ প্রভা বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল।" তিনি যাহা বলিবেন তাহা করিবেন এবং তাঁহাব মস্তিস্ক এত পরিষ্কাব ছিল যে সমুদয় ভারতবাসীরা তাঁহার যশঃ গান করিতেন এবং ইংরাজদের মধ্যেও তিনি "পূজনীয়া দেবী বলিয়া" কীর্ত্তিত হইয়াছেন। রাণী ভবানী বহুদিন স্বর্গলাভ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার নাম লুপ্ত হয নাই। এখনও ভাবতের শত শত নরনারী

প্রাতঃকলে ভক্তিভরে রাণী ভবানীর পুণ্য-শ্লোক নাম স্মরণ করিয়া দিন সফল হইল বলিয়া আনন্দঅনুভব করে। মহারাণী ভবানীর নানাবিধ গুণ (১) সম্বন্ধে স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয় ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়াছেন। রাণী ভবানীর জমিদারী কার্য্য-কুশলতা যেমন প্রশংসনীয় তেমনই তাঁহার দানশীলতা, পূণ্যকীর্ত্তি ও যশঃও ভারত-বিস্তৃত।

মহারাণী ভবানীর সময় "বর্গীর হাঙ্গামা"– "বীবভূম ও বিষ্ণু পুবেব শালবন অতিক্রম কবিয়া, উড়িষ্যার গিরিনদী পার হইয়া, নানা পথে সহস্র সহস্র মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহী পঙ্গপালেব মত বাঙ্গালা দেশের বুকেব উপর ছুটিয়া আসিতে লাগিল। বাদসাহ আবঙ্গজীব এক দিন যাহাদিগকে "পার্ব্বত্য মূষিক' বলিয়া উপহাস করিতেন, তোষামোদ পরায়ণ পাবিষদগণ যাহাদিগকে পিপীলিকাবৎ নাসাগ্রে টিপিয়া মারিবেন বলিয়া আস্ফালন কবিতেন, সেই মাহরাষ্ট্রীয়গণ কঙ্কন প্রদেশের গিরিগহ্ববে অধিক দিন লুকাইয়া রহিল না; মোগলেব অধঃপতন কাল নিকট বুঝিয়া বাহুবলে হিন্দু বাজত্ব সংস্থাপন কবিবার আশায, তাহারা দলে দলে অসি হস্তে দেশ বিদেশ ছুটিয়া বাহিব হইল। দিল্লীর বাদশাহ তাহাদের হাতে ক্রীড়া কন্দুক হইযা উঠিলেন। তাহারা ভাবতবর্ষের বিবিধ প্রদেশে রাজকবের চতুর্থাংশ "চৌথ" আদায 'ফরমান' পাইয়া বাহুবলে ন্যয্যগণ্ডা বুঝিয়া লইবার জন্য বাঙ্গালা দেশেও পদার্পণ কবেন,— বাঙ্গালার ইতিহাসে ইহাব নাম 'বর্গীর হাঙ্গামা'।'(২)

যে সময় আলীবর্দ্দী খাঁ বাঙ্গালা, বিহাব উড়িষার নবাব, সেই সময় মহারাষ্ট্রীয়গণ অশ্বারোহী হইয়া দলে দলে লুট করিতে করিতে একবারে কাটোয়া পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িল। কাটোযায় একটা অতি সামান্য দুর্গ ছিল। সেই দুর্গ মহারাষ্ট্রীয়গণ অনায়াসে জয় করিয়া মুবশীদাবাদের অভিমুখে অশ্বচালনা করিলেন। কাটোয়া মুরশীদাবাদ প্রবেশেব দ্বাবস্বরূপ; সেই দ্বাব মহারাষ্ট্রীয়গণ অতিক্রম কবিলে, নবাব অলীবর্দ্দী খাঁ নিজ রাজধানী মুরশীদাবাদ রক্ষা জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। যে মহারাষ্ট্রীয়গণের শক্তি ও গতি রোধ কবিতে আলীবর্দ্দী খাঁকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল, তাহাদের সেই অত্যাচাব হইতে সেই হিন্দু বমণী রাণীভবানী প্রজাগণকে অধিকাংশ সময়ে বক্ষা কবিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীয় লুণ্ঠনে রাজসাহী রাজ্যের একাংশ নষ্টও হইয়া যায, কিন্তু রাণীভবানীর শাসন কৌশলে পদ্মানদীর উত্তব তীরস্থ রাজসাহী প্রদেশ অনেক অংশে বক্ষা পাইয়াছিল। এই হিন্দু বমণীব বীরত্ব। ইহাই তাঁহাব সুশাসনেব পবিচয। নবাব আলীবর্দ্দীখাঁ মহাবাষ্ট্রীয়গণেব ভয়ে মহারাণী ভবানীর রাজসাহী রাজ্যে পদ্মানদীর উত্তব তীরে গোদাগাড়ী গ্রামে নিজ বাস ভবন নির্ম্মাণ করেন। হিন্দু বমণী পক্ষে ইহা কম গৌববের কথা নহে। স্বর্গীয কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয় বলেন "বিগত শতাব্দীর শেষার্দ্ধভাগে তাঁহাব (বাণী ভবানীব) রাজশাসন চিরস্মবণীয় ছিল।" (৩) "বর্গীব হাঙ্গামা" বঙ্গদেশের নবনাবীদের এত ভয়াবহ ছিল যে, এখন শিশু সন্তানকে নিদ্রা কবান সময় বর্গীর ভয দেখান হয়।

মহারাণী ভবানীর রাজ্যশাসন ও রাজকর– রাজসাহী প্রদেশে রাজকুমারীকে "ঠাকুব ঝি" নামে সম্বোধিত হইয়া থাকে। এই প্রথা অনুসারে মহারাণী ভবানীর কন্যা তারাদেবী "ঠাকুর ঝি"

(1) The Maharani Bhabani was endowed with a large capacity for business. She thoroughly understood Zamindari affairs and the tact and judgment with which she managed the Raj were most admirable "

" "She was gifted with genius with the talent of governing and managing men and her regime was the culmainating period of the influence and wealth of the Nator familly "
-The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review

(২) শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয প্রণীত সিবাজদ্দৌলা। ২৬ পৃষ্ঠা।

(3) "-Her administration of the Raj during the last half of the last century was memorable"- The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review

বলিয়া সম্বোধিত হইতেন। সেই তারা ঠাকুর ঝি এবং বৃদ্ধ মন্ত্রী দয়ারামের সাহায্যে রাণী ভবানী রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তারা ঠাকুরাণী বিবিধ বিদ্যা অনুশীলন করেন এবং নিরন্তর মাতৃ সন্নিধানে থাকিয়া মাতাব অনেক গুণ অনুকরণ করেন। তাঁহার কার্য্য-কুশলতা-বুদ্ধিও কম ছিল না। দয়াবামও অসাধারণ বুদ্ধিমান মন্ত্রী। এই দুই ব্যক্তির পবামর্শে রাজকার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইবে তাহার আর সন্দেহ কি। রাণী ভবানীর রাজ্য সম্বন্ধে হলওয়েল সাহেব যাহা বলিয়াছেন তাহাতে প্রচুর প্রমাণ যে দয়ারারেম বুদ্ধি কৌশলে এবং রাণী ভবানীব অসাধারণ গুণে রাজ্যেব উন্নত অবস্থা ছিল। (১) আবার ১৩০৪ সনের কার্ত্তিক মাসের "সাহিত্যে" শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় বলিয়াছেন— "স্বাধীন ভাবে শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করিবার অধিকাব প্রাপ্ত হইলে, বাঙ্গালী কত সহজে, কত অল্প ব্যয়ে, কিরূপ কৌশলে রাজ্যশাসন করিয়া প্রজা-পুঞ্জেব সুখ সৌভাগ্য বর্দ্ধন করিতে সক্ষম, রাণী ভবানীর জীবন কাহিনীই তাহার উজ্জ্বল নিদর্শন।" বাণী ভবানীর সময় তিন শ্রেণীর বাজকব প্রচলিত ছিল ঃ— ১। দখলী ভূমির জন্য প্রকৃত জমা, ২। অপরাধ জন্য আর্থিক দণ্ড, ৩। আব ওয়াব (২)। সে সময় দখলী ভূমির জমা যৎসমান্য ছিল, কিন্তু আবওয়াবের সংখ্যা ও পরিমাণ বেশী ছিল। সুতবাং আবওয়াবই অধিক পরিমাণে আদায় হইত, কিন্তু অপরাধ জন্য প্রজার অর্থিক দণ্ড অতি সামান্য ছিল। কেবল প্রজাব শাসন জন্য এবং এক প্রজার প্রতি অপব প্রজা অন্যায় অত্যাচাব করিতে না পারে ওই জন্য, অপবাধী প্রজার সামান্য অর্থিক দণ্ড করা হইত। যাহারা কৃষিজীবী তাহাবা যৎসামান্য রাজকব দিত কিন্তু যাহাবা ব্যবসায়ী তাহারাই অধিক পরিমাণে রাজকর দিত। সেকালে বাস্তু ভূমির রাজকর বড়ই যৎসামান্য ছিল; এবং উত্তর দ্বাবী গৃহের জন্য কাহারই রাজকর দিতে হইত না। কোন্ বিষযের আবওয়াব ধার্য্য হইত তাহা নিম্নে লেখা গেল ঃ—

(১) বাণিজ্যের লভ্যাংশেব উপর।

(২) অন্ন প্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, বিবাহ, পিতৃ-মাতৃ শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সামাজিক ও পাবিবাবিক মাঙ্গলিক কার্য্যের উপর।

এই প্রকারেই বাণীভবানীর প্রচুব অর্থ আদায় হইত। এই অর্থদ্বারা রাণীভবানী দেবসেবা, পুষ্করিণী খনন, দান প্রভৃতি পূণ্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার রাজ্যে প্রজাগণ এরূপ সুখে কালযাপন করিত যে তাঁহার রাজ্য "রামরাজ্য" বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল।

রাজকার্য্য নির্ব্বাহ সময় রাণীভবানী ও তাঁহার কন্যা তাবা ঠাকুরঝি, একত্রিত হইয়া

---

(1) "At Nattore about ten day's travels North-East of Calcutta resides the family of the most ancient and opulent of the Hindu Princes of Bengal-Raja Ram Kanto of the race of Brahmins who deceased in the year 1748 was succeeded by his wife, princess named Bhabani Rani, whose Dewan or Minister was Dayaram of the Tuly custe or tribe, they possess a tract of country about 35 days' travel and under a settled Goverment, their stipulated annual rent to the Crown was seventy Laks of Sicca Rupees, the real revenues about one Krore and a half "- Holmull

(বাঙ্গালায অনুবাদ।)

"কলিকাতাব উত্তব-পূর্ব্ব দশ দিবসেব পথ নাটোব। সেই নাটেবে বঙ্গদেশেব প্রাচীন বংশীয একটী অত্যন্ত ঐশ্বর্য্যশালিণী হিন্দুবানী বাস করেন। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে ঐ নাটোবেব ব্রাহ্মণ বংশীয় বাজা বামকান্ত পবলোক গমন করেন। বাজাব মৃত্যুব পব তাঁহার পত্নী বাণীভবানী পতিব ত্যক্ত সম্পত্তিব উত্তবাধিকারীণী হন। তিলী জাতীয দযাবাম নামক একব্যক্তি রাণীব দেওযান বা মন্ত্রী ছিলেন। সেই সময় নাটোব রাজ্য প্রদক্ষিণ কবিতে ৩৫ দিবস লাগিত এবং রাজ্যটী সুশাসনের অধীন ছিল। উহার বার্ষিক নির্দ্ধাবিত বাজস্ব ৭০ লক্ষ সিকা টাকা কিন্তু উহাব প্রকৃত আদায দেড় কোটী টাকা ছিল"— হলওয়েল।

(২) নবাব জাফাবখাঁব পব হইতে আবওয়াব লওযা প্রচলিত হয। কিন্তু নবাব আলীবর্দ্দী ও কাশীমখাঁব সময আবওযাব বেশী পবিমাণে আদায় কবা হইত।

দয়ারামের সহিত কৌতূকাবহ কলহ করিতেন। তারা ঠাকুরঝি দয়ারামকে দাদা বলিয়া ডাকিতেন এবং বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। এবং রাণী ভবানীরও দয়ারামের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস ছিল। একদা তারা ঠাকুরঝি ব্রাহ্মণগণের ব্রহ্মোত্তর পত্রের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। রাজা রামজীবন ব্রাহ্মণগণকে নিষ্কর ভূমি দান করেন তাহাদের অধিকাংশ সনন্দ দয়ারামের দস্তখতঁ। তারা ঠাকুরঝি ঐ ব্রহ্মোত্তর ভূমি ক্রোক দিলেন। দয়ারাম এক জন চাকর, তাহাব দস্তখতে নিষ্কর ভূমির দানপত্র কোন মতে গ্রাহ্য করা যাইতে পারে না। এই সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া, বৃদ্ধ মন্ত্রী দয়াবাম রাণীভবানী সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন।" মহারাণী আপনকার বিবাহের লগ্নপত্রে আমি স্বাক্ষর করিয়াছিলাম কিন্তু তাহাতে রাজা রামজীবন স্বাক্ষব করেন নাই। সুতরাং আপনকার বিবাহও গ্রাহ্য যোগ্য নহে।" এই কথায় মহাবাণী ভবানী ও তারাঠাকুবঝি হাস্য করিয়া বলিলেন, "দেখ! দয়ারামের কি বুদ্ধি কৌশল।" তখনই মহারাণী ভবানী সমুদয় নিষ্কর ভূমি ক্রোক হইতে মুক্ত করিয়া খালাস দিলেন এবং দয়ারামেব স্বাক্ষরিত সনন্দ গ্রাহ্য করিলেন। অবশেষে দয়ারামের পরামর্শে রাণী বহুতর নিষ্কর ভুমি ব্রাহ্মণগণকে দান করিলেন।

মহারাণী ভবানীর কীর্ত্তি– বিষয় কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য মহারাণী ভবানীর পুণ্য কার্য্যের বাঁধা জন্মে নাই। সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ সময়ও তাঁহার পূণ্যকীর্ত্তি স্থাপনের চিন্তা প্রবল ছিল।

মোগল সম্রাট আরঙ্গজীব ধর্ম্মান্ধ ছিলেন। তাঁহার কঠোর শাসনে বারাণসী ধামের সীমা চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। দেব মন্দিরগুলি প্রায়ই চূর্ণ হইয়াছিল। মহারাণী ভবানীর কল্যাণে আবাব কাশীর সীমা চিহ্ন নির্দিষ্ট হইল এবং কাশীতে সর্ব্বশুদ্ধ ২৮০ ধর্ম্মশালা, অতিথিশালা এবং ঠাকুর বাড়ী প্রভৃতি-স্থাপিত হইল। বিশ্বেশ্বরের মন্দির হইতে সুরনাথের মন্দির পর্য্যন্ত তিনি এক সুবিস্তৃত রাজপথ নির্ম্মাণ করেন। এই কেবল তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি নহে। "আলিগড় কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক কালিদাস শাণ্ডিল্য বিরচিত 'উত্তব পশ্চিমাঞ্চলের ভূবৃত্তান্ত নামক পুস্তকে লিখিত আছে— 'মহারাণী ভবানী দেবী' কাশীধামে গমন করিয়া দেখিলেন যে, কাশীধামে প্রকৃত ক্রিয়াশীল ব্রাহ্মণের একান্ত অভাব। তাই তিনি কান্যকুব্জ হইতে সার্দ্ধ তিন শত সুব্রাহ্মণ আনাইয়া কাশীতে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের বাসের জন্য ৫০/৬০ হাজার টাকা ব্যয়ে পৃথক্ পৃথক্ বাড়ী প্রস্তুত করিয়া দেন এবং যজ্ঞোপলক্ষে যে কয়টা ভোজ দিয়াছিলেন, তাহার 'গাথা' অদ্যাপি ঐ প্রদেশে প্রচলিত আছে।" (১) বারাণসী, মুরশীদাবাদ, নাটোর, প্রভৃতি স্থানে তাঁহার নির্ম্মিত দেবমন্দির বিস্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি শ্যামরায়কে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ডিহি ফুলবাড়ী দেবোত্তর দেন। দেবসেবার জন্য দেবোত্তর এবং ব্রাহ্মণের ভরণ-পোষণ জন্য ব্রহ্মোত্তর, রাণীভবানী বিস্তর দান করেন। এক' কাশীধামেই মহারাণী ভবানী প্রদত্ত দুই লক্ষ টাকার বেশী দেবোত্তর সম্পত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার স্বামী কে তাহা এক্ষণ নির্ণয় করা যায় না। অসংখ্য পুস্করিণী খনন করিয়া তিনি বহু স্থানের জলকষ্ট নিবারণ করিয়াছেন। বগুড়া জেলায় করতোয়া নদীর নিকটবর্তী ভবানীপুরে যে তীর্থ স্থান আছে, সেই পর্য্যন্ত একটী পথ রাণী ভবানী নির্ম্মাণ করেন। সেই পথ রাণীভবানীর "জাঙ্গাল" বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন যে "কেহ গৌরব লালসায় উত্তেজিত হইয়া, কেহ লোক প্রশংসার বা রাজদত্ত উপাধি লাভাশয় অনেক পুণ্য কীর্ত্তির অনুষ্ঠানাচরণ করিয়া থাকে। রাণীভবানীর দান সে শ্রেণীর নহে"। রাণীভবানীর দান মানুষ দেখান ছিল না; তিনি পরের দুঃখে কাতর হইয়া, অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া সকরুণ হৃদয়ে, স্থিরচিত্তে এবং মুক্ত-হস্তে দুঃখীর দুঃখ মোচন জন্য দান করিতেন। স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের কথা বলিতে গেলে,

(১) "বঙ্গবাসী"— ৩০শে ডিসেম্বব, ১৮৯৯।

"প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভবানী একটী ধার্ম্মিকা রমণী, মুক্ত-হস্ত, এবং পরোপকারে দ্রুতগামনী"। (১) রাণীভবানী স্বদেশেব হিতকামনায় এবং পবেব উপকার জন্য নিজ জীবন তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া এক মুষ্টি আতব তণ্ডুলেব উপর নির্ভর করত নিজ জীবন ক্ষেপণ করিতেন। তাঁহার পুণ্যকীর্ত্তি নিস্কাম। নিস্কাম দান বা পুণ্য কার্য্য তাঁহার জীবনের একটীমাত্র ব্রত ছিল। রাণীভবানীর দান কি প্রণালীর তাহা ১৩০৪ শকের মাঘ মাসের "সাহিত্যে" শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমাব মৈত্র মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেনঃ— "নিজ কাশীতে নিত্য প্রাতঃকালে এক প্রস্তরেব চৌবাচ্চাতে আটমণ ছোলা ভিজান যাইত, তাহা অনাহুত যে সকল লোক আগত হইত, তাহাদিগকে দেওয়া যাইত এবং অন্নপূর্ণার মন্দিরে নিত্য নিত্য ২৫ মণ তণ্ডুল বিতবণ হইত"। এই উদ্ধৃত অংশ পাঠে জানা যায় রাণীভবানী কিরূপ উদাবমনা এবং তাঁহাব নিরাশ্রয়ের প্রতি দয়া। তাঁহার দানে ভেদাভেদ নাই; পাত্রাপাত্র বিচাব নাই; স্থান ও সময় বিবেচনা নাই। আমরা হিন্দু এবং রাণীভবানীও হিন্দু। আমরা অনায়াসে তাঁহার প্রশংসা শত মুখে বর্ণনা করিতে পাবি। কিন্তু ইউরোপ দেশীয় লোক যাঁহাব রীতি নীতি ও ধর্ম্ম বিভিন্ন, তিনি রাণী ভবানীব কিরূপ গুণ কীর্ত্তন কবিয়াছেন তারা উদ্ধৃত অংশে জানা যাইবে ঃ— রাণী ভবানী পুণ্যশীলা ও ধর্ম্ম পরায়ণ বলিয়া সবিশেষ পরিচিতা। তিনি সর্ব্বদাই দেব সেবা ও দেব মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য মুক্ত হস্তে অর্থ ব্যয় করিতেন; এক মাত্র কাশীধামেই তিনি শত দেব মন্দির, অতিথিশালা ও ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ কবিয়া গিয়াছেন। আজ পর্য্যন্ত তাহার অনেকগুলি রক্ষিত হইয়া আসিতেছে, অনেকগুলি আব দেখিতে পাওয়া যায় না; হয় ত বিস্তীর্ন রাজ্য হস্তচ্যুত হইলে রাণী ভবানীর বংশধরগণ অর্থাভাবে সে গুলির রক্ষা করিতে পারেন নাই; (২) রাণী ভবানী এই সকল সেবা পূজার জন্য অর্থ ও ভূমি দান করিয়া গিয়াছিলেন; তন্মধ্যে কতকগুলি নাটোবে অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। শ্যামবায়ের সেবা এখনও মুরশীদাবাদ প্রদেশে সর্ব্বজন পবিচিত। ইহাব জন্য বাণী ভবানী যে ভূমিদান কবেন, তন্মধ্যে চুমাগাছা ও কালীগঞ্জের মধ্যবর্ত্তী ডিহি ফুলবাড়ীয়া সর্ব্ব প্রধান"। (৩) বাণী ভবানীর পূণ্য কীর্ত্তি অবলোকনে এবং তাঁহার কার্য্য কলাপ দেখিয়া ইহা স্থির করা যাইতে পাবে যে তাঁহার কার্য্য দেবময়। রাণী ভবানীর সময় ইংরাজী শিক্ষাব প্রচার ছিল না। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা শিক্ষার প্রথা প্রচলিত ছিল। দেশীয় পাঠশালায় সাধাবণ লেখা পড়া শিক্ষা হইত এবং চতুষ্পাঠীতে রীতিমত সংস্কৃত ব্যকরণ, স্মৃতি, ন্যায় প্রভৃতি পডান হইত। রাজসাহী প্রদেশেব অনেক স্থানে ভাল ভাল চতুষ্পাঠী ছিল। দয়ারামের যুক্তি অনুসারেই রাজসাহী রাজ্যেব বিস্তব চতুষ্পাঠীতে মহারাণী ভবানী সাহায্য করেন। বাণীভবানী কোন কোন চতুষ্পাঠীব সাহায্যার্থ ভূমি ও কোন কোন চতুষ্পাঠীতে মাসিক বা বার্ষিক অর্থদান করিতেন। (৪) মহারাণী ভবানীর দান কত তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। "বঙ্গে এরূপ প্রবচন প্রচলিত আছে যে, যিনি রাণীভবানীব ব্রহ্মোত্তর ভোগী নন তিনি ব্রাহ্মণ নামেরই অযোগ্য"। (৫) এ প্রবচন ববেন্দ্র ভূমিবই যোগ্য।

(1) The Maharani Bhbahi was pious, liberal and actively benevolent "- The Rajas of Rajshahi, Calcutta Raview

(২) স্বর্গীয় কিশোবীচাঁদ মিত্র মহাশয বলেন কাশীতে দেব মন্দিব প্রভৃতি মহাবাণী ভবানী নিজ মন্ত্রদাতা গুরুব নামে প্রতিষ্ঠিত কবেন। গুরু বংশেব অভাবে মন্দিব প্রভৃতি বিনষ্ট হইযাছে।—

"-The religious establishments at Beneras standing as they do in the name of the Garu or spiritual guide of the family are gone to wred and ruin, because the said Guru and his Jescendents are extent "-

"-The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review

(3) Translated by Babu Akshya Kumar Moitra from Weked's Jessore published in "Sahitya "

(৪) সংস্কৃত চতুষ্পঠীতে মহাবাণী ভবানীব দান এই গ্রন্থেব চতুর্থ অধ্যযে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইযাছে।

(৫) "বঙ্গবাসী"— ৩০শে ডিসেম্বর, ১৮৯৯।

ভবানী মহারাণী হইয়াও ব্রহ্মচারিণী– রাণীভবানী শয্যা হইতে প্রত্যুষে উঠিয়া নিজে পুষ্প চয়ন করিতেন। যখন গঙ্গাতীরে বড়নগরের নিজ বাটীতে বাস করিতেন, তখন প্রাতে গঙ্গা স্নান করিয়া সন্ধ্যা-বন্ধনাদি করিতেন। মধ্যাহ্নকালে দেবতাদের পূজা ও সেবা করিতেন। অবকাশ মত পুরাণাদি শ্রবণ করিতেন। এ সকল কার্য্য করাতেও তাঁহার রাজকার্য্য পরিদর্শনের ব্যাঘাত হইত না। রাজকার্য্য নির্ব্বাহ জন্য তাঁহার একটী সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল। তিনি একবার মাত্র হবিষ্যান্ন আহার করিতেন— হবি নাম মাত্র। "তাহার হবিষ্যান্নেব জন্য উড়ি ধান্য ভিন্ন কৃষিজাত ধান্য ব্যবহৃত হইত না"। তাঁহার নিজের সুখের জন্য তিনি কিছুই ব্যয় কবিতেন না। কেবল লোক হিতসাধন জন্য তিনি সর্ব্বদা ব্যস্ত ছিলেন। তিনি ব্রহ্মচারিণীর ন্যায় জীবন যাপন করিতেন'। হিন্দু বিধবা রমণীর এইরূপে দিন যাপন করাই প্রশংসনীয়।

পবিত্রা বিধবা হিন্দু রমণী দেবী না মানবী?– মহারাণী ভবানী, মহাবাণী শরৎসুন্দরী, ও অহল্যাবাই, এই তিনটী হিন্দু বিধবা রমণী ভারতবর্ষ উজ্জ্বল করিয়াছেন। ইহাঁরা প্রাতঃস্মবণীয়া। ইহাঁরা নিজে ব্রহ্মচারিণীর ন্যায় দিন যাপন করিয়া লোক হিতসাধনে দীন দরিদ্রের দুঃখ মোচনে, প্রজাপালন এবং গো, ব্রাহ্মণ, দেব সেবায় ব্যস্ত ছিলেন। নাটোর রাজবংশীয় মহারাণী ভবানী ও পুঁঠীয়া রাজবংশীয় মহাবাণী শরৎসুন্দরীর বিস্তর বলিয়াছি। মহারাণী শরৎসুন্দরী ১২ বৎসর বয়সে অপুত্রক অবস্থায় বিধবা হইয়া ব্রহ্মচাবিণী ছিলেন। আবার মহারাণী ভবানী এক পুত্র ও এক কন্যা প্রসব করিয়াও পতির সঙ্গে কিছু দিন কালযাপন করার পর বিধবা হইয়া ব্রহ্মচাবিণী বেশে দিন যাপন করিয়াছিলেন। ইহাঁদের শয্যা কুশাসন, ইহাঁদের হস্ত উপাধানের কার্য্য কবিত। মশকের দংশনকে ভয় কবিতেন না। দিনান্তে আহার হবিষান্ন, হবি কেবল নাম মাত্র। এইরূপে দিন যাপন কবিয়া কেবল পরের দুঃখ মোচনের জন্য তাঁহারা ব্যগ্র ছিলেন। ইহাঁদেব নির্ম্মল চরিত্রের অনুকরণ সকল হিন্দুরমণীরই প্রার্থণীয়। অহল্যাবাই মহারাষ্ট্রীয় হিন্দুরমণী। ইহাঁর পূণ্যকীর্ত্তিও কম নহে। ইহাঁর মহৎকীর্ত্তি কলিকাতা হইতে বারাণসী ধাম পর্য্যন্ত একটী সুবিস্তৃত রাজপথ অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে।˘ কাশীধামেও তাঁহার কীর্ত্তি অসংখ্য। এই তিন হিন্দু রমণীব কাহিনী পাঠে এক আশ্চর্য্য বিষয় উদ্ঘটিত হয়। ইহাঁরা তিন জনই বিস্তৃত রাজ্য শাসনে যেমন পটু এবং কর্ত্তব্যপরায়ণা; পারত্রিক যাবতীয় কার্য্য সম্পন্নে তেমই পটু এবং কর্ত্তব্যপরায়ণা। আবার ইহাও দেখিতে হইবে ইহাঁদের পুণ্য কীর্ত্তিতে নিষ্কাম ভাব অবলম্বন করে। রাণী ভবানী নিজ পুত্রনিধনে শোক এবং কন্যার বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও রাজ-কার্য্য নির্ব্বাহে এক দিনেব জন্যও অমনোযোগ করেন নাই। সেইরূপ অহল্যা বাইও পুত্রের দুর্ব্বৃত্ততায় এবং তাহার নিধনে কাতব হইয়াও রাজকার্য্য নির্ব্বাহে শৈথিল্য কবেন নাই। রাণী শরৎসুন্দরীও ১২ বৎসর বয়সে পতির অভাবে ম্রিয়মানা হইয়াও সুচারুরূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। এই তিন হিন্দু রমণীর আশ্চার্য্য গুণ এই যে কর্ত্তব্য জ্ঞান ইহাঁদের যেরূপ দৃঢ় ছিল, অনেক পুরুষের সেরূপ কর্ত্তব্য জ্ঞান দেখা যায় না। এই তিন রমণীই ভারতবর্ষের হিন্দু রমণীদের শীর্ষস্থান অধিকার করিবে। ধন্য ভারত ডুমি। তুমি এরূপ রমণীর জন্মদাত্রী। ভাবতবর্ষের মানবকুল সতত এই তিন হিন্দু রমণীর পবিত্র কীর্ত্তিকলাপ কীর্ত্তন করিবে।

হিন্দুশাস্ত্রে ইহা লিখিত আছে—

"অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকন্যাঃ স্মরেন্নিতাং মহাপাতক নাশনম্ ॥

প্রত্যহ ব্রহ্মমুহূর্ত্ত সময়ে নিদ্রা ভঙ্গের পর এই পঞ্চ কন্যার পবিত্র নাম স্মরণ করিবার প্রথা হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত আছে এবং ইহাঁদের নাম স্মরণ করিলে মহাপাতক নাশ হয়, কিন্তু ইহাও

বলিলে অত্যুক্তি হয় না, যে প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে রাণী ভবানী, রাণী শরৎসুন্দরী, অহল্যা বাই— এই তিন রমণীর নাম স্মরণেও পাপক্ষয় হইবে। ইহাঁরা তিন রমণী দেবী— মানবী নহেন তাহার আর ভুল নাই। রাণী শরৎসুন্দরী বাল্যে বিধবা হইয়া কিরূপ সাধ্বী পবিত্রা রমণী ছিলেন তাহাতে কেবল রাজসাহীর নহে, সমগ্র ভারতের গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। পতির মৃত্যুর পরেও যে, সাধ্বী পতিপরায়ণা হিন্দু রমণীর সেই পতির সহিত ধর্ম্ম-সম্বন্ধ বিলুপ্ত হয় না (১) —পতির চরণ যুগল ধ্যানে, পতির পবিত্র হৃদয়ের প্রেম চিন্তনে, পতির মুখশ্রী নিজ হৃদয়ে অবলোকনে, পরলোকেও পতি দর্শন লালসায়, এবং ইহলোক বিচ্ছেদেও পতির প্রিয় কার্য্য সতত সাধনে, আহার নিদ্রা সুখ স্বচ্ছন্দতা ত্যাগ— সেই হিন্দু রমণীই দেবী, সেই হিন্দু রমণীই ব্রহ্মচারিণী, সেই হিন্দু রমণীই আর্য্য-কুলের ভূষণ, সেই হিন্দু রমণীরই জীবন ধন্য,দান, তীর্থ ও ধর্ম্ম সার্থক। এখন ভারতে সে ভাবের হ্রাস দেখা যায়। একালে বিবাহ যে একটী ধর্ম্মসম্বন্ধ এবং যে সম্বন্ধ এসংসারে কোন কারণে সাধ্বীব জীবন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবাব নহে, তাহার শিথিলভাব রাজার অট্টালিকা হইতে দরিদ্রের কুঠীর পর্যন্ত লক্ষিত হইতেছে। তথাপি ভারত ভূমি পৃথিবীর অপর সকল দেশ অপেক্ষা এখনও সতীকুলের পবিত্র নিবাস ভূমি বলিয়া গৌরব করিয়া থাকে। ভারতে আজও নারীজাতীর সতীত্বের জন্য ধরণীময় কীর্ত্তিত। কিন্তু বিদেশীর আদর্শে অল্প স্থলেই সেই গৌরবধ্বংসের সূত্রপাত কবিতে দেখা যাইতেছে। যত দিন হিন্দুর ধর্ম্মভাব ভারতে জাজ্জ্বল্যমান থাকিবে, তত দিন সেই গৌরব, আর্য্যজাতির সেই শ্রেষ্ঠত্ব অস্তমিত হইবার নহে।

তারা-ঠাকুরঝি ও নবাব সিরাজদ্দৌলা।– মহারাণী ভবানীর বংশে নবাব সিরাজের কর্ত্তৃক একটী কলঙ্কের আখ্যায়িকা শুনা যায়। তারাঠাকুরঝির বিদ্যা-বুদ্ধির কথা, অপরূপ-লাবণ্যের কথা এবং প্রতিভার কথা বঙ্গদেশের সকল স্থানেই প্রচারিত হইয়াছিল। তারার রূপ-লাবণ্যের কথা নবাব সিরাজের কর্ণগোচর হইলে, নবাব তারাকে হস্তগত করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। মহারাণী ভবানী সেই কথা জানিতে পারিয়া বড়ই বিপদ মনে করিলেন। নবাব দেশের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। তাঁহার হস্ত হইতে তারাকে রক্ষা করা কঠিন মনে করিয়া, রাণী ভবানী "তারাকে লইয়া বারাণসী ধামে পলায়ন করিলেন।" (২) ইহাই স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয় বলেন। "রাণী ভবানী কলঙ্কগ্রস্ত হইবার ভয়ে তারা ঠাকুরাণীর মৃত্যু রটনা করিয়া দিয়া নাটোর হইতে পলায়ন করিয়া ছিলেন, ইহাই বিশ্বাস যোগ্য।" মিত্র ও মৈত্র মহাশয়ের কথার অনেক সাদৃশ্য আছে বলিয়া আমরা মিত্র মহাশয়ের কথাকে বিশ্বাস যোগ্য মনে করি।

জমিদার (জমিনদার)– জমিনদার শব্দ পারশ্যভাষায় প্রচলিত। পারশ্যভাষায় "জমিন ও দার" এই দুই শব্দ দ্বাবা জমিনদার শব্দ গঠিত হয়। "জমিন" শব্দে ভূমি এবং "দার" শব্দে রক্ষক বুঝায়। সাধারণ কথার জমিনদাবকে ভূমির রক্ষক বুঝায়; কিন্তু ভূমির অধিকারী বুঝায় না (৩)। ক্রমে জমিনদার শব্দ পরিবর্ত্তন হইয়া বাঙ্গালাভাষায় জমিদার শব্দ প্রচলিত হইলে ক্রমে জমিদার ভূম্যধিকারী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল। আবঙ্গজীব বাদশাহর সময় পর্য্যন্ত জমিদার ঐ প্রধান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে বুঝাইত যাহারা ভূমি রক্ষক হইয়া মুসলমান রাজাদের সময় প্রজার নিকট

(1) "And not more than about a quarter of a century ago, even the death of the husband did not dissolve is a tie formed in his life tim for which the utmost regidity was the injunction carried out which prohibited widows to remmairy "
"The Statesman", September 30,1991

(2) She therefore took her daughter Tara with her and fled from the Rajbari to Beneras "- The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review

(3) "The Persian word Zemindar means haver holder or keeper of the land but the no means necessarily implies ownership"-
-The Elphinistone's History of India- foot note, Book II, Chapter II

রাজস্ব আদায় করিত এবং রাজস্বের রাজাংশ মুসলমান রাজাকে দিয়া যৎকিঞ্চিৎ পরিমাণে স্বাধীন ভাব অবলম্বন করিত। ইহারাই মুসলমান রাজস্ব সময় হইতে জমিদার নামে প্রসিদ্ধ হইয়া স্বাধীন ভাব অবলম্বনে ক্রমে ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইল। (১) কুতবের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ বখতিয়ার বঙ্গদেশ অধিকার করার পর ঘিয়াউদ্দীনের সময় হইতে সেনবংশীয় রাজাদের অধীনে যে সকল ভূম্যধিকারী ছিল, তাহারাই পরে জমিদার নাম ধারণ করিল। 'পাঠান সম্রাটদের সময় বঙ্গদেশের জমিদারগণ সুবাদারের অধীন থাকিয়া রাজস্ব সুবাদার সমীপে দাখিল করিত। সে সময় জমিদারগণের ক্ষমতা বেশী ছিল না— সুবাদারই বাঙ্গালার হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা ছিলেন। পাঠানদের পর মোগল সুবাদারগণ বাঙ্গালায় প্রায় দুইশত বৎসর রাজত্ব করেন। পাঠানদিগের অপেক্ষা মোগল সুবাদারগণের রাজ্য-শাসন প্রণালী অনেক ভাল ছিল। "মোগলদের আমলে হিন্দুদিগের ক্ষমতা অনেক বাড়িয়া ছিল"। সুতরাং "মোগল সুবাদারদের আমলে হিন্দু জমিদারদিগেরও ক্ষমতা খুব ছিল। তাঁহাদের মধ্যে যশোহবের রাজা প্রতাপাদিত্য, ভূষণার মুকুন্দরায়, বিক্রমপুরের কেদার রায়, পুঁঠীয়া তাহিরপুরে এবং দিনাজপুরের বর্ত্তমান প্রসিদ্ধ রাজাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ এবং নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ই খুব বিখ্যাত ছিলেন। ইহাঁরা যদিও সুবাদারকে কর দিতেন, কিন্তু অনেকটা স্বাধীন রাজার মতই জমিদারী করিতেন। ইহাদের মধ্যে বার ভূঁইয়া জমিদারেরাই অধিক ক্ষমতাশালী ছিলেন। এই জমিদারদের সৈন্য, গড়, বিচারালয় সবই ছিল।" (২) আবাব "আইন আকবরীতে লিখিত আছে যে বাঙ্গালার জমিদারেরা প্রায়ই কায়স্থ এবং তাহারা সম্রাটের সাহায্যার্থ ১৩৩০ অশ্বারোহী, ৮০১১৫৮ পদাতিক, ১১৭০ গজ, ৪২৬০ কামান এবং ৪৪০০ নৌকা যোগাইয়া থাকে। এরূপ যুদ্ধের উপকরণ যাহাদিগের ছিল তাহাদিগের পরাক্রম নিতান্ত কম ছিল না।" আমাদের মহারানী ভবানী এই জমিদার শ্রেণীর মধ্যে গণ্য। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় বলেন "রাণী ভবানী যখন রাজসাহীর রাজ্যভার গ্রহণ করেন, সে সময়ে জমিদারেরাই প্রকৃত প্রস্তাবে এদেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হইয়া উঠিয়াছিলেন। সম্রাট আকবরের ন্যায় প্রবল প্রতাপশালী মোগল রাজেশ্বরকেও জমিদারবর্গের পদমর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখিতে হইয়াছিল।" (৩) নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর শাসন সময় জমিদারগণ স্ব স্ব রাজ্যে দেওয়ানী ফৌজদারী বিচারকার্য্য সম্পাদন করিয়া অপরাধীগণকে নিজ নিজ রাজবাটীতে কারারুদ্ধ করিতেন এবং নিজ নিজ রাজ্য রক্ষা করিতেন। তাঁহারা কিস্তিমত নবাব সরকাবে রাজস্ব প্রদান করিতেন, এবং অন্যান্য সকল বিষয়ে কথঞ্চিৎ স্বাধীনভাবে জমিদারী কার্য্য নির্ব্বাহ কবিতেন। তথাপি নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর সময়ে কিস্তিমত "রাজকর পরিশোধ করিতে না পারিলে সকলকেই সবিশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত। কেহ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইতেন, কাহার জমিদারী অন্যের হস্তে সমর্পিত হইত, কাহারও বা বৈকুণ্ঠবাসের ব্যবস্থা হইত।" (৪)

---

(1) It is said by Mr Sterling (Asiatic Researches, Vol XV A 230) the until Aurang zeb's time, the term Zomindar was confined to such chief enjoyed some degree of independence"- The Elphinistone's History of India Book II Chapter II

(২) প্রিয়নাথ মল্লিক প্রণীত বাঙ্গালাব ইতিহাস। (৩) রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস।

(3) "The first, class of Bengal Zemindars represented the old Hindus and Mohammedan Rajas of the country, previous to the Mogul conquest by the Emperer Akbar in 1576, or persons who claimed that status The second class were Rajas or great land-holders, most of whom were dated from the 17th and 18th centuries and some of whom, were, like the first defacto class, rulers in their own estates or territories, subject to a tribute or land tax to the representative of the Emperor These two classes had a social position faintly resembling the Fuedatory chiefs of the British Indian Empire, but that position was enjoyed by them on the basis of custom, not of treaties "- The Bengal M S. records, Vol I 31

(৪) শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় প্রণীত "সিরাজদ্দৌলা"

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় "বৈকুণ্ঠের" ব্যাখ্যা এইরূপ করিয়াছেন যে ঃ— "মুর্শিদকুলীখাঁর শাসন সময়ে মুর্শিদাবাদে একটী গর্ত্তের মধ্যে যাবতীয় পূতি গন্ধময় পদার্থ সঞ্চিত রাখিয়া রাজস্বদানে অশক্ত জমিদারদিগকে তাহার মধ্যে টানিয়া আনিয়া নির্য্যাতন করিবার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। ইহাকে সেকালে মুসলমানেরা ব্যঙ্গচ্ছলে 'বৈকুণ্ঠ' বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন। মুসলমান ইতিহাসে একথার উল্লেখ নাই, কিন্তু সমসমায়িক ইংরাজেরা ইহা লিখিয়া গিয়াছেন।" (১) জমিদাবগণের সাহায্যেই আলীবর্দ্দী খাঁ মুর্শিদাবাদের নবাব হন। সুতরাং তাঁহার শাসন সময়ে বাঙ্গালার জমিদারগণেরও ক্ষমতা এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে তিনি তাঁহাদের পরামর্শ না লইয়া কোন গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। জমিদারগণ যাহা বলিতেন তাহার বিরুদ্ধে নবাব কোন মতে কিছু করিতে পারিতেন না। কিন্তু নবাব সিরাজদ্দৌলার ইহা ভাল বোধ না হওয়ায় জমিদারগণের ক্ষমতা ক্রমে খর্ব্ব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। জমিদারগণ ভয় পাইলেন। ইংরাজদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন এবং মিরজাফরকে নবাব করিবেন বলিয়া দল পাকাইতে লাগিলেন। জগৎশেঠ ভবনই জমিদারগণের যুক্তি পরামর্শের স্থান ছিল। প্রায় বড় বড় সকল জমিদারগণই এই দলভুক্ত ছিলেন। কিন্তু আমাদের মহারানী ভবানী এই দলের বিপক্ষ ও ছিলেন না এবং সপক্ষও ছিলেন না। তিনি নিরপেক্ষ ছিলেন। তিনি কালের উপর নির্ভর করিয়াছিলেন। কালচক্রে এবং ইংরেজদের বাহুবলে যা হইবে তাহাতেই তিনি বাধ্য ছিলেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩ জুন বৃহস্পতিবারে ইংরাজেরা সিরাজদ্দৌলাকে পলাশী যুদ্ধে পরাস্ত করিলেন। সিরাজ পলায়ন করেন এবং অবশেষে ধৃত হইয়া নিহত হন। পলাশীযুদ্ধের পর হইতে জমিদারগণের স্বাধীন বাজশক্তির হ্রাস হইতে লাগিল। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট তারিখে বার্ষিক ২৬০০০০০ লক্ষ টাকা রাজকর লইয়া দিল্লীর সম্রাট সাহআলম ইংবাজদিগকে বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার "দেওয়ানী" সনন্দ প্রদান করেন। এই সনন্দ বলে ইংরাজ সেনাপতি লর্ডক্লাইব ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে জমিদারগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া "শুভপুণ্যাহ" করিলেন। এই হইতে "কোম্পানীব রাজত্ব প্রতিষ্ঠালাভ করিল।" এই দিল্লী সাম্রাজ্যের অধঃপতন, মুর্শিদাবাদ নবাবের ধ্বংস এবং ইংরেজ রাজ্যের সূত্রপাত। তদপর ক্লাইব স্বদেশ চলিয়া গেলে মিষ্টার বেরেলেষ্ট এবং মিষ্টার কাটিবার নামে দুই ব্যক্তি পব পর বাঙ্গলার গবর্ণর হন। তাঁহাদের সময় রাজ্যের বিশৃঙ্খলতা ও অবাজকতা দৃষ্ট হইতে লাগিল। এমন বিপদের সময়েও মহারাণী ভবানী নিজ প্রতিভা-গুণে নিজ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া অতি সুচারুরূপে প্রজাদের রক্ষা করিতেছিলেন এবং তাঁহার শাসন কৌশলে চোর ডাকাইতের অত্যাচার হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করিতেছিলেন। মুসলমান রাজ্যের পতনে ইংরেজ রাজ্যের আরম্ভ হওয়ায় মহারাণী, ভবানী সন্তোষচিত্তে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। (২) ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংশ বাঙ্গালার গবর্ণর হইয়া কলিকাতা পৌছেন। "শুভপুণ্যাহ" হওয়ার পর হইতে নবাবের সঙ্গে একযোগ বাঙ্গালার শাসনকার্য্য সম্পন্ন হইত। কিন্তু কোম্পানীর আদেশ মত এবং দিল্লীর সম্রাটের সনন্দ বলে হেষ্টিংস জমিদারগণের নিকট হইতে খাজানা আদায়ের ভার নিজ হস্তে লইলেন এবং তজ্জন্য প্রত্যেক জেলায় ইংরাজ কালেক্টর নিযুক্ত কবিলেন। জমিদারগণের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিবার জন্য তাঁহারা মন্ত্রী সভার পাঁচ জন সভ্যকে স্থানে স্থানে পাঠাইয়া দিলেন। পাঁচ বৎসরের জন্য জমিদারগণের সঙ্গে এই বন্দোবস্ত হইল। ঐ প্রণালীতে হেষ্টিংস মহারাণী ভবানীর সঙ্গে কেবল রাজস্বের বন্দোবস্ত করিলেন, এমত নহে;

(১) শ্রীযুক্ত অক্ষযকুমাব মৈত্র মহাশয প্রণীত "সিবাজদ্দৌলা।"

(2) "The Maharani had the gratification of witnessing the eminetion of the Muhammedan Government and the substitution for it of the English "Government."- The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review

প্রত্যেক জেলায় এক একটী ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালত স্থাপন করিলেন। কালেক্টরের হস্তে দেওয়ানী বিচারের ভার এবং মুসলমান কাজির হস্তে ফৌজদারী বিচারের ভার অর্পিত হইল। এই বন্দোবস্তে জমিদারগণের রাজস্ব বৃদ্ধি হইল এবং তাহাদের পূর্ব্বে যে ক্ষমতা ছিল তাহা খর্ব্ব হইবার সূত্রপাত হইল। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সময় পর্য্যন্ত নাটোর রাজা দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারের কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। (১) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সময় পর্য্যন্ত অন্যান্য জমিদারগণেরও নাটোরের রাজার মতই প্রায় ক্ষমতা ছিল। মুসলমান রাজত্বকালেও উত্তরাধিকারীসূত্রে জমিদারগণ নিজ নিজ রাজ্য ভোগ দখল করিয়াছেন, তাহা মহাত্মা রাউস সাহেব স্বীকার করিয়াছেন। (২) উত্তরাধিকাবী সূত্রে জমিদারী পাইবার প্রণালী ইংরেজ গবর্ণমেন্ট সময়ও প্রচলিত হইল, কিন্তু জমিদারগণের অন্যান্য ক্ষমতার হ্রাস হইল। ইংলাণ্ডে পার্লামেন্ট নামে একটী মন্ত্রী সভা আছে, সেই সভার ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের নিয়মানুসারে বাঙ্গাল্যার গবর্ণর হেস্টিংস ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের প্রথম "গবর্ণর জেনারেল" হইলেন। ইহাঁব সময় (জমিদারীর নূতন বন্দোবস্ত সময় হইতে ইহাঁর ইংল্যান্ডে প্রত্যাগমন করা পর্য্যন্ত, ১৭৭২—১৭৮৫) ইনি অনেক জমিদারগণের প্রতি অত্যাচার করেন। হেস্টিংস মহারাণী ভবানীর প্রতিও অত্যাচার করিতে ত্রুটি করেন নাই। বেশী জমায় মহারাণী ভবানী এবং তাহেরপুর, লস্করপুর ও বার্ব্বকপুর পরগণার জমিদারগণের সহিত হেষ্টিংস পাঁচ বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত করেন, এই পাঁচশালা বন্দোবস্তই রাণী ভবানীর অধঃপতনেব মূলকারণ। ওরারেণ হেষ্টিংস বলিয়াছেন,— "রাজসাহী জমিদারী বাঙ্গালার দ্বিতীয় রাজ্য; ইহার বার্ষিক রাজস্ব ২৫ লক্ষ; বহুসংখ্যক জমিদারকে রাজ্যচ্যুত করিয়া বর্ত্তমান রাজসাহী জমিদার, তাহার সমগ্র জমিদারী মধ্যে একখানা গ্রামও উত্তরাধিকারক্রমে অধিকার করেন নাই।" (৩) কিন্তু হেষ্টিংস স্বয়ং এই নিয়ম রক্ষা না করিয়া রাণী ভবানীর নিকট হইতে রঙ্গপুরের অন্তর্গত বাহিরবন্দর পবগণা কাড়িয়া লইয়া বানিয়ান কান্তবাবুকে দেন। সেই হইতে এখনও বাহিরবন্দর কাশিম বাজার রাজবংশের অধিকার হেস্টিংসের পরে ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস গবর্ণর জেনারেল হইয়া আইসেন। জমিদারগণের সহিত তিনি প্রথমে দশ বৎসরের জন্য যে "দশশালা" বন্দোবস্ত করেন, তাহাই ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়। এই বন্দোবস্তে জমিদারগণের নিকট হইতে ইংরেজ গবর্ণমেন্ট আর বৃদ্ধিহারে রাজস্ব লইতে পারিবেন না এবং জমিদারগণও প্রজাদের নিকট হইতে নির্দ্দিষ্টহারে খাজানা ব্যতীত অন্য কোন প্রকার আবওয়াব লইতে পারিবেন না। তাঁহাদের বিচারাদি করিবার ক্ষমতা রহিত হয় এবং কিস্তিমত নির্দ্দিষ্ট দিনে খাজানা ইংরেজ সরকারে দাখিল করিতে না পরিলে জমিদারী নিলাম হইয়া যাইবে। জেলাব কালেক্টরগণেব হস্তে

(1) "At the time of the permanent settlement the chief of the Natore Raj exercised civil and criminal powers and was also unmuleced in the collection of revenue On him rested the power of farming the lands, collecting the rents from the villages and keeping teh accouunt He was independent of teh interference of the Government in the deails of Seral and criminal administratinn "- The Rajas of Rajshahi, Caleutta Review

(2) "That the state in which we received the rich provinces of Bengal Behar and Orissa, was a general state of hereditary property" - The Rajas of Rajhahi, Colcutta Review.

(3) Mr Warren Hastings in his "Memories relative to the State of Indian" mentions that "the Zamindari of Rajshahi, the second in rank in Bengal and yielding an annual revenue of about twenty five laks of rupees has risen to its presents magnitude during the course of the last eighty years by accumulating the properly of a great number of dispossessed Zamindars although the ancestess of present possessor had not by inheritance a right to the property of a single village within the whole Zamindait " The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review
Mr H Hastings himself did not wrest the Raj, as he spared from Rani Bhabani the large estate of Banhirband in Rangpur and vested the same in his Banian Kauto Babu,"- The Rajas of Rajahshi, Calcutta Review

খাজানা আদায়ের ভার অর্পিত হইল। প্রতি জেলায় দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার জন্য জজ নিযুক্ত হইল। জজদিগের অধীন বাঙ্গালী মুন্সেফ নিযুক্ত করিয়া এবং স্থানে স্থানে থানা স্থাপন করিয়া এক এক থানায় এ এক পুলিশ দারোগা নিয়োজিত করা হইল। তদপর গবর্ণর জেনারল বেন্টিকের সময়ে কালেক্টরদের হাতে ফৌজদারী বিচারের ভার অর্পিত করিয়া বাঙ্গালীদের ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত করেন। আবার লর্ড এলেনবরার সময়ে বাঙ্গালী ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট পদ সৃষ্টি করিয়া নিম্ন ফৌজদারী বিচার একবারে তাঁহাদের হস্তে অর্পিত হইল। এই সময় হইতে প্রকৃত প্রস্তাবে আইন সঙ্গত জমিদারগণের বিচারাদি কবিবার কোন ক্ষমতা রহিল না, কেবল প্রজার নিকট খাজনা আদায় করিয়া ইংরেজ সরকারে রাজস্ব দিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রজার অভ্যাসবশতঃ এবং প্রজারা অশিক্ষিত বলিয়া, জমিদারগণ ব্যপদেশে বিচারাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া কিঞ্চিৎ দণ্ডও আদায় করিতেছিলেন এ প্রথা রাজসাহী প্রদেশে যে প্রচলিত ছিল না তাহা বলিতে পারা যায় না। সামান্য ব্যয়ে এবং বিনা পরিশ্রমে, বিচারকার্য্য জমিদারের নিকট সম্পন্ন হয় বলিয়া, প্রজার বহুকালের পূর্ব্ব অভ্যাস একবারে ত্যাগ হওয়া কঠিন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে নাটোর রাজ্যের কি প্রকার অবস্থা ঘটে তাহাও এস্থলে বলা প্রয়োজন।

নাটোর রাজ্য যে দুই দিন পরে ধ্বংস হইত কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে তাহার ধ্বংস আরো নিকটবর্ত্তী হইল। (১) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙ্গালার সমুদয় জমিদারগণের অসম্ভব বৃদ্ধিহারে রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট হয়। বিশেষতঃ নাটোর জমিদারীর রাজস্ব অন্যান্য জমিদারগণ অপেক্ষা অত্যন্ত বেশী হইয়াছিল। (২) অনেক স্থলে আদায়ী জমা অপেক্ষা রাজকর বেশী হইয়াছিল। (৩) এইরূপ বৃদ্ধিহারে রাজকর নির্দ্ধারণে "কোর্ট অব ডাইরেক্টরগণ" সন্তুষ্ট না হইয়া বরং অসন্তুষ্টই হইয়াছিলেন। তাঁহারা এই বলেন যে "পবিমিত জমা নির্দ্ধারণ করিয়া, কিস্তি কিস্তি রীতিমত আদায় হয়, তাহাতে প্রজা ও জমিদারগণের সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হইতে পারে কিন্তু বৃদ্ধিহারে জমা নির্দ্ধারণ করিয়া কিস্তিমত আদায় না হইলে, প্রজা ও জমিদারগণের বিরক্তির ও কষ্টের কারণ ভিন্ন কিছুই নহে। প্রজার ও জমিদারের সুখই কোম্পানীর সুখও সমৃদ্ধি।" (৪) মুসলমান রাজত্ব সময়ে জমিদারগণের জমিদারীতে যে লাভ ছিল তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কমিয়া গেল। জমিদারগণের রাজস্ব পূরণ করিতে বা আয় বৃদ্ধি করিতে কিছুদিন কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল; কিন্তু ভূমির উৎকর্ষতা ও আদায় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, জমিদারগণের আয়ও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তদপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে ভাল মন্দ দুই ঘটিল। ক্রমে প্রজার রক্ত শোষণ করিয়া জমিদারগণের আয় বৃদ্ধি হইতেছে অথচ জমিদারগণকে নির্দ্ধারিত জমাব বেশী দিতে হইতেছে না। মোটের উপর বলিতে গেলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারগণ ভূমির উৎকর্ষতা লাভ করিয়া নিজ নিজ অবস্থাকে অনেক উন্নত করিতে পারিয়াছেন এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর হইতে

---

(1) "The permanent settlement precipitated the ruin of the Natore Raj"- The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review

(2) "Based upon the Lawzema papers of the Zamindari Sarishta and the records of the Kanungos as well as previous periodical settlements, it assumed a rental in excess of the reality It formed an exaggerated estimates of Zemindaris and assured them at a rate for beyond their power"- The Rajas of Rajahahi, Calcutta Review

(3) "The asessment of several large eastates and notably of the Nattore Raj, ws excessive, as shown by the settlement given by Mr West-Land in his report on Jessore"- The Rajas of Rajsnahi, Calcutta Review

(4) "-a moderate" Jama or assessment, regularly and punctually collected unites the consideration of our interest with the happiness of the natives and security of the land holders, more rationally than any imperfect collection of an exaggarated Jama to be enforced with severity and vexation"- The Rajas of Rajahshi, Calcutta Review

এক দল নূতন শ্রমজীবী ব্যবসায়ী লোকের উৎপত্তি হইল। ইহারা ভুমির আয়ের উপর নির্ভর না করিয়া, ইংরেজ বণিক সম্প্রদায়ের অধীনে সদরমেট, বানিয়ান, কোম্পানী কাগজের দালালী কার্য্য প্রভৃতি নির্ব্বাহ করিয়া যথেষ্ট ধনসঞ্চয় করিতে লাগিলেন। এই উপায়ে অনেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সাময়িক অসুবিধা নিবারণ করিয়া পরে তাঁহারা বড় বড় ভূম্যধিকারী হইয়া পড়িলেন। এ সকল সুবিধা নাটোর রাজবংশের কিছুই হইতে পারে নাই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে নাটোর রাজকে যত ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছিল এত কোন রাজাকেই করে নাই। জমিদারীর আয় অপেক্ষা রাজকর বেশী হওয়ায়, নাটোর রাজা সম্পূর্ণ রাজস্ব দাখিল করিতে অক্ষম হন এবং জমিদারীও রাজকর জন্য ক্রমে নিলাম হইয়া যায়। এইরূপে নাটোর রাজের অধঃপতনে ছোট ছোট বিস্তর জমিদারের সংখ্যা বৃদ্ধি হইল।

রাণীভবানীর সময় সামাজিক নিয়ম সংস্কারের প্রস্তাব– রাণীভবানীর কন্যা তারাঠাকুরঝি অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিলেন। তাঁহার বৈধব্য যন্ত্রণায় রাণীভবানী সর্ব্বদা দুঃখিত থাকিতেন। ঢাকার রাজবল্লভ ও ঐরূপ স্বীয় কন্যার বৈধব্য যন্ত্রণায় প্রপীড়িত ছিলেন। রানীভবানী ও বাজবল্লভ তাঁহাদের বিধবা কন্যার বিবাহের প্রস্তাব পণ্ডিতমণ্ডলীতে উত্থাপন করিলেন। সে সময় বিক্রমপুব ও নদীয়ার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সমাজের শিরোমণী ছিলেন। নদীয়ার পণ্ডিতগণ নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রেব অধীন। বিক্রমপুর ও নদীয়ার পণ্ডিতগণের বিচারে বিধবা বিবাহ ব্যবস্থসূচক বলিয়া স্বীকৃত হয় কিন্তু রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কৌশলে কার্য্যে পরিণত হইল না। স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বিধবা বিবাহ বঙ্গদেশে প্রচলিত জন্য আন্দোলন করেন তাহা একশত বর্ষ পূর্ব্বে রাণীভবানী এক জন হিন্দুরমণী প্রস্তাব করেন। রাণীভবানী কোন স্কুলে পড়েন নাই এবং আধুনিক মতেও শিক্ষিত ছিলেন না। একরূপ হিন্দুমরণীর বিধবা বিবাহের প্রস্তাবে তাঁহার দূরদর্শীতারই পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র মতেই বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিবার আগ্রহ প্রকাশ পায়।

বিধবা রমণীদের প্রতি রাণীভবানীর ব্যবহার– বিধবা অনাথা দরিদ্র রমণীর যে কষ্ট ও দুঃখ তাহা রাণীভবানী বিলক্ষণ বুঝিতেন। বিধবা রমণীদের অন্ন বস্ত্রের কষ্ট নিবারণ জন্য তাহাদের অনেককে মাসিক বৃত্তি দিতেন এবং অনেক হতভাগিণী বিধবা রমণীর ভরণপোষণের জন্য গঙ্গাতীরে আশ্রয় স্থান নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন।

বিধবা রমণীদের প্রতি এইরূপ সাহায্য করা পূর্ব্বে প্রয়োজন কম ছিল। দেশে এত প্রচুর পরিমাণে কার্পাস উৎপন্ন হইত যে তদ্দারা সূতা প্রস্তুত করিয়া তাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। একার্য্যের প্রতিবন্ধকেই তাহাদের পরের দয়ার উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় বলেন— "দেশে প্রচুর পরিমাণে কার্পাস উৎপন্ন হইত। এদেশের তন্তুবায়গণ ব্যবসায়ান্তর অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে, কার্পাসের কথা এখন অভিধানে অধ্যয়ন করিতে হইতেছে; সুতরাং পল্লী রমণীগণের পক্ষে শ্রমলব্ধ অর্থোপার্জনের সর্ব্ব প্রধান পথ অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে"। (১) মুসলমানও নীচ জাতীয় অনাথা হিন্দুরমণীরা এক্ষণে অপরের শস্যক্ষেত্রে ত্যক্ত ধান্য কুড়াইয়া এবং গোময় পিষ্ঠক বিক্রয় করিয়াও জীবিকা নির্ব্বাহ করে, কিন্তু ব্রাহ্মণ কায়স্থের হতভাগিণী দরিদ্রা বিধবা রমণীর জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়ের দ্বার প্রায় একবারে রুদ্ধ। তাঁহাদের অধিকাংশই আত্মীয়ের গলগ্রহ হইয়া থাকেন।

রাণীভবানীর সময় শিল্প ও বাণিজ্য– রাজসাহী রাজ্য কার্পাস ও পট্টবস্ত্র জন্য বিখ্যাত ছিল। ইউরোপীয় বণিকেরা কার্পাস ও পট্টবস্ত্র ক্রয় করিয়া বিক্রয় জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেশে পাঠাইয়া দিতেন। রাণীভবানীর শাসন সময়ে ধান্য চাউল খুব সস্তা দরে বিক্রয় হইত। কোন কোন সময় টাকায় ৫/৬ মণ করিয়া চাউল বিক্রয় হইত, খুব দর চড়া হইলেও টাকায় ২/৩ মণ করিয়া

(১) "সাহিত্য", ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩৪৪ শব্দ।

পাওয়া যাইত। এজন্য তাঁহার প্রজাগণ সুখী ছিল। তাঁহার শাসন সময়ের প্রথম অবস্থায় শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য বিশেষ উন্নতি লাভ করে, আবাব তাঁহারই শাসন সময়ের শেষ দশায়, দেশীয় শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের তিরোধানের সূত্রপাত হয়। মিরকাশীমকে যুদ্ধে ইংরেজরা পরাস্ত করার পর হইতে দেশীয় শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিল। ব্যবসা বাণিজ্যের লাভ নিতান্ত কম হইতে লাগিল এবং ক্ষেত্রে প্রচুব পরিমাণে নানাবিধ শস্য উৎপন্ন হইতে লাগিল। অনেক লোক শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য ত্যাগ কবিয়া কৃষি কার্য্য অবলম্বন করিতে লাগিল। বিলাতী কাপড় সস্তা দরে বিক্রয় হওয়াতে দেশীয় তন্তুবায়েদের অন্ন একবারে আরো গেল। সুতবাং দেশীয় কার্পাস বস্ত্র আর দেখা যায না। একমাত্র পট্ট বস্ত্র (মটকা বস্ত্র) রাজসাহী প্রদেশের দক্ষিণ ও উত্তরভাগে অতি অল্প পরিমাণে এখনও প্রস্তত হইতেছে।

রাণীভবানীব সময় "মন্বন্তর"- দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে "দেওয়ানী" সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া ইংবেজ বণিক সমিতি দেশের রাজা হইলেন। নবাবের আর সে ক্ষমতা বহিল না। সুতরাং জমিদাবগণের ক্ষমতা হ্রাসেরও সূত্রপাত হইল। এক রাজার পতনে এবং নূতন রাজার নূতন আমলে, রাজশাসন শিথিল হইবারই কথা। সুতরাং অরাজকতা আরম্ভ হইল এবং দেশের লোক দুর্দ্দশায় পতিত হইল। নিরাশ্রয় দরিদ্র লোকদিগের প্রতি অত্যাচার হইতে লাগিল। লোকেরা আর স্বচ্ছন্দ চিত্তে ও নিরুদ্বেগে কি কৃষি, কি শিল্প, কি ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইতে পারিল না। কেহ প্রধান প্রধান ব্যবসায় আড়ৎ হইতে দূব দেশে পলায়ন করেন এবং কেহ বা পল্লী গ্রামে যাইয়া কৃষি আবম্ভ কবেন। এমতাবস্থায় "দেশের রাজ্যশসন, বিশেষতঃ প্রজা রক্ষণ কার্য্য প্রায় লুপ্ত হইতে লাগিল"। (১) ১৩০৪ শকের ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের "সাহিত্যে" শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় "মন্বন্তর" সম্বন্ধে বিশেষ রূপ লিখিয়াছেন ঃ— "বাঙ্গালীর অন্নগত প্রাণ। সাতাত্তরের মন্বন্তরে সেই অন্ন দুর্লভ হইয়া উঠিল। লোক দলে দলে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। প্রধান জমিদার বংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া গেল। পথে ঘাটে নদীতীরে শব-দেহ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। দুর্ভিক্ষ শেষে স্থির হইল যে "মন্বন্তরে" বাঙ্গলার সর্ব্বনাশ হইয়াছে— হলকর্ষণক্ষম কৃষক জীবত নাই, বীজধান্য ও গো-বৎসের অভাব হইয়াছে, শস্যক্ষেত্র তৃণ কণ্টকে পূর্ণ হইয়াছে"। এরূপ দুর্দ্দিনে দয়াশীলা রাণীভবানী প্রজার রক্ষা জন্য রাজ ভান্ডার খুলিয়া দিলেন। রাজকোষে আর অর্থ রহিল না। চারিদিকে হাহাকার। রাণীভবানী প্রজার দুঃখে ম্রিয়মানা। তিনি শূন্য হস্তে প্রজার দুঃখে দুঃখিনী হইয়া এবং রক্ষা করিতে না পারিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ কবিতে লাগিলেন এবং ঈশ্ববের নিকট প্রজার দুঃখ নিবাবণ জন্য বোদন করিতে লাগিলেন।

রাণীভবানীর গঙ্গা বাস- রাজসাহী রাজ্যে "মন্বন্তর" উপস্থিত; ওয়ারেণ হেষ্টিংসের ব্যবহারে দুঃখিত; শিল্প, ব্যবসা বাণিজ্যের অবনতি; প্রজার দুঃখ; রাজ্যের রাজস্ব বৃদ্ধি; নিজ ক্ষমতার খর্ব্বতা;— এই সমুদয় কারণে রাণীভবানী দত্তকপুত্র রামকৃষ্ণের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া গঙ্গাবাসে সঙ্কল্প করিলেন। যে দিন রাণীভবানী রাজসাহীর রাজ্যভার পরিত্যাগ করেন সেই দিন হইতে রাজসাহীব গৌরব নষ্ট হইতে আরম্ভ হইল।

মহারাজা রামকৃষ্ণ- রাজসাহী জেলার অন্তর্গত আটগ্রামের রায় বংশ সম্ভূত রামকৃষ্ণ। (২) মহারাণী ভবাণীর মৃত্যুব পব, মহারাজা রামকৃষ্ণ সবর্বতোভবে তাঁহার মাতৃরাজ্য অধিকার

(1) "The Government of the country, as far as regarded the protection of the people, was dissolved "- Mill's History of British India Vol III

(২) হরিদেব বায কামদেবেব কনিষ্ঠ ভ্রাতা অভিবামের বংশ সম্ভূত। এই হবিদেব বায়েব তৃতীয় পুত্র বামকৃষ্ণ নামে অভিহিত হয। বামকৃষ্ণকে দত্তক পুত্ররূপে গৃহীত হইলে, বানীভবানী আমরুল পরগণাব অন্তর্গত আটগ্রাম পুবস্কাব স্বরূপ নিজবাজ্য হইতে মৌবসী জোত সত্ত্বে খারিজ করিয়া দেন। এক্ষণে আটগ্রাম বাযবংশীয়ের একটী বিশেষ লাভেব সম্পত্তি।

করিলেন। তাঁহার পিতার ন্যায় তিনিও নিষ্ঠাবান ও ধার্ম্মিক ছিলেন এবং দেবার্চ্চনায় তাঁহার সময় অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার বিষয় বুদ্ধি এবং জমিদারী কার্য্য নির্ব্বাহের ক্ষমতা একবারে ছিল না, বা তিনি জমিদারী ও ঐশ্বর্য্য ভোগে বীতরাগ ছিলেন। যখন দেবার্চ্চনা ও তপস্যা তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল, তখন তাঁহার সংসাবে বীতরাগই সম্ভব। যে কারণেই হউক মহাবাজা রামকৃষ্ণের সময় হইতে নাটোর রাজ্যেব ধ্বংস আবন্ত হইল। বলিহাবেব রাজা কৃষ্ণেন্দ্র রায় বাহাদুর মহারাজা রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে যেরূপ তাঁহার "সুখভ্রমে" লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃতি করিলাম।

"—'মহারাজা রামকৃষ্ণ' নির্দিষ্ট অন্তবে—
অন্বেষিলা নিত্যসুখ, যবে যোগবলে,
ভ্রূক্ষেপ কি ছিল তাঁর, বিষয়েব প্রতি;
অতি অল্পকালে, প্রায় সমস্ত সম্পদ,—
পরহস্তগত হ'ল অনেকেই জানে।
—কিন্তু, একদিন (ও) তিনি, ক্ষোভ না প্রকাশি—
প্রশান্তমানসে চিন্তি, ইষ্টদেব পদ,
ইহলোক পরিত্যাগ করেন হবিষে।"

যাহার অন্তঃকরণে ঈশ্বর-প্রেম উচ্ছলিত হয়, তাহাব নিকট অতুল ঐশ্বর্য্য, ধন, জন সম্পত্তি তৃণবৎ জ্ঞান হয়। রামকৃষ্ণ তাঁহার বিশাল বাজ্যকে অনিত্য সুখের কারণ জ্ঞানে উপেক্ষা কবেন। (১)

মহারাজা রামকৃষ্ণের আমলা ও চাকরদের অন্যায় ব্যবহার– তাঁহার আমাত্য, আমলা এবং ভৃত্যগণ চারিদিকে লুঠ আরম্ভ করেন। যে ব্যক্তি যে দিকে পায় অর্থ লইয়া নিজে ধনী হইয়া উঠিল। ইহাদের মধ্যে নড়াইল বংশের কালাশঙ্কর বায় সর্ব্ব প্রধান। মহারাজা, কালীশঙ্করকে বিশ্বাসী, বুদ্ধিমান ও বিজ্ঞ এবং পরম বন্ধু জ্ঞান করিতেন। কিন্তু কালীশঙ্কর, মিত্রের কার্য্য না করিয়া শক্রর কার্য্যই করিয়াছেন। তিনিই নাটোর রাজ্য ধ্বংসের একটী প্রধান কারণ।

মহারাজা রামকৃষ্ণের রাজ্যনাশ– মহারাজা একটী গানের জন্য পরগণা কাদীহাটী নড়াইল বংশীয় কালীশঙ্করের নিকট বিক্রয় করিলেন এবং ভূষণার অবশিষ্টাংশ তাহাকেই ইজারা দিলেন। ভূষণার আয় বৃদ্ধি হইবার আশায় কালীশঙ্করকেই ইজারা দেওয়া হয়। ১৭১৩ খৃষ্টাব্দেব এপ্রেল মাসে ইজারা লইয়া কালীশঙ্কর ৩২০০০০ টাকা বাজস্ব হইতে ৩৪৮০০০ টাকা রাজস্ব বৃদ্ধি করিলেন। পুনরায় দ্বিতীয় বর্ষে রাজস্ব বৃদ্ধি করায় কালীশঙ্করের দৌরাত্ম্যে প্রজাগণ বিদ্রোহী হইল। কালীশঙ্করের সহিত বিবাদে অনেক প্রজা প্রাণ হারাইল। অবশেষে কালীশঙ্কর নরহত্যাব অপরাধে চারি মাস কারাগারে বাস করিলেন। ইজারা আর রহিল না। ১৭৯৫ খৃস্টাব্দে মহারাজা, তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র বিশ্বনাথের নামে ভূষণা হেবা করিয়া দিলেন। এইরূপে কিছু দিন চলিয়া গেলে, জমিদারীর কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতেছে না বলিয়া ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে ভূষণার জন্য নিজ একজন কমিশনর নিযুক্ত হইল। তিনি কালীশঙ্করের নির্দ্ধারিত কর বিস্তর কমাইয়া দিলেন। ভূষণার মোট রাজস্ব ৩২৭৮০০ টাকা এবং সদর জমা ২৪৮১১৮ টাকা স্থির হইল। বিশ্বনাথ বয়ঃ প্রাপ্ত হইলে তাহাকে ভূষণা জমিদারী অর্পণ করা হইল কিন্তু লাভজনক জমিদারী নহে বলিয়া তিনি গ্রহণ করিলেন না। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে যশোহরের কালেক্টরীর আফিশে নিম্নলিখিত

---

(১) জেলা রাজসাহীর অন্তর্গত বীবকুৎসা গ্রামনিবাসী মজুমদারগণ সিংদিয়াড় গ্রামী মহারাজা রামকৃষ্ণ ঐ মজুমদাব বংশেব কন্যা বিবাহ কবাতে তাহারা মান্য শ্রোত্রিয় হইয়াছেন।
বামকৃষ্ণের শাসনে ও যত্নে নিবাবিল ও ভূষণা পট্টী কুলীন মধ্যে দত্তকগ্রহণেব প্রথা প্রচলিত হয়।

লাটে ভূষণা বিক্রয় হইল ঃ— (১)

পরগণা	রাজস্ব	বিক্রয়ের তারিখ	যে ব্যক্তি ক্রয় করে
হাবেলী	৩৬৬১৩	১৫ ফেব্রুয়ারী ১৭৯৯	রমানাথ রায়
মুকিমপুর	২৫৩৪৭	২৫ "	ঐ
নসীবশাহী	১৩৯৩৭	২৫ "	ভৈরবনাথ রায়
সাতোড়	৩৯৯৬৮	২৮ "	শিবপ্রসাদ রায়
নলদী	৬৬৭৬০	২৩ মার্চ ১৭৯৯	ভৈরবনাথ রায়

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ভূষণা পরগণা যশোহর জেলার সামীল হয় বলিয়া যশোহরের কালেক্টরীর আফিশে নিলাম হয়। মহারাজা রামকৃষ্ণের অন্যান্য বৃহৎ জমিদারী ভূষণার মত বিক্রয় হইয়া গেল। রাজার অনেক জমিদারী ইজারদার কালীশঙ্কর ক্রয় করিলেন। মৈমনসিংহের চৌধুরী জমিদারেরা পুখরিয়া পরগণা; গোবরডাঙ্গার কেনারাম মুখোপাধ্যায় ডিহি আড়পাড়া এবং গোপীমোহন ঠাকুর ডিহি কালেশপুর এবং স্বরূপপুর ক্রয় করিলেন। এইরূপে রাজসাহী রাজ্যের ধ্বংস হইয়া অল্প মাত্র অবশিষ্ট রহিল।

মহারাজা রামকৃষ্ণের রাজ্যনাশের কারণ— মহারাজার জমিদারী কার্য্যের অপটুতা ও শিথিলতাই যে রাজ্যনাশের কেবল একমাত্র কারণ তাহা নহে। রাজ্য-নাশের অন্যতম কারণ রাজ্যের রাজস্ব বৃদ্ধি। অতিরিক্ত কোম্পানীর করবৃদ্ধি হওয়ায় মহারাজা কিস্তিমত কোম্পানীর সরকারের রাজস্ব দিতে পারিলেন না। এবং দেশীয় শিল্প ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাঘাতে প্রজার অবস্থা দিন দিন খারাপ হওয়ায় প্রজার নিকটও কর রীতিমত আদায় করিতে পারিলেন না। ডাইরেক্টরগণ বলিয়াছেন যে— "সম্ভবপর জমা কিস্তিমত আদায় করিয়া প্রজা ও ভূমধিকারীর সুখ সন্তোষ বর্দ্ধন করাই কর্ত্তব্য কিন্তু অসম্ভব জমার কিয়দংশ বলপূর্ব্বক আদায় করিয়া প্রজা ও ভূমাধিকারীগণকে ত্যাক্ত বিরক্ত করা এবং কঠিন ব্যবহার করা নিতান্ত অযুক্তি"। (২) এই উদ্ধৃত অংশে ইহা কতকটা প্রমাণ হয় যে সদর জমা অসম্ভব বৃদ্ধি হওয়ায় রাজ্যনাশের একটী কারণ। কিন্তু রাজার জমিদারী কার্য্যের শিথিলতাই রাজ্যনাশের প্রধান কারণ। স্বর্গীয় কিশোরী চাঁদ মিত্র মহাশয় বলিয়াছেন যে "মহাত্মা ওয়েষ্টল্যান্ড সাহেব যশোহরের রির্পোটে যে সকল জমিদারী বন্দোবস্তের উল্লেখ করিয়াছেন সে বন্দোবস্ত বিশেষতঃ নাটোর রাজ্যের বন্দোবস্ত অতিরিক্ত হইয়াছে।" (৩) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কোন কোন স্থলে পুরাতন জমিদারগণের উপকারও হইয়াছে। আবার এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে নূতন একশ্রেণী জমিদারগণের সৃষ্টি হইল— যাহারা বণিক, দালাল, মহাজন, ভূসম্পত্তি লাভের লালসায় সঞ্চিতধন প্রয়োগ করিতে ইচ্ছুক। পুরাতন জমিদারের জমিদারী কোম্পানীর রাজস্ব না দিতে পারায় নিলাম হয় এবং ঐ বণিক, দালাল প্রভৃতি তাহাদের সঞ্চিত অর্থ দ্বারা ঐ সকল নিলামী ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া নতুন জমিদার হইল। ইহারা জমিদারীতে যেরূপ আয় বৃদ্ধি করিয়া লাভজনক করিল, পুরাতন জমিদারেরা প্রায়ই সে রূপ আয় বৃদ্ধি করিতে পারিল না। ক্রমেই পুরাতন জমিদারগণ— ধ্বংস হইবার আকার হইল। স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয় বলেন "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে নাটোর রাজ্যের ধ্বংস শীঘ্র হয়"। (১) মহাত্মা হেঙ্কেন সাহেব ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে নাটোরের কালেক্টর, জজ এবং মাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার সময়েই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কার্য্যে পরিণত হয়। তাঁহার বন্দোবস্তে গবর্ণমেন্ট অত্যন্ত

(1) The Rajas of Rajshahi, Calcuta Review.
(2) The Rajas of Rajshahi, Calcuta Review
(3) The Rajas of Rajshahi, Calcuta Review

অসন্তুষ্ট হন; কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে তিনি নিজে সন্তোষ লাভ করেন নাই। নাটোর রাজ্যের অধঃপতনে তাঁহার দোষ ছিল না। মহারাজা রামকৃষ্ণ সুচারুরূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারগ হইলেও তাঁহার পক্ষ কিছুকালের জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নির্দ্ধারিত সদর জমা গবর্ণমেন্টকে রীতিমত দেওয়া কঠিন হইত। তাঁহার সংসারে সঞ্চিত অর্থ থাকিলে, এবং সেই অর্থ দ্বারা কমতী জমা কিছুদিন পূরণ করিতে পারিলে, তাঁহার রাজ্য নাশ হইত না, বরং পরে এ জমিদারী লাভজনক হইত। তাঁহার ভাগ্যক্রমেই নাটোর রাজ্যের ধ্বংসাপবাদ সহ্য করিতে হইল।

মহারাজা রামকৃষ্ণের কারাবাস– মহারাজা ক্রমে রাজস্ব বাকী ফেলিলেন। কোম্পানীর রাজস্বের অনেক টাকা মহারাজার নিকট পাওয়ানা হইল। নিজ রাজসাহী জন্য সিক্কা ১৭০৩৫ টাকা এবং বাজে মহাল জন্য সিক্কা ৯৮৫০/১৪ গণ্ডা মোট সিক্কা ২৬৮৮৪২১৪ গণ্ডা রাজস্ব মহারাজার নিকট কোম্পানীর পাওয়ানা। এতটাকা আদায়ের কোন উপায় না দেখিয়া ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ৬ মার্চ্চ তারিখে রাজসাহী বিভাগের কমিশনর মহাত্মা জে, এচ, হারিংটন সাহেব মহারাজাকে অতি সম্মানের সহিত নজরবন্দী স্বরূপ উপযুক্ত কারাবাসে রাখিলেন। কেবল সিপাহী মাত্র পাহারা থাকিল কিন্তু তাঁহার আমলাগণ বা তাঁহার চাকর আদি যখন ইচ্ছা তখনই রাজার নিকট যাইতে পারিতেন। নাটোর রাজ্যেব কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য রাজার কারাবাসের সময় পর্য্যন্ত রামজীমল নামক জনৈক "সরবরাহকার" নিযুক্ত হইলেন। বোর্ড কমিশনরের কার্য্য অনুমোদন করিলেন। (১) কিন্তু ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ১৫ মার্চ্চ বড় লাট মহারাজাকে আরো সময় দিলেন এবং কমিশনর সাহেবকে আদেশ করিলেন যে মহারাজা কোম্পানীর কিস্তির বাকী রাজস্ব দিবার "অঙ্গীকার পত্র" বেজিষ্টরী করিয়া দিলে তাঁহাকে কারাবাস হইতে মুক্ত করিতে পাবেন। ১৮ মার্চ "অঙ্গীকার পত্র রেজষ্টরী হইলে মহারাজ্য কারাবাস হইতে মুক্ত হইলেন। কিন্তু "অঙ্গিকার পত্রে" সর্ত্তানুসারে কার্য্য করিতে না পারায় মহারাজাব অবশিস্ট রাজ্যের কিয়দংশ বাকী রাজস্ব আদায় জন্য নিলাম হইল। এই সময় পরগণা পাতিলাদহ, পবগণা, আমবাড়ী, কিসমৎ কোতওয়ালী, চৌঘবিয়া মাণিক ডিহি প্রভৃতি জমিদারী নিলাম হইল।

মহারাজা রাজকৃষ্ণের সময়ে দেশের অবস্থা– ইংরেজ বঙ্গদেশ অধিকার কবায় এবং কোম্পানীর আপন নবাব সৃষ্টি হওয়ায়, মহারাজাব দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারের ক্ষমতা কমিয়া গেল। ইংরেজ শাসন প্রণালীও রীতিমত প্রচলিত হয় নাই। এ সময় রাজ্যের সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলতা দৃষ্ট হইতে লাগিল। চারিদিকে চুঁরি ডাকাইতী এত প্রবল হইয়া উঠিল যে প্রজার ধন প্রাণ রক্ষা হওয়া কঠিন হইল। ডাকাইতগণ মধ্যে পণ্ডিতা, কার্ত্তিকা, ফতু এবং জিতু প্রধান। এই দস্যুদল মধ্যে ব্রাহ্মণ ভদ্রও ছিল। চলনবিল এই দস্যুদলের আবাস স্থান ছিল। এই চলনবিলের স্থানে স্থানে দস্যুদলের ঘাঁটী ছিল। চলনবিলই দস্যুদলের দস্যুবৃত্তির প্রধান স্থান ছিল। ইহাদের অত্যাচারে প্রজাগণ অত্যন্ত বিপদাপন্ন হইয়া পড়িল। পুলীশ ও জমিদারের নাএব ও গোমস্তাদের নিকট লোকে দলে দলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইল। চোর ডাকাইতেরা অর্থ দ্বারা পুলীশ ও জমিদারের নাএব ও গোমস্তাকে বশীভূত করিল। এইরূপে চোর ডাকাইতের দল ক্রমে পুষ্ট হইতে লাগিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুকদার ও অন্যান্য অনেক ব্যক্তি চুরির দ্রব্যাদি গোপনে নিজ বাটীতে রাখিলেন এবং তাহারা "থানীদার" বলিয়া পরিচিত হইল। এই প্রকারে সলপ ও রাজসাহী প্রদেশের অন্যান্য গ্রামের অনেক ব্যক্তি চোর ডাকাইতের অর্থ দ্বারা বহুতর ধনসঞ্চয়

(1) 'We approve your having put the Raja in confinemen conformaly to the Regulations and of your having vested the management of his estate a Ramjimal, to whom you will afford any necessary assistance to secure the realization of the sums now remaining outslanding'- The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review

করিল। (১) রাজসাহী প্রদেশের বর্ত্তমান কোন কোন ধনী ও সম্ভ্রান্ত বংশের ধন সম্পত্তির মূল অনুসন্ধান কবিলে ইহা অনুমিত হইবে যে, দস্যুবৃত্তিই তাহাদের সম্পত্তির কারণ। মাজিস্ট্রেট সাহেব নূতন স্থানের রীতি নীতি জানেন না। সুতরাং তাঁহাকে তাহার সেরেস্তাদারের উপর সমুদয় বিষয় নির্ভর করিতে হইল। সেকালে সেরেস্তাদারই প্রকৃত জেলার মাজিস্ট্রেট হইয়া উঠিলেন। যখন সেবেস্তাদার জেলার সর্ব্বময়কর্ত্তা,তখন চোর ডাকইতের শাসনের আশা রহিল না। কলিকাতাব সারকিট কাছারীর তৃতীয় জজ স্ট্রেচী সাহেব উল্লেখ করেন যে, সেরেস্তাদার এবং বহিমউদ্দীন নামক এক ব্যক্তি মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে অধিকার করেন এবং তাঁহাদেব প্রজা বলিয়া, চোর ও ডাকাইতকে রাজদণ্ড হইতে রক্ষা কবেন (২) যাহারা রক্ষক তাহাবাই ভক্ষক হইল। দেশ রক্ষার উপায় রহিল না। সে সময় পুলীশের দারোগা, জমাদার, ববকন্দাজ, এবং কাছারীর আমলা দেশ রক্ষক। কিন্তু তাঁহারা উৎকোচ গ্রহণ কবায়, চোব ডাকাইতের দৌরাত্ম্য ক্রমে বৃদ্ধি পাইল। (৩) এসকল কথা গবর্ণমেন্টের প্রধান কর্ম্মচারীদের কর্ণ গোচব হইতে বিলম্ব হইল না। এক জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য এক সাহেব নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার কার্য্য এত বেশী যে তিনি একা সুচারুরূপে সকলদিকে লক্ষ্য বাখিতে পাবেন না। সুতরাং আমলাদের উপর নির্ভর না কবিয়া উপায় হয় না এবং পুলীশের কার্য্য উচিত রূপ পর্য্যবেক্ষণ করিবার সময় হয় না। প্রজাগণও পুলীশেব অত্যাচার সহ্য অপেক্ষা চোর ডাকাইতেব অত্যাচারই সহ্য করা সঙ্গত মনে কবিল। বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ঠিকই বলিযাছেন যে— "মফস্বল কাছারীর প্রধান বিচারকই আমলা, যেহেতুক নূতন বিচারককে আমলাবা আপন ইচ্ছামত চালায়"। (৪) আমলাদের ও পুলীশের কর্ত্তব্য কর্ম্মের ক্রটিতে দেশে চুরি ডাকাইতির দমন না হওয়ায়, রাজ্য শাসনের জন্য এবং প্রজাগণকে অত্যাচার হইতে বক্ষা কবিবার জন্য গবর্ণমেন্ট কৃতসঙ্কল্প হইলেন। নানা দিক হইতে গবর্ণমেন্ট রিপোর্ট চাহিতে লাগিলেন যে কি উপায় অবলম্বন করিলে প্রজাগণকে চোর ডাকাইতের অত্যাচার হইতে রক্ষা করা যায়। চোব ডাকাইতের অত্যাচার হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে কলিকাতা "সারকীট কোর্টের" জজ মিঃ স্ট্রাচী সাহেব গবর্ণমেন্ট সমীপে এই প্রস্তাব করিলেন যে চোর ডাকইতেব সদ্দাবগণকে কঠিন দণ্ড প্রয়োগ করিলে, তাহাদের অনুচর ডাকাইতদের প্রভেদ না করিয়া একবাবে সমুদয়কে দণ্ড করা সঙ্গত নহে; কিন্তু কেবল চোর ডাকাইতকে দণ্ড প্রয়োগ করা অপেক্ষা চোব ডাকাইতী দমন জন্য উপায়লম্বন করাই যুক্তিসিদ্ধ; আবার কেবল লিখা পড়াব দিগে দৃষ্টি না রাখিয়া, স্থান পাত্র বিবেচনা করিয়া ফৌজদারী বিচাব করিবার উপযুক্ত ব্যক্তিকে ফৌজদাবী আদালতের বিচারক নিযুক্ত কবাই সঙ্গত। এই প্রস্তাব অনুমোদনে প্রজাগণকে চোর ডাকাইতেব অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য গবর্ণমেন্ট ক্রমে কৃতকার্য্য হইতে লাগিলেন। শেষে কোম্পানীর সুশাসন বলে চোর ডাকাইতের দমন হইল এবং প্রজাগণও সুস্থির হইল।

(1) "Several families in Sulap and other villages to Rajshahi accumulated wealth by Thungidari "- The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review

(2) "It appears that the Sariahtadar and one Rahim Uddin monopolised magisterial power and sheltered several Sardar dacoits, who were their ryats '- The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review

(3) "We see corruption pervading every grade of the Police establishments the Darogus, the Jamadars, the Muharirs, the Barkandazes, and Chaukidars We see the Magistrate was over whelmed with w rk The consequence was the people preferred quite submission to extortion and robbery as a lesser evil than the operation of the Police "- The Rajas of Rajshahi Calcutta Review

(4) Referring to this evil, Babu Dwarka Nath Thakur in his evidence before the Police Committee says, "The first and principal Judges of the Mufasal Courts are the Amlas, who lead the in experienced Judges as they pleased "-The Rajas of Rajshahi,Calcutta Review

"ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী" গঠনের সময় হইতে রাজ্য শাসন প্রণালী– ইংলন্ডেশ্বরী মহারাণী এলিজেবেথ ১৬০০ খৃস্টাব্দে পূর্ব্ব মহাদেশে বাণিজ্য করিবাব জন্য লন্ডন নগরের এক দল বণিককে সনন্দ দেন। এই সনন্দ অনুসারে "লন্ডন ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী" নামে এক বণিক সমিতি সংস্থাপিত হয়। আবার ১৬৯৮ খৃস্টাব্দে "ইংলিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী" নামে এক ইংরেজ বণিক সমিতি স্থাপিত হয়। কিন্তু মহাবাণী এনের রাজত্বকালে ১৭০৮ খৃস্টাব্দে এই দুই দল বণিক একত্রিত হইয়া 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী' নাম ধাবণ করে। এইরূপে দুই দল বণিক একত্রিত হইবাব পূর্ব্বে, ১৬১৩ খৃস্টাব্দে ইংলন্ডেব বণিক সমিতি ভারতবর্ষান্তর্গত সুরাট নগবে কুঠী নির্ম্মাণ জন্য দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে একখানি সনন্দ প্রাপ্ত হন। ইহাই "ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ভারতে স্বাধীন রাজত্ব বিস্তারের সূত্রপাত। এই কোম্পানী স্বাধীনভাবে বাজত্ব বিস্তাব করিবার পূর্ব্বে বণিক সমিতি মোগল সম্রাটেব অধীন থাকিযা, তাঁহাকে কব দিতেন, তাঁহার আদেশ প্রতিপালন কবিতেন এবং কুঠী নির্ম্মাণ কবিয়া ব্যবসা বাণিজ্যই চালাইতেন। কুঠীগুলি মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইলেও, ইংলন্ডেশ্ববের আদেশ মত বণিক সমিতি নিজ আইন প্রচলিত কবেন এবং নিজ কর্ম্মচাবীদের ও কোম্পানীর দখলী ভূমিব অধিবাসীদের কোম্পানীর আইন অনুসারে বাধ্য করিতেন। ইহাতে মোগল সম্রাটের কোন আপত্তি ছিল না। তত্রাচ সে সময়ে কোম্পানীর শাসন প্রণালী ব্যবস্থাহীনই ছিল মহাবাণী এলিজেবেথ প্রদত্ত সনন্দ সময় হইতে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশী যুদ্ধেব সময় পর্য্যন্ত, কোম্পানীব শাসনপ্রণালীর বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় না। কিন্তু পলাশী যুদ্ধের পর হইতে মোগল সম্রাট সাহ আলম নিকট হইতে ১৭৬৫ খৃস্টাব্দে কোম্পানী বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার "দেওয়ানী" প্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত, অর্থাৎ এই আট বৎসরে 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর' আইন কানুনের অনেক পরিবর্ত্তন হয়। কুঠী সমুদয়ের কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ জন্য, কোম্পানীর স্বত্ব রক্ষা জন্য, এবং ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতি নিবাবণ জন্য, কোম্পানী সংশোধিত নিজ আইন ও নিয়ম প্রচলিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন আইন বা ব্যবস্থা ইংলন্ডেব ব্যবস্থাব বিরুদ্ধে হইবার যো ছিল না। ১৭২৬ খৃস্টাব্দে ইংলন্ডেশ্বর প্রথম জর্জেব সময় বাঙ্গালা, মাদ্রাজ ও বোম্বে এই তিন প্রেসিডেন্সীতে "মেওর কোর্ট" নামে বিচাবালয় স্থাপিত হইল। এই কোর্টে সর্ব্ব প্রকার দেওয়ানী বিচার হইত এবং উইল আদিও প্রবেট হইত। এই কোর্টেব আদেশের অন্যথায় প্রত্যেক প্রেসিডেন্সীব গবর্ণরের নিকট আপীল এবং গবর্ণরেব আদেশেব বিরুদ্ধে আপীল বিলাতে রাজার সমীপে হইত। এই "মেওব কোর্ট" ইংলন্ডস্থিত "কোট অব ডাইবেক্টরগণের" অধীন ছিল। ভাবতের বিচারালয়ের কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ জন্য কোর্টের বা ডাইরেক্টরেবা আইন, নিয়ম ইত্যাদি করিয়া দিতেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এইরূপ আইন ও ব্যবস্থা প্রভৃতি ছিল এবং ইহা মোগল সম্রাটের অনুমোদিত ছিল। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট তারিখে লর্ড ক্লাইভ মোগল সম্রাট সাহ আলমের নিকট হইতে কোম্পানীর পক্ষে বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার "দেওয়ানী" সনন্দ গ্রহণ করেন। এই সনন্দ অনুসারে "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী" এই তিন প্রদেশের বাজস্ব আদায় করিবেন এবং দেওয়ানী ও রাজস্ব সম্বন্ধীয় বিচাব করিবেন। কিন্তু ফৌজদারী বিচার নবাবের হস্তে রহিল। এই ফৌজদাবী বিচারের ব্যয় ভার কোম্পানীকেই বহন করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত বর্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা কর স্বরূপ মোগল সম্রাটকে দিতে হইবে। ৬ বৎসর যাবৎ ঐ ফৌজদারী বিচার নবাবের হস্তে এবং দেওয়ানী বিচার "দেওয়ানের" হস্তে অর্পিত ছিল। ইহাতে এই ফল হয় যে কিছু দিন রাজ্যে প্রকৃত বিচার ছিল

না— অরাজকতাই হইয়াছিল। অরাজকতা দুই প্রকার— (১) রাজার অভাবে, (২) রাজার বা রাজকর্ম্মচারীর অবিচারে। রাজার বা রাজকর্ম্মচারীর অবিচারে যে অরাজকতা হয়, তদ্দ্বারা কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পের যে কেবল ক্ষতি হয় এমত নহে; অরাজকদেশে মনুষ্যের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, ধর্ম্ম, ক্রিয়া কলাপ দস্যুর ন্যায় হইয়া দেশের শ্রীনষ্ট হয়। মফস্বলে ফৌজদারী বিচার মুসলমান আইন অনুসারে মুসলমান কর্ম্মচারী দ্বারা নির্ব্বাহিত হইত। কিন্তু শহরে নবাব, তাঁহার নাএব, ফৌজদার, কোতওয়াল প্রভৃতি দ্বারা ফৌজদারী বিচার নির্ব্বাহ করিতেন। কলিকাতা, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামে এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের বিচার কার্য্য সাহেবের তত্ত্বাবধানে ছিল; কিন্তু বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার অবশিষ্ট স্থানের কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য দুই জন দেশীয় দেওয়ান ছিল— একজন মুরশিদাবাদে এবং একজন পাটনায় থাকিত। এই দুই জনের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ জন্য দুই স্থানে দুই সাহেব "রেসিডেন্ট" ছিলেন। "এই সময়েও জমিদারগণ দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার করিতেন; কেবল প্রাণ দন্ডেব উপযোগী মোকদ্দমা নবাব নাজিমের নিকট রিপোর্ট করিতে হইত"। (১) অতএব নাটোর রাজ্যের ঐরূপ দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারের ক্ষমতা ছিল। এসময় "পিনাল কোড," "ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোড" প্রভৃতি দণ্ডবিধির আইন কিছু ছিল না। নাটোর রাজার কারাগার ছিল, সরাসরী বিচার করিয়া দণ্ডের যোগ্য হইলে, কোন অপরাধী আর্থিক দণ্ডে দণ্ডিত হইত এবং কোন অপরাধী কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইত। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ওয়ারণ হেষ্টীংস রাজ্য শাসন সম্বন্ধীয় নিম্নলিখিত নিয়ম প্রচলিত করেন ঃ—

(১) নাএব দেওয়ানের পদ উঠাইয়া জেলায় জেলায় এক একজন সাহেব জেলার কর্ত্তা হইল।

(২) একটী সারকীট কমিটী স্থাপিত হইল; গবর্ণর এবং ৪ জন মেম্বর দ্বারা এই কমিটী গঠিত।

(৩) মপস্বলে দেওয়ানী আদালত স্থাপিত হইল; এই দেওয়ানী আদালত জেলার কালেক্টর সহেবের অধীন। এই কালেক্টর সাহেবই জজ, মাজিস্ট্রেটের কার্য্য করিবেন।

(৪) সদর দেওয়ানী আদালত স্থাপিত হইল। মফস্বল আদালতের ৫০০৲ টাকার অতিরিক্ত দাবীর মোকদ্দমার এই আপীল আদালত।

(৫) এক এক জেলায় এক একটী ফৌজদারী আদালত স্থাপিত হইল। প্রত্যেক জেলায় একটী কাজী, কালেক্টর সাহেবের অধীন থাকিয়া, ফৌজদারী কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। একজন মুফতী এবং দুই জন মৌলবী কাজীকে সাহায্য করিবে।

(৬) মুরশিদাবাদে "সদর নিজামত আদালত" স্থাপিত হইল। ইহার অধ্যক্ষ একজন দারোগা থাকিবে। ঐ দাবোগাকে একজন মুফতী এবং দুই জন মৌলবী সাহায্য করিবে। এ আদালতে জেলার ফৌজদারী আদালতে বিচারের পুর্ণর্ব্বিচার হইবে। নবাব নাজীমের তত্ত্বাবধানে এই "সদর নিজামৎ আদালত" স্থাপিত হয়।

এইরূপেও রাজ্যশাসন সুচারু রূপে নির্ব্বাহিত হইতেছিল না। কোম্পানীর অধীন কর্ম্মচারীরা প্রজার প্রতি অত্যাচার ও দৌরাত্ম্য করিয়া অথবা প্রচুর ধন সঞ্চয় করিয়া স্বদেশে গমন করিতে ছিলেন। ইহাঁরা সর্ব্বসাধারণের অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। এই সকল ভারতের

(1) "In the provinces the Zemindars exercised civil and criminal Jurisdiction over their several districts. A report was made to the Nazim in capital cases only "- Cowell's Tagore Law Lecture, 1872, quoted from the student's guide to Law Examinations, by Babu bejoy Kesab Miter B.L.

অত্যাচারের গল্প ইংলন্ডের পার্লেমেন্ট নামক মহাসভা শুনিতে পাইলেন। ভারতে কোম্পানীর নূতন লব্ধ রাজ্য উত্তমরূপে শাসন হইতেছে না এবং কর্ম্মচারীর দোষে কোম্পানীর অনেক দুর্নাম হইতেছে, এসকল কথাও পার্লেমেন্ট জানিতে পারিলেন। প্রজার দুঃখ নিবারণ করিতে না পারিলে, রাজ্যরক্ষা হওয়া কঠিন। কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা বা তাঁহাদের আত্মীয়েরা প্রজার প্রতি দৌরাত্ম্য করিয়া স্বার্থ-সাধন করিতে না পারে, ইহার জন্য পার্লেমেন্ট কৃতসংকল্প হইলেন। (১) ভারতের প্রজার দুঃখ নিবারণ এবং রাজ্যে সুশাসন সংস্থাপন জন্য ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে "রেগুলেটীং এক্ট" (Regulating Act) নামে বিলাতে একটী আইন প্রচলিত হইল। এই বিধান অনুসারে বাঙ্গালার গবর্ণর ভারতবর্ষের "গবর্ণর জেনারেল" হইলেন এবং চারজন মন্ত্রী তাঁহাকে সাহায্য করিবেন। ইহাই ভারতের সুপ্রীম গবর্ণমেন্ট" হইল। ইংলন্ড স্থিত "কোর্ট অব ডাইরেক্টরগণের" অধীনে এই "সুপ্রীম গবর্ণমেন্ট হইল। এই "সুপ্রীম গবর্ণমেন্ট" আইন কবিবেন এবং জরিমানা আদি অর্থ দণ্ডেরও ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। কিন্তু এই আইন ও ব্যবস্থা 'সুপ্রীম কের্টের' অনুমোদিত না হইলে তদনুসারে কার্য্য হইবে না। (২) একজন প্রধান জজ এবং অপর তিনজন সহকারী জজ বিলাত হইতে নিযুক্ত হইয়া ভারতে আইসেন। ইহাঁবাই চারিজনে কলিকাতায় 'সুপ্রীম কোর্টের' বিচার কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। এই ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের বিধানে একটী দোষ লক্ষিত হইল। 'সুপ্রীম কাউন্সিল' এবং 'সুপ্রীম কোর্ট'— দুইটারই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক্ষমতা, আবার প্রত্যেকের ক্ষমতা বিশদরূপে নির্দিষ্ট করা ছিল না। ইহাতে দুটীতেই দ্বেষ ও ঈর্ষা উপস্থিত হইল। সুপ্রীম কোর্টের জজেরা সুপ্রীম কাউন্সিলের প্রতি ক্রমে শত্রুতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। সুতরাং বিচারে অত্যাচার ও দৌরাত্ম্য হইতে লাগিল। এই রূপে ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৮১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, আটবৎসর, সুপ্রীম কোর্টের অত্যাচার, অবিচার, দৌরাত্ম্য প্রসিদ্ধ ছিল। এই আটবৎসর 'ভয়াবহ রাজত্ব' বলিয়া ইতিহাসে পরিচিত হইয়াছিল। (৩) রাজা নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড এবং ঢাকার ফৌজদারী আদালতের দেওয়ানের অপমান এবং গ্রেপ্তার প্রভৃতি অত্যাচার সুপ্রীম কোর্টের অবিচারের জাজ্বল্যমান্ প্রমাণ এবং সুপ্রীম কোর্টের সহিত সুপ্রীম কাউন্সিলের বিবাদের ফল। এমতাবস্থায় দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকের ধন, প্রাণ, সম্মান রক্ষা হওয়া কঠিন হইয়া উঠিল। ১৭৮১ সালের আইনে 'গবর্ণর জেনারেল' স্বাধীন হইলেন এবং

---

(1) "A variety of circumstances tended to draw the attention of the English public to the confused state of the Indian affairs. The unpopularity of the retired servants of the Company, their wealth and ostentation attracted attention and led people to believe that their wealth was due to crimes and oppression Tales of cruelty and appression roused English Statesmen to bring the authority of Parliment into action to control the excesses to their countrymen abroad, and to secure some measure of proteetion and good Government to the teretories they had acquired A commitee of Seciecy was formed in the House of Commans, in 1772, to carry out the ganeral demand for investigation The English Government determined to interfere directly with the authority of the Company, and to assame the exercise of the sovereign powers conceded by the Mogul Emperor In 1773, the committee reported that the subjects derived little protection or security from the Coures of Justice established in Bengal, and great oppression prevalled Accordingly, in the same year, an Act of Parliament, known as the Reguluting Act, was passed for the better management of the Company's affairs in India as well as in Europe "- Cowell's Law Lacture II, 1872

(২) সুপ্রীমকোর্টের আইন প্রস্তুতের সহিত সংস্রব না থাকিলে বিবাদের সম্ভাবনা ছিল না।

(3) "The history of the first eight years of the supreme Court is marked with violence, oppression and kisrule The period was indeed a Reign of Terror The Court carried all its mensures with a high hand, in defiance of the Executive Government, and thereby entailed the most disastrous consequences upon the country."- Cowell's Lecture Section, II, 1872, quoted from the student's guide to Law Examination, by Babu Bejoy kesab mira B L

রাজস্ব সম্বন্ধীয় কোন কার্য্যে সুপ্রীম কোর্টের আর কোন ক্ষমতা রহিল না। গবর্ণর জেনারেলের মন্ত্রী সভায় যে সকল আইন পাশ হইবে তাহার এক খণ্ড নকল ইংলান্ডের সম্রাটের ষ্টেট সেক্রেটরী সমীপে এবং আর এক খণ্ড প্রতিলিপি ইংলন্ডস্থিত 'কোর্ট অব ডাইরেক্টরগণ' সমীপে পাঠাইতে হইবে। দুই বৎসর মধ্যে ঐ আইন রদ না হইলে, আইন বিধিবদ্ধ হইয়া কার্য্যে পরিণত হইবে। এই বিধানে "সুপ্রীম কোর্ট" কর্ত্তৃক কারাগারে নিহিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ খালাস পাইল এবং দেশে শান্তি স্থাপন হইল। এই সময় হইতেই রাজ্যে সুশাসন বিস্তৃত হইল এবং সুবিচারের সূত্রপাত হইল। কিন্তু ১৭৮১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কেবল যুদ্ধ বিগ্রহ, দাঙ্গা হাঙ্গামা রাজস্ব সম্বন্ধীয় বন্দোবস্তের গোলযোগে, নূতন সমাজ গঠন প্রভৃতি কার্য্যে কোম্পানীকে ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল। অতএব ১৭৮১ খৃষ্টাব্দ হইতে কোম্পানীর রাজকার্য্যের সুশৃঙ্খলা হইল।

১৮২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নাটোরে রাজসাহী জেলার সদর কাছারী ছিল। উপরের প্রণালী অনুসারে নাটোরে রাজ্যশাসন কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। হেষ্টিংসের পর লর্ড কর্ণওয়ালীশের রাজত্ব সময়ে, রাজ্য-শাসন প্রণালী অনেক পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত হয়। লর্ড কর্ণওয়ালীশ জমিদারগণের সহিত প্রসিদ্ধ "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" সম্পাদিত করেন। এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় অর্থাৎ ১৭৯৩ সাল পর্য্যন্ত নাটোর রাজার কমবেশী, স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে ফৌজদারী বিচারের ক্ষমতা ছিল। ইহার পর হইতেই নাটোর রাজাদের ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচারের ক্ষমতা একবারে রহিত হইল এবং রাজার কারাগার উঠিয়া গিয়া কোম্পানীর কারাগার স্থাপিত হইয়াছিল। কোম্পানী একজন সাহেবকে জজ, কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করিলেন। এক জনের হস্তে জেলার যাবতীয় কার্য্যের ভার অর্পিত হওয়ার কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইবার সম্ভাবনা কোথায়? একজনে যাহা নির্ব্বাহ করিতে পারে তদপেক্ষা অনেক বেশী কার্য্য উপস্থিত হইতে লাগিল। তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে থাকিয়া কাজীর কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ, ক্ষুদ্র অপরাধীদের সরাসরী বিচার করিয়া কারাগারে প্রেরণ বা অর্থদণ্ড করিতেন। কিন্তু নরহত্য, ডাকাইতি প্রভৃতি গুরুতর অপরাধে অপরাধীদের কলিকাতা "সারকিট কোর্টে" অর্পণ করিতেন। তিনি কালেক্টরের পদে রাজস্ব আদায় সম্বন্ধীয় যে সকল কার্য্য তাহাই নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি জজের পদে দেওয়ানী বিচারের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন এবং তাঁহার অধীন বাঙ্গালী মুন্সেফের বিচারের উপর অধিকাংশ সময় নির্ভর করিতেন। এক ব্যক্তিকে নানাবিধ বহুতর কার্য্য করিতে হয়; আবার তিনি দেশীয় ভাষা ও রীতি নীতিতে অনভিজ্ঞ। এমত স্থলে দেশ প্রকৃত রূপ শাসন না হইয়া অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। নাটোরও ক্রমে অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিল। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে নাটোর হইতে জেলা, পদ্মানদীর তীরে রামপুর বোয়ালীয়ায় উঠিয়া গেল। ক্রমে জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, কলেক্টরের কার্য্য নির্ব্বাহ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি এবং জজের অধীনে সবজজ, ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে বাঙ্গালী ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট, কালেক্টরের অধীনে বাঙ্গালী ডেপুটী কালেক্টর নিযুক্ত হওয়ার শাসন কার্য্য ক্রমে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে লাগিল। কিন্তু নাটোর রাজগণ ক্রমে যে হীন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই অবস্থাতেই রহিলেন। আবার জেলার অপর জমিদারগণেরও কেবল প্রজার নিকট নির্দ্ধারিত রাজস্ব আদায় ভিন্ন ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচারের ক্ষমতা রহিল না।

মহারাজা রামকৃষ্ণের তপস্যা– রামকৃষ্ণ রাজসাহী রাজ্যের রাজা হইয়াও তান্ত্রিক মতের ব্রহ্মচারী ছিলেন। তাঁহার সংসারে আসক্তি ছিল না। তিনি যদৃচ্ছা লাভে সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি সাংসারিক দুঃখেও আনন্দময় ছিলেন। তিনি রাত্রিকালে তান্ত্রিকমতে শ্মশানে জপ তপ করিতেন। ভোলা তাঁহার উত্তর সাধক ছিল। করতোয়া নদীর অনতিদূরে ভবানীপুর নামক গ্রাম ৫১ পীঠ বা

তীর্থ স্থানের একটীস্থান। ভবানীপুর সেরপুর হইতে চারি ক্রোশ দক্ষিণ। সাধক প্রবর মহারাজা রামকৃষ্ণ এই স্থানে তপস্যা করিতেন। এখন পর্য্যন্ত তাঁহার যজ্ঞকুণ্ড, তপস্যাসন ও পঞ্চমুণ্ডি ভবানীপুরে বিদ্যমান আছে। দিঘাপতিয়ার নিকট বাগসরও তাঁহার তপস্যা— স্থান ছিল।

মহারাজা রামকৃষ্ণের উত্তরাধিকারী– মহারাজা রামকৃষ্ণ দুই পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। জ্যেষ্ঠের নাম বিশ্বনাথ এবং কনিষ্ঠের নাম শিবনাথ।

বিশ্বনাথ ও শিবনাথ– মহারাণী ভবানীর সময়ে নাটোর রাজ্য বঙ্গদেশের মধ্যে একটী অতি বৃহৎ বিস্তৃত রাজ্য ছিল। মহারাজা রামকৃষ্ণের সময়ে সেই বৃহৎ রাজ্যর সমস্তই ধ্বংস হইয়া অতি অল্প অবশিষ্ট থাকে। দেবোত্তর ভূমি সমস্তই ছিল। বিশ্বনাথ পিতার ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিকারী হইলেন এবং শিবনাথ দেবোত্তর ভূমি অধিকার করিয়া সেবাইত রাজা হইলেন। এসময় হইতে বড় তরফ ও ছোট তরফ নামে নাটোর রাজবংশ পরিচিত হইল। বিশ্বনাথ বড় তরফের এবং শিবনাথ ছোট তরফের রাজা হইলেন।

বিশ্বনাথ– বিশ্বনাথের তিন স্ত্রী— (১) রাণী কৃষ্ণমণী, (২) রাণী গোবিন্দ মণী, (৩) রাণী জয়মণী। বিশ্বনাথের জীবনের প্রধান ঘটনা তাঁহার শাক্ত ধর্ম্ম হইতে বৈষ্ণব ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন। তিনি এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা শক্তির উপাসনা করিতেন, কিন্তু নিজে বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। রাণী কৃষ্ণমণী ও রাণী গোবিন্দমণী তাঁহাদের পতির অনুকরণ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। কিন্তু রাণী জয়মণী শক্তি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে অস্বীকার করিয়া মুরশিদাবাদে বাস করিতে লাগিলেন। রাজা বিশ্বনাথ অপুত্রক পরলোক গমন করিলেন। কিন্তু মৃত্যুকালে দত্তক গ্রহণের "অনুমতি পত্র" দিয়া গেলেন। অনুমতি পত্রানুসারে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে রাণী কৃষ্ণমণী গোবিন্দ চন্দ্রকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিলেন। আবার রাণী জয়মণীও এক দত্তক পুত্র রাখিলেন।

গোবিন্দ চন্দ্র– ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে রাজা গোবিন্দ চন্দ্র পিতৃ রাজ্য অধিকার করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে বেশি দিন রাজ্যভোগ করিতে বিধাতা দিলেন না। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করিলেন। তিনি আসন্নকালে তাঁহার স্ত্রী রাণী শিবেশ্বরীকে দত্তক পুত্র রাখিবার "অনুমতিপত্র" এবং তাঁহার মাতা রাণী কৃষ্ণমণীকে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ জন্য "কর্ত্তৃত্ব পত্র" রেজস্টিরী করিয়া দিলেন।

রাণী কৃষ্ণমণী– রাজা গোবিন্দ চন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার মাতা রাণী কৃষ্ণমণী নাটোর রাজ্যের ভার গ্রহণ করিলেন। রাণী কৃষ্ণমণী অতি বুদ্ধিমতী ছিলেন এবং তাঁহার রাজকার্য্য নির্ব্বাহের উপযুক্ত ক্ষমতা ছিল। যে সকল জমিদারী ধ্বংস হইয়া মোকদ্দমা চলিতেছিল, তাহাদের মোকদ্দমা জয়ী হইয়া নিজ অধিকার ভুক্ত করিলেন। তাঁহার বুদ্ধি কৌশলে নাটোর রাজ্যের কিঞ্চিৎ পরিমাণে নষ্টোদ্ধার হয়।

রাজা গোবিন্দ নাথ– রাণী শিবেশ্বরী অনুমতি পত্রানুসারে গোবিন্দ নাথকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিলেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে গোবিন্দ নাথ পিতৃ রাজ্য অধিকার করিলেন। মাতা ও পুত্রে মনান্তর হইয়া বিবাদ আরম্ভ হইল। রাণী শিবেশ্বরী দত্তক পুত্রের অসিদ্ধির মোকদ্দমা রাজসাহীর জজ আদালতে উপস্থিত করিলেন। রাজসাহীর জজ মহাত্মা লুইস জ্যাক্সন দত্তক পুত্র অসিদ্ধ করিলেন। মহামান্য হাইকোর্ট জেলার জজের আদেশ রহিত করিয়া দত্তক পুত্র সিদ্ধ করিলেন। প্রিভী কাউন্সিল হাইকোর্টের আদেশ স্থির রাখেন। ইংলন্ড হইতে এই শুভ সংবাদ তারযোগে আসিবার পূর্ব্বেই রাণী কৃষ্ণমণী ও রাজা গোবিন্দ নাথের মৃত্যু হয়। ইহাঁরা কেহই পরিশ্রমের ফল ভোগ করিতে পারেন নাই। ইহা সুখের বিষয় যে রাজা গোবিন্দ নাথের মৃত্যুর সময় তাঁহার

মাতার সহিত সদ্ভাবের চিহ্ন দৃষ্ট হয়। আদিতে এই সদ্ভাব থাকিলে মাতার সহিত পুত্রের বিবাদ হইয়া অশান্তির কারণ কখনই দেখা যাইত না।

রাজা গোবিন্দনাথ বিনয়ী ও নম্র ছিলেন। তিনি পরের দুঃখ মোচনে মুক্ত-হস্ত ছিলেন। তাঁহাকে সকলেই ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। রাণী কৃষ্ণমণীর ন্যায় তিনিও জমিদারী কার্য্যে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। কিন্তু তাঁহার অকাল মৃত্যুতে সকলেই দুঃখিত হন। মাতার সহিত যে মনান্তর সেই অশান্তিই বোধ হয় তাঁহার অকাল মৃত্যুর কারণ।

মহারাজা জগদিন্দ্র নাথ– রাজা গোবিন্দ নাথের কোন পুত্র ছিল না। অনুমতি পত্রানুসারে তাঁহার পত্নী মহারাজা জগদিন্দ্রকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। তিনি রাজসাহী কলেজে শিক্ষিত হইয়া কৃতবিদ্য হন এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পিতৃরাজ্য অধিকার করেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও বিচক্ষণতা গুণে তিনি বাঙ্গালা কাউন্সিলের মেম্বর পদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই বর্ত্তমান মহারাজা নাটোর রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বৃটীশ রাজ সম্মান গ্রহণ করিতেছেন এবং বিজ্ঞ মন্ত্রিগণের সাহায্যে সুচারুরূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন।

রাজা শিবনাথ– শিবনাথ মহারাজা রামকৃষ্ণের দ্বিতীয় পুত্র এবং বিশ্বনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। তিনি ছোট তরফের প্রথম রাজা। ইহাঁর নয়টী বিবাহ, কিন্তু পুত্র সন্তান হয় নাই। কেবল তাঁহার একমাত্র কন্যা ছিল। শিবনাথের হস্তে সমগ্র দেবোত্তব ভূমি অর্পিত হয়। ইহাঁরই দত্তক পুত্র রাজা আনন্দ নাথ।

রাজা আনন্দনাথ– আনন্দনাথ পিতৃ দেবোত্তর রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, অতি সুচারুরূপে স্বীয় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। তিনি বুদ্ধিমান কিন্তু সরলভাবে সকলের সহিত ব্যবহার করিতেন না বলিয়া পরিচিত। তিনি ১০,০০০ টাকায় রামপুর বোয়ালীয়াতে পুস্তকালয় জন্য একটী সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেন এবং বহু অর্থ দ্বারা নানাবিধ পুস্তক ক্রয় করিয়া দেন। এই পুস্তকালয় "আনন্দনাথ লাইব্রেরী" নামে পরিচিত। এই মহৎ কার্য্যের জন্য তিনি গবর্ণমেন্ট হইতে "রাজা বাহাদুর" এবং তদপর "সি,এস্ আই" উপাধি প্রাপ্ত হন। এ পর্য্যন্ত রাজসাহীতে কোন রাজা এই শেষোক্ত প্রণালীর উপাধি প্রাপ্ত হন নাই। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার চারি পুত্র ও দুই কন্যা ছিল। এই চারটী পুত্র মধ্যে জ্যেষ্ঠ চন্দ্রনাথ বুদ্ধিমান এবং সুপন্ডিত ছিলেন। ইনি ইংরাজী পারস্য, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করেন। রাজা চন্দ্রনাথ ইংরাজীতে একজন সুলেখক ছিলেন। তাঁহার পিতা বর্ত্তমানে অল্প দিনের জন্য ডেপুটী মাজিস্ট্রেটের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার পান্ডিত্যগুণে তিনি "রাজা বাহাদুর" উপাধি গবর্ণমেন্ট হইতে প্রাপ্ত হন এবং "ফরেণ আফিশে" মহামান্য বড় লাট সাহেব বাহাদুরের অধীনে "আটাচার" পদ প্রাপ্ত হন। দেশীয় ও ইউরোপীয় প্রণালীর শিষ্টাচার ব্যবহারে বাজা চন্দ্রনাথ একজন সুদক্ষ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভ্রাতা কুমুদনাথ ও নগেন্দ্রনাথের অকাল মৃত্যুতে রাজা চন্দ্রনাথ শোক-সাগরে নিমগ্ন হন। এই তিন ভ্রাতাই গত। তাঁহাদের তিন বিধবা পত্নী একত্রে কলিকাতায় বাস করিতেছেন। ইনি বুদ্ধিমান ও তেজস্বী। কিন্তু একমাত্র পুত্রের অকাল মৃত্যুতে তাঁহার জীবনের আশা ও তেজস্বীতা বিলুপ্ত প্রায়। তাঁহার একমাত্র পৌত্র বর্ত্তমান, এখন সেই পৌত্রই রাজার জীবনের সম্পূর্ণ আশা। পৌত্রের মুখ-চন্দ্রিমা দর্শনে রাজার পুত্রশোকের কিয়ৎপরিমাণে হ্রাস হইবারই সম্ভব।

নাটোর রাজবংশের সমালোচনা– প্রায় দুই শত বৎসর হইল নাটোর রাজবংশের অভ্যুদয় হয়। এই কাল মধ্যে প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভবানীর সময়ে নাটোর রাজ্যের উন্নত অবস্থা এবং তাঁহার সময়ই অবনতি ও পতনের সূত্রপাত হয়। কোম্পানীর রাজস্ব অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি এবং

দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের হ্রাস রাজ্যের অবনতির প্রধান কারণ। যে সময় রাজ্যের অবনতি ও পতনের সূত্রপাত হয়, সেই সময় রাজা রামজীবনের ন্যায় একজন সুদক্ষ প্রতাপশালী রাজা এবং দয়ারাম রায়ের ন্যায় একজন অসাধারণ বুদ্ধিমান মন্ত্রীর হস্তে রাজ্যের ভার অর্পিত হইত; তাহা হইলে রাজ্যের পতন এত শীঘ্র হইবার সম্ভব ছিল না। নাটোর রাজবংশের একটী এই বিশেষত্ব দৃষ্টি হয় যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক বেশী প্রতিভা-সম্পন্না ছিলেন। এই বংশে মহারাণী ভবানী এবং রাণী কৃষ্ণমণী যেরূপ বুদ্ধিকৌশলে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আপন আপন নাম বিস্তার করিয়াছেন, সেরূপ রাজা রামজীবন ব্যতীত আর কোন পুরুষ রাজা যশস্বী হইতে পারেন নাই। রাণী কৃষ্ণমণী ও রাণী শিবেশ্বরীর বুদ্ধি কৌশল নিতান্ত সাধারণ ছিল না। নষ্ট রাজ্যের কিয়দংশ উদ্ধার এবং জমিদারীর আয় বৃদ্ধি করাই, তাঁহাদের বুদ্ধি কৌশল ও রাজকার্য্য দক্ষতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। মহারাণী ভবানী ব্রাহ্মণদিগকে এত ব্রহ্মোত্তর ভূমি দান করিয়াছেন; এত পুষ্করিণী খনন করিয়া জলকষ্ট নিবারণ করিয়াছেন এবং এত দেব মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, যে নাটোর বংশ লোপ পাইলেও রাণী ভবানীর নাম ভারতবর্ষ হইতে বিলুপ্ত হইবে না। অক্ষয়কীর্ত্তিই মহারাণী ভবানীকে আজও জীবিত করিয়া রাখিয়াছে।

নবম অধ্যায়
(নাটোর রাজ-বংশ পত্রিকা।)

- কামদেব
  - বামজীবন
    - কালিকা প্রসাদ (কালুকুঙর মৃত্যু)
    - বামকান্ত (দত্তক) (বিবাহ বাণী ভবানী)
      - দুইটী পুত্র (অকাল মৃত্যু) কালী প্রসাদ এক
      - তাবা (কন্যা (বিবাহ রঘুনাথ লাহিড়ী)
      - রামকৃষ্ণ (দত্তক)
        - (বড় তবফ) বিশ্বনাথ ৩ স্ত্রী
          - গোবিন্দ চন্দ্র (দত্তক)
            - গোবিন্দ নাথ (দত্তক)
              - জগদিন্দ্রনাথ (দত্তক)
        - (১) কৃষ্ণমণী (২) গেবিন্দমণী (৩) জয়মণী (মুর্শিদাবাদ বড় নগরেব বাটীতে বাস কবেন)
        - (ছোট তবফ) শিবনাথ ৯ বিবাহ
          - আনন্দনাথ (দত্তক)
            - চন্দ্রনাথ নিঃসন্তান)
            - কুমুদনাথ (নিঃসন্তান
            - নগেন্দ্রনাথ (নিঃসন্তান)
            - যোগেন্দ্র নাথ
              - জীতেন্দ্রনাথ
            - ২ কন্যা
          - এক কন্যা (বিবাহ বলিহারের রাজা রাজেন্দ্রনরাযণ বায়।)
  - রঘুনন্দন
    - ভবানী প্রসাদ (মৃত্যু)
  - বিষ্ণুবাম
    - দেবী প্রসাদ
      - গৌরীপ্রসাদ
        - গঙ্গা প্রসাদ
          - কালীকা প্রসাদ (নিবাস সাতপাড়া)

※ বাণী জয়মণী আট গ্রাম নিবাসী হরিদেবের পৌত্র রামচন্দ্র বাযের সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্রকে দত্তক বাখিয়া হরনাথ নামে অভিহিত কবেন। হরনাথেব পুত্র উমেশচন্দ্র রায়।

※ আটগ্রাম নিবাসী হবিদেব রায়েব পৌত্র কৃষ্ণকিশোর রায়। এই কৃষ্ণকিশোরের দ্বিতীয় পুত্র রাজা গোবিন্দচন্দ্র নামে অভিহিত হন।

※ গ্রন্থকার রাজা কৃষ্ণেন্দ্র বায় বাহাদুব এই বংশ সম্ভূত। ইহাঁর প্রণীত গ্রন্থাবলী, "এখন আসি" "সীতাচবিত", "সুখভ্রম", "স্বভাবনীতি"। পাঠশালাব শিক্ষা ব্যতীত কোন উচ্চ অঙ্গের বিদ্যালয়ে ইনি বিদ্যা শিক্ষা না করিয়া যে এইরূপ গ্রন্থ প্রণযন কবিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার অধ্যবসায়ের ও বিশেষ যত্নের পবিচয। ইনি দরিদ্রের, দুঃখী প্রজার, অনাথা বিধবা রমণীর বন্ধু ছিলেন। "ইনি, প্রজাগণের সহিত, ঠিক আপনার পরিবারস্থ ব্যক্তির ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন।" যথাস্থানে বলিহার রাজবংশ বিবরণ লিখিত হইবে।

দশম অধ্যায়

দিঘাপতিয়া রাজবংশ

দিঘাপতিয়া রাজবংশের উৎপত্তি– দয়ারাম রায় দিঘাপতিয়া রাজবংশের আদিপুরুষ। ইহাঁর নিবাস কলমে ছিল বলিয়া কথিত হয়; এবং পিতার নাম কি জানিবার উপায় নাই। নবাব সরকারের এবং কোম্পানীর সময়ের কাগজ-পত্রে কেবল এইমাত্র জানা যায় যে, তিনি তিলী জাতীয় ছিলেন। ইহা কথিত আছে যে, রাজা রামজীবন জলবিহার উপলক্ষে চলন বিলে যান। সেই সময় তিনি কলমে নৌকা লাগাইলে দুইটী বালক রাজার নৌকার নিকট উপস্থিত হয়। এই দুই বালক মধ্যে এক বালক আমাদের দয়ারাম। দয়ারামের বাল্যকালেই বুদ্ধি ও প্রতিভার লক্ষণ দৃষ্ট হইয়াছিল। বালককে সুলক্ষণসম্পন্ন জানিয়া, রাজা সঙ্গে করিয়া নাটোর রাজধানীতে আনেন। সেই হইতে দয়ারামের ভাগ্য প্রসন্ন হয়। দয়ারাম রায় অসাধারণ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কোন বিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন নাই, কিন্তু তাঁহার বুদ্ধির সীমা ছিল না। যেমন পণ্ডিতেরা পুস্তক পাঠ করিয়া নানা শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হইতে পারিতেন, তেমনই দয়ারাম মনুষ্যের মুখ দেখিয়াই তাহাকে অধ্যয়ন করিতেন এবং তাহার আভ্যন্তরিক সমুদয় বিষয় জানিতে পারিতেন। ফল কথা তিনি মনুষ্যকে বিশেষরূপ চিনিতে পারিতেন। তাঁহার বিষয় কার্য্যের বুদ্ধি অসাধারণ। তাঁহার মন উন্নত এবং মস্তিষ্ক নিতান্ত পরিষ্কার ছিল। তিনি নাটোর বংশের আদি রাজা রামজীবনের একজন ক্ষুদ্র কর্ম্মচারীর পদে প্রথমে নিযুক্ত হন; অবশেষে তিনি নাটোর রাজের প্রধান মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সেই রাজ্যের উন্নতির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। এইরূপ প্রতিভাগুণে ও বুদ্ধিকৌশলে দয়ারাম দিঘাপতিয়া রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করেন।

দয়ারাম রায়ের "রায়রায়ান" উপাধি– যশোহরের অধীন মামুদপুরের জমিদার, সীতারাম মজুমদার বিদ্রোহী হইলে, নবাবের অনুমত্যনুসারে রাজা রামজীবন, দয়ারাম রায়কে সৈন্যাধ্যক্ষ করিয়া পাঠাইলেন। সীতারামের সহিত যুদ্ধ হইল, কিন্তু যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া সীতারাম বন্দী হইল; এবং দয়ারাম তাহাকে বন্দী করিয়া নাটোর রাজধানীতে আনিলেন। অল্পদিন পরে নাটোর রাজকারাগারে সীতারামের মৃত্যু হইল। এই কার্য্যকৌশলে এবং বীরত্বে নবাব দয়াবামের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে "রায়রায়ান" উপাধিতে সম্মানিত করিলেন; এবং রামজীবন পুরস্কারস্বরূপ এবং ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ কতকগুলি ভাল জমিদারী তাঁহাকে দিলেন। এই দিঘাপতিয়া রাজবংশের প্রথম রাজ্যলাভ।

দয়ারামের সহিত রাজা রামকান্তের মনান্তর– নাটোর রাজবংশের ইতিহাসে এবিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ লিখিত হইয়াছে। এস্থলে পুনরায় উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

দয়ারাম রায়, রাজা রামজীবন, রাজা রামকান্ত ও মহারাণী ভবানী– রাজা রামজীবন প্রথমে দয়ারামকে সামান্য কর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত করিয়া, পরে প্রধান মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। রাজা রামজীবন দয়ারামকে তাঁহার বুদ্ধি-কৌশলে ও প্রতিভাগুণে এত বিশ্বাস করিতেন এবং এত ভালবাসিতেন যে দয়ারাম তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। তাঁহার প্রতি এরূপ বিশ্বাস ও সম্মান যে রামকান্তের সহিত রাণী ভবানীর বিবাহের "সম্বন্ধ পত্রে" দয়ারাম স্বাক্ষর করেন এবং

ব্রাহ্মণের ব্রহ্মোত্তরভূমি দানপত্রেও তাঁহারই স্বাক্ষর ছিল। মহারাণী ভবানীও দয়ারামকে সেইরূপ সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন। বৃদ্ধ মন্ত্রী দয়ারামের পরামর্শ বিনা রাণী ভবানী কোন কার্য্য করিতেন না। দয়ারামের জীবিতকাল পর্যন্ত নাটোর রাজবংশের অবনতি ও পতনের সূত্রপাত দৃষ্টি হয় নাই।

দয়ারাম রায়ের রাজ্যলাভ– নবাব ও রাজ রামজীবনের অনুগ্রহে নিম্নলিখিত জমিদারী দয়ারাম অধিকার করেন ঃ—

(১) পবগণা ভাতুড়িয়া, তরফ নন্দকুজা।

(২) তরফ ডুমরাই, এই তরফ ডুমরাইয়ের অন্তর্গত নওখিলা।
নওখিলার কিয়দংশ জেলা বগুড়া এবং জেলা মৈমনসিংহে স্থিত।

(৩) জেলা যশোহরের অন্তর্গত তরফ মাউল কালনা।

(৪) পাবনা জেলার অন্তর্গত তরফ সিলিমপুর।

তরফ ডুমরাই অত্যন্ত লাভের জমিদারী। যে সময় এবট সাহেবকে ইজারা দেওয়া হয়, সে সময় তরফ ডুমরাইয়ের ৩৫০০০ টাকা আদায় ছিল। সাহেবের কৌশলে ক্রমে জমা বৃদ্ধি হয়। রাজা প্রসন্ননাথ রায়বাহদুরের সময় হইতেই ক্রমে জমা বৃদ্ধি হইতে থকে। দাওকোবা নদীর চরের জন্যও অনেক জমা বেশী হয়। এক্ষণে প্রায় দুই লক্ষ টাকা আদায়। দিঘাপতিয়া রাজ্যমধ্যে এরূপ লাভের জমিদারী আর নাই।

দয়ারাম রায়ের পূণ্যকীর্ত্তি– দয়ারামের সময় সংস্কৃতভাষা শিক্ষার জন্য ব্রাহ্মণদের বিশেষ যত্ন ছিল। তিনি অনেক চতুষ্পাঠী সংস্থাপন করেন এবং সেই সকল চতুষ্পাঠী রক্ষার জন্য মাসিক ও বার্ষিক সাহায্যদান করিতেন। ব্রাহ্মণগণের ভবণপোষণ জন্য তিনি অনেক ব্রহ্মোত্তর ভূমি দান করেন এবং প্রজাপুত্রের জলকষ্ট নিবারণ জন্য নিজ জমিদারী মধ্যে অনেক স্থানে পুস্করিণী খনন করেন। জেলা যশোহরের অন্তর্গত মামুদপুরে কৃষ্ণচন্দ্র দেবের, জেলা মুরশিদাবাদের অন্তর্গত বিনোদে গোপাল-দেবের এবং নিজ দিঘাপতিয়া রাজবাটীতে কৃষ্ণজিব নিত্যসেবার ও পূজার রীতিমত বন্দোবস্ত করিয়া প্রচুর দেবোত্তর ভুমি দয়ারাম দান করিয়া যান।

দয়ারামের সন্তান ও বংশধরগণ– এক পুত্র এবং পাঁচ কন্যা রাখিয়া দয়ারাম রায় পরলোক গমন করেন। তাঁহার পুত্র জগন্নাথ রায় পিতৃরাজ্য অধিকার করেন, কিন্তু তিনি কিছুকাল রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন কবেন। তাঁহার ১৬ জন সন্তান ছিল, কিন্তু ক্রমে ১৫ জন গত হওয়ার পর. কেবল এক পুত্র প্রাণনাথ রায় বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি পিতৃরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি অত্যন্ত বাবু ছিলেন এবং দানকর্ম্মে নিতান্ত মুক্তহস্ত ছিলেন। ইহা কথিত আছে যে, তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ অতি ধূমধামের সহিত নির্ব্বাহ করেন। তাঁহার পুত্রসন্তান না থাকায়, প্রসন্ননাথকে দত্তক গ্রহণ করেন। প্রসন্ননাথ পিতৃরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, দিঘাপতিয়া রাজবংশের যশ ও নাম বিস্তৃত করেন।

প্রসন্ননাথ রায়– প্রসন্ননাথ রায়ের অপ্রাপ্তবয়সের সময়, তাঁহার পিতা প্রাণনাথ রায় পরলোক গমন করেন। অপ্রাপ্তবয়সের সময় তাঁহার রাজ্য "কোর্ট অব ওয়ার্ডের" অধীন হয়। প্রসন্ননাথ রামপুর বোয়ালিয়া জেলাস্কুল অধ্যয়ন করেন। কিন্তু বিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল থাকিয়া ইংরাজী ভাষার ব্যুৎপত্তি জন্মাইতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁহারা রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জ্ঞান পূর্ণভাবে বিকশিত হইয়াছিল। তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার অভাব তাঁহার প্রতিভা, বুদ্ধি কার্য্য-কৌশল পূর্ণ করিয়া তাহাকে যশস্বী করিয়াছিল। তিনি, তাঁহার পিতৃপুরুষ প্রতিভাশালী দয়ারামের ন্যায়, লোককে চিনিতে পারিতেন। বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর কিছুদিন কতকগুলি মন্দ পারিষদের সংসর্গে এবং

পরামর্শে তাঁহাকে কুপথগামী করিবার উদ্যত করে; কিন্তু অল্পদিন পরেই তাঁহার চৈতন্য হয় এবং কুসংসর্গ একবারে পরিত্যাগ করেন। তখন তাঁহার মন সৎকার্য্যে ধাবিত হয়। (১)

নাটোরে মহকুমা স্থাপন– এই সময় প্রত্যেক জেলায় মহকুমা স্থাপনের প্রথা প্রচলিত হইল। মাজিস্ট্রেট যেরূপ জেলার ভারপ্রাপ্ত হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, সেইরূপ মহকুমার কার্য্যের ভার একজন সাহেব বা বাঙ্গালীর প্রতি অর্পিত হইল। মাজিস্ট্রেট বিভাগীয় কমিশনর সাহেবের অধীন এবং মহকুমার ভারপ্রাপ্ত হাকিম জেলার মাজিস্ট্রেটের অধীন হইলেন। রাজসাহী জেলায় নাটোর মহকুমা স্থাপন করা স্থির হইলে, জ্যাক্সন নামে একজন সাহেব মহকুমার ভারপ্রাপ্ত হইলেন। তিনি অল্পদিন নাটোরে থাকিয়া স্থানান্তর চলিয়া যান। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে একজন সদ্বংশজাত হিন্দুসন্তান ডেপুটী মাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়া নাটোর মহকুমার ভার পরে প্রাপ্ত হইলেন। তিনি উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন। তিনি মহকুমার উন্নতিসাধনে যত্নবান হইলেন। নাটোরে বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় স্থাপিত করিবার জন্য মহকুমার অন্তর্গত জমিদার কুঠীয়াল সাহেবদের নিকট তিনি যথেষ্ট সাহায্য পান। এই সকল সৎকার্য্যে প্রসন্ননাথ ডেপুটী ম্যজিস্ট্রেটকে বিশেষ সাহায্য করেন।

ডেপুটী মাজিস্ট্রেটের পদ– লর্ড এলনবরা, লর্ড বেন্টিঙ্কের দৃষ্টান্তানুসারে ডেপুটী মাজিস্ট্রেটের পদ সৃষ্টি করেন এবং বড় বড় লোকদের ছেলেদিগকে এই পদ দিবার ব্যবস্থা করেন। ডেপুটী মাজিস্ট্রেট জেলার মাজিস্ট্রেটের সহকারী হইয়া দণ্ডবিধান ও পুলিশের তত্ত্বাবধারণ প্রভৃতি কার্য্যে ব্রতী হইলেন। এই নিয়মানুসারে সদ্বংশজাত এবং হিন্দুকালেজের সুশিক্ষিত ছাত্রদের মধ্য হইতেও এই পদের জন্য লোক মনোনীত হইতে লাগিল। ক্রমে সেরেস্তাদার, পেস্কার, দারোগা ও মুহুরীদের মধ্য হইতেও ঐ পদের জন্য লোক মনোনীত হইতে আরম্ভ হইল। এক্ষণে পরীক্ষা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী ছাত্রদের মধ্য হইতে ডেপুটী ও সব ডেপুটী মাজিস্ট্রেটের পদের জন্য লোক মনোনীত করা হয়। এই প্রণালীতে সুযোগ্য ও সুশিক্ষিত ব্যক্তিই ঐ পদে নিযুক্ত হইতেছে। জমিদার ও সম্ভ্রান্ত সদ্বংশজাত ব্যক্তিদের মধ্যে যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী তাহাদের পরীক্ষা করিয়া ঐ পদের জন্য লোক মনোনীত করিবার প্রণালীই উত্তম বলিয়া বোধ হয়। ইহাঁদের দ্বারাই নিরপেক্ষ বিচার সম্ভব।

প্রসন্ননাথ রায়ের পূণ্যকীর্ত্তি– দিঘাপতিয়া হইতে রামপুর বোয়ালীয়া পর্য্যন্ত যে একটী প্রশস্ত রাজপথ আছে, তাহা পূর্ব্বে নাটোর পর্য্যন্ত ছিল। কিছু দিন পরে দিঘাপতিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া বগুড়া যাইবার রাস্তার সঙ্গে সংযোগ করা হয়। ঐ রাজপথ মেরামত জন্য ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে প্রসন্ননাথ এককালীন ৩৫,০০০ টাকা দান করেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে নাটোরের ডিপুটী মাজিস্ট্রেট একটী বিদ্যালয় নাটোরে স্থাপিত করেন। সেই বিদ্যালয় ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে প্রসন্ননাথের সাহায্যে দিঘাপতিয়াস্থিত "প্রসন্ননাথ একডেমীর" সহিত মিলিত হইল। এই কার্য্য জন্য প্রসন্ননাথকে নাটোর মহকুমার ডেপুটী মাজিস্ট্রেট বিশেষ প্রশংসা করেন। (২) এই উচ্চ শ্রেণী ইংরাজী স্কুল হইতে অনেকে অদ্যাবধি কৃতবিদ্যা হইতেছেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে মহকুমার ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী মাজিস্ট্রেট নাটোরে একটী চিকিৎসালয় স্থাপিত করেন। দিঘাপতিয়া উচ্চশ্রেণী ইংরেজী

(1) "After leaving School he fell into a bad set of Europeans who tried to tempt him to several indulgences and fleece him, but he soon shook off their influences and learned to think and judge for himself He at last stumbled into the right path, and found for himself a field for active usefulness" The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review

(2) "Impressed with these sentiments, I hail the establishment of the "Prasamea Nathu Academy" as a harbinger of better days for Rajahshi."- The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review

স্কুল এবং নাটোর ও রামপুব বোয়ালীয়া চিকিৎসালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য প্রসন্ননাথ কমিশনর সাহেবের যোগে গবর্ণমেন্টকে এক বৎসরের সুদ সমেত একলক্ষ টাকার গবর্ণমেন্ট প্রমিসারী নোট (অর্থাৎ ১০৪৫৬৭ টাকা ২ পাই) দান করেন। ঐ দান গ্রহণ করিয়া গবর্ণমেন্ট ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই তারিখে কমিশনর সাহেবকে পত্র লিখেন এবং প্রসন্ননাথকে ভূয়সী প্রশংসা করেন। স্কুল ও চিকিৎসালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য গবর্ণমেন্ট একটী কমিটী সংস্থাপিত করেন। কমিশনর, জজ, কলেক্টর, মাজিস্ট্রেট, এবং সিবিল সারজন কমিটীর "একস অফিসিও" মেম্বর থাকিবেন। নাটোর মহকুমার ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী মাজিস্ট্রেট এবং স্থানীয় অন্যান্য ভদ্রলোককে গবর্ণমেন্ট মেম্বর পদে নিযুক্ত করিয়া "সব কমিটী" গঠিত করেন। নিজ দিঘাপতিয়া রাজবাটীর নিকটে প্রসন্ননাথ স্বীয় নাম খ্যাত "প্রসন্নকালী" স্থাপিত করিয়া মধ্যাহ্নে অন্ন ভোগ এবং রাত্রিতে লুচি পক্কান্ন ভোগের বন্দোবস্ত করেন। মধ্যাহ্নকালে প্রত্যহ একমণ চাউলের ভোগ এবং তদুপযোগী উপকরণ আছে এবং রাত্রিতে প্রায় ১০/১৫ জন ব্রাহ্মণ পরিতোষ সহকারে আহার করিতে পারেন এরূপ লুচি পক্কান্নের বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। স্থানে স্থানে শিবস্থাপন করেন এবং প্রজাগণেব জল কষ্ট নিবারণ জন্য নিজ জমিদারী মধ্যে পুস্করিণী খনন করিয়া দিয়াছেন। ইহা ব্যতীত দীন দুঃখীকে তিনি যথেষ্ট দান করিয়াছেন। তিনি অনেক সময় দিঘাপতিয়া হইতে রামপুর বোয়ালীয়া যাইবার সময় টাকা, আধুলী, সিকি, দুইআনি, পয়সা এবং চাউল স্থানে স্থানে দীন দুঃখীকে অকাতরে দান করিতেন।

প্রসন্ননাথের রাজ সম্মান– প্রসন্ননাথের অতুলদান ও সৎকার্য্যের স্মরণচিহ্ন স্বরূপ গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে "রাজা বাহাদুর" উপাধি দিয়া সম্মানিত করেন। এ উপাধির সনন্দের তারিখ ২০ এপ্রেল ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ, কিন্তু বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ২০ মে তারিখে উপাধি প্রদত্তেব সংবাদ রাজা প্রসন্ননাথের নিকট প্রেরণ করেন। স্বয়ং বড়লাট লর্ড ডেলহাউসী গবর্ণমেন্ট প্রাসাদে প্রকাশ্য দরবারে রাজা প্রসন্ননাথকে খেলাত্‌সহ "রাজা বাহাদুর" উপাধির সনন্দ প্রদান করেন। ঐ দরবারে পাতিয়ালার মহারাজা প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত রাজা ও সুবা উপস্থিত ছিলেন।

রাজা প্রসন্ননাথের মাজিস্ট্রেটের পদ– ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে রাজা প্রসন্ননাথ রায় বাহাদুর অবৈতনিক আসিস্টান্ট মাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার অধীন পুলীশের একজন জমাদার এবং ২০ জন বরকন্দাজ নিযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। তিনি নিজে রাজধানীতে নির্দ্ধারিত সময়ে এই ফৌজদারী কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

রাজা প্রসন্ননাথের চরিত্র– রাজা প্রসন্ননাথের চরিত্র সম্বন্ধে কেহ কেহ কোন বিষয়ে দোষরোপ করে। কিন্তু তাঁহার গুণের ভাগ এত বেশী যে তাঁহার লঘুদোষ থাকিলেও তাহা কাহারই স্মরণ করা বা উল্লেখ করা উচিত নহে। আমরা বলি যে তিনি একজন মহচ্চেতা, উদারমনা ও বিদ্যোৎসাহী প্রধান জমিদার ছিলেন। দান ও সৎকার্য্য সম্বন্ধে তিনি একটী আদর্শ জমিদাব ছিলেন। দিঘাপতিয়ার ইংরাজী স্কুল স্থাপন করিয়া, মফস্বলে উচ্চ শিক্ষার বীজ তিনিই প্রথমে রোপণ করেন। তিনি স্বভাবতঃ সাহসিক ও উদার ছিলেন। তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা আনন্দময়। তিনি রাজা হইয়াও, তাঁহার সকলের সহিত মিসিবার চেষ্টা প্রবল ছিল। তাঁহার আতিথ্য ও লোকন্যগুণে গবর্ণমেন্টের কর্ম্মচারী, কুঠীয়াল সাহেব এবং জমিদারগণ তাঁহার বাধ্য ছিলেন এবং তাঁহারা তাঁহাকে ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। তিনি মৃগয়াসক্ত ছিলেন এবং অনেক সময়ে এই মৃগয়া জন্য বড় বড় সাহেব এবং জমিদারগণকেও আহ্বান করিয়া নিজ দিঘাপতিয়া রাজধীতে আনিয়া "সিংহদালান" নামক উৎকৃষ্ট সুসজ্জিত অট্টালিকায় তাঁহাদের বাসস্থান নির্দেশ

করিয়া দিতেন এবং তাঁহাদের আতিথ্য করিতেন। তাহার পরে একত্রিত হইয়া নিজব্যয়ে তিনি মৃগয়ার্থ গমন করিতেন। রাজা প্রসন্ননাথ রায় বাহাদূরের পূর্ব্বে রাজবাটী তত সুন্দর ছিল না। তিনি প্রসন্নকালীর বাটী, সিংহ দালান, দোলমঞ্চ প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া রাজবাটী প্রকৃতই সুন্দর করেন। মন্দকে সুন্দরগঠনে আনিবার তাঁহার ক্ষমতা এবং ইচ্ছা ছিল।

রাজা প্রসন্ননাথের উত্তরাধিকারী– ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে রাজা প্রসন্ননাথ রায় পরলোক গমন করেন। তাঁহার সন্তান সন্ততি ছিল না। প্রমথনাথ রায়কে তিনি দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। রাজা প্রসন্ননাথের মৃত্যুর পর তাঁহার উইল অনুসারে তাঁহার ভূসম্পত্তি "কোর্ট অব ওয়ার্ডের" অধীন হয় এবং ১৮৬৩ খৃষ্টব্দে সুশিক্ষার জন্য প্রমথনাথকে কলিকাতা "ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউসনে" পাঠান হয়। তাঁহার সদ্‌গুণভূষিতা মাতাও তাঁহার সহিত কলিকাতা যান এবং স্বতন্ত্র গৃহে বাস করেন। মাতৃভক্ত কুমার প্রতি রবিবারে মাতার চরণ-দর্শন জন্য তাঁহার বাসভবনে আসিয়া সমস্ত দিবাভাগ মাতৃসন্নিধানে কালযাপন করিতেন এবং সন্ধ্যাকালে স্বস্থানে গমন করিতেন। যেমন নেপোলিয়ান মাতার সদুপদেশে নিজ চরিত্রগঠিত করেন, সেইরূপ কুমার প্রমথনাথও মাতার উপদেশে দিন দিন স্বীয় চরিত্র সুগঠিত করিলেন এবং পবিত্র করিয়া উঠিলেন। চরিত্র গঠনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিদ্যালাভ করিতেন। কলিকাতা "ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউসন" হইতে কুমার প্রমথনাথই প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

কুমার প্রমথনাথের পিতৃ রাজ্য অধিকার– কুমার প্রমথনাথের বিদ্যাশিক্ষায় বিশেষ অনুরাগ ছিল। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন জন্য প্রবিষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত না হইতেই তিনি রাজ্যভার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পিতৃরাজ্যের ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি প্রথমাবস্থায় রাজকার্য্যে অনভিজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই তিনি জমিদারী কার্য্য বিলক্ষণরূপ শিক্ষা করিলেন। অল্প সময় মধ্যে তিনি রাজকার্য্যে যেরূপ পটু হন এবং প্রজারঞ্জনে যশঃলাভ করেন, সেরূপ রাজসাহীর অনেক জমিদারই সক্ষম হন নাই।

কুমার প্রমথনাথের রাজ্য ভার গ্রহণ করিবার পর বিদ্যাধ্যায়ন এবং দৈনিক কার্য্য-নির্ব্বাহের নিয়ম– প্রত্যহ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে কুমার দুই কি তিন মাইল পথ ভ্রমণ করিতেন। তদপর রাজবাটী প্রত্যাগমন করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিতেন। পূর্ব্বাহ্ন ৮ ঘটিকা হইতে ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত রাজমন্ত্রীদেরসহ রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন এবং প্রজাগণের আবেদন শুনিয়া যথাযোগ্য আদেশ প্রদান করিতেন। স্নান আহারাদি করিয়া নির্জ্জন গৃহে প্রবেশ করিতেন। তাঁহার দিবা নিদ্রার অভ্যাস একবারে ছিল না। আহারান্তে প্রথমে সংবাদ পত্রাদি পাঠ এবং তদপর রীতিমত এবং ধারাবাহিক ইংরাজী সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান আদি সম্বন্ধে পুস্তক পাঠ করিতেন। ইতিহাসই তাঁহার প্রিয় পাঠ্য ছিল। দিবা দুই প্রহর হইতে অপরাহ্ন ৪ ঘটিকা, কোন দিন ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকিতেন। পাঠান্তে প্রাতঃকালের ন্যায় ভ্রমণ করিতেন। সন্ধ্যার পর বন্ধুবান্ধবদের সহিত সদালাপে কালযাপন করিতেন এবং আবশ্যক হইলে কখন মন্ত্রীদের সহ রাজকার্য্যের পরামর্শ করিতেন। রাত্রি এক প্রহর সময় আহারাদি করিয়া অন্তঃপুরে শয়নাগারে গমন করিতেন। রাজকুমারদের এরূপ অধ্যয়নে অনুরাগ প্রায় দেখা যায় না। কলেজে দীর্ঘকাল অধ্যয়ন না করিয়াও তিনি ইংরাজী ভাষায় এত প্রশংসনীয় হইয়াছিলেন যে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। নিয়ত অধ্যয়নে তাঁহার এরূপ জ্ঞান জন্মিয়াছিল এবং নানা দেশের এত সংবাদ জানিতেন যে তাঁহার সহিত এক জন পণ্ডিত আলাপ করিতে বসিলে যথেষ্ট সন্তোষ লাভ করিতেন। তাঁহার এই জ্ঞান জন্য সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও

ভক্তি করিতেন।

কুমার প্রমথনাথ "রাজা বাহাদুর" উপাধিতে সম্মানিত– ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে বিভাগীয় কমিশনর গবর্ণমেন্ট সমীপে রিপোর্ট করেন। যে নিম্ন বাঙ্গালায় জমিদারগণ মধ্যে কুমার প্রমথনাথ একটী বুদ্ধিমান এবং সৎস্বভাব সম্পন্ন জমিদার; তিনি নিজ জমিদারীর কার্য্য অতি উৎকৃষ্টরূপে নির্ব্বাহ করিতেছেন এবং তাঁহার পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহাকে ভূয়সী প্রশংসা করে। রাজাদের মধ্যে কুমার প্রমথনাথের ন্যায় বিনয়ী অতি অল্প লোকই ছিল। এই সকল নানা গুণে ভূষিত ছিলেন বলিয়া কমিশনর গবর্ণমেন্ট সমীপে কুমাবকে "রাজা বাহাদুর" উপাধিতে সম্মানিত করিবার জন্য অনুরোধ করেন। সদাশয় বড় লাটও "রাজা বাহাদুর" উপাধি-সনন্দ মঞ্জুর করেন। রামপুর বোয়ালীয়াতে কমিশনর সাহেব গবর্ণমেন্টের প্রতিনিধি স্বরূপ বাজা প্রমথনাথকে "রাজা বাহাদুরের" সনন্দ প্রদান করেন।

রাজা প্রমথনাথের রাজ্য লাভ– রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুর পিতৃ-রাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া সেই রাজ্যের কেবল উন্নতি সাধন কবেন এমত নহে; তাঁহার বুদ্ধিকৌশলে এবং যত্নে তিনি অনেক নূতন জমিদারী লাভ করেন। তাঁহার সময় নিম্নলিখিত জমিদারী তিনি রাজ্যভূক্ত করেন ঃ—

(১) জেলা রাজসাহীর অন্তর্গত ডিহি শিবপুর, জেলা সাইল, তরফ বেশালপুর, রামপুরবোয়ালীয়া, বৈদ্য বেলঘরিয়া প্রভৃতি।

(২) জেলা হুগলী ও হাবড়ার অন্তর্গত সেওড়াফুলী ষ্টেট।

(৩) জেলা যশোহরের অন্তর্গত মাহমুদপুর, তেলীহাটী মধ্যে নড়াইল জমিদাবীর কিয়দংশ এবং নশরৎ সাহীর কিয়দংশ।

(৪) জেলা নদীয়ার অন্তর্গত ডিহি রামচন্দ্রপুর।

এইরূপে এবং সুশাসনগুণে পূর্ব্বাপেক্ষা দিঘাপতিয়া জমিদারীর আয় প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি হয়। এইক্ষণে রাজসাহী মধ্যে সকল জমিদার অপেক্ষা দিঘাপতিয়া রাজার রাজ্য বেশী এবং বাজসাহী, বগুড়া, ফরিদপুর, পাবনা, যশোহর, নদীয়া, হুগলী, হাবড়া প্রভৃতি বহু জেলায় বিস্তৃত। এরূপ বিস্তৃত এবং লাভজনক রাজ্য রাজসাহী জেলার আর কোন রাজা জমিদারের নাই।

রাজা প্রমথনাথের পূণ্য-কীর্ত্তি– রাজা প্রমথনাথ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া এবং পিতৃরাজ্যের অধিকারী হইয়াই রামপুর বোয়ালীয়ার দাতব্য চিকিৎসালয়ের গৃহ নির্ম্মাণ জন্য ১০,০০০ টাকা দান করেন। (১) এই চিকিৎসালয় তাঁহাব পিতৃকীর্ত্তি। এই দানদ্বারা পিতার কীর্ত্তির তিনি গৌরব বৃদ্ধি করিলেন। দিঘাপতিয়া হইতে রামপুরবোয়ালীয়া পর্যন্ত যে রাজপথ আছে তাহার সংস্কাব জন্য তিনি তাঁহার পিতার ন্যায় যাবতীয় ব্যয় দিয়া গবর্ণমেন্টের এবং সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রশংসা-ভাজন হন। রাজসাহী বালিকা বিদ্যালয়েব জন্য বার্ষিক ১৮০৲ টাকার প্রয়োজন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে এই টাকার অনুরূপ তিনি গবর্ণমেন্ট প্রমিসরী নোট দান করেন। এই বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধনের অভিপ্রায়ে তিনি তিনটী বৃত্তির সৃষ্টি করেন। বাঙ্গালার ছোট লাট এই দান জন্য রাজা প্রমথনাথের ভূয়সী প্রশংসা করেন। প্রজাপুঞ্জের উপকার জন্য স্থানে স্থানে স্কুল পাঠশালা এবং কোন কোন স্থানে চিকিৎসালয় স্থাপিত করেন। রাজসাহীজেলা-স্কুল, দুবলহাটীর রাজা হরনাথ দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে পরিণত করিয়া এফ,এ, পরীক্ষার উপযোগী দুইটী শ্রেণী সংযোজিত

(১) ঐ গৃহ জীর্ণ সংস্কার জন্য রাজা প্রমথনাথেব পুত্র বাজা প্রমদানাথ ১০,০০০ টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। এই দান দ্বারা পিতা পিতামহের কীর্ত্তির গৌবব বৃদ্ধি হইয়াছে।

করিবার সমস্ত ব্যয়ভার নিজে বহন কবেন। "রাজসাহী এসোসিয়েসন" নামে রাজনীতি বিষয় পরিচালনার জন্য একটী সভা বোয়ালিয়াতে স্থাপিত আছে। এই সভার পক্ষ হইতে রাজা প্রমথনাথ ঐ কলেজে আর দুইটী শ্রেণী সংযোজিত করিয়া বি,এ, পবীক্ষার পাঠার্থী প্রস্তত হইবার প্রস্তাব করেন। ইহাব ব্যয় অনেক। এই প্রচুর ব্যয়ভার রাজা প্রমথনাথ একাই অনাযাসে বহন করিতে পারিতেন। কিন্তু দুবলহাটী রাজার কীর্তিকে খর্ব্ব করিযা নিজ কীর্ত্তির প্রাধান্য স্থাপন করা রাজা প্রমথনাথের উদ্দেশ্য ছিল না। সুতরাং "এসোসিয়েসন" হইতে রাজসাহীর জমিদাগণের নিকট টাকা সংগ্রহের চেষ্টা হইতে লাগিল বটে। কিন্তু অতি অল্প টাকাই সংগ্রহ হইল। রাজা প্রমথনাথ "রাজসাহী এসোসীয়েসন" যোগে দেড়লক্ষ টাকা নিঃস্বার্থভাবে এককালীন দান করিয়া সর্ব্বজন নিকট প্রশংসাব পাত্র হন। অনেক রাজা জমিদার নামের জন্য বা গবর্ণমেন্ট প্রদত্ত সম্মান চিহ্ন জন্য দান করিয়া থাকেন। বাজা প্রমথনাথের দান এ শ্রেণীব দান নহে। তাঁহার কোন দানই নামেব জন্য ছিল না। দুঃখীব দুঃখ মোচনের জন্য যে দান আবশ্যক, তাঁহার দানও সেই প্রকারের ছিল। যে ব্যক্তির ভিক্ষাই ব্যবসা এবং যে ব্যক্তি অভাব জন্য ভিক্ষা করে না, তাহাকে তিনি কখনই দান দিতেন না। স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয যে প্রণালীতে দান কবিতেন, বাজা প্রমথনাথও সেই প্রণালীতে দান করিতেন। তিনি যে কেবল বহুতর স্কুল পাঠশালাব মাসিক ও বার্ষিক সাহায্য দিতেন এমত নহে; তাঁহার অর্থে অনেক বিধবা দরিদ্রা হিন্দু-বমণী দিন যাপন করিতেন। তিনি অনেক হিন্দু বিধবা রমণীকে মাসিক বৃত্তি দিয়া ভরণ-পোষণ করিতেন। তাঁহার উদারতা ও দানের অনেক কাহিনী আছে। এস্থলে একটী কাহিনী বলিলে তাঁহাব দানের প্রণালীর পবিচয় পাওয়া যাইবে। একদা বৈকালে ভ্রমণ উদ্দেশে বাজবাটী হইতে তিনি বহির্গত হইলেন। তাঁহাব সঙ্গে তাঁহার মাতুল ও ডাক্তর কৈলাসচন্দ্র মজুমদার ছিলেন এবং লেখকও সেই সঙ্গে ছিল; অশ্বশালার নিকট আসিয়া আমবা দেখিতে পাইলাম যে একটী বমণী তৃণ শয্যায় শয়ন করিযা আছে। রাজা মাতুলকে বলিলেন যে অনুসন্ধান করুন "এ কাহার রমণী এবং কি কাবণে এখানে শয়ন কবিয়া আছে, বোধ হয এস্থানেব কোন লোকের রমণী নহে"। মাতুল জিজ্ঞাসা করায রমণী উত্তর করিল। "আমি মুসলমান রমণী, আমাব বাড়ী বঙ্গপুব প্রদেশে, আমি পাডুয়া তীর্থে গিযাছিলাম, ফিরিযা আসিবার সময় পথিমধ্যে আমার ভেদবমী হয়, আমি অজ্ঞান অবস্থায় থাকায়, আমাকে মৃত জ্ঞানে আমাব সঙ্গীরা ছাড়িয়া চলিয়া গিযাছে। আমি একাকিনী ভিক্ষা করিয়া আহার কবি এবং ক্রমে চলিয়া আসিতেছি। আমাকে কেহ বাড়ীতে পৌছাইয়া দিলে, আমি সন্তুষ্ট হইতাম; আমি চলিতে পারি না"। রাজা এই সকল কথা শুনিয়া ডাক্তাবকে আদেশ কবিলেন যে "ডাক্তর বাবু দেখুন, রমনীর কোন ব্যাধি আছে কি না?" ডাক্তাব বাবু দেখিয়া বাজাকে বলিলেন, "এ রমণীর এক্ষণে কোন ব্যাধি নাই, অত্যন্ত দুর্ব্বলা, কেবল শুশ্রুষা ও পুষ্টিকর আহার পাইলে, বমণী সবলা হইবে"। রাজাব আদেশমত রমণীব আহাবের ও শুশ্রুষার সুবন্দোবস্ত হইল এবং পরিধেয় জীর্ণ ও মলিন বস্ত্র ত্যাগ করাইয়া ভাল নূতন বস্ত্র দেওযা হইল। শরীর সুস্থ হইলে কিছু দিন পর রাজা বেহারা ও ডুলী করিয়া সঙ্গে অনেক লোক দিয়া রমণীকে নিজ বাটীতে পৌছাইয়া দিলেন। সে সময় উত্তর বঙ্গ রেলওয়ে স্থাপিত হয় নাই। সুতরাং বহু ব্যয় করিয়াও রাজা ঐ অনাথা মুসলমান রমণীর মহোপকার করিলেন। তাঁহার দানে জাতিভেদ ছিল না। এই প্রকার পুণ্যকীর্ত্তিই প্রকৃত সৎকার্য্য এবং রাজার মহত্ত্বের সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। এইরূপ কাহিনী রাজা প্রমথনাথের জীবনে অনেক আছে। তাঁহার আমলা ও অন্যান্য চাকরগণের পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ, পুত্র কন্যার বিবাহ, পুত্রের উপনয়ন, অন্নপ্রাশন ও চূড়াকরণ প্রভৃতিকার্য্যে ও তীর্থাদি পর্য্যটন জন্য, তাহাদিগকে বিশেষ

সাহায্য করিতেন। যাহার যেরূপ কার্য্য তদনুরূপ দান করিতেন। তিনি ১০ টাকা হইতে ৫/৬ হাজার টাকা পর্য্যন্ত নিজ কর্ম্মচারীদের দান করিয়াছেন। তিনি নিজ চাকরদের মধ্যে কাহাকে বন্ধুর ন্যায়, কাহাকে পিতার ন্যায়, কাহাকে পুত্রের ন্যায় জ্ঞান করিয়া এরূপ অভাবের সময় তাঁহাদের অকাতরে সাহায্য করিতেন।

রাজা প্রমথনাথ ও প্রজাগণ— যেমন পিতা পুত্রে সম্বন্ধ, তেমনই জমিদার প্রজা সম্বন্ধ। যেমন পিতা পুত্রকে পালন করিবে, তেমনই জমিদার প্রজাকে পালন করিবে। পুত্রের নিকট পিতার যেরূপ স্বার্থ, প্রজার নিকট জমিদারের সেইরূপ স্বার্থ। রাজা প্রমথনাথের প্রজার সহিত এইরূপ সম্বন্ধ ছিল। প্রজাকে পালন করা এবং বিপদ হইতে রক্ষা করা তাঁহার মূখ্য কর্ম্ম ছিল। প্রজার করবৃদ্ধি করিয়াছেন সত্য কিন্তু প্রজাকে পীড়ন করিয়া করবৃদ্ধি করেন নাই। তিনি সকল বিষয়ে প্রজাকে সুখে রাখিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। পুত্র দুর্বৃত্ত হইলে তাহাকে দমন করিতে পিতা যেমন যত্ন ও চেষ্টা করেন; তেমনই রাজা প্রমথনাথ দুরন্ত প্রজাকে শাসন করিতে চেষ্টা করিতেন। তাহাকে কখনই নষ্ট করিতেন না। দুরন্ত প্রজা বশীভূত হইলে, তাহাকে পুত্রজ্ঞানে ক্ষমা করিতেন। তাঁহার ক্ষমা ও ধৈর্য্যগুণ যথেষ্ট ছিল। পিতার নিকট পুত্র আবদার করিলে পিতা যেমন সন্তোষসহ তাহা সম্পন্ন করেন, তিনিও সেইরূপ প্রজাকে সুখী করিতেন। পিতা পুত্রের সহিত যেমন আলাপ করেন, তিনিও তেমনিই প্রজার সহিত আলাপ করিতেন এবং তাহার দুঃখের কথা মনোযোগপূর্ব্বক শুনিতেন। প্রজা বাজাকে ভয় না করিয়া ভক্তি করিত। তাঁহার রাজত্ব সময়ে প্রজা সুখে ছিল। কোন কর্ম্মচারী প্রজার প্রতি অযথা অত্যাচাব করিলে, তাহা রাজার কর্ণগোচর হওয়া মাত্র তাহার প্রতিবিধান হইত। প্রজার সুখ ও দুঃখ সম্বন্ধে কোন বিষয় কেবল মন্ত্রীর উপর নির্ভর করিয়া থাকিতেন না। তিনি প্রজাপালন সম্বন্ধে একটী আদর্শ জমিদার ছিলেন; তাহা গবর্ণমেণ্ট অনেকস্থলে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কি নিজের প্রজা, কি অপর জমিদারের প্রজা, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি বৃদ্ধ, কি যুবা সকলেরই তিনি প্রিয় ছিলেন।

রাজা প্রমথনাথের বেঙ্গল কাউন্সিলের সভ্যপদে নিযুক্ত— রাজা প্রমথনাথ "রাজা বাহাদুর" উপাধি পাওয়ার পর তাঁহার উপযোগিতা এবং রাজ্যের সুশাসন জন্য তিনি বাঙ্গালার, ছোটলাট বাহাদুরের প্রশংসা-ভাজন হইয়া উঠিলেন। তাহার পর তাঁহাকে বেঙ্গল কাউন্সিলের মেম্বরের পদে নিযুক্ত করা হইল। তিনিও অতি সুচারুরূপে বৃটিশ রাজ প্রদত্ত সম্মানের কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু অল্পদিন পরে তাঁহার বাজকার্য্যের অসুবিধা হওয়াতে তিনি ঐ পদ নিজেই ত্যাগ করেন। তিনি যে কেবল রাজসবকার হইতে সম্মানিত হইয়াছিলেন এমত নহে, দেশীয় জমিদারেরাও তাঁহাকে সম্মান করেন। "রাজসাহী এসোসিয়েসনের" প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ সভাপতি পদে তিনি নিযুক্ত থাকিয়া সকলের প্রীতিকর ও স্বদেশ-হিতকব কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

রাজা প্রমথনাথের শারীরিক অসুস্থতা ও মৃত্যু— প্রায় ১৩/১৪ বৎসর রাজত্বের পর, তাঁহার শরীর অপটু হয়। অজীর্ণজনিত অসুস্থতাই রাজার প্রবল কারণ। কিন্তু এই ব্যাধিতে কিছুদিনের জন্য তাঁহার শরীরের লাবণ্য ও কান্তি নষ্ট হয়। সুচিকিৎসাবলে এই অজীর্ণ রোগ হইতে তিনি মুক্তিলাভ করেন। তাহার পর ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে রাজা জ্বররোগে কাতর হন। নিম্ন রাজসরকারে যে আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ছিলেন, তিনিই প্রথমে চিকিৎসা করেন। ক্রমে ব্যাধি বৃদ্ধি হওয়ায় দুইজন বিখ্যাত সাহেব সিবিল সার্জ্জন চিকিৎসা করেন। তাঁহাদের চিকিৎসায় কোন সুফল না হওয়ায়, ১৯৮৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে কেবল রাজপরিবারবর্গ অপার দুঃখসাগরে নিমগ্ন হন এমত নহে। কি ধনী, কি দরিদ্র,

কি বৃদ্ধ যুবা, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, সমগ্র রাজসাহীবাসীরা তাহার অকাল মৃত্যুর জন্য ক্রন্দন করিয়াছে।

রাজা প্রমথনাথের চরিত্র— রাজা প্রমথনাথ অতি বুদ্ধিমান ও সরলাত্মা এবং অত্যন্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি সহজে কোন বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিতেন না, কিন্তু একবার প্রতিজ্ঞা করিলে তাহাতে সহস্র ক্ষতি হইলেও সেই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে বিমুখ হইতেন না। তিনি বিনয়ী ও নম্র ছিলেন। তাঁহার রাজা বলিয়া মনে কোন অহঙ্কার ছিল না। তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচাবী পীড়ায় কাতর হইলে ঔষধ ও পথ্যাদির উপযোগী দ্রব্য দিতেন এবং অনেক সময়ে তত্ত্বাবধান করিতেন। কোন কোন স্থলে স্বয়ং তাহাকে দেখিতেও যাইতেন। প্রতিবেশী জমিদার বা সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদের বাটীতে যাইতে বা তাহাদের সহিত সৌহার্দ্যভাব রক্ষা করিতে, তাঁহার মনে অহঙ্কারেব লেশমাত্র ছিল না। তাঁহার কোন কর্ম্মচারী বা ভৃত্য গুরুতর অপরাধে অপবাধী হইলেও তাহাকে কটু বা অপ্রিয়বাক্য প্রয়োগ করিতেন না। তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া বা আর্থিক দণ্ড করিয়া বা উপদেশচ্ছলে সামান্য ভৎর্সনা করিয়া ক্ষান্ত হইতেন। তিনি নিতান্ত লজ্জাশীল পুরুষ ছিলেন। তিনি নিতান্ত মিতবায়ী ছিলেন। তাঁহার পরিচ্ছদে রাজাব ন্যায় কোন ধূনধাম ছিল না। কিন্তু তিনি নিতান্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিলেন। তাঁহার শরীবে দয়া ও উদারতা যথেষ্ট ছিল, তাহা তাঁহাব জীবনবৃত্তান্ত পাঠে বিশেষরূপ জানা যাইবে। তিনি পণ্ডিত এবং জমিদারী কার্য্যে অত্যন্ত পটু ছিলেন। তিনি নিজে রাজকার্য্য বিশেষরূপ পর্যাবেক্ষণ করিতেন এবং আয় অনুসারে ব্যয় করিতেন। প্রজার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ নিতান্ত প্রশংসনীয়। তিনি সুধীর ও সুবিবেচক ছিলেন; ক্রোধ কাহাকে বলে তাহা তিনি জানিতেন না। তিনি কখন নিবানন্দ থাকিতেন না; সর্ব্বদা আনন্দময়। অবযব কিছু কাল নিরীক্ষণ করিয়া, দয়ারামেব ন্যায়— তিনিও লোককে চিনিতে পারিতেন। সরল লোক না হইলে তাহার সহিত অতি সাবধানে আলাপ করিতেন। স্বজাতীয়দের মধ্যে শিক্ষা প্রচারের তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল। তাঁহাব স্বজাতীয় মধ্যে যে এক্ষণে সুশিক্ষিত অনেক ব্যক্তি দেখা যায়, তাহা তাঁহারই যত্নের ও অর্থেব ফল। তাঁহাদের শিক্ষা-জন্য সময় সময় তিনি অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। মোটের উপব বলিতে গেলে, তিনি একটী পণ্ডিত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দয়াবান, বুদ্ধিমান সরল প্রজারঞ্জক জমিদার ছিলেন। তাঁহার পবিত্র চরিত্র মনে করিয়া আমরা এখনও রোদন করিয়া থাকি। তিনি ১৬ বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়া জমিদাবী প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি করেন। তিনি দীর্ঘজীবী হইলে তাঁহার রাজ্য যে কতদূর বিস্তৃত হইত, তাহা পাঠক অনুমান করিবেন।

রাজা প্রমথনাথের সন্তান সন্ততি— চারি পুত্র এবং এক কন্যা রাখিযা রাজা প্রমথনাথ পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর সময় চারি পুত্রই অপ্রাপ্ত বয়স্ক। তাঁহার উইল অনুসারে তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি "কোর্ট অব ওয়ার্ডসের" অধীন হয় এবং বাজসাহীর অন্যতম জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু রাজকুমার সবকার মহাশয় মেনেজরের পদে নিযুক্ত হন। (১) বোর্ডেব আদেশমত এবং উইলের সর্তানুসারে চারি কুমারের শিক্ষার জন্য অতি সুবন্দোবস্ত হয়। প্রথমে রাজসাহী কলেজে তদপর কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করিয়া সকলই সুশিক্ষিত ও পণ্ডিত হইয়াছেন। এবং তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে রাজজামাতাও সুশিক্ষিত হইয়াছেন। সম্প্রতি রাজজামাতা রাজসাহী জজ আদালতের উকীল শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। রাজসাহীতে বড় রাজবংশে

---

(১) রাজকুমার রাজা প্রমথনাথের প্রিযবন্ধু ও পরামর্শদাতা ছিলেন। বাজকুমাব অতি সুশিক্ষিত এবং জমিদারী কার্য্যে সুদক্ষ। ইহাঁব পিতাব নাম বামকুমাব এবং পিতামহের নাম নিমাই। এই নিমাই হইতেই বংশ উন্নতি লাভ করে। নিমাই ও রাজকুমাব বিস্তব জমিদাবী লাভ কবেন।

দিঘাপতিয়ার রাজকুমারেরা ও রাজজামাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিতে বিশেষরূপ সম্মানিত হইয়াছেন। সরস্বতী ও লক্ষ্মীদেবী এক গৃহে বাস প্রায় দেখা যায় না। কিন্তু দিঘাপতিয়া রাজবংশে এই দুই দেবীই বিরাজমানা। ইহা দয়ারামের পুণ্যকীর্ত্তির ফল না রাজা প্রমথনাথের পবিত্র নির্ম্মল চরিত্রের লক্ষণ? চারি কুমার— প্রমদানাথ রায়, বসন্তকুমার রায়, শরৎকুমার রায় ও হেমেন্দ্রনাথ রায়— দীর্ঘজীবী হইয়া যশঃ ও নাম বিস্তার করিলে দয়ারাম রায়ের বংশের আরো গৌরব বৃদ্ধি হইবে।

রাজা প্রমথনাথের উত্তরাধিকারী— রাজা প্রমথনাথকৃত উইল অনুসারে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার প্রমদানাথ রায় পিতৃরাজ্যের উত্তরাধিকারী বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সমগ্র পাঠ সমাপ্ত না হওয়ার পূর্ব্বেই তাঁহার পিতার ন্যায় তাঁহাকে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে হয়। কুমার প্রমদানাথ রায় বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ২৯শে জানুয়ারী তারিখে পিতৃরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইহার চারি বৎসর পরেই "রাজা বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। এই অল্পকাল মধ্যে ভূমিকম্পে রাজবাটীর ও প্রসন্নকালীর বাটীর সুন্দর অট্টালিকা ভূতলশায়ী করায় রাজবাটীর শ্রীভ্রষ্ট করিয়াছে। ইহা কম ক্ষতি নহে। রাজা বাহাদুর পুনরায় রাজবাটী নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তথাপি তিনি পূণ্য কার্য্যে বিরত নহেন। কিছুদিন হইল তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে বিস্তর দীন দুঃখীকে প্রচুর আহার, পয়সা এবং বস্ত্রদান করিয়া, জনসমাজে তিনি যশশ্বী হইয়াছেন। রাজসাহী কলেজে এম.এ. পরীক্ষার্থীদিগের জন্য একটা ১০ টাকার মাসিক বৃত্তি স্থাপিত করিয়া উচ্চ শিক্ষার বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। (১) এই ছয় বৎসর মাত্র তাহার রাজত্ব। এই অল্প সময় মধ্যে এবং রাজবাটী নির্ম্মাণের প্রচুর ব্যয় নিবন্ধনেও, তিনি যেরূপ পুণ্যকীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন, তাহা প্রশংসনীয়। তাহার পিতৃপুরুষের যশঃ ও নাম বিস্তার করিলে লোক-সমাজে প্রশংসার পাত্র হইবেন।

---

(1) "Raja Prumada Nath Roy Bahadur, of Dighaputya has founded a Scholarship of Rs. 10, to be forwarded to a graduate of the College reading for the M.A. Degree Examination."- Administration Report of the Rajshahi Division for 1898-99

একাদশ অধ্যায়

দুবলহাটী রাজবংশ

উপক্রমণিকা— দুবলহাটীর আদিরাজ্য বার্ব্বকপুর। এই বার্ব্বকপুরেব কোন একটী অত্যুচ্চ স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া বর্ষা সমাগমে যদি একবার চতুর্দিকে নয়ন-নিক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে একটী বিস্তৃত জলরাশি চারিদিকে ব্যাপিযা রহিয়াছে। সেই জল রাশি মধ্যে এক একটী ক্ষুদ্র গ্রাম, এক একটী দ্বীপ এবং নিজ দুবলহাটীও সেইরূপ দ্বীপ বলিযা ভ্রম জন্মিবে। এই দুবলহাটী বাজ্যে মৎস্যের নামে শৌলকোপা, খলিশামারী, পবা-মারী, টেঙ্গরা-গাড়ী প্রভৃতি মৌজা আছে। আবার জলকর নদীর অন্তর্গত প্রায় ৫০/৬০ বিল এখনও এই রাজ্যে বর্ত্তমান আছে। এই দৃশ্য নয়নপথে পতিত হইবামাত্র হৃদয়ে সহসা এই উদয় হয় যে দুবলহাটী একটী প্রাচীন স্থান এবং এককালে সেই জলবাশি মৎস্যাদি জল জন্তুর আবাস স্থান ছিল। সেই দৃশ্য, মৎস্য নামের মৌজা, এবং বিলসমূহ স্পষ্টই বলিয়া দেয় যে জলরাশি এককালে কি বর্ষা, কি গ্রীষ্ম ঋতুতে চারি দিকে ব্যাপিয়া থাকিত, তাহা এক্ষণে শস্যক্ষেত্ররূপে পবিণত, এবং আদিতে বিনাকরে রাজ্যভোগ তদপরে "বাইশ কাহন কবজী মৎস্য করস্বরূপ" মোগল সম্রাট সমীপে প্রেরিত হইত, তাহা ও মিথ্যা ঘটনা বলা যায় না। এইক্ষণ সেই জলবশি শস্যক্ষেত্রে পরিপূর্ণ এবং লক্ষাধিক মুদ্রায় জমিদারী। ইহাই কালের বিচিত্র গতি।

রাজসাহী মধ্যে দুবলহাটী একটী প্রাচীন রাজবংশ। সাঁতুল, তাহিরপুর, পুঠীয়া ও নাটোর রাজবংশ অভ্যুদয়েব অনেক পূর্ব্বে দুবলহাটী বংশের স্থিতি অনুমিত হয়। আদিশূরের (অর্থাৎ রাজসাহী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের সমাজ নাম ধারণ করার) পর হইতে তাহিরপুব ও সাঁতুল রাজবংশর উৎপত্তি বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে। সুতবাং সেন বংশীয় আদিশূব বঙ্গদেশ অধিকাব কবিবাব পূর্ব্বে পাল বংশীয় বাজাদের সময় বা তৎপূর্ব্বে দুবলহাটী বংশেব স্থিতি তাহাই অনুমিত হয়। জগৎরাম রায় দুবলহাটী রাজবংশের আদি পুরুষ। জগৎরাম হইতে রাজা হরনাথ বায় বাহাদুব পর্য্যন্ত ৫৩ জন পুরুষ দুবলহাটী রাজ্য অধিকাব করেন। সম্বৎ ১৯৪৮ (১৮৯০ খৃষ্টাব্দে) রাজা হরনাথেব মৃত্যু হয়। গড়ে প্রত্যেকের ৩৩ বৎসর বাজত্ব কাল বলিয়া ধরিলেও ৫৩ পুরুষে ১৭৪৯ বৎসব হয়। সুতবাং মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সম্বৎ প্রচারের ২০০ বৎসরেব পর যে দুবলহাটী বংশেব অভ্যুদয হয় তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইতে মুসলমানদের আক্রমণ পর্যন্ত বাঙ্গালা দেশে পাঁচটী বংশ ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করে। (১) এই পাঁচটী রাজবংশের কোন একটী রাজবংশের সময় দুবলহাটী বংশের অভ্যুদয় বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। ইহা কথিত আছে যে উত্তরে গঙ্গা নদীর উৎপত্তি স্থান হইতে দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র নদ হইতে পশ্চিমে পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষে দেবপালদেব নামক এক রাজা বাজত্ব করেন। (২) বাঙ্গালার

"From him, the Ayne Akberi continues the succession through five dynasties till the Muhomedan Conquest "-The Elp'iniatione's History of India, Book IV, Chapter !

(2) "It says in explicit terms, that the reigning Raja Deb Pal Deb (or Deva Pal Deva) passessed the whole of India, from the source of the Ganges to Adam's Bridge (reaching to Ceylon) and from the river Megna or Burumputer, to the Western Sea It specifies the inhabitants of Bengal, the caruatic and Tibet among his subjects, and alludes to his army marching through Conbora,-a coun'ry generaly supposed to be beyond the Indus, and, if not so, certainly in the extreme West of India "- The Elphinstone's history of India, foot note Book IV, Chapter I

ইতিহাসে ইহাঁর নাম এরূপ বিখ্যাত যে দেবপালদেব অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ অর্থাৎ বেহার, বাঙ্গালা, উড়িষ্যা, এই তিন প্রদেশ এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজাদের নিকট কর আদায় করেন এবং "মহারাজাধিরাজ রাজ-চক্রবর্ত্তী" উপাধি প্রাপ্ত হন। ইহাঁরই বংশধরেরা পালবংশীয় রাজা নামে বঙ্গদেশে রাজত্ব করেন। এই পালবংশীয় রাজার্দের রাজধানী গৌড়ে তদপরে নবদ্বীপে ছিল এবং পুরাতন রাজসাহী প্রদেশে তাঁহাদের অনেক কীর্ত্তিও আছে। আদিশূরের পূর্ব্বে অর্থাৎ রাজসাহী প্রদেশে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের উপনিবেশের পূর্ব্বে, রাজসাহী বন, জঙ্গল, বিল, নদ, নদীতে পরিপূর্ণ ছিল। লোকের বসতি সংখ্যাই কম ছিল, যে সকল লোক ছিল, তাহাদের মধ্যে আদিম নিবাসী অসভ্য জাতিই অধিক। এ সময় দুবলহাটী রাজ্য যে জঙ্গলময় গ্রাম চারিদিকে জলে পরিপূর্ণ এবং অসভ্যজাতির বাস ছিল, তাহা দুবলহাটী রাজ্যের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলেও কতক পরিমাণে প্রতীতি হয়। এখন এরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে দুবলহাটী বংশের অভ্যুদয় রাজসাহী বরেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজ নাম ধারণের পূর্ব্বে এবং সম্ভবতঃ পাল-বংশীয় রাজার সময়। এই বংশের অভ্যুদয়কালে জগৎরাম জঙ্গলময় ও জলময় দেশে একজন অপরিচিত ক্ষুদ্র স্বাধীন ভূম্যাধিকারী ছিল, তাহার আর ভূল নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এরূপ প্রাচীন বংশের ইতিবৃত্ত রক্ষিত হয় নাই; এবং যাহা কিছু রক্ষিত হইয়াছিল তাহাও রাজা হরনাথের মাতার সঙ্গে বিবাদে লোপ হয়। সুতরাং দুবলহাটী বংশের ইতিবৃত্ত সংক্ষেপ ও অসম্পূর্ণ হইবে তাহার আর সন্দেহ কি?

দুবলহাটী রাজবংশের উৎপত্তি— এই বংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটী জনশ্রুতি আছে। পদ্মা নদীর পূর্ব্বতীরে বর্ত্তমান মুরশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত যজ্ঞেশ্বরপুর গ্রামে জগৎরাম রায় নামে শুঁড়ী জাতীয় একজন ধনী বণিকের বাস ছিল। তিনি দেশ বিদেশ বাণিজ্য জন্য বহুবিধ বাণিজ্য দ্রব্যাদিসহ অনেক নৌকা বোঝাই করিয়া কবিকঙ্কণের শ্রীমন্ত সওদাগরের ন্যায় জলপথে গমনাগমন করিতেন। একদা বাণিজ্য দ্রব্যাদি পরিপূর্ণ বহু নৌকাসহ বাটী হইতে বহির্গত হইয়া উত্তরাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। একটী ক্ষুদ্র নদী বর্ত্তমান দুবলহাটী গ্রাম দিয়া প্রবাহিত হইত। সে নদীর চিহ্ন এখনও আছে। হাতাসের বিলের সহিত এই নদীর যোগ আছে। এই বিল দিয়া জগৎরাম তাহার নৌকা-আদিসহ যাইতে যাইতে এক রজনীতে বর্ত্তমান দুবলহাটীর দুই মাইল ঠিক উত্তর এ নদীর তীরে কশবা গ্রামে বাণিজ্য তরীগুলি বাঁধিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। এই প্রবাদ যে রজনীতে নিদ্রায় অভিভূত হইলে, দেবী 'রাজরাজেশ্বরী" জগৎরামের নিকট আবির্ভূতা হইলেন। জগৎরাম স্বপ্নে দেবীকে সম্মুখে দেখিতে পাইলেন। দেবী বলিলেন, "জগৎরাম! আমি অনেক দিন হইল এই স্থানে ভূমিতলে বাস করিতেছি, আমাকে ভূমিতল হইতে উঠাইয়া তুমি সেবা কর, তোমার মঙ্গল হইবে।" এখনও এই "রাজরাজেশ্বরী" দেবীর সেবা রীতিমত দুবলহাটী রাজবাটীতে হইতেছে। স্বপ্নাদেশের পর জগৎরামের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া জগৎরাম দেখিলেন, যে স্থানে তাহার বাণিজ্য তরীগুলি আছে তাহার চতুর্দ্দিকের গ্রামগুলি জঙ্গলময় এবং জলরাশি মধ্যে এক একটা গ্রাম যেন জলে ভাসিতেছে; কেবল স্থানে ২/১ ঘর ইতর লোকের বাস। পরে জগৎরাম জানিতে পারিলেন যে এ গ্রামবাসীরা স্বাধীন, কাহাকে কোন কর দেয় না। ভাগ্য প্রসন্ন হইলে লোকের সকল বিষয়ই সুবিধা হয় এবং বুদ্ধি-কৌশলও ভাগ্য প্রসন্নের সঙ্গে সঙ্গে মানবের অবস্থাকে পরিবর্ত্তন করিয়া দেয়। জগৎরামের অর্থ বল যথেষ্ট এবং সঙ্গেও অনেক নৌকা, অনেক দ্রব্য ও অনেক টাকাও ছিল। আবার গ্রাম-গুলির স্বামীও কেহই দেখা যাইতেছে না। তখন দেবীর স্বপ্নাবিষ্ট কথার "তোমার মঙ্গল হইবে" উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, জগৎরাম ক্রমে গ্রামগুলি দখল করিয়া জঙ্গল পরিষ্কার করিতে আরম্ভ

করিলেন। এই কার্য্যে কোন বাধা না পাইয়া তিনি উৎসাহের সহিত বন, জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া এবং নূতন প্রজাকে অগ্রিম টাকা দিয়া বসতি করাইতে লাগিলেন। এইরূপ করিতে করিতে তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার বাণিজ্য করা অপেক্ষা এই নূতন রাজ্য আবিষ্কার করাই বেশী লাভ হইবে। তখন তিনি বাণিজ্য একবারে ত্যাগ করিয়া ক্রমে নিজ রাজ্য বিস্তার করিতে করিতে প্রায় ১০/১২ ক্রোশ মধ্যের গ্রামগুলিতে তাঁহার অধিকার স্থাপন করিলেন, এবং কর আদায় করিতে লাগিলেন। এইরূপে আধিপত্য স্থাপিত হইলে জগৎরাম কশবা গ্রামে নিজ বাসভবন স্থির করিয়া, সেই "রাজরাজেশ্বরী" দেবীকে নির্দিষ্ট স্থান হইতে উত্থিত করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিলেন। যেরূপ শ্রীমন্ত সওদাগর বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া সিংহল প্রভৃতি দেশে গিয়া ব্যবসা করেন এবং ভারতবর্ষের পশ্চিম অঞ্চল গিয়া জঙ্গল কাটিয়া ভগবতীয় অনুগহে গুঞ্জর দেশ অর্থাৎ গুজরাট রাজ্য স্থাপন করেন, সেইরূপ জগৎরাম বাণিজ্য বল লইয়া ভারতবর্ষের নানা স্থানে ব্যবসা করেন এবং শেষে বঙ্গদেশের পশ্চিম অঞ্চলে গিয়া জঙ্গল কাটিয়া দেবী "রাজরাজেশ্বরীর" অনুগ্রহে দুবলহাটী রাজ্য স্থাপন করেন। এই জগৎরামই দুবলহাটী রাজবংশের আদি পুরুষ।

জগৎরামের বংশধরগণ—জগৎরাম হইতে ৪৪ পুরুষ পর্য্যন্ত এই বংশধরগণের মধ্যে কাহার নাম জানিবার উপায় নাই। সুতরাং ৪৫ পুরুষ হইতে জগৎরামের বংশে যে যে ব্যক্তি রাজত্ব করেন, তাহাদের নাম নিম্নে দেওয়া গেল।

পুরুষ	ভূম্যধিকারীর নাম।	পুরুষ	ভূম্যধিকারীর নাম।
১	জগৎ রাম	৫০	শিবনাথ রায়চৌধুরী
৪৫	তুলসীরাম রায়চৌধুরী	৫১	কৃষ্ণনাথ রায়চৌধুরী
৪৮	মুক্তারাম রায়চৌধুরী	৫২	আনন্দনাথ রায়চৌধুরী
৪৭	কৃষ্ণরাম রায়চৌধুরী	৫৩	রাজা হরনাথ চৌধুরী রায়বাহাদুর
"	রঘুরাম রায়চৌধুরী (দুইভ্রাতা)	৫৪	কুমার ঘনদানাথ রায়চৌধুরী
৪৮	রঘুনাথ রায়চৌধুরী	"	কুমার ক্রীঙ্কারীনাথ রায়চৌধুরী (দুইভ্রাতা)
৪৯	পরমেশ্বর রায়চৌধুরী		

কাহার সময় হইতে এবং কিরূপ ঘটনায় নামের পর "রায় চৌধুরী" উপাধি সংযোজিত হয় তাহার বিবরণ জানা যায় না। কিন্তু তুলসীরাম হইতে "রায় চৌধুরী" প্রত্যেক নামের পর সংযোজিত হইয়াছে। কেবল হরনাম-রায় চৌধুরী ভিন্ন দুবলহাটী বংশে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট হইতে কোন ব্যক্তি "রাজা বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হয় নাই। কিন্তু রাজসাহীর প্রথানুসারে বড় বড় জমিদারকে তাহার রাইয়তেরা "রাজা" বলিয়া সম্বোধন করে। সেই প্রথানুসারে রাইয়তেরা দুবলহাটী জমিদারকে পূর্ব্ব হইতে রাজা বলিত। (১)

জগৎরাম হইতে কৃষ্ণরাম পর্য্যন্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ— এই দীর্ঘকাল মধ্যে ৪৬ পুরুষ দুবলহাটী রাজ্যে রাজত্ব করেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী পালবংশের লোপ হইলে হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী

(1) "There are several Zamindars in Rajshahi who call themselves Rajas They have certainly not been enobled by the Govenment, but they possess large landed properties, on the strength of which their retainers and royats address them as Rajas Among them may be mentioned Hara Nath Cbaudhari of the Suri Caste, commonly called Raja of Duballati; etc,-The Rajas of Rajshahi, Calcuna Review

সেনবংশীয বাজগণ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিলেন। পালবংশীয় কি সেনবংশীয রাজাদের সময় দুবলহাটীর ভূম্যধিকারী যে কর দিয়াছেন তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। ইহাই বেশীসম্ভব যে ক্ষুদ্র জঙ্গলময় এবং জলময় রাজ্য বলিয়া দুবলহাটী রাজ্য পাল ও সেনবংশীয় রাজাদের অজ্ঞাত ছিল। সুতরাং জগৎরামের বংশধরেরা দীর্ঘকাল দুবলহাটী বাজ্য নিষ্কর ভোগ করিতেন। সেনবংশীয় রাজাদের সময় মুসলমানেরা বঙ্গদেশ অধিকার কবেন। এই সময় বা তাহার অব্যবহিত পরে মুসলমানেরা জানিতে পারিলেন যে দুবলহাটী বাজ্যের ভূম্যধিকাবী নিষ্করে রাজ্য ভোগ করিতেছেন। তখন মুসলমান সম্রাট দুবলহাটী রাজ্যেব ভূম্যধিকারীব নিকট বাজস্ব চাহিলেন। ভূম্যধিকারী মুসলমান সম্রাটের নিকট প্রকাশ কবিলেন যে, "আমি যে ক্ষুদ্র বাজ্যেব অধিকাবী তাহাব প্রজার কর এত কম যে রাজার বাজস্ব দিলে আমার কিছুই থাকিবে না, আমার কেবল পরিশ্রম মাত্র হইবে; রাজ্যেব অধিকাংশ স্থান প্রায় সমুদয় বৎসর জলময় থাকে এবং যে স্থানে জল নাই সে স্থানের অনেক ভাগ জঙ্গলময় ও প্রচুব শস্য উৎপন্ন হয় না"। এই কথায় মুসলমান সম্রাট বিশ্বাস করিয়া ভূমাধিকারীকে বলিলেন, ভূমি নিষ্করে রাজ্য ভোগ কর, কেবল বাজকর স্বরূপ প্রতিবৎসর ২২ কাহন কবজী মৎস্য সম্রাট সমীপে দিতে হইবে এবং শেষ চিহ্ন স্বরূপ "ভুবী ও ডঙ্কা" ব্যবহার করিতে পারিবে। সেই অবধি দুবলহাটী বংশীয়েবা" তুরী ও ডঙ্গা "ব্যবহাব করিয়া থাকে। বার্ব্বকপুব পরগণা দুবলহাটীব রাজ্য। এই গরগণায় এখনও যেরূপ ৫০/৬০ বিল ছিল এবং হিন্দু জালুয়া ও গাওয়া" নামে এক প্রকার মুসলমান জাতীয় প্রায় ৫০০/৬০০ ঘব মৎসাজীবীর যে দেখা যায় এবং এখনও সেরূপ কবজী মৎস্য বিলে পাওযা যায়, তাহাতে ইহা নিতান্ত অমূলক নহে যে কেবল "২২ কাহন কবজী মৎস্য কব স্বরূপ' দিতে হইত। এইরূপে জগৎরামের বংশধবেবা কিছু দিন রাজ্যভোগ করেন। মোগল সম্রাট আকববের সময় রাজা টোডরমল্ল সমগ্র বঙ্গদেশ জরীপ কবিয়া তাহাব বাজস্ব নির্দ্ধারিত করেন। সেই সময় দুবলহাটী বাজ্যের রাজস্ব অতি নগন্য ছিল। "তকসীম জমায়" ইহা জ্ঞাত হওয়া যায় যে বাঙ্গালাব সুবাদারের অধীন সরকার ঘোড়াঘাটের অন্তর্গত এক বার্ব্বকপুর মহাল দৃষ্ট হয়। ইহাব বার্ষিক জমা ৮৪,৯৫২ দাম ছিল। (১) আবার ঐ সুবার অধীন সবকার অমতাবাদের (গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী) অন্তর্গত মালদহেব আশ পাশ বার্ব্বকপুর প্রভৃতি ১১ খান মহালেব নাম দেখা যায়; ইহাদের কোন বাজস্ব ছিলনা। (২) "হস্তবুদে" ইহা দেখা যায় সরকাব পীঞ্জাবা চাকলা ঘোড়াঘাটের অন্তর্গত বার্ব্বকপুরের ১১৩৫ বঙ্গাব্দের আসল জমা ৬০৭ সিক্কা টাকা এবং ১১৩৮ বঙ্গাব্দে "হস্তবুদে" জমা ৭২২ সিক্কা টাকা ছিল। (৩) সরকাব অমতাবাদের অন্তর্গত বার্ব্বকপুরেব কোন নির্দিষ্ট জমা আইন আকবরীতে দেখা যায় না এবং "হস্তবুদে" যাহার জমা ৭২২ সিক্কা টাকা মাত্র ছিল, তাহাই দুবলহাটী বাজ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত কবা যাইতে পারে। "হস্তবুদে" যেমন রাজসাহী প্রদেশ, লস্কবপুব, তাহিবপুব, সাঁতুলেব স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাম উল্লেখ আছে, তেমনই বার্ব্বকপুরেরও স্বতন্ত্র নাম দেখা যায। ইহাতে এই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, বার্ব্বকপুব উদিতনারাযণের বা বাণী ভবানীর বাজসাহী রাজ্যেব অন্তর্গত ছিল না। ইহা প্রথম হইতেই একটী স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল।

---

(1) Ayen Akberi
(2) The Enuirons of Maldah, Mahals vic
1 Barbuckpoor
2 Yusef Bazar
3 Hanehly Maldah
4 Dhurpoor
5 Sujapoor
6 Sermadhelpor
7 Sengoolya
8 Salazery
9 Shahnindooy
10 Tettahpoov
11 Mavzzeddunpoor
(3) The fifth Report from the Select Committee on the Affairs of the * Company

কৃষ্ণরাম বায়চৌধুরীর সময় কশবা হইতে দুবলহাটী রাজবাটী নির্ম্মাণ হয়। কৃষ্ণরাম ও রঘুরাম দুই ভ্রাতা। কৃষ্ণবাম জ্যেষ্ঠ ও বঘুরাম কনিষ্ঠ। কিছুদিন একত্র বাস কবাব পর দুই ভ্রাতার মনান্তব ঘটিল। মনান্তর হওয়ার পর ভূসম্পত্তি দুই অংশ হইল। জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণরাম ।/০ আনা অংশ এবং কনিষ্ঠ রঘুরাম ৷৯০ আনা অংশ পাইলেন। কৃষ্ণবাম জমিদারীর ।/০ আনা অংশ লইয়া দুবলহাটীতে বাস ভবন নির্দ্দেশ কবেন। কশবাতে আর বাস কবিলে বংশ থাকিবে না এই কুসংস্কারবশত দুই ভ্রাতাই বাসস্থান ত্যাগ কবিয়া স্থানান্তরে বাস ভবন নির্দ্দেশ করিতে বাধ্য হন। জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণরাম অপুত্রক পরলোক গমন কবিলে তাহার বিধবা স্ত্রী এক একজন পবে ক্রমান্বয়ে চাবিটী দত্তক পুত্র গ্রহণ কবিলেন। কিন্তু দূর্ভাগ্যবশত একে একে সকল পুত্রই পরলোক গমন করিল। এইরূপ দুর্ঘটনায় কৃষ্ণবামেব বিধবা স্ত্রীব সংসারে বিবাগ জন্মিল এই বিধবা রাণীর সহিত রঘুরামেরও মনান্তর ছিল। সুতরাং সেই বিধবা বাণী তাহাব ।/০ আনা অংশ বলিহাবেব ও দামনাশের জমিদারদের নিকট বিক্রয় করেন। (১) দুবলহাটী রাজ্যের কেবল ৷৯০ আনা অংশ রঘুবামের হস্তে রহিল। দুবলহাটীব বর্ত্তমান কুমারেরা ঐ রঘুরামেব বংশধব।

রঘুনাথ চৌধুরী— রঘুনাথ, রঘুবামের পুত্র। বঘুনাথের স্ত্রীর নাম বিদ্যাধবী চৌধুবাণী। ইহাঁর রাজত্ব সময়ে কোন প্রধান-ঘটনা দেখা যায় না। ইনি মৃত্যুকালে, ইহাব পত্নীব ভরণপোষণ জন্য দুবলহাটী বাজ্যের ৯০ আনা অংশ দান বিক্রয়ের ক্ষমতা সহিত হেবা কবিয়া দেন। এই হেবানামা সূত্রে বিদ্যাধবী দুবলহাটী বাজ্যেব ৯০ আনা অংশ অধিকাব কবিতে লাগিলেন। অবশিষ্ট ৷৯০ আনা রঘুনাথেব পুত্র পরমেশ্বরেব দখলে বহিল।

শৈলগাছী বংশোৎপত্তি— পবমেশ্বব রায়ের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ শিবনাথ কনিষ্ঠ কাশীনাথ। পরমেশ্বর পরলোক গমন করিলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবনাথ পিতৃবাজ্যেব ভাব গ্রহণ কবিলেন। সুতরাং কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাশীনাথ মাসিক মোসহাবা গ্রহণে স্বতন্ত্র বাস কবিতে লাগিলেন। শিবনাথের মৃত্যুব পব, তাঁহাব পুত্র কৃষ্ণনাথ পিতৃবাজ্যেব অধিকারী হইলেন। এই সময় পরমেশ্বরের কনিষ্ঠ পুত্র কাশীনাথ দুবলহাটী বাজ্যেব অংশ পাইবাব চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। বঘুনাথেব পত্নী বিদ্যাধবী অপত্য স্নেহবশতঃ তাঁহাব পতিব দুবলহাটী বাজ্যেব দান করা ৯০ আনা অংশ পবমেশ্বরেব কনিষ্ঠ পুত্র কাশীনাথকে হেবানামা-সূত্রে দান করিয়া পবলোক গমন করেন। এই কাশীনাথ হইতে শৈলগাছী বংশের উৎপত্তি হইল। এই শৈলগাছী যমুনা নদীর তীরে এবং কাশীমপুর হইতে দুই মাইল দূর। কাশীনাথেব বংশধবেরা দুবলহাটীব ৯০ আনির জমিদার বলিয়া প্রসিদ্ধ। কাশীনাথের পুত্র গৌবনাবায়ণ এবং গৌবনারায়নের পুত্র গোলোকনাথ। এই গোলোকনাথ স্বধর্ম্মপরায়ণ এবং অতিথি সেবাব অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। "যস্য ন জ্ঞায়তে নাম নচ গোত্রং নচ স্থিতিঃ অকস্মাৎ গৃহমায়াতি সোঽতিথিঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ।" এইশাস্ত্রোক্ত বচনের উপর নির্ভর করিয়া অতিথিব নাম, গোত্র বা কোন পরিচয় লইতেন না। ভিক্ষাব্যবসায়ীই হউক বা পুস্তক বিক্রেতাই হউক, যে ব্যক্তি ভোজনার্থী

---

(১) বলিহাব ও দামনাশ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণেব সমাজ। ইহাতে প্রমাণ হয় বাজসাহী "বাবেন্দ্র সমাজ" নাম ধাবণ কবাব পব বলিহার রাজবংশের অভ্যুদয এবং বাজসাহী "বাবেন্দ্র সমাজ" নাম ধাবণেব অনেক পূর্ব্বে দুবলহাটী বাজ্যেব অভ্যুদয়। ইহাও এস্থলে বলা যাইতে পাবে যে চিবস্থাযী বন্দোবস্তেব পূর্ব্বে বার্ব্বকপুবেব আযতন অনেক বেশী ছিল। ইহা বুঝা যায চিবস্থাযী বন্দোবস্তেব সময হইতে বার্ব্বকপুব ও বলিহাব দুই স্বতন্ত্র পবগণাব আযতন ২৮,১৫ বর্গমাইল এবং বর্ত্তমান বার্ব্বকপুব পবগণাব আযতন ৯৯.৬০ বর্গমাইল। যদি বর্ত্তমান বলিহাব পবগণা দুবলহাটী বাজ্যেব অন্তর্গত হয, তবে পূর্ব্বে দুবলহাটী বাজ্য ১২৭-৭৫ বর্গ মাইল ছিল বলিযা অনুমিত হয।

হইয়া তাঁহার গৃহে আসিত, তিনি তাঁহাকেই অতিথি করিতেন। সময়, জাতি বা অবস্থার ভেদাভেদ তাঁহার নিকট ছিল না। তিনি অপুত্রক পরলোক গমন করিলে তাঁহার পত্নী এক দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়াছেন। পরমেশ্বর হইতে যে শৈলগাছী বংশের উৎপত্তি, তাহার বংশাবলী নিম্নে দেওয়া গেল ঃ—
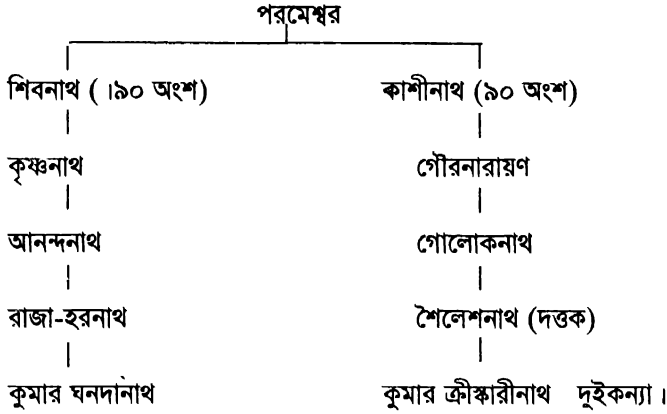
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত— রাজা হরনাথ চৌধুরী রায় বাহাদুরের পিতামহ কৃষ্ণনাথ চৌধুরীর সময় ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পন্ন হয়। লর্ড কর্ণওয়ালিশ বার্ষিক ১৪৪৯৫ ।/০ আনা রাজস্বে কৃষ্ণনাথের নিকট কবুলিয়ত গ্রহণ করেন। এই জমিদারী রাজসাহী কলেক্টরী তৌজির নম্বর ১৬২ পরগণে বার্ব্বকপুর। কাশীম আলীর রাজত্ব সময়ে বাঙ্গালা ১১৬৮ সালে (১৭৬১ খৃষ্টাব্দ) বার্ব্বকপুরের হস্তবুদ জমা ৭২২ সিক্কা টাকা ছিল।

কৃষ্ণনাথের বংশধর— কৃষ্ণনাথের পুত্র আনন্দনাথ। আনন্দনাথের কোন পুত্র সন্তান জন্মে না। তাঁহার পত্নী রূপমুঞ্জরীকে দত্তক পুত্র রাখিবার অনুমতি দিয়া, আনন্দনাথ পরলোক গমন করেন। পতির মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী রূপমুঞ্জরী দুবলহাটী রাজ্যের ভার গ্রহণ করিয়া হরনাথকে দত্তক পুত্র স্বরূপ রাখিলেন। এই দত্তক পুত্রের সহিত, মাতার মনান্তর উপস্থিত হইল। মাতা দত্তক পুত্র অসিদ্ধ জন্য রাজসাহীর জজ আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। নিম্ন আদালতে দত্তক সিদ্ধ হইলে, মাতা কলিকাতা হাইকোর্টে নিম্ন আদালতের আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করেন। এই আপীল করার পর, রূপমুঞ্জরী চৌধুরাণী অত্যন্ত পীড়িত হইয়া প্রাণসংশয় কাতর হন। এমন সময় পুত্রের প্রতি স্নেহের উদয় হয় এবং তিনি পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে পুত্র হরনাথ মাতার নিকট উপস্থিত হইলে, তাহাকে দুবলহাটী রাজ্যভার গ্রহণ করিতে অনুমতি করেন। সম্বৎ ১৯১০ (১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে) হরনাথ রায় চৌধুরী দুবলহাটী রাজ্যের ভার গ্রহণ করেন। ইহার অল্পদিন পরেই তাঁহার মাতা রূপ-মুঞ্জরী পরলোক গমন করেন।

রূপ-মুঞ্জরী চৌধুরাণীর সময় রাজ্য লাভ— জগৎরামের সময় হইতে রূপ-মুঞ্জরী চৌধুরাণীর সময় পর্যন্ত জগৎরামের বংশধরগণ মধ্যে কেহই নূতন জমিদারী লাভের যত্ন বা চেষ্টা করেন নাই। রূপ-মুঞ্জরী চৌধুরাণীর বিষয় বুদ্ধি বিলক্ষণ ছিল। তাঁহার সময় যে সকল

জমিদারী দুবলহাটী রাজ্যভুক্ত হয়, তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল ঃ—

জেলার নাম।	কালেক্টরীর তৌজির নম্বর।	মহালের নাম।
রাজসাহী	১৮২৯	চক কালিদাস ও রঘুনাথপুর।
ঐ	৭৩৮ হাল নম্বর ২১৯৭	মহাল দেওয়ানপুর।

দুবলহাটী রাজ্যের প্রজা বিদ্রোহ— পূর্ব্বে দুবলহাটী রাজ্যের জরীপ জমাবন্দী রীতিমত হয় নাই। সুতরাং প্রজার রাজস্ব বেশী ছিল না। হরনাথ রায় চৌধুরী দুবলহাটী রাজ্য জরীপ করান। জমাবন্দীর সময় কতকগুলি দুষ্ট প্রজা একত্রিত হইয়া বৃদ্ধি হারে জমা দিবে না বলিয়া ক্রমে দল পাকাইতে লাগিল। শেষে প্রায় সমস্ত প্রজাই বাঙ্গালা ১২৯১ সালে (১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে) বিদ্রোহী হইয়া উঠে। রাজাকে কর দিতে প্রজারা বিরত হইল। বাঙ্গালা ১২৯৬ সালে (১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে) সেটেলমেন্ট আদালতের সাহায্যে প্রজার কর বৃদ্ধি হইল এবং প্রজাগণও সুশাসিত হইল। এই বন্দোবস্তে প্রায় বিশ হাজার টাকা দুবলহাটী রাজ্যের কব বৃদ্ধি হইল। দুবলহাটী রাজ্যে অনেক জমিন বহুকাল হইতে পতিত ছিল এবং জলময় ছিল। ক্রমে জমি উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি হইয়া নানাবিধ শস্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে। আবার বার্ব্বকপুরে প্রায় ১৮০০ বিঘা জমিতে গাঁজা জন্মে। গাঁজার চাষে প্রজার বিলক্ষণ লাভ। এমতাবস্থায় প্রজার কর বৃদ্ধি হওয়াতে প্রজার অসুবিধা হওয়াই সম্ভব নহে।

হরনাথ রায়চৌধুরীর সময় জমিদারী লাভ— হরনাথ রায় চৌধুরীর সময় যে যে জমিদারী লাভ হয় তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল ঃ—

জেলার নাম।	কালেক্টরীর তৌজির নম্বর।	মহালের নাম।
রাজসাহী	৯৮০; ১৬৬	কিঃ ভাকৈল বনামে আবাদপুর।
"	৯৭৯	জফরাবাদ।
"	৯৮৫/৮৬/৮৭	হানঘোষপাড়া।
"	১৭৫৪	খাসবন্দোবস্তী মহাল বুজরক আতিপ্পা।
"	১৮৭৬	মহাল যমুনী।
"	১৭৩৬	ফুলীহার।
"	২২৭	পরগণে তেগাছীর তারু গোড়সর।
"	২৪০	" " তালুক কর্ণভাগ।
"	৯৮১	" বার্ব্বকপুর তারুক ভবানীগাছী উলাসপুর।
"	২২৩১	" ফতেজঙ্গপুরের লাট নন্দাহার।
রাজসাহী	২২২০	পরগণে ফতেজঙ্গপুরের লাট নারায়নপুর।
"	১০৪৭	" তাহিরপুর কিঃ রসুলপুর।
"	১৭২৬	" বার্ব্বকপুর বঃ আতিথা মৃজাপুর।
বগুড়া	১৪২ হালনম্বর ১৪৭	" খাট্টার মোতালক ডিহি পুণ্ডরিয়া।
"	২৭ বি	" খাট্টা নিষ্কর কিঃ লস্করপুর গাঙ্গজোযার বঃ রহিমপুর।
দিনাজপুর	২৩৮	মহাল পরগণে সুলতানপুব।
"	৫৯৭	পরগণে সুলতানপুরের তালুক আমড়া

"	৯৮৮	" " নিষ্কর আমড়া।
"	১২৭	মহাল পরগণে গিলাহবাড়ী নাট পুঘুবী।
"	৪৭	" " খলসীর নাট লোকা।
ফরিদপুর	২৩৪৯	মহাল পবগণে মকিমপুবের মোতালক তালুক চৈতন্যকৃষ্ণ রায় মৌজে ঘোনাপাড়া।
শ্রীহট্ট	৪৭০৩১/১ হাল নম্বব ৭	পরগণে ভানুগাছেব তালুক বায গৌরহবি সিংহ তালুকদাবী বাধাগোবিন্দ সিংহ সম্পর্কীয মৌজে কুমড়াকাপন।
	৪৭০৩১/১	পরগণে ভানুগাছের তালুক রায় গৌরহবি সিংহ ও তালুকদাবী রাধাগোবিন্দ সিংহ সম্পর্কীয় মৌজে গোপালনগর, মৌজে পাণিশালাসমেত তদন্তর্গত প্রকাশ নাম জাদেহাট বাজার কমলগঞ্জ ও চাঁদনী কট এবং মৌজে বড়গাছা।

হরনথের মাতার পুর্ব্বে কেবলরগণে বার্ব্বকপুরেব ।৯০ আনা অংশ জমিদাবী ছিল। তাঁহাব মাতা রূপমুঞ্জরী চৌধুরাণীর সময় অল্প জমিদারীই লাভ হয। কিন্তু হরনাথের সময় বিস্তর জমিদারী লাভ হয়। পূর্ব্বে কেবল রাজসাহী জেলার বার্ব্বকপুর পরগণার ।৯০ আনা দুবলহাটী রাজ্য মাত্র কিন্তু হবনাথের সময়ে দুবলহাটী রাজ্য রাজসাহী, বগুড়া, দিনাজপুব, ফরিদপুব এবং শ্রীহট্ট, এই পাঁচ জেলার বিস্তৃত। জগৎরামের সময়ে দুবলহাটী বাজ্যের যে আয়তন ছিল, তদপেক্ষা এক্ষণ দুবলহাটী রাজ্যেব আয়তন চারিগুণেব বেশী বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। হরনাথ কোন কলেজে বা স্কুলে শিক্ষিত হন নাই, কিন্তু তাঁহার বিষয় বুদ্ধি এত প্রবল ছিল যে দুবলহাটী রাজবংশের কোন রাজা তাঁহার মত বিষয় বুদ্ধিব পবিচয় দেখাইতে পারেন নাই। আবার নিজ বুদ্ধিগুণে তাঁহাব সুযোগ্য মন্ত্রী বাবু শশিভূষণ বাযের এবং বুদ্ধিমতী জ্যেষ্ঠা পত্নীর উপদেশকে শীরোধার্য্য কবিতেন। হরনাথের রাজ্য বিস্তারই তাঁহার বিষয় বুদ্ধিব এবং মন্ত্রী ও পত্নীর উপদেশেব সম্মান জাজ্বল্য প্রমাণ। তিনি যে কেবল রাজ্য বিস্তাব করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন এমত নহে। তিনি যেরূপ আয় বৃদ্ধি কবিয়াছেন, সেইরূপ অর্থের সার্থকতা সম্পাদনে নিজ বংশের গৌরবও বৃদ্ধি করিয়াছেন। যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার জন্য রাজসাহী বাসীদের "সাত সমুদ্র তেরনদী" পাব হইয়া এবং বহু অর্থব্যয় কবিয়া কলিকাতা যাইতে হইত যে শিক্ষা আজ ঘরে বসিয়া সামান্য ব্যয়ে কি ধনী কি দরিদ্র সকলেই প্রাপ্ত হইতেছেন। সে সময কলিকাতা বহু দিবসেব পথ ছিল। তখন রাজসাহীতে রেল প্রবেশ কবে নাই। সে সময় দরিদ্র পক্ষে কলিকাতা গমনাগমন অসাধ্য ব্যাপাব ছিল। এমন দুঃসময়ে রাজসাহীতে হরনাথই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শিক্ষার সুত্রপাত করেন। ইনিই রাজসাহী জেলা স্কুলকে দ্বিতীয় শ্রেণী কলেজে পবিণত করেন। এই মহৎ কার্য্য জন্য ইনি বার্ষিক ৫০০০ টাকা আয়ের সম্পত্তি গবর্ণমেন্টকে বাঙ্গালা ১২৭৯ সালের ৯ই মাঘ তারিখে (১৮৭৩ খৃষ্টব্দের ২১ জানুয়ারী) দান করেন। যদি বিশগুণ ধরা যায়, তথাপি ঐ সম্পত্তির মূল্য এক লক্ষ টাকা হয়। ইহা সামান্য দান নহে। ইহা ব্যতীত তাঁহার যথেষ্ট পুণ্যকীর্ত্তি আছে, তাহার উল্লেখ যথা-স্থানে করা যাইবে।

দুবলহাটী অতিথিশালা— যে অভ্যাগত, ভিক্ষাব নিমিত্ত বা ভোজনার্থী হইয়া গৃহস্থের গৃহে আগমন করে, তাঁহাকেই অতিথি বলে। এই অভ্যাগত ব্যক্তিদের আবাস স্থানকেই অতিথিশালা

বলে। গৃহে অতিথি উপস্থিত হইলে, গৃহস্থ তাহাব নাম, গোত্র বা কোন-পরিচয় জিজ্ঞাসা কবিবে না। গৃহস্থ কেবল তাহার সেবায় নিযুক্ত হইবে। যাহার গৃহ হইতে অতিথি বিমুখ হয়, তাহাব সমস্ত পুণ্য নষ্ট হয় এবং গৃহস্থ ঘোর পাপে নিমগ্ন হয়। গৃহস্থদিগেব গৃহে গৃহে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপলিত হইতেছে কি না, দেখিবার জন্য ধর্ম্ম অতিথিরূপে ভ্রমণ কবিয়া থাকেন। অতিথি গৃহস্থের গৃহ দেখিয়া তাহাতে উপস্থিত হয়। যদি সেখানে তাহাব আতিথ্য না হয তবে সে গৃহে আর অরণ্যে প্রভেদ কি? অতিথিকে অতি মধুব বাক্যে সম্ভাষণ কবিয়া যথা বিধানে তাঁহার সৎকার কবিবে। ইহার অন্যথায় গৃহস্থ ঘোব নবকে পতিত হয। অতিথি ব্রাহ্মণ হউন বা অন্য জাতিই হউন, ধনীই হউন, কি দরিদ্রই হউন, তাঁহাব যথাবিধি পূজা কবা উচিত। যে-ব্যক্তি অতিথির প্রতি অনাদব প্রদর্শন করে, নরকের প্রাণিগণও তাহাব মুখ দেখিতে ঘৃণা বোধ কবে। হিন্দু গৃহস্থের অতিথি সেবাই প্রধান ধর্ম্ম। পুরাকালে কি বাজাব প্রাসাদে কি দবিদ্রের কুটীরে সর্ব্বত্র যথাবিধান অতিথির সৎকার হইত। এক্ষণে ইহাব বৈলক্ষণ্য অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ এক্ষণ কোন কোন হিন্দু জমিদারেরা অতিথি সেবাকে বৃথাকার্য্য মনে কবেন। তাঁহাবা ইহাকে পূণ্য-কীর্ত্তি বা কর্ত্তব্যকর্ম্ম একেবারে জ্ঞানই করেন না। আজ কাল জমিদারগণ কলেজ, স্কুল, ডাক্তাবখানা, রাস্তা প্রতিষ্ঠিত বা স্থাপিত কবিয়া সংবাদপত্রে গুণানুবাদ ও প্রশংসা শ্রবণে আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন। আবার এই পুণ্য কার্য্যের বিনিময়ে গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত মহারাজা, রাজা বা রায় বাহাদুর উপাধি পাইলে ত আর কোন কথাই নাই। কলেজ, স্কুল প্রভৃতি স্থাপিত করাও বিশেষ পুণ্যকীর্ত্তি। কিন্তু তাই বলিয়া গৃহস্থেব নিত্য ধর্ম্ম ত্যাগ করা কোন মতেই উচিত নহে। আবাব ইহাও সকলের জানা উচিত, সকাম দান দানই নহে, নিষ্কাম দানই দান। হিন্দুশাস্ত্রে কেন সকল জাতীয়ের শাস্ত্রেই লিখিত আছে, যে অতি গোপনে দান করিবে। আবাব কোন কোন হিন্দু গৃহস্থ বলিয়া থাকে যে, অতিথি সেবায বংশ লোপ পায়। অতএব অতিথি সেবা অকর্তব্য। তাঁহাদের এই সংস্কার তাহাদেব আমরা এই বলি যে, যদি অভ্যাগত অতিথিকে সেবা-করিলে-বংশ না থাকে, তবে সে বংশ থাকিয়াই বা কাব কি? হিন্দু গৃহস্থেব প্রধান, কার্য্য অতিথি সেবা এই কার্য্য যথা বিধানে নির্ব্বাহিত কবিয়া যে অর্থ থাকিবে সেই অর্থ দ্বাবা মানবেব অন্য পূণ্য কীর্ত্তি স্থাপন করাই যুক্তিসিদ্ধ। দুবলহাটী রাজবংশের পূণ্য-কীর্ত্তি এই প্রণালীর। এই বংশীয়দিগের প্রধান ধর্ম্মই অতিথি সেবা (১) হরনাথ যদিচ কলেজ, স্কুল স্থাপন প্রভৃতি পূণ্য-কীর্তিতেও যথেষ্ট অর্থ দান করিয়াছেন, তথাপি পূর্ব্বপুরুষের প্রধান কীর্ত্তি অতিথি সেবায় ব্যয় কোন প্রকারে হ্রাস করেন নাই; ববং অতিথি সেবার উৎকর্ষ সাধন কবিয়া বংশেব গৌরব বৃদ্ধি করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। দুবলহাটী অতিথিশালায় কোন অতিথি মাসাধিক বাস করিলেও তাহাকে চলিয়া যাইতে আদেশ হয়, না বা তাহার প্রতি তাচ্ছিল্য ভাব প্রকাশ হয না। এই কীর্ত্তি স্থির থাকিলে বা আরো উন্নতি লাভ করিলে, বংশর যশ, নাম ও গৌবব ক্রমে বৃদ্ধি হইবে। তাহার আর ভুল নাই। "এক কপর্দক হাতে না করিয়াও ভারতবর্ষেব সমস্ত গ্রামে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে পারা যায়।" এই কথাব মর্যাদা বক্ষা কবা রাজসাহীবাসীর নিতান্ত কর্ত্তব্য। অন্যান্য দেশ অপেক্ষা রাজসাহীতে এখনও অতিথি সেবা প্রণালীব প্রাধান্য দেখা যায। একান্নবর্ত্তিতা ও প্রচুর শস্য উৎপন্নতা অতিথি সেবার অনুরাগ স্থির রাখে না বৃদ্ধি কবে। কিন্তু ইউরোপীয় প্রণালীর সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনভাবে বাসের ইচ্ছা সংক্রমণিত হইলে, আতিথ্য ধর্মের হ্রাস হইয়া যাইবে। জগতের সকল দেশীয় লোক অপেক্ষা ভারতবাসীরা আতিথ্য ধর্মে শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিয়া থাকে। ঐ গৌরব রাজসাহীবাসীদেরও রক্ষা করা কি কর্তব্য নহে?

(১) অতিথিসৎকাবকে নৃযজ্ঞ কহে। গৃহীর পক্ষে শাস্ত্রে যে পঞ্চযজ্ঞেব বিধান অছে, তন্মধ্যে নৃযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ।

হরনাথের পূণ্য-কীর্ত্তি— হরনাথ দুবলহাটী রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া সৎকার্য্যে যে যে দান করিয়াছেন তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল ঃ—

পূণ্যকীর্ত্তি।	যত টাকা দান।
(১) রাজসাহী জেলা-স্কুলকে দ্বিতীয় শ্রেণী কলেজে পরিণত (বার্ষিক ৫০০০ লাভের সম্পত্তি বিশগুণ মূল্য)	১,০০,০০০
(২) একটী রাজপথ দুবলহাটী রাজবাটী হইতে নওগাঁও পর্য্যন্ত ৫ মাইল (কেবল বিলের মধ্যে)	২০,০০০
(৩) নওগাঁও মহকুমার কাছারী আদি প্রস্তুত জন্য গবর্ণমেণ্টকে দান ৩৬ বিঘা জমি, প্রত্যেক বিঘা ৫ টাকা, বিশ বৎসরের কর ধরিয়া নিষ্কর ভূমি	৩৬০০
(৪) পুস্তক, সংবাদ পত্রাদি মুদ্রিত করিবার জন্য বোয়ালীয়া ধর্ম্মসভাকে একটী মুদ্রাযন্ত্র দান অনুমানিক মূল্য	২০০০
(৫) জিওলজিকাল বাগানে (কলিকাতা)	১০০০
(৬) দারজীলিঙ্গ লাবিস জুবিলী সেনিটেরীয়াম	১০০০
(৭) কলিকাতা ইডেন হিন্দুহোস্টেল	১০০০
(৮) সার এসলী ইডেন সাহেবের জীবনচরিত মুদ্রিত করিবার সাহায্যার্থ নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে দান	৩০০
(৯) কলিকাতা সিটিকলেজের গৃহনির্ম্মাণজন্য সাহায্য	৪০০
(১০) রাজসাহী কলেজের সংশ্লিষ্ট হিন্দুবোর্ডীং গৃহনির্ম্মাণের সাহায্য	১০০০
	১৩০৩০০

হরনাথের এই মোটামুটী দানের তালিকা দিলাম। ইহা ব্যতীত দুঃখী দীন-দরিদ্র অভ্যাগতকে নিত্য দানও যথেষ্ট ছিল। তাঁহার নিত্য অর্থ দান অপেক্ষা নিত্য অন্নদানই বেশী প্রশংসনীয়। অন্ন ও জল দান অপেক্ষা জগতে অন্য কোন দানে মানবকে সন্তুষ্ট করা যায় না। যে ব্যক্তি ক্ষুধায় এক মুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত, এবং যে ব্যক্তি পিপাসায় কাতর, তাহাকে অন্ন ও জল না দিয়া অর্থ দিলে, সে কখনই সন্তুষ্ট হইবে না এবং অর্থে তাহার জীবনরক্ষা ও হইবে না। হরনাথ জানিতেন অন্ন ও জল মহাদান। অন্নদান যে মানবের প্রধান কর্ত্তব্যকর্ম্ম, সেই সংস্কারের বশীভূত হইয়া তিনি ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত দীন দুঃখীকে অন্ন ও জল দিয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। অন্নদানে তাঁহার পাত্রাপাত্র বিবেচনা ছিল না।

প্রজাপুঞ্জের বালকদের ও নিজ অমাত্যবর্গের বালকদের শিক্ষার জন্য ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে একটী অবৈতনিক মধ্যশ্রেণী ইংরাজী স্কুল (১) নিজ বাটীতে স্থাপন করেন; তাহা আজিও সুপ্রণালীতে পরিচালিত হওয়ায় প্রতি বৎসর বহুতর বালক মধ্যশ্রেণী ইংরাজী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে।

হরনাথের রাজ-সম্মান— হরনাথের পুণ্য-কীর্ত্তি জনসমাজে প্রকাশিত হইল এবং বৃটীশ রাজ দরবারেরও অগোচর রহিল না। তিনি রাজভক্তি প্রদর্শনে ও ক্রটী করেন নাই। হরনাথের ক্রিয়াকলাপে সন্তুষ্ট হইয়া দয়াবান্ প্রজাবৎসবল বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে রাজা এবং ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে রাজা বাহাদুর উপাধিতে সম্মানিত করেন। ইহার পূর্ব্বে দুবলহাটী

(১) এক্ষন উচ্চ শ্রেণী ইংরাজী স্কুলে পবিণত। এ একটী রাণীদেব প্রধান কীর্ত্তি।

রাজবংশের আর কোন রাজা বৃটীশ রাজ সম্মান প্রাপ্ত হন নাই। রাজা হরনাথ চৌধুরী রায় বাহাদুর হইতেই দুবলহাটী বংশের গৌরব বৃদ্ধি হয়।

রাজা হরনাথের শেষ জীবন— রাজা হরনাথ শেষাবস্থায় শারীরিক তত ভাল থাকিতেন না। ক্রমে শরীর অপটু হইলে, তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে এক খানি উইল করেন। এই উইল রেজেষ্টারী হইবার পর ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। দুই পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া এবং ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৩৮ বৎসর রাজ্য করিয়া, তিনি স্বর্গারোহণ করেন। দুই পুত্র—কুমার ঘনদ্রানাথ রায় চৌধুরী এবং কুমার ক্রীস্কারীনাথ চৌধুরী অপ্রাপ্ত বয়ঃক্রম; সুতরাং তাঁহাদের বিধবা মাতা রাণী শ্যামাসুন্দরী চৌধুরাণী ও উমাসুন্দরী চৌধুরাণীর কর্ত্তৃত্বাধীন রহিলেন।

রাজা হরনাথের উত্তরাধিকারী— রাজার কৃত উইল অনুসারে জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার ঘনদ্রানাথ রায় চৌধুরী দুবলহাটী রাজ্যের ।/০ এবং কনিষ্ঠ পুত্র কুমার ক্রীস্কারীনাথ রায় চৌধুরী ।৯০ আনা অংশ পাইবেন। কুমারগণ বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত দুবলহাটী রাজকার্য্য তাহাদের মাতার কতৃত্বাধীনে নির্ব্বাহ হইবে। সুতরাং দুবলহাটী রাজা কোর্ট অব ওয়ারডসের অধীন হয় নাই। সুবিজ্ঞ ম্যানেজার বাবু শশিভূষণ রায় মহাশয়ের পরামর্শে রানীরা একত্রিত হইয়া সুচারুরূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। রাণীরা কুমার-গণের (১) শিক্ষার যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন তাহাতে দিঘাপতিয়া কুমারগণের ন্যায় সুশিক্ষিত হইবার সম্ভব। পতির সৎকার্য্যের অনুকরণ করিয়া রাণীরাও পুণ্যকার্য্যে বিরত নহেন। পতির স্বর্গারোহণের পর রাণীরা নওগাঁ “প্রাইস দাতব্য চিকিৎসালয়ের” গৃহনির্ম্মাণ এবং মহকুমার কাছারীর নিকট পাকা ঘাটসহ একটী পুষ্করিণী খনন করিয়া দিয়াছেন। প্রজাদের জলকষ্ট নিবারণ জন্য স্থানে স্থানে পুষ্করিণী খনন করিয়া দিতেছেন। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের দেবার্চ্চনা, অতিথি সেবা ও নিত্য দান আদি কর্ম্ম পূর্ব্বের ন্যায় নির্ব্বাহ হইতেছে। দুই রাণী যেরূপ সদ্ভাবে সকল কার্য্য-নির্ব্বাহ করিতেছেন, তাহাতে রাজশ্রী ক্রমে বৃদ্ধি হইবে তাহার সন্দেহ নাই। এই সদ্ভাব স্থির থাকিলেই রাজ্যের কুশল।

দুবলহাটী রাজবংশের সমালোচনা— রাজসাহীতে দুবলহাটী রাজবংশের ন্যায় প্রাচীন রাজবংশ আর একটী দেখা যায় না। যে বংশ অদ্যাবধি বর্ত্তমান থাকিয়া ৫৪ পুরুষ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং দিন দিন উন্নতি লাভ করিতেছেন, সে বংশের যশঃগৌরব কীর্ত্তন করা অতীব আনন্দের বিষয়। এরূপ প্রাচীন বংশ ব্রাহ্মণ বা উচ্চ কুলোদ্ভব হইবে ইহার যশঃ ও নাম বহুদূর বিস্তৃত হইত তাহার আর ভুল নাই। যে বংশের স্থিতি ১৭০০।১৮০০ বৎসর অনুমান করা যায়, সে বংশের পুণ্যফল ব্যতিরেকে এত দীর্ঘকালের স্থায়িত্ব সম্ভব নহে। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে অনেক জাতি বা অনেক বংশের রাজ্যলাভের প্রধান কারণই বাণিজ্য। “বাণিজ্যেই লক্ষ্মী” এই বাক্যের সার্থকতা দুবলহাটী রাজবংশ বিশেষরূপ সম্পাদন করিয়াছেন। সদুপায়ে শ্রম-লব্ধ রাজ্যের স্থায়িত্ব দীর্ঘকাল সম্ভব। দুবলহাটীর রাজ্য এই শ্রেণীর রাজ্য। অসদুপায়ে যে রাজ্য লাভ হয়, তাহার স্থায়িত্ব দীর্ঘকাল সম্ভব নহে। ধর্ম্মের সহিত অর্থোপার্জ্জনে বংশের উন্নতি ধীরে ধীরে হয়; কিন্তু দীর্ঘকাল স্থায়ী থাকে। যেমন একটী দীপ-শিখা অত্যন্ত

(১) ইহাঁরা ১৩০৭ সনের ফাল্গুন মাসে বিবাহিত এই বিবাহে লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয় হইয়াছে। এই বিবাহে ১২০০০ কাঙ্গালীকে ভদ্রলোকদিগের ন্যায় লুচি, সন্দেশ, মিঠাই, ক্ষীর, দধি প্রভৃতি দ্বারা ভোজন করান হইয়াছে এবং প্রত্যেককে ।০ আনা করিয়া বিদায় দেওয়া হইয়াছে। “ইহাদিগের ভোজন ব্যাপারে বিশৃঙ্খলা না হয় এই অভিপ্রায়ে কুমারদ্বয় ও সুদক্ষ ম্যনেজার শ্রীযুক্ত শশিভূষণ রায় মহাশয় নগ্নপদে বিচরণ ও পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন।” এ ব্যাপারে জাতি ও বর্ণের তারতম্যে ভোজনেব ভিন্নভাব ছিল না। কি ধনী, কি দরিদ্র, কি ভিক্ষুক সকলকেই সমভাবে যত্ন করা হইয়াছে। ইহাই প্রশংসনীয়।

প্রজ্জ্বলিত হইয়া সহসা নির্ব্বাণ হইয়া যায়, তেমনই অধর্ম্মে উপার্জ্জিত অর্থে যে বংশ অল্প সময় মধ্যে উন্নতি লাভ করে, সে সহজেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। অর্থোপার্জ্জনের সময় যে ব্যক্তি ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য করে না, সে বালির উপর অট্টালিকা নির্ম্মাণের ন্যায় বৃথা পরিশ্রম করে।

চৌগ্রাম রাজবংশ

রাজসাহীর জমীদার— রাজসাহীতে কতকগুলি একরূপ বড় বড় জমিদার আছেন যে তাঁহারা রাজা বলিয়া পরিচিত। গবর্ণমেন্ট রাজা উপাধি দ্বারা তাঁহাদিগকে সম্মানিত করেন নাই; কিন্তু তাঁহাদের প্রচুর জমিদারী আছে এই জন্য তাঁহাদের প্রজারা জমিদারকে "রাজা" বলিয়া সম্বোধন করে। চৌগ্রামের জমিদার এই শ্রেণীর রাজা। (১) চৌগ্রাম বিলের মধ্যে এবং সিঙ্গড়া থানা হইতে প্রায় ৪/৫ মাইল উত্তর-পূর্ব্বদিকে। একটী রাজপথ রামপুর বোয়ালীয়া হইতে নাটোর, দিঘাপতিয়া দিয়া বগুড়াভিমুখে প্রসারিত হইয়াছে; সেই রাস্তার পার্শ্বেই চৌগ্রাম।

চৌগ্রাম রাজবংশের উৎপত্তি— গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অভ্যুদয় সময় গৌড়ের বাদসাহদিগের অধীনে কাশ্যপ গোত্রীয় ভাদুড়ী বংশজাত সুবুদ্ধি কেশব ও জগদানন্দ (২) নামে তিন ভাই উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। দিল্লীর বাদসাহের নিকট সুবুদ্ধি ও কেশব আপন আপন বল বিক্রমের পরিচয় দেওয়াতে খাঁ উপাধি এবং জগদানন্দ রায় (৩) উপাধি প্রাপ্ত হন। এই তিন ভ্রাতা রাজা কংশনারায়ণের ভাগিনেয় এবং উদয়নাচার্য্যের অধস্তন সন্তান ছিলেন। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজে ইহাঁরা শ্রেষ্ঠ কুলীন। জগদানন্দ রায়ের পাঁচু রায় ও ভুবন রায় নামে দুই বৃদ্ধ প্রপৌত্র ছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে পাঁচু রায়ের পুত্র রসিক রায় মহারাজা রামজীবনের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন; রসিকের দুই পুত্র, তন্মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্রকে মহারাজা রামজীবন দত্তকপুত্র গ্রহণ করিলেন। এই দত্তক পুত্র নাটোর রাজবংশের দ্বিতীয় রাজা এবং রাজসাহীর ইতিহাসে মহারাজা রামকান্ত নামে পরিচিত ছিলেন।

পুরস্কার— রসিক রায়ের কনিষ্ঠ পুত্রকে দত্তক পুত্র গ্রহণে মহারাজা রামজীবন রাজসাহীর অন্তর্গত পরগণা চৌগ্রাম এবং রঙ্গপুরের অন্তর্গত পরগণা ইসলামবাদ পুরস্কার স্বরূপ রসিককে প্রদান করেন।

রসিক রায়ের বংশ— রসিক রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র কৃষ্ণকান্ত রায় চৌগ্রামে রাজবাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণকান্ত রায়ের পুত্র রুদ্রকান্ত রায়। রুদ্রকান্ত রায়ের দত্তক পুত্র রোহিণীকান্ত রায়। রোহিণীকান্তের পুত্র সন্তান না থাকায় পাটুল নিবাসী নিরাবিলপটীর কুলীন কৃপানাথ মৈত্রের এক পুত্রকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। এই দত্তক পুত্র অতি সুলক্ষণ সম্পন্ন। ইনি

---

(১) "There are several Zemindara in Rajshahi who call themselves Rajas. They have certainly not been enobled by the Government, but they possess large landed properties, on the strength of which their retainers and royats address them as Rajas. Among them may be mentioned Hara Nath Chandhuri of the Sunri caste commonly called Raja of Dubalhati. Moheswar Rai, a high caste Brahmin commonly called Raja of Tahirpur, and Ruhini Kanto Rai also a Brahmin, commonly called Raja of Chengaon"- The rajas of Rajahahi Calcutta Review

(২) কেহ কেহ বলেন পূর্ব্বদ্বারের অধ্যক্ষ-সুসঙ্গ পরগণার আদি রাজা বুদ্ধিমন্তু খাঁ ও সুবুদ্ধি খাঁ একব্যক্তি। এই বুদ্ধিমন্তু খাঁর ভ্রাতার নাম জগদানন্দ খাঁ। বংশাবলী দৃষ্ট বুদ্ধিমন্তু খাঁ ও সুবুদ্ধি খাঁ পৃথক ব্যক্তি বলিয়া অনুমান হয় এবং সুবুদ্ধি খাঁর ভ্রাতার নাম জগদানন্দ রায়। এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে যে বংশাবলী দেওয়া গেল তাহা দেখিলে ভ্রম অনেক পরিমাণে আপনীত হইতে পারিবে।

(৩) জগদানন্দের পিতা শ্রীকৃষ্ণ দর্পনারায়ণী অবসাদে আলোড়িত হন, কিন্তু জদানন্দের সময় অবসাদ হইতে নিষ্কৃতি হয়।

বমনীকান্ত রায় নামে পরিচিত। ইনি সুধীর ও সুশিক্ষিত। ইনি কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের বি.এ। ইহাঁরই দ্বারা সরস্বতী ও লক্ষ্মী এক গৃহে বিরাজিত। খাজুয়ার ভোলানাথ খাঁব সহিত বসিক রায়ের জাতিত্ব।

রমাকান্ত রায় বি.এ— রোহিণীকান্ত বায়েব মৃত্যুব পব, তাঁহাব জমিদারী কোর্ট অব ওয়ারডসের অধীন হয়। রমণীকান্ত রায় বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে এবং শিক্ষা সমাধা কবিলে পিতৃবাজ্যে অধিকাবী হন। তিনি পিতৃ জমিদারীব ভাব গ্রহণ করিয়া একটী মধ্যশ্রেণী ইংবেজী স্কুল স্থাপিত কবেন এবং জমিদাবীর যথেষ্ট আয় বৃদ্ধি করেন। ইহার কার্য্য কুশলতা এবং জন-সাধাবণেব প্রতি সদ্ব্যবহার নিতান্ত প্রশংসনীয়। ইনি মিতবায়ী ও ধর্ম্মনিষ্ঠ।

কাশীমপুরের চৌধুরীর বংশ

বর্ত্তমান রাজসাহী জেলার অন্তর্গত উপৈলসর গ্রামে গঙ্গানন্দ সান্ন্যালেব বাস। ইনি ধরাধব বংশ সম্ভূত। ইনি নিরাবিল পটীর কুলীন ছিলেন। কাপেব কন্যা গ্রহণে চূড়মণি কাপ হইলেন। যেমন কাশীমপুরের চৌধুবীরা কাপ মধ্যে শ্রেষ্ঠ তেমনই লালুরেব ও হবিপুরেব চৌধুবীবাও কাপ মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আবাল বা আপাল সরস্বতী হইতে লালুর চৌধুরী বংশেব ও রামদেব হইতে হবিপুরের চৌধুবী বংশেব উন্নতি হয। রামদেব চৌধুবী সাতুলের রাণী সর্ব্বাণীব দেওয়ান ছিলেন। গঙ্গানন্দ সান্ন্যাল হইতে কাশীমপুবেব চৌধুবী বংশের উন্নতি হয। ইহাঁব চাবি পুত্র— শিববাম, সীতাবাম, বামনাবায়ণ, দেবীদাস। ইহাদেব বংশধবেব বর্ত্তমান কাশীমপুবের চৌধুরী জমিদার। ইহা কথিত আছে যে কাশীম খাঁ নামে একজন মোগল জাযগীবদার কাশীমপুরে বাস করিতেন। কাশীমের বংশ লোপ হইলে বা অন্য কোন কাবণে জনৈক বাঙ্গালাব সুবাদার (১) কাশীম খাঁর জায়গীব শিবরামকে প্রদান কবিয়া "চৌধুরী" উপাধি দেন। এই চৌধুবী বাঙ্গালাব "চৌদ্দ চৌধুরীর" এক চৌধুরী বলিয়া কথিত হয়। কাশীমেব জায়গীব প্রায় তিন লক্ষ টাকার সম্পত্তি, এই বৃহৎ সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া শিবরাম কাশীমপুরে বাস কবিতে থাকেন। পবগণে কাশীমপুব ব্যতীত শিববামের আরো অনেক জমিদাবী ছিল। শিববামেব প্রথম বনিতাব দুই পুত্র, করকৃষ্ণবল্লভ ও বিষ্ণুবল্লভ কাশীমপুবে থাকেন এবং দ্বিতীয় বনিতার পুত্র শ্রীমমোহন কাশীমপুব ত্যাগ কবিয়া হাজরাহাটী বাসভবন নির্দ্দেশ করেন। কৃষ্ণবল্লভের পুত্র ব্রজবল্লভ। ইহাব সময়ে রামজীবনেব বাজ্যলাভ। নাটোবের অধিপতি মহারাজা বামজীবন কাশীমপুরে আইসেন এবং ব্রজবল্লভেব গৃহে আহার করিয়া ভোজন লৌকিকতা স্বরূপ পরগণে কালীগাঙ গ্রহণ করেন। ইহার পর কেবল কাশীমপুব পবগণা ব্রজবল্লভের দখলে রাখিযা রাজা বামজীবন অবশিষ্ট সমুদয় জমিদারী বাজেয়াপ্ত কবিয়া নিজ রাজ্যভূক্ত করেন। এসময় হইতে কেবল কাশিমপুব পরগণা চৌধুবীবংশের অধিকৃত রহিল। আবাব বিষ্ণুবল্লভেব বংশধব বৃন্দাবন বল্লভ কাশীমপুর ত্যাগ করিলেন এবং জোয়াড়ী যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। বর্ত্তমানে গঙ্গানন্দ সান্যালেব বংশ বহুবিস্তৃত। এই বিস্তৃত বংশে আজি কালি অনেক অংশীদার; তন্মধ্যে রুদ্রকান্ত চৌধুবীর বংশই প্রসিদ্ধ। রুদ্রকান্তের পুত্র হবকান্ত অনেক তীর্থ পর্য্যটন করেন এবং "মহাভারত" পুরাণ পাঠে অনেক ব্যয় করেন। ইনি সদাশয ব্যক্তি ছিলেন। ইহাঁর সহিত লেখকের পিতার গাঢ় প্রণয ছিল। এই হরকান্তের পুত্র সারদাকান্ত সুশিক্ষিত ও বুদ্ধিমান। রঘুনাথ চৌধুরীর প্রপৌত্র কিশোরীনাথ চৌধুরী একজন সুধীব এবং বিনয়ী পুরুষ ছিলেন। এস্থলে কাশীমপুর চৌধুরী বংশাবলী সন্নিবেশিত কবা হইল।

(১) সম্ভবত মোগল সম্রাট আকববেব সময।

কাশীমপুর (চৌধুরী বংশাবলী)
গঙ্গানন্দ সান্ন্যাল (সংযামিনী)
শিববাম
সীতারাম
বামনারায়ণ
দেবীদাস
জয়কৃষ্ণবল্লভ
বিষ্ণুবল্লভ
শ্যামমোহন
ব্রজবল্লভ
দযালবল্লভ
ভূপালবল্লভ
দ্বিজবল্লভ
বৃন্দাবনবল্লভ
কিঙ্করবল্লভ
কৃষ্ণহরি
কৃষ্ণমঙ্গল
কৃষ্ণজীবন
কৃষ্ণবিনোদ
কৃষ্ণকান্ত
রাধাকান্ত
রামকান্ত
রমাকান্ত
কানাইলাল
রামধন
জগন্নাথ
হরিনাথ
রূপকান্ত
রুদ্রকান্ত
রঘুনাথ
মোহনলাল
জগন্নাথ
নন্দলাল
বিবাহিতা কন্যা
গদাধর লাহিড়ী
ঈশান চন্দ্র
গোবিন্দ
বিপীনবিহারী
ব্রজনাথ
বিশ্বনাথ
হবকান্ত
দুর্গাকান্ত
শরৎচন্দ্র
কৃষ্ণচন্দ্র
গৌবচন্দ্র
এই লহিড়ী হইতে অত্র বংশের উৎপত্তি
বোহিনীকান্ত
চন্দ্রকান্ত
তারিণীকান্ত
রজন্যকান্ত
নীলকান্ত
দ্বারকান্ত
জগৎচন্দ্র
শিবচন্দ্র
যাদবচন্দ্র
ত্রৈলক্যনাথ
যোগেন্দ্রনাথ
সারদাকান্ত
বরদাকান্ত
লক্ষ্মীকান্ত
শ্রীকান্ত
বমণীকান্ত
রাধানাথ
লক্ষ্মীনাথ
গোলকনাথ
লোকনাথ
রমানাথ
হবনাথ
গৌরনাথ
আনন্দনাথ
গোবিন্দনাথ
প্রসন্ননাথ
কিশোরীনাথ
গিবীন্দ্রনাথ
কৃষ্ণসুন্দবী কন্যা
নগেন্দ্রনাথ
সুকেন্দ্রনাথ
বৈদ্যনাথ

এই কাশীমপুরের চৌধুরী বংশে বিস্তর কুলীনের কুলচ্যুত হইয়াছে। অতএব চৌধুরীবংশ কাপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঝিকড়া নিবাসী গদাধর লাহিড়ী কুলীন ছিলেন। ইহার সহিত রঘুনাথ চৌধুরীর ভগিনীর বিবাহ হয়। এই কন্যাগ্রহণে গদাধর লাহিড়ী কাপ হইলেন। বর্ত্তমান রায় কেদারপ্রসন্ন লাহিড়ী বাহাদুর গদাধর লাহিড়ীর বংশসম্ভূত।

কাশীমপুরের "রায়বাহাদুরের" বংশ

আদিশুর যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ গৌড়ে আনেন তন্মধ্যে শান্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণ একজন। এই ভট্টনারায়ণের অধস্তন সন্তানের নাম জয়সাগর। জয়সাগরের চারি পুত্র, তন্মধ্যে এক জনের নাম পীতাম্বর। যে মৌন ভট্ট হইতে তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণের উৎপত্তি হয়, সেই মৌনভট্ট পীতাম্বরের সহোদর। পীতাম্বর ভূষণা পঠীর কুলীন। পীতাম্বরের সাধু, রুদ্র, লোকনাথ নামে পুত্রত্রয় বল্লাল সেনের নিকট হইতে কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। (১) সাধু ও রুদ্র বাগচী গাঞি নমে বিখ্যাত হন। লোকনাথের পৌত্র বল্লভাচার্য্য কুলে শ্রেষ্ঠ। এই বল্লভাচার্য্য উদয়নচার্য্য ভাদুড়ীর লীলাবতী নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করেন। বল্লভের তিন পুত্র অর্ক, কেশব এবং দনু। ইহাঁরা সাধারণতঃ আকাই, কেশাই ও দনুজাই নামে প্রসিদ্ধ। কেশাইয়ের সমাজ নকড়িয়া। নকড়িয়ার কেশাই লাহিড়ীর বংশধরগণই লাহিড়ীকুলে শ্রেষ্ঠ। কেশাইয়ের পুত্র শ্রীনারায়ণ খেকাই, নামে পরিচিত ছিলেন। খেকাইয়ের অধস্তন সন্তান বাচাই। এই বাচাইয়ের পুত্র কৃষ্ণদাস লাহিড়ী। ইহাঁর বংশ বহু বিস্তৃত। গদাধর লাহিড়ী কৃষ্ণদাস লাহিড়ীর অধস্তন সন্তান। ইহাঁর আদি নিবাস রাজসাহী জেলার অন্তর্গত নওগাঙের উত্তর-পশ্চিম ঝিকরা গ্রামে ছিল। গদাধরও শ্রেষ্ঠ কুলীন ছিলেন। গদাধর প্রাণ সংশয় কাতর হইয়া গঙ্গাযাত্রা করেন। গঙ্গায় যাইবার সময় নৌকাপথে কাশীমপুর হইয়া যাইতে ছিলেন। কাশীমপুরের শিবরাম চৌধুরীর বৃদ্ধ প্রপৌত্র রঘুনাথ চৌধুরীর বয়োধিকা অবিবাহিতা এক কন্যা ছিল। রঘুনাথ কুলীনে কন্যা প্রদান করিবেন বলিয়া, এত বয়সেও কন্যার বিবাহ দিয়া ছিলেন না। শ্রেষ্ঠ কুলীন গদাধর লাহিড়ীকে পথিমধ্যে পাইয়া তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিয়া, রঘুনাথ কুলক্রিয়া করেন। গদাধরও আসন্নকালে কেবল ধনলোভে কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। গঙ্গাতীরেই গদাধরের মৃত্যু হয়। যে ব্যক্তি মরিতে যাইতেছে, তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়া ও যে কথা, কোন একটা জড়পদার্থের সহিত বিবাহ দেওয়াও সেই কথা। সেকালে সমাজগৌরব জন্য লোক এত লালায়িত ছিল যে কন্যাকে যাবজ্জীবন দুঃখে পাতিত করিয়াও কুল রক্ষার নিমিত্ত তাঁহারা বিশেষ যত্নবান হইতেন।

পিতার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র রামকিশোর লাহিড়ী কাশীমপুরে আইসেন। রুদ্রকান্ত চৌধুরী তাহার ভগিনীর বিবাহ গদাধর লাহিড়ীর পুত্র রামকিশোর লাহিড়ীর সহিত দিয়া ঐ কাশীমপুরে নদীতীরে বাসোপযোগী ভূমি ব্রহ্মোত্তর দেন এবং নিজ জমিদারী মধ্যে গ্রাম গ্রাম কম নিরিখে জোত দেন। ইহা ব্যতীত কতক ব্রহ্মোত্তর ভূমিও তাহাকে প্রদান করিয়া, রুদ্রকান্ত রাম কিশোরকে কাশীমপুরে স্থাপিত করেন। জোত, ব্রহ্মোত্তর এবং নদীতীরে বাসোপযোগী স্থান প্রাপ্ত হইয়া রামকিশোর লাহিড়ী কাশীমপুরে বাসভবন নির্দ্দেশ করিলেন। এ বাটীতেই রামকিশোরের বংশধরেরা অদ্যপি বাস করিয়া নিজ নাম ও যশঃ বিস্তার করিতেছেন।

---

(১) "পীতাম্বরস্য ত্রয়ঃ পুত্রঃ সাধুরুদ্র লোকনাথাঃ।
সাধুরুদ্রকৌ বাগ্চী লোকনাথস্ব লাহিড়ী"।
হুরিশা নাগ বাটীর পুস্তক।

রামকিশোর লাহিড়ীর তিন পুত্র, কালীকান্ত, কাশীকান্ত ও কালীশঙ্কর। কালীকান্তেব পুত্র ছিল না। কালীকান্তেব দুই পুত্র— অমলাকান্ত ও বজনীকান্ত। কালীশঙ্করের এক পুত্র গিরীশচন্দ্র। তিন ভ্রাতা কালীকান্ত কাশীকান্ত ও কালীশঙ্কর একান্নভুক্ত থাকিয়া কাশীমপুরে বাস করিতেন। যে সময় নাটোরে রাজসাহী জেলার সদব অফিশ ছিল, সেই সময় কালীকান্তের অভ্যুদয়। নাটোব ছোট তবফ বাজধানী, কাশীমপুবেব চৌধুবী, মুক্তাগাছার জমিদাব, ডিহিছাতনীব জমিদার প্রভৃতিব মোক্তারী গ্রহণে, কালীকান্ত নাটোবে স্থায়ী ছিলেন। যে সময় নাটোর হইতে জেলাব সদর আফিশ বামপুর বোয়ালীয়াতে উঠিয়া যায়, সেই সময় কালীকান্তও নাটোর হইতে যাইযা রামপুরবোয়ালিয়ায় স্থায়ী হন এবং একটা সুন্দব ও বিস্তৃত বাসভবন নির্ম্মাণ করেন। মোক্তারী পদই কালীকান্তের উন্নতির মুল কাবণ। সেকালে বড় বড় মোক্তাব সদর নাএব বলিয়া, পরিচিত ছিলেন। সেকালে একজন মোক্তার বা সদব নাএবেব যেরূপ আয়, ক্ষমতা ও আধিপত্য ছিল, এখন অনেক উকীলের সেরূপ আয় ও আধিপত্য নাই। বিশেষতঃ সে সময় জমিদারীর মূল্য অতি সুলভ ছিল এবং ভাল ভাল জমিদারী লাভেরও সহজ উপায় ছিল। অন্য ব্যক্তি অপেক্ষা মোক্তাবদের সে সময় জমিদারী ক্রয় করিবার অনেক সুবিধা ও সুযোগ ছিল। তথাপি জমিদারী লাভ জন্য কালীকান্ত কৌশল জাল বিস্তার কবেন এবং কোন কোন স্থলে অধর্ম্মাচরণ কবিতেও ক্রটী করেন নাই। মোক্তারী কবিয়া কালীকান্ত অনেক অর্থ সঞ্চযও কবিয়াছিলেন। সেই প্রচুব অর্থ ও কৌশল দ্বাবা, কালীকান্ত বিস্তর ভাল ভাল জমিদাবী ক্রয় করেন। তিনি বুদ্ধিমান ও প্রতিভা-সম্পন্ন লোক ছিলেন; কিন্তু তাঁহাব প্রকৃতি সরল ছিল না। প্রতিভাগুণে তিনি প্রায় ৮০ হাজাব টাকা লাভেব ভূসম্পত্তি করেন। কিন্তু তাহাব পুত্র নাই। এ বিস্তৃত জমিদাবী ভোগ করে কে? পুত্রকামনায় তিনি দুই বিবাহ কবিয়াও পুত্র লাভ করিতে পাবিলেন না। তাঁহার প্রথম বনিতার নাম কাশীশ্বরী এবং কনিষ্ঠাব নাম মৃন্ময়ী (১)। কালীকান্তের কনিষ্ঠা বনিতা মৃন্ময়ী সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। ইনি, বুদ্ধিমতী এবং ইহাব আইন কানুনও কতকপরিমাণে জানা ছিল। মৃন্ময়ীব অমতে কালীকান্তেব কোন কার্য্য করিবাব ক্ষমতা ছিল না।

কালক্রমে কাশীকান্ত, তাহার পত্নী ও জ্যেষ্ঠ পুত্র কমলাকান্ত স্বর্গলোকে গমন করেন। কেবল তাহাব কনিষ্ঠ পুত্র রজনীকান্ত এবং কালীশঙ্করের একমাত্র পুত্র গিরীশচন্দ্র জীবিত বহিল। কালীকান্তের পুত্র না থাকায় তিনি বজনীকান্তকে সারদাকান্ত নামকবণে দত্তকপুত্র স্বরূপ গ্রহণ কবিলেন। এই দত্তক পুত্র গ্রহণের পর হইতে কালীকান্ত ও মৃন্ময়ী দেব্যা গিবীশকে অশ্রদ্ধার চক্ষুতে দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু কালীকান্তের প্রথম বনিতা গিবীশকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। গিবীশ জানিতে পবিলেন যে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত সম্পত্তি হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিবেন। তখন গিবীশ জ্যেষ্ঠতাতেব নিকট সম্পত্তির অংশ চাহিলেন। লেখকের পিতা রঘুরাম চৌধুবী কালীকান্তের বন্ধু ছিলেন। তিনি কালীকান্তকে গিরীশের পক্ষ হইয়া অনেক অনুরোধ করিলেন যে গিরীশকে যাবতীয় ভূসম্পত্তিব কিয়দংশ দেওয়া হউক। কালীকান্ত বন্ধুর অনুরোধও রক্ষা করিলেন না। কালীকান্ত মৃন্ময়ীব পরামর্শে বিস্তৃত জমিদারী সোপার্জ্জিত বলিয়া গিরীশকে কিছুই দিলেন না। গিরীশ অতি কষ্টে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। কখন শ্বশুরালযে, কখন কোন বন্ধুর আশ্রয়ে থাকিয়া গিরীশ কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। বন্ধুবান্ধবের পরামর্শে জ্যেষ্ঠতাত কালীকান্তের নামে সম্পত্তির অংশ পাইবার আশায় গিরীশ আদালতের আশ্রয় লইতে ইচ্ছুক হইলেন; কিন্তু অর্থাভাবে তাহাও ঘটিল না। শেষে অর্থ ঋণ করিয়াও মোকদ্দমা করিবাব জন্য গিরীশ অগ্রসব হইলেন; তাহাতেও কালীকান্ত স্থানে স্থানে বাধা দিতে লাগিলেন। গিরীশ ঋণ

(১) কাগশ্রেষ্ঠ হবিপুত্রেব চৌধুবী বংশেব কন্যা।

করিয়াও কোন স্থান হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। বিশেষে কোন প্রকার সাহায্যে আদালত অবলম্বনে মাতার নামে বার্ষিক ৯০০্ টাকা মাসহাবা মঞ্জুর হয়। এই সামান্য আয়ে মাতা, স্ত্রী, কন্যা প্রভৃতি পরিবারবর্গ সহ গিরীশ বহু কষ্টে দিন যাপন কবিতে লাগিলেন এবং ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন।

ভগবান নিরাশ্রয়ের আশ্রয়। যাহার ধন নাই, যাহাব শবীর বক্ষক নাই, যাহাব বন্ধুবান্ধব নাই, তাহার ধনই ভগবান, তাহাব রক্ষকই ভগবান, তাহার বন্ধুই ভগবান। বক্ষকহীন প্রাণী ও ভগবানে কোন প্রভেদ নাই (১) পাঁচ জন একান্নভুক্ত থাকে; কেহ ক্ষমবান, কেহ অক্ষম হয়। কেহ বেশী অর্থ উপার্জ্জন কবে, কেহ কম অর্থ উপার্জ্জন করে। তথাপি একান্নবর্তিতা স্বার্থপরতাশূন্য বলিয়া শাস্ত্রকারেবা নির্দ্ধারিত করিযাছেন। শাস্ত্র লঙ্ঘনেও মানবকে পাপ স্পর্শ করে। গিবীশ ধন হীন, নিরাশ্রয় ও রক্ষক হীন বলিয়া ভগবানের প্রিয় হইলেন এবং ভগবান স্বয়ং গিরীশকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে অগ্রসর হইলেন। আবাব কালীকান্তকে পাপ আশ্রয় করাতে তিনি ভগবানের দয়ার পাত্র রহিলেন না। এই আভ্যন্তরিক কার্য্য মানব বুদ্ধিব অগম্য। এই কার্য্যের গূঢ়ভাব মানব জানিতে পারিলে কখনই অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না। ধর্ম্ম মানবকে রক্ষা কবে এবং অধর্ম্মই মানবকে নষ্ট করে। ধর্ম্মেব স্রোত ধীবে ধীবে প্রবাহিত হয় এবং অধর্ম্ম বায়ু সংযোগে অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠে, কিন্তু শীঘ্র নির্ব্বাণ হইয়া যায। সংসাবে এই ভাব মানব সদাসর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিতেছে, তথাপি অন্ধের ন্যায অধর্ম্ম কার্য্যেই ব্রত হয়। স্বার্থপরতায়, "আমি" "আমবা" অভিমানে, ধন ও যশঃ লিপ্সায়, দ্বেষ ও হিংসায, কালীকান্ত বাগান্ধ হইয়া গিরীশকে উপেক্ষা করেন। পাপীর বিধানকর্ত্তাই ভগবান।

কালীকান্ত নিজ-কর্ম্ম ফলে জীবিত কাল পর্য্যন্ত প্রচুব সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া, তাহাব দত্তক পুত্র সাবদাকান্তকে বাজ্যভার অর্পণ করেন। যে অর্থ অর্জ্জন করে, তাহাব অদৃষ্টে অর্থ ভোগ প্রায়ই ঘটে না। কালীকান্ত সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া যান বটে; কিন্তু সেই ধন বিশেষরূপে ভোগ বা সৎকার্য্যে ব্যয় করিয়া যাইতে পাবেন নাই। কালীকান্তেব প্রথম পক্ষীয় বনিতা কাশীশ্বরী মাসহারা গ্রহণে কাশীধামে বাস জন্য গমন করেন এবং তাঁহাব দ্বিতীয পক্ষীয় বনিতা মৃন্ময়ী ইহ সংসাব ত্যাগ কবেন। কালীকান্তের মৃত্যুব পর সারদাকান্ত তাহার পিতৃ সম্পত্তির অধীশ্বর হইলেন। কিন্তু সারদাকান্ত সম্পত্তি বেশী দিন ভোগ করিতে পারিলেন না। তিনি নিঃসন্তান পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর সময তাঁহার পত্নীকে দত্তক পুত্র রাখিবার অনুমতি পত্র দিযা তিনি পত্নীব হাতে সম্পত্তির ভাব অর্পণ করেন। বিধবা পত্নীও পতির মৃত্যুব এক বৎসর মধ্যে পবলোক গমন করেন। সুতবাং সারদার বিধবা পত্নী দত্তক পুত্র রাখিতে পারেন নাই। সে সময়ে কালীকান্তের প্রথমপক্ষীয় বনিতা কাশীশ্বরী কাশীধামে বাস করিতেছিলেন। তখন এই বিধবা রমণী সম্পত্তির উত্তরাধিকারীণী হইলেন। এ সময়ে এ রমণীর বয়স অনেক এবং সংসারেও বীত রাগ; আবার গিরীশকে পূর্ব্ব হইতেই স্নেহ কবিতেন। গিবীশেরও ভাগ্য প্রসন্ন। সারদাকান্তের পত্নীর মৃত্যু সংবাদ পাওয়া মাত্র, গিরীশ কাশিধামে যাইয়া বৃদ্ধা রমণীকে বার্ষিক ৯০০ টাকা মাসহারা এবং তাঁহার আবশ্যকীয় যাবতীয় ব্যয় দিতে স্বীকৃত হইলেন এবং তাঁহাকে বশীভূত করিলেন। সুতরাং গিরীশই কালীকান্তের প্রচুর স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তিব উত্তরাধিকারী হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন।

সারদার পত্নীর মৃত্যুর সময় হইতে গিরীশের রাজ্যভার গ্রহণ কাল পর্যন্ত জমিদারীর কেহ কর্ত্তা ছিল না। এমন সময় আমলাগণ সর্ব্বময় কর্ত্তা। যে যেখানে পারিল লুট আরম্ভ করিল। এই

(১) "ব্রাহ্মণ, দুগ্ধবতী গাভী ও বক্ষকহীন প্রাণী, এই তিনটী আমাব শরীর"। শ্রীমদ্ভাগবত, তৃতীয় স্কন্ধ, ষোড়শ অধ্যায।

প্রকারের বহুমূল অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইয়া যায়। সামান্য অস্থাবর সম্পত্তিই গিরীশের হস্তগত হয়। সুতরাং জমিদারীর ভারগ্রহণ করিয়াই নানা ব্যয় জন্য গিরীশের অর্থের প্রয়োজন হইল। এই কারণেই হউক বা অন্য কারণেই হউক, গিরীশ ঋণ জালে জড়িত হন। কিন্তু গিরীশ স্কুল কালেজে রীতিমত শিক্ষিত না হইলেও, তাহার বিষয় বুদ্ধি প্রবল ছিল। নিজ বুদ্ধিবলে ও কৌশলে অল্পদিন মধ্যে ঋণ হইতে তিনি মুক্ত হইলেন। গিরীশের দুর্দ্দিনের কথা মনে ছিল এবং সময়ে সামান্য উপকার পাওয়াই যে দুর্লভ তাহা গিরীশ বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। যখন গিরীশের ভাগ্য প্রসন্ন হইয়া, তিনি সুদিনে পতিত হইলেন, তখন তাহার পরোপকার বৃত্তি নিতান্ত প্রবল হইল। গিবীশ নিজের ক্ষতি স্বীকার করিয়া ও শরীর বা অর্থ দিয়া পরের উপকার কবিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাব জীবনে তিনি অনেকের দুঃখ নিবারণ করিয়াছেন এবং নানা প্রকারে উপকার কবিয়াছেন। তাঁহাব শবীরে পরোপকার বৃত্তিই যে কেবল প্রবল ছিল এমত নহে; তাঁহার নিঃস্বার্থতাও অনেক সময় প্রশংসনীয় ছিল। তাঁহার শরীরে অনেক গুণ ছিল। তিনি বিনয়ী, তেজস্বী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, স্বার্থশূন্য এবং পরহিতে রত ছিলেন। তিনি প্রজাকে অসন্তুষ্ট করিয়া কব আদায় করিতেন না। তিনি কাশীমপুরে নিজ ব্যয়ে একটী মধ্যশ্রেণী ইংরাজী স্কুল স্থাপিত করিয়া শিক্ষা বিস্তারের সহায়তা করেন এবং বিদেশীয় ছাত্রবৃন্দের আহার পরিচ্ছদ, পুস্তক, কাগজ কলমের মূল্য এবং দরিদ্র বালকদের স্কুলের বেতন নিজ সরকার হইতে দিতেন। এই বিদ্যালয়টী একটী লব্ধ প্রতিষ্ঠ মধ্যশ্রেণী ইংরাজী স্কুল ছিল। ইহা ব্যতীত বর্ষায় প্রপীড়িত দীন-দরিদ্র লোকের বোয়ালীয়া প্রভৃতি স্থানে বিস্তর অর্থ দান করেন। এই সকল গুণে ভূষিত হইয়া গিরীশচন্দ্র লাহিড়ী মহামান্য ছোট লাট সার জর্জ্জ ক্যাম্পবেল সাহেব বাহাদুরের সময় 'রায় বাহাদুর" উপাধিতে সম্মানিত হন। তিনি যে কেবল বৃটীশ রাজ-সরকারে সম্মান লাভ করিয়া বংশের গৌবব বৃদ্ধি করেন এমত নহে। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজেও তিনি যথেষ্ট সম্মান লাভ করেন। তিনি পাঁচটী কন্যাকে নিরাবিল, বোহিলা, ভূষণা প্রভৃতি কুলীন পাত্রে দান কবিয়া সমাজেও তাঁহার পদমর্য্যাদা যথেষ্ট বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। আবার কন্যাগুলির ভরণপোষণ জন্য উপযুক্ত জমিদারী দান করিয়াও সমাজে প্রশংসনীয় হইয়াছেন। এই শ্রেষ্ঠ কুলীনে কন্যা দানে গিরীশ "স্পর্শমণি" পদ পাইয়া বারেন্দ্র সমাজে বিখ্যাত হন।

রায় গিরীশচন্দ্র লাহিড়ী বাহাদুর এক পুত্র রাখিয়া এবং পাঁচ কন্যার শ্রেষ্ঠ কুলীনে বিবাহ দিয়া পবলোক গমন করেন। পিতাব মৃত্যুর পর তাঁহার একমাত্র পুত্র কেদারপ্রসন্ন লাহিড়ী পিতৃ জমিদারীর ভারগ্রহণ করিলেন। পিতাকে অনুসরণ করিয়া তিনিও বৃটিশ গবর্ণমেন্ট হইতে "রায়বাহাদুর" উপাধিতে সম্প্রতি সম্মানিত হইয়াছেন। আমরা আশা করি পিতার নাম ও যশঃ গৌরব বৃদ্ধি করিয়া তিনিও জনসাধারণের প্রশংসনীয় হইবেন।

বিশী বংশ। (জোয়াড়ী থানা বড়াইগ্রাম)

বিশী বংশের উৎপত্তি— নারায়ণভট্ট, সুষেণ, পরাশর, ধরাধর ও গৌতম, এই পঞ্চ মহাপুরুষের অধস্তন সন্তানেরা বরেন্দ্র ভূমে একশত গ্রামে বাসভবন নির্দ্দেশ করেন। নারায়ণভট্ট শাণ্ডিল্য গোত্রীয়। আদি গাঞি ওঝা নারায়ণভট্টের পুত্র। ওঝা, উপাধ্যায়ের অপভ্রংশ মাত্র। উপাধ্যায় উপাধি বল্লাল সেন প্রদত্ত। নারায়ণভট্টের অধস্তন পুত্র তপোমণি। এই তপোমণির পুত্র সিন্ধুসাগর। সিন্ধুসাগরের পুত্র বিন্দুসাগর। আবার বিন্দুসাগরের দুই পুত্র, জয়সাগর ও মণিসাগর। জয়সাগর বরেন্দ্রভূমে থাকিবেন এবং মণি-সাগর বীরভূমে বাসভবন নির্দ্দেশ করিলেন। জয়সাগরের চারিটী পুত্র — আদিমাধব, মৌনভট্ট, স্বর্ণরেখ ও পীতাম্বর। আদিমাধবের

পুত্র অভিমন্যু। অভিমন্যুর দুই পুত্র, বৎসাচার্য্য ও বল্লভাচার্য্য। বৎসাচার্যের অজ, প্রজ, মনু ও মার্তণ্ড নামে চারি পুত্র। প্রজের তিন পুত্র, তন্মধ্যে কালিসাওঝা কনিষ্ঠ। "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" গ্রন্থে লিখিত আছে যে "এই কালিসাওঝা হইতে বিশী গাঞির উৎপত্তি হইয়াছে।" কিন্তু ঐ বিশী বংশীয় যাদব বাবু বলেন যে, এই নারায়ণ ভট্ট ওঝার অধস্থ সন্তান জয়সাগরের বংশে পিপড়া ওঝা বিশী (১) জন্মগ্রহণ করেন। যাদব বাবুর কথার উপর নির্ভর করিয়া পিপড়া হইতে বিশী বংশের উৎপত্তি স্বীকার করা গেল। ব্রাহ্মণেরা জন্ম, ধারার ও বেদাধ্যয়ন দ্বারা শ্রোত্রির শব্দে অভিহিত হইতেন। যাঁহারা কন্যা যোগান প্রদানে অসাবধান তাঁহারাই কষ্টশ্রোত্রিয় নামে পবিচিত হইলেন। বরেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের ৮৪ গাঞি কষ্টশ্রোত্রিয় (২), তন্মধ্যে শিহার, খর্জ্জুরী, ধণী প্রভৃতি আট গাঞি সাধ্য এবং অবশিষ্ট কষ্ট আখ্যা প্রাপ্তহন। বিশী গাঞি যে প্রসিদ্ধ তাহা নিম্ন বচনে প্রমাণ হইবে ঃ—

"বিশিষ্ট বিজ্ঞ বিদ্যাংস বৌদ্ধ বেদজ্ঞ বাধ্যাতঃ।
সদ্বংশ সাধকাশ্চাষ্টৌবৈতেবু বিশী গাঞিন ॥"

যাদব বিশীর নিকট হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে পিপড়া ওঝা, ব্রক্ষচারী ও পণ্ডিত ছিলেন; আবার বিশী গাঞি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অতএব বল্লাল সেন সাধক প্রবর পিপড়া ওঝাব নিকট ইষ্টমন্ত্র গ্রহণ করিয়া পিপড়া ওঝাকে বিশী গাঞি প্রদান করেন। তিনি ইহাও বলেন যে পিপড়া ওঝা মোগল সম্রাট আকববেব সভাপণ্ডিত ও হিন্দুদাযভাগের বিচাবক ছিলেন। যে ব্যক্তি বল্লাল সেনের সময় বর্ত্তমান, সেই ব্যক্তি আকবর বাদসাহের সময়ও বর্ত্তমান থাকা সম্ভব হয় না। ইতিহাসে ইহা জানা যাইবে যে বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষণ সেন; লক্ষ্মণ সেনের দুই পুত্র মাধব সেন ও কেশব সেন। এই লক্ষণ সেনের সময় ১২০৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা মুসলমান সম্রাটের অধিকৃত হয়। ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে মোগল সম্রাট আকবর পিতৃরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হন। অতএব পিপড়া ওঝার ৩/৪ শত বৎসর জীবিত থাকা অসম্ভব। এমতাবস্থায় পিপড়া ওঝাকে বল্লাল সেনের সময় বর্ত্তমান থাকা স্বীকার করিলে, তাহাকেই আকবরের সময় বর্তমান থাকা অস্বীকার করিতে হয়। পিপড়া ওঝার কোন উর্দ্ধতন পুরুষ বল্লাল সেনের যে দীক্ষাগুরু ছিলেন তাহারই বেশী সম্ভব। ইহা প্রতীতি হইবে যে কালিকা ওঝা বল্লাল সেনকে দীক্ষা দিয়া বিশী গাঞি প্রাপ্ত হন এবং পিপড়া ওঝা আকবর বাদসাহের সভাপণ্ডিত হইয়া ভূম্পত্তি লাভ করেন। যাদব বাবুব মতে পিপড়া ওঝা আকবর বাদসাহের সভাপণ্ডিত ছিলেন।

বিশী বংশের জমিদারী লাভ— পিপড়িয়া ওঝা বিশী মোগল সম্রাট আকবরের সভাপণ্ডিত এবং হিন্দু দায়ভাগের বিচারক ছিলেন। ব্যাকরণ, স্মৃতি, বেদ, ষড়দর্শন, জ্যোতিষ ও তন্ত্রে ওঝা একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। ইহাব ধর্ম্ম শাস্ত্রে এত অধিকাব যে ইনি একজন তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। তিনি প্রথমে আগরায় ছিলেন। হরিবাটী গ্রাম দান করিয়া আকবর ওঝাকে পাবইডিঙ্গিতে স্থাপিত করেন। তদপর অতিথি সেবার্থে হুলীখালী গ্রাম, জিয়াসিদ্ধ, মাঁদা, সিন্দুর-কুসুম্বী, কারীগাঁও ও তেগাছী প্রভৃতি পরগণা এবং অনেক ব্রহ্মোত্তর ভূমি ওঝাকে আকবর বাদসাহ দেন। এই বৃহৎ ভূসম্পত্তি লাভের পর, পিপড়া ওঝা পারইডিঙ্গিতে ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ, ও দেবালয় নির্ম্মাণ এবং সংস্কৃত বিদ্যালয় ও অতিথিশালা স্থাপিত করেন। জলাশয় খনন করিয়াও জলকষ্ট নিবারণ করেন। ইহাব পর তিনি পরলোক গমন করেন। আগরা হইতে নীল প্রস্তর

(১) "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" গ্রন্থমতে পিপড়া ওঝা বিনাযকবংশ হইতে সম্ভুত এবং ধূর্জ্জটীব পুত্র।
(২) কষ্টশব্দে পীড়াদায়ক" "যে শ্রোত্রিযেব কন্যা শ্রবণ কবিলে কুলীন কষ্টপান তাহাকে গোত্রিয় বলে"— গৌড়ে ব্রাহ্মণ।

আকবর, ওঝাকে দেন তাহা আজিও হরিঘাটীর দেবালয়ের সম্মুখে স্থাপিত আছে।

পিপড়িয়া ওঝার অধস্তন সন্তান— পিপড়িয়া ওঝা বিশী হইতে ষষ্ঠ পুরুষ পর্য্যন্ত বিশী বংশাবলী নিম্নে দেওয়া গেল ঃ—

যে সময় রামহরি ও গঙ্গাহরি পারইডিঙ্গিতে বাস করেন। সেই সময় বড়ল নদীর নিকট চাঁপালিয়ায় একটী ফৌজদারী আদালত ছিল। দিল্লীর সম্রাটের অনুগ্রহে গঙ্গাহরি সেই ফৌজদারী আদালতের প্রধান কর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত হন। বড়ল নদীর তীবে জোয়াড়ী এবং চাঁপিলা জোয়াড়ীর অতি নিকট। চাঁপিলা থাকা সময় গঙ্গাচুবি জোয়াড়ীর মজুমদারবংশীয় একটী কন্যাকে বিবাহ করেন। গঙ্গাহরিব শ্বশুরেব পুত্র সন্তান ছিল না। সুতরাং শ্বশুবের যাবতীয় সম্পত্তি গঙ্গাহরি প্রাপ্ত হন। কিন্তু গঙ্গাহরির মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা পত্নী সন্তানগণসহ পাবইডিঙ্গির বাটীতে যান। রামহরি কনিষ্ঠ ভ্রাতা গঙ্গাহরির সন্তানগণকে পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বেদখল করেন। সুতরাং গঙ্গাহরির বিধবা পত্নী সন্তানগণসহ জোয়াড়ী ফিবিয়া আসিয়া পিতৃ সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়া বহিলেন। এদিকে পারইডিঙ্গিতে রামহরি পৈতৃক সম্পত্তির ষোল আনাব অধিকারী হইয়া বসিলেন। অল্পদিন মধ্যেই রামহবি এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিলেন যেমন সময়ে নাটোর রাজবংশেব অভ্যুদয় হয়। যে সময়ে রঘুনন্দন মুবশিদাবাদে আধিপত্য বিস্তার করেন এবং বিস্তৃত রাজ্য লাভের জন্য সচেষ্ট ছিলেন, সেই সময়ে বঘুনন্দন রামহরির যাবতীয় সম্পত্তিব প্রতি লোভ করেন। ইহা কথিত আছে যে রামহরি বিশীব নিকট হইতে রঘুনন্দন যাবতীয় সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়া পারইডিঙ্গি, হুলীখালী ও হরিঘাটী এই তিন গ্রাম তাহাকে ছাড়িয়া দেন। এদিকে গঙ্গাহরির বিধবা পত্নী সন্তান-সহ জোয়াড়ী গ্রামে বাস কবিতেছিলেন।

জোয়াড়ীর বিশী বংশ— গঙ্গাহরি বিশীব অধস্তন সন্তানগণ লইয়াই জোয়াড়ীব বিশী বংশ। গঙ্গাহরির পুত্র রূপনারায়ণ। রূপনারায়ণের পুত্র উদয়নারায়ণ। আবার উদয় নারায়ণের পুত্র দর্পনারায়ণ। এই দর্পনাবাযণের দুই পুত্র, হবিপ্রসাধ ও বলরাম। গঙগাহবি হইতে দর্পনারায়ণ পর্য্যন্ত বিশীবংশের অবস্থা ভাল ছিল না। হরি প্রসাদ ও বলরাম হইতেই বিশী বংশ উন্নতি করিতে লাগিল। কিন্তু দর্পনাবায়ণের সময় হইতেই জমিদারী বৃদ্ধির সুত্রপাত হয়। একদা বড়ল নদী দিয়া সাঁতুলের কোন রানী (১) বহুতর নৌকা ও লোকজনসহ জোয়াড়ীর নিকট দিয়া

(১) **সম্ভবতঃ** রাণী সর্ব্বানী।

যাইতেছিলেন। ঝড় বৃষ্টি নিবন্ধন নৌকা আদি জোয়াড়ীর ঘাটে লাগাইয়া রাণী বিশ্রাম করিতেছিলেন। সে দিবস দ্বাদশীয় পাবণ। দর্পনারায়ণও ঘাটে উপস্থিত। রাণী ব্রাহ্মণ দেখিয়া দ্বাদশীর পারণ জন্য ফল-মূল্যাদিব প্রয়াস করিলেন। দর্পনারায়ণ বিশেষ যত্ন করিয়া রাণীকে নিজ বাটীতে লইয়া গেলেন এবং দ্বাদশীর পারণ ও তদপর হবিষ্যান্নাদিসহ আহার অতি ভক্তির সহিত সম্পন্ন করাইলেন। রাণী, দর্পনারায়ণের প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া কিছু জমিদাবী দিতে চাহিলেন। দর্পনারায়ণের আকাঙ্ক্ষা সামান্য ছিল। জোয়াড়ীর উত্তরে যে বিল আছে, সেই বিল এবং বাড়ীর নিকটবর্ত্তী যে কয়েকঘর শূদ্রের বসতি আছে, তাহা দর্পনাবায়ণেব অধিকারে ছিল না। দর্পনারায়ণ তাহাই যাঞ্ছা করিলেন। রাণীও সন্তুষ্ট হইয়া তাহাই দিয়া যান। শূদ্র কয়েক ঘর যে স্থানে বাস করিতেছিল তাহা দর্পনারায়ণ জ্যেষ্ঠ পুত্রের নামে গৃহীত হইল। সেই হইতে সে স্থানের নাম চক-ভবানী বলিয়া এখনও চলিয়া আসিতেছে। সেই চকভবানীব শূদ্রেরা এখন বিশীবংশের খানসামা, গোমস্তা প্রভৃতির কার্য্য-নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

দর্পনারায়ণের সন্তান সন্ততি— দর্পনারায়ণের তিন পুত্র ভবানী, হরিপ্রসাদ ও বলরাম। পিতা বর্ত্তমানেই ভবানীগত। পিতার মৃত্যুরপর হরিপ্রসাদ ও বলরাম পিতৃ সম্পত্তিতে অধিকারী হইলেন। নাটোর রাজবংশের জমিদারী নাশের সময় হবিপ্রসাদ ও বলবাম দুই ভ্রাতা পরগণে সোণাবাজু ৩২০০০ টাকা মূল্যে নিলামে ক্রয় করেন। সোণাবাজু পরগণা এখন পাবনা জেলার অন্তর্গত। ইহা একটী বৃহৎ ও বিস্তৃত জমিদাবী। আজ কাল ইহার মূল্য ৩২ লক্ষ বলিলেও বলা যায়। হরিপ্রসাদ ও বলরাম সুলভ মূল্যে এই জমিদারী ক্রয় কবেন। নিলাম স্থির থাকিবে কিনা সন্দেহ স্থলে, ঐ জমিদারীর ।০ আনা অংশ দুই ভ্রাতা রাখিয়া অবশিষ্ট ।০ আনা অংশ তাতিবন্দ, হরিপুর ও দুলাইয়েব জমিদারগণ নিকট বিক্রয় করেন। এই দর্পনাবায়ণ হইতে বিশী বংশের বিস্তার হইতে লাগিল। হরিপ্রসাদ বড় তরফ এবং বলরাম ছোট তবফ হইয়া দুই পৃথক শাখা বিশী বংশে গঠিত হইল।

বড় তরফ— দর্পনবায়ণ বিশীর তিন পুত্র, ভবানী, হবিপ্রসাদ ও বলরাম। ভবানী অল্প বয়সে অপুত্রক পরলোক গমন করেন। সুতরাং হবিপ্রসাদ হইতে বড় তবফ এবং বলরাম হইতে ছোট তরফ গঠিত হইল। হরিপ্রসাদের চার পুত্র— শিবনাথ, হারু, রামধন এবং বুধরাম। সর্ব্ব কনিষ্ঠ বুধরাম নিঃসন্তান পবলোক গমন করেন। জ্যেষ্ঠ শিবনাথেব বংশ বহু বিস্তৃত হয়। হরিপ্রসাদের বংশাবলী সন্নিবেশিত হইল। হরিপ্রসাদের অধস্তন সন্তানেরা বংশ বৃদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে ধন, সম্পত্তি, মান, মর্যাদা নিজ নিজ ক্ষমতানুসারে বৃদ্ধি করেন। এই বংশে বিদ্যা ও জ্ঞান চর্চ্চারও প্রাধান্য দেখা যায়। ইহা ব্যতীত বিশী বংশে সমাজের পদ মর্য্যাদা নিতান্ত কম নহে। নিরাবিল ও ভূষণা পঠীর কুলীন বংশে এবং রাজা ও বড় বড় সভ্রান্ত জমিদার বংশে কন্যা দানে দর্পনরায়ণের অধস্তন সন্তানদের সমাজের পদ গৌবব আরো বৃদ্ধি হইযাছে। এই বড় তরফের কেহ মুনসেফ, কেহ রাজার দেওয়ান, এইরূপ সম্ভ্রান্ত চাকুরীও করিয়াছেন। এই বংশে অনেক ক্ষমতাবান পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন।

হরিপ্রসাদ সংস্কৃতে একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। ইহাঁব ধর্ম্ম শাস্ত্রে ও জ্যোতিষে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবনাথও পিতার ন্যায় সংস্কৃত সাহিত্য ও স্মৃতি এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন; কিন্তু ইহাঁর বিষয় বুদ্ধি পিতা অপেক্ষা বেশী ছিল। ইহাঁর সময় অনেক জমিদারী লাভ হয়। শিবনাথের এক কন্যা মহামায়া দেবীর সহিত নওগাঁও নিবাসী শ্রেষ্ঠ কুলীন প্যারীমোহন সান্ন্যালের পিতার এবং অপর কন্যার সহিত ইটালী নিবাসী কুলীন গিরীশচন্দ্র মৈত্রেব

বিবাহ হয় (১)। শিবনাথ মহামায়াকে ছোট গোবিন্দপুর কোঙরদহ প্রভৃতি বার্ষিক এক হাজার টাকা লাভের জমিদারী এবং অপর কন্যাকে বার্ষিক তিনশত টাকার লাভের জমিদারী দেন। শিবনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র শম্ভুনাথ লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া চাকুরীর চেষ্টা করেন। তিনি ওয়াটসন কোম্পানীর শাতকুঠির মেনেজর ছিলেন এবং নাটোব রাজসরকারের কিছু দিন দেওয়ানী পদে নিযুক্ত ছিলেন। এইরূপ চাকুরী করিয়া তিনি ধনসঞ্চয় করেন এবং সঞ্চিত ধন দ্বারা ভূসম্পত্তিও ক্রয় করেন। ইনি নিজ গ্রামেব উন্নতি জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন। ইহার ব্যয়ে ও যত্নে গ্রামের অনেক রাস্তা প্রস্তুত হয়। শিবনাথের দ্বিতীয় পুত্র কালীপ্রসাদ। ইহাঁব কোন পুত্র সন্তান ছিল না। ইহাঁর কন্যা গৌরমুনি দেবীকে কাশীমপুর নিবাসী শ্রেষ্ঠ কাপ ও জমিদার আনন্দনাথ চৌধুরী বিবাহ করিয়া বার্ষিক ছয়শত টাকার সম্পত্তি পান। শিবনাথের কনিষ্ঠ ও তৃতীয় পুত্র কাশীনাথের কন্যা সুধাময়ী দেবীকে খাজুরা নিবাসী নিরাবিল পট্টীর কুলীন এবং জমিদার ভোলানাথ খাঁ বিবাহ করিয়া বামন গ্রাম প্রভৃতি বার্ষিক এক হাজার টাকা লাভের ভূসম্পত্তি পান।

শম্ভূনাথের তিন পুত্র, জয়নাথ, মহেশচন্দ্র, ও ঈশানচন্দ্র। সর্ব্ব কনিষ্ঠ ঈশানচন্দ্র নিঃসন্তান পবলোক গমন কবেন। মহেশচন্দ্রের কন্যা কুমুদমণির বলিহার কুলীন রাজবংশে বিবাহ হয়। শম্ভুনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়নাথ সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। ইহাঁর রচনাশক্তি ছিল। ইনি বাঙ্গালা ভাষায় দেবী-যুদ্ধ, পদ্মপূরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ণ করিয়া মুদ্রিত কবেন। ইনি অনেক দেশ ও তীর্থ পর্য্যটন করিয়া, অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ইনি চাকুরীর অর্থ দ্বারা ভূসম্পত্তি লাভ কবেন। জয়নাথেব তিন পুত্র, যদুনাথ, যাদবচন্দ্র ও মাধবচন্দ্র। যদুনাথ বাঙ্গলা ও সংস্কৃতে শিক্ষিত হন। ইহাঁর স্বভাব অতি ধীর ছিল। ইনি পাণিগ্রহণের পূর্ব্বেই পরলোক গমন করেন। মাধবচন্দ্রের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। কেবল তাঁহার দুই কন্যা, হেমলতা ও বনলতা। রামগোপালপুরের রায় যোগেন্দ্রকিশোর চৌধুবী বাহাদুরের পুত্রের সহিত হেমলতা দেবীর এবং সুসঙ্গের রাজা নীরদকৃষ্ণ সিংহের সহিত বনলতা দেবীর বিবাহ হয়। যাদবচন্দ্র দেশ হিতৈষী। ছোট তবফের বলরামের পৌত্র চন্দ্রনাথের নিজ পুত্র মোহিনীকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিতে উদ্যত হন। মোহিনী জোয়াড়ীর অনেকের নিকট সাহায্য না পাইয়া যাদবের নিকট উপস্থিত হন। কিন্তু যাদব বিজয়গোবিন্দ চৌধুরীর সাহায্যে মোহিনীনাথের সম্পত্তি উদ্ধার কবেন। যাদব সাহায্য না করিলে মোহিনীকে ভিক্ষা বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইত। শরীক তরফের এরূপ নিঃস্বার্থ সাহায্য নিতান্ত প্রশংসনীয়। বিজয়গোবিন্দর সহিত লেখকের বিশেষ পরিচয় ছিল। বিজয়গোবিন্দ উদার চরিত্রের লোক ছিলেন। যাদব বিজয়ের আন্তরিক সাহায্য পাইয়াই মোহিনীর উপকার করিতে পারিয়াছিলেন। যাদব অধিকাংশ কাল সহরে থাকিয়া সাধারণ হিতকর কার্যে যোগদান করেন এবং নিম্ন গ্রামের উন্নতি চেষ্টা করেন। তাঁহারই যত্নে একটী চিকিৎসালয় জোয়াড়ীতে স্থাপিত হইয়াছে। জেলার বোর্ডের মেম্বরের পদে নিযুক্ত থাকিয়া, তিনি স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিতে যত্নবান আছেন।

হারুর পুত্র রঘুনাথ বিষয় কার্য্যে বিলক্ষণ পটু ছিলেন। নিজ যত্ন ও চেষ্টায় তিনি অনেক ভূসম্পত্তি লাভ করেন। তিনি অনেক ব্যয়ে মহাভারত ও রামায়ণ পুরাণ পাঠ করান। ইহার পৌত্রী সৌদামিনীকে চৌগ্রামের রাজা রোহিণীকান্ত রায় বিবাহ করেন। রোহিণীকান্ত রায় শ্রেষ্ঠ কুলীন।

রামধনের পুত্র কৃষ্ণধন বিশীর কন্যা সখীসুন্দরীর সহিত ইটালী নিবাসী কুলীন ঈশানচন্দ্র মৈত্রের বিবাহ হয়। এই বিবাহে ঈশান ইটালী প্রভৃতি বার্ষিক সাত শত টাকা লাভের সম্পত্তি

(১) রক্ষিত মতুর বংশ সম্ভূত। বক্ষিতেব সমাজ মধ্য গ্রাম (মাধগ্রাম)। বক্ষিতেব পুত্র লক্ষ্মীধর। ইটালীর মৈত্রগণ লক্ষ্মীধরের বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রাপ্ত হন। ইহার পুত্র কেশবনাথ লেখকের সমপাঠী ছিলেন। যে সময় রাজসাহী জেলা স্কুলে কেশব অধ্যয়ন করেন, সেই সময় বাজসাহীর জজ লুইস জ্যাক্‌সনের সহিত কেশবেব পরিচয় হয়। তদপর লুইস জ্যাক্‌সন কলিকাতা হাইকোর্টের জজ হন এবং মুনসফের পদে উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিবার ভার তাঁহারই উপর অর্পিত হয়। এদিকে কেশবনাথ বি.এল পবীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া লুইস জ্যাক্‌সনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। কেশবকে সুপণ্ডিত, সুধীর এবং সদ্বংশজাত জানিয়া লুইস জ্যাক্‌সন তাঁহাকে মুনসফের পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু দুঃখেব বিষয় এই পদে অল্প দিন নিযুক্ত থাকিয়া, কেশব পরলোক গমন করেন।

ছোট তরফ— দর্পনারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র বলবাম হইতে ছোট তবফ গঠিত হয়। এই তরফেব বংশাবলী নিম্নে লেখা গেল ঃ—
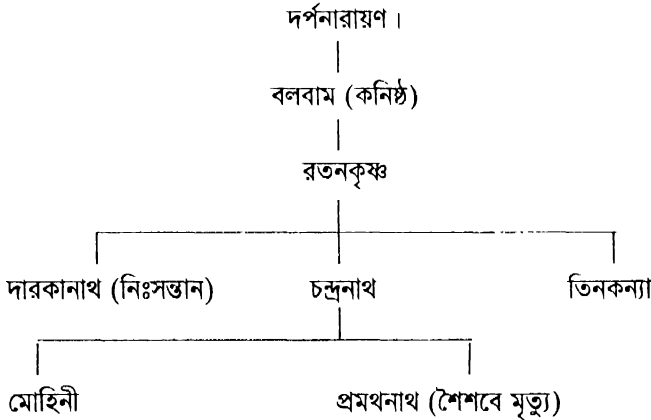
বলরাম বিশী নাটোর রাজ সরকারের দেওয়ান ছিলেন। এই দেওয়ানী কার্য্য সময়ে বিস্তর ধন সঞ্চয় করেন; কিন্তু এই সঞ্চিত অর্থ দ্বারা সৎকার্য্য নির্ব্বাহ জন্য প্রবৃত্ত হইয়া কার্য্য শেষ করিবার পূর্ব্বেই, তিনি পরলোক গমন করেন। একটী শিবমন্দির নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়া এবং নিজ কন্যা জয়সুন্দরী দেবীর বিবাহের সম্বন্ধ নিরাবিল পঠীর কুলীন তাহিরপুরের রাজা বীরেশ্বর রায়ের সহিত স্থির করিয়া, তিনি পরলোক গমন করেন। এই দুইটী কার্য্য তাহার পুত্র রতনকৃষ্ণ সম্পন্ন করিয়া পিতার **সঙ্কল্প** স্থির রাখেন।

রতন কৃষ্ণের দুই পুত্র এবং তিন কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বারকানাথ নিঃসন্তান পরলোক গমন করেন। সুতরাং কনিষ্ঠ পুত্র চন্দ্রনাথ পিতৃ জমিদাবীতে প্রতিষ্ঠিত হন। রতনকৃষ্ণ কন্যাদের নিরাবিল পঠীব কুলীনে বিবাহ দিযা সমাজ গৌরব স্থির রাখেন।

চন্দ্রনাথের দুই স্ত্রী। জ্যেষ্ঠ স্ত্রী এক পুত্র মোহিনীকে রাখিযা পরলোক গমন করেন। চন্দ্রনাথ কনিষ্ঠা পত্নীর বাধ্য হন। এই পত্নীর গর্ভে প্রমথনাথ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু শৈশবেই প্রমথনাথের মৃত্যু হয়। মোহিনীকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া উইল দ্বারা কনিষ্ঠা পত্নী মৃণ্ময়ীকে চন্দ্রনাথ যাবতীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী করিতে ইচ্ছুক হন। যাদব বিশী ও বিজয়গোবিন্দ চৌধুরীর বিশেষ যত্নে ও চেষ্টায় উইল পরিবর্ত্তন করাইয়া মোহিনী বিশী পিতৃ জমিদারীতে প্রতিষ্ঠিত হন। মোহিনী অতি সুধীর ও বিজ্ঞ। ইহার স্বভাব নিতান্ত প্রশংসনীয়। চন্দনাথের দুই কন্যা। জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত মুক্তাগাছার অমৃতলাল আচার্য্যের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ আচার্য্যের এবং কনিষ্ঠ কন্যার সহিত তাঁতিবন্দের জমিদার অন্নদা-গোবিন্দ চৌধুরীর পুত্রের

বিবাহ হয়। এই দুই কন্যাকে চন্দ্রনাথ বার্ষিক বার শত টাকা লাভের সম্পত্তি দিয়া যান। এই ছোটতরফের জমিদার একা মোহিনী বিশী থাকায়, বর্ত্তমানে ছোটতবফের জমিদারী অধিক।
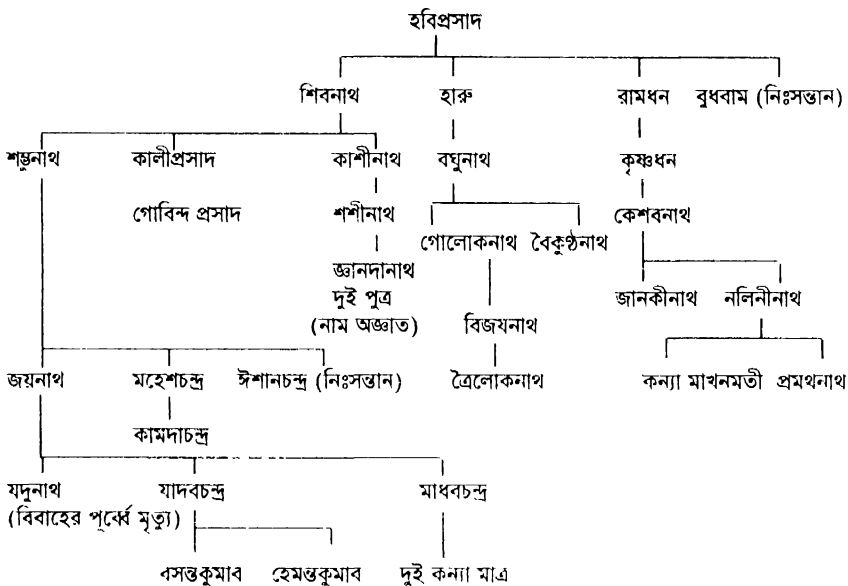
বলিহার রাজবংশ।

নাবায়ণ ভট্ট, সুষেণ, পরাশর, ধরাধর ও গৌতম, এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ ববেন্দ্রভূমেব একশত গ্রামে বাস করেন। বাৎস্য গোত্রীয় ঐ ধরাধবের প্রপৌত্র বেদান্তচার্য্য। বেদান্তচার্য্যের পুত্র হরিহর ও লক্ষ্মীধর। লক্ষ্মীধরের পুত্র বর্দ্ধমান। কুলজ্ঞ গ্রন্থে বর্ত্তমান বলিহারকে কুড়মইল বলে। এই কুড়মইল গ্রামে হরিহব ও লক্ষ্মীধরের পুত্র বর্দ্ধমান বাস করিত। তদপর বর্দ্ধমান পৈতৃক সঞ্জামিনী গ্রামে বাস করেন। লক্ষ্মীধরেব অধস্তন সন্তান অনন্ত ও বামনাথ। অনন্তের বংশধবেরা বলিহাব রাজবংশ এবং রামনাথের বংশধরেরা বঙ্গপুব জেলার অন্তর্গত দিনহাটার রায় চৌধুবী বংশ বলিয়া খ্যাত। (১) অনন্তের প্রপোত্র গোপাল। গোপালের তিন পুত্র, কৃষ্ণ দেব, প্রাণকৃষ্ণ ও রামরাম। কৃষ্ণদেব বঙ্গপুবেব অন্তর্গত বাহিরবন্দব পবগণার জমিদার বানী সত্যবতীর ভগ্নীকে বিবাহ করেন। এই বৈবাহিক সম্বন্ধে প্রাণকৃষ্ণ ও রামরাম রাণী সত্যবতীর (২) প্রধান কার্য্যকারক হইয়া যথেষ্ট ক্ষমতা প্রাপ্ত হন; রঙ্গপুরেব অন্তর্গত ভিতব-বন্দর পরগণাও সত্যবতীর জমিদারী ছিল। ক্রমে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া এবং কৌশল জাল বিস্তার করিয়া প্রাণকৃষ্ণ ও রামবাম

(১) বলিহাব বাজবংশাবলী এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইল।

(২) চান্দবায বাহিরবন্দব পবগণাব জমিদাব ছিলেন। চান্দবায়ের পুত্র বঘুনাথ। বঘুনাথ সত্যবতীকে বিবাহ করেন। বাণী সত্যবতীব অভাবে বাহিববন্দব পবগণা নাটোব বাজস্বভুক্ত হয। অবশেষে হেস্টীংশ সাহেব বাণীভবানীর নিকট হইতে বাহিববন্দব পবগণা লইয়া বিষ্ণুচবণ ও লোকনাথকে প্রদান কবেন। বিষ্ণুচবণ কান্তবাবুব বেনামবধাব ও লোকনাথ তাহাব পুত্র। সেই হইতে এখন বাহিববন্দব কাশীমাবাজাব বাজবংশেব অধিকাব।

ভিতর বন্দ পরগণা অধিকার করিলেন। এই ভিতর-বন্দর পরগণার দুইজন অধিকারী হইলেন। রামরাম জ্যেষ্ঠ ও প্রাণকৃষ্ণ কনিষ্ঠ। রামরামের বংশধরেরা ।১৫ আনা এবং প্রাণকৃষ্ণের বংশধরেরা।৯৫ আনা জমিদারী প্রাপ্ত হন। কিন্তু পরে রামরামেব অন্যতর জ্ঞাতি কৃষ্ণগোবিন্দ সান্ন্যালের অতি বৃদ্ধ প্রপৌত্র কৃষ্ণগোবিন্দ সান্ন্যাল। (১) এই— কৃষ্ণগোবিন্দই দিনহাটাব রায়চৌধুরী বংশ এবং প্রাণকৃষ্ণের বংশ বাজবংশ বলিয়া প্রসিদ্ধ। দিনহাটা জেলা রঙ্গপুবের এবং বলিহার (কুড়মইল) জেলা রাজসাহীর অন্তর্গত। বলিহার বাজবংশ আমাদের আলোচ্য।

প্রাণকৃষ্ণের প্রপৌত্র বাজেন্দ্র রায় নাটোব বংশীয় মহারাজা বামকৃষ্ণেব কন্যাকে বিবাহ করিয়া বহু ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হন। রাজেন্দ্র বায়েব পৌত্র কৃষ্ণেন্দ্র বায়, এই বংশে বিখ্যাত ছিলেন। কৃষ্ণেন্দ্র রায় নিরাবিল পঠীব কুলীন। ইনি কুলে, ধনে এবং সম্মানে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। একদিকে ইনি ধনী ও কুলীন এবং অন্যদিকে ইনি একজন গ্রন্থকার। বাজসাহী জেলাব বাজাদেব মধ্যে কৃষ্ণেন্দ্রই কেবল গ্রন্থরচনায় জীবন ক্ষেপণ করিয়াছিলেন। অতএব একবার বাজাদেব শ্রেণী এবং আর একবার গ্রন্থকাবদের শ্রেণীতে তাঁহার জীবনের আলোচনা করা উচিত হইবে। প্রথমে রাজাব শ্রেণীতে তাঁহার জীবনের আলোচনা কবিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

কৃষ্ণেন্দ্র শিব প্রসাদ বায়ের দত্তক পুত্র। বাল্যকালেই পিতা স্বর্গারোহণ কবেন। অতএব বাল্যকাল হইতে যৌবনের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত তিনি বিপদে পতিত হন। এই বিপদ নিবন্ধনই তিনি রীতিমত বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারিয়া ছিলেন না; কিন্তু তাঁহার বুদ্ধি ও অধ্যাবসায় বলে নানা বিপদ হইতে উদ্ধাব হন। যৌবনকালে সংসাবে প্রবেশ করিয়া, তিনি বাজকার্য্যর ভার গ্রহণ করেন। তিনি "সনাতন আর্য্যধর্ম্মে আশৈশব নিষ্টাবান" ও বিশ্বাসী থাকিলেও তাঁহার যৌবনেব উচ্ছৃঙ্খলতায় "তাঁহার চরিত্রভ্রংশ সামান্যই ঘটিয়াছিল"। (১) গ্রন্থকারের স্বভাব চরিত্র ও মনোবৃত্তির অনেক পরিমাণে তাঁহার প্রণীত নিজ গ্রন্থে পরিচয় পাওয়া যায়। কৃষ্ণেন্দ্র রায় "স্বভাব নীতি" নামক একখানি গ্রন্থ প্রণীত করেন। তিনি যৌবনকালে যে সামান্য অসাবধান হইয়াছিলেন তাহার প্রমাণ ঐ গ্রন্থে 'প্রাচীন' শীর্ষক প্রবন্ধটীতেই পাওয়া যায়। কৃষ্ণেন্দ্র বলিতেছেন, "প্রাচীন! এখন আর বৃথা রোদন করিয়া বক্ষঃস্থল আর্দ্র করিতেছ কেন? পূর্ব্বে বিবেচনা না করিয়াই ত, অধুনা এতাদৃশ দুর্গতি লাভ কবিলে।" যদি কৃষ্ণেন্দ্র যৌবনকালে চবিত্রে সামান্য স্খলিত হইয়া থাকেন, তাহা তাঁহার এই অনুতাপ উক্তিতেই চরিত্র বিশুদ্ধ ও পবিত্র হইয়াছিল তাহার আর সন্দেহ নাই। পণ্ডিতেরা অনুতাপকেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ব্যাখ্যা করিযা গিয়াছেন।

কৃষ্ণেন্দ্র বিনয়ী সরল ও সত্য-নিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার শিষ্টাচাবেব যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। একথা তিনি কলিকাতাব কতিপয় ভদ্রলোকদের নিজভবনে আহার জন্য নিমন্ত্রণ কবেন। সে সময়ে নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদের অভ্যর্থনা কবা তাঁহাব অমাত্যবর্গ অনুমোদন না করিলেও, তিনি স্বয়ং উৎসাহের সহিত সেই কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ইহাতে রাজার সম্মান ও গৌবব বৃদ্ধিই পাইয়াছে। কি ধনী, কি দরিদ্র, কি প্রজা, কি ভিক্ষুক সকলকেই তিনি 'মিষ্ট আলাপে এবং বিনয়-নম্র বচনে বশীভুত করিতেন। তাহার সহিত সাক্ষাৎ, করিবে বলিয়া দ্বারে ধনী, দরিদ্র, ভিক্ষুক, প্রজা কেহ উপস্থিত হইলে দ্বারবানের বাধা দিবাব অধিকার ছিল না। প্রজারা তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত এবং তিনিও প্রজা ও অমাত্যদেব পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। ইহার

(১) "গ্রন্থকাব বাজাকারদের সংসাবে প্রবেশ কবিযা বিষয়-কীটবিদেশেব দংশনে জর্জ্জবিত হইলেও তাঁহাব চবিত্র অংশ সামান্যই ঘটনাছিল"— শ্রীযুক্ত গিবীশচন্দ্র লাহিড়ী লিখিত "কি বুঝিলাম" স্বভাবনীতি গ্রন্থেব শেষ ভাগে সংযোজিত।

বদ্যান্যতা ও ক্ষমাশীলতা নিতান্ত প্রশংসনীয় ছিল। ইনি কাহার সহিত কলহ বা মোকর্দ্দমা করিতে ভাল বাসিতেন না। ইহাঁব গৃহ ও ফল পুষ্পের উদ্যান নিতান্ত পরিষ্কার ছিল। কোন দ্রব্যকে সুন্দর গঠনে আনিতে ইহাঁর বিশেষ ক্ষমতা ও ইচ্ছা ছিল। তাঁহার গোলাপফুলের উদ্যানে কিয়ৎকাল অবস্থান করিলে, তাপিত হৃদয়ও শীতল হয়।

তিনি একটী বালিকাকে ভালবাসিয়া যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা তিনি স্বয়ং সীতা চরিত্রেব "গ্রন্থ সূচনায়" লিখিয়া গিয়াছেন। বালিকার সুখ সম্পাদনে তাঁহার একান্ত বাসনা ছিল। (১) সেই বালিকাকে প্রচুর ভূসম্পত্তি দিয়া এবং নিজ দত্তক পুত্রের সহিত বিবাহ দিয়া তিনি পরলোক গমন কবেন। তিনি "ভগবানের উপরই সংসারের যাবতীয় সুখ দুঃখ নির্ভর" করিয়া গিয়াছেন। আবার বার্দ্ধক্যে ভালবাসাকেই সংসারেব নবক যন্ত্রণা বলিয়া-বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এই ভালবাসাই প্রথমে তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল।

আবার পবিণত বয়সে সেই ভালবাসাকে ঘৃণার চক্ষুতে দেখিয়া গিয়াছেন। এই ভালবাসাই যৌবনে তাঁহার সুখ এবং বার্দ্ধক্যে দুঃখেব কারণ বলিয়া প্রতীতি হয়। তাঁহার প্রণীত স্বভাব-নীতির "প্রাচীন" শীর্ষক নামক প্রবন্ধটী পাঠ করিলে ইহা প্রতীতি হইবে যে ভালবাসা সংসারে নরক-যন্ত্রণার প্রধান কারণ।

কৃষ্ণেন্দ্র কুলীন ব্রাহ্মণকুলে এবং রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও তাঁহার মনে অহঙ্কারের লেশমাত্র ছিল না। তিনি আপনাকে বড় জ্ঞানে দরিদ্র বা নীচ বংশ-সম্ভূত মানবকে ঘৃণা বা তাচ্ছিল্য করিতেন না। তাঁহার প্রণীত "স্বভাব নীতি" হইতে নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম, তাহাতে তাঁহার স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যাইবে। "অথচ রঘুকুলতিলক রঘুপতি রামচন্দ্রও নাই, আর যদুপতি নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ও নাই, সংসারের এবন্বিধ নশ্বরত্ব দেখিযাও অথবা গর্ব্বে স্ফীত হইয়া সকলকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা যে কতদূর নীচাশয়তা তাহা দূরদর্শীরা অবশ্যই স্বীকাব করিবেন। ভগবান যাহাতে কৃপা করিয়াছেন, তাঁহাকে সকলেইত বড় বলিয়া জানেন। তথাপি 'আমি বড় আমি বড়" বলিয়া চীৎকারে লাভ কবি?" তিনি বিলক্ষণ জানিতেন ধন ও পদ গৌরব চিরস্থায়ী নহে। তিনি কখনই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ভাব অবলম্বন করিযা নীচ ব্যক্তিকেও "তুমি" ও "তুই" শব্দ ব্যবহার করিযা কাহারো মনে অযথা ব্যাথ্যা দিতেন না। দুঃখীর প্রতি সর্ব্বদা তিনি সদয় ব্যবহার করিতেন? তাঁহার হৃদয় উদাব ও প্রশস্ত ছিল। তিনি মহৎ এবং তাঁহার শরীবে মহত্বের চিহ্নও বিস্তর ছিল। দুঃখীর দুঃখে তিনি যথার্থই ক্রন্দন করিতেন। (২)

এইরূপ নানা গুণে ভুষিত হইয়া কৃষ্ণেন্দ্র রায় কি ধনী, কি দরিদ্র, কি প্রজা, কি সাহেব, কি বাঙ্গালী সকলেরই নিকট প্রিয় হন এবং নিজ জমিদারী শাসনে সকলের নিকট যশস্বী হন, তাঁহাব চরিত্র দান, সর্ব্বজন হিতকর কার্য্য ও প্রজারমনে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট সন্তুষ্ট হইয়া রাজোপাধি দ্বারা তাঁহাকে সম্মানিত করেন।

বাজশাহী জেলার মধ্যে যত রাজা ছিলেন তন্মেধ্যে বাজা কৃষ্ণেন্দ্র রায় মৃগয়া কার্য্যে শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি মৃগয়া কার্য্যে এরূপ পাবদর্শী ও নির্ভরচিত্ত ছিলেন যে তাঁহার জীবন বিস্তর বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র ও সিংহকে বধ কবিয়া নিজ নাম ও যশঃ বহুদূব বিস্তৃত

(১) "আমিও একটী বালিকাকে ভালবাসিয়া মুগ্ধ হইযাছি। বালিকাব সুখ সম্পাদন আমাব একান্ত বাসনা"—
গ্রন্থসূচনা, সীতাচরিত।

(২) "ক্ষুদ্রেব দুর্দ্দশা যদি মহতে হেরিত।
তবে কি ভাবতে আজি দীনতা থাকিত।"
স্বভাবনীতি।

করিয়াছিলেন। তাঁহার লক্ষ্য কদাচিৎ ব্যর্থ হইত। তিনি হস্তী পৃষ্ঠ হইতে নীচে নামিয়াও ব্যাঘ্র শিকার করিতেও বিলক্ষণ পটু ছিলেন। অনেক সাহেব তাঁহার মৃগয়া-পটুতাকে বিলক্ষণ প্রশংসা করিতেন।

রাজা কৃষ্ণেন্দ্র রায়ের দান ও পরহিতকর কার্য্য প্রশংসনীয়। তিনি দীন দুঃখীর দুঃখ মোচনে সতত যত্নবান্ ছিলেন। ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন, এবং তৃষ্ণার্তকে জল দিয়া সন্তুষ্ট করিতেন। তাঁহার বাটীতে অতিথি বা কোন ভদ্রলোক উপস্থিত হইলে, তাহাদেব আহার ও অভ্যর্থনার ক্রুটী হইত না। দেবার্চ্চনয় বিশেষতঃ রথ যাত্রায় তিনি অনেক টাকা ব্যয় করিতেন। প্রজাপুঞ্জেব শিক্ষা জন্য নিজ বলিহারে একটী মধ্যশ্রেণী ইংরেজী স্কুল স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন।

এক্ষণ গ্রন্থকারদের শ্রেণীকে তাঁহার জীবনের আলোচনা কবিতে আমরা প্রবৃত্ত হইলাম। রাজা কৃষ্ণেন্দ্র বাল্যকলে সুপ্রণালী বিদ্যাশিক্ষার সুবিধা পান নাই। ইনি দেশীয পাঠশালা ভিন্ন কোন উচ্চতম বিদ্যালয়ে শিক্ষা পান নাই। কিন্তু তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায় ও যত্ন গুণে, তিনি অবকাশ সময় নানাবিধ বাঙ্গালা পুস্তক এবং বাঙ্গলা সম্বাদপত্র পাঠ করিতেন। তিনি অধ্যয়নে নিতান্ত নিপুণ হন। এইরূপ অধ্যয়নে তিনি শেষকালে বাঙ্গালা ভাষার ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। আবার সংস্কৃতেও তিনি নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন না। বঙ্গ ভাষায় কিঞ্চিৎ অধিকার লাভ করিলে গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন। গদ্য ও পদ্য উভয় রচনার ইহাঁর লেখনী ধাবিত হয়। তিনি গদ্যে "এখন আসি" ও "স্বভাব নীতি", এবং পদ্যে "সীতা চরিত" ও "সুখভ্রম", রচনা করেন। তাঁহার রচনার ভাষাগত দোষ থাকিলেও ভাবেব প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। অনেক প্রবন্ধে তাঁহার হৃদয়ের সরল ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। মোটের উপব বলিতে গেলে রাজার গ্রন্থে দোষ থাকিলেও গুণও বিস্তর আছে। তাঁহার গ্রন্থ পাঠে ইহা প্রতীতি হইবে যে অনেক স্থলে সুন্দর ভাব তাঁহার হৃদয় হইতে বাহির হইয়াছে এবং শিল্প নৈপুণ্যের পবিচয় দিযাছে। আমরা তাঁহাকে শিল্পী ও কবি বলিব। রাজা হইয়া শিল্পী ও কবি হওয়া আশ্চর্যের বিষয়, (১) যেহেতু বঙ্গেব বাজা সাধারণতঃ অলস ও বিলাস-পরায়ণ। ইহাঁর সংগীত রচনাও প্রশংসনীয়। ইহাঁর সংগীত শাস্ত্রেও বুৎপত্তি ছিল।

তিনি পরিণত বয়সে বৎসরাধিক হইল স্বর্গ লাভ করিয়াছেন। তাঁহাব দত্তক পুত্র সম্পত্তির উত্তবধিকারী হইয়াছেন।

মুসলমান জমিদারগণ

মুসলমান জমিদারের সংখ্যা নিতান্ত কম। কেহ ফকীর বা সাধক ও শিক্ষক হইয়া কেহ বা কোম্পানীর প্রথম আমলে আফিসে প্রধান কর্ম্মচাররি পদে নিযুক্ত হইযা জমিদারী প্রাপ্ত হইয়াছিল।

নাটোরে মুসলমান জমিদার— নাটোর রাজবংশেব ধ্বংসকালে এবং কোম্পানীর রাজত্বেব প্রথম আমলে যখন চুরী ডাকাইতিতে প্রজারা প্রপীড়িত এবং কোম্পানীর আমলারা জেলার সর্ব্বময় কর্ত্তা এবং জেলার কলেক্টর আমলাদের দ্বারা চালিত, সেই সময় আমলাবা দুই হাতে দেশের ধন লুঠিতে আরম্ভ কবেন। প্রত্যেক আমলাই প্রচুর ধন সঞ্চয় কবিল। নাটোরের ফৌজদারীর নাজির মহম্মদ জামান খাঁ এই শ্রেণীর আমলা ছিলেন। (২)

(১) "ধনীর গৃহে কবিব জন্মও অল্প হইয়া থাকে। এই গ্রন্থকার ধনী হইযা ও কবি; যাব কবি হইযাও শিল্পী।"— শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র লাহিড়ীব লিখিত ভূমিকা "সীতচবিতে" সন্নিবেশিত।

(2) "In those happy-go-lucky days, when the Amla exercised irresponsible power the following characteristic emample will be interesting Mohummad Zaman Khan, originally an inhabitant of Burdwn, was the Nazir of the Fouzdari court and in that capacity accumulated large wealth and bequathed it to his son Chaudhuri Dost Mohammud Khan, who set himself up as an independent gentleman and bought several Zamindaries"- The Rajas of Rajshahi, Calcutta Review

জামান খাঁ বর্দ্ধমান জেলার অধিবাসী ছিলেন। তিনি প্রচুর সঞ্চিত ধন সম্পত্তি তাঁহার পুত্র চৌধুরী দোস্ত মহম্মদ খাঁকে দিয়া পবলোক গমন করেন। দোস্ত মহম্মদ খাঁ চৌধুরী ঐ প্রচুর অর্থ দ্বারা রাজসাহী জেলার কলম, পিপুরুল, খোলাবাড়িয়া প্রভৃতি বৃহৎ জমিদারী ক্রয় করেন। তিনি মিতব্যয়ী ও বিনয়ী ছিলেন। দোস্ত মহম্মদের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ আলী খাঁ কোরাণে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন এবং অত্যন্ত ধার্ম্মিক ছিলেন। মহম্মদ আলীর পুত্র রসীদ মিঞা পিতৃ জমিদারীতে অধিকারী হইয়া কিছু দিন পরে পবলোক গমন কবেন। রসীদ মিঞার পুত্র নুর মিঞা নিতান্ত অমিতব্যয়ী এবং কুসংসর্গে চবিত্র দূষিত করেন। তিনি ঋণগ্রস্ত হইয়া সকলের অপ্রিয় হন। তাঁহার সময়েই ঋণেব জন্য প্রায় সমস্ত জমিদাবী হস্তান্তরিত হয়।

বাঘার জায়গীর— ইহা বহুদিনেব জাযগীর। এই জায়গীর দুই সনন্দে সংগৃহীত। ইহার দুই অংশ। এক অংশ সাহজিহনের পিতা জাহঙ্গিব প্রদত্ত এবং দ্বিতীয় অংশ সাহজিহানেব প্রদত্ত। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে সাহজিহান পিতার প্রদত্ত সনন্দ অনুমোদন কবেন। এই সনন্দ বলে মৌলনা সেখ আবদুল ওয়াহেব ৪২ গ্রাম "জায়গীর" বা "মদৎমাস" সরূপ দখল করেন। এই ৪২ খানি গ্রামের বার্ষিক আয় সকলে বলিত ৮০০০ টাকা কিন্তু কালেক্টর সাহেব বলিতেন উহার বার্ষিক আয় ৩০,০০০ টাকা। মৌলনা পণ্ডিতেব উচ্চ উপাধি। আবদুল ওয়াহেব এই জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া, ঐ মৌলনা উপাধি প্রাপ্ত হন। নিজেব, ভ্রাতার, সন্তানের, চাকর ও অনুচরের ভরণ পোষণ জন্য যে ভূমি নিষ্কর দেওয়া যায় তাহাকে মদৎমাস বলে। শিক্ষার উৎসাহ জন্য শিক্ষক মৌলনা আব্দুল ওয়াহেবকে এই জায়গীর প্রদত্ত হয়। সেখ আব্দুল ওয়াহেবের অধস্তন পুরুষেরা খোন্দকার নাম ধারণ করেন। আকহুন শিক্ষককে বুঝায়, ইহাব অপভ্রংশ খোন্দকাব। নিম্নলিখিত চারিটী উদ্দেশ্যে জায়গীর প্রদত্ত হয় ঃ—

(১) খোন্দকাব বংশের ভরণ পোষণ।

(২) সর্ব্বসাধারণের ঈশ্বরোপাসনা।

(৩) দরিদ্র ও পাড়িত ব্যক্তির প্রতি আতিথ্য।

(৪) পাবশ্য ও আরব্য ভাষাব শিক্ষাব উন্নতি।

বাঘায় যে মসজিদ নির্ম্মাণ হয়, তাহাতে সাধক, ফকীর ও অন্যান্য মুসলমানের দিবা রাত্রিতে পাঁচবার নামাজ করিবার অধিকার আছে। জায়গীরের অর্থ দ্বারা এই মসজিদ নির্ম্মাণ হয় এবং জীর্ণ সংস্কার হইয়া থাকে।

এই ষ্টেটের কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য গবর্ণমেন্টের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। খোন্দকার বংশীযদের মধ্যে যিনি "রইস" অর্থাৎ মুসলমান সমাজের প্রধান, তাঁহারই হস্তে ষ্টেটের ভার অর্পিত হয়।

ইহা কথিত আছে যে এই খোন্দকার বংশের মধ্যে দুই ভ্রাতা পবস্পর শত্রুতা করিয়া বিবাদ উপস্থিত করেন। এই কারণে এই বংশের পূর্ব্ব সম্মানের ক্ষতি হয়। এডাম সাহেবের নিকট মুসাফব উল ইসলাম নামে এক খোন্দকার প্রকাশ করেন যে শত্রুতা বশতঃ জায়গীরের এক অংশ মোগল সম্রাটের অধীন বাঙ্গলার এক সুবাদাব বাজেয়াপ্ত কবিয়া ৮৭২ টাকা কর নির্দ্ধারিত করেন। বিভাগীয় কমিশনব সাহেবেব নিকট এডাম সাহেব জ্ঞাত হন যে ১৯১৯ সালের দুই আইনের বিধান অনুসারে জায়গীর স্থির থাকে। (১)

(1) "One of the present incumbents Musufer ul Islam, states that from a personal feeling of hostility to the family, a part of the property was resumed by one of the Mogul Governors of Bengal, and an assessment imposed of 872 Rupees per annum, which continues to be paid to the British Government I hear also from the Commissioner of the division, that this endowment has been recently confirmed and investigated under regulation II of 1819."- Mr Adam's Report on Education

এডাম সাহেবের সময় বাঘা মাদ্রাসাকে, পারশ্য শিক্ষার জন্য ৪৮ জন ছাত্র এবং আববা ভাষা শিক্ষাব জন্য ৭ জন ছাত্র ছিল। পারশ্য ভাষা পড়ান জন্য শিক্ষকের মাসিক বেতন ৮৲ টাকা এবং আরব্য ভাষা পড়ান জন্য মৌলবীব বেতন ৪০৲ টাকা ছিল। শিক্ষক ও ছাত্রগণ আহার, পরিধেয় বস্ত্র, পুস্তক, কাগজ কলম প্রভৃতি সমুদয় ব্যয় জায়গীর ষ্টেট হইতে পাইতেন। এডাম সাহেব বলেন "মাদ্রাসা সুনিয়মে রক্ষিত হয় না এবং শিক্ষা নিতান্ত জঘন্য"। (২)

তারাটীয়ার মুসলমান জমিদাব— বর্ত্তমান বাজসাহী জেলাব অন্তর্গত সাহাগোলা গ্রামে (১) গোল মহম্মদ নামে জনৈক মুসলমান বাস করিতেন। ইহা কথিত আছে যে কোন এক মোগল সম্রাটেব সময় পশ্চিম দেশ হইতে আসিযা সাহগোলা গ্রামে গোলমোহাম্মদ বাস করেন। ইহার পাঁচ পুত্র— সেখ মকবুল, সেখ হাজী, সেখ পিয়ার, সেখ ফাজিল, সেখ তাজ। এই পঞ্চ ভ্রাতার মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠ শেখ তাজ পশ্চিম দেশে বাস ভবন নির্দ্দেশ কবেন। অবশিষ্ট চারি ভ্রাতা সাহগোলাই থাকেন। শেখ মকবুল পীব খাজা মযনউদ্দীন চিস্তিব প্রিয় শিষ্য ছিলেন। এই শেখ মকবুল একজন আরবী ও পারশী ভাষার অদ্বিতীয় মৌলবী ছিলেন এবং মুসলমান ধর্ম্মেব সাধক ছিলেন। তারাটিয়া গ্রামে এই সেখ বংশেব বর্ত্তমান বাস। এই গ্রামে শেখ মকবুল একটী মসজিদ প্রস্তুত করেন। এই মসজিদের সম্মুখে একখানি প্রস্তর খণ্ড স্থাপিত আছে। সেই প্রস্তব খণ্ডে নির্ম্মাতাব নাম ও নির্ম্মাণের তারিখ লিখিত আছে। ইহাতে লিখিত আছে যে হিজরী ১০৬৭, জিলহজ আরম্ভ হইয়া হিজরী ১৯৬৭ মেহবমের ১৩ দিন যাইতে মসজিদ প্রস্তত শেষ হয়। শেখ মকবুলের সময ইহা নির্ম্মাণ হয। এই প্রস্তরের লেখক ফকীব রৌশন"। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে মোগল সম্রাট সাহজিহানেব সময় সেখ মকবুল বর্ত্তমান ছিলেন। সেখ মকবুলের জমিদারী লাভের অনেক-অলৌকিক কাবণ এদেশের লোকে বলিয়া থাকে, কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য নহে বলিয়া, এস্থলে উল্লেখ করা গেল না। ইহা অনুমান হয় যে দেওয়ান শেখ মকবুল একজন সাধক ছিলেন। তাঁহাব প্রতি কোন কাবণে সন্তুষ্ট হইয়া সাহজিহান বা তৎপূর্ব্ব কোন মোগল সম্রাট তারাটীয়া, বিজয়কান্দী ও উলুবাড়িয়া মুসলমান সাধক প্রবরকে প্রদান করেন। উলুবাড়িয়া হস্তান্তরিত হইয়াছে। ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে মৌজে তারাটিয়া ও বিজযকান্দী ৩৬০।৯০ আনা কালেক্টবীর তৌজীভুক্ত হইয়া সেখ মকবুলের বংশধরেরা অদ্যপি ভোগ দখল করিতেছে। শেখ মকবুলের পুত্র সেখ বক্তাব; সেখ দারম উল্লাব পুত্র সেখ কোকাই। সেখ কোকাইর পুত্র, সেখ কলীম বর্ত্তমান আছে। এই সেখ বংশ এত বিস্তৃত যে সেখ মকবুলেব চারি ভ্রাতার বংশরগণের নাম বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। মুসলমানেব উত্তরাধিকারী সম্বন্ধে আইন অনুযায়ী পুত্র কন্যা সকলেই স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে। অতএব এই জমিদারীতে এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশীদাব আছে যে কাহার কাহাব কড়া গণ্ডাব অংশ হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র অংশ জন্য সেখ মকবুলের বংশধরেরা সামান্য কৃষকের ন্যায় পরিচিত হইতেছে। আবার ইহাদের অনেকে ঋণগ্রস্ত হওয়ায়, অনেক অংশ হস্তান্তবিত হইয়াছে। ২/১ জন অংশীদার ভিন্ন সকলেই অবস্থা শোচনীয়।

---

(1) "It thus appears that this institution has no organization or discegipline and that the course of instruction excedingly meagre "- Mr. Adam's Report on Education

(২) এই গ্রাম আমরুল পবগণার অন্তর্গত।

দ্বাদশ অধ্যায়
জমিদার ও রাইয়ত

ভাবতের মধ্যে সূর্য্য ও চন্দ্রবংশ অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। ভগবান বিষ্ণু হইতে এই দুই বংশেরই উৎপত্তি। ভগবান সূর্য্যর তনয় মনু সূর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই মনুই আদি রাজা। মনুব সময়ের পূর্ব্বে বেদদ্বারা আর্য্য জাতির আচার ব্যবহার অবগত হওয়া যাইত। কোন্ সময়ে মনু সুমেরু পর্ব্বতে রাজত্ব করেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। সর উইলিয়ম জোন্স অনুমান করেন যে, মনু খৃষ্টীয় শকের পূর্ব্বে ঊনবিংশতি শতাব্দীতে রাজত্ব করেন। এই ভাগবান মনু মানব পিতা। ইহাঁরই বংশধরেরা সুমেরু শিখর হইতে নানা জাতি ও বংশে ভারতের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। তাঁহারই সঙ্কলিত মনুসংহিতাতে রাজা প্রজা সম্বন্ধ, শাসন প্রণালী, সামাজিক আচার ব্যবহার, রীতিনীতি সমস্ত বিস্তৃতরূপে নিয়ম বদ্ধ হইয়া প্রথমে সমাজ গঠিত হইল।

এই মনুসংহিতাতে রাজা প্রজা সম্বন্ধ উল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু "জমিদার ও রাইয়তের" কথাব উল্লেখ নাই। মুসলমান রাজত্বকাল হইতেই 'জমিদাব ও রাইয়তের" সৃষ্টি দেখা যায়। "জমিদার ও রাইয়তের" বিষয় বিস্তারিতরূপে বলিবার পূর্ব্বে মনুসংহিতার "রাজা প্রজা" সম্বন্ধ এস্থলে কিছু বলা আবশ্যক।

বাজা সকল সমাজের সর্ব্বময় শাসনকর্ত্তা। রাজা কেবল ঈশ্বরের অধীন ছিলেন, কিন্তু কোন মানবের ক্ষমতাধীন ছিলেন না। অত্যাচার নিবারণ এবং কুকর্ম্মান্বিত ব্যক্তির দণ্ড বিধান করার জন্যই রাজার সৃষ্টি। রাজার সাত জন মন্ত্রী ছিল, তন্মধ্যে প্রধান মন্ত্রী ব্রাহ্মণ এবং অবশিষ্ট ৬ জন ক্ষত্রিয় ছিল। এই সপ্ত মন্ত্রীর পবামর্শে রাজা রাজকার্য্য-নির্ব্বাহ কবিতেন। বাজা ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, কিন্তু সুখবিলাসী ছিলেন না। তিনি ক্রোধকে নিয়ত শাসনাধীন বাখিতেন এবং আলস্য পরবশ ছিলেন না। রাজা বিলক্ষণ জাতিব যে "দণ্ড জাগ্রত যে সময় প্রহরী নিদ্রিত।" এই সত্যের উপর নির্ভর করিয়া রাজা বিচার ও দণ্ডবিধান করিতেন।

বাজার অধীনে রুষিয়ার ন্যায় ভাবতেব সকল স্থানে "পল্লী সমাজ" স্থাপিত ছিল। এক একটী পল্লীসমাজ এক একটী ক্ষুদ্র সাধারণতন্ত্র। লর্ড মেটকাফ সাহেব বলেন— "এক একটী পল্লীসমাজ এক একটী ক্ষুদ্র সাধারণতন্ত্র। ইহা এক একটী ক্ষুদ্র দেশ যাহার শাসনকর্ত্তা প্রজারাই মনোনীত করে। প্রজারা যাহা চায় তাহা সমস্তই এই পল্লীসমাজে আছে। বিদেশীয় সম্বন্ধে এ সমাজ প্রায় স্বাধীন।" (১) গ্রামের সমুদয় অধিবাসীরা দলবদ্ধ হইয়া থাকাকে পল্লী সমাজ বলে। "গ্রামের মণ্ডল সেই দলের অধিপতি। তিনি নিজ এলাকার মধ্যে শান্তিরক্ষণ, জমা নিরূপণ, বিবাদভঞ্জন ও রাজস্ব আদায়ের জন্য দাযী। তিনি রাজা ও প্রজার উভয়ের প্রতিনিধিস্বরূপ পরিগণিত হন। কোন প্রজা সমাজের অমতে সমাজভুক্ত নয় এমন ব্যক্তিকে, নিজ জমিজমা দান বিক্রয় করিতে পারে না। যদি কেহ্ উত্তরাধিকারী না রাখিযা পরলোক গমন করে, তাহার বিষয় রাজার না হইয়া সমাজেরই দখলে আইসে। মণ্ডলের সাহায্যার্থ মুহুবি কোটাল প্রভৃতি কয়েকজন কর্ম্মচারী তাঁহার তাঁবে নিযুক্ত থাকে। পল্লীসমাজ অতি পূর্ব্বকার হইতে এদেশেব নানা স্থানে

---

(1) "The Village Communities " Says Lord Met-calfe "are little republics, having nearly everything that they want whithin themelves and almost independent of any foreign relations"- The Fifth report from the select committee on the afairs of the East India Company

সন্নিবেশিত ছিল। কিন্তু এখন ক্রমশই বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে।" (২) যে আত্মশাসন প্রণালীর জন্য ভারতবাসীরা আজ কাল আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তাহা অতি প্রাচীনকালে ভারতের সকল স্থানে কোন না কোন এক আকারে প্রচলিত ছিল। এক পল্লীসমাজের অধিপতি দশ পল্লীসমাজের অধিপতির অধীন। দশ পল্লীসমাজের অধিপতি শত পল্লীসমাজেব অধিপতির অধীন। শত পল্লীসমাজেব অধিপতি সহস্র পল্লী সমাজের অধিপতিব অধীন। এই প্রকারে বাজা পর্যন্ত নিয়োজত হইত। একশত পল্লী একটী পরগণাব সমান এই সকল কর্ম্মচারীবা রাজার দ্বারা নিযুক্ত হইয়া বাজকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। প্রজারা আপন আপন অধিপতির নিকট রাজকর দিত এবং অধিপতি পবস্পরা উচ্চতর অধিপতির নিকট বাজকর দিতেন। এইরূপে রাজা উচ্চতম অধিপতির নিকট হতে কর প্রাপ্ত হইতেন। নিম্নলিখিত কর্ম্মচাবীবা পল্লী সমাজ গঠিত হইত,—

(১) অধিপতি (মণ্ডল);
(২) একাউণ্টেণ্ট মুহুবি);
(৩) ঘাটাল (চৌকিদার);
(৪) পুবোহিত ও গুরুদেব;
(৫) শিক্ষক;
(৬) গণক;
(৭) কামার;
(৮) ছুতার;
(৯) কুমার
(১০) ধোপা;
(১১) নাপিত;
(১২) গোবক্ষক
(১৩) চিকিৎসক;
(১৪) বাদ্যকর;
(১৫) কবি, গায়ক; কুলঞ্চ।

এইরূপ পল্লীসমাজে কিছুরই অভাব নাই; যাহা আবশ্যক তাহা সমুদয় পল্লীসমাজে ছিল। উপরের লিখিত ব্যক্তি দ্বারা পল্লীসমাজ গঠিত ছিল। ইহারা-প্রত্যেকে নিজ নিজ কার্য্য জন্য ভুমিজাত শস্যের একাংশ প্রজার নিকট পাইত। এক গ্রামেব অধিপতি প্রজার নিকট হইতে উৎপন্ন শষ্যের সামান্য অংশ দশ পল্লীর অধিপতি দুই হালেব জমিনদার শত পল্লীর অধিপতি একটী ক্ষুদ্র পল্লী; এবং সহস্র পল্লীব অধিপতি একটী বৃহৎ নগর পুরস্কাব পাইতেন। এই তাহাদের কর্ম্মের বেতন স্বরূপ ছিল। জমিনের অবস্থা অনুসারে এবং কৃষকেব পরিশ্রমানুযায়ী জমিনের উৎপন্ন শস্যের দ্বাদশ, অষ্টম অথবা এক ষষ্টাংশ রাজার কর নির্দিষ্ট ছিল। রাজাব কর যে কেবল কৃষিজাত শস্যের উপব নির্দ্ধারিত ছিল এমত নহে; গৃহের এ বাণিজ্যেব উপব, বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী ও রপ্তানীর উপর, বিবাহ আদি কার্য্য উপলক্ষে এবং অন্যান্য উপায়ে বাজার কর বিস্তর সংগৃহীত হইত। রাণীভবানীব সময়েও এই প্রথা অবলম্বনে নানা উপায়ে কর আদায় হইত। মনুসংহিতানুসারে শস্যেব এক ষষ্টাংশ যে রাজার কব ছিল তাহা ক্রমে পবিবর্ত্তন হইয়া একার্দ্ধ হইল। এই নিয়মানুসারে বর্ত্তমানে বঙ্গদেশে যে ব্যক্তি-জমিন প্রকৃত চাষ করে সে তাহার অধিকাংশ শস্য জমিন দখিলকারীকে দেয়। সেই অর্দ্ধাংশ হইতে জমিন দখিলকাবী প্রকৃত ভূম্যধিকারীকে রাজস্ব দেয়া ইহাকেই বাজসাহীতে 'সর্বাহ বা আদি' প্রণালী বলে। ক্রমে দেবমন্দির ও ঋষিগণের আশ্রম এবং সৈন্য রক্ষার প্রয়োজন হইল। সৈন্য রক্ষার জন্য কর্ম্মচারীদের বেতন স্বরূপ এবং দেবমন্দির ঋষিদের আশ্রমরক্ষাব জন্য নিষ্কর ভুমিরও সৃষ্টি হইল।

পূর্ব্বে রাজসাহীর পল্লী যেরূপ ছিল এক্ষণে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন। পুবাকালে প্রায় সকল

---
(২) ভাবতবর্ষেব ইতিহাস।

সময়ে এক একটী পল্লী এক একটী দ্বীপ বলিয়া ভ্রম হইত; কিন্তু এখন কেবল বর্ষাকালে পল্লী দ্বীপ বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। পল্লীব যে স্থানে বসতি আছে সে স্থান কেবল লোকের বসতি। আবার এক এক জাতি এক এক স্থানে বসতি। এক পল্লীর যে স্থনে ব্রাহ্মণ বাস করিতেন সে স্থানে কেবল ব্রাহ্মণই বাস কবিতেন, যে স্থানে কায়স্থ বাস করিতেন, সে স্থানে কেবল কায়স্থই বাস করিতেন, যে স্থানে কুমার বাস কবিত সে স্থানে কেবল কুমারই বাস কবিত। এই রূপে এক জাতির মধ্যে, অন্য জাতিব বাস ছিল না এবং হিন্দু মধ্যে মুসলমানের বাস ছিল না। এক্ষণে কোন কোন স্থান এ প্রথাব বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইতেছে। এক একটী পল্লী একরূপ গঠিত যে পল্লীর এক একটী স্থান গৃহস্থের গৃহ-শ্রেণী ও বৃক্ষশ্রেণী, প্রাচীর ও জলবাশি চৌকি বাসাধিকার কার্য্য কবিয়া থাকে এবং এক জাতি এক ধর্ম্মীয় প্রতিবাসীব রক্ষক স্বরূপ দিবারাত্রি পরস্পব প্রহবীর কার্য্য করিয়া থাকে। ববেন্দ্রভুমিব পল্লী পরিখা দ্বাবা বেষ্টিত না হইয়া মৃত্তিকা নির্ম্মিত প্রাচীব দ্বারা বক্ষিত। এখন খড়েব গৃহের পরিবর্ত্তে টীনের ঘর, ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ পল্লীতে প্রস্তুত করিয়া গৃহস্থ চোর ডাকাইত ও অগ্নিভয় হইতে ত্রাণ পাইবাব উপায কবিয়াছেন। (১) পল্লীর নিকট নদী প্রবাহিত হইলেও কুপ ও পুষ্করিণীর অভাব নাই। এক পল্লীতে জলকষ্ট থাকিলে সেই পল্লীর বা অন্য পল্লীর ধনবানেবা নিজ ব্যয়ে কৃপ ও পুকুর খনন কবিয়া দিয়া জলকষ্ট নিবারণ করিয়া থাকেন। এখন এই প্রথাব শীথিলতা দেখা যাইতেছে। পল্লীতে সামান্য কোন বিষয লইয়া পবস্পব বিবাদ উপস্থিত হইলে পল্লীব প্রধানেরা মধ্যস্থ হইয়া পরস্পব বিবাদ নিষ্পত্তি কবিয়া দিয়া থাকে। এ প্রথা প্রায় বিলুপ্ত।

এরূপ পুরাকালের পল্লী সমাজের গুণ ও দোষ উভয়ই ছিল। প্রজাবা আপনারা একত্রিত হইয়া পরস্পর পবস্পরকে রক্ষা করিত। রাজস্বের সম্বন্ধ ব্যতীত প্রজাবা সকল বিষয়ে স্বাধীন থাকিযা পল্লীব শাসনকার্য্য রক্ষা করিত। কিন্তু পল্লী সমাজে একটী প্রধান দোষ দেখা যায় যে রাজবিপ্লব ও দুর্ভিক্ষ সময়ে রাজার প্রজাকে বক্ষা করাব কোন নিয়ম দেখা যায না; এমন দুর্দ্দিনে ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট যেরূপ প্রজাকে রক্ষা কবিয়া থাকেন, সেরূপ পল্লী সমাজে কোন নিয়ম দেখা যায় না।

মুসলমান বাজত্ব কাল হইতে বঙ্গদেশে মনুব সময়ের বাজ কর্ম্মচরীরা (পল্লী সমাজের অধিপতি প্রভৃতি) বিলুপ্ত হইতে লাগিল। মনুর পব আধুনিক হিন্দু বাজত্ব সময়, হিন্দুরাজার অধীন যে সকল ভূম্যধিকারীর সৃষ্টি হয়, তাহারাই মুসলমান বাজত্ব সময় হইতে জমিদার নামে প্রসিদ্ধ হইল। ইহারাই গ্রাম্য ভূম্যধিকাবী বলিয়া আদিতে পরিচিত ছিল। এই গ্রন্থের 'জমিদার' শীর্ষকে সঙ্গের জমিদারগণেব উৎপত্তি ও ক্ষমতা বিস্তৃত রূপে বর্ণিত হইয়াছে। মোগল সম্রাটের অধঃপতনেব বাঙ্গালাব সুবাদারের অধীনে, বঙ্গদেশেব জমিদারগণের ক্ষমতা এরূপ যে, তাহাদের সৈন্য, গড়, বিচাবালয় প্রভৃতি সবই ছিল। রাজসাহী প্রদেশের সাঁতুল, তাহিরপুর, পুঁঠীয়া নাটোর প্রভৃতির বাজারা এই শ্রেণীর জমিদাব ছিলেন। মুসলমান রাজ্যেব ধ্বংসের পব কোম্পানীর আমলেব কিছু দিন পর হইতে তাহাদেব সে ক্ষমতা রহিল না। আবার নাটোব রাজবংশ পতনের পব রাজসাহীতে বিস্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারের সৃষ্টি হইল। এই ব্রিটীশ গবর্ণমেন্টের অধীনে ছোটবড় জমিদারগণের দেওয়ানী ও ফৌজদারী কোন বিচারেরই ক্ষমতা রহিল না। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে জমিদারগণের সহিত যে চিবস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, সেই বন্দোবস্তানুসারে গবর্ণমেন্টের খাজানা থানার নির্দ্দিষ্ট দিনে সূর্য্য অস্তের পূর্ব্বে জমিদারগণ নিজ

(1) "The villagers are neither attacked at home by robbers in the night, nor are their homes laid in ruins by an invading army "- The Citizen of India

নিজ রাজস্ব কিস্তিমত দাখিল করিবে এবং প্রজার নিকট জমির কর বা রাজস্ব ব্যতীত অন্য কোন আবওয়াব বা অন্য কোন প্রকারের কর লইতে পারিবে না।

মুসলমান সময় হইতে ভূম্যধিকারীর অধীন যে প্রজারা কর দিতে ছিল তাহারা "রাইয়ত" নামে প্রসিদ্ধ হইল। আরব্য ভাষায় "রাইয়ত" শব্দে অধীন বা বশতাপন্ন ব্যক্তিকে বুঝায়। সুতরাং মুসলমান রাজ্যে সম্রাটের অধীন ভূম্যধিকারী বা জমিদারের জমিদারীর অধিবাসীবশতাপন্ন প্রজাকে "রাইয়ত" বুঝাইতে লাগিল। "যে ব্যক্তি স্বয়ং বা আপন পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগেরদ্বার বেতনভোগী কৃষাণদিগের দ্বারা অথবা ভাগী উঠাইয়া চাষ করিবাব অভিপ্রায়ে কোন জমিদার বা মধ্যস্বত্বাধিকারীর নিকট হইতে ভূমিভোগের স্বত্ব পাইয়াছেন, সেই ব্যক্তিকে ও তাহার উত্তরাধিকারীকে রাইয়ত বলা যাইতে পারে"। (১) বঙ্গদেশে এই "রাইয়ত" সাধারণতঃ তিননামে পরিচিত হয়, যথা—(১) যে ব্যক্তি জমিদারকে কর দেয়, (২) কৃষক, (৩) যে ব্যক্তি ভূমি দখল করে (খোদকস্তা ও পাইকস্তা প্রজা) আবার কৃষক তিন শ্রেণীতে বিভক্ত যথা— (১) আদিম নিবাসী এবং অধস্তন সন্তান, (২) উপনিবেশী (৩) পাইকস্তা। এক্ষণ এই অনুমিত হইবে যে মনুসংহিতার রাজা আমাদের বৃটীশ গবর্ণমেন্ট কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে দেশীয় রাজা ও বড় জমিদার— যাহাদের সহিত রাইয়তের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। এক, দশ, শত ও সহস্র গ্রামের অধিপতি আমাদের বর্ত্তমান ছোট জমিদার ও তালুকদার এবং পল্লীসমাজভুক্ত প্রজা সমূহ বর্ত্তমান "রাইয়ত"। জমিদারের অধীন থাকিয়া যাহারা কর দেয় তাহারাই বাইয়ত বলিয়া অভিহিত হইল। মনুর সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত জমিদারের সহিত রাইয়তর (প্রজা) সমন্বন্ধ নির্ণয়, পরস্পর ব্যবহার ও অবস্থা বর্ণন করা এবং রাজস্ব পদ্ধতির সহিত জমিদাব ও বাইয়তের সম্বন্ধ দেখান এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

মনুসংহিতার আর্য্য জাতিব আচার, ব্যবহার, রাজনীতি প্রভৃতি অবগত হওয়া যায়। বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণ এক খানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ইহাতে অতি প্রাচীন ভারতান্তর্গত গৃহস্থের জীবন ও ধর্ম্ম, প্রাচীন, সভ্যতা, রাজনীতি, যুদ্ধশস্ত্র অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে। মনুব সময় হইতে রামায়ণের সময় পর্যন্ত "রাজা প্রজার" যে সম্বন্ধ ছিল সে সম্বন্ধ অনেক দিন বিলুপ্ত। এ সময়ে রাজা প্রজাকে পুত্রবৎ স্নেহ মমতা ও পালন করিতেন এবং দুর্ব্বৃত্ত প্রজার দন্ডবিধান করিতেন। আবর প্রজাও পিতার ন্যায় রাজাকে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান করিত। রাজা কৌশলে, ছলে বা বলে প্রজার অনিষ্ট করিতেন না এবং প্রজাও সরলভাবে রাজার অনুগত থাকিয়া রাজকর যথাসময় রাজকর্ম্মচারী সমীপে উপস্থিত করিত এবং রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করিতে অণুমাত্র ক্রটী করিত না। ইহা কথিত আছে, এ সময়ে রাজ্যে অকালমৃত্যু ও রোগ আদিতে প্রজাকে প্রপীড়িত করে নাই। এ সময় ক্ষেত্র প্রচুর শস্য প্রদান করিত। গাভী স্বচ্ছন্দে দুগ্ধ দিত। ছল, মিথ্যা, আলস্য, হিংসা, শোক, দুঃখ, মোহ ও দৈন্যে প্রজাকে একবারে অভিভূত করিতে পারে নাই। অন্নাভাবে প্রজার কষ্ট হয নাই; রাজকর জন্য প্রজাপ্রপীড়িত হয় নাই। সে সময়ে সুখের রাজ্য ছিল। ইহা সর্ব্বদা কথিত হয় যে সুখের রাজ্যকেই "রামরাজ্য" বলে। হিন্দুশাস্ত্র মতে সত্য যুগে পূর্ণ ধর্ম্ম, ত্রেতা যুগে ধর্ম্মের একপদ স্খলিত হয়। দ্বাপর যুগে ধর্ম্মের দুই পদ স্খলিত হয় এবং কলিতে ধর্ম্মের কেবল এক পদ মাত্র রহিল। ইহাতে এই অনুমিত হইবে যে সত্যযুগ হইতে হিন্দুদের মধ্যে ধর্ম্মের ভাব ক্রমে কমিয়া অধর্ম্মের ভাব বৃদ্ধি পাইতেছে। দ্বাপরের শেষভাগে মহাভারতের সময়।

(1) Rayat means primarily a person who has acquired a right to head land for the purpose of cultivating it by himself or by members of his family or by hired servants or with the aid of parteners, and includs also the sucessors in interest of persons who have acquired such a right"- The Bengal Tenancy Act

এই মহাভারত আর এক খানি প্রসিদ্ধ প্রাচীন ইতিহাস। ইহাতে চন্দ্রবংশীয় কুরু পাণ্ডবাদিগের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। এই ভারতে ভগবান ব্যাসদেব ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, রাজা ও প্রজার কর্ম্ম, লোকের আচাব ব্যবহার, রাজনীতি, যুদ্ধশাস্ত্র, ভারতের সে কালের উচ্চ বীরত্ব, সাহস, প্রাচীন সভ্যতা প্রভৃতি এরূপ বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়াছেন, যে হিন্দু অপেক্ষা পৃথিবীর কোন জাতী অতীত গৌরবেব ছবি সুন্দররূপে অঙ্কিত করিতে ক্ষমবান হন নাই। (১) যেমন রামায়ণে রামরাজ্যের বীরত্ব ও রাজ্যশাসন বর্ণিত আছে। তেমনই মহাভারতে ধার্ম্মিকপ্রবর রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজধর্ম্ম বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়া আছে। খৃষ্টীয় শতকের চতুর্দ্দশ শতাব্দীব পূর্ব্বে রাজা যুধিষ্ঠির দিল্লীব নিকট ইন্দ্র প্রস্থ নগরে অতি প্রতাপের সহিত রাজত্ব করিতেন। অভিমন্যুতনয় মহারাজ পরীক্ষিত পাণ্ডব প্রবীর যুধিষ্ঠিরের উত্তরাধিকারী। যে সময় মহারাজ যুধিষ্ঠিব নিজ পৌত্র পরীক্ষিতের করে রাজ্যভাব সমর্পণ করিয়া মহা-প্রস্থানে যাত্রা কবিলেন, সেই সময় হইতে রাজ্যে কলির প্রবেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহা ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে পাণ্ডবগণ ভারতে প্রজাদিগকে দোর্দ্দান্ত প্রতাপে পরম সুখে প্রতিপালন করেন। যে রাজার রাজ্যে অসৎ ব্যক্তিরা প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচার করে, তাঁহাব যশঃ, পরমায়ু, সৌভাগ্য ও পবলোক সকলই নষ্ট হয়। অত্যাচার হইতে প্রজাকে রক্ষা করিয়া এবং অবস্থা কালানুযায়ী রাজস্ব গ্রহণ করিয়া, প্রজার সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করাই পরমধর্ম্ম। মহারাজ পরীক্ষিত এইরূপে রাজ্যশাসন করিয়া পরলোক গমন করেন। এই সময় হইতে ক্ষেত্রে পূর্ব্বের মত বৃষ্টি না হওয়ায় শস্য কম উৎপন্ন হইতে লাগিল। প্রজারা শোক, দুঃখ ও রোগে ক্রমে অভিভূত হইতে লাগিল। অল্প আয়ু হইতে লাগিল। প্রজারা অনাবৃষ্টির ভয়ে কাতব হইতে লাগিল এবং সময়ে সময়ে তাহারা দুর্ভিক্ষে কষ্ট পাইতে লাগিল। বাজা প্রজার সম্বন্ধ ক্রমে অপবিত্র হইতে লাগিল। রাজা ক্রমে প্রজার শোনিত শোষণ করিয়া রাজকর আদায় করিতে লাগিলেন। ক্রমে হিন্দু রাজা হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন এবং প্রজাব সুখসমৃদ্ধিরও হ্রাস হইতে লাগিল।

এইরূপে হিন্দু রাজার পতনে ভারত যবনাক্রান্ত হইল। সেনবংশীয় রাজার সময় দিল্লী সম্রাট কুতবুদ্দিনের অধীন বক্তিয়ার খিলিজী ১২০৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা অধিকার করেন। বক্তিয়ার অধিকৃত রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত করেন। বাগড়ির কিয়দংশ একভাগ এবং বরেন্দ্র ভূমি লইয়া এক ভাগ। দিনাজপুর সন্নিহিত দেবকোট ইহার রাজধানী ছিল। রাজসাহী প্রদেশ এই বরেন্দ্রভূমিব অন্তর্গত। এই সময় হইতে সেরসাহ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার রাজস্বপদ্ধতির কোন সুচারু বন্দোবস্ত ছিল না। বাঙগালার শাসনকর্ত্তাদের অনেকেই মুখে দিল্লীব প্রভূত্ব স্বীকার কবিতেন কিন্তু কার্য্যে প্রায় স্বাধীন ছিলেন। তাঁহারা দিল্লীর সম্রাটকে করও রীতিমত দিতেন না। সেই শাসনকর্ত্তাদেব অধীনে যে সকল ভূম্যধিকারী ছিলেন তাঁহারা রাইয়তের নিকট কর আদায় করিতেন বটে কিন্তু শাসন কর্ত্তাদের নিকট রীতিমত কর দিতেন না। এসময় রাজসাহী কেন বঙ্গদেশেই অরাজকতা ছিল; এমন সময়ে সাঁতুল, তাহিরপুর, পুঠীয়া দুবলহাটী প্রভৃতি জমিদারেবা সর্ব্বময় কর্ত্তা।

(1) Mr Dult says in his epilogue - "The Mahabbarsta depicts the political life of ancient India. with all its valour and heroism, ambition and lofty chivalry The Ramayan ambodies the domeatic and religious life of ancient India, with all its tenderness and sweetness, its indurance and devotion The one picture without the other was incomplete, and we should know but little of the ancient Hindus, if we did not comprehend their inner life and faith as well as their political life and their warlike virtues. The two together give us a true and graphic picture of ancient Indian life and civilitation, and no nation on earth has preserved a more faithful picture of its glorious past "- Quoted in the Indian Review, Vol I, 1900

মুসলমান রাজাদের মধ্যে সেরসাহ প্রথমে রাজস্ব প্রণালীর প্রস্তাব করেন কিন্তু অল্প দিন রাজত্ব করায় ঐ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। আকবরই সেরসাহার রাজস্ব প্রণালী সংশোধিত করিয়া কার্য্যে পরিণত করেন। (১) আকবরেব প্রধান মন্ত্রী রাজা তোডরমল্লের যত্নে ও কার্য্য দক্ষতাগুণে এই সুপ্রসিদ্ধ রাজস্ব পদ্ধতি দিল্লীর সাম্রাজ্য মধ্যে প্রচলিত হইল। প্রথমতঃ জমির জরিপ ও গ্রামের সীমা নির্দ্দিষ্ট হইল। পরে উর্ব্বরতা অনুসারে জমি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইল। প্রত্যেক ভূমধ্যধিকারীর দখলে কত জমি এবং কোন্ কোন্ গ্রাম তাহা নির্দ্দিষ্ট হইল। পরিশেষে প্রত্যেক শ্রেণীর জমিতে প্রতি বিঘায় গড়ে কত শস্য উৎপন্ন হয় এবং উহাব মূল্যই বা কত, তাহা নিদ্ধাবিত হইল। তখন সম্রাট সমুদয় আয়ের তিন ভাগের এক ভাগ রাজকর বলিয়া ধার্য্য করেন। কিন্তু ভুমি সংক্রান্ত অন্য প্রকাব কর বা আবওয়াব যাহা ছিল তাহা রহিত হইল। "এই বন্দোবস্ত নিবন্ধন প্রজাবর্গের ভারের অনেক লাঘব হইল কিন্তু চুবি ও তহবিল ভাঙ্গার বড় সুবিধা না থাকাতে ভূমি হইতে পূর্ব্বে রাজসংসাবে যে আয় হইত, উহাব পবিমাণ বড় কমিল না। যাহাতে এই বন্দোবস্ত দ্বারা প্রজালোকের সুখ স্বচ্ছন্দতা বর্দ্ধিত হয়,তদ্বিষয়ে সম্রাট যৎপরোনাস্তি উৎসুক ছিলেন। যাহাতে রাজস্বেব ইজেরা দেওয়া না হয় এবং কালেক্টরেরা গ্রামের মণ্ডল বা পাটোয়ারীর কথায় না ভূলিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রত্যে কবাইয়তেব সহিত তাবৎ বিষয়ের নিস্পত্তি কবেন, তন্নিমিত্ত তিনি অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। অতএব ইহা সাহসপূর্ব্বক বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার এই বন্দোবস্ত নিবন্ধন অনেকাংশে প্রজাপুঞ্জেব সুখ স্বচ্ছন্দতা বর্দ্ধিত হইয়াছিল"। (২) বাজার কর শস্যে না দিয়া প্রতি বিঘায় উৎপন্ন শস্যেব এক তৃতীয়াংশের বাজার মূল্য ধবিয়া নগদ টাকা দিতে হইত। বাজার দরের রাজস্বের টাকা বেশী হওয়া মনে করিলে কৃষকেরা শস্যের এক তৃতীয়াংশও দিতে পারিত। এই বন্দোবস্ত প্রথমে প্রতি বৎসর হইত; অবশেষে দশবৎসর জন্য বন্দোবস্ত হয়। এই দীর্ঘকালের বন্দোবস্ত প্রজার অনেক সুবিধা হয় যে রাজ্যে প্রতি বিঘায় ধানও ২০ মণ, গম ১৩ মণ এবং কার্পাস ৭॥ মণ জন্মে এবং বাজার কর এক তৃতীয়াংশ মাত্র; সে দেশের প্রজাব দুঃখ কোথায়? আইন আকবরীতে লিখিত আছে যে, "বাঙ্গলার রাইয়তেবা রাজভক্ত এবং রাজ-কর দিতে নিতান্ত মুক্ত-হস্ত। খাজানা কিস্তী বা কিস্তী দাখিল করিত। তাহারা আপনারাই নির্দিষ্ট স্থানে কিস্তীর খাজানা দিবাব সময় পবিস্কাব ও বহুমূল্য বস্ত্র পরিধান করিয়া রৌপ্য বা স্বর্ণ মুদ্রা লইয়া আসিত। বাঙ্গালার নবাব সায়েস্তা খাঁ, নবাব সুজাউদ্দীনর সময়ে টাকায় দশ মণ করিয়া চাউল বিক্রয় হইয়াছে এবং নবাব মুর্শিদকুলী খাঁব সময়ও টাকায় ৪ মণ চাউল বিক্রয় হইয়ছে"। (৩) সে সময বাইয়ত সুখ স্বচ্ছন্দতায় জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া পরিবাবর্গকে প্রতিপালন কবিয়াছে; অথচ রাইয়ত সুখবিলাস-পরায়ণ ছিল না।

এমন সময়ে অর্থাৎ নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর সময় পর্য্যন্তও জমিদারগণ কম বেশী যেরূপ স্বাধীন ভাব অবলম্বন করিয়া রাইয়তের নিকট কর আদায় করিতেন এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচাব কার্য্য সম্পাদন করিতেন; তাহা এই গ্রন্থের নাটোব রাজবংশেব ইতিহাসে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এস্থলে পুনবায় উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই সময় রাজসাহীব রাইয়তেবা জমিদারগণের অধীনে কি প্রকার কাটাইয়াছে তাহা রাজবংশীয়দের ইতিহাসেই বর্ণিত হইয়াছে।

যেমন মুসলমানদিগের বঙ্গদেশ অধিকারের সময় হইতে মোগল সম্রাট আকবরের সময়

---

(1) "Akbar's revenue system, though celebrated for the benfits it conferred on India, presented no new invention It only carried the previous system into effect with greater precition and correctness it was in fact only a continuation of a plan commenced by Shirshsh, whose short reign did not admit of his extending to all parts of his kingdom "- Elphinstone'es History of Inmia, Book IX, Chapter III

(২) ভাবতবর্ষেব ইতিহাসে;

(৩) রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায প্রণীত বাঙ্গলার ইতিহাস।

পর্য্যন্ত রাজস্বপদ্ধতির সুশৃঙ্খলা ছিল না। তেমনই ইংরেজের বঙ্গদেশ অধিকার সময় হইতে লর্ড কর্ণওয়ালীশের সময় পর্য্যন্ত রাজস্ব পদ্ধতির সুনিয়ম বিধিবদ্ধ হয় নাই এবং জমিদার রাইয়ত সম্বন্ধ দৃঢ়ীভূত হয় নাই। ইংরাজ রাজত্বে রাজস্বপদ্ধতি সম্বন্ধে লর্ড কর্ণওয়ালীশ আকবর। মোগল সাম্রাজ্যে যেমন আকবরের রাজস্বপ্রণালী প্রসিদ্ধ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে তেমনই লর্ড কর্ণওয়ালীশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রসিদ্ধ। এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সহিত বঙ্গের জমিদার রাইয়তের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধের উপর রাইয়তের সুখ দুঃখ, সমৃদ্ধি দৈন্য, উন্নতি অবনতি সমুদয় নির্ভর করিতেছে। আকবরের "রাজস্ব পদ্ধতিতে" রাইয়তের সহিত জমিদারের (কালেক্টবের) যেরূপ সম্বন্ধ ছিল, লর্ড কর্ণওয়ালীশের "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে" সেরূপ সম্বন্ধ রহিল না। সম্বন্ধের অনেক পরিবর্ত্তন হইল। আকবরের প্রণালীতে কালেক্টর অর্থাৎ ভূম্যধিকারী রাজস্ব রাইয়তের নিকট হইতে আদায় জন্য শতকরা কিয়ৎপরিমাণে কমিশন পাইতেছিলেন। এই কর সংগ্রহ কার্য্য ক্রমে পুরুষানুক্রমিক হইয়া উঠে। সেই জন্য এই কালেক্টরেরা জমিদার উপাধি গ্রহণ করিলেন এবং তাহাদের অধীনের মহলের প্রকৃত ভূস্বামী বলিয়া পরিচিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে তাহাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এরূপে জমিদারেরা দেওয়ানী ফৌজদারী বিচার করিবার ক্ষমতা হস্তগত করিলেন এবং স্বাধীন ভাবও অবলম্বন করিতে লাগিলেন। অবশেষে এই জমিদারগণ সৈন্য, গড়, বন্দুক, কামান প্রভৃতি রাখিতে লাগিলেন। আবার কেহ রাজা, রায়রায়ান, খাঁ, সিংহ প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করিলেন। সে সময় দিল্লী বহুদিনের পথ, রাজ দববার সঙ্কটময় এবং দুরধিগম্য; অতএব বঙ্গের ক্ষমতাশালী জমিদারগণই রাইয়তের হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা এবং দণ্ড মুণ্ডের কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। তখন রাইয়ত একপ্রকার জমিদারের সম্পূর্ণ অধীন। বঙ্গের রাইয়ত চিবকাল রাজভক্ত। সুতরাং জমিদার যাহা চাহিতেন তাহাই রাইয়তের নিকট পাইতেন। রাইয়ত সে সময় বিলাস-পরায়ণ নহে, সরল ও নিরীহ এবং অল্পেই সন্তুষ্ট। আবার মৃত্তিকাও উর্ব্বর এবং শস্য প্রচুর উৎপন্ন হয়। অতএব রাইয়ত সুখে কাল কাটাইত। কিন্তু মুসলমান রাজ্য-পতনে এবং ব্রিটীশ রাজ্যের সুবন্দোবস্ত না হওয়া পর্যন্ত রাজ্যে দরিদ্র নিরীহ রাইয়তদের প্রতি অন্যায় অত্যাচার নিবন্ধন কৃষি বাণিজ্যের অনেক ক্ষতি হইতে লাগিল। এই সময় রাইয়ত যে হীন অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহা সংশোধন করিতে অনেক দিন লাগিল।

তদপব ইংরেজেবা এ দেশ জয় করিয়াই লর্ড কর্ণওয়ালীশের সময়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আকবরের রাজস্ব পদ্ধতি অনুসারে রাজস্ব আদায় করেন না। যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর রাজস্ব দিতে চাহিত তাহারই সহিত মেয়াদি ইজারা বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইত। কোন কোন স্থলে পুরুষানুক্রমিক পদ্ধতিরও বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইতে লাগিল। ইজারদারেরা স্ব স্ব অধিকার নির্দ্দিষ্টকালের জন্য মনে করিয়া বাইয়তদের উন্নতি বা ভুমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি কিছুই বিবেচনা করিতেন না। কেবল রাইয়তের রক্ত শোষণ করিয়া নিজ উদর পরিপূর্ণ করিতে চেষ্টা করিতে চেষ্টা করিত। তন্নিবন্ধন বঙ্গের কৃষি ও বাণিজ্যের একবারে হীন অবস্থা হইল। জমিদার ও রাইয়ত উভয়েই ক্রমে নিঃস্ব হইতে লাগিল। এমতাবস্থায় প্রজাবৎসল বৃটীশ গবর্ণণ্টে জমিদার ও রাইয়তের রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন; ১৭৯০ সালের ১লা ডিসেম্বর হইতে জমিদার রাইয়ত সম্বন্ধ দৃঢ়ীভূত হইতে লাগিল। তদপর ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পাদিত হইল। যে সময় লর্ড কর্ণওয়ালীশ জমিদারগণ সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পন্ন করেন সে সময় রাইয়ত কি এবং রাইয়তের স্বত্ব কি, তাহা তাঁহার অগোচর ছিল না। এই 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে" জমিদার প্রকৃত ভূস্বামী এবং তাহার অধীন যে জমি ভোগদখল করিবে সেই রাইয়ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। জমিদারের সঙ্গে এই বন্দোবস্ত হইল যে জমিন সম্পর্কীয় কর ব্যতীত জমিদার রাইয়তের নিকট অন্য কোন আবয়াব লইতে পারিবে না এবং যে রাজস্ব বৃটীশ গবর্ণমেণ্টকে দিতে হইবে তাহার কমি বেশী হইবে না; বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে লর্ড

কর্ণওয়ালীশ এইরূপ অঙ্গীকারে বদ্ধ হইলেন। এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তদ্বারা কৃষি ও বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না; কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে যে দোষ শূন্য তাহাও বলা যাইতে পারে না। জমিদার ও রাইয়তের সুবিধা অসুবিধা দুইই হইয়াছে। লর্ড কর্ণওয়ালীশের এই বিশ্বাস ছিল, বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট সন্তোষ চিত্তে রাজস্বের সীমাবদ্ধ করিলেন; অতএব জমিদারগণও তাহাদের নিজ করের সীমাবদ্ধ করিবে। কিন্তু কার্য্যে তাহা পরিণত হইল না। বৃটীশ গবর্ণমেণ্টেব রাজস্বের সীমা নির্দ্ধারিত রহিল; কিন্তু জমিদারগণ নিজ রাইয়তের রক্ত শোষণ করিয়া কর ক্রমে বৃদ্ধি করিতে লাগিল। ইহা অপেক্ষা একটী গুরুতর দোষ লক্ষিত হইল। "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" একটী প্রাচীরের ন্যায় জমিদার ও রাইয়তদিগেব মধ্যে দণ্ডায়মান হইল। এই প্রাচীর অতিক্রম করিয়া রাইয়ত নিজ দুঃখকাহিনী বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীর গোচর করিবার পন্থা পাইল না। (১) এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারকে নির্দ্ধারিত দিনে সূর্য্য অস্তেব পূর্ব্বে কিস্তী কিস্তী রাজকর কলেক্টর সমীপে দাখিল না করিলে জমিদারী নিলাম হইয়া যাইবে। জমিদার অত্যাচারেই হউক বা কৌশলেই হউক রাইয়তের নিকট হইতে কর আদায় করিয়া কালেক্টরীতে দাখিল করিতে পারিলেই হইত। কালেক্টর সাহেব রাজস্ব পাইলেই সন্তুষ্ট। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রথমাবস্থায় অনেক জমিদার রাজস্ব কিস্তী বা কিস্তী নির্দ্দিষ্ট দিনে দাখিল করিতে না পারায় জমিদারী নিলাম হইয়া যায়। জমিদারের এই অসুবিধা বেশী দিন রহিল না। জমিদার রাইয়তের নিকট যাহাতে সহজে রাজস্ব সংগ্রহ করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে অনেক আইন প্রচলিত হইল। বঙ্গদেশের প্রজাস্বত্ব বিষয়ক ১৮৮৫ সালের ৮ আইন প্রচলিত হইবার পর হইতে বঙ্গের রাইয়তের অনেক সুবিধা হইয়াছে এবং জমিদারের অন্যান্য রাজস্ব বৃদ্ধির দায় হইতে রক্ষা পাইয়াছে। পক্ষান্তরে রাইয়তের নিকট জমিদারের রাজস্ব আদায়ের এবং জমির উৎকর্ষতালাভে বা অন্য কারণে প্রজার জমা বৃদ্ধি করিবার অনেক সুবিধা হইয়াছে। বাকী খাজানার সুদ বা খেসারৎ লইবার জমিদারগণের অধিকার হওয়ায় রাইয়ত বাকী খাজানার সুদ বা খেসারৎ দিবার ভয়ে জমিদারের খাজানা রীতিমত দিতে লাগিল।

এক্ষণ রাজসাহীর জমি ও কৃষি; জমিদারের রাইয়তের প্রতি ব্যবহার এবং রাইয়তের জমিদারের প্রতি ব্যবহার এবং জমিদার ও রাইয়তের অবস্থা বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

রাজসাহীর জমি— রাজসাহীর জমি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা ঃ— (১) পলি, (২) ভড়, (৩) বরেন্দ্র। পদ্মা নদীর চরে নীল ও কলাই প্রচূর পরিমাণে জন্মে। পলিতে ধান্য কম জন্মে; কিন্তু সর্ষপ, তিল, খেঁসারী, মটর, বুট, গাঁজা, তুত, ইক্ষু, হরিদ্রা, পাট, গম, তামাক প্রভৃতি বেশী পরিমাণে জন্মে। ভড়ে কেবল ধান্য জন্মে। আজি কালি ধন্যের জমিতেও পাট চাষ হইতেছে। বরেন্দ্রভূমিতে কেবল ধান্য জন্মে। রাজসাহীর প্রধান শস্য ধান্য; কিন্তু রাজসাহীতে সকল শস্যই প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। রাজসাহী দুগ্ধবতী গাভী। ইহাকে যথোচিত আহার দিয়া পুষ্ট করিতে পরিলে ঐ দুগ্ধদ্বারা আমরা বলবান ও পুষ্ট থাকিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারি। জমি সাধারণতঃ এখনও উর্ব্বর। কিন্তু উর্ব্বরতা শক্তি ক্রমে হ্রাস হইতেছে। পূর্ব্বে রাজসাহীর উৎকৃষ্ট জমিতে ২০/২৫ মণ ধান্য জন্মিয়াছে। এক্ষণে সেই জমিতে ১০/১২ মণের বেশী জন্মে না। ইহার কারণ কি? বঞ্চনাপদ্ধতিই ইহার প্রধান কারণ। (২) এক জমিতে প্রতি বৎসর দুইটী একটী শস্য প্রচুর পরিমাণে আত্মসাৎ করিয়া নিজে বলবান ও পুষ্ট হইবে; কিন্তু মাতৃভূমিকে পুষ্টিকর আহার দিতে ইচ্ছা কর না বা জান না। কৃষক! ভূমি কি ইহাও

(1) "But amongst the many evils resulting from this permanent settlement, perhaps the worat has been that it has acted as a wall shututing out the great agricultural population from the cognizance of the British officials"- The Statesman, September I, 1880.

(2) "Agriculture in India has become and becomes, daily more and more what Liebig happily designated a system of Spuliatison" -The Statesman, November I, 1881

জান না যে, গাভীকে ভাত খাওয়াইলেই বেশী দুগ্ধ দেয়? যে দুগ্ধের ভাগ প্রত্যহ অপহরণ করিতেছ, তাহা আহার দিয়া পূরণ করিলে সেই দুগ্ধ পাইবে। অতএব মাতৃভূমিকে বঞ্চনা করিয়া অপহৃত অংশ, সারাংশ দ্বারা পুরণ না করিলে তোমাকে মাতৃভূমি প্রতি বৎসর পূর্ব্বের ন্যায় প্রচুর শস্য কি প্রকারে দিবে? কৃষক! মাতৃভূমিকে প্রচুর পুষ্টিকর আহাব দেও, তবে প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণে পূর্ব্ববৎ শস্য পাইবে। এখনও সাবধান হও নতুবা পরে মাতৃভূমির শক্তি আরও হ্রাস হইবে। পিতা, পিতামহ যে যে প্রণালীতে কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছে, সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকিলে ভবিষ্যতে দুর্গতি উপস্থিত হইবে। বঙ্গভূমি রত্ন-প্রসবিনী। সুতরাং কৃষি পদ্ধতির উন্নতি সাধন না কবিয়াও তোমরা এক্ষণ যথেষ্ট শস্য পাইতেছ।

আমি স্বীকার করি, রাজসাহীব কি সমস্ত বঙ্গের কৃষক বিজ্ঞান শিক্ষা করে নাই; তাহারা সাধারণতঃ মূর্খ। কিন্তু বিশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে যে জমি যে শস্যের উপযোগী এবং যে সময় যে প্রণালীতে চাষ করিতে হইবে, কোন্ জমি কি প্রকার তাহা বঙ্গের কৃষক যেরূপ জানিত, আজও সেরূপ বঙ্গের কৃষক জানে। এক জন ইউরোপীয় স্বীকার করিয়াছেন যে বঙ্গের কৃষক ইউরোপীয় উত্তম কৃষকের ন্যায় জমিব গুণাগুণের ক্ষুদ্র বিভিন্নতা বিলক্ষণ অনুভব করিতে পারে। (১) কিন্তু এক জমিতে পুনঃ পুনঃ এক শস্য, এক জমিতে এক বৎসর ২/৩ শস্য দেওয়া, জমিকে মধ্যে মধ্যে অবকাশ এবং সার না দেওয়া নিবন্ধনে শস্য উৎপন্নের পরিমাণ ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিতেছে। রাজসাহীতে বহুতর নদ, নদী, বিল আছে। বর্ষার সময় সমুদয় শস্য ক্ষেত্র বিশেষতঃ ধান্য ক্ষেত্র জলে প্লাবিত হইয়া এক প্রকার "রেতি" মৃত্তিকা জমির উপর পতিত হইয়া জমির উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি করে। ইহার উপব নির্ভর করিয়াই বোধ হয় রাজসাহীর কৃষকেরা জমিতে সার দিবার পদ্ধতি শিক্ষা করে নাই। কিন্তু রাজসাহীর নদ নদী বালিতে ক্রমে পূর্ণ হইয়া আসিতেছে। অতএব পূর্ব্বের ন্যায় সকল স্থান বর্ষাব জলে প্লাবিত হইয়া "রেতি" মৃত্তিকা পায় না। গাঁজার জমিতে সার না দিলে হয় না বলিয়াই সাব স্বরূপ খৈল দিয়া থাকে।

রাজসাহীব কৃষকদিগের সহিত, জমির উর্ব্ববা শক্তির হ্রাস এবং কৃষি দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য অর্থাভাব বিলক্ষণ সম্বন্ধ আছে। রাজসাহীতে মুসলমান কৃষকই বেশী। তাহাদের সাধারণতঃ অবস্থা ভাল না হইলেও নিতান্ত মন্দ নহে। কৃষকদের বিলাসিতাই অর্থাভাবের প্রধান কারণ। স্বল্প মূল্যে গাভী পাওয়া যায় বলিয়া তাহারা দুর্ব্বলা গাভী দ্বারাই প্রায় কৃষি-কার্য্য নির্ব্বাহ করে। বলবান বলদ বা ষাঁড় দ্বারা প্রায়ই তাহারা কৃষি কার্য্য নির্ব্বাহ কবে না। অতএব জমি উত্তম কর্ষণ হয় না। অর্থাভাবে বলিষ্ঠ গরু ক্রয় করিতে না পারায়, এবং জমি ভাল চাষ না হওয়ায় ক্রমে ঘাস জন্মে এবং জমির উর্ব্বরতা শক্তিরও হ্রাস হয়। কৃষক বিলাস-পরায়ণ না হইলে এবং বিশেষ যত্ন করিলে মন্দ জমিও ক্রমে ভাল এবং বিলাস-পরায়ণ হইয়া অর্থাভাবে এবং অযত্নে ভাল জমিও মন্দ হইয়া যায়। রাজসাহীর জমি যেরূপ উর্ব্বর, সেরূপ কৃষক পরিশ্রম, যত্ন ও অর্থ ব্যয় করিলে আরও প্রচুর পরিমাণে নানাবিধ শস্য জন্মিতে পারে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

জমিদারের রাইয়তের প্রতি ব্যবহার এবং রাইয়তের জমিদারের প্রতি ব্যবহার— রাজসাহীর জমিদারের মধ্যে কেহ "মহারাজা," কেহ "রাজা", কেহ "রাজাবাহাদুর", কেহ "রায় বাহাদুর", কেহ "রায় রায়ান" কেহ "চৌধুরী", কেহ "খাঁ", উপাধি মুসলমান সম্রাট বা ইংরাজ সম্রাট হইতে পাইয়া, সম্মানিত হইয়াছে। আবার কোন জমিদারের রাজ প্রদত্ত চিহ্নিত উপাধি না থাকিলেও হিন্দু সমাজে তাঁহারা বিশেষ সম্মানিত। রাজসাহীতে বড় ছোট অনেক রাজা জমিদারের বাস। ইহাঁরা প্রায় সকলেই হিন্দু এবং অধিকাংশই সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ। ইহাদের মধ্যে প্রাচীন আদি বংশও নিত্যন্ত কম নহে। অতি পূর্ব্বে রাজসাহীর জমিদারগণ বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ

(1) "Native cultivators as keenly appreciate the smallest differences in the relative qualities of different sails as do the best Europan farmars "- The Statistman, November, I, 1880

জমিদারগণ সংস্কৃতে বিলক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহাদের বিষয়জ্ঞান ও ধর্ম্মজ্ঞান নিতান্ত প্রশংসনীয় ছিল। তাঁহাদের অধিকাংশ নিজ রাজধানীতে থাকিয়া বা প্রত্যক্ষ সংস্রবে থাকিয়া আপন আপন রাইয়তের সুখ দুঃখের কথা শুনিয়া তাহাদের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। আজকালকার বঙ্গেব কোন কোন জমিদারের ন্যায় দাঙ্গা-হাঙ্গামায় বা প্রাচীন স্থান অস্বাস্থ্যকর হওয়ায় নিজ নাএব বা দেওয়ানের প্রতি নিজ জমিদারীর ভার অর্পণ করিয়া, পূর্ব্বে জমিদারগণকে স্থানান্তর গমন, করিতে হইত না। প্রাচীন স্থান অস্বাস্থ্যকর নিবন্ধনে বা অন্য কোন অনিবার্য্য কারণে কোন কোন জমিদার স্থানান্তর বাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এশ্রেণীর জমিদারের সহিত রাইয়তেব দেখা সাক্ষাৎ দেওয়ানের বা নাএবের মুখে বা জমা জমিব কাগজে। আবার কাহারও সহিত কোন প্রকাবেই সাক্ষাৎ নাই। কোন কোন জমিদার নিজ রাইয়তকে চিনেন না এবং কোন কোন রাইয়তও জমিদারকে চিনে না। এশ্রেণীর জমিদারের দেওয়ান বা নাএব সর্ব্বময় কর্ত্তা। জমিদার স্বয়ং যেরূপ স্নেহ ও মমতার সহিত রাইয়তকে পালন করিবেন, সেরূপ দেওয়ান বা নাএব দ্বারা কোন মতেই আশা করা যায় না। যে জমিদার সম্পূর্ণরূপে দেওয়ান বা নাএবের উপর নির্ভর করেন, তিনি তাঁহাব জমিদারীব আভ্যন্তরিক কার্য্যাদিতে ও সম্পূর্ণরূপে অনভিজ্ঞ। এশ্রেণীর জমিদার কেবল মুনাফার টাকা লইয়া নিজ ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারিলেই কৃতার্থ মনে করেন। ইহার আয় ব্যয়ের হিসাবের প্রতি দৃষ্টি নাই। আবশ্যক মত অর্থ না পাইলে দেওয়ান বা নাএব অকর্ম্মণ্য বলিয়া ইহাব ভ্রম জন্মিতে পারে। অতএব দেওয়ান বা নাএব অর্থেব সরবরাহ করিলেই প্রভু সন্তুস্ট থাকিবেন এবং তাহাব চাকুরী স্থির থাকিবে, তখন রাইয়তের প্রতি স্নেহ মমতা না করিয়া রাজস্ব ব্যতীত ভিক্ষা গ্রাম খরচা প্রভৃতি নানা আবওয়াবে রাইয়তের নিকট অর্থ সংগ্রহ করিয়া দেওয়ান বা নাএব কিয়দংশ জমিদারকে দিয়া সরফরাজ হন এবং কিয়দংশ নিজের বাক্সবন্দী করেন। এমতাবস্থায় রাইয়তের কষ্ট ভিন্ন কি? রাজসাহীতে এরূপ জমিদারও অনেক আছে যাহারা কেবল ন্যায্য রাজস্ব, সেস; সুদ, জমিপত্তনের নজর লইয়া সন্তুস্ট। ইহাঁরা কোন বাবদে কখনও রাইয়তের নিকট হইতে কোন অন্যায্য কর লইতে ইচ্ছা করেন না এমত নহে, রাইয়তের গৃহে অগ্নি দাহ হইলে দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত হইলে, মড়ক লাগিলে অর্থ দিয়া আহার, ঔষধ দিয়া সাহায্য করিয়া থাকেন। ইহাদের ধনাগার জমিদারের নহে। প্রজার ধন প্রজার উপকারের জন্য জমিদার নিকট গচ্ছিত আছে। (১)

আবার দরিদ্র রাইয়ত ন্যায্য কর দিতে অশক্ত হইলে তাহার অনাদায়ী কর মাপ দিয়া থাকেন। ইহারাই রাইয়তের পিতা, ইহারাই দরিদ্র রাইয়তের প্রকৃত জমিদার। পক্ষান্তরে দুই একটী এরূপ জমিদারের নাম শুনা গিয়াছিল যে যাহার বার্ষিক যত জমা তাহার বার্ষিক তত ভিক্ষা বা কোন স্থলে জমারও বেশী ভিক্ষা। হস্তী ক্রয়ের ভিক্ষা, স্কুল খরচা প্রভৃতিও রাইয়তের নিকট আদায় করিতে ত্রুটী করিতেন না। ইহারাই রাইয়তের যম-স্বরূপ। এরূপ অত্যাচারেও দরিদ্র রাইয়ত জমিদারের পদানত এবং আজ্ঞাবহ ছিল। জমিদার ও রাইয়তগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারেব সঙ্গে সঙ্গে এপ্রকার দৌরাত্ম্য ক্রমে কমিয়া আসিতেছে। জমিদারগণ সুশিক্ষিত এবং ধর্ম্মপরায়ণ হইলে রাইয়তের প্রতি অত্যাচার হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। অশিক্ষিত জমিদার-গণের হিতাহিত জ্ঞান না থাকায় রাইয়তের রক্ত শোষণ করিয়া নিজ সুখ স্বচ্ছন্দ বৃদ্ধি করাকেই কৃতার্থ মনে করেন। মোটের উপর বলিতে গেলে এক্ষণ বড় ছোট অনেক জমিদার শিক্ষিত এবং ন্যায়পরায়ণ রাইয়তের সুখ দুঃখের কাহিনী স্ব-কর্ণে

---

(১) কাবুলের আমীব যথার্থই পুত্রকে উপদেশ দিয়াছেন। "মনে থাকে যেন, রাজকোষ বাজাব নহে, প্রজাব ধন ভাণ্ডার রাজার তত্ত্বাবধানে আছে মাত্র, প্রজার ধন রাজাব হস্তে গচ্ছিত আছে মাত্র।"

"গচ্ছিত ধনের এক কপর্দকেও রাজা নিজেব সুখের জন্য খরচ কবিতে অধিকাবী নহেন প্রজাব ধন বহিয়াছে শুদ্ধ প্রজার সুখের জন্য, প্রজার অভাবের জন্যে। যে রাজা এই ধনেব এক কপর্দ্দকও নিজেব অর্থে খরচ করেন তিনি ঘোর বিশ্বাসঘাতক। তাঁহার মত নিমক হারাম আর দ্বিতীয় নাই। সে বাজার ইহলোকে দারুণ অযশ পরলোকেও ঘোর দুর্গতি" বঙ্গবাসী—৯ই জুন ১৯০০।

শুনিয়া, রাইয়তের অবস্থা দেখিয়া স্নেহ সংগ্রহ করিয়া ইহারা যে কেবল গবর্ণমেন্ট সমীপে এবং রাইয়ত সমীপে প্রশংসনীয় হন এমত নহে; প্রজাপালনে ঈশ্বরও জমিদারের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন। (১) মহানির্ব্বাণতন্ত্রে ইহা উক্ত হইয়াছে, যে রাজা প্রজার ধনে লোভ করিবেন না এবং নিয়ম মত কর গ্রহণ করিয়া প্রজাসমূহকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিবেন। (২)

রাজসাহীর রাইয়ত সাধারণতঃ নিরীহ এবং প্রভুভক্ত; কিন্তু কোন কোন স্থলে আজ কাল রাইয়ত জমিদারের অবাধ্য দেখা যাইতেছে। কৃষক স্বভাবতঃ সরল এবং সর্ব্বদা সন্তোষ চিত্তে কালযাপন করে। শস্যের সময় ইহারা আনন্দময়। অর্থ না থাকিলেও শস্যের সময় শস্যের বিনিময়ে কেহ মৎস্য, কেহ দধি, কেহ মিষ্টদ্রব্য ক্রয় করে। পৌষ মাসের সংক্রান্তির দিন কৃষকের বড়ই অনন্দ। কিন্তু কৃষক-জীবন বড় কষ্টকর। চাষের সময়, রোপণ সময়, শস্য কর্ত্তন সময়, রৌদ্র, বৃষ্টি, ঝড়, কৃষকের মাথার উপর দিয়া যায়। এরূপ কষ্টে ও দুঃখেও যদি কৃষক ক্ষেত্র শস্যপূর্ণ দেখে এবং সমুদয় শস্য গৃহে গোলাযাত করিতে পারে, তবে সেই দুঃখ ভুলিয়া যায় এবং আনন্দে উচ্ছলিয়া উঠে। এইরূপ শ্রমলব্ধ সামান্য অর্থ মধ্যে জমিদার মহাজনের ন্যায্য কর দিয়াও যদি কৃষক সমুদয় বৎসরের সংসার উপযোগী শস্য রাখিতে পারে, তবে তাহার আনন্দের সীমা থাকে না। জমিদার শিক্ষিত ন্যায়পরায়ণ হইলে কৃষকের কোন দুঃখের কারণ উত্থিত হয় না। নতুবা বৎসরের খোরাকের শস্য বিক্রয় করিয়া জমিদারের সুখ সমৃদ্ধির জন্য আবওয়াব দিতেই সমস্ত ফুরাইয়া যায়, অবশেষে পেটের দায়ে মহাজনের দ্বারে উপস্থিত হইতে হয়। এমতাবস্থায়ও রাইয়ত জমিদারের পদানত ও আজ্ঞাবহ। জমিদারের বাড়ীতে কোন বিবাহ কোন পূজা বা কোন কার্য্য উপস্থিত হওয়ায় রাইয়তের কায়িক সাহায্য আবশ্যক হইলে, তাহারা অতি আহ্লাদের সহিত সাহায্য করিয়া থাকে। যে রাইয়ত এইরূপ সরল ভাবে জমিদারের কার্য্য করে, সে জমিদার ও রাইয়তকে পুত্রের ন্যায় প্রচুর আহার দিয়া, মিষ্ট বাক্যে সন্তোষ করিয়া বিদায় করেন। বঙ্গদেশের অন্যান্য জেলার রাইয়ত অপেক্ষা রাজসাহীর রাইয়ত অতি সরল এবং প্রভুভক্ত, আবার অন্যান্য জেলা অপেক্ষা রাজসাহীর অধিকাংশ জমিদারই নিরীহ, রাইয়তেব প্রশংসায় পাত্র এবং পিতার ন্যায় সম্মানিত হন। রাজসাহীতে অনেক স্থলে এরূপ দেখা যায়। যে রাইয়তের বাড়ীতে কোন নূতন ফল জন্মিলে জমিদারকে না দিয়া রাইয়ত অগ্রে ভক্ষণ করে না। ইহাই রাইয়তের জমিদারের প্রতি ভালবাসা ও ভক্তির চিহ্ন। রাইয়তের গৃহে শস্য থাকিতে জমিদারের ন্যায্য গণ্ডা দিতে কোন আপত্তি করে না। অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায় যে রাইয়ত জমিদাবের বাধ্য এবং জমিদারের কোন অবাধ্যের কার্য্য করিয়া তাহার অসন্তোষের ভাজন হইতে ইচ্ছা করে না। আইন আকবরী হইতে বর্ত্তমান সময় পর্যন্ত রাইয়তের এইরূপ ব্যবহার প্রায়ই দেখা যাইতেছে। (৩)

এস্থলে বঙ্গের জমিদার ও রাইয়তের সম্বন্ধে একজন বাঙ্গালার সিবিলিয়ান যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। "জমিদার ও রাইয়ত, যেমন রাজা ও প্রজা; যেমন সম্রাট ও অধীনস্থ প্রজা। জমিদার যাহা আদেশ করিবে রাইয়ত তাহা প্রতিপালন করিবে। জমিদার নিজ আকাঙ্খা, লিপ্সা, অভিমান প্রভৃতি নীচ প্রকৃতি অনুসারে রাইয়তের নিকট হইতে

(১) শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থেব তৃতীয় স্কন্ধে ১৩শ অধ্যায়।

(২) "অনোভীস্যাৎ প্রজাবিত্তে গৃহায়াৎ সম্মিতং করম্
বক্ষস্গীকৃতং ধর্ম্মং পুত্রবৎ পালয়েৎ প্রজাঃ।
মহানির্ব্বাণ তন্ত্র অষ্টম উল্লাস।

(3) "The ryats (raiyut) of Bengal are obedient and ready to pay taxes During eight months of the year they pay the required sums by instalments They personally bring the money in rupees and gold-mohurs in the appointed place. Payment in kind is not usual Grain is always cheap. The people do not object to a survey of the lands and amount of the land tax is settled by the collector and the ryat His majesty, from kindness, has not altered this system "-Ain Akbari

অন্যায্য কর আদায় জন্য অত্যাচার করিবেন। নাএবের খোরাকী, আমলাদের বেতন, সরকারী ইন্‌কম ট্যাক্স নিজের হস্তী ক্রয়, নিজ কাছারীর কাগজ কলম, কালী আদির ব্যয়, দাখিলা আদিছাপান ব্যয়, প্রতিবেশী নীলকর সহিত বিবাদ বাবত ব্যয় এবং মেজিস্ট্রেট নিকট কোন অপরাধে দণ্ডনীয় হইলে সেই দণ্ডের টাকা, প্রভৃতি জমিদাব রাইয়তের নিকট অন্যায আদায় করিবে। গোয়ালা রাইয়ত দুগ্ধ দিবে, কলু তৈল দিবে, তাঁতি কাপড় দিবে, ময়রা সন্দেশ দিবে এবং জালুয়া মৎস্য দিবে। মহোৎসব, সন্তান জন্ম, অন্তোস্টি ক্রিয়া, এবং বিবাহ উপলক্ষে জমিদার রাইয়তের নিকট হইতে অন্যায্য কর আদায় কবিবে। কোন স্ত্রীর সহিত গুপ্ত সহবাসে সন্তান উৎপন্ন হইয়া ভ্রূণ হত্যা হইলে, সেই অপরাধী রাইয়ত প্রচুর অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে। জমিদারের নিজের খোয়াড় আছে এবং প্রজার শস্য ক্ষেত্রে পদার্পণে প্রত্যেক পশুর জন্য চারি আনা আদায় করিবে। জমিদারগণ মধ্যে এইরূপ অন্যান্য কর আদায় হয়"। (১) ইহা অতিরঞ্জিত বলিয়া আমরা অনুমান করি। তথাপি রাজসাহীর জমিদারগণ মধ্যে যে এ দোষের কোন একটী দোষ একবারে ছিল না তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু জমিদারগণ মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে এবং ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের সুদক্ষ শাসন প্রণালীতে এই দোষ ক্রমে কমিয়া আসিতেছে। গবর্ণমেন্টের তীক্ষ্ণ গবেষণায় এবং শাসন কৌশলে জমিদার ক্রমে সুলভ্য এবং দোষ শূন্য হইয়া উঠিতেছে এবং রাইয়তের অন্যায় ভার কমিয়া আসিতেছে। রাইয়তেব সহিত জমিদারের সম্বন্ধ সন্তোষ জনক এবং শান্তিপুর্ণ। ১৮৯০—৯৯ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক রিপোর্টে রাজসাহী বিভাগেব কমিশনর সাহেব বলিয়াছেন যে "ভূম্যধিকারীর সহিত রাইয়তের যে সম্বন্ধ তাহা সাধারণতঃ শান্তিপ্রদ।" (২)

জমিদারের অবস্থা— দুই চারি জন বড় বড় জমিদার ব্যতীত রাজসাহীর জমিদারের অবস্থা সাধারণতঃ যে বড় সন্তোজনক তাহা আমাদের বিশ্বাস নাই। বঙ্গের জমিদার সাধারণতঃ অলস, উচ্চ শিক্ষায় অরুচি, বিলাসী, অমিতব্যয়ী, অভিমানী, "খানদানী" প্রিয় ও বৃথা আমোদপ্রিয়। রাজসাহী জমিদার মধ্যে এ সকল দোষ অল্প স্থলেই দৃষ্ট হয়। রাজসাহী জমিদাব শ্রেণী মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দোষও ক্রমে করিয়া আসিতেছে। কিন্তু এই প্রকারেব দোষ কমবেশী জমিদারগণ মধ্যে প্রচলিত হইলে, সে জমিদারকে দেওয়ান বা নাএবের উপব নির্ভর করিতে হয় এবং রাইয়তের প্রতি অত্যাচারও কম হয় না; অবশেষে জমিদারীও ধ্বংস হয়। রাজসাহীর পক্ষে এই একটী শুভ যে, সমস্ত দোষ গুলি একাধারে প্রায় দেখা যায় না যে জমিদারের একটী বা দুইটী দোষ আছে, তাহার গুণরাশি সে দোষকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। যাহাকে সমস্ত দোষ স্পর্শ করিয়াছে, তাহার জমিদারী ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। রাজসাহীতে শিক্ষিত জমিদারের সংখ্যা আজ কাল নিতান্ত কম নহে, কিন্তু বিষয় জ্ঞান বিশিষ্ট ও জমিদারী-কার্য্যপটু জমিদারের সংখ্যা বেশী নহে। অশিক্ষিত ব্যক্তির নানা দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা। এই অশিক্ষিত বিষয়-জ্ঞানবিহীন জমিদারগণ মধ্যে অধিকাংশই অমিতব্যয়ী ও বিলাসপরায়ণ। এই দুইটী দোষই ঋণের প্রধান কারণ। ঋণের আর একটী প্রধান কারণ আছে। আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী।

(1) "The Zemindar and ryut are as king and people, they are monarch and subject What the Zemindar asks, the ryat will give, what the Zemindar orders, the ryat will obey The land-lord will tax his tenants for every extra-vagance that avarice, ambition, pride, vanity or other intemperance may suggest He will tax him for the Kharaki of his naib, for the salary of his amin, for the purchase of an elephant for his own use, for the cost of the Stationery of his establishment, for the cost of printing the forms of his rent receipt, for the payment of his expenses &c These cesses pervade the whole Zemindari system "- The Statesman, "September I, 1880

(2) "The relations between Landlords and tanants are generally peaceful "- Rajsahi Division's Administration Report for 1898-99

হিন্দু আইন অনুসারে একটী ক্ষুদ্র জমিদারীতে বহুতর অংশ ক্রমে হইয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদার বা তালুকদারের সৃষ্টি হয়। এই প্রকার ক্ষুদ্র তালুকদাবেরা সুশিক্ষিত হইয়া ব্যবসান্তর অবলম্বন করিলে ঋণ করিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু জমিদার বা তালুকদার মধ্যে সাধারণতঃ উচ্চ শিক্ষার অরুচিতেই নানা দুঃখেব কারণ হইয়া উঠে। এই জন্য বাজসাহীর জমিদারগণ মধ্যে অনেকে ঋণগ্রস্ত। যাহাদের ঘবে নগদ ধন সঞ্চিত নাই এবং ঋণও প্রচুর, তাহাদের অবস্থা শোচনীয় তাহার আর সন্দেহ নাই। এশ্রেণীর জমিদাবগণের লাটের সময় প্রায় মহাজনের দ্বারে দ্বাবে, মাড়ওয়ারীর ঘবে ঘরে দৌড়িতে হয়। আবার কখন কখন অলঙ্কার প্রভৃতি অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রাখিবার অভিপ্রায়ে মহাজনেব দ্বারে যাইয়া তাহাদের মুখাপেক্ষা কবিতে হয়। তখন সুদের হারের দিকে দৃক্‌পাত নাই, টাকা পাইলেই হইল। এরূপ অবস্থায় যে জমিদাব টাকা ঋণ কবিয়াও লাটের টাকাব জন্য, সুখ-বিলাস সম্ভোগের জন্য বা অনাবশ্যকীয় দ্রব্য ক্রয় জন্য প্রস্তুত হন; তাহাদের জমিদারী ধ্বংস হইবে বা মহাজনের ঘবে যাইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? বঙ্গের ছোট ছোট জমিদারগণ ও সম্ভ্রান্ত ধনী ভদ্র লোকদের মধ্যেও পূর্ব্বে অনেকে "খানদানী" প্রিয় ছিলেন ঃ পূর্ব্বে এরূপ রীতি দেখা গিয়াছে যে, নিজে ছাতা ধরিলে, জমিদারের পক্ষে নিতান্ত অপমানের কথা ছিল। কিন্তু বড় বড় রাজা জমিদার ও সম্ভ্রান্ত ধনী ভদ্র লোকেরা উচ্চ শিক্ষা-বলে এপ্রথা রহিত করেন। তাহাদের দৃষ্টান্তে ছোট ছোট জমিদারগণের মধ্যে এদোষ অনেক পরিমাণে সংশোধন হইয়াছে। পূর্ব্বপেক্ষা এক্ষণ বিস্তর বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইতেছে। এক্ষণ অনেক বড় বড় জমিদারও পূর্ব্বের ন্যায় "খানদানী" দেখান না। ইহাই রাজসাহীর পক্ষে শুভ। বড় বড় বাজা জমিদার মধ্যে একবারে "খানদানী" উঠিয়া যাওয়াও উচিত নহে। রাজ-দরবারে বা সময় কালে, অবস্থা ও ব্যক্তি বিবেচনায় "খানদানী" দেখান একবারে অনুচিত বোধ হয় না। সকল সময় সকলের নিকট এবং সকল অবস্থার "খানদানী" অপ্রিয় হইবারই কথা।

বঙ্গের অল্পসংখ্যক জমিদার ঘরে নগদ টাকা সঞ্চিত আছে। যে জমিদারের ঘরে প্রচুর ধন সঞ্চিত থাকে, তাহার জমিদাবী ধ্বংসের কোন আশঙ্কা থাকে না। কোন কোন জমিদাবের আয় ব্যয় সমান। (১) কোন কোন জমিদার ঋণগ্রস্ত। এই দুই শ্রেণীর জমিদারগণ ধ্বংসের ডালী মাথায় করিয়া লইয়া বসিয়া আছেন। দুই দিন অগ্র পশ্চাৎ ইহাদের ধ্বংস হইবার কথা। যে দিন রাজ্যে দুর্ভিক্ষ হইবে, যে দিন রাইয়ত ন্যায্য কব দিতেও অপারগ হইবে, যে দিন রাইয়ত মড়কে প্রপীড়িত হইয়া হা অন্ন, হা অন্ন করিয়া প্রাণত্যাগ কবিবে, সেই দিন নিঃস্ব জমিদারগণের জমিদারী কি প্রকারে রক্ষা হইবে? তখন এই জমিদারগণ তাঁহার দুই চাকার মধ্যে মর্দ্দিত হইবে। এক দিকে গবর্ণমেন্টের রাজস্ব দাখিলের অপারগতা, আর এক দিকে রাইয়তের নিকট বাজস্ব আদায়ের অপারগতা; এই দুইটা চাকার মধ্যে জমিদাব প্রেরিত হইলেই রাজ্য ধ্বংস। এই শ্রেণীর জমিদারের সংখ্যা রাজসাহীতে নিতান্ত কম নহে।

রাজসাহীর জমিদারগণ মধ্যে অধিকাংশই বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ। ব্রাহ্মণ কায়স্থের কন্যাদায় বিষম দায়। এ কন্যাকে পাত্রস্থ করিতে সাধারণ জমিদার ৩/৪ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া যায়। কোন কোন স্থলে ইহার অনেক বেশীও ব্যয় হয়। এই কৌলিন্য প্রথা কোন কোন ব্রাহ্মণ কায়স্থকে ধনী করিতেছে এবং কোন কোন ব্যক্তিকে নিঃস্ব করিতেছে।

অন্য দেশের জমিদার অপেক্ষা রাজসাহীর জমিদারগণের সামাজিক ও কুলজ ব্যয় নিতান্ত বেশী। ইহাতেও জমিদারগণকে দিন দিন হীন অবস্থায় পতিত করিতেছে।

ইহা ইতিহাসে লিখিত আছে যে, "হোসেন সার রাজ্যারম্ভ সময়ে এতদ্দেশীয় ধনীগণ স্বর্ণ-

(1) The expression "living from, hand to mouth" is alluded to here.

পাত্র ব্যবহার করিতেন এবং যিনি নিমন্ত্রিত সভায় যত স্বর্ণপাত্র দেখাইতে পারিতেন তিনি তত মর্য্যাদা পাইতেন"। (১) জমিদাব ও ধনীগণের বর্ত্তমান অবস্থা দৃষ্টে ইহা কাল্পনিক বলিয়া বোধ হয়। এখন বড় বড় রাজা জমিদারের গৃহেও স্বর্ণপাত্র অতি বিরল। ইহাও প্রতীত হয় যে বর্ত্তমান জমিদারগণের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল নহে।

রাইয়তের অবস্থা।—ছোট বড় জমিদাবগণেব অধীন থাকিয়া যে ভূম্যধিকারীকে কব দেয়, তাহাকেই রাইয়ত বুঝাইবে। রাজসাহীর এই রাইয়ত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা—

(১) যে ব্যক্তি জমিদারকে কর দেয়। যথা—, পত্তনীদার, মৌবসী ইজাবদার, মৌরসী জোতদার, কায়েমী জোতদার, ইস্তমুবারী জোতদার প্রভৃতি এবং অধীন মধ্য-স্বত্বাধিকারী প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। অর্থাৎ মোকররীহারে ভূমি-ভোগকারী রাইয়ত।

(২) উচ্চ, মধ্য বা নিম্নশ্রেণী (হিন্দু ও মুসলমান) বাইয়ত— যাহারা নিজে জমি চাষ করে না। ইহারা চাকর দ্বারা শস্য সংগ্রহ করে। ইহারা খোদকস্তা বা পাইকস্তা; এবং দখলিস্বত্ববান রাইযত।

(৩) কৃষক-- যে খোদকস্তা বা পাইকস্তা রাইয়ত (হিন্দু বা মুসলমান) নিজে জমি চাষ করে। দখলিস্বত্ববান ও দখলিস্বত্বশূন্য রাইয়ত এই শ্রেণীভুক্ত।

প্রথম শ্রেণীর রাইয়তের অন্যায্য করের ভার বহন কবিতে হয় না। ইহাদের অধীন যে কৃষক আছে, তাহারা রাইয়ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রথম শ্রেণীর রাইযত প্রায় জমিদাবেব ন্যায় অধীনস্থ বাইয়তের নিকট রাজস্ব আদায় করে। এই শ্রেণীর রাইয়তেরা কেবল জমিদারের ন্যায্য কর, ন্যায্যমত দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে। ইহাদের সাধারণতঃ অবস্থা ভাল। ইহাদের অবস্থা অনেক জমিদার অপেক্ষাও ভাল। ইহাদের মধ্যে অনেকে সুশিক্ষিত। অনেক জমিদার অপেক্ষা ইহাদের আয় বেশী।

দ্বিতীয় শ্রেণীর রাইয়তের মধ্যে উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীরা জমিদারেব নিকট সম্মানিত। ইহাদেব অনেকের ৫০ বিঘা হইতে ৫০০ শত বিঘা পর্য্যন্ত জোত আছে। ইহাদের বার্ষিক আয় ৩০০ শত হইতে ৩০০০ হাজার পর্য্যন্ত হইতে পারে। ইহাবা অনেক অন্যায্য কর হইতে বক্ষা পায়। ইহাদের মধ্যে অনেকেব অবস্থা ভাল। ইহারা প্রায়ই ঋণী নহে। আজ কাল জমিদারী অপেক্ষা সরাসরী জোতের লাভ বেশী বলিয়া, অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারও সরাসরী জোত ক্রয় করিয়া থাকেন। এই প্রণালীতে সরাসরী জোতের জন্য জমিদাবের নজর বেশী হইয়াছে এবং এই প্রকাব জোতেরও যথেষ্ট আদর হইয়াছে। এই প্রণালীতে কৃষক বাইয়তেব ক্ষতি এবং অনেক কৃষক রাইয়ত ইহাদের "কোর্ফা" রাইয়ত বা "বর্গা" বাইয়ত হইয়াছে। এই দ্বিতীয় শ্রেণীব রাইয়তের সংখ্যা যত বৃদ্ধি হইবে, ততই কৃষক বাইয়তের অবস্থা হীন হইবার সম্ভাবনা। এমন দিন হইতে পারে যে কৃষক মাত্রই "কোর্ফা" রাইয়ত হইবে। "কোর্ফা" রাইয়তের স্বত্ব ও অধিকার নিতান্ত দুর্ব্বল।

তৃতীয় শ্রেণীর রাইয়ত কৃষক। এই শ্রেণীব রাইয়ত স্বয়ং চাষ করে। কৃষক জমিদারের ও জমিদারের অধীনস্থ মোকররী হারে ভূমি ভোগকারীদের অধীন থাকিয়া স্বয়ং ভূমি চাষ করে। ইহাদের সহিত জমির সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। ইহারা হিন্দু ও মুসলমান। কিন্তু হিন্দু কৃষকেব সংখ্যা নিতান্ত কম; কৈবর্ত্ত প্রভৃতি হিন্দুরাই কৃষক শ্রেণীভুক্ত। এই কৃষক শ্রেণীর রাইয়ত আমরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিলাম; যথা— উচ্চ, মধ্যম ও নিম্ন। ৩০ বিঘা কি তদুর্দ্ধ জমি যে কৃষক চাষ করে, তাহাকে উচ্চ শ্রেণী; ১১ বিঘা হইতে ২৯ বিঘা পর্য্যন্ত জমি যে কৃষক চাষ করে, তাহাকে মধ্যম শ্রেণী; এবং ১ বিঘা হইতে ১০ বিঘা পর্য্যন্ত জমি যে কৃষক চাষ করে তাহাকে নিম্ন

(১) রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায প্রণীত বাঙ্গালাব ইতিহাস।

শ্রেণীভুক্ত করিলাম। রাজসাহীতে উচ্চ শ্রেণীর কৃষক কম; মধ্যম ও নিম্ন শ্রেণীর কৃষকই বেশী। এক গ্রামে একটী কি দুইটীর বেশী উচ্চ শ্রেণীর কৃষক নাই। আবার কোন গ্রামে উচ্চ শ্রেণীর কৃষক একবারে নাই। নিম্নশ্রেণীভুক্ত কৃষকের মধ্যে ১ বিঘা হইতে ৫ বিঘা জমি চাষ করে এইরূপ কৃষকই বেশী। গ্রামে এমন শ্রমজীবী লোক আছে যাহাদের কিছুই নাই। তাহাদের সংখ্য শতকরা ১০ হইতে ১৫ জন পর্য্যন্ত দেখা যায়। নিম্নশ্রেণী কৃষকের মধ্যেও অনেকে শ্রম-জীবী। কোন্ প্রকার জমিতে প্রত্যেক বিঘায় রাজস্ব ও চাষ করিবার ব্যয় বাদে কৃষকেব ন্যায্য আয় কত হয় তাহার একটা মোটামোটী তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল ঃ—

(১) ধান্য	৩্	প্রতিবিঘায়
(২) সর্ষপ, রাই, তিল প্রভৃতি	৪্	প্রতিবিঘায়
(৩) পাট	৮্	প্রতিবিঘায়
(৪) ইক্ষু	১৫্	প্রতিবিঘায়
(৫) হরিদ্রা	২৫্	প্রতিবিঘায়
(৬) গাঁজা	৩০্	প্রতিবিঘায়
(৭) তূঁত	৫্	প্রতিবিঘায়
(৮) নানা প্রকার কলাই	২্	প্রতিবিঘায়
(৯) গম	৩্	প্রতিবিঘায়
(১০) তামাক	৫্	প্রতিবিঘায়

"কালেক্টর সাহেব অনুমান করেন যে বিঘা প্রতি ৯ মণ ধান্য উৎপন্ন হয়" . (১) এ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত নহে। কিন্তু অনেক পূর্ব্বে ভড়ে ও বরেন্দ্র ভূমের উত্তম জমিতে ইহা অপেক্ষা বেশী ধান্য হইত। "এক হালে ১৬/১৭ বিঘার বেশী জমি চাষ হয় না"। (১) ধান্য ও অন্যান্য শস্যে যে আয় হয় তাহার গড় ধরিয়া উচ্চশ্রেণীর কৃষকের বার্ষিক আয় ৩০০্ টাকা, মধ্যশ্রেণী কৃষকের ১২০্ টাকা এবং নিম্নশ্রেণী কৃষকের ৬০ টাকা অনুমান করা যাইতে পারে।

পূর্ব্বের লিখিত তালিকা-আনুমানিক। ঠিক তালিকা প্রস্তুত করা নিতান্ত সহজ নহে। এই তালিকা সংস্রবে ইহা বলা যাইতে পারে যে রাজসাহীর ভড় ও বরেন্দ্র ভূমিতে কেবল ধান্য এবং পলিতে ধান্য নিতান্ত কম, কিন্তু অন্যবিধ শস্য উৎপন্ন হয়। তাহা বলিয়া পলিতে যে ধান্য ব্যতীত পূর্ব্বের তালিকার সকল প্রকার শস্য এক গ্রামে হয় এমত নহে। পলির এক স্থানে হরিদ্রা ও ইক্ষু জন্মে, এক স্থানে গাঁজা ও আলু জন্মে। এইরূপ রাজসাহীর পলি জমিতে শস্য উৎপন্ন হয়। স্থানানুসারে শস্য উৎপন্নের তারতম্যে কৃষকের অবস্থারও তারতম্য আছে। বরেন্দ্র ও ভড়ের কৃষকেরা একমাত্র ধান্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। সেই ধান্য কোন বৎসর না জন্মিলে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা হইয়া উঠে। পলিতে এক বৎসর একাধিক শস্য পাইলেও অন্নকষ্ট নিবারণ হয় না।

রাজসাহীতে যেরূপ সকল প্রকার শস্যই উৎপন্ন হয়, তাহাতে সকলেরই এই প্রতীতি হইবে যে কৃষকের অবস্থা ভাল। কিন্তু গ্রাম গ্রাম বিশেষ করিয়া দেখিলে ইহা জানা যাইবে যে, কৃষকের ঋণ নাই এরূপ কৃষক অতি বিরল। প্রচুর শস্য জন্মাতেও যেকৃষক এরূপ ঋণগ্রস্ত হয় কেন? ইহার একটী প্রধান কারণ বিলাসিতা। এই সুখ বিলাসিতার স্রোত সর্ব্বত্র কৃষকদের মধ্যে

(1) Hunter's Statistical Account

প্রবাহিত। এস্থলে সেকালের এবং একালের কৃষকদের অবস্থাব তারতম্য করা আবশ্যক।

সেকালের কৃষকের সম্পত্তি মৃন্ময় কলস, ঘটী, বাটী, থালা গাড়ু প্রভৃতি। শয্যা তাহাব তালাই এবং কাঁথা। রৌদ্র বা বৃষ্টি নিবারণ জন্য তালপত্রের বা বাঁশের পাতার ছাতা বা মাথুল। শীত নিবারণ জন্য দেশীয় মোটা কার্পাস বস্ত্র। পুণ্যাহ সময়, রাজদরবাবে বা জমিদারেব কাছারী যাইবার সময়, কোন কোন অবস্থাপন্ন কৃষক পবিস্কাব কাপড় ব্যবহাব করিত। সেকালের কৃষকের চিহ্নই লেঙ্গটী পরিধান, হাতে হুঁকা ও অগ্নিপাত্র এবং স্কন্ধে লাঙ্গল। কৃষকপত্নীব হস্তে কাঁসাব খাড়ু বা লোহার খাড়ু ও মৃন্ময় চূড়ি। এরূপ অবস্থাবও কৃষক আনন্দময়, যদি তাহার ঘরে বৎসরের আবশ্যকীয় ধান্য সঞ্চিত থাকে। সেকালের কৃষকেব শস্যই সম্পত্তি, শস্যই ধন, শস্যই টাকা কড়ি। অন্ন কিঞ্চিৎ লবণ সংযোগে উদরপূর্ণ করিতে পারিলে, সেকালের কৃষকের আনন্দেব সীমা থাকিত না। গৃহ শস্যপূর্ণ থাকিলে, সেকালের কৃষকের কোন অভাবই ছিল না। সেকালের কৃষকেরা, ঋণকে বড়ই ভয় করিত। টাকা কৰ্জ্জ করিয়া কৃষক একালের ন্যায় মহাজনকে রীতমত ষ্ট্যাম্পে খত লিখিয়া দিত না বা খত রেজেষ্টরী কবিয়া দিত না। তথাপি মহাজনের সহিত সেকালের কৃষক অধর্ম্মাচরণ প্রায়ই করিত না। দুর্ভিক্ষে বা অন্য কোন দৈব নিবন্ধনেও সেকালের কৃষক সকল ঋণগ্রস্ত হইত না। অনেক কৃষকের গোলাতে শস্য সঞ্চিত থাকিত।

একালের কৃষকের সম্পত্তি পিতলের কলস, ঘটী, গাড়ু বা বদনা; কাঁসার থালা, বাটী ও গেলাস। শয্যা শতরঞ্চ, লেপ, পাটী ও কম্বল। রৌদ্র বা বৃষ্টি নিবারণ জন্য কাপড়ের, বেতের বা লৌহ শিকেব রেলীর ছাতা। শীত নিবাবণ জন্য বিলাতী ব্যাপাব এবং অৰ্দ্ধ-গজী। এবং কাহারও পায়ে জুতা। লজ্জা নিবারণ জন্য বিলাতী লংক্লথ বা মার্কিন বা বিলাতী নানাপ্রকার পাড়িয়া ধূতি। এমত বাবু পোষাকেও স্কন্ধে ধান্যভার এবং মাথায় রেলীব বাড়ীর ছাতা। পুণ্যাহ সময় বা রাজদরবারে অনেকে ফিট্ বাবু। ইহাদের পবিচ্ছদ ও বেশভূষা দেখিয়া অনেক সময় ভদ্রলোক বলিয়া ভ্রম জন্মিবে। একালে কৃষকের পবিচ্ছদ দেখিয়া চিনিবার উপায় নাই। কেবল লাঙ্গল ও মই স্কন্ধে দেখিয়া কৃষককে চিনিতে পারা যায়। কৃষক পত্নীরও সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন। সোনা রূপার অলঙ্কারও কাহার হস্তে দেখা যায় এবং পবিধানে গাছা পাড়িয়া বিলাতী কাপড়ও দেখা যায়। সেকালের কৃষক-পত্নীর ন্যায় একালের কৃষকপত্নী ঘরে চরকা-ঘুরায় না। এই চিত্র অবলোকনে কৃষকের অবস্থা ভাল দেখিতে পাওয়া যাইবে। কিন্তু হায়। জমিদাব ও মহাজনদের দেয় দিয়া নিজ বিলাস সামগ্রী ক্রয় করিলে কৃষকের গৃহে বৎসরেব আহার্য্য ধান্য পাওয়া দূরে থাকুক, বীজের জন্য ধান্যই থাকে কি না সন্দেহ। কিন্তু রাজার রাজস্ব বাকী ফেলিয়া বাবুগিরির ক্রুটী হইবে না। কৃষক অমনি মহাজনের বাটীতে দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল। মহাজনের নিকট জমি বন্ধক রাখিয়া বা খাইখালাসী দিয়া কৃষক বাবুগিবির জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিল। এশ্রেণীর কৃষক জমিদারের ন্যায্য রাজস্ব বাকী ফেলে। সেকালের কৃষক জমিদার ও মহাজনদেব দেয় সমানভাবে পরিশোধ করিত। একালের কৃষকমধ্যে কেহ জমিদারের খাজানা পরিশোধ কবিল, কেহ কিয়দংশ দিল এবং মহাজনকে ২/১ টাকা দিয়া হাকাইয়া দিল। মহাজন নিরুপায় হইয়া আদালত অবলম্বন করিল। অবশেষে ঋণ করি নাই বলিয়া কৃষক আদালতে জবাব দিয়া রক্ষা না পাইলে, হয়ত মহাজন জমি নিজ নামে ক্রয় করিয়া হইল, না হয়ত চতুর জমিদাবের কবুলিয়াতের সর্ত্ত অনুযায়ী মহাজন জমির ত্রি-সীমানায় যাইতে পারিল না। মহাজনের টাকাই সমস্ত নষ্ট। পূর্ব্বের ন্যায় মহাজনের অত্যাচার নাই বটে, কিন্তু কৃষক মহাজনকে ফাঁকী দিতে পারিলে ক্রুটী করে না। ২০/২৫ বৎসর পূর্ব্বেও কৃষকেরা নিয়ত কাল ঋণজালে জড়িত থাকিত

না। হণ্টার সাহেবের লিখাতে ইহা বিশেষ প্রমাণ হইবে। (১) বর্ষার সময় ঋণ করিয়া শস্যের সময় সুদ সমেত সমস্ত টাকা কৃষক পরিশোধ কবিত। এখন প্রায় কৃষকের ঋণ নিয়তকাল লাগিয়া আছে। এমন অনেক কৃষক দেখা যায় যে যাহার এক হালের জমি, তাহার ঋণ ৪০০/৫০০ টাকার কম নহে। এই শ্রেণীর কৃষকও কম নহে।

যেমন ভদ্রলোক বিলাসপরায়ণ হইয়াছেন, তেমনই কৃষক সন্তানেরাও বিলাসপরায়ণ হইয়াছে। রাজসাহীর অনেক স্থানে মেলা বসিযা থাকে। কোন স্থানে এক সপ্তাহ, কোন স্থানে দুই সপ্তাহ, কোন স্থানে তিন সপ্তাহ মেলা স্থায়ী থাকে। মেলায় নানা দেশ হইতে নানা প্রকার দ্রব্য আসিয়া এক একটী সুন্দর বাজার বসে। ইহাতে বিলাস্ দ্রব্যেব আমদানীই বেশী। এই সকল দ্রব্যের চাক্চিক্যে কৃষক সন্তান মোহিত হয়। কৃষক সন্তানেরা বিলাস দ্রব্যের চাক্চিক্যে মুগ্ধ হইয়া অর্থ না থাকিলে এবং আবশ্যক না হইলেও, অর্থ কর্জ্জ করিয়া দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া থাকে। এ প্রণালীতে কৃষকের যে কেবল অর্থ নাশ হয় এমত নহে, কৃষক ঋণগ্রস্ত হইয়া নিজ তেজ হারাইতেছে ও সুখ বিলাসিতাব বৃদ্ধিতে অকর্ম্মণ্য হইতেছে। এইরূপে কৃষক দিন দিন হীন অবস্থায় পতিত হইতেছে। কৃষকের হীন অবস্থায় জমিদারের দুঃখ এবং পতন। এই মেলার প্রণালীতে কৃষকেরা সুখ-প্রিয়, বিলাস-পবায়ণ এবং ঋণগ্রস্ত হইতছে। কৃষক শ্রমজীবী, অতএব ইহাদেব পক্ষে বিশুদ্ধ নির্দ্দোষ আমোদ ও সুখ নিতান্ত ভাল। যাহাতে তেজ, বলবীর্য্য ও অর্থ ক্ষয় হয়, তাহা কৃষকের পক্ষে নিতান্ত দোষাবহ। এই দোযাবহ সুখ ও আমোদ কৃষক সন্তানকে দিন দিন হীন অবস্থায় পতিত করিতেছে। অর্থ ও শারীবিক বলবীর্য্য ক্ষয়ে, কু-শিক্ষার আশ্রযে, অসচ্চরিত্র ও অধর্ম্ম অবলম্বনে এবং বিলাস পরাযণতায় কৃষক নষ্ট হইলে জমিদারের জমিদারীর সুখ নষ্ট হইতেছে। কৃষকের অর্থে জমিদারেব অর্থ, কৃষকের বলে জমিদারের বল, কৃষকেব সৌভাগ্যে জমিদারের সৌভাগ্য। বাইয়তের অর্থ বৃদ্ধি করা, তাহাকে সুশিক্ষিত করা, বলবান করা, সচ্চরিত্র কবা এবং ধার্ম্মিক করা জমিদারের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আইন আকবরীতে দেখা যায় "আমিল গুজার" ও "কানুন গো" নামক কর্ম্মচাবীর সহিত কৃষকের যথেষ্ট সম্বন্ধ ছিল। "আমিল গুজার" কৃষকেব নিকট হইতে কর আদায় করিতেন। ইনি কৃষকেব বন্ধু ছিলেন। কৃষক যাহাতে উন্নতি লাভ করে, ইহাই তাহাব লক্ষ্য ছিল। কানুনগো কৃষককে রক্ষা করিতেন। এই দুই জনেব উপর কৃষক সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিত। আমাদেব জমিদার বা জমিদারেব দেওয়ান কৃষকের নিকট এখন "আমিল গুজাব" (বা রাজস্ব আদা করেন) এবং তাহার নাএব বা গোমস্তাকে "কানুনগো" বলিযা নির্দ্দেশ কবা যাইতে পারে। জমিদাব, তাহার দেওয়ান, নাএব ও গোমস্তা "আমিল গুজাব" ও "কানুনগোব" ন্যায় কৃষককে পালন ও বক্ষা করিলে কৃষকেব কোন দুঃখের কাবণ হয় না। (২) কৃষকেব অবস্থার উন্নতি কবা বাজা জমিদারেব শুভ। কৃষকের মঙ্গলেই বাজা জমিদবের মঙ্গল।

(1). "Very few cultivators of Rajshahi are contianously in debt, but most of them incur liablities to the village merchant at seed time in the shape of advances of grain which are repaid with interest after the rice crop has been harvested" Hanter's Statistical account,Rajshahi.

(2) "The Amilguzzar is the callector of revenues. He must consider himself the immediate friend of the husband-man." "The Canoongoo is the protector of husbandman."... Aynn Akburi.

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সেকাল আর একাল

মহারাণী ভবানীর সময় পর্য্যন্ত যে সময তাহা "সেকাল" এবং তাহাব পবেব সময় "একাল" বলিয়া নির্দ্ধারিত করিলাম। সেকালেব বিবরণের সহিত একালেব বিববণের তুলনা করিলে রাজসাহীর অবস্থা প্রতীয়মান হইবে।

রাজসাহী বাসীদের আচার-ব্যবহাব, বীতিনীতি, সমাজ, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা প্রভৃতিব আলোচনা কবিলেই দেশের অবস্থা বিশেষরূপ জানা যাইবে। প্রত্যেক বিষয় বিস্তাবিত বলিতে গেলে, পুস্তকের কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি হয। অতএব সংক্ষেপে নিম্নলিখিত বিষযগুলিব আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

১। শরীর, বলবীর্য্য, আয়ু।
২। বিদ্যাশিক্ষা।
৩। সমাজ, আচাব-ব্যবহার, চরিত্র।
৪। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য।
৫। ধর্ম্ম।

বাজসাহী প্রদেশে হিন্দু ও মুসলমান, এই দুই জাতিই প্রধান। বাজা জমিদারেরা প্রায় সমুদয় হিন্দু— বিশেষতঃ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। বাজসাহীতে হিন্দুর মধ্যে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেবই প্রাধান্য। মুসলমানের সংখ্যা অধিক হইলেও এ জাতির মধ্যে ধনবান ও প্রধান লোক অতি বিরল। মুসলমান জাতিব মধ্যে প্রায় সকলেই কৃষক। হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণই সমাজের নেতা। ইহাই স্বাভাবিক প্রকৃতি যে সকলেই শ্রেষ্ঠের ধর্ম্ম, আচার ব্যবহাব প্রভৃতির অনুকবণ করিয়া থাকে। অনুকবণ প্রবৃত্তি মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ। হিন্দুর রাজত্ব সময়ে অনেকে হিন্দুকে অনুকবণ করিতে যত্নবান হইতেন, আবার মুসলমান রাজত্ব সময়ে কেহ কেহ কোন কোন স্থলে মুসলমানকে অনুকরণ করিতেন। কিন্তু আজি কালি হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে অনেকে কোন কোন ইংরাজকে অনুকরণ করিতেছেন। সদ্‌গুণের অনুকরণ মহতের কার্য্য। কিন্তু অসদ্‌গুণের অনুকবণ জাতীয় স্বভাব বিরুদ্ধ।

১। শরীর, বলবীর্য্য, আয়ু— পূর্ব্বাপেক্ষা শারীরিক বলবীর্য্যের বিলক্ষণ অবনতি দৃষ্ট হইতেছে। রাজসাহীর ইতিহাসপাঠে জানা যাইবে তাহিরপুরের রাজবংশর বিজয় লস্কব বাঙ্গালার পশ্চিম দ্বার রক্ষা করিয়া অস্তাচলের জমিদাব বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তন্নিবন্ধন তিনি সিংহ উপাধি এবং ২২ পরগণা জমিদারী দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন এবং সৈন্য, গড়, প্রভৃতি রক্ষা করিতেন। সেইরূপ সাঁতুলের বাজা রামেশ্বর বলবীর্য্যের বিলক্ষণ পবিচয় দিয়াছেন। নাটোর রাজবংশের আদি রাজা রামজীবন এবং তাঁহার মন্ত্রী দয়ারাম বীরত্বের পুবস্কার স্বরূপ নবাব সরকার হইতে সম্মান ও জমিদারী লাভ করেন। আমরা দেখিয়াছি এবং পিতা বা বৃদ্ধের নিকট শুনিয়াছি যে রাজসাহী অনেক লোক বলবান, দীর্ঘকায় এবং দীর্ঘজীবী ছিলেন। এখন আর সে দিন নাই। এখনকার পুরুষেরা খর্ব্বকায়, রুগ্ন এবং অল্প আয়ু দেখা যায়।

নৈসর্গিক-প্রকৃতির পরিবর্ত্তন একালের লোকের বলবীর্য্য ক্ষয়ের ও অল্প আয়ুর একটী কারণ

বলিয়া বোধ হয়। একালে ঋতুর পূর্ব্বপেক্ষা অধিক পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে জলবায়ুরও পরিবর্তনে বলবীর্য্যের ক্ষয় হইতেছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। রাজসাহী জলময় প্রদেশ। নদ, নদী, বিলের জলেব উপর রাজসাহীব লোকদের বেশী নির্ভর করিতে হয়। এক্ষণ অনেক নদ, নদী, বিল প্রভৃতি শুষ্কপ্রায়। পানীয় জল পূর্ব্বাপেক্ষা যে ভাল নাই, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। জলবায়ু দূষিত হওয়াতে বলবীর্য্যের অনেক ক্ষয় হইতেছে।

মনুষ্যের পরিশ্রম দুই প্রকার— মানসিক ও শারীরিক। মানসিক পরিশ্রম দ্বারা আত্মার এবং শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা দেহের উন্নতি হয়। সেকালে লোকেরা নিয়মিতরূপে উভয়বিধ পরিশ্রম করিত, কিন্তু একালে লোকেরা এ উভয়বিধ পরিশ্রমই নিয়মিতরূপ সম্পন্ন করে না। একালের লোকের শাবীরিক বলবীর্য্যক্ষয়ের একটা প্রধান কারণ, অতিশয় পরিশ্রম ও অসময় পরিশ্রম। শীতপ্রধান দেশবাসী ইংরাজদের যেরূপ পরিশ্রম করার শক্তি আছে, আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশবাসীদের সেরূপ ক্ষমতা নাই। আমাদের প্রাতে ও বৈকালে ভিন্ন অন্য সময় পরিশ্রম করা সঙ্গত নহে। কিন্তু বিদ্যালয়েব বালকদের শিক্ষা এবং আফিশের কর্ম্মচারীদের খাটুনী মধ্যাহ্নকালে সম্পন্ন হয় এপ্রথা কার্য্যেব সুবিধাজনক কিন্তু এতদ্দেশীয় লোকদের পক্ষে বলবীর্য্যক্ষয়ের একটী কারণ,তাহার আর সন্দেহ নাই। শীত-প্রধান দেশের প্রণালী গ্রীষ্ম-প্রধান দেশেব পক্ষে অশুভ তাহার আর ভুল নাই। এতন্নিবন্ধনেই এতদ্দেশে প্রাতে ও বৈকালে বিদ্যাশিক্ষা ও রাজকার্য্য প্রভৃতি নির্ব্বাহ হইবার প্রথা প্রচলিত ছিল।

পুষ্টিকর দ্রব্য ভক্ষণে শারীরিক বলবীর্য্য ও আয়ুবৃদ্ধি কবে। এখন এরূপ আহারের প্রতি লক্ষ্য কম। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ইহা অনুমোদিত যে কটু ও তিক্ত দ্রব্য স্বাস্থ্যকর, মাংস ও দুগ্ধ বলকর এবং ঘৃতে পরমায়ূ বৃদ্ধি করে। আমাদের প্রধান খাদ্য দ্রব্যই ঘৃত, দুগ্ধ ও তৈল, কিন্তু এই তিনটী দ্রব্য বিশুদ্ধ পাওয়া আজি কালি নিতান্ত কঠিন। ঘৃত, দুগ্ধ ও তৈল প্রায়ই কৃত্রিম দেখা যায়। সেকালের লোকেরা দুগ্ধে জল দেওয়া এবং ঘৃতে অন্য দ্রব্য মিশ্রিত করা মহাপাপ জ্ঞান করিত। এই তিনটী দ্রব্য কৃত্রিম হওয়ায় শারীরিক বলবীর্য্যক্ষয়ের প্রধান কারণ হইয়াছে।

বিবাহের সঙ্গে শারীরিক বলবীর্য্যের অনেক সম্বন্ধ আছে পুত্র কন্যাব উপযুক্ত সময় বিবাহ না হইয়া অপরিপক্ক বীর্যে সন্তান উৎপন্ন হইলে সন্তান বলিষ্ঠ হইবার আশা নাই। সেকালে পুরুষ বেশী বয়সে বিবাহ করিতেন। এখন অনেক পিতা মাতা শ্রদ্ধা জন্য ও স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া পুত্র কন্যাকে অল্প বয়সেই বিবাহ দিয়া থাকেন। পিতা মাতা আজি কালি কন্যাকে যেরূপ বেশী বয়সে বিবাহ দিতেছেন, পুত্রকে সেরূপ বেশী বযসে বিবাহ দিতেছেন না। পুত্র কন্যা উভয়েরই বেশী বয়সে এবং উপযুক্তকালে বিবাহ দেওয়া উচিত।

সেকালে তান্ত্রিক মতের প্রাধান্যে সুরা-দেবীর উপাসনা রাজসাহীতে নিতান্ত যে কম ছিল না, ইতিহাস পাঠেই তাহা জানা যাইবে। একালে তান্ত্রিক মতের সুরাপানের প্রাবল্য হ্রাসে বর্ত্তমান সভ্যতাপ্রণালীর সুরাপানের আধিক্য স্থানে স্থানে দৃষ্ট হইতেছে। যে প্রণালীতেই সুরাদেবীর উপাসনা করা যাইবে, তাহাতেই শারীরিক বলবীর্য্যের হানি করিবে সন্দেহ নাই। দেশীয় সুরা অপেক্ষা বিদেশীয় সুরা অধিক তীব্র। দেশীয় কি বিদেশীয সুরাকে আশ্রয় করিয়া অনেক লোক বোগগ্রস্ত হইয়া অকাল কাল কবলে পতিত হইতেছে।

আমাদের শরীরের গঠন একরূপ; ইংরেজদের শরীরের গঠন অন্যরূপ। আমাদের জন্ম গ্রীষ্মপ্রধান দেশে, ইংরেজদের জন্ম শীতপ্রধান দেশে। আমাদের দেশের জলবায়ু একরূপ, ইংরেজদের দেশের জলবায়ু অন্যরূপ। আমাদের আহার পরিচ্ছদ হইতে ইংরেজদের আহার

পরিচ্ছদ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অতএব শরীর সম্বন্ধীয় আচার ব্যবহারে ইংবেজদের অনুকরণ আমাদের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। সেকালে হিন্দুরা বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ কায়স্থেরা অতি প্রত্যুষে শয্যা হইতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সম্পন্ন করিয়া পুষ্পচয়ন, প্রাতঃস্নান, সন্ধ্যা-বন্ধনদি নিত্যক্রিয়া শেষ করিয়া সংসারের কার্য্যে লিপ্ত হইতেন। একালে একার্য্যের সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইতেছে। এই পরিবর্ত্তনে ইংরেজদের আচার ব্যবহার অনুকরণে শুদ্ধ শারীরিক বলবীর্য্যের ক্ষতি হইতেছে এমত নহে, পবিত্রতাও অন্তর্হিত হইতেছে। পবিত্রতার সহিত শরীর ও মনেব বিলক্ষণ সম্বন্ধ আছে।

সেকালের লোক একালের লোকের ন্যায় সুখপ্রিয় ও বিলাসপরায়ণ ছিলেন না। সেকালের লোক অল্প অর্থলাভে সন্তুষ্ট এবং সর্ব্বদা আনন্দময় থাকিতেন। বাবুগিরি কাহাকে বলে সেকালের লোক জানিতেন না। সেকালের হিন্দুরা বিদ্যা শিক্ষার সময় ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া সত্যকথন, স্বার্থত্যাগ, পবিত্রতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ শিক্ষা করিতেন। ইংরেজী শিক্ষা করিয়া ইংরেজদের সদ্‌গুণের অনুকরণ করাই আমাদের কর্ত্তব্য। কিন্তু একালেব লোকেরা ইংরাজী শিক্ষা বা ইংরেজদের আচার ব্যবহারের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাবুগিরি শিক্ষা করিয়া অতিশয় স্বার্থপব হইতেছেন। বাবুগিরির সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থপরতা বৃদ্ধি পায়। স্বার্থপরতার সঙ্গে সঙ্গে দ্বেষ হিংসা প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তিগুলি প্রবল হইয়া উঠে। বর্ত্তমান সভ্যতার অপব নাম স্বার্থপরতা। এইরূপ আচরণে একালের লোকেরা বাহ্যিক ও আন্তরিক পবিত্রতার প্রতি বিশেষ ভাব দেখাইতে ক্রটী করেন না। এসকল দোষে বলবীর্য্যের হানি করে তাহার আর সন্দেহ নাই। সুখপ্রিয়তা, বিলাস-পবায়ণতা, বাবুগিরি ও স্বার্থপরতা মানবের তেজ নষ্ট করিয়া হীনবল কবিয়া তুলে।

ব্যায়ামে দেহ লঘু হয়, কার্য্য করিবার শক্তি দৃঢ় হয় ও সহিষ্ণুতা, বল, উৎসাহ ও ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। সাধারণতঃ ব্যায়ামে শারীরিক বলবীর্য্য বৃদ্ধি হয়। ব্যায়ামে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বলিষ্ঠ হয়। মস্তক হইতে পা পর্য্যন্ত যে অঙ্গ যেরূপ চালনা করা যায় সে অঙ্গ সেইরূপ বলিষ্ঠ হয়। মুটীয়াদের মস্তক দৃঢ় এবং ভার বহনে সক্ষম। ভারি ও বেহারাদেব স্কন্ধ বলিষ্ঠ। দাঁড়িদের বাহু বলিষ্ঠ এবং বক্ষঃ প্রশস্ত, ভ্রমণকারীদের পা বলিষ্ঠ। এইরূপে আমাদের প্রত্যেক সাংসারিক কার্য্যের সহিত ব্যায়ামের সম্বন্ধ। আমরা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যথাবিধান অনুসারে এখন চালনা না করিয়া বাবুর ন্যায় অলসভাবে অন্যের প্রতি নির্ভর করিতে শিক্ষা করিতেছি বলিয়া, বিদেশীয় প্রণালীর ব্যায়াম শিক্ষার জন্য প্রয়াসী হইতেছে। চলিবার আবশ্যক হইলে চলিয়া যাও, কার্য্য নির্ব্বাহ আবশ্যক হইলে হস্তাদি নিয়োগ কর, যে কার্য্য করিলে শারীরিক বলবীর্য্য বৃদ্ধি পায়, তাহা নিজে সম্পন্ন কর, তখন দেখিবে বিদেশীয় ব্যয়ামের আবশ্যক হইবে না। যথা সময় ক্ষুধা বৃদ্ধি পাইবে, এবং প্রচুর পুষ্টিকর আহারে শরীর বলিষ্ঠ হইবে। তাই! যদি পদব্রজে গমন করিলে মান সম্ভ্রম নষ্ট হইবে, এই জ্ঞান করিয়া ২/৩ মাইল পথও চলিয়া যাইতে গাড়ী বা পাল্কীর প্রয়োজন হয়, তবে দীর্ঘজীবী হইবার আশা ত্যাগ কর। আমাদের বাঙ্গালীর পক্ষে পরিমিত রূপ প্রত্যহ ভ্রমণ একটী প্রধান ব্যায়াম। কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, কি ধনী, কি নির্ধন, সকলেরই পক্ষে ভ্রমণ একটী উৎকৃষ্ট ব্যায়াম। রাজসাহী বাসীদের মধ্যে অনেকের মনে এই কুসংস্কার যে, পদব্রজে গমন করিলে মান সম্ভ্রম নষ্ট হয়। এই কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া শারীরিক বলবীর্যের ও আয়ুর ক্ষয় করা আমাদের নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

২। **বিদ্যাশিক্ষা**— এই বিষয় এই গ্রন্থের স্থানান্তরে বিস্তৃতরূপে বলা হইয়াছে। অতএব এস্থলে বেশী বলা নিষ্প্রয়োজন। কেবল দুই একটী কথা বলিয়া আমি ক্ষান্ত হইব। সেকালে রাজসাহীতে সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ উন্নতি ছিল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-সমাজে এই সংস্কৃত ভাষার

প্রাধান্য ছিল। সেকালে মহারাণী ভবানী ও জমিদারগণের প্রভূত সাহায্যে ব্রাহ্মণ পন্ডিত উৎসাহিত হইয়া শিক্ষাদানে মুক্তহস্ত ছিলেন। সেকালে রাজসাহীর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের অভাব ছিল না। "দারিদ্র্য সকল অনিষ্টের মূল।" অর্থাভাবে মানবের বুদ্ধি বিলুপ্ত হয়। একালে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দরিদ্র। দরিদ্রতাবশতই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের জ্ঞান চর্চ্চার অভাব দৃষ্ট হইতেছে। জ্ঞান চর্চ্চার অভাবে ধর্ম্মভাবের বৈলক্ষণ্যও দৃষ্ট হইতেছে। সেকালের ন্যায় একালের জমিদারেরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সাহায্য করেন না। জমিদারের সাহায্য বিহীনে সংস্কৃত চতুষ্পাঠী বিলুপ্ত প্রায়। বিদ্যাশিক্ষার প্রধান কার্য্য জ্ঞান-বিকাশ। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুগ্রহে অনেক বিএ, এমএ হইতেছে। ইহাদের অধিকাংশ অর্থ উপার্জ্জন জন্য যে জ্ঞান, তাহাই শিক্ষা করিয়া থাকেন। যে জ্ঞান দ্বারা বিশুদ্ধাত্মা হইয়া পিতৃমাতৃ সেবা শুশ্রুষা করিতে যত্নবান হইতে পারা যায এবং ঈশ্বরের নির্ম্মল জ্যোতিতে আনন্দলাভ কবিতে পাবা যায়, সে জ্ঞান তাঁহারা লাভ করিতে পারেন না। প্রকৃত নির্ম্মল জ্ঞান এবং প্রকৃত সভ্যতার অনেক দূরে তাঁহারা বসতি করেন। সেকালে অনেক লোক সে জ্ঞান ও সভ্যতার শীর্ষভাগে দণ্ডায়মান হইয়া সমাজের শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিয়াছেন। সেকালের অনেক লোক আত্মাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিতেন। কিন্তু একালের প্রায় লোকেই আত্মাকে জানিতে চেষ্টা করেন না এবং আত্মা ও রিপুর কার্য্য করিতে প্রস্তুত হয়। যিনি আত্মাকে বশীভূত করিতে পারেন, তিনিই কর্তব্য কর্ম্ম প্রতিপালনে দৃঢ়ব্রত হন। আত্মাকে জানবার জন্য যে জ্ঞান সে জ্ঞান একালের লোকের মধ্যে অত্যন্ত বিরল।

৩। সমাজ, আচার ব্যবহার, চরিত্র— বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের কৌলীন্য প্রথাব সহিত আচাব ব্যবহার ও সমাজ-নীতির যথেষ্ট সম্বন্ধ। সেকালে সমাজের যেরূপ বন্ধনী ছিল, একালে তাহার অনেক শিখিল হইতেছে। তথাপি একালে কন্যা বিবাহের ব্যয়ের অধিক্যে কন্যার পিতৃপক্ষ দিন দিন দরিদ্র হইতেছে। একালে বহুবিবাহ যেরূপ ঘৃণার চক্ষুতে পতিত হইয়াছে, সেকালে সেরূপ ছিল না। "ধনেন কূল" এবাক্যের মর্য্যাদা একালেও খর্ব্ব হয় নাই। ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের রীতিনীতির পরিবর্তন হইয়া বর্ত্তমান সভ্যতার দিকে একালের লোক অগ্রসর হইতেছেন সত্য; কিন্তু জাতীয়ভাব ও ধর্ম্ম অক্ষুন্ন রাখিতে সমাজের নেতাবা এখনও বদ্ধপরিকর হইয়া অটলভাবে বিদ্যমান আছেন। জাতীয় মর্য্যাদা ও ধর্ম্ম রক্ষা করাই বীরের কার্য্য। ইংরাজী ভাষা রাজভাষা। ইহা শিক্ষা করা মহতের কার্য্য কিন্তু ইংরাজদিগের রীতিনীতি, ভাবভঙ্গীর অনুকবণ করা বাঙ্গালীর বিরুদ্ধ প্রকৃতিরই পরিচয় পায়। ইংরেজ ত কখন হিন্দুর আচার ব্যবহার ভাবভঙ্গী গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন না, তবে আমরা তাহাদের ভাবভঙ্গী গ্রহণ করিতে চেষ্টা করি কেন?

অতিথি সেবা করা গৃহস্থের একটী প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। পূর্ব্বে রাজসাহীতে আতিথ্য সৎকারের প্রথা যে প্রকার বলবৎ ছিল, এক্ষণে তাহা অপেক্ষা ক্রমশঃ হীনবল হইতেছে। সেকালে-কোন গৃহস্থের বাটীতে অতিথি আসিলে, অতিথির প্রত্যাখ্যান করাকে গৃহস্থ মহাপাপ জ্ঞান করিতেন এবং কর্ত্তব্যকর্ম্ম-জ্ঞান-ভ্রষ্ট বলিয়া পবিচিত হইতেন। আগন্তুক অপরিচিত হউক কি পরিচিতি হউক, তাহাকে গৃহস্বামী অতি সমাদরে গ্রহণ করিতেন। সেভাবের অনেক বৈলক্ষ্যণ্য রাজসাহীতে এখন দৃষ্ট হইতেছে। তথাপি অন্যপ্রদেশ অপেক্ষা রাজসাহী প্রদেশে অতিথি সৎকার অনেক ভাল। রাজসাহীতে অনেক রাজা জমিদার অপেক্ষা সাধারণ গৃহস্থের মধ্যে অনেকে অতি পবিত্রভাবে এবং কর্ত্তব্য-কর্ম্ম জ্ঞানে অতিথির যথাসাধ্য সেবা করিয়া থাকেন। সেকালে রাজসাহীর গৃহে গৃহে আতিথ্য সৎকারেব প্রথা প্রচলিত ছিল। একালে কোন কোন গৃহস্থ অতিথির আগমনের ভয়ে গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া সর্ব্বদা বাস করেন এবং কোন

কোন গৃহস্থ অতিথিকে নিকটে দোকান, হাট, বাজার দেখিয়া দেওয়া, নিকটে একটী গৃহস্থ ভালরূপে অতিথি সেবা করে, "এখনও বেলা আছে অনায়াসে সেস্থানে সন্ধ্যার পূর্ব্বে যাইতে পারেন"— ইত্যাকার বলিতে ক্রটী করেন না। কেহ বা কটু বাক্য দ্বারা অতিথিকে মধ্যাহ্ন বা সায়াহ্নে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিতেও সঙ্কুচিত হন না।

চরিত্র সম্বন্ধীয় দুই একটী কথা এস্থলে বলা প্রয়োজন হইতেছে। চরিত্র মানবের একটী প্রধান ভূষণ। যে ব্যক্তি সচ্চরিত্র অথচ বিদ্বান নহেন, তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া উচিত। যে ব্যক্তি বিদ্বান অথচ অসচ্চরিত্র, তাঁহাকে কোন মতে উচ্চাসন দেওয়া উচিত নহে। সেকালেব লোকেরা রামচন্দ্র, ভীষ্ম প্রভৃতিকে অনুসরণ কবিয়া পিতাব আজ্ঞা সর্ব্বদা প্রতিপালন করিতেন এবং পিতাকে ভক্তি করিতেন। একালে পিতা মাতার প্রতি ভক্তি বা তাঁহাদেব সেবা শুশ্রূষা করা দূরে থাকুক, কোন কোন পুত্র পিতা মাতাকে ত্যাগ কবিয়া এবং সর্বদা তাঁহাদেব নিন্দা কবিয়া আনন্দ অনুভব করেন। ঐরূপ পতির প্রতি স্ত্রীর ভক্তির হ্রাস দেখা যাইতেছে। ইহাই বর্তমান শিক্ষা ও সভ্যতার ফল। একালের লোক অপেক্ষা সেকালের অনেক লোক সবল, কর্তব্যনিষ্ঠ ও কৃতজ্ঞ ছিলেন। একালের অনেকে মিথ্যা কথনে যেরূপ অগ্রসর, সত্য কথনে সেরূপ আগ্রহ করেন না। একালের অনেকে বেশী স্বার্থপব। ইহা নিতান্ত আনন্দেব বিষয় যে একালের লোকদেবও বাজ-ভক্তির হ্রাস হয় নাই। সেকালেব লোকদের ন্যায় একালের লোকেবা উৎকোচ গ্রহণ করেন না। একালে অনেকেই উৎকোচ গ্রহণকে মহাপাপ জ্ঞান করেন। যেমন এখন লোকদের মধ্যে স্বদেশ-প্রিযতার প্রাবল্য দেখা যায়, তেমনই একতার প্রাবল্য দেখিলে স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের কোন ব্যাঘাৎ সৃষ্ট হইত না। দ্বেষ, হিংসা, ও স্বার্থপরতা একতা প্রবৃত্তিব মূল উচ্ছেদ করে।

৪। **কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য**— গো সেবার উপযোগী তৃণ পূর্ণ মাঠ আর নাই; গোচর আর দেখা যায় না। যে দিকে নয়ন-নিক্ষেপ করি সেই দিকেই হবিদ্বর্ণ শস্য ক্ষেত্র দেখিতে পাই। সেকালে গাভী মাঠে প্রচুর পরিমাণে তৃণ আহারে পুষ্টি লাভ করিয়া যথেষ্ট দুগ্ধ দিত। একালে গাভী গৃহস্থের ঘরে থাকিয়া মুষ্টিমেয় আহারে কেবল জীবন ধারণ করিয়া নিজ বৎসকেই দুগ্ধ দিতে কাতর হয়। এখানেই গাভীব দুঃখ শেষ হয় না। যে গাভী দুগ্ধ দিয়া আমাদেব প্রাণ রক্ষা করে, সেই গাভী দ্বারা নিষ্ঠুর মুসলমানরা ভুমি-কর্ষণ করিয়া শস্য উৎপাদন করিয়া লয়। সেকালে মাঠে শস্যক্ষেত্র কম, গোচবই বেশী ছিল। একালে গোচর প্রায়ই নাই; সমুদয় জমি শস্যে পবিপূর্ণ। জমিদারের জমি পত্তনের নজর যথেষ্ট এবং জমিও পতিত নাই। তথাপি পূর্ব্বেব ন্যায় শস্য জন্মে না। কিন্তু শস্যের দর আক্রেয় বলিয়া প্রজার এবং জমিপতিত নাই বলিয়া জমিদারের পূর্ব্বাপেক্ষা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। মোটের উপর দেখিতে গেলে কৃষি উন্নতি লাভ কবিয়াছে। তথাপি জমিদারের ও প্রজার অভাব দূর হইতেছে না। সুখ-প্রিয়তা ও বিলাসপরায়ণতা এই অভাবের প্রধান কাবণ। একালের জমিদার ও প্রজা যেরূপ সুখপ্রিয় ও বিলাসপরায়ণ হইয়াছেন, সেকালেব জমিদার ও প্রজা সেরূপ সুখপ্রিয়, বিলাসপবায়ণ ও বাবু ছিলেন না। এখন সুখ-প্রিয়তা, বিলাস-পরায়ণতা ও বাবুগিরির অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। সেকালে রাজা জমিদারেরা ২/৪ ক্রোশ পথ পদব্রজে গমনাগমন করিলে অপমান বোধ করিতেন না, বা অশক্ত ছিলেন না। এখন দুই মাইল পথ চলিয়া গেলে বাবু একবারে ক্লান্ত হইয়া পড়েন অথবা অসম্মান জ্ঞান করেন। আমি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে কৃষক সন্তানও স্কুলে আসাবধি ফিট বাবু— পায়ে মোজা ও বিলাতী জুতা, গায়ে সার্ট, হাতে রেলীর বাড়ীর উৎকৃষ্ট ছাতা। এই পোষাকে কৃষক সন্তান প্রত্যহ স্কুলে আসিতে আসিতে তাহার অভ্যাস এরূপ হইয়া যায় যে, সে আর মাঠে যাইয়া

হালের মুঠা ধরিয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইতে পারে না। ভদ্র লোকদের সংসর্গে থাকিয়া সেই কৃষক সন্তান ঠিক বাবু। সে বাহ্যিক সভ্যতার অনুকরণ করে বটে কিন্তু আচার ব্যবহার রীতিনীতিতে প্রকৃত সভ্যতার ত্রিসীমায় যাইতে পারে না।

সে কালে রাজসাহী প্রদেশের সহস্র সহস্র বস্তা কার্পাস ও পট্ট বস্ত্র বিলাতে ও ভারতের নানা স্থানে প্রেরিত হইত। কিন্তু এ কালে রাশি রাশি বস্ত্র বিলাত হইতেই রাজসাহীতে আসিতেছে। সেকালে গৃহস্থের ঘরে ঘরে চর্‌কা ঘুরিত। একালে কাহারো ঘরে আর চরকা ঘুরে না। রাজসাহীতে পূর্ব্বাপেক্ষা হাট বাজার মেলার সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু ইহাতে দেশীয় শিল্প অপেক্ষা বিদেশীয় শিল্পেরই প্রাধান্য বেশী। বাণিজ্যে পূর্ণ লক্ষ্মী, কৃষিতে তাহার অর্দ্ধেক,— এই বাক্য এখন পুস্তক গত। একালের লোকেরা দাসত্ব শৃঙ্খলে বন্ধ হইবার জন্য যেরূপ আগ্রহাতিশয় হইয়াছেন, কৃষি বা বাণিজ্যের জন্য সেরূপ ব্যস্ত নহেন। বাণিজ্যের প্রবৃত্তি হইলে সামান্য মূল-ধনেও বাণিজ্য করা যাইতে পারে।

৫। ধর্ম্ম— ধর্ম্মের সহিত সমাজ, আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, চরিত্র প্রভৃতির বিলক্ষণ সম্বন্ধ আছে। অতএব ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অনেক কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ধর্ম্মের পথ বহুবিধ এবং দুর্জ্ঞেয়। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বেদের মতের অনৈক্য, স্মৃতির মতের অনৈক্য, ঋষি বাক্যের অনৈক্য দৃষ্ট হয়। অতএব ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মীমাংসা নিতান্ত দুরূহ। তন্নিবন্ধনে শাস্ত্র বাক্যে ইহা বলে মহাজনগণ যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, আমাদেরও সেই পথ অবলম্বন করা উচিত। মনুসংহিতাতে ইহাই প্রতিপাদ্য হইয়াছে ঃ—

যেন স্যপিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্‌ ন রিয়াতে ॥

যে পথে পিতা পিতামহ গমন করিয়াছেন, সেই পথ সৎ হইলে সেই পথে আমাদেরও গমন করা উচিত। এই মনু বাকের মর্যাদা রক্ষা করিতে হইলে, আমাদের দেশীয় ভাব, দেশীয় ধর্ম্ম, দেশীয় বীতিনীতি হইতে আমাদের বিচলিত হওয়া উচিত নহে। সেকালের লোকেরা যেরূপ সত্যপ্রিয়, সৎ, বিশ্বাসী ও ধর্ম্মভীরু ছিলেন, একালে সেরূপ দেখা যায় না। সেকালে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি ধর্ম্ম পুস্তক পাঠের প্রণালী প্রচলিত ছিল, একালে সে প্রথায় হ্রাস দেখা যায়। সেকালে গৃহস্থেরা পূর্ব্ববেলা নিত্যক্রিয়া ও সংসারের কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন, বৈকালে বা সন্ধ্যার পর গৃহস্থের অবকাশ ছিল, সেই সময় রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পূরাণ এক জন পাঠ করিত এবং তাহার চারিদিকে ঘিরিয়া পুরুষ স্ত্রীলোক শ্রোতা বসিত। রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতিগ্রন্থ পাঠে চিত্তশুদ্ধ হয়। চিত্তশুদ্ধি মানবের মুক্তির সোপান স্বরূপ। একালে অবকাশ সময় গৃহস্থেরা তাস, পাশা, দাবা ক্রীড়ায় বা উপন্যাস পাঠ করিয়া বা পরের নিন্দা করিয়া সময় ক্ষেপণ করেন। উপন্যাস পাঠে চিত্তশুদ্ধ না হইয়া চিত্ত অপবিত্র হয়; এবং হৃদয়ের ভাব তমসাচ্ছন্ন হইয়া ধর্ম্ম প্রবৃত্তিকে কলুষিত করে। আজি কালি দুই এক খানা ধর্ম্ম ভাবাপন্ন উপন্যাস পুস্তক দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ইহাতেই এই প্রতীয়মান হইবে ধর্ম্ম পথে বিপ্লব উপস্থিত। রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হইলেই যে দেশের মঙ্গল।

উপরে আমরা যাহা বলিলাম তাহার বলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে দেশের প্রকৃত উন্নতি সম্পূর্ণরূপে হইতেছে না। যে উন্নতিকে আমরা উন্নতি বলি সে প্রকৃত উন্নতি নহে। দেশ, কাল, অবস্থাভেদে পূর্বপুরুষের চক্ষুতে দেখিতে বর্ত্তমান উন্নতিকে প্রকৃত উন্নতি বলা যায় না। আমরা স্বীকার করি যে কোন কোন বিষয়ে দেশ উন্নতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু যে দোষ ধীরে ধীরে দেশে প্রবেশ করিতেছে তাহাতে প্রকৃত উন্নতির আশা নিতান্ত কম।

আমাদের পূর্ব্ব গুণগুলিকে উপেক্ষা করিয়া বিদেশীয়দের অসদ্গুণগুলি অথবা কেবল তাহাদের উপযোগী গুণগুলির অনুকরণ করিতেছি। বিদেশীয়দের একতা, সাহস, অধ্যবসায়, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি সদ্গুণগুলির অনুকরণ না করিয়া, যে সকল গুণগুলি এতদ্দেশীয় লোকের উপযোগী নহে তাহাই আমরা অনুকরণ করিতেছি। কেবল অনুকরণ নহে; আমাদের হিন্দুর আচার ব্যবহার ও রীতিনীতির প্রতি আমরা সম্পূর্ণ অনাস্থা প্রদর্শন করিতেছি। আমরা বাঙ্গালার প্রকৃতি সম্ভূত। কিন্তু বিদেশীর প্রকৃতি গত গুণ গুলিকে আমরা অনুকরণ করিতেছি। ইহাই আমাদের প্রধান দোষ; ইহাই আমাদের উন্নতি পথের কণ্টক স্বরূপ। কিন্তু এই দুর্দ্দিনে অনেকের মনে এই সংস্কার যে বিদেশীয় ভাবাপন্ন হওয়া আমাদের পক্ষে শুভকর নহে এবং প্রকৃত ধর্ম্মভাবেব আধিক্যে দেশের মঙ্গল। এই স্রোত সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইলে, সেকালের অপেক্ষাও একালে দেশের অধিক উন্নতি হইবে। রাজসাহীতে যেরূপ বুদ্ধির ও কার্য্যদক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে যত্ন ও অধ্যবসায় ঈশ্বরের অনুগ্রহে রাজসাহী একদিন উন্নতির উচ্চ সোপানে সমারূঢ় হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। যদি রাজসাহীকে শিক্ষা, ধর্ম্ম, শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্যে প্রকৃত উন্নতি করিতে চাহ, তবে একতা, সাহস, নিস্বার্থপরতা, অধ্যাবসায়, ও ঈশ্বর-নিষ্ঠার আশ্রয় অবলম্বন কর। হে ভাই! বৃটিশ গবর্ণমেন্ট আমাদের উন্নতির ও সমৃদ্ধির জন্য যে যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার অনুসরণ করিতে যে সকল সদ্গুণের আবশ্যক তাহা অবলম্বন কর এবং কার্য্য সফল জন্য দৃঢ়ব্রত হও।

সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট

আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে যে পঞ্চ গোত্রীয় পাঁচজন ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আইসেন, তন্মধ্যে কাশ্যপ গোত্রীয় সুষেণ মণি একজন। এই সুষেণ হইতে বরেন্দ্র ব্রাহ্মণের উৎপত্তি। অতএব সুষেণ হইতে যে নাটোর রাজবংশের উৎপত্তি হইয়াছে এবং নাটোর রাজবংশের সঙ্গে যে যে বংশের সংশ্রব আছে, তাহা নিম্নলিখিত বংশাবলীতে জানা যাইবে।

সুষেণ হইতে জীবন মৈত্র পর্য্যন্ত এই প্রথম টেবলে (Table) দেওয়া হল। এই টেবলের অন্তর্গত কেহ কেহ রাজসাহী ত্যাগ করিয়া স্থানান্তর ভবন নির্দ্দেশ করেন। জীবর ওঝা (মৈত্র) কামদেবের পূর্ব্বপুরুষ:

টেবিল নং ১
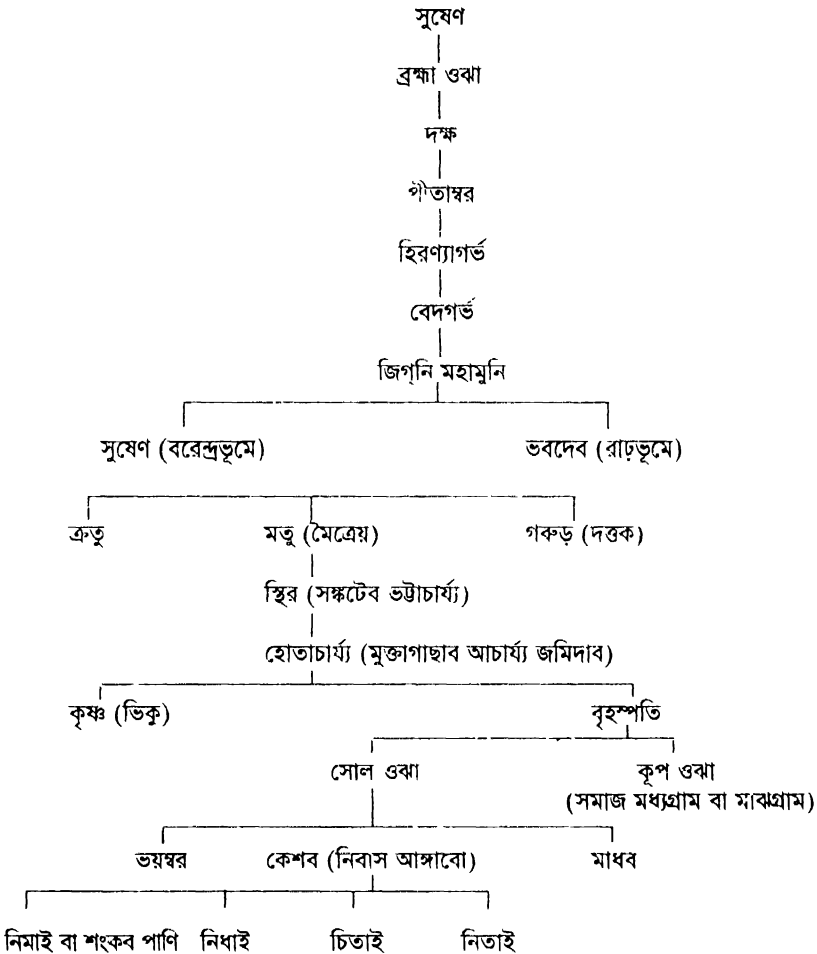
যে সময় বল্লালসেন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কৌলিণ্য মর্য্যাদা স্থাপন করেন, সেই সময় ক্রতু ভাদুড়ী গাঞি (গ্রাম) এবং মভু মৈত্র গাঞি (গ্রাম) প্রাপ্ত হন। ক্রতু হইতে উদয়নচার্য্য এবং মভু হইতে নাটোর রাজবংশের উৎপত্তি হয়।

জীবর ওঝার বংশাবলী দ্বিতীয় টেবলে দেখা যাইবে।

টেবিল নং ২

এই দ্বিতীয় টেবিলে জীবর হইতে কামদেব পর্য্যন্ত লিখিত হইল। এই কামদেব নাটোবের প্রথম রাজা রামজীবনেব পিতা।
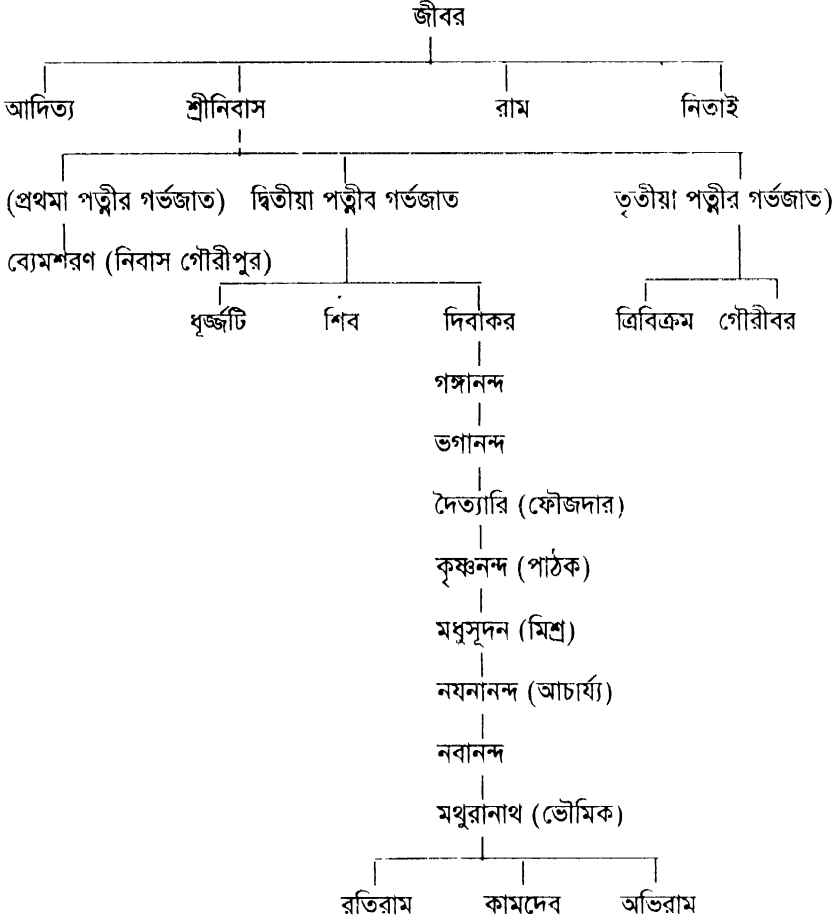
রতিরামের বংশধরেরা নাটোবে বাস-ভবন নির্দ্দেশ করেন। ইহারাই চৌকিব পাহাড়েব রায় নামে প্রসিদ্ধ। কামদেবের বংশাবলী নাটোর রাজ বংশের ইতিহাসের শেষ ভাগে সন্নিবেশিত হইয়াছে। অভিরামের দুই পত্নী প্রথমা পত্নীর পুত্র রাম নারায়ণ রায় চৌধুরী মাধনগরে বাস-

ভবন নির্দ্দেশ করিলেন এবং দ্বিতীয়া পত্নীর পুত্র মহাদেব রায় আটগ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। অতএব রতিগ্রাম ও অভিরামের বংশধরেরা নাটোর রাজার জ্ঞাতি রতিরামের বংশাবলী তৃতীয় টেবিলে দেখান হইল।

টেবিল নং ৩
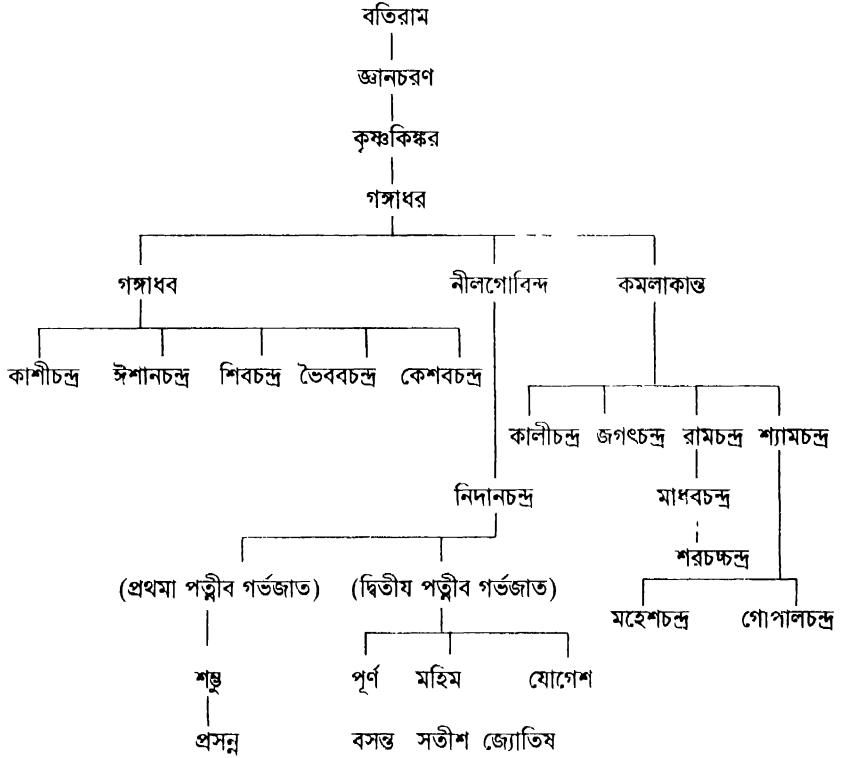
মাধনগরের রায় বংশাবলী চতুর্থ টেবিলে এবং আট গ্রামেব বায় বংশাবলী পঞ্চম টেবিলে দেখান হইল।

টেবিল নং ৪

অভিরাম
(প্রথম পত্নীর গর্ভজাত)
রামনারায়ন রায়চৌধুরী
নন্দরাম
রামনাথ
চতিনাথ
রামাসিংহ
জয়চন্দ্র
রঘুনাথ
বামকিশোব
জ্যোতিরাম
গঙ্গাপ্রসাদ
গোপালচন্দ্র
কৃষ্ণশরণ
শিবপ্রসাদ
ঈশান
দুর্গাপ্রসাদ
পরমানন্দ
শশিশবণ
পূর্ণচন্দ্র
হেমশরণ
গিরিজা শবণ
যোগেশ
সতীশ
কাশীপ্রসাদ
জগবন্ধু
মোহিনী
তারিণী
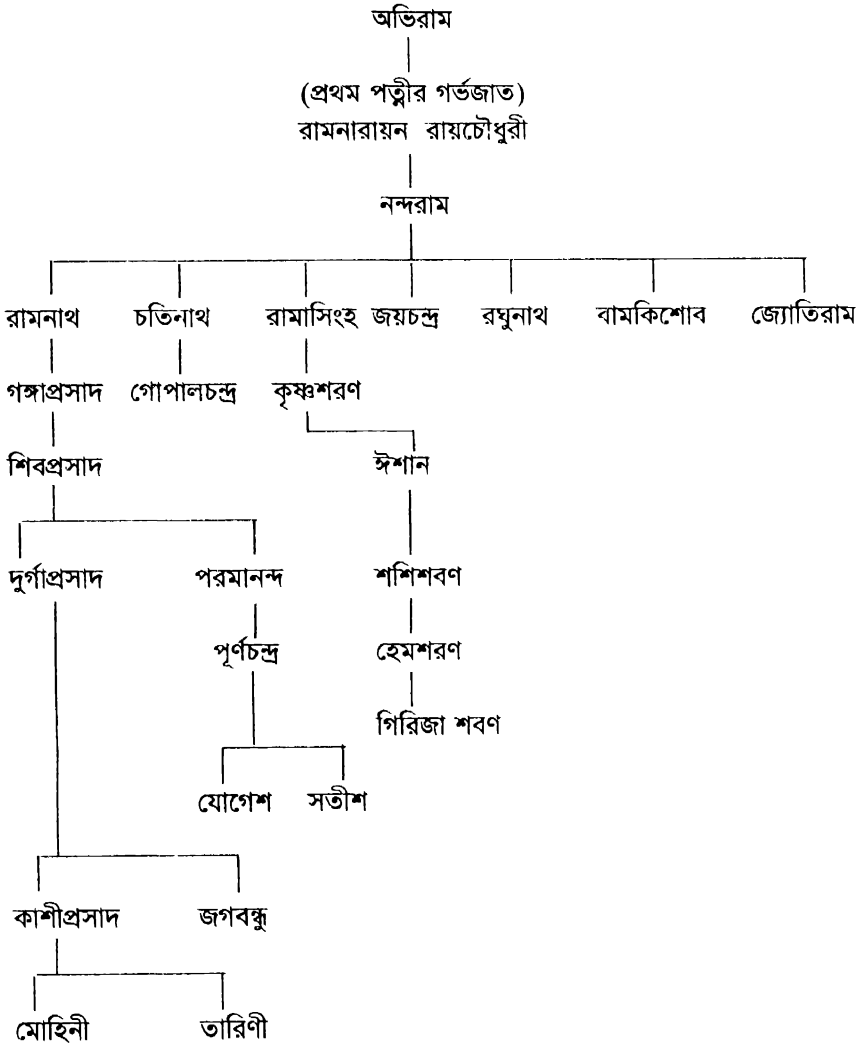
টেবিল নং ৫
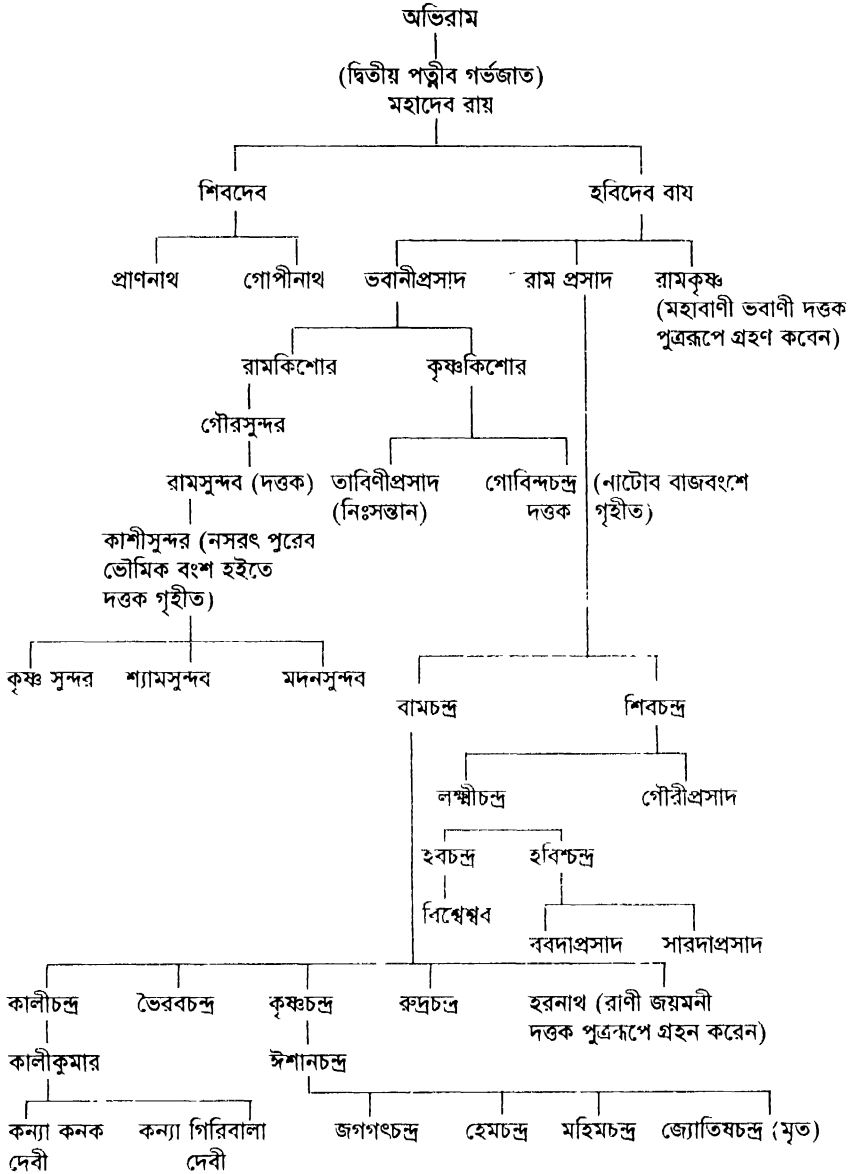
এই মহাদেব রায়ের বংশ হইতে নাটোব রাজ সরকারে ক্রমান্বয়ে তিনটী দত্তক পুত্র গৃহীত হইয়াছে। মহারাণী ভবানী রামকৃষ্ণ, রাণী কৃষ্ণমণী গোবিন্দচন্দ্র, এবং রাণী জয়মণী হবনাথকে দত্তক

পুত্র রূপে গ্রহণ করেন। দত্তক পুত্রদের জনক জননীর ভরণপোষণ জন্য আট গ্রম, হালতী খোলা বাড়ীয়া প্রভৃতি প্রচুর লাভের ভূসম্পত্তি প্রদত্ত হয়। আটগ্রাম রায় বংশ অতি প্রসিদ্ধ এবং মাননীয়।

জীবর মৈত্রের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীনিবাস। শ্রীনিবাসের তিন পত্নী। প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র ব্যোমশরণ গৌরীপুরে বাস-ভবন নির্দ্দেশ করেন। এই ব্যোমশরণের বংশাবলী ষষ্ঠ টেবিলে দেখান হইল।

টেবিল নং ৬
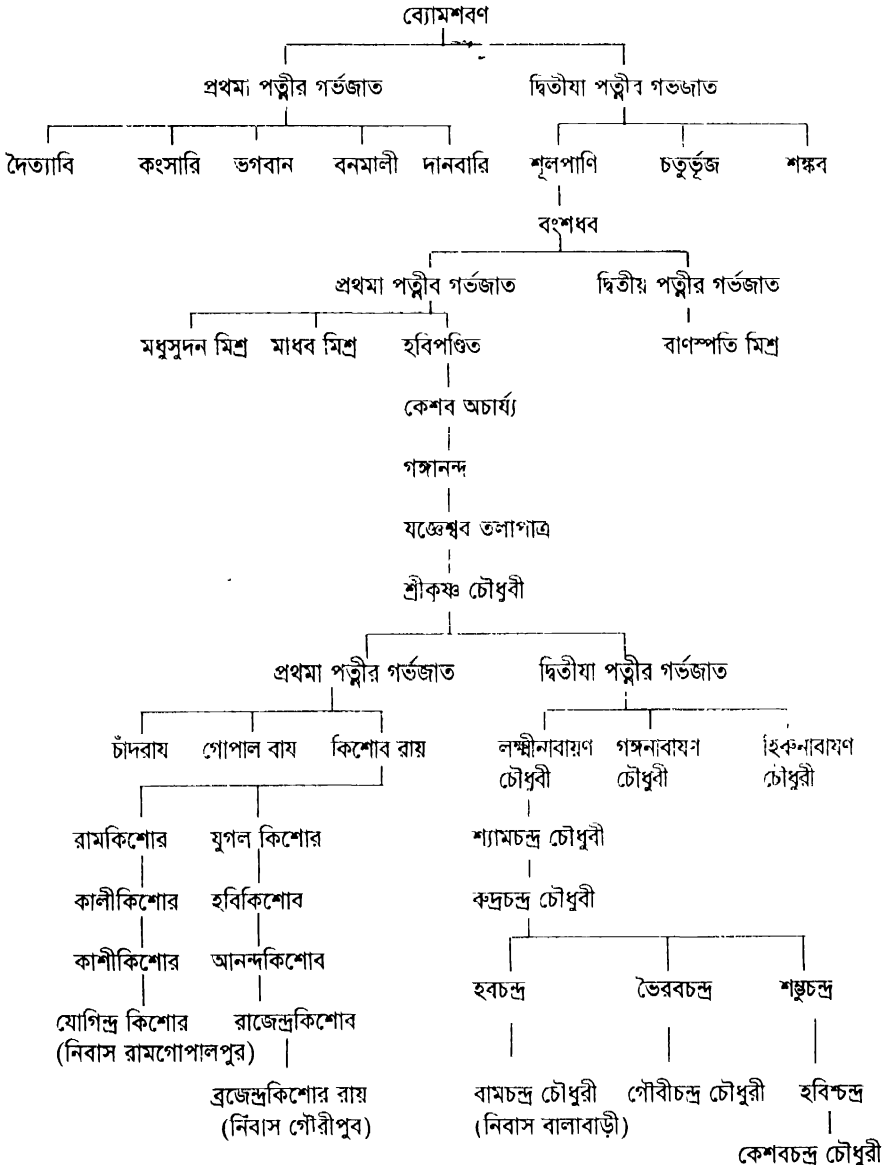
পরিশিষ্ট

সুষেণ হইতে উদয়নাচর্যের উৎপত্তি
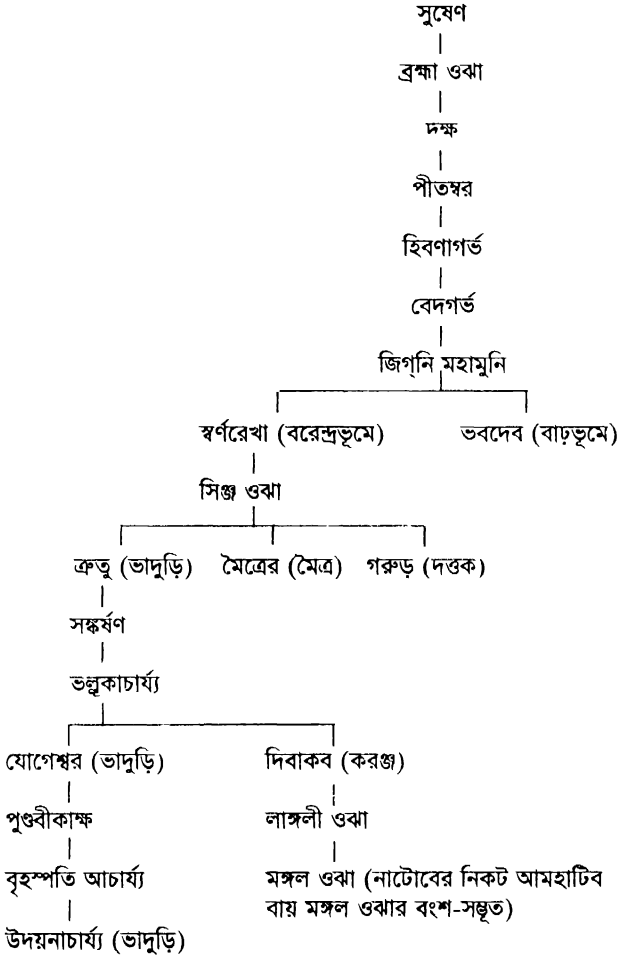
ক্রতু বল্লাল সেনের সময় বর্ত্তমান ছিলেন। উদয়নাচার্য্য মধু মৈত্রের পিতামহ নরসিংহ মৈত্রের সমসাময়িক লোক। ইনি কুল্লুক ভট্টের নিকট দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং বৌদ্ধদিগের সহিত বিচার করিয়া জয়লাভ করেন। উদয়নাচার্য্য কুলশাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া কুলীনগণের মধ্যে পরিবর্ত্ত মর্য্যাদা স্থাপন করেন। ইহাঁর প্রণীত "কুসুমাঞ্জলি" দর্শনশাস্ত্রের একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই উদয়নাচার্য্য হইতে বর্ত্তমান তাহিরপুর ও চৌগ্রাম রাজবংশের উৎপত্তি হয়। বর্ত্তমান বগুড়া জেলার অন্তর্গত নিসিন্ধা গ্রামে।

উদয়নাচার্য্যের বংশ। (Continued)
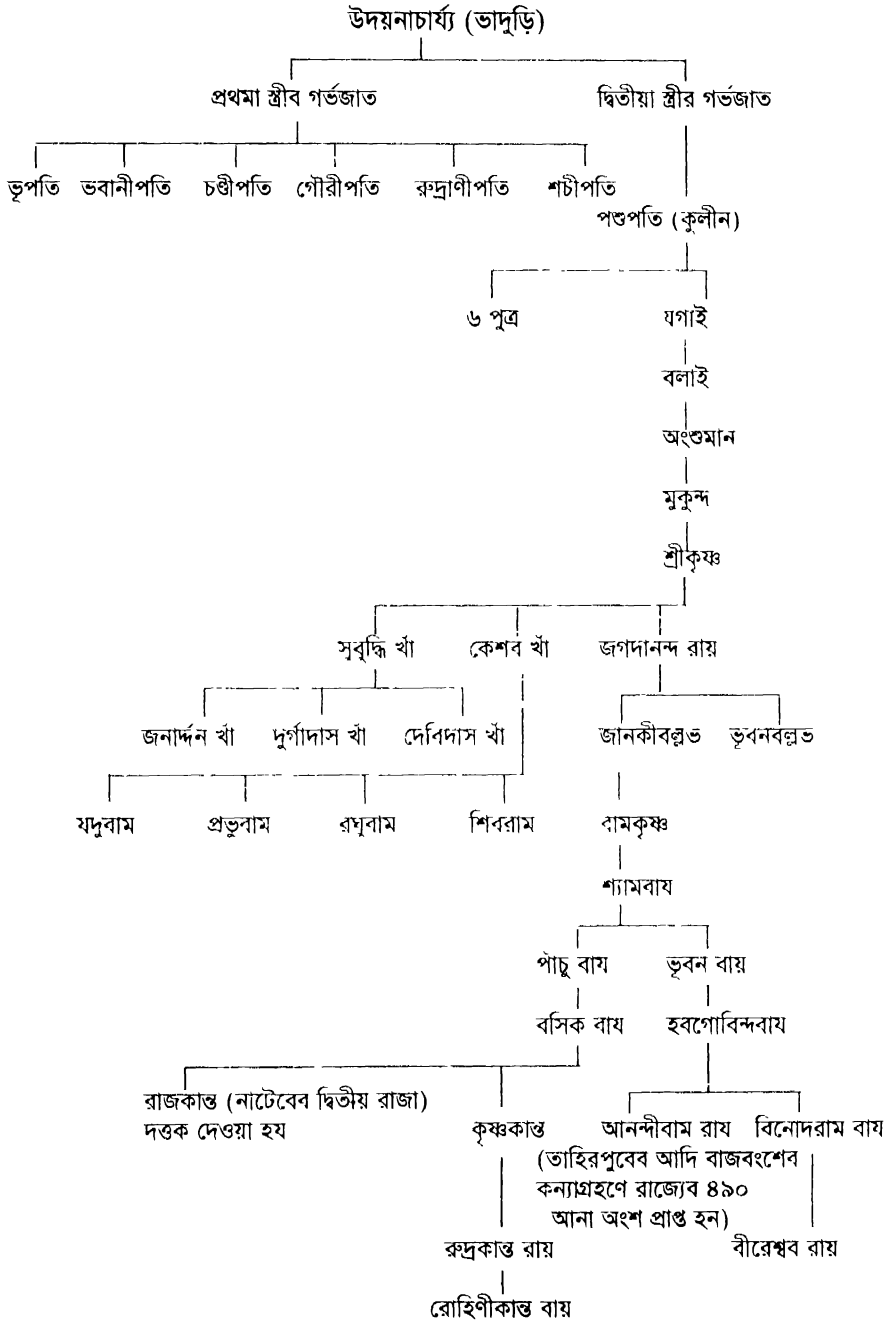
পরিশিষ্ট

উদয়নাচার্য্যেব বংশ। (Continued.)
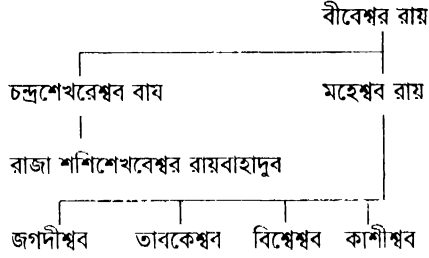
আনন্দীরাম রায় নিঃসন্তান মৃত্যু হইলে বিনোদবাম রায় রাজত্ব প্রাপ্ত হন। অতএব বিনোদরায় রায়ই বর্ত্তমান তাহিরপুর রাজবংশেব আদি পুরুষ। চৌগ্রাম রাজবংশের আদিপুরুষ রসিক রায়। খাজুরা নিবাসী ভোলানাথ খাঁ উদয়নাচার্য্য বংশ সম্ভূত। ভোলানাথ খাঁর পুত্র জীবন্তীনাথ খাঁ। ইনি নিরাবিল পটীর কুলীন এবং একটী সম্ভ্রান্ত জমিদার।

ভট্টনাবায়ণ হইতে তাহিরপুরের আদি বাজবংশ
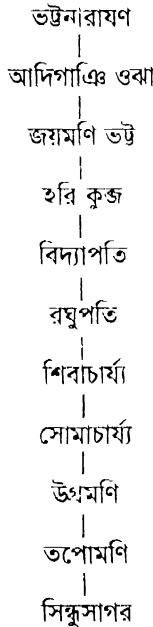
তাহিরপুবের আদি বাজবংশ। (Continued)
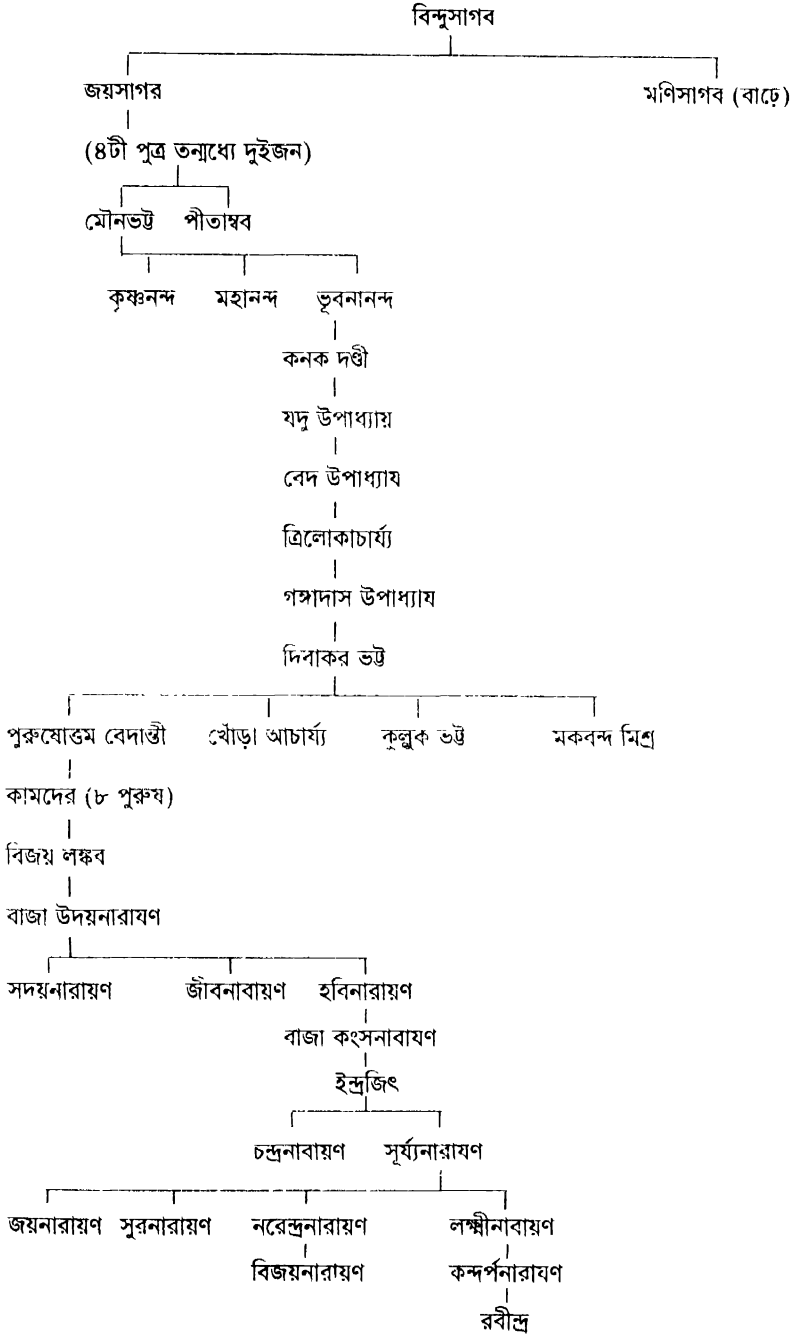
মৌনভট্ট হইতে রাজা কংসনরায়ণের বংশের উৎপত্তি হয়। এই বংশসম্ভূত রাজা বলেন্দ্রনারায়ণ নিজ কন্যা উমাদেবীর সহিত আনন্দরাম রায়ের বিবাহ দেন। রাজা বলেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর তাহিরপুর পরগণার ৪৯০ আনা অংশ আনন্দীরামের অধিকৃত হয়। এই আনন্দীরাম রায় হইতে বর্ত্তমান তাহিরপুর রাজবংশের উৎপত্তি হয়।

পীতাম্বরের বংশ হইতে পুঁঠীয়ার রাজবংশ ও কাশীমপুরের রায় বাহাদুরের বংশের উৎপত্তি।

পীতাম্বরের বংশ। (Continued.)
বৎসাচার্য্য
রামচন্দ্র
অনন্ত
বাসুদেব
গঙ্গাধর
ইহার চারিপুত্র তন্মধ্যে
একজন বাচাই
পীতাম্বর
নীলাম্বর
পুষ্করাক্ষ
(তাহিরপুর পরগণার
।০ আনা অংশ প্রাপ্ত হন)
কৃষ্ণদাস লাহিড়ি
রাজা আনন্দরাম
অধস্তন সন্তান গদাধর (কাশীমপুরের রঘুনাথ চৌধু
কন্যাকে বিবাহ করিয়া কুলীন হইতে কাপ হন।
রতিকান্ত ঠাকুর
(১) রামচন্দ্র
রামকিশোর
রূপনারায়ণ
নরনারায়ণ
দর্পনারায়ণ
জয়নারায়ণ
প্রেমনারায়ণ
কালীকান্ত
কাশীকান্ত
কালীশঙ্কর
নরেন্দ্রনারায়ণ
সারদাকান্ত (দত্তক)
ভূবেন্দ্রনারায়ণ
জগন্নারায়ণ
হরেন্দ্রনারায়ণ
কামলাকান্ত
রজনীকান্ত (পরে সারদাকান্ত)
যোগেন্দ্রনারায়ণ (পত্নী প্রসিদ্ধা মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবী)
রায় গিরীশচন্দ্র লাহিড়ি বাহাদুর
জ্যোতিন্দ্রনারায়ণ (পত্নী শ্রীমতী রাণী হেমন্তকুমারী দেবী)
রায় কেদারপ্রসন্ন লাহিড়ি বাহাদুর
ধরাধর হইতে বলিহার রাজবংশের উৎপত্তি
ধরাধর
বেদ
শিধওঝা
বেদান্তাচার্য্য (বরেন্দ্রভূমে)
দামোদর (রাঢ়ভূমে)
হরিহর
(কুড়মাইল)
লক্ষ্মীধর
(সঞ্জামিনী সান্নাল)
জয়মানমিশ্র
(ভীম কালিহাই)
দিবাকর
(ভাড়িয়াল)
শশিধর
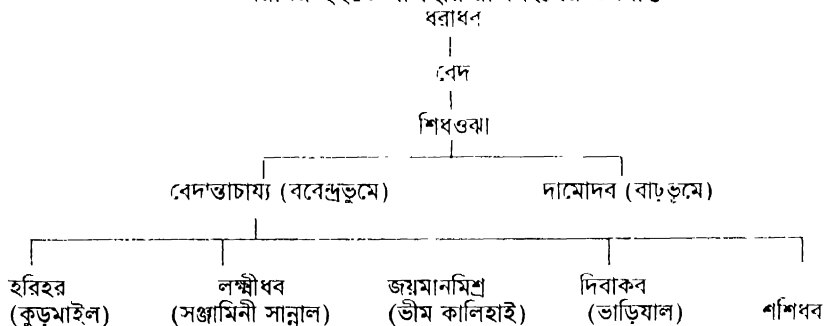
বলিহার রাজবংশ। (Continued.)

লক্ষ্মীধব সান্ন্যাল

- বর্দ্ধমান (কুড়মইল পবে সজ্জামিনী)
  - বাসুদেব
    - মেধাতিথি
      - নবসিংহ
        - মহোদয
          - ভূতনাথ
            - শিব্বাই সান্ন্যাল
            - দামোদবসান্ন্যাল
              - কানাই
                - মহী
                  - দমোদব
                    - অনন্ত
                      - গোপীজন চক্রবর্তী
                        - নৃসিংহ চক্রবর্ত্তী
                          - গোপাল
                            - কৃষ্ণদেব
                            - প্রাণকৃষ্ণ
                              - বামনাথ
                                - নীলকণ্ঠ
                                  - রাজেন্দ্র (বাজা বামকৃষ্ণেব কন্যাকে বিবাহ কবিয়া বহু ভুসম্পত্তি প্রাপ্ত হন)
                                    - শিবপ্রসাদ
                                      - রাজা কৃষ্ণেন্দ্র বায (নিবাস বলিহাব)
                            - বামবাম
                    - বামনাথ
                      - কৃষ্ণগোবিন্দ সান্ন্যাল
                        - কৃষ্ণকান্ত
                          - কালীকান্ত (দত্তক)
                            - আনন্দচন্দ্র
                              - মহেশচন্দ্র
                                - যোগেন্দ্রচন্দ্র বায়চৌধুরী (দিনহাটা)
                    - রমানাথ
              - বলাই
              - পিযাই
                - আনুয়াই
- বিশ্বম্ভব
  - সিমুলী
- বিশ্বপতি (কামরুখি)
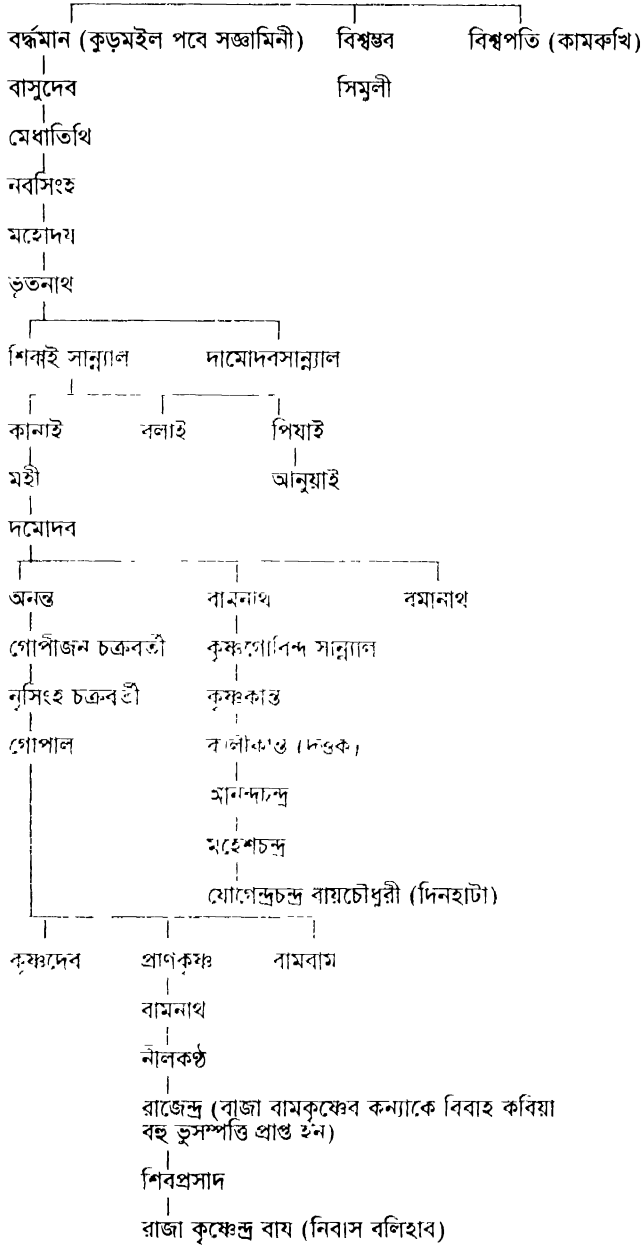
বাজসাহীর ইতিহাসে রাজসাহীর অন্তর্গত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের যে সকল সমাজের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহাদের বিশেষ বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল ঃ—

১। মাঝগ্রাম— কুলজ্ঞের আদিস্থান, লালুরের নিকট। মধুমৈত্রের পুত্র রক্ষিতের এবং বৃহস্পতির পুত্র কুপের সমাজ।

২। গুড়নই— আত্রাই ষ্টেসনের নিকট। মধু মৈত্রের পুত্র আন্দাইর সমাজ।

৩। ভাতুড়িয়া (ভাদুড়ী)— রাজসাহীর পূর্ব্বভাগে; সাঁতুল রাজার রাজ্য ছিল ভাদুড়ীকুলে মুকুন্দ ও উদয়নাচার্য্য অতিশয় বিখ্যাত। এই মুকুন্দের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ী। এই শ্রীকৃষ্ণের পুত্র সুবুদ্ধি খাঁ ও কেশব খাঁ গৌড়েব বাদসাহের সরকারে প্রধান কার্য্যাকারক হইয়া খাঁ এবং জগদানন্দ রায়, রায় উপাধি প্রাপ্ত হন। ভাতুড়িয়া ক্রতেব সমাজ।

৪। গাঙ্গইল— লালুরের নিকট। মধু মৈত্রের পুত্র নান্দাইর সমাজ।

৫। বাগসর— মাঝগ্রামেব নিকট। মধু মৈত্রের পুত্র গদাইব সমাজ।

৬। মাটিকোপা—লালুরের নিকট। মধু মৈত্রেব পুত্র মাধাইর সমাজ।

৭। চামারি— হালসার নিকট। মধুর পৌত্র ধরাধবের সমাজ।

৮। আঁচলকোট— লালুরের নিকট। মনোহর মৈত্রের পুত্র জগাইর সমাজ। মনোহর বৃহস্পতির পৌত্র।

৯। বাগডোর— নাটোরেব নিকট। বৃহস্পতির প্রপৌত্র পুবাইয়ের সমাজ।

১০। বলিহাব (কুড়মইল)— নওগাঁও মহকুমাব অধীন। ধবধরের বংশ সম্ভূত হরিহরের সমাজ। সান্ন্যাল গ্রামী ব্রাহ্মণদেব বলিহার অঞ্চলে বসতি।

১১। সীমলা অথবা সীমলী— আত্রাই ষ্টেশনের নিকট। ধরাধরের বংশ সম্ভূত লক্ষ্মীধরের পুত্র বিশ্বম্ভরর সমাজ।

১২। করঞ্জ— সিন্ধ শ্রোত্রিয়। দিবাকরের সমাজ।

১৩। কুজিল— কাশীমপুরের নিকট বর্ত্তমান কুজাইলই সম্ভবপর কুজিল। শিকাই সান্ন্যালেব পৌত্র পিযাইব পুত্র আনুয়াইব সমাজ কুজিল। অনুয়াই ধবাধর বংশ সম্ভূত।

১৪। দেউলা বা দেউলী— পতিশরের নিকট। জয়মান মিশ্রেব পুত্র হলদরেব সমাজ।

১৫। ধুবাইল বা ধরুল— তানোরেব নিকট ধুবইল সম্ভবপব। বাঙ্গলা ওঝা জয়মান মিশ্রেব বংশ সম্ভূত। ধুবাইল বাঙ্গালেব পুত্র ধুমাইর সমাজ।

১৬। হাপানিয়া— নাটোরেব নিকট। জয়মান মিশ্র বংশ সম্ভবত বাঙ্গলা ওঝার পৌত্র ধুবাইর সমাজ।

১৭। লক্ষ্মীকোল— বড়াইগ্রামেব নিকট লক্ষ্মীকোল সম্ভবপর। দিঘাপতিয়ার নিকটও এক লক্ষ্মীকোল আছে। আকাইব পৌত্র মাধাইর সমাজ লক্ষ্মীকোল।

১৮। ঢাকঢোর— ডাঙ্গাপাড়ার নিকট। উদযনাচার্য্যর জামাতা বল্লভাচর্য্যের পুত্র অর্কের সমাজ ঢাকঢোর।

১৯। নিদ্রালী বা নিদাইল— সম্ভবতঃ রাজসাহীব পূর্ব্বভাগে। জয়মান মিশ্রেব পুত্র হরগ্রীবেব সমাজ।

২০। কালীগ্রামী— মাঁদাব নিকট। জয়মান মিশ্রের বংশ সম্ভূত কামদেবের সমাজ।

২১। বোয়ালিয়া— আমরুল পবগণার অন্তর্গত। বাঙ্গলা-ওঝার পুত্র অচ্যুতের সমাজ।

২২। জোনালী (জোনাইল)—হবিপুব ও দারীকুশীর নিকট। এই গ্রামেব নামানুসারে জোনালীপটী কুলীনের নাম হয়। লালুরের নিকট মাঝগ্রাম ও মাধারি গ্রাম এবং হাপানিয়ার নিকট শ্যামনগবের কুলজ্ঞগণ এই জোনালীপটীর কুলীন। ইহাঁরা সদাচারী এবং শূদ্রের দানাদি গ্রহণ করেন না।

২৩। চম্পটী (চামটা)— জোনাইলের নিকট। আদি মাধববংশ সম্ভূত বৎসাচার্য্যের পুত্র প্রজের সমাজ। বালুভরাব চৌধুরী ও বোন গ্রামেব রায় চম্পটী গাঞি। আট গ্রামের

রায়েদের পূর্ব্বে বোনগ্রামে বাস ছিল। নাটোর রাজবংশ হইতে আটগাম জমিদারী প্রাপ্ত হইয়া রায়েরা আটগ্রামে বাস-ভবন নির্দ্দেশ করেন।

সাধুবংশীয় অসহায় রামজয়

আদিশূর যে সকল ব্রাহ্মণগণকে গৌড়ে আনেন, তন্মধ্যে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণ এক ব্যক্তি। ভট্টনারায়ণ রাঢ়দেশে বাসভবন নির্দ্দেশ করেন; কিন্তু তাঁহাব পুত্রগণ বরেন্দ্র ভূমেই থাকেন। এই পুত্রগণ মধ্যে আদি গাঞি ওঝা নামে এক পুত্র ধামসার গ্রামে বাসভবন নির্দ্দেশ করিয়া ধামসার গ্রামী আখ্যা প্রাপ্ত হন। আদি গাঞি ওঝা হইতে সাধু বাগচি পর্য্যন্ত ব্যক্তিগণের নাম পরিশিষ্টে যে সকল বংশাবলী সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহাতে বিস্তৃতরূপে দেখিতে পাওয়া যাইবে। এস্থলে তাহাদের নাম উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সাধু বাগচির আদি বাস গাঙ্গইল। সাধুর পুত্র লবণ ও মনু। মনু রাঢ়দেশবাসী হন। লবণের পুত্র ত্রিপরারি; ত্রিপুরারিব পুত্র চক্রপাণি; চক্রপাণির পুত্র রূপ ওঝা; রূপওঝার পুত্র ঋষি-দীক্ষিত। এই ঋষিদীক্ষিতের পঞ্চপুত্র অগ্নিহোত্রী, তন্মধ্যে বিয়াই দ্বিতীয় পুত্র। বিয়াইর জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিহর এবং হরিহরের দ্বিতীয় পুত্র বলাই। এই বলাই দুই বিবাহ করেন প্রথম পক্ষীয় বনিতার গর্ভে ধিয়াই প্রভৃতি ছয় পুত্র এবং দ্বিতীয় পক্ষীয় বনিতার গর্ভে দুই পুত্র বামন ও কমল জন্মগ্রহণ করে। এই ধিয়াই বাগচি বংশে প্রসিদ্ধ এবং ধেঞি বাগচি নামে কুলজ্ঞ গ্রন্থে পরিচিত। আমাদের শীর্ষোক্ত রামজয় এই ধেঞি বগচি সম্ভবত এবং পুঁঠীয়ার রাজগণ বামন বাগচি সম্ভূত। পুঁঠীয়ার রাজগণ ও রামজয় এক সাধু বাগচির অধস্তন সন্তান। ধেঞি বাগচির নবাই প্রভৃতি চারি পুত্র। বেটাইব রামমিশ্র প্রভৃতি পঞ্চ পুত্র; আবার রামমিশ্রের বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি পঞ্চ পুত্র। বৈকুণ্ঠের পুত্র মধুসূদন; মধুসুদনের পুত্র চূড়ামণি; চূড়ামণি মিশ্রের পুত্র কমলকান্ত ও রাধাকান্ত বাগচি। রাধাকান্তের পুত্র রামকৃষ্ণ ওড়নইয়ের শ্রীনারায়ণ মৈত্রে ও চৌগ্রামের মঙ্গল কারকুনে করণ; করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ কবেন। বামকৃষ্ণের সদাশিব প্রভৃতি চারি পুত্র। এই সদাশিবের আব এক নাম ব্রজরাম ছিল। ব্রজরাম বনাম সদাশিব হইতেই রামজয় বাগচির ধারা প্রচলিত। সদাশিব হইতে বংশাবলী নিম্নে প্রদর্শিত হইল ঃ—
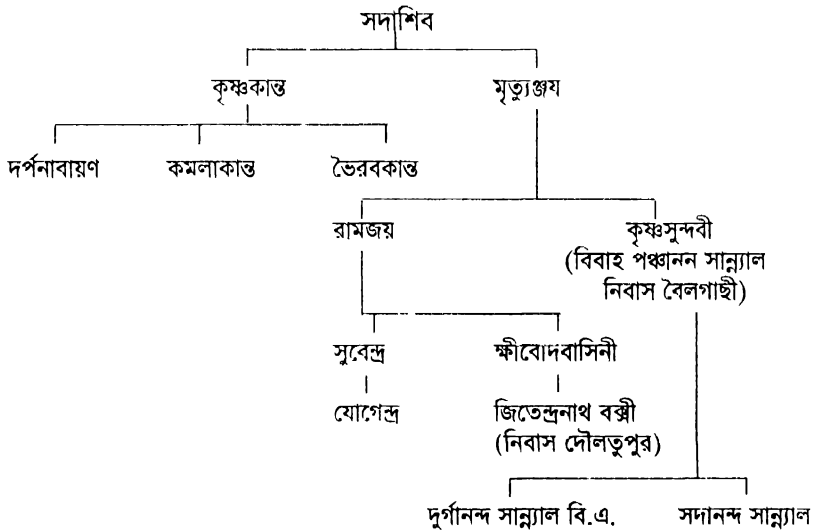
সদাশিব পাইকশাব গণেশ চক্রবর্ত্তীতে, পুঁঠীযার কৃষ্ণগোবিন্দ বৈরাগীতে এবং ভাবনীল রঘুদেব চৌধুরীতে করণ করেন। সদাশিবের পুত্র মৃত্যুঞ্জয় বৈলগাছী নিবাসী পঞ্চাননকে কৃষ্ণসুন্দরী নাম্নী একমাত্র কন্যা সম্প্রদান করেন। মৃত্যুঞ্জয় বাগচির ঔরসে এবং জয়দুর্গা দেবীব গর্ভে ১২৪৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে রামজয় জন্মগ্রহণ করেন। ১২৫০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে জয়দূর্গা দেবীর এবং ১২৬০ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে মৃত্যুঞ্জয়েব মৃত্যু হয়। সাধু হইতে মৃত্যুঞ্জয় পর্য্যন্ত সকলেই গাঙ্গইলে (গঙ্গাগ্রাম) বাস করিতেছিলেন। কিন্তু "পিতৃমাতৃহীন সহায়-সম্বল-বিহীন রামজয় এই কোমল বয়সে" পৈতৃক প্রসিদ্ধ সমাজ গাঙ্গইল ত্যাগ করিয়া বৈলগাছী তাহার ভগিনী কৃষ্ণসুন্দরী দেবীর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

যে "অসহায় রামজয়ের" জীবনবৃত্তান্ত ১৩০৩ বঙ্গাব্দেব ৪ঠা আষাঢ়েব "হিন্দুবঞ্জিকায়" মুদ্রিত হইয়াছে. তাঁহার জীবনের কাহিনী এস্থলে লিখা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু যে রামজয় দশমাস বয়সের সময় মাতৃহীন হইয়া এবং "দরিদ্রের ভীষণ দংষ্ট্রাঘাতে প্রপীড়িত হইয়া" একজন গণ্যমান্য এবং যশস্বী হইয়াছেন এবং সমাজক্ষেত্রে ও ধর্ম্মক্ষেত্রে পরিচিত হইয়াছেন, তাঁহাব জীবন বৃত্তান্তের অসম্পর্ণতা পূর্ণ করা জনসমাজের কর্ত্তব্যকর্ম্ম। সেই জন্যই তাঁহার বংশাবলী এস্থলে সন্নিবেশিত হইল এবং যে যে বিষয় "হিন্দুবঞ্জিকায়" উল্লেখ হয় নাই. তাহাবই উল্লেখ এস্থলে করা প্রয়োজন বোধ করিলাম।

যে রামজয় "পিতৃমাতৃহীন, সহায়-সম্বল-বিহীন" সে কোন বিদ্যালয়ে না পড়িয়াও গ্রন্থকাব এবং কবি। তাঁহার "কবিতা-কুসুম" ও "সঙ্গীত কুসুমে" (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ) ধর্ম্মের উচ্ছ্বাস ও ভগবান ভক্তি এবং সমাজের বিচিত্রতা অঙ্কনে তিনি একজন প্রকৃত চিত্রকব। যে পথেব ভিখারী হইয়াও প্রচুর অর্থ উপার্জ্জনে সক্ষম, সেই অর্থের স্বার্থকতা সম্পাদনে মুক্তহস্ত, অন্নদানে, জলদানে ও পূণ্যকীর্ত্তিতে যশস্বী. তীর্থপর্য্যটনে বিদুরের ন্যায় ভক্তবৎসল, তাঁহার জীবন ধন্য, তাঁহার যত্নও অধ্যবসায় প্রশংসনীয়। যে রামজয় একমুষ্টি অন্নেব জন্য উকীল গৌরসুন্দরের সামান্য মহরের হইতে একজন প্রসিদ্ধ মোক্তার হন. সেই রামজয অন্নদানের অবশ্যকতা বিশেষরূপে অনুভব করেন। তাই তাঁহার বাসায় বহু অনাথ দরিদ্র ছাত্রবৃন্দক অন্ন দিয়া বিদ্যাশিক্ষা করাইয়াছেন এবং করাইতেছেন। ইহাই অর্থের প্রকৃত সদ্বয়। সর্ব্বভূতের মঙ্গলসাধনে, দেব, গো ও ব্রাহ্মণের সেবায় স্বোপার্জ্জিত অর্থের প্রায় সমস্তই ব্যয় কবাতে, রামজয়ের নিঃস্বার্থতাই প্রমাণ হয়।

রামজয় রাজা নহেন, জমিদার নহেন, মহাজন নহেন, তিনি একজন দীন দরিদ্র সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণের সন্তান। কিন্তু তাঁহার হৃদয় অনেক রাজা জমিদার অপেক্ষা উচ্চ। যাঁহার সুখ দুঃখে সমভাব, যাঁহার সর্ব্বভূতে সমান দয়া, যাঁহার তত্ত্বনুসন্ধানে মন লালায়িত, তাঁহার দীর্ঘজীবন, আমরা প্রার্থনা করি। তাঁহার হৃদয়ে ধর্ম্মভাব প্রবলবেগে বহিতেছে বলিয়া, তিনি সম্প্রতি বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভার ভার গ্রহণ করিয়া অবৈতনিক সম্পাদক পদে নিযুক্ত আছেন। যে রামজয় আদিতে "অসহায়" বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছিলেন, সেই রামজয়ের প্রতি আজ ভগবান সহায়। ভগবদ্ভক্তের সহায়ই ভগবান। ভগবান সহায় হইলেই, সমস্ত জগৎ তাহার সহায় হয়। তখন সে শান্তিময় রাজ্যে স্বর্গীয় সুখ অনুভব হয়— সে সুখ ধন, অধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান বা তপাদিদ্বারা পাওয়া যায় না, কেবল শক্তি দ্বারাই পাওয়া যায়। যে গৃহস্থ ভগবদ্ভক্তকেই আশ্রয় করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে, সে কাম, ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি রিপুকে পরাজিত করিয়া হৃদয়ে সর্ব্বদা শান্তি অনুভব করে। তাহার দুঃখ কোথায়? সকল গুনেই এবং সকল অবস্থাই তাহার সুখ।

উপসংহার

রাজসাহীর প্রাচীনত্ব। উপক্রমণিকায় যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা শ্রুতিমূলক। মহাভারতোক্ত "মৎস্য দেশ" প্রাচীন ব্রহ্মর্ষি দেশের অন্তর্গত ছিল। পাণ্ডবগণ কালিন্দর দক্ষিণ তীর অতিক্রম করিয়া উত্তরে দশার্ণ দক্ষিণে খাল ও তন্মধ্যবর্ত্তী শূরসেন প্রভৃতি জনপদ উত্তীর্ণ হইয়া "মৎস্য দেশস্থ বিরাটরাজ্যে" প্রবেশ করিবার কথা মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায়। (১) পঞ্চালীর নাম কান্যকুব্জ; শূরসেনের নাম মথুরা; — সুতরাং মহাভারতোক্ত "মৎস্য প্রদেশ" বঙ্গভূমির অন্তর্গত বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু রাজসাহী প্রদেশে জনশ্রুতি বড়ই প্রবল। যাহা হইক, রাজসাহী যে পুরাতন পৌণ্ড্র বর্দ্ধনভূক্তির অন্তর্গত প্রাচীন জনপদ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই প্রদেশে পাল ও সেন বংশীয় নরপাল বর্গের অনেক কীর্ত্তি চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে; সুবিখ্যাত রামপাল সেনের পিতা বিজয় সেন দেবের প্রতিষ্ঠিত প্রদ্যুন্নেশ্বর নামক শিবমন্দিরে শিলালিপি রামপুর বোয়ালিয়ার অদূরবর্ত্তী গোদাগাড়ীর নিকট প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। রাজসাহীর অন্তর্গত তাহিরপুর ও সাঁতুল বহুপুরাতন স্থান। এই নামে কোন "সরকার" থাকার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

প্রেমতলী। পদ্মাতীরবর্ত্তী বর্ত্তমান প্রেমতলী গ্রাম বহু পুরাতন। বৈষ্ণব-সাহিত্য প্রচারের প্রধান সহায় ভক্ত-প্রবর বৈষ্ণব কবি নরোত্তম দাস অঙ্কুর এই প্রেমতলীর নিকটবর্ত্তী খেতরি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, তথায় এখনও পর্যন্ত প্রতি বর্ষে তাঁহার স্মরণার্থ বৈষ্ণবগনের মেলা বসিয়া থাকে। নরোত্তম দাসের পদাবলী ভাবে, ভাবনায় ও রচনাকৌশলে বৈষ্ণব-সাহিত্যে সুপরিচিত। তাঁহার সময়ে রাজসাহী প্রদেশে সংকীর্ত্তন স্রেত প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়, তৎসূত্রের অভিনব মৃদঙ্গবাদন কৌশল প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা নরোত্তমের জমিদারীর নামানুসারে অদ্যাপি "গড়ের হাটী" নামে পরিচিত রহিয়াছে। নরোত্তম দাস ঠাকুর উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-বংশোদ্ভব কৃষ্ণানন্দ দত্ত মজুমদরের পুত্র। কৃষ্ণানন্দ মুসলমান জায়গীরদারের অধীনে একজন প্রসিদ্ধ জমিদার ছিলেন। (১) খেতরির মেলার বয়ঃক্রম চারিশত বৎসরের উপর হইবে। এই স্থানে নরোত্তমের "ভজনটোলা" নামক বৃক্ষবটিকা "আসন বাড়ী" নামক জীর্ণ মন্দির ও পুরাতন পুস্কুরিণী ছিল। আসন বাড়ী ও পুস্কুরিণী সম্প্রতি রাজসাহীর অন্তর্গত করচমাড়িয়া নিবাসী রামকুমার সরকারের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত রাজকুমার সরকার মহাশয়ের যত্নে ও ব্যয়ে সংস্কৃত হইয়াছে। রামকুমার সরকারের পিতার নাম নিমাই সরকার, পিতামহের নাম মানিকচন্দ্র। ইহাদের আদি বাসস্থান করচমাড়িয়ার নিকটবর্ত্তী ছাতারদিঘী গ্রামে ছিল। মানিকচন্দ্রের মহাজনী কারবারের অর্থের সহিত তাঁহার পুত্র নিমাইচন্দ্র স্বোপার্জ্জিত অর্থ সংযুক্ত করিয়া করচমাড়িয়ায় বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন এবং পুস্করিণী খননাদি করিয়া অনেক পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার পৌত্র সুপণ্ডিত কার্য্যদক্ষ রাজকুমার রাজসাহী এসোসিয়েসন সভার সর্ব্বপ্রথম সম্পাদক এবং উক্ত সভাসংস্থাপক স্বর্গীয় রাজা প্রমথনাথ রায়ের বিবিধ সৎকার্য্যের প্রধান পরামর্শ যন্ত্রে ও রাজসাহীর উপকারী বন্ধু বলিয়া পরিচিত।

কলম। কাৎস্যশিল্পের জন্য কলম প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কলমের কাঁশারীরা রাজসাহীর আদি নিবাসী নহে। বর্গীর হাঙ্গামার সময়ে বর্দ্ধমানাঞ্চল হইতে জনৈক পুরোহিতের সঙ্গে একদল কাঁশারী আসিয়া চলনবিলের তীরে উপবেশন সংস্থাপন করে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। ইহাদের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া কলমের অনেক মুসলমানও এক্ষণে কাংস্যশিল্পের অনুশীলনে

---

(১) মঙ্গাভারত, বিবাটপর্ব্ব।

(২) শ্রীযুক্ত শশিরকুমার ঘোষ প্রণীত নরোত্তম চরিত।

জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে।

গ্রাম্য কবি। তাহিরপুরের নিকটবর্ত্তী সাধনপুর নিবাসী রামেন্দ্র শাশ্বতী স্বভাব কবি ছিলেন। ইঁহার পুত্র কামেন্দ্র সরস্বতী এখনও জীবিত আছেন। মুসলমান মৎস্য ব্যবসায়ী মিলনা ধাওয়ার গীত ও রাজকিশোর জালিয়ার জাগর গান রাজসাহীর গ্রাম্য কবিতার নিদর্শন। চৌগ্রামের রুদ্রকান্ত রায় একজন দ্রুত কবি ছিলেন। ইহার প্রণীত উর্দ্দু ভাষায় চণ্ডীর কবিতা অতি প্রসিদ্ধ। কলিকাতার প্রসিদ্ধ যাত্রা সম্প্রদায়ের অধিনায়ক শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় রাজসাহীর অন্তর্গত পুঠিয়ার নিকটবর্ত্তী পীরগাছা নিবাসী। ইনি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশীয় গুড়নাইর মৈত্র কুলোদ্ভূত। বচনাকৌশলে মতি বাবুর যাত্রার পালা সর্বত্র সুপরিচিত ও প্রশংসিত।

সংবাদ পত্র। সংবাদ পত্রের মধ্যে হাণ্ডিয়াল নিবাসী শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র সরকার সম্পাদিত "রাজসাহী সংবাদ" নামক পত্রিকা পুরাতন, উহা বহুদিন হইল উঠিয়া গিয়াছে। জগচ্চন্দ্র সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশোদ্ভব। তাঁহার "অজোদ্বাহ" কাব্য ও "রাজসাহী সংবাদ" তদীয় সাহিত্যচর্চ্চার নিদর্শন। রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর "বৈষয়িক তত্ত্ব" ও "শিল্প ও কৃষি পত্রিকা" নামক দুইখানি পত্রিকা ও "রেশম তত্ত্ব" এবং কতিপয় ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক প্রচারিত কবিয়া সাহিত্য চর্চ্চার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

উদিত নারায়ণ। উদিত নারায়ণ ব্রাহ্মণবংশীয়। ইহার বংশধর এখনও জীবিত আছেন।

রাজা লক্ষীনারায়ণ। তাহিরপুর রাজবংশের আদি পুরুষ বিজয় লস্করের অধস্তন বাজা কংসনারায়ণ। সিদ্ধ শ্রোত্রীয় রাজা কংসনারায়ণের অধস্তন লক্ষ্মীনারায়ণ নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনন্দনের কন্যাকে বিবাহ করেন। ১৩০৪ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসের "উৎসাহে" এই বিবাহ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা ভ্রমপ্রদ বলিয়া সিদ্ধ হইল।

ধর্ম্মশালা। রাজসাহী "ধর্ম্মশালা ও দাতব্য সমাজ" উঠিয়া গিয়াছে।

পদাঙ্কদূত। পদাঙ্কদূত-রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণ শর্ম্মা একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন। ইহাব কবিত্বশক্তির পরিচয় "পদাঙ্কদূতে" প্রকাশিত আছে। ইঁহার বাসস্থান ঘুরকা গ্রামে ছিল—অদ্যাপি তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান আছে।

রামকান্ত। মহারাজ রামকান্ত ইংরাজী ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন; ভ্রমক্রমে ৪৮ স্থলে ৮৪ হইয়াছে।

রামকৃষ্ণ। মহারাজ রামকৃষ্ণ মহারাণী ভবানীর সম্মুখে বড়নগবে পঙ্গাতীরে তনুত্যাগ করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় নাটোর রাজত্ব মহারাজ রামকৃষ্ণের হস্তে ছিল। তাঁহাব অভাবে মহারাণী ভবানী পুনরায় কিছু দিন রাজসাহী রাজ্যের শাসনভার পরিচালন করিয়াছিলেন। মহারানী ভবানীর মৃত্যুর পর মহারাজ রামকৃষ্ণ রাজ্যভার গ্রহণ করার কথা যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা ভ্রম।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের জলপ্লাবন— এই প্লাবনে রাজসাহীর বহুস্থানের ভূমি যেরূপ উর্ব্বর হয় সেইরূপ বালুকারাশি পড়িয়া অনুর্ব্বরও হইয়াছে।

নুন-নগর— কেহ কেহ নুর নগর বলিয়া থাকে

মুসাখাঁ— হোজা নদীর সহিত মিশ্রিত হইয়া দিঘাপতিয়ার নিকট গদাই নামে খ্যাত।

বারানই— ইহার প্রাচীন নাম বারাহী। মহানন্দা হইতে বহির্গত হইয়া রামপুর বোয়ালিয়ার বড়কুঠীর পূর্ব্ব দিক দিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল এবং যাহার নিকট প্রবল ছিল। ইহার স্থানে স্থানে চিহ্ন মাত্র আছে।

হাজরাহাটী— প্রাচীন কালে একটা অতি প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান ছিল। এই স্থানের সাঁচী পান

অতি সুবিখ্যাত।

ছোট পেঁয়াজ— তাহিরপুর অঞ্চলে যথেষ্ট ছোট পেঁয়াজ ও লশুন উৎপন্ন হয়।

দেশীয় শিল্প— খাজুরা নিবাসী শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ খাঁ মৃত্তিকা দ্বারা লবঙ্গ, এলাইচ, জাফল, গুপারি প্রভৃতি ফল প্রস্তুত করিতে পারেন; তাহা প্রকৃত লবঙ্গ, এলাইচ প্রভৃতি হইতে সহজে বিভিন্ন করা যায় না। তিনি একজন জমিদার হইয়াও প্রসিদ্ধ চিত্রকর ও শিল্পী।

যত্যাচার— যত্যাচারেরা নিরামিশভোজী।

নাটোরের রাজধানী— যে বিলের মধ্যে প্রাচীন নাটোর রাজধানী স্থাপিত হয়, তাহার নাম চন্দ্রাবতী।

কুমারপুর— রামপুর বোয়ালিয়ার পশ্চিম ও গোদাগাড়ীর পূর্ব্বদিক কুমারপুর নামে একখানি গ্রাম আছে। এই গ্রামে রাজা কুমার পালের রাজধানী ছিল। এখনও ইহার ভগ্নাবশেষ আছে। প্রায় ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে এই স্থানে কুমার পালের সময়ের একখানি প্রস্তর লিপি অবিষ্কৃত হয়। ঐ প্রস্তরখণ্ড ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে সুরক্ষিত আছে।

জিলিম— একটী প্রাচীন স্থান। মান্দা রঘুনাথের বাড়ীর তিন ক্রোশ পশ্চিম। এইস্থানে এক প্রকাণ্ড বাড়ীর ভগ্নাবশেষ এবং কাঁচ নির্ম্মিত অঙ্গন বর্ত্তমান আছে। সম্প্রতি একখানি প্রস্তর ফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে।

উদিশা— এই গ্রাম চৌগ্রামের নিকট। এই স্থান জ্যোতিষ শিক্ষা ও পঞ্জিকা প্রস্ততের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এপ্রদেশে পূর্ব্বে উদিশার পঞ্জিকাই প্রচলিত ছিল।

বাণী ভবানী প্রদত্ত টোলের সাহায্য— এখনও রাণী ভবানী প্রদত্ত অর্থ নবদ্বীপের চতুষ্পাটীতে বিতরিত হইয়া থাকে।

বৈদ্য বেলঘরিয়া— সংস্কৃত চর্চ্চার দ্বিতীয় নবদ্বীপ বলিয়া খ্যাত শিবচন্দ্রের প্রণীত "চণ্ডীর ব্যাখ্যা" ও "সিদ্ধান্ত কৌমূদী" প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

রাজা গোবিন্দনাথ— রাণী শিবেশ্বরীর দত্তক পুত্র। নাটোরের শ্যাম বৈষ্ণবী নাম্নী জনৈক বেশ্যা প্রজার নামে বাকী খাজানার মোকর্দ্দমা উপলক্ষে দত্তক পুত্রের অসিদ্ধির মোকর্দ্দমা উপস্থিত হয়।

রাজা কৃষ্ণেন্দ্র রায়— ইনি বলিহারের প্রসিদ্ধ রাজা। চরিত্রে এবং বদান্যতায় ইনি একটী আদর্শ জমিদার ছিলেন। ইহার পিতামহ নাটোর বংশের রাজা শিবনাথের কন্যা জয়দুর্গাকে বিবাহ করেন।

রণেন্দ্রনারায়ণ— তাহিরপুরের আদি রাজ বংশের শেষ রাজা। ইহাকে সাধারণতঃ রণু রাজা বলা হইত। ইনি রাজা রঘুনন্দনের দৌহিত্র।

তামলী লুট— তামলী জাতি কুসীদব্যবসায়ী। ইহারা এত বর্দ্ধিত হারে কুসীদ লইত যে দরিদ্র প্রজারা অত্যন্ত প্রপীড়িত হয়; তাহিরপুরের রাজা বীরেশ্বরের প্রজারাই অধিক প্রপীড়িত হয়। রাজার আদেশে প্রপীড়িত প্রজারা তামলীর খত খাতা লুট করে। এই মোকদ্দমায় রাজাকে এক দিনের জন্য কারাবাসে যাইতে হয় এবং লক্ষাধিক মুদ্রাও ব্যয় হয়। এইরূপ ব্যয় তাঁহার ঋণের প্রধান কারণ।

কালিদাস সাণ্ডিল্য— ইহাঁর প্রকৃত নাম কালীচন্দ্র সান্যাল। নাটোরের তিন ক্রোশ পশ্চিমে হরিদাখলসী গ্রামে ইহাঁর নিবাস ছিল।

নাটোরের দেবোত্তর সম্পত্তি— বড় তরফ ও ছোট তরফ উভয়েরই দেবোত্তর সম্পত্তি আছে। কিন্তু ছোট তরফের প্রায় সমস্ত সম্পত্তিই দেবোত্তর। বড় তরফের দেবোত্তর সম্পত্তি

নিতান্ত কম নহে। ডিহি রাম রামা নাটোর সুকুল ছোট তরফের জমিদারী।

রাণীভবানীর দানের আদি সূত্র— রামকান্তের মৃত্যুর পর প্রথম দ্বাদশীর দিবস দয়ারাম রায় রাণীভবানীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য একট রৌপ্য ষোড়শ উৎসর্গের আয়োজন করিয়াছিলেন। আসনে উপবিষ্ট হইয়া ঐ সকল দান উৎসর্গ করিতে রাণী ভবানী অসম্মতি প্রকাশ করেন। দয়ারাম অসম্মতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাণী ভবানী বলিলেন "আমি বালিকা নহি। বিধবা হইয়া একদাশীর উপবাস করিতেও কষ্ট বোধ করি না; এমতাবস্থায় প্রথম দিনে আমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য এরূপ আয়োজন করার প্রয়োজন কি? যাহা প্রতি দ্বাদশীতে দান করিতে পাবিব না, তাহা আমি অদ্য দান করিতে ইচ্ছা করি না। প্রত্যেক দ্বাদশীতে আমার অবস্থানুযায়ী যে প্রকার দান করিতে পারি, তাহারই আয়োজন অদ্য করা হউক"। দয়ারাম হাস্য করিয়া এই বলিলেন যে— "মাঁ; এরূপ রৌপ্য ষোড়শ আপনি আজীবন প্রত্যেক দ্বাদশীতে কেন, প্রত্যহ দান করিলেও আপনকার অনাটন হইবার নহে"। এই ঘটনা হইতেই রাণী দানে মুক্তহস্ত হন।

নবাবী আমলের যাতায়াতের পথ— নবাবের আমলে প্রথমে ঢাকা তদপর মুর্শিদাবাদ বাঙ্গালার রাজধানী ছিল। রাজসাহীতে জোয়াড়ীর নিকট চাপিলার নবাবের ফৌজদাবী কাচাবী ছিল। নাটোর মহারাণী ভবানীর রাজধানী। সে সময় পদ্মানদীর তীরস্থ ভগবানগোলা মুশিদাবাদের দ্বার স্বরূপ ছিল। ঢাকা, নাটোর, চাপিলা প্রভৃতি স্থানে যাইতে হইলে ভগবানগোলা হইয়া যাইতে হইত। নিম্ন টেবলে ঢাকা ও মূর্শিদাবাদ হইতে যাইবার পথ ও দূবত্ব দর্শিত হইল ঃ—

বর্ষার সময় ঢাকা হইতে	বর্ষার সময় মুর্শিদাবাদ হইতে
প্রথম পথ।	প্রথম পথ।
জাফর গঞ্জ	৫.৫ মাইল। ভগবানগোলা ৭৭ মাইল।
শীতলাই	১৩৩ " সরদহ ১০০ "
চাপিলা	১৩৭
নাটোর	১৬৩ " নাটোর ১৫৯ "
শীত ও গ্রীষ্ম কালে ঢাকা হইতে	বর্ষার সময় মূর্শিদাবাদ হইতে
দ্বিতীয় পথ।	দ্বিতীয় পথ।
জাফরগঞ্জ	২১৮ " বোয়ালিয়া ৯০½ "
শীতলাই	২৯৩¼ " কাপাশিয়া ৯৯ "
নাটোর	৩২৩ " পুঁটীয়া ১১২ "
	নাটোর ১২৬ "

নবাবী আমলে রাজসাহী প্রদেশের আয়তন— নিম্ন টেবলে রাজসাহী রাজ্যের আয়তন প্রদর্শিত হইল ঃ—

প্রদেশ	বর্গমাইল
রাজসাহী (প্রকৃত)	৪,০৭১
ভাতুড়িয়া	৩,৯৪২
ভূষণা	২,২৩০
পুকরিয়া	৭১১
বাহির বন্দ	৫২০

ভিতর বন্দ	... ... ২২১
পাতিলাদহ	... ... ৪৮৭
স্বরূপপুর	... ... ২৪৯
কোতয়ালী হোশেনপুর	... ... ৬৫
বার্ব্বক সিঙ্গ	... ... ৮১
সাহজোলা	... ... ৩৩১
	১২,৯০৮

একবর্গ মাইল ৬৪০ একর। ১২৯০৮ বর্গমাইলে ৮২৬১১২০ একর রাজসাহী রাজ্য ছিল।

পরগণা	বর্গমাইল
লস্করপুব	... ... ৪৯৯
তারিপুর	... ... ৮৩
বার্ব্বকপুর	... ... ১৫৯

এই তিন প্রদেশ ব্যতীত সমুদয় স্থান রাজসাহী রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

বাজসাহী রাজ্য— ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে রেনেল সাহেব তাঁহার মানচিত্রে বাঙ্গালা ও বিহার ৮ অংশে বিভক্ত করেন। উক্ত আট ভাগের মধ্যে ছয় ভাগ রাজসাহী রাজ্য বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে।

রাজসাহী জেলার বোর্ড— ১৮৮৬-৮৭ খৃষ্টাব্দে জেলার বোর্ড নামক সভা স্থাপিত হয়। মধ্য ও নিম্ন শিক্ষা, পথ, পাউণ্ড প্রভৃতি এই সভার অধীন। সেই সভার কার্য্য নির্ব্বাহর্থ নিম্নলিখিত মহাত্মারা সভ্য পদে আদিতে গবর্ণমেণ্ট দ্বারা নিযুক্ত হন।

১। ই,এইচ, রডক (চেয়ারম্যান ও মাজিস্ট্রেট)
২। ছি, আর মেরিয়ট।
৩। ই,এ, ল্যাঙ্গ।
৪। ছি,বি, ওয়ালটন।
৫। এছজে, এনড্রুজ।
৬। ডবলিউ, জে, ডনেল।
৭। ডাক্তর ডি, মরিশন।
৮। এল,কেমিরেন।
৯। বাবু ব্রজগোপাল বাগছী।
১০। " কিশোরীমোহন চৌধুরী।
১১। " মাধবচন্দ্র রায়।
১২। বাবু রাজকুমার সরকার।
১৩। " দুর্গাগোবিন্দ চৌধুরী।
১৪। " কালীনাথ চৌধুরী।
১৫। " রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।
১৬। " কেদারেশ্বর আচার্য্য।
১৭। " হরিচরণ মৈত্রেয়।
১৮। " শশিভূষণ রায়।
১৯। " কালীকুমার দাস।
২০। সৈয়দ তফজ্জল হোছেন।
২১। সাহ জুহরল হোসেন।
২২। মৌলবী মহাম্মদ তাহির।

আদিতে ডাক্তার এল, কেমিরেন ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। তৎপর ১৮৮৮ খৃঃ অব্দের ১৫ ডিসেম্বর বাবু ব্রজগোপাল বাগছী এম-এ. বি-এল ভাইস চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত হন। ১৮৮৯ খৃঃ অব্দের ৪ মে তারিখে ঐ পদ তিনি ত্যাগ করেন; কিন্তু ১৮৯০ খৃঃ অব্দের ২৯ এপ্রিল

তারিখে তাঁহার প্রতি ঐ কার্য্যের ভার পুনরায় অর্পিত হয়। ১৮৯৭ খৃঃ আব্দের ২১ জুলাই তারিখে তাঁহার অকাল মৃত্যুতে জেলার বোর্ড শোক প্রকাশ করিয়া যে মন্তব্য লিখেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

"Proposed by Babu" Prasanna Kamar Bhattacharjee :"That this Board desires to put on record their heart-felt sorrow at the untimely death of Babu Broja Gopal Bagchi who was the Vice-chairman for over 8 years, and who as such rendered valuable services to the Board " Seconded by Babu Kishori Mohon Chaudhuri. The proposal was passed nemine contradicente. Resolived also that a copy of the resolution be forwarded to the bereaved family."

বাবু ব্রজগোপাল বাগছী বুদ্ধিমান, ধর্ম্মপরায়ণ ও পণ্ডিত ছিলেন। তিনি যেরূপ কার্য্য করেন তাহাতে রাজসাহীবাসী তাঁহার নিকট চিরকাল ঋণী থাকিবেন। তাঁহার মৃত্যুর পর শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীমোহন চৌধুরী এম.এ.বি-এল ১৮৯৭ খৃঃ অব্দের ২রা আগষ্ট তারিখে ভাইস চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত হইয়া অদ্যাপি যশের সহিত স্বীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন।

মিউনিসিপালিটী— ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের বাঙ্গালা মিউনিসিপাল আইন III (B.C) অনুসারে রামপুর বোয়ালিয়া মিউনিসিপালিটীর ২১ জন কমিশনর এবং নাটোর মিউনিসিপালটীর ১৮ জন কমিশনর নির্দ্ধারিত হয়।

রামপুর বোয়ালিয়া মিউনিসিপালটীর কমিশনরগণ।

১। গোসাঁই রামরতন ভারতী
২। বাবু ব্রজগোপাল বাগছী এম.এ. বি.এল
৩। বাবু হরিচরণ মৈত্রেয়
৪। " লোকনাথ চক্রবর্ত্তী বি.এ
৫। " শশধর রায় এম.এ. বি.এল
৬। " হরগোবিন্দ সেন
৭। " হরকুমার সরকার
৮। " কেদারেশ্বর আচার্য্য এম.বি
৯। " গুরুনাথ মুন্সী এম.এ.
১০। " শশিভূষণ রায়
১১। মৌলবী ওয়াজীব উদ্দিন আহম্মদ
১২। বাবু মথুরানাথ মৈত্রেয়
১৩। " নন্দলাল ভট্টাচার্য্য
১৪। মি. পি. মুখোপাধ্যায়
১৫। মিঃ ই, লিলিবর
১৬। বাবু কাশী কিঙ্কর সেন
১৭। " রাজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ
১৮। ডাক্তার এল, কেমিরণ
১৯। সৈয়দ তফজ্জল হোসেন
২০। বাবু চন্দ্রনাথ চৌধুরী
২১। ডাক্তার মরিশন

নাটোর মিউনিসিপালটীর কমিশনরগণ।

১। মৌলবী ফজলার রহমান খাঁ চৌধুরী।
২। বাবু সর্ব্বানন্দ সাহা
৩। " মহিমচন্দ্র রায়
৪। " তারকচন্দ্র রায়
৫। " বিহারী লাল সান্ন্যাল
৬। " নীলমনি দাস
৭। মোহাম্মদ খাঁ
৮। বাবু রাজকুমার চক্রবর্ত্তী
৯। " মহিমচন্দ্র রায়
১০। " রাধিকালাল সোম
১১। " নরেন্দ্রনাথ গুপ্ত
১২। " কেদারনাথ চৌধুরী
১৩। " শরচ্চন্দ্র বসু
১৪। নুর মহাম্মদ খাঁ চৌধুরী
১৫। বাবু যোগেশচন্দ্র বাগছী
১৬। " শ্রীকৃষ্ণ মৈত্রেয়
১৭। " হরিচরণ চক্রবর্ত্তী
১৮। " মহেন্দ্রকুমার বসু

রামপুর বোয়ালিয়া মিউনিসিপালটীর চেয়ারম্যান পদে প্রথমে বাবু গোবিন্দ সেন নিযুক্ত হন। বর্ত্তমানে জজ আদালতের একজন প্রসিদ্ধ উকিল বাবু ভুবনমোহন মৈত্র ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ১২ই মে হইতে চ্যায়ারম্যান কার্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ভুবন বাবু সহরের এবং জনসাধারণের উপকারের জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। তিনি রেশম স্কুলে ৩০০০৲ মবলাপাড় জুবলী বাগান প্রস্তুত জন্য ৩০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এইরূপ অর্থ ব্যয়ই সার্থক।

রাজসাহী সভা— "রাজকার্য্য সমালোচনা ও জনসাধারণের হিতকর কার্য সাধনের নিমিত্ত ১১৭৯ সালেব ৭ই শ্রাবণ এক সাধারণ অধিবেশন হইয়া এই সভা সংস্থাপিত হয়।" এই সভার বয়ক্রম এখন ২৮ বৎসরের কম নহে। রাজসাহী সভার উদ্দেশ্য অতি মহৎ। এই সভার কার্য্যবিবরণ হইতে উদ্দেশ্য গুলি নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল—

১। "দেশীয় লোকদিগের শিক্ষার উন্নতি সাধন।"

(ক) "ব্যবসায়, শিল্প কার্য্য ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয়" উপদেশ এবং সাধারণ উপদেশ দিবার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন এবং অধ্যাপক নিয়োগাদি করা, অথবা তত্বৎ বিষয়ের ব্যয় সঙ্কুলনের সাহায্য প্রদান করা।"

(খ) "পূর্ব্বোক্ত কোন বিদ্যা শিক্ষার্থীদিগকে সাহায্য এবং উৎসাহ প্রদান করা।"

(গ) "সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপন, অথবা স্থাপন বিষয়ে সাহায্য করা কিম্বা তাহার ব্যয় সঙ্কলন করা।"

(ঘ) "ভৈষজ্য উদ্যান এবং উদ্ভিদ্ বিদ্যার অনুশীলনার্থ উদ্যান প্রস্তুত ও চিত্র শালিকা স্থাপনা করা অথবা তত্তৎ বিষয়ে সাহায্য করা।"

(ঙ) "শিক্ষা সংক্রান্ত ও পদ্ধতির সংস্কার সাধন বিষয়ে উপায় ও পদ্ধতির উদ্ভাবন করা এবং তত্তৎ কার্য্যে যোগ দেওয়া।"

২। "দেশীয়দিগের শিল্প, বিজ্ঞান চর্চ্চা এবং জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি সাধন।"

(ক) প্রচলিত ভাষায় দেশীয় কৃতবিদ্যাদিগের দ্বারা বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক এবং সাহিত্য বিষয়ক উপদেশ প্রদান ও পুস্তক প্রণয়ন অথবা পুস্তক অনুবাদ বিষয়ে সহায়তা করা।"

(খ) "ভারতবর্ষের প্রাচীন ভাষায় লিখিত গ্রন্থ সকলের পুনমুদ্রাঙ্কণ এবং প্রাচীন ভাষায় অনুবাদ করার বিষয়ে সাহায্য করা।"

৩। "ন্যায়ানুগত সাধারণমত বিকাশের সহায়তা।"

(ক) "সংবাদপত্র সম্পাদকদিগকে পত্রাদি লেখা এবং অন্য কোন প্রকার তাঁহাদিগকে সাহায্য করা।"

(খ) "রাজসাহীতে কোন সাময়িক অথবা সংবাদপত্র প্রকাশিত করা বা তদ্বিষয়ে সাহায্য করা।"

(গ) "অন্য সভা এবং অন্য সমাজের মতামত গ্রহণ ও প্রকাশ করা।"

৪। "দেশের সমৃদ্ধির উপকরণ সমূহের বিকাশ সাধন বিষয়ে যত্ন করা।"

(ক) "তৎউপযোগী কোন কার্য্যে লোকের সহকারিতা বা যোগ উৎপাদন করার চেষ্টা করা।"

(খ) "বাণিজ্য দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানির জন্য নূতন পথ ও নূতন উপায় অনুসন্ধান এবং তদ্বিষয়ে অভিপ্রায় প্রকাশ করা এবং বর্ত্তমান তাদৃশ কোন পথ ও উপায়ের উন্নতি সাধন প্রস্তাব করা।"

(গ) “প্রদর্শনী মেলা সংস্থাপন, শিল্প কৃষিকার্য্য সংক্রান্ত আবিষ্কার। নৈপুণ্য, পারগতা ও কৃতিত্বের পুরস্কার দেওয়া এবং অন্য কোন প্রকারে উৎসাহ প্রদান করা।”

৫। “দেশের স্বাস্থ্যকারিতা বর্দ্ধন এবং সাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন।”

(ক) “দেশের কোন স্থানে ঔষধ বিতরণ, অথবা তদ্বিষয়ে আনুকূল্য কবা।”

(খ) “অস্বাস্থ্যজনক জলাশয়ের জল নিঃসারণ, প্রচলিত পয়ঃপ্রণালীর পুনঃসংস্কার, কদর্য্য পুস্করিণী, গর্ত্ত ইত্যাদি পূরণ, অথবা পরিষ্কার করণ, জঙ্গল কর্তন এবং স্বাস্থ্যকর পেয় জল আনয়ন সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও উপায় নির্দ্দেশ করা ও অন্য কোন প্রকারে তদ্বিষয়ে সাহায্য করা।”

(গ) “দাতব্য চিকিৎসালয়, হাসপাতাল এবং ঔষধের দোকান,বা স্থাপনের উপায় নির্দ্দেশ অথবা তৎসমূদায় সংস্থাপনের উদ্যোগ করা।”

(ঘ) “গবর্ণমেণ্ট সাধারণ স্বাস্থ্য বর্দ্ধনের জন্য যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন তাহার উন্নতির উপায় ব্যক্ত করা, অথবা তাদৃশ কার্য্যে লোকের সাহায্যেব চেষ্টা করা।”

৬। “দুর্ভিক্ষ, ঝড়, জলপ্লাবন বাতাদৃশ অন্য কোন দৈব দুর্বিপাকে পতিত কোন স্থানীয় লোকের কষ্ট মোচন করা এবং তদ্বিষয়ে সাহায্য করা।”

(ক) “আর্থিক সাহায্য প্রদানে অন্নকষ্ট মোচন জন্য কোন কার্য্যেব অনুষ্ঠান অথবা তত্ত্বৎ বিষয়ে সাহায্য প্রদান করা।”

৭। “সাধাবণের ভ্রমণ ও গমনাগমনের উপায় বিধান এবং তদ্বিষয়ে সুবিধা করার উপায় নির্দ্দেশ করা।”

(ক) “রাস্তা, সেতু এবং জলপথ ইত্যাদি সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও উপায় উদ্ভাবন করা।”

(খ) “কোন স্থানে নূতন টেলিগ্রাফ অথবা ডাকঘর খোলার অথবা সরাই ইত্যাদি সংস্থাপনের উপায় নির্দ্দেশ করা।”

৮। “সামাজিক উন্নতি সাধনের জন্য সহায়তা করা।”

(ক) “দেশীয়দিগের স্বাস্থ্য ও শারীরিক উন্নতির বাধা দূরীকরণের উপায় নির্দ্দেশ করা।”

(খ) “যে সকল কারণ দ্বাবা জাতীয় মুলধন বৃদ্ধি হইতে পারে, তাহার উত্তেজক উপায় অবলম্বন করা।”

(গ) “বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে অসদ্ভাব এবং বিদ্বেষ নিবারণের উপায় উদ্ভাবন করা।”

৯। “ব্যবস্থাপক সভার কি কোন রাজকর্ম্মচারীর কি গবর্ণমেণ্টের অন্য কার্য্যকারকের কোন কার্য্য ও বিধি সম্বন্ধে দেশীয়দিগের মনের ভাব ও তাহাদিগের অভাব রাজসমীপে, ব্যবস্থাপক সভায় বা কোন রাজকর্ম্মচারীর নিকট কিম্বা কোন সমাজ কি সভার নিকট এবং গবর্ণমেন্টের কার্য্য ও বিচাব সম্বন্ধীয় কর্ম্মচারীগণের নিকট প্রতিনিধি স্বরূপ জ্ঞাপন করা।”

(ক) “মেমোরিয়াল, আবেদনপত্র, প্রার্থনাপত্র, ও সাধারণপত্র দ্বারা দেশীয়দিগের ভাব প্রকাশ করা।'

(খ) “অভিনন্দন পত্র প্রদান এবং সভার কার্য্যকারক ও সভ্যদিগের প্রতিনিধি রূপে জ্ঞাপন, বাচনিক সংবাদ প্রেরণ করা।”

১০। “দেশীয়দিগের অর্থনাশ ও কলহ নিবাররণের উপায় অবলম্বন কবা অথবা তদ্বিষয়ে যোগ দেওয়া।”

(ক) “শালিসী বিচারালয় স্থাপন এবং স্থাপন বিষয়ে সাহায্য করা।”

(খ) উভয় পক্ষের প্রার্থনা মত কোন বিচার মীমাংসার জন্য শালিস নিযুক্ত করা ও তৎস্বন্ধীয় অন্যান্য আবশ্যকীয় উপায় অবলম্বন করা।"

জমিদার, প্রজা, বাণিজ্য ব্যবসায়ী ও মহাজন, শাস্ত্র ও ব্যবসায়জীবী ও চাকুরিয়া দ্বারা এই সভা গঠিত হইয়া আজ পর্য্যন্ত রাজসাহীর উন্নতি সাধন করিতেছে। (এই সভার সাহায্যে ও যত্নে যে বোয়ালিয়া জেলা স্কুল ক্রমে প্রথম শ্রেণীর কালেজে পরিণত হইয়াছে তাহা রাজসাহীর ইতিহাসে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৭২-৭৩ সাল দুবলহাটীর অধিপতি স্বর্গীয় রাজা হরনাথ রায় বাহাদুর সর্ব্বপ্রথমে ঐ স্কুলকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে পরিণত করার জন্য অর্থাৎ রাজসাহীতে এফ.এ.পরীক্ষা পর্য্যন্ত অধ্যাপনা হইবার ব্যবস্থা করিয়া গবর্ণমেন্টের হস্তে ৫০০০৲ টাকা লভ্যের একটি মূল্যবান ভূসম্পত্তি অর্পণ করেন। রাজসাহী সভা সেই সাধু দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বি.এ. পরীক্ষা পর্য্যন্ত পড়াইবার জন্য বর্ষিক ৬০০০৲ টাকা লভ্যের ১৫০০০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ গবর্ণমেন্টের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত আইন শিক্ষার জন্য পুঁঠিয়া নিবাসিনী দানশীলা শ্রীমতী রাণী মনোমোহিনী দেবীর প্রদত্ত ২০০০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ আছে। এই কলেজের গৃহ নির্ম্মাণ ও ছাত্রনিবাস রাজসাহীর রাজা জমিদার বিশেষতঃ পুঁঠিয়া নিবাসিনী প্রাতঃস্মরণীয়া স্বর্গীয় মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবী ও শ্রীযুক্তা রাণী হেমন্তকুমারী দেবী বিস্তর অর্থদান করিয়াছেন। যে সময়ে গবর্ণমেন্ট এই কলেজ উঠাইয়া দিবার জন্য মন্তব্য প্রকাশ করেন, সে সময়ে রাজসাহী সভার যত্নে এবং চেষ্টায় গবর্ণমেন্টের নিকট রাজসাহীবাসী চিরঋণী থাকিবেন।)

এ সভা সংস্থাপিত হওয়া অবধি ক্রমে যে সকল মহাত্মারা সভাপতি ও সম্পাদকেব আসন গ্রহণ করেন তাহাদেব নাম নিম্নে প্রকাশিত হইল—

সভাপতি	সম্পাদক।
১। রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুব, (দিঘাপতিয়া)	১। বাবু রাজকুমার সরকাব বাবু প্রমথকৃষ্ণ সিংহ এম.বি.এ
২। বাজা কৃষ্ণেন্দ্র রায় বাহাদুব, (বলিহাব)	২। বাবু কৃষ্ণচৈতন্য ভৌমিক বি.এল.
৩। রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুর, (দিঘাপতিয়া)	৩। বাবু কেদারেশ্বর আচার্য্য এম.বি
৪। রাজা শশিশেখরেশ্বব রায় বাহাদুর (তাহিবপুব)	৪। " ব্রজগোপাল বাগছী এম.এ. বি.এল
৫। মহারাজা, জগদিন্দ্রনাথ বায বাহাদুর, (বর্ত্তমান)—নাটোর) সভাপতিব প্রতিনিধি।	৫। বাবু তাবণকৃষ্ণ ভৌমিক
৬। রাজা প্রমদনাথ বায বাহাদুর, (বর্ত্তমান)— (দিঘাপতিয়া)	৬। বাবু প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য বি.এল. ৭। " সুরেশচন্দ্র মৈত্রেয বি.এল ৮। " অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি.এল ৯। বাবু কেদারেশ্বর আচার্য্য এম.বি. (বর্তমান)

মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের সময়ে প্রতিনিধি সভাপতির পদ সৃষ্ট হয়।

এই টাকার সুদ এখন কলেজের সাধারণ বিভাগের উন্নতিকল্পে ব্যয়িত হইতেছে।

রাজশাহী পরিচিতি

[বরেন্দ্র একাডেমী, রাজশাহী]

ড. তসিকুল ইসলাম

সম্পাদনা পরিষদ :

শামসুদ্দীন আহমদ
মুহম্মদ আবদুস সামাদ
অধ্যক্ষ মুহম্মদ এলতাসউদ্দিন
এস. এম. আবদুর লতিফ
ড. মুহম্মদ মজির উদ্দিন
আবুল হোসেন মালেক

সূচিপত্র

ভূমিকা

বরেন্দ্র অঞ্চল তথা রাজশাহী বিভাগ বাংলাদেশের প্রাচীনতম জনপদ— সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক বর্ণাঢ্য লীলাভূমি। বাংলাভাষা ও সাহিত্যের আদি নীড়ও এই বরেন্দ্রভূমি। এখানেই অনেক চর্ষাপদ কর্ত্তাদের বাসস্থান বলে পণ্ডিতরা মনে করেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্ষাপদের ভাষার সাথে রাজশাহী অঞ্চলের ভাষার মিল খুজে পাওয়া যায় বলেও অনেকের ধারনা। রাজশাহীর লোক শিল্প ও লোক-সাহিত্য বিলুপ্তপ্রায়। বরেন্দ্র অঞ্চলে আদিবাসীদের সংখ্যাও নেহায়েত কম নয়। আদিবাসীদের জীবন বৈচিত্র ও বৈচিত্রপূর্ণ জীবনযাত্রার উপকরণ ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত ও বিলুপ্ত হতে চলেছে। এ সব সংরক্ষণ ও অনুসন্ধান আমাদের পবিত্র দায়িত্ব।

এতদঞ্চলের বিলুপ্ত ও লুপ্ত প্রায় সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদর্শনসমূহ উদ্ধার ও সংরক্ষণ করে এবং গবেষণা চালিয়ে দেশের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার মহান উদ্দেশ্য নিয়ে বরেন্দ্র একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হাতে গোনা কয়েকজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির প্রচেষ্টায় মাত্র দুই বছর আগে প্রতিষ্ঠিত বরেন্দ্র একাডেমীর মত একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কেবলমাত্র নিজেদের উদ্যম ও আমাকে মুলধন করে 'রাজশাহী পরিচিতি' নামে একটি ঐতিহাসিক তথ্যমূলক গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশনা করতে যাচ্ছে যাচ্ছে জেনে আমি বিস্মিত ও আনন্দিত।

'রাজশাহী পরিচিতি' রাজশাহীর ইতিহাস নয়। ইতিহাস প্রণয়নে সহায়ক কিছু তথ্যের সংগ্রহমাত্র। এতদঞ্চলের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও গোটা সামাজিক জীবনের বিভিন্ন অঙ্গনে পূর্বপুরুষেরা যে অবদান রেখে গেছেন সেই বিস্মৃত ও উপেক্ষিত ঐতিহ্যের একটু খানি সাধারণ পাঠকের কাছে উপস্থাপন করে গৌরবোজ্জল ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও ইতিহাস প্রণয়নে আগ্রহ সৃষ্টি করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। রাজশাহী পরিচিতি নব অভিযাত্রীর যাত্রাপথে প্রথম পদক্ষেপ। স্বল্প সময়ে সম্পূর্ণ বেসরকারী উদ্যোগে এরূপ একটি গ্রন্থ প্রকাশনা নিঃসন্দেহের এক দুঃসাহসী প্রয়াস। এই গ্রন্থ সাধারণ পাঠক ও গবেষকদের কৌতুহলী দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হবে বলে আশা রাখি।

বরেন্দ্রভূমি তথা রাজশাহী বিভাগের পাঁচটি জেলাই বরেন্দ্র একাডেমীর গবেষণা এলাকা। বরেন্দ্র অঞ্চলের প্রাণকেন্দ্র রাজশাহী নিয়েই এর যাত্রা শুরু। পর্যায়ক্রমে অন্য চারটি জেলার পরিচিতি প্রণয়ন ও প্রকাশনা একাডেমী পরিকল্পনার অর্ন্তভূক্ত। বরেন্দ্র একাডেমীর এই জয়যাত্রা অব্যাহত থাকুক এবং এই উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা সফল হোক এই আমাদের একান্ত কামনা।

আমিনুল হক
জেলা প্রশাসক, রাজশাহী
ও
সভাপতি, বরেন্দ্র একাডেমী

বাজশাহী ১০ই জানুয়ারী ১৯৮১

নিবেদন

বরেন্দ্র এলাকা তথা উত্তরাঞ্চলের আদি ইতিহাস উদ্ধার এবং তা ভবিষ্যতের জন্য লিপিবদ্ধ করে রাখবার জন্য বরেন্দ্র একাডেমী বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগুচ্ছে। একাডেমী প্রতিষ্ঠার দু বছরের মধ্যে তার নিজস্ব গবেষণা পত্রিকা প্রকাশ অব্যাহত রেখেছে এবং তাতে এতদঞ্চলের উপর গবেষণামুলক বহু তথ্য পূর্ণ নিবন্ধ প্রকাশ করেছে।

এই অঞ্চলের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা স্বল্প সময়ের কাজ নয়। বহু পরিশ্রম, অর্থ, সময় সর্বোপরি ব্যাপ প্রয়াস ও সাহায্য সহযোগিতা প্রয়োজন। এই প্রয়াসের ক্ষেত্রে 'রাজশাহী পরিচিতি' প্রকাশ প্রথম ও অন্যতম পদক্ষেপ। এই গ্রন্থ বরেন্দ্র একাডেমীর গবেষণা লব্ধ প্রথম বই। জেলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নয়— ইতিহাস আশ্রিত গাইড বুক এটি। বাবো জন লেখক— গবেষকের দীর্ঘদিনের সাধনার ফসল ১২টি নিবন্ধ নিয়ে এক প্রথম প্রকাশ। জেলার উল্লেখযোগ্য বিষয়ের দলিল হিসেবে চিহ্নিত হবে এই বই।

সময়াভাবে এই বইতে জেলার আরো অনেক বিষয় সন্নিবেশ করা সম্ভব হয়নি। সম্ভব হলে ভবিষ্যতে এক পূর্ণতা দান করা একাডেমীর দায়িত্ব। বইটির জন্য লেখা সংগ্রহ করে প্রকাশ করতে প্রায় এক বছর সময় লেগেছে। মফঃস্বল শহর থেকে একটি বই প্রকাশ নানাদিক থেকে অসুবিধাজনক। কাজেই নির্দিষ্ট সময়েব চেয়ে 'রাজশাহী পরিচিতি' প্রকাশ করতে বিলম্ব ঘটেছে। একাডেমী পর্যায়ক্রমে উত্তরাঞ্চলের সবকটি জেলা পরিচিতি প্রকাশ করতে উদ্যোগ নিয়েছে। উত্তরাঞ্চলের সামগ্রিক ইতিহাস রচনা এবং তথ্যানুসন্ধান ও গবেষকদেব জন্যে এটি এক মহৎ কাজ হবে। রাজশাহী পরিচিতি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করায় বরেন্দ্র একাডেমী স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

রাজশাহীর জেলা প্রশাসক জনাব আমিনুল হক একাডেমীর চেয়ারম্যান। জেলার বিভিন্ন সাংস্কৃকি প্রতিষ্ঠানের সাথে তাঁর সম্পৃক্তি অবশ্যই তাঁর সুকুমার সাংস্কৃতিক মনের পরিচায়ক। 'রাজশাহী পরিচিতি' প্রকাশনা তাঁর অনুপ্রেরণার ফসল, এ ব্যাপারে তাঁর অবদান আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি।

'রাজশাহী পরিচিতি' প্রণয়নে একাডেমীর পরিচালক মণ্ডলীর মুল্যবান উপদেশাবলী ও আন্তরিক সহযোগিতা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। একাডেমীর নির্বাহী পরিচালক (অবৈতনিক) আবুল হোসেন মালেক ও একাডেমীর কর্মীগণ, প্রেস কর্তৃপক্ষ, কর্মচারীগণ স্ব স্ব অবদানের জন্য ধন্যবাদার্হ। গ্রন্থটির সম্পাদনা কাজে সর্বোতভাবে সহযোগিতাদানের জন্য সহকর্মীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ।

পরিশেষে পাঠক-পাঠিকা, গবেষক ও তথ্যানুসন্ধানীদের নিকট নিবেদন, এই গ্রন্থের যা কিছু ভুলত্রুটি তা আমাদেরই। এই গ্রন্থের ভবিষ্যৎ উন্নতি, সংশোধন পরিমার্জ্জন সংক্রান্ত পরামর্শ সাদরে আমন্ত্রিত। খোদা হাফেজ।

নিবেদক—

শামসুদ্দীন আহমদ

সভাপতি, সম্পাদনা পরিষদ।

রাজশাহী জেলার প্রাকৃতিক পরিচয় ও ইতিহাস

অধ্যক্ষ মুহম্মদ এলতাসউদ্দিন

জেলার অবস্থান ও আকার :

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে রাজশাহী বিভাগের দক্ষিণ পশ্চিমে রাজশাহী একটি বিস্তৃত জেলা। রাজশাহী জেলার উত্তরে দিনাজপুর ও পশ্চিম বঙ্গের পশ্চিম দিনাজপুর, পশ্চিমে পশ্চিম বঙ্গের মালদহ জেলা, পূর্বে পাবনা ও বগুড়া জেলা এবং এর দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত ঘেঁষে পদ্মা নদী প্রবাহিত। এই পদ্মা নদীই রাজশাহী জেলাকে পশ্চিম বঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে পৃথক করে রেখেছে। জেলার সদর দপ্তর রামপুর বোয়ালিয়া (বর্তমানে রাজশাহী) এই পদ্মার উত্তর তীরে অবস্থিত। এই জেলা ২৪°—৬ থেকে ২৫°—১৩ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°-২ থেকে ৮৯°–২১ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এর বর্তমান আয়তন ৩,৬৫২ বর্গ মাইল, এবং (১৯৭৪ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী। লোক সংখ্যা ৪২,৬৮,১১০ তার মধ্যে পুরুষ ২১,৭৫,৫৪৩ ও মহিলা ২০,৯২,৫৬৭। ১৯৬১ সালে রাজশাহীর লোক সংখ্যা ছিল ২৮১০,৯৬৪ এবং ১৯৬১ সালে ছিল ২২,০৫,৩৫৭।

পূর্বে অবশ্য রাজশাহী জেলার আয়তন অনেক কম ছিল। ১৯৪৭ সালে ভারত বর্ষ যখন দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়, তখন মালদহ জেলার নবাবগঞ্জ, শিবগঞ্জ, ভোলাহাট, নাচোল, গোমস্তাপুর, এই ৫টি খানা রাজশাহী জেলার অন্তর্ভূক্ত হয়। ১৯৪৮ সালের নভেম্বর মাসে এই ৫টি থানা নিয়েই নবাবগঞ্জ মহকুমার সৃষ্টি হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় দিনাজপুর জেলার পোরশা, পত্নীতলা ও ধামুরহাট থানাকে বগুড়া জেলার সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয়। পরে ১৯৪৯ সালে প্রশাসনিক সুবিধের জন্য এই ৩টি থানাকে রাজশাহী জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পত্নীতলা ও ধামুরহাট থানা নওগাঁ মহকুমাব এবং পোরশা থানা নবাবগঞ্জ মহকুমার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৫৪ সালে (Bagge Award এর অধীন) পশ্চিম বঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে ৩৬টি মৌজা (যার আয়তন প্রায় ২৪,০৪০ একর) রাজশাহীর অন্তর্ভূক্ত হয় এবং ১৬,৭৯৬ একর আয়তনের ২২টি মৌজা রাজশাহী থেকে মুর্শিদাবাদ জেলায় হস্তান্তর করা হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পূর্বে এই জেলায় ৩টি মহকুমা ও ২২টি থানা ছিল। বর্তমানে এতে ৪টি মহকুমা ও ৩০টি থানা আছে।

রাজশাহীর প্রাকৃতিক গঠন :

রাজশাহী জেলা গঙ্গা নদীর অববাহিকার অন্তর্গত। বছরের পর বছর ধরে পলি মাটি জমে এই অববাহিকার সৃষ্টি হয়েছে। এই পলি মাটির স্তর কোন কোন স্থানে কয়েক হাজার ফিট পুরু আবার কোন কোন জায়গায় ২০০০ ফিটের বেশী পুরু হবে না।

ভূমির প্রকৃতি অনুসারে মোটামুটি ভাবে রাজশাহী জেলাকে ৩টি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে :

০১। বরিন্দ অঞ্চল;

০২। নদীর তীরের পলিমাটি অঞ্চল;

০৩। বিল ও জলাভূমি অঞ্চল।

বরিন্দ অঞ্চল :

সংস্কৃত কথা 'বরেন্দ্র' থেকে বর্তমানে বরিন্দ কথাটা ব্যবহৃত হয়। পশ্চিম বঙ্গের মালদহ এবং রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর ও বগুড়া জেলার উঁচু অঞ্চল এই বরিন্দ অঞ্চলের অর্ন্তগত। কোন কোন স্থান বেশ উঁচু। দুই উঁচু স্থানের মধ্যে ভাগ নীচু হওয়ার দরুন খাড়ির সৃষ্টি হয়েছে। এই অঞ্চলের উচ্চতা প্রায় ২০ ফিট থেকে ৪০ ফিট পর্যন্ত দেখা যায়। রাজশাহী জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশ এই বরেন্দ্র ভুমির অন্তর্গত। এই জেলার নাচোল, পত্নীতলা, পোরশা, ধামুরহাট, গোমস্তাপুর, নিয়ামতপুর, মহাদেবপুর থানা বরিন্দ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। তা ছাড়া গোদাগাড়ী, তানোর, সিংড়া ও মান্দা থানার কোন কোন অংশ এই এলাকার মধ্যে পড়ে।

এই অঞ্চলে অনেক প্রাচীন দীঘি ও পুকুর দেখা যায়। লোক বসতি তুলনামুলক ভাবে অনেক কম। উঁচু অঞ্চলে সাঁওতাল, কোল, ভীল, রাজবংশী, মুণ্ডা, ওঁরাও, নুণে, ডোম-হাড়ি, চামার, চাণ্ডাল প্রভৃতি লোক বাস করে। এখানকার চাষাবাদের জমিগুলি বেশ বড় আকারের এবং মাঝে মাঝে উঁচু অনাবাদি জমিও দেখা যায়। অবশ্য বর্তমানে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এই সব অনাবাদি জমির পরিমাণ দিন দিন কমে যাচ্ছে। জমিগুলির উচ্চতা কম বেশী হওয়ায় বা সমতল না হওয়ায় কলের সাহায্য চাষাবাদ করা বই দুস্কর হয়ে পড়েছে।

নদী তীরের পলিমাটি অঞ্চল :

পদ্মা নদী ও মহানন্দা নদীর ধার বরাবর পলিমাটি জমে এই অঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে। চারঘাট, লালপুর, রামপুর, বোয়ালিয়া ও নবাবগঞ্জ মহকুমার মহানন্দা নদীর ধার এই অঞ্চলের অন্তর্গত। এই অঞ্চলের বালি মাটির প্রাধান্যই বেশী। এবং মাটির রং বরিন্দ অঞ্চলের মাটির রং থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। গোমস্তাপুরের পশ্চিম থেকে শিবগঞ্জ, ভোলাহাট, বদলগাছি ও নওগাঁ থানার ভূমি বালুময়, উর্বর এবং রবিশস্যের পক্ষে খুবই উপযোগী। এ অঞ্চলের লোক বসতি অত্যন্ত ঘন। জমিগুলি সমতল হওয়ায় কলের চাষের উপযোগী।

বিল ও জলাভূমি অঞ্চল :

রাজশাহী জেলার পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্বে এই নীচু বিল এলাকা পরিলক্ষিত হয়। পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ক্রমশঃ বিলের শাখা ও আকার বেড়ে গেছে। পূর্ব দিকের সীমানা বরাবর এই বিল ও জলাভূমি বিদ্যমান। বিলগুলি অগভীর হওয়ার দরুন বর্ষাকালের বৃষ্টিতে একেবারে ভেসে যায়। গ্রীষ্মের সময় আবার দ্রুত শুকিয়ে যায়। বর্ষাকালে বিলগুলি পানিতে ভেসে একাকার হয়ে গেলে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করার জন্য এক মাত্র নৌকা ছাড়া আর কোন যানবাহনের কথা চিন্তাও করা যায় না। বিলের মাটি খুব উর্বর হওয়ায় বিলগুলিতে ধান ও অন্যান্য রবি শস্যের চাষ করা হয়ে থাকে। বর্তমানে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় কোন কোন বিলে মাটি তুলে ভিটে বানিয়ে ঘর বাড়ী তৈরী করা আরম্ভ হয়ে গেছে।

বিলগুলি কি ভাবে সৃষ্টি হয়ে ছিল, তার সঠিক কারণ জানতে না পারলেও মনে হয় বিভিন্ন যুগ ধরে নদীর গতি পথ পরিবর্তনের ফলেই এগুলোর সৃষ্টি হয়েছে। তা ছাড়া নদী পথে পলি মাটি জমতে জমতে অনেক সময় নদীর মুখ বন্ধ হয়ে এই জলাভূমির সৃষ্টি হতে পারে। পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে অগ্রসর হলে প্রথমেই নবাবগঞ্জ মহকুমার ভোলাহাট থানার বিল তাতিয়া পরিলক্ষিত হয়। মহানন্দা নদী এলাকায় এটাই সবচেয়ে বড় বিল। তাছাড়া নবাবগঞ্জ শহরের উত্তর-পশ্চিমে অর্থাৎ মহানন্দা নদীর অপর পাড়ে তাতার মারির বিলের কথাও উল্লেখ করা যেতে

পারে। বরিন্দ অঞ্চলের পশ্চিম ধারে পোরশা থানার মিরজাপুর বিল ও গোদাগাড়ী থানার পালতলা বিল বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বরিন্দ অঞ্চলের পূর্ব দিকে চকচকী, ঘুঘরী উৎরীল, হিলনা, বিল কুমারী, কঙ্কণ, মান্দা, সোনা, বাঘদিমলি ইত্যাদি নামের ছোট বড় অসংখ্য বিল দৃষ্টি গোচর হয়। অনেকে ধারণা করেন তরাই নদীর পুরাতন গতি পথেই এই সব বিলের সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ও বিখ্যাত বিল চলন বিল এই রাজশাহীতেই অবস্থিত। এই বিল পিপরুল, ডাঙ্গাপাড়া, লারর, চলন, মাঝগাঁ, বিল চৌমহন, সাতাইল, খরদহ, কাজীপাড়া, সোনাপাতিলা, কুরোলিয়া, চিরল, গরকা, ইত্যাদি নামের অনেক ছোট বড় বিলের সমন্বয়ে গঠিত। বর্ষাকালে সমস্ত এলাকা জুড়ে পানিতে এককার হয়ে যায়। তখন তার আয়তন হয় প্রায় ১৪০ বর্গ মাইল। যদিও এই বিল রাজশাহী ও পাবনা জেলা জুড়ে বিস্তৃত, তবুও এর বেশীর ভাগই রাজশাহী জেলার অন্তর্গত। তারাশ থেকে উত্তর পূর্বে গুমানীর উত্তর পাড়ের নারায়ণপুর পর্যন্ত এই বিলের সর্বোচ্চ প্রশস্ত ৯ মাইল; এবং সিংড়া থেকে কচিকাতা পর্যন্ত সর্বোচ্চ দৈর্ঘ ১৫ মাইল।

পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের গতি পথ পরিবর্তনের ফলেই এই বিলের সৃষ্টি হয়েছে। ইংরেজ আমলে এই বিলের মূল কেন্দ্র সিংড়া, গুরুদাসপুর থানার মধ্য স্থলে গুমানীর তীর ঘেঁষে নির্দেশ করা হয়েছে। এক সময় রাজশাহীর পূর্ব প্রান্তে নাটোর মহকুমার খানা বড়াই গ্রাম, গুরুদাস পুর, সিংড়া এবং পাবনা জেলার চাটমহর, তারাশ রায়পুর এই ৬টি থানার মধ্য ভগে চলন বিলের অবস্থান বিবেচনা করা হতো। বন্যার সময় যখন এই বিরটি বিস্তৃত হতো তখন এর আয়তন দাঁড়াত প্রায় ৪২১ বর্গ মাইল। পদ্মার গতি পরিবর্তন এবং আত্রাই ও করতোয়ার দুর্দিনের সঙ্গে সঙ্গে প্রসিদ্ধ চলন বিলের আয়তন কমে গেছে। এমন একদিন আসতে পারে, যখন হয়ত এই চলন বিল খুঁজে বের করা দুষ্কর হয়ে পড়বে।

এখনও বন্যার সময় আত্রাইয়ের জলধারা চলন বিলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। চলন বিল কতকটা চৌবাচ্চার মত। গুমানী নদী এর জলধারা নিয়ে গিয়ে বড় বরালে ঢালে— তার পর সেই বিপুল জররাশি যমুনাতে গিয়ে পড়ে। ব্রহ্মপুত্র প্লাবিত হলে চলন বিল ফেপে উঠত। এই পানি না নামা পর্যন্ত বিল অঞ্চলের জনগণের দুঃখ দুর্দশার সীমা থাকতনা। গ্রীষ্মের সময় চার পাশের পানি নেমে যখন চৌবাচ্চার মত একটা খাতে জমা হয়, তখন এর আয়তন এসে দাঁড়ায় মাত্র ১০ থেকে ১২ বর্গ মাইল। এই ভাগই বিল চলনের প্রাণ কেন্দ্র। গ্রীষ্মের সময় চলনের পানি কমে গেলে কিছু নামা কেটে বিলের চার পাশের চর ও উঁচু জমিতে চাষ বাস করার জন্য স্থানীয় কৃষকগণ বার বার চেষ্টা চালাতে থাকেন। ক্রমশঃ জন সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলে চলনের উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা তৎকালীন বৃটিশ সরকার উপলব্ধি করেন। তারপর ১৯০৯ সালে সর্ব প্রথম চলনের সংস্কারের উদ্দেশ্যে সরকার প্রাথমিক পরীক্ষা কার্য শুরু করেন।

এই পরীক্ষা কার্য থেকে দেখা যায় যে চলন বিল সৃষ্টি হওয়ার সময় যেখানে তার আয়তন ছিল প্রায় ৪২৯ বর্গ মাইল, সেখানে ১৯০৯ সালে দেখা গেল এর আয়তন এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১৪২ বর্গ মাইল; এবং সারা বছর ধরে পানি থাকত মাত্র ৩৩ বর্গ মাইল এলাকায়। ১৯১০ সালে এর আয়তন আও কমে যায়। ১৯১৩ সালের জরীপ থেকে দেখা যায় যে, মাত্র ১২ থেকে ১৫ বর্গ মাইল জায়গা জুড়ে সারা বছর ধরে পানি থাকে। যেখানে ১৯০৯ সালে পানি থাকত পায় ৩৩ বর্গ মাইল এলাকা জুড়ে। ১৯৫০ সালের জরিপ থেকে দেখা গেছে যে চলন বিলের আয়তন কমে মাত্র ১০ বর্গ মাইলে দাঁড়িয়েছে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে বেশ দ্রুত গতিতে এই চলন বিল ভরাট হয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যার চাপে চলন বিলের আশে পাশে বাড়ী-ঘর ও গ্রাম গড়ে উঠতে আরম্ভ করেছে। যে ভাবে জন বসতি বাড়ছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে চলন বিলের অস্তিত্ব বিলোপ পাবে বলে আশঙ্কা করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে চলন বিলের বর্ণনা দিতে গিয়ে জনৈক সুপারভাইজার নাটোর থেকে মুর্শিদাবাদ দরবারে লিখেছিলেন, 'চলন বিল অতীব দুর্গম স্থান। সেখানে অপরাজেয় দুর্দ্ধর্ষ দস্যু তস্করের আড্ডা তো ছিলই উপরন্ত নানা প্রকার হিংস্র জন্তু জানোয়ারের লীলা ক্ষেত্র। কার সাধ্য যে দিন দুপুরে ২/৪ খানা পানসী বয়ে যায়। মানুষ মানুষকে কেবল নির্দয় ভাবে হত্যাই করে না; হিংস্র জন্তু জানোয়ারও মানুষের রক্ত চুষে খায়।" নাটোর মহকুমার হাঁড়ির বিল ও সদর মহকুমার বসন্তপুরের বিল আয়তন ও গুরুত্বে উল্লেখযোগ্য।

রাজশাহীর মাটির বিবরণ ও খনিজ সম্পদ :

রাজশাহীর মাটিকে মোটামুটি ৩ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। বরিন্দ অঞ্চলের লাল মাটি, নদী অঞ্চলের উঁচু পলি মাটি যেখানে সাধারণতঃ বন্যার পানি উঠতে পারেনা; এবং বিল অঞ্চলের মাটি যেখানে বর্ষার সময় পানি জমে থাকে।

বরিন্দ্র অঞ্চলের মাটিতে লোহা ও চুনের ভাগ বেশী। এখানে বন্যার পানি কোন দিনই উঠতে পারেনা, ফলে সেখানে নতুন করে কোন মাটিও পড়েনা। শুষ্ক মৌসুমে মাটি শুকিয়ে পোড়া ইটের মত শক্ত হয়ে যায়। আবার একটু বৃষ্টি হলেই মাটি পিচ্ছিল ও চিটে গুড়ের মত হয়ে যায়। এই মাটিতে প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট আমন ধান উৎপন্ন হয়।

নদীর পাড়ের উঁচু অঞ্চল অধিকাংশই পলিমাটি দ্বারা গঠিত। এই মাটি খুবই উর্বর। এই মাটিতে কৃষকেরা সাধারণতঃ পাট, আখ, আলু, পেয়াজ ইত্যাদি অর্থকরী ফসল উৎপাদন করে। তা ছাড়া গঙ্গা নদীর উভয় তীরে তরমুজ, পটল, করোলা, মরিচ ও শাক-সব্জি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এসব মাটিতে প্রচুর পরিমাণে রবি শস্যের চাষ হয়ে থাকে। এ ধরনের মাটি বেলে দো-আঁশ নামে পরিচিত।

তৃতীয় প্রকারের মাটি সাধারণতঃ বিল অঞ্চল দেখা যায়। বেশীর ভাগ সময় এই বিল অঞ্চলের মাটি পানির নীচে থাকায় মাটির রং একটু কালচে ধরনের হয়ে থাকে। এই মাটি ধান উৎপাদনের জন্য খুবই উপযোগী। স্থানীয় ভাবে এই ধরনের মাটিকে বলা হয় মেটেল মাটি।

খনিজ সম্পদ :

রাজশাহীর কোন কোন অংশের মাটি পুরাতন পলি মাটি দ্বারা গঠিত। ফলে নবাবগঞ্জ ও অন্যান্য কয়েকটি থানার মাটিতে কিছু কিছু কাঁকর দেখা যায়। এই মাটিতে লৌহ বা ক্যালসিয়ামের পরিমাণ আজও পরীক্ষা করে দেখা যায় নি। তবে মনে হয় এই মাটির উপকরণে কিছু খনিজ দ্রব্য থাকতে পারে।

কয়লা :

রাজশাহীতে তেমন খনিজ সম্পদ নেই বললেই চলে। তবে পত্নীতলা ও রহনপুরে কয়লা ও চূনা পাথরের সন্ধান পাওয়া গেছে। জামালগঞ্জের পূর্ব দিক থেকে আরম্ভ করে পত্নীতলার পশ্চিম দিক পর্যন্ত প্রায় কয়েক 'শ বর্গ মাইল জায়গা জুড়ে কয়লা আছে বলে অনুমান করা

হচ্ছে। নওগাঁর উত্তর দিকে জামালগঞ্জের কাছে পায় ৩.৬৫ বর্গ মাইল জায়গা জুড়ে ১৬৫ মিলিয়ন টন কয়লা আছে বলে জানা গেছে।

চুনা পাথর :

জামালগঞ্জের পূর্ব দিক থেকে আরম্ভ করে রাজমাহীর রহনপুর পর্যন্ত কয়েক'শ বর্গ মাইল স্থান জুড়ে চুনা পাথরের সন্ধান পাওয়া গেছে। সিমেন্ট উৎপাদনের জন্য এই চূনা পাথর বিশেষ প্রয়োজন। মাটি থেকে প্রায় ১৫০০ ফুট নীচে এই চুনা পাথর পাওয়া যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই চুনা পাথরের স্তর প্রায় ৫০ ফুট থেকে ১০০ ফুট পর্যন্ত পুরু। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন এখান থেকে প্রচুর পরিমাণে চুনা পাথর পাওয়া যাবে। সম্প্রতি নাটোব মহকুমাব সিঙড়া থানায় গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গেছে।

পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা ও রাজশাহীর নদী-নালা :

রাজশাহী জেলা উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ঢালু। কাজেই নদীগুলি প্রায় উত্তব-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত। রাজশাহীর নদীগুলি কিন্তু পানি নিষ্কাশনেব জন্য মোটেই ব্যবহৃত হয় না, বরং রাজশাহীর বিল ও জলাশয়গুলিই পানি নিষ্কাশনেব জন্য গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকা পালন করে। নিচু এলাকার অতিরিক্ত পানি সাধারণতঃ চলন বিল অঞ্চলে এসে জমা হয়, পরে সেই পনি দক্ষিণ-পূর্ব কোণ দিয়ে শেষ পর্যন্ত যমুনাতে গিয়ে পড়ে। পদ্মা নদী পানি নিষ্কাশনের জন্য মোটেই ব্যবহৃত হয় না। পদ্মার পাড় রাজশাহী শহব থেকে উঁচু হওয়ায় বরং পদ্মার পানিই তীরস্থ জনপদে ও শহরে প্রবেশ করে।

নদী-নালা :

রাজশাহীর নদী-নালা ও জেলার অধিবাসীদের জীবিকা অর্জনের বিরাট দায়িত্ব বহন করছে। রাজশাহী জেলার সুখ-সমৃদ্ধি ও আশা-ভরসা এই নদীগুলিরই দান। এই নদীগুলি বিল পাথারে পানি এনে দেয়, আর মাঠ প্রান্তর হয়ে ওঠে শস্য-শ্যামল।

নিম্নে এ জেলার প্রধান প্রধান নদীগুলির পরিচিতি দেওয়া হলো। রাজশাহী জেলার ভুমি দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ঢালু আজেই এর নদী-নালা খাঁল বিল-ঝিলগুলির গতি প্রবাহ দক্ষিণ-পূর্ব গামী। তা ছাড়া জেলার উত্তর পশ্চিম অপেক্ষা পূর্ব দক্ষিণ দিকে নদী-নালার সংখ্যাও বেশী। এ সব নিম্ন গামী নদীর গতি পরিবর্তিত হয়ে কতক হারিয়ে গেছে। কতক নতুন নামের সৃষ্টি করেছে, আবার কতক পুরাতন স্মৃতি বহন করছে। রাজশাহীর প্রাণকেন্দ্র থেকে এখনও যে সব নদী মানুষের জীবন ধারণের সাহায্য করছে তন্মদ্যে পদ্মা, মহানন্দা, আত্রাই, যমুনা (যমুনা) বারাল, মুসাখান, নন্দনকুজা, গুমানী, বরলাই, নারদ, তুলসীগঙ্গা, নাগর বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এরা অবশ্য সকল ঋতুতে সমানভাবে প্রবাহিত হয় না। কতক স্বল্পতোয়া, কতক ক্ষীণ স্রোতা।

গঙ্গা বা পদ্মা নদী :

গঙ্গা নদী (রাজশহীতে এসে এর নাম হয়েছে পদ্মা) রাজশাহী জেলার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নদী। এ নদী ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রায় ১০০ মাইল আন্তর্জাতিক সীমানা নির্দেশ করছে। গঙ্গা নদী হিন্দুদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র। নবাবগঞ্জ মহকুমার শিবগঞ্জে এসে এই নদী

রাজশাহীতে প্রবেশ করেছে এবং সদর মহকুমার গোদাগাড়ী থানার কাছে এসে মহানন্দার সঙ্গে মিশেছে। পরে রাজশাহীর দক্ষিণ দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সারদা পর্যন্ত গেছে। পরে লালপুর থানার পাশ দিয়ে রাজশাহী ত্যাগ করে পাবনায় প্রবেশ করেছে।

মহানন্দা ছাড়া ও জেলায় গঙ্গার কোন উপনদী নেই। রাজশাহী জেলায় বরাল নদী এর এক মাত্র শাখা নদী। এই বরাল নদী সারদার এক মাইল দক্ষিণ থেকে অর্থাৎ চারঘাট থেকে বের হয়ে পরে আত্রাই ওমানীর সঙ্গে মিসেছে।

অবশ্য দক্ষিণ-তীরে আরও কয়েকটা শাখা-নদী আছে, তন্মধ্যে, জলঙ্গী ও মাথাভাঙ্গা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। জলঙ্গী সারদার দক্ষিণ পশ্চিম থেকে বের হয়েছে এবং মাথাভাঙ্গার উৎপত্তি হয়েছে আরও ১০ মাইল ভাটি থেকে। খরা মৌসুমে এর স্রোত খুবই কম থাকে। ঘণ্টায় মাত্র ৩ থেকে ৫ মাইল। [ফারাক্কা বাঁধ চালু হওয়ার পর থেকে এই নদীর পানি অসম্ভব রকম কমে গেছে এবং এর ফলে বর্তমানে কোন স্রোত নেই বললেই চলে।] বর্ষাকালে এই নদী অবশ্য কিছুটা খরস্রোতা হয়। মাঝে মঝে কোন কোন স্থানে স্রোত এত বেশী হয় যে সেখান দিয়ে নৌকা চলাচল দুষ্কর হয়ে পড়ে।

পদ্মা সর্বনাশী ও রাক্ষুসী। পদ্মার ভাঙ্গন সর্বজন বিদিত। পদ্মার ভাঙ্গা গড়ার সঙ্গে রাজশাহীর ভাগ্য বিজড়িত। বর্ষাকালে প্রতি দিনই প্রায় পদ্মার এ কুল ভাঙ্গে ও কূল গড়ে। পদ্মার মাটি বালুময় হওয়ায় এই ভাঙ্গা গড়ার কাজ আরও সহজতর হয়েছে। কখনও কখনও পদ্মা রাজশাহী শহরের গা ঘেঁষে প্রবাহিত হয়। মাঝে মাঝে চর সৃষ্টি হওয়ায় কখনও আবার শহর থেকে আরও দূরে চলে যায় এর জলধারা। চরের উপর ঘাস ও অন্যান্য ছোট ছোট কাঁটা গাছ জন্মে। চরের মাটি বেশ উর্বর। তরমুজ, পটল, করলা ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য খুবই উপযোগী। পদ্মার চরের দখল নিয়ে প্রায়শঃ মানুষে মানুষে বিবাদ লাগে। পরের বছর দেখা যায় পদ্মার খর স্রোত এই চরগুলিকে কোথায় ধুয়ে মুছে নিয়ে গিয়ে বিবাদের অবসান ঘটিয়েছে। রাজশাহী শহরের দক্ষিণ দিকে বাঁধ দিয়ে এই শহরকে রক্ষা করা হয়েছে। এই বাঁধের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস একটু পরে আলোচিত হবে।

মহানন্দা নদী :

মহানন্দা রজশাহী জেলার আরও একটি গুরুত্বপুর্ণ নদী। ইহা পদ্মা নদীর একটি বড় উপনদী। এই নদী ভারতের দার্জিলিং জেলার মহলদিরাম পর্বত থেকে প্রবাহিত হয়ে পূর্ণিয়া জেলার মধ্য দিয়ে মালদহ— পরে ভোলাহাটের কাছে রাজশাহী জেলায় প্রবেশ করেছে। এই নদী মকরমপুর ঘাট, গোমস্তাপুর থানা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ টাউন, বারঘরিয়া বন্দর, রাজারামপুর, সুলতানগঞ্জ প্রভৃতি অতিক্রম করে গোদাগাড়ী থানার কাছে গিয়ে পদ্মার সঙ্গে মিশেছে। এই নদী অতি প্রাচীন এবং স্থানে স্থানে তলদেশ বেশ গভীর। দুপাশে কোথাও বেশ ঢালু। এখনও বন্যার সময় এর ভয়াবহ তরঙ্গ মানুষের সৃষ্টি আকর্ষণ করে। বর্ষার সময় যে কোন রকমের মাল-বোঝাই ও যাত্রীবাহী নৌকা গমনাগমন করতে পারে। এর পানি খুবই স্বচ্ছ। মহানন্দার দুই তীরের জনবসতির দৃশ্যাবলী অতি মনোরম। এই নদীর নিম্নাংশ কোথাও কোথাও শুশুক ও বড় বড় কচ্ছপ প্রভৃতি জল জন্তু ভেসে উঠতে দেখা যায়। রাজশাহী জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হবার সময় এই নদীতে কোন উপনদী এসে পড়েনি কিংবা এর থেকে কোন শাখা নদীরও উৎপত্তি হয়নি। গত কয়েক বছরে মহানন্দার ভাঙ্গনে নবাবগঞ্জ শহর ও আশে পাশে বহু স্থানে বিস্তর জান মালের ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে।

আত্রাই নদী :

আত্রাই উত্তর বঙ্গের একটি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ নদী। দিনাজপুরের করোতোয়া এই নদীর প্রধান উৎস। দিনাজপুরের খানশামা তানার কাছে এই করোতোয়া আত্রাই নামে পরিচিত। এই জলধারা দিনাজপুরের চিরির বন্দর থানার কাছে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে থানার উত্তর পশ্চিমে এসে আবার মিলিত হয়েছে। পরে এই সম্মিলিত জলধারা আত্রাই নামে রাজশাহীর মহাদেবপুর থানার ৮ মাইল উত্তর দিক দিয়ে রাজশাহীতে প্রবেশ করেছে। বরিন্দ অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় এই নদীতে অনেক ছোট খাটো জলধারা এসে মিলেছে। রাজশাহী জেলার মান্দা থানা পর্যন্তএই নদী দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়েছে। এর পর দক্ষিণ পূর্ব দিকে গিয়ে নওগাঁ ও নাটোর মহকুমার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। শুক্তিগাছার কাছে পশ্চিম যমুনা আত্রাইয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। আরও কয়েক মাইল ভাটিতে আত্রাই রেল ষ্টেশনের কাছে এই জলধারা আবার দু-ভাগে ভাগ হয়েছে। দক্ষিণ দিকের জলধারা পুরাতন আত্রাই প্রথমে দক্ষিণে পরে পূর্ব দিকে গেছে। অন্য ধারা গুর নামে উত্তর দিকে গেছে। নারদ ও নন্দকিয়া নামে আরও দুটি নদী দক্ষিণ দিক থেকে এসে এই নদীতে মিশেছে। গুর নামে উত্তর দিকের জলধারা সিংড়ার কাছে নাগরের সঙ্গে মিশেছে। পরে সম্মিলিত জলধারা চলন বিলে গিয়ে প্রবেশ করেছে।

১৭৮৭ সালের পূর্বে আত্রাই উত্তর বঙ্গের খুব গুরুত্ব পূর্ণ ও বড় নদীগুলির অন্যতম ছিল। কেননা তিস্তার জলধারা এই অঞ্চলের মধ্য দিয়েই পদ্মায় এসে পড়ত। কিন্তু ১৭৪৭ সালে এক বড় বন্যা হওয়ার ফলে এই অঞ্চলের নদীগুলির গতিপথ পরিবর্তিত হয়। ফলে তিস্তা নতুন পথে প্রাবহিত হয়ে পদ্মার পরিবর্তে ব্রহ্মপুত্রে (যমুনা) এসে পড়েছে। তখন থেকেই আত্রাইয়ের গুরুত্ব অনেক কমে গেছে। তবে এখনও বর্ষাকালে প্রচুর নৌকার ভীড় দেখা যায় এই আত্রাই নদীতে। তবে খরা মৌসুমে তা শীর্ণতোয়া হয়ে পড়ে। এই নদী নওগাঁ মকুমার জন্য বিশেয গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমানে আত্রাইয়ের তীরে পত্নীতলায় নাজিরপুর, মহাদেবপুর, মান্দা পুলিশ ষ্টেশন, প্রসাদপুর, আত্রাই রেল ষ্টেশন, পাঁচুপুর, সাহেবগঞ্জ, খাজুরিয়া, ডাঙ্গাপাড়া, আতাইকুলা, চাঁচখোর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য শহর বন্দর অবস্থিত।

এই আত্রাই নদী হিন্দু সম্প্রদায়ের কছে অত্যন্ত পবিত্র। অনেক সময় এই আত্রাই নদীতে স্থান করা গঙ্গা স্নানের মতই পবিত্র বলে বিবেচিত হয়। আত্রাই নদীর পানি (বর্ষাকাল বাদে) খুবই পরিস্কার ও স্বচ্ছ। আত্রাই নদীর মাছ স্বাদের জন্য বিখ্যাত।

যমুনা (যবুনা) :

পশ্চিম যমুনা আত্রাই নদীর একটি প্রধান উপনদী। এই নদী ভারতের জলপাইগুড়ি জেলায় উৎপন্ন হয়ে দিনাজপুরের পূর্ব ও বগুড়া জেলার পশ্চিম দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পরে রাজশাহীতে প্রবেশ করেছে। নওগাঁর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে শুক্তিগাছায় আত্রাইয়ের সঙ্গে মিশেছে। ইটাকাটা গ্রামের সন্নিকটে তুলসীগঙ্গা নামে অন্য একটি নদী পশ্চিম যমুনার সঙ্গে মিশেছে। বগুড়া থেকে আগত তুলশীগঙ্গা রাজশাহীতে প্রবেশ করে পশ্চিম যমুনার প্রায় সমান্তরালে প্রবাহিত হচ্ছে। আত্রাইয়ের মত যমুনাও তিস্তা নদীর স্রোত ধারা।

বড়াল :

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বড়াল নদী রাজশাহীতে পদ্মার একটি শাখা নদী।

চারঘাটের কছে এনদী পদ্মা থেকে পৃথক হয়ে জেলার দক্ষিণাংশ দিয়ে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়েছে। আত্রাই ও ওমানী স্রোত ধারার সঙ্গে যোগ দিয়ে পরে আবার পদ্মার সঙ্গে মিশেছে। বড়াল থেকে মুসাখান ও নন্দনকুজা নামে দুটি শাখা নদী উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়েছে। বড়াল নদীর জলধারা এ দুটি শাখানদী দিয়েই বিভিন্ন বিলে নিষ্কাশিত হয়।

নন্দনকুজা বড়াল নদী থেকে বের হয়ে আত্রাইয়ের দক্ষিণাংশের ওমানীর সঙ্গে মিশেছে। পরে উত্তর পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে বাহাদুরপুরের কাছে গুরের সঙ্গে মিশেছে।

বড়লাই :

বড়লাই নদী নওগাঁ মহকুমার মান্দা থানার বিল অঞ্চল থেকে উৎপন্ন হয়ে দক্ষিণ দিকে নওহাটা পর্যন্ত এসেছে। পরে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে বাগমারা থানার মধ্য দিয়ে নাটোর মহকুমায় প্রবেশ করেছে। পরে পুরাতন আত্রাইয়ের স্রোতধারার সঙ্গে মিলিত হয়ে চলন বিলে গিয়ে পড়েছে। বরিন্দ অঞ্চল থেকে ধান, শাকসব্জী, পান ইত্যাদি বহন করাব জন্য বড়লাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে।

নারোদ :

নারোদ একটি প্রাচীন নদী। মুসাখান থেকে বের হয়ে এই নদী নাটোব শহর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। নারোদ এক কালে খুবই বিখ্যাত ছিল। বর্তমানে এ নদী মৃত প্রায।

পদ্মার ভাঙ্গন বাঁধের সূচনা :

খরা মৌসুমের ক্ষীণ স্রোত পদ্মা বর্ষাকালে এক ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন সময়ে পদ্মা তাব গতি পথ পরিবর্তন করে কত শহর বন্দব, গ্রাম-গঞ্জ যে ধ্বংস করেছে তার ইয়ত্তা নেই। পদ্মার গতি প্রবাহের সাথে মানুষ দিনের পর দিন বিরামহীন সংগ্রাম করে অসছে। বহু শ্রম ও অর্থব্যয় হয়েছে তবুও মানুষ এঁটে উঠতে পারেনি। এমনকি গত বছরও বর্ষাকালে পদ্মার বাঁধ প্রায় ভেঙ্গে যাওয়র উপক্রম হয়েছিল। বহু শ্রম ও অর্থব্যয়ে তাকে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে।

রাজশাহী শহরের জমিন পুরো বর্ষাকালে পদ্মার পানির উচ্চতা থেকে প্রায় ৭ ফিট নীচু। অর্থাৎ বাঁধ না থাকলে কিম্বা কোন কাবণে বাঁধ ভেঙ্গে গেলে সমস্ত রাজশাহী শহর কমপক্ষে ৭ ফিট পানির নীচে তলিয়ে যাবে। কাজেই রাজশাহী শহরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে এই পদ্মার বাঁধ এক গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে। এই বাঁধই হলো রাজশাহীর জীবন মরণ। বর্তমানে রাজশাহী শহরের দক্ষিণ দিকে প্রায় ১০ মাইল লম্বা বাঁধ দেয়া হয়েছে এবং প্রতি বছরই বাঁধের পরিমাণ বাড়ছে। ইতি মধ্যেই বেশ কয়েকটা 'ক্রস' বাঁধ নির্মিত হয়েছে যাতে করে সর্বনাশা পদ্মার স্রোতধারা শহরের দূর দিয়ে প্রবাহিত হয়।

বাঁধের ওপর ইটের গাঁথুনি দিয়ে তার ওপর মোটা তারের জাল দিয়ে আবৃত করা হয়েছে। যেন প্রবল বন্যায় কোন মতেই বাঁধের ক্ষতি সাধন করতে না পারে। তবুও ১৯৬০ সালের বন্যায় পুরাতন ইটের 'ম্যাট্রেসের' যথেষ্ট ক্ষতি সধিত হয়েছিল, ফলে কোন কোন জায়গায় বাঁধ ভাঙ্গার উপক্রম হয়েছিল।

বর্তমানে অবশ্য সোনাইকান্দি থেকে আরম্ভ করে তালাইমারী পর্যন্ত একটা বড় 'চর' পড়ে যাবার ফলে পদ্মার স্রোতধারা রাজশাহী শহর থেকে বেশ একটু দূরে চলে গেছে। তাতে করে পদ্মার ভাঙ্গন একটু কমেছে। যদিও বর্ষাকালে সমগ্র 'চর' ডুবে পানিতে একাকার হয়ে যায় এবং

রাজশাহী শহরের জন্য মারাত্মক হুমকির কারণ হয়।

১৯৫৬ সালে সারদার পুলিশ ট্রেনিং কলেজ পদ্মার ভাঙ্গনে দারুণ-ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ১৯৫৭ সলে পদ্মার ধারে ইটের 'ম্যাট্রেসিং'দিয়ে এই ট্রেনিং কলেজকে ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষা করা হয়। ১৯৬১ সালে সরদার পুলিশ ট্রেনিং কলেজ অবার পদ্মার ভাঙ্গনে ধ্বংসের মুখোমুখি হলে বাঁধকে জরুরি ভিত্তিতে মেরামত করা হয়। বর্তমানে চারঘাটের কাছে বরাল নদীর মুখে এক বিরাট চর পড়ায় এই ভাঙ্গন অধিকাংশ বন্ধ হয়ে গেছে।

ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রাজশাহীর শ্রীরামপুর (বর্তমানে নদী গর্ভে) অবস্থিত জেলা সদরের অফিস-আদালত, সহেবদের আবাসিক কুঠি, সাহেবগঞ্জ প্রভৃতি নদী গর্ভে নিমজ্জিত হলে শহরের সরকারী বেসরকারী লোকজন বহু ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ফরে বাঁধ দিয়ে শহরকে রক্ষা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জেলার সদর কোর্ট-কাচারী ও অন্যান্য অফিস বর্তমান স্থান বুলনপুরে স্থানান্তরিত করা হয় এবং বুলনপুরের মধ্যদিয়ে ১৮৫৫ সালে সর্ব প্রথম ১,৭২৯ ফিট বাঁধ নির্মিত হয়। এটাই রাজশাহীর সর্ব প্রথম সরকারী বাঁধ বলে অনুমিত হয়। তার পর বর্ষার সময় কখনও কখনও কাচারী প্রাঙ্গনে বন্যার পানি প্রবেশ করতে থাকলে কাচারী সংলগ্ন পশ্চিম ও দক্ষিণ ধারে ঢালু করে আরও একটি বাঁধ নির্মিত হয়। বর্তমানে এটাই কাচারী বাঁধ নামে পরিচিত।

১৮৬৯ সালে বর্ষার সময় প্রবল বন্যায় পদ্মা তার উগ্র মূর্তি ধারণ করে। তার প্রবল গতি বেগ নিয়ে রামপুর-বোয়ালিয়া ও অন্যান্য স্থানের ক্ষতি সাধন করে, ফলে ওর প্রতিরোধ কল্পে বৃটিশ সরকার ১৮৭৩ সালে বাঁধ সংক্রান্ত আইন পাশ করেন। তদানুযায়ী ১৮৯৫ সালে বোয়ালিয়ার দক্ষিণ ধার দিয়ে বড় কুঠির পশ্চিমে কসাই পাড়া থেকে বুলনপুর পর্যন্ত প্রায় ১৪,০০০ ফিউ (বোয়ালিয়া বাঁধ) সাহেবগঞ্জ (পরে স্থানান্তরিত হয়ে নাম হয় সাহেব বাজার) থেকে রাজশাহী পাবনা রোডের সংযোগ স্থল পর্যন্ত ৮০০০ ফিট (তালাইমারী বাঁধ) ও রামপুর বোয়ালিয়া বাঁধের উত্তর পশ্চিমে জজ কোর্টের নিকট থেকে গোদাগাড়ী রাস্তার ওপর মাটি ঢেলে প্রায় ১২,০০০ ফিট (গাদাগাড়ী রোড কাঁধ) এই তিনটি বাঁধ নির্মিত হয়। এই তিনটি বাঁধ বোয়ালিয়া বাঁধ, তালাইমারী বাঁধ ও গোদাগাড়ী রোর্ড বাঁধ নামে সরকারী কাগজ পত্রে উল্লেখ আছে। গোদাগাড়ী বাঁধটি সোনাইকান্দী পর্যন্ত বিস্তৃত।

১৯৩৮ সালের প্রবল বর্ষণে পদ্মা ভেসে যায়। পাঠান পাড়ার পুরাতন বাঁধ ভেঙ্গে পাঠান পাড়া, দরগাপাড়া ও হোসনীগঞ্জের বিস্তর ক্ষতি হয়। অত্র অঞ্চলের কাঁচা-পাকা বাড়ী ভুমিসাৎ হয়। অতঃপর ১৯৪৪ সালে রাজশাহী শহরে আরও দুটি বাঁধ নির্মিত হয়। পাঠান পাড়ার দক্ষিণে পাঠান পাড়া বাঁধ প্রায় ২,৪৫০ ফিট ও দরগা পাড়ার বাঁধটি প্রায় ৭৬৬ ফিট।

অতঃপর ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর আরও দুটি বাঁধ নির্মিত হয়েছে। একটি সোনাইকান্দীর বাঁধ ১০,৬০০ ফিট ও অপরটি কাজলার বাঁধ প্রায় ৩,৭৬০ ফিট।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে স্থানীয় প্রাচীন লোকের মুখে বর্তমান বাঁধের নীচে আরও একটি বাঁধের কথা শোনা যায়।

রাজশাহীর গাছপালা ও পশুপাখী :

পুরাতন নদীর তলদেশে, পুকুরে ও জলাভুমিতে চেপ্টা শেওলা জাতীয় ও অন্যান্য উদ্ভিদ দেখা যায়। তা ছাড়া নিম্নভূমিতে ও চর এলাকায় ঝাউ গাছ ও খাগড়া ও নল জাতীয় ঘাস প্রায়শঃ চোখে পড়ে। রাজশাহীতে কোন বন সম্পদ নেই বললেই চলে, তবে উঁচু ভুমিতে বাঁশ ও নানা জাতীয় ঘাস দেখা যায়। কলা, পিপল ও শিমুল গাছও দৃষ্টি গোচর হয়। রাজশাহী

জেলার নবাবগঞ্জ মহকুমায় অসংখ্য আমের বাগান আছে। রাজশাহীর আম খুব উৎকৃষ্ট মানের। রাজশাহীতে যথেষ্ট লিচু গাছও আছে। এককালে ঢাকা থেকে শত শথ নৌকা আম পরিবহণের জন্য পদ্মা ও মহানন্দা দিয়ে নবাবগঞ্জ যাতায়াত করতো। বর্তমানে রাস্তা ঘাটের উন্নতি হওয়ায় সেই ঢাকোয়াদের নৌকার বহর আর দেখা যায় না। বেশীর ভাগ আমই ট্রাক যোগে বিভিন্ন জেলায় বাহিত হয়।

গ্রামাঞ্চলে বাঁশ ও অসংখ্য আম-জাম-কাঁঠাল-বট্পাকুড়-খয়ের গাছ পরিলক্ষিত হয়। বরিন্দ অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে তাল গাছ, খেজুর গাছ ও দক্ষিণাঞ্চলে নারিকেল গাছ দেখা যায়। তা ছাড়া বাবুল ও বিভিন্ন ধরনের বরই গাছও দৃষ্ট হয়। বড় বড় রাস্তার পাশে শাল, মেহগিনি, শিশু, কোড়াই, নিম, শিমুল কদম, হিজল, বেল, পাঙ্গী, সেগুন, নিম গাছ জিলার সর্বত্রই জন্মে। গুলমোর, পামট্রি, ইউকেলিপটাস প্রভতি গাছপালাও লাগানো হচ্ছে।

বন্য পশু :

এককালে রাজশাহীর চর এলাকার ঝোপ-ঝাড়ে, ঝাউ বনে ও নল জাতীয় ঘাসের জঙ্গলে বুনো মহিষ দেখা যেত। বরিন্দ অঞ্চলে বাঘ, চিতা বাঘ, হরিণ, ও শূকর এখনও দৃষ্টি গোচর হয়। কাঠ বিড়ালী, বন্য শূকর, খরগোস ও রাজহাঁসও প্রচুর দেখা যায়। বনবিড়াল, শৃগাল ও খেঁকশিয়াল চর ও বরিন্দ অঞ্চলের ছোট খাট জঙ্গলে বাস করে। দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে বেজি, সজারু, শৃগাল দেখা যায়।

বর্তমানে লোক সংখ্যা বেড়ে যাবার ফলে অন্যান্য জেলার ন্যায় রাজশাহীতেও বিভিন্ন অঞ্চলের ঝোপ-জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে বসত বাড়ী নির্মিত হচ্ছে। ফলে উল্লিখিত অধিকাংশ জন্তুই এখন আর সচরাচর চোখে পড়ে না। যে ভাবে লোক বসতি বেড়ে বরিন্দ, চর ও বিল অঞ্চলে গ্রাম-গঞ্জ গড়ে উঠছে তাতে উল্লিখিত প্রাণীগুলি সংরক্ষণের যথাবিহিত ব্যবস্থা না করলে অচিরেই এই প্রাণীগুলির অস্তিত্ব লোপ পাবে বলে আশংকা হয়।

রাজশাহীর পাখী ও মৎস্য সম্পদ :

এখানকার লোভনীয় সম্পদ মৎস্য ও পাখীর কথা স্থানীয় লোকেরা কোন দিনই ভুলতে পারবেনা। এক সময় এখানকার পাখী ও মৎস্য বিক্রী করে প্রায় ১ লক্ষ লোক জীবিকা নির্বাহ করতো। চলনের পাখী ও মাছ বিভিন্ন স্থানে চালান যেত।

শীতকালে এখনও পদ্মার চরে অসংখ্য বুনোহাঁস ও বেলে হাঁস দেখা যায়। তা ছাড়া চলন বিলে, নওগাঁর ৬ মাইল দক্ষিণে দুবলহাটির বিলে ও মাধনগর রেল স্টেশনের কাছে হালতি বিলে এই সব বুনোহাঁস ও বেলে হাঁস দলবদ্ধ ভাবে বাস করে।

পদ্মার চরে অনেকে বুনো হাঁস ও বেলে হাঁস শিকার করেন। তা ছাড়া বক, কবুতর, টিয়া পাখী ও বাগাড়ী পাখী প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। একখনও রাজশাহীর হাটে-বাজারে ফাল্গুন চৈত্র মাসে প্রচুর পরিমাণে বাগাড়ী পাখী আমাদনী হয়ে থাকে। এককালে বিহার ও অন্যান্য স্থান থেকে শীতকালে এক শ্রেণীর লোক এসে চলন বিল এলাকা থেকে জাল দিয়ে ও ফাঁদ পেতে পাখী ধরে কলকাতায় চালান দিত।

রাজশাহী জেলায় প্রচুর নদী নালা ও খাল বিল থাকায় যথেষ্ট পরিমাণে মাছ পাওয়া যায়। পদ্মা ও আত্রাই নদীতে প্রচুর সুস্বাদু মাছ পাওয়া যায়। পদ্মার ইলিশ বহু খ্যাত। এখানে রুই,

কাতলা, কালবাউশ ও মৃগেল মাছও যথেষ্ট পাওয়া যায়। বোয়াল, ট্যাংরা, মলা মাছ প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়। বিল এলাকায় এই মাগুর ও জিঁওল মাছ পাওয়া যায়। দুবলহাটির বিলে প্রচুর পরিমাণে কই মাছ পাওয়া যেত। কথিত আছে দুবল হাটির বিলের মালিককে বছরে ২০,০০০ কই মাছ খাজনা হিসেবে দিল্লীর মোগল বাদশাকে দিতে হতো। উল্লেখ করা যেতে পারে বর্তমানে খরা, চাষের প্রয়োজনে জলাভূমি উদ্ধার ইত্যাদি কারণে মাছের নৈসর্গিক আবাস বিনস্ট হওয়ায় মাছের সে প্রাচুর্য আর নেই।

সরীসৃপ ও কুমীর :

বাংলাদেশের প্রায় সব ধরণের সাপই রাজশাহীতে দেখা যায়। বিষাক্ত সাপের মধ্যে, কোবরা প্রায় স্থানেই দেখা যায়। তাছাড়া ভাইপারও দেখা যায়। কোবরা অত্যন্ত বিষাক্ত ও হিংস্র প্রকৃতির সাপ। এই সাপ প্রায় ৭/৮ ফিট লম্বা হয়। তা ছাড়া আরও অনেক সাপ আছে, যে গুলি সাধরণতঃ জলে ও স্থলে উভয় স্থানেই বাস করে। এই সব সাপ গিরগিটি, ব্যাঙ, ইত্যাদি খেয়ে জীবন ধারণ করে। জলে বাস করা সাপ তত বিষাক্ত হয় না।

রাজশাহীর প্রধান প্রধান নদীতে সাধারণতঃ দু-ধরনের কুমীর দেখা যায়। প্রকৃত কুমীরের দৈর্ঘ্য প্রায় ১২ ফিট পর্যন্ত হয়ে থাকে। অন্য প্রকারের কুমীরকে ঘড়িয়াল বলা হয়ে থাকে। যার দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ ৮ ফুটের বেশী হয় না। এই ঘড়িয়াল মছ খেয়েই বেঁচে থাকে। তা ছাড়া প্রায় সব নদীতেই অসংখ্য কচ্ছপ দেখা যায়। এ সব প্রাণী সম্পদ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সহায়।

রাজশাহীর জলবায়ু :

রাজশাহীর জলবায়ু চরম ভাবাপন্ন না হলেও অন্যান্য জেলার তুলনায় কিছুটা শুষ্ক। যদিও রাজশাহীর নবাবগঞ্জ মহকুমায় কিছুটা চরম ভাবাপন্ন জলবায়ু পরিলক্ষিত হয়। সেখানে শীতকালে শীতের আধিক্য অনুভব করা যায়; আবার গ্রীষ্মকালে প্রখর তাপে ঘরের বাইরে বের হওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ে। অবশ্য দক্ষিণের সামুদ্রিক ঝড়, পূর্ব দিকের মৌসুমী বায়ুর প্রবল বেগ, উত্তরে হিমালয়াঞ্চলের প্রচণ্ড শীত কোনটাই রাজশাহীর উপর সরাসরি প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

বর্ষাকালে বায়ুর আর্দ্রতা কিছু বেশী থাকলেও সেপ্টেম্বর মাস থেকে তা কমতে অরম্ভ করে। জুন মাসে বায়ুর আর্দ্রতা থাকে প্রায় শতকরা ৮২। জুলাই-আগষ্ট ৮৩ ও সেপ্টেম্বর-অক্টোবর যথাক্রমে ৮২ ও ৭৮।

বায়ু প্রবাহ :

সাধারণত মার্চ থেকে গ্রীষ্মকাল আরম্ভ হয়। তখন থেকে খুব শুষ্ক দক্ষিণ পশ্চিমা ও পশ্চিমা গরম বাতাস বইতে আরম্ভ করে। মার্চ মাসের শেষ দিক থেকে আরম্ভ করে সমস্ত এপ্রিল মাস পর্যন্ত এই বাতাস প্রবাহিত হয়। এই সময় বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে এখানে অসহ্য ধুলিঝড় প্রবাহিত হয়। এপ্রিল-মে মাসে পদ্মার মিহি বালি এসে রাজশাহী শহরকে বালিতে আচ্ছাদিত করে ফেলে। পদ্মা রাজশাহীর দক্ষিণে হওয়ায় এবং মে মাসে দক্ষিণ থেকে বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় মে মাসের ধুলিঝড়ে রাজশাহীর জন জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। মৌসুমীর আগমনে দক্ষিণ পূর্ব দিক থেকে বাতাস বইতে আরম্ভ করে। তখন মাঝে মাঝে বৃষ্টি হওয়ায় জন জীবনে স্বস্তি ফিরে আসে।

তাপমাত্রা :

সাধারণত গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা বেশ কম বেশী হয়। মে মাসে কখনও কখনও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ১১০° ফরেনহাইট ও সর্ব নিম্ন ৭৮° ফারেনহাইট পরিলক্ষিত হয়। সাধারণতঃ এপ্রিল, মে ও জুন মাসে রাজশাহীর গড় তাপমাত্রা থাকে ৮৭° ফারেনহাইট, যদিও জানুয়ারী মাসে এই গড় তাপমাত্রা থাকে মাত্র ৬৩° ফারেনহাইট। এপ্রিল সর্বোচ্চ গড় তাপমাত্রা থাকে ৯৬° ফারেনহাইট এবং সর্ব নিম্ন গড় তাপমাত্রা থাকে ৭৮° ফাঃ। জানুয়ারী মাসে সর্ব নিম্ন গড় তাপমাত্রা থাকে মাত্র ৫৯° ফারেনহাইট।

বৃষ্টিপাত :

সাধারণত নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত রাজশাহীতে বৃষ্টিপাত হয় না বললেই চলে। পরে অবশ্য মার্চ এপ্রিল মাসে কিছু বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। জুন, জুলাই, আগষ্ট, সেপ্টেম্বর এই চার মাসই রাজশাহীতে সবচেয়ে বেশী বৃষ্টি হয়। গড়ে প্রতি মাসে প্রায় ১০ ইঃ করে। এপ্রিল, মে ও অক্টোবর মাসে কখনও কখনও ভারি ধরণের বৃষ্টিপাত হয়। এই সময়ের বৃষ্টিকে কাল বৈশাখী ঝড় বৃষ্টি ও অক্টোবর মাসের ঝড় বৃষ্টিকে আশ্বিনের ঝড় বৃষ্টি বলা হয়ে থাকে। স্থানীয় ভাবে সৃষ্ট ঘূর্ণিবাত্যের ফলেই এই ধরণের ভারী বৃষ্টিপাত হয়। আশ্বিন মাসের ঝড় বৃষ্টি কখনও কখনও কয়েক দিন ধরে চলতে থাক। মৌসুমী ঋতুতে বায়ু মণ্ডলে প্রচুর জলীয় বাষ্প থাকে। তা ছাড়া এখানে সেখানে প্রায়শঃ নিম্ন চাপেব সৃষ্টি হওয়াতে বেশী বৃষ্টিপাতের সহায়ক হয়। রাজশাহী জেলার গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ৫৭´´। ১৯৬১ সালে সবচেয়ে বেশী প্রায় ১০´´ বৃষ্টিপাত হয়েছিল এবং ১৯৭৩ সালে রাজশাহী সদর মহকুমায় সবচেয়ে কম, মাত্র ৩২´´ বৃষ্টি হয়েছিল। নিম্ন বর্ণিত চার্টে রাজশাহীর বার্ষিক গড় বৃষ্টিপত দেখনো হযেছে। (বছর ১৯০২—৬১)।

মাস	স্থানের নাম ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ	
	নওগাঁ	রাজশাহী
জানুয়ারী	০.২৮	০.৫৪
ফেব্রুয়ারী	০.৬৫	০.৬৪
মার্চ	০.৮৩	১.১৫
এপ্রিল	১.৯৫	১.৪৯
মে	৫.৬৭	৫.১৪
জুন	১১.৯৪	১০.৪৩
জুলাই	১২.২৯	১১.৭৮
আগষ্ট	১১.৩০	১০.৪০
সেপ্টেম্বর	১০.২৪	৮.৮৬
অক্টোবর	৫.৬২	৪.৪৫
নভেম্বর	০.৪৯	০.৪৬
ডিসেম্বব	০.০৬	০.১২
বার্ষিক গড়–	৬০.৮৯´´	৫৭.৩৯´´

প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে রাজশাহী :

বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন যুগে রাজশাহী বেশ কিছু প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষ করে দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও বন্যা কবলিত হয়েছে। কতকগুলো দুর্ভিক্ষ ও বন্যায় রাজশাহীর জন-গণের জীবনে বয়ে এনেছিল সীমাহীন দুঃখ দুর্দশা :

পূর্বেই বলা হয়েছে রাজশাহী বরিন্দ অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট মানের আমন ধান উৎপন্ন হয়। বরিন্দ অঞ্চলের ধান উৎপাদন সম্পূর্ণ নির্ভর করে আকাশের বৃষ্টির ওপর। কখনও কখনও অনাবৃষ্টিতে এই ধানের উৎপাদন একেবারে কমে যায়। ফলে খাদ্যাভাব দেখা দেয। অন্য দিকে রাজশাহীর বিল অঞ্চলের ফসলও নির্ভর করে এই বৃষ্টির ওপর। অনেক সময় বিল অঞ্চলে আধা-পাকা ধান যখন কৃষকের ঘরে প্রায় উঠি উঠি করে সেই মুহূর্তে অসময়ে বন্যা এসে এ সব খাল বির ভরে ফেলে, এবং মাঠ ভরা সোনাব ফসলকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ফলে মানুষের দুঃখ দুর্দশার সীমা থাকেনা। নদীর চর অঞ্চলে বিশেষ কবে চারঘাট, লালপুর ও বোয়ালিয়া থানা অঞ্চলে যথেষ্ট আউশ ধান হয়। কখন বা অনাবৃষ্টিতে, কখনও বা অতিবৃষ্টিতে এই আউশ ফসলের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। ফলে জনজীবনে নেমে আসে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া।

রাজশাহীর ১৭৬৯-৭০ সালের দুর্ভিক্ষের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। পুর্ণিয়া, রাজমহল, বীরভূম ও বাজশাহীর কতকাংশ এই দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হয়েছিল। এই দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে রাজশাহীব মানুষ যে দুঃখ দুর্দশায় পতিত হযেছিল, তার বিস্তারিত ইতিহাস পাওয়া না গেলেও, এই টুকু জানা যায় যে সে বছর আউশ ধানের উৎপাদন একেবাবে কম হয়েছিল। ফলে অন্যান্য জেলা থেকে বিশেষ করে মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে খাদ্য শস্য নিয়ে এসে দুর্ভিক্ষ কবলিত জেলাগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থাও হয়েছিল। চালেব দাম বেড়ে নাটোরে টাকায় ১৮ সের চাল বিক্রী হতো এবং মুর্শিদাবাদে চালের মূল্য ছিল টাকায় ৩০ সের।

১৭৭০ সালের জুন মাসে মোগল দরবারে বর্ণিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীব একজন কর্মচারীব মুখ থেকে শোনা যায় যে, সে বছর মানুষের দুঃখ দুর্দশার সীমা ছিল না। এমন কি অনেকে মরা জন্তুর মাংস খেতেও দ্বিধা বোধ করেনি।

এরপর প্রায় ১০০ বছরের ব্যবধানে অর্থাৎ ১৮৭৪ সালে রাজশাহী জেলা আরও একবার দুর্ভিক্ষের কবল পতিত হয়। অনাবৃষ্টি ছিল সে বছর দুর্ভিক্ষের মূল কারণ। নাটোরে যেখানে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত হতো প্রায় ৬১´´ ইঃ, সেখানে ১৮৭৩ সালে বৃষ্টি হয়েছিল মাত্র ৪৩´´ ইঃ। সদর মহকুমাতে যেখানে বৃষ্টিপাত হয় ৫৯´´ ইঃ, সেখানে হয়েছিল মাত্র ৩২´´ ইঃ।এই অনাবৃষ্টির ফলে সব আউশ ধান শুকিয়ে মরে গিয়েছিল। ফলন হয়েছিল শতকরা ৫০ ভাগেবও কম। যে আমন ধানর উপর রাজশাহীবাসী অধিকাংশে নির্ভরশীল, সে আমন ধানের ফলন হয়েছিল শতকরা মাত্র ১৯ ভাগ।

কাজেই চালের দাম আস্তে আস্তে বাড়তে লাগলো। ১৮৭৪ সালের জানুয়ারী মাসে চালের দাম ছিল টাকায় ১২ সের। (অর্থাৎ সাধারণ মূল্যের প্রায় দ্বিগুন)। পরে মে মাসের দিকে সেই চালের দাম বেড়ে টাকায় ৭.৫ সের হয়ে গেলে, মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। অন্যান্য জেলা থেকেও খাদ্য শস্য আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মানুষ খাদ্যাভাবে ছুটাছুটি করতে থাকে। অনেকে ছেলেমেয়ে নিয়ে অনাহারে দিন কাটাতে লাগলো। এই দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর সংখ্যা সঠিক ভাবে জানা না গেলেও বেশ কিছু লোক খাদ্যাভাবে অকালে মৃত্যু বরণ করেছিল।

১৮৯৭ সালের ভূমিকম্প ও দুর্ভিক্ষ :

১৮৯৭ সালের দুর্ভিক্ষ তত মারাত্মক রূপ ধারণ করেনি। রাজশাহী জেলা কিছুটা এই দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হয়েছিল। সে বার তুলনামূলক ভাবে কম বৃষ্টি হওয়ায় এবং অসময়ে বন্যা এসে পড়ায় ফসলের হানি হয়েছিল। ফলে চালের দাম বেড়ে টাকায় সাড়ে সাত সের থেকে ৬ সের পর্যন্ত হয়েছিল। সে বছর বেশী লোক মারা না গেলেও অনেকে ওল কচু, মান কচু, শাক পাতা ইত্যাদি খেয়ে জীবন ধারণ করে ছিল।

তবে রাজশাহী জেলা সব চেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ১৯৮৭ সালের (বাংলা ১৩০৪ সালের) ভুমিকম্পে। এই ভুমিকম্প ১৩০৪ সালের বড় ভূমিকম্প নামে খ্যাত। এই ভূমিকম্পে রাজশাহী তথা সমগ্র বাংলাদেশের বিস্তর ক্ষতি হয়। রাজশাহী জেলার রাজা-জমিদার দের অধিকাংশ পাকা বাড়ী ভেঙ্গে চূর্ণ বিচুর্ণ হয়ে যায়। নীল ও রেশম কুঠিগুলি ধুলিসাৎ হয। নাটোর ও রাজশাহীর বহু ইমারত ধ্বংস স্তুপে পরিণত হয়। এই সর্বনাশা প্রাকৃতিক দুর্যোগে রাজশাহী জেলার স্থাপত্য শিল্পের বিস্তর ক্ষতি হয়। কতক চূর্ণ বিচুর্ণ হয়েছে, কতক চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এই ভূমিকম্পে রাজশাহীর সরকারী ও বেসরকারী বিস্তর ধন সম্পত্তি, প্রাচীন কাগজ পত্র ও রেকর্ড বিনষ্ট হয়ে গেছে।

সমগ্র জেলার বিভিন্ন স্থানে ভূমি ফেটে রাশি রাশি বালি উঠে স্তূপীকৃত হয়। রাস্তা-ঘাট ফেটে যায়। কোথাও কোথাও অর্ধ মাইল দীর্ঘ ফাটল ধরে। এই সব ফাটলের ফাঁক ছিল প্রায় ৯/১০ ফিট মত। এই সব ফাটলের জন্য রাস্তা-ঘাট বন্ধ হয়ে যায়, এবং নীচ থেকে পানি ও বালি উঠে শস্যাদির বিস্তর ক্ষতি সাধন করে। আত্রাই ও বড়াল রেলওয়েব্রীজ ভীষণ ভাবে ক্ষতি গ্রস্ত হয়, এবং বহু কালভার্ট ও সাঁকো বিনষ্ট হয়।

রাজশাহী শহর, নাটোর, নওগাঁ ও নবাবগঞ্জ মহকুমার মনাকসার বহু পাকা বাড়ীর প্রাঙ্গণ ও রাস্তা ফেটে পানি ও বালুকা রাশি বের হয়। অসংখ্য প্রকাণ্ড বৃক্ষ উপড়ে পড়ে।

১৩০৪ সালের ভুমিকম্পের পর থেকে পদ্মার গর্ভে নবীনগর, কাঁঠাল বাড়িয়া, বশরী, হাবাসপুর প্রভৃতি পাকা বাড়ীগুলি ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। এই ভূমিকম্পে কত লোক যে দালান চাপা পড়ে মৃত্যু মুখে পতিত হয় তার কোন হিসেব নেই। তবে সরকারী বিবরণে মাত্র ৯ জনের মৃত্যু সংবাদ ও কিছু সংখ্যক আহত হওয়ার খবর জানা যায়।

১৯৪২-৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ ও মহামারী :

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালে ১৯৪১-৪২ সালে কলকাতায় জাপানী বিমান থেকে বেশ কয়েকবার বোমা বর্ষিত হয়। ফলে কলকাতা বাসী প্রাণ ভয়ে বহু ক্ষয় ক্ষতি স্বীকার করে ছত্রভঙ্গ হয়ে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। নাগরিকদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি হয়। সরকারী ও বেসরকারী কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর অস্থায়ী ভাবে বাংলার বিভিন্ন জেলায় স্থানান্তরিত হয়। তৎকালীন বাংলা সরকারের স্বায়ত্ব শাসন বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ, সমবায়, রেজিষ্ট্রেশন ও চিকিৎসা বিভাগ এই রাজশাহী শহরে স্থানান্তরিত হয়। এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নানা স্থানে খাদ্য ও অর্থ সংকট দেখা দেয়। এই সংকট কালে বাংলার প্রতিটি জেলা মারাত্মক দূর্ভিক্ষের কবলে পতিত হয়। ডাস্টবিন থেকে মানুষ ও কুকুরকে একই সংঙ্গে উচ্ছিষ্ট খাদ্য নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে দেখা গিয়েছে। খাদ্যাভাবে দেশে হাহাকার উঠে। পল্লীর বহু গরীব-দুঃখী অসহায় জনগণ বন জঙ্গলের কচু, শাক, পাতা ইত্যাদি অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে অকালে প্রাণ হারায়। নানা স্থানে লঙ্গর খানা খুলে এক বেলা খিচুড়ী খাওয়ান হতো। এই দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ

লোক প্রাণ হারায়। পরে অবশ্য বাংলার বিভিন্ন শহরে কন্‌ট্রোল প্রথা প্রবর্তিত হলে, রাজশাহী শহরেও তখন রেশন প্রথা চালু হয়।

এই ঐতিহাসিক দুর্ভিক্ষের কারণ অনুসন্ধান করলে জানা যায় যে, তৎকালীন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শাসক গোষ্ঠী ও মুনাফালোভী শোষক সম্প্রদায় লক্ষ লক্ষ মণ ধান-চাল গোলাজাত করে রাখায় ও যুদ্ধে সরবরাহের জন্য বিদেশে রপ্তানী ও অবস্থার প্রতিকূলে তা বিনষ্ট করে ফেলার দরুন এই ভয়াবহ ও জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তা ছাড়া ১৯৪২ সালে রাজশাহীতে অনাবৃষ্টির জন্য বরিন্দ অঞ্চলের আমন ধানের উৎপাদন খুবই কম হয়েছিল।

১৯৪২ সালে রাজশাহী শহর ও নবাবগঞ্জ মহকুমা কলেরায় আক্রান্ত হয়। এই কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে কত লোক যে মৃত্যু বরণ করে ছিল তার ইয়ত্তা নেই। সে বছর নবাবগঞ্জ মহকুমার এমন কোন বাড়ী ছিল না যে বাড়ীতে কোন না কোন একজন কলেরায় আক্রান্ত হয়নি। সেই ভয়াবহ মহামারীর কথা এখনও অনেকের মনে আছে।

১৯৫৮ সালে আরও একবার রাজশাহীর সদর মহকুমা ও নবাবগঞ্জ মহকুমা গুটি বসন্তের কবলে পতিত হয়েছিল। এই মারাত্মক ব্যাধি মহামারী আকারে দেখা দেয়, এবং রাজশাহী সদর ও নবাবগঞ্জ মহকুমায় মারাত্মক আকার ধারণ করে। নবাবগঞ্জ মহকুমায় গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে গিয়েছিল। বসন্ত কবলিত এলাকায় জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছিল।

বন্যার কবলে রাজশাহী :

১৮৩৮, ১৮৫৬, ১৮৬৫ ও ১৮৭১ সালে রাজশাহীতে প্রবল বন্যা হয়। ১৮৫৬ সালের বন্যায় রাজশাহীর পদ্মায় যে টুকু বাঁধ ছিল তা প্রায় নিশ্চিহ্ন হবার উপক্রম হয়। এই বন্যায় ফসলের যথেষ্ট ক্ষয় ক্ষতি হয়।

১৮৬৫ ও ১৮৭৯ সালের বন্যায় ভীষণ জল বিল্পব ঘটে, যার ফলে পদ্মা ভেসে যায়। কয়েক স্থানে বাঁধ ভেঙ্গে শহরে পানি প্রবেশ করে এবং কাঁচা বাড়ী ঘর ভেঙ্গে যায়। লোক জন তাদের বাড়ী ঘর ছেড়ে গৃহপালিত পশুসহ উঁচু স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে। বন্যা নেমে গেলে কলেরা মহামারীতে বহু লোকের প্রাণ হানি ঘটে। এই বন্যায় শস্যাদির প্রচুর ক্ষতি হওয়ায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।

এই বন্যায় রাজশাহী শহরের মধ্য স্থলে প্রবাহিত বরাহী নদী পদ্মার বালুকা রাশির চাপে পড়ে নালায় পরিণত হয়। এই নালাটি এখন ১ নম্বর ড্রেন নামে খ্যাত। এক সময় এর প্রবল স্রোত আজকের রাজশাহী শহরের মধ্য দিয়ে বায়া হয়ে নওহাটাতে পতিত হতো। এখনও এই নদীর মরাখাত সিরইল থেকে নওহাটা পর্যন্ত বর্তমান রয়েছে।

এর পর ১৯৩৮ সালের প্রবল বর্ষণে পদ্মা ভেসে যায়। পাঠান পাড়ার পুরাতন বাঁধ ভেঙ্গে পাঠান পাড়, দরগাপাড়া, হোসনীগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের বিস্তর ক্ষতি হয়। এই সব স্থানের বহু কাঁচা ও পাকা বাড়ী ভূমিসাৎ হয়। (১৯৪৪-এ সেখানে বাঁধ নির্মাণের ব্যবস্থা করা হয়)। ১৯৩৮ সালের (বাংলা ১৩৪৫) বন্যায় নবাবগঞ্জ মহকুমা ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উক্ত মহকুমার দক্ষিণ পশ্চিমাংশের সমগ্র এলাকাটাই প্লাবিত হয়। মহাডাঙ্গার ব্রীজ থেকে আরম্ভ করে সমস্ত নবাবগঞ্জ শহর পারি নীচে তলিয়ে যায়। ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। সেখানে মাঝে মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করতে দেখা যেত। ১৯৩৮ সালের বন্যায় নবাবগঞ্জ মহকুমায় শস্য ও গবাদি পশুর বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল।

১৯৬৮ সালের বন্যা ও ১৯৬৯ সালের ঘূর্ণিঝড় :

১৯৬৮ সালের জুন মাসের শেষের দিকে প্রায় একটানা ১০ দিন ধরে বৃষ্টি হওয়ার ফলে নাটোর ও নওগাঁ মহকুমা বন্যায় আক্রান্ত হয়। এই বন্যায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সিংড়া, গুরুদাসপুর, রাণীনগর আত্রাই ও নাটোর থানা। প্রায় ৫০,০০০ একর জমির ফসল পানির নীচে তলিয়ে যায় এবং আউশ ও আমন ফসলের প্রায় অর্ধেকেরও বেশী নষ্ট হয়।

১৯৬৯ সালের ১৭ই এপ্রিল রাজশাহীর ওপর দিয়ে প্রবল ঘূর্ণিঝড় বয়ে যায়। এই ঘূর্ণিঝড়ের ফলে হাজার হাজার বাড়ী ঘর ধূলিসাৎ হয় এবং লক্ষ লক্ষ লোক গৃহহীন হয়ে পড়ে। প্রায় ২৭ জন লোক অকাল মৃত্যু বরণ করেন ও প্রায় ১৫০ জন আহত হয়। এই ঘূর্ণিঝড়ে পবাথানার সোনাইকান্দী গ্রাম খুব বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তা ছাড়া নাটোর, সিংড়া ও গুরুদাসপুর থানার যথেষ্ট ক্ষয় ক্ষতি হয়। কিছু লোক হতাহতেরও খবর পাওয়া যায়। শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ কাঁচা ঘর বাড়ী ভুমিসাৎ হয় এবং অনেক মাল বোঝাই নৌকা ডুবে যায়। রাস্তা ঘাট বন্ধ হয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

১৯৭০ ও ১৯৭১ সালের বন্যা :

১৯৭০ সালে সমগ্র বাংলাদেশে ভীষণ বন্যা হয়। এই বন্যায় বহু ব্রীজ ও কালভার্ট নষ্ট হয়ে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায় এবং জান মালের যথেষ্ট ক্ষয় ক্ষতি হয়। ১৯৭০ সালের বন্যায় রাজশাহী তুলনা মূলক ভাবে কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। লালপুর থানার ৩টি ও বড়াইগ্রাম থানার ৬টি ইউনিয়ন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বহু ঘব বড়ী নষ্ট হয়ে যায় এবং বেশ কিছু লোককে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়া হয়। তাছাড়া গঙ্গ নদীর ভাঙ্গনে কয়েকটি গ্রাম পানি গর্ভে নিমজ্জিত হয়।

১৯৭১ সালের প্রবল বর্ষণে রাজশাহী মারাত্মক ভাবে বন্যায় আক্রান্ত হয়। নবাবগঞ্জ মহকুমার দক্ষিণ পশ্চিমের অধিকাংশ অঞ্চল পানির নীচে তলিয়ে যায়। পদ্মার বাঁধ প্রায় ভাঙ্গার উপক্রম হয়। পদ্মার সমস্ত বাঁধ বরাবর তৎকালীন পাক সেনাবাহিনী ঘাঁটি করেছিল। ফলে সে বছর পদ্মার বন্যা কবলিত বাঁধ দেখা কারও ভাগ্যে ঘটেনি। মানুষ ১৯৭১ এর যখন স্বাধীনতা সংগ্রামে এত বেশী ছুটাছুটি করেছে, এবং এত বেশী ত্রাসের মধ্যে ছিল যে বন্যার ক্ষয় ক্ষতি সম্পর্কে কেউ হিসেব করে দেখেনি। স্বাধীনতা যুদ্ধের ক্ষয় ক্ষতির তুলনায় এই বন্যার ক্ষয় ক্ষতি নগন্যই ছিল বলতে হবে।

রাজশাহীতে বন্যার আক্রমণ এক নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে পদ্মার ভাঙ্গন রাজশাহী বাসীর কাছে এক বিরাট সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে যাতে করে প্রতি বছরই রাজশাহী বাসীরজান মাল হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা একান্ত প্রয়োজন।

রাজশাহী জিলা

স্কেল ০ ৮ ১৬ মাইল

রাজশাহীর ঐতিহাসিক পরিচয়

বৃটিশ রাজত্বের আমলে ইংরেজীতে রাজশাহী (Rajshahı) শব্দের বানান বিভিন্ন রেকর্ড পত্রে নিম্নরূপ দেখা যায় :

(ı) Rajeshy, Rajeshye, Rajesshahy, Rajeshaye,

(ii) Radshy, Radshi, Radshahy, Radshye, Radshay,... Raudshehi,

(iıı) Raujihy, Raujeshahy, Ranjshahy,

(ıv) Raajshahy, Raajshiey and

(ıv) Rajshahy, and Rajshy.

রাজশাহীর প্রাচীন ইতিহাস :

এত অল্প পরিসরে রাজশাহীর প্রাচীন ইতিহাস বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তবুও অতি সংক্ষেপে রাজশাহীর প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে দু-চার কথা বলা হলো।

রাজশাহীর প্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সমগ্র উত্তর বঙ্গ (বর্তমানে রাজশাহী বিভাগ) সে কালের পৌণ্ড্র বর্ধণের অন্তর্গত ছিল। এই পৌণ্ড্র বর্ধণের কেন্দ্র স্থল ছিল বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রী। পূর্বে করতোয়া নদী, পশ্চিমে মহানন্দা, ও দক্ষিণে পদ্মা এবং উত্তরে হিমালয় পাদদেশের টেরাইভূমি, এই চতুঃসীমা বেষ্টিত ভুমি ভাগই বরেন্দ্রভুমি। এই বরেন্দ্রীর প্রাচীনতম নামই পৌণ্ড্র বা পৌন্ড্র বর্ধণ। এই পৌণ্ড্র বর্ধণ অর্থাৎ বরেন্দ্র বা বরিন্দের দক্ষিণাংশের সীমান্তবস্থিত ভূমি ভাগই হলো রাজশাহী জেলা।

খৃষ্ট পূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে পৌণ্ড্র বর্ধণ মৌর্য সাম্রাজ্য ভুক্ত ছিল। এবং বগুড়া শহরের ৭ মাইল উত্তরে মহাস্থানে এই মৌর্য শাসনের মর্মকেন্দ্র ছিল। উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে অশোক স্তম্ভের অস্তিত্ব থেকেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তা ছাড়া বগুড়ার মহাস্থান গড়ে একটি পুরাতন ব্রাহ্মী লিপি আবিষ্কৃত হওয়ায় তা আরও জোরালো ভাবে সমর্থিত হয়েছে।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পূত্র প্রথম কুমার গুপ্তের রাজত্ব কাল থেকে পঞ্চম শতব্দী পর্যন্ত বাংলার গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল এই পৌণ্ড্র বর্ধণ। তখন রাজশাহী জেলা এই পৌণ্ড্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে শশাঙ্ক নামে এক শক্তিশালী রাজা বাংলার শাসন ভার গ্রহণ করেন। তারপর অবশ্য এই অঞ্চলের শাসনভার হর্ষবর্ধণের হাতে চলে যায়। হর্ষবর্ধণই উত্তর ভারতের শেষ হিন্দু অধিপতি।

হর্ষ বর্ধণের রাজত্বকালে বিখ্যাত চীন পর্যটক 'হিয়েন সিয়াং' (৬২৯-৬৪৫) ভারত আগমন করেন। তিনি সম্ভবতঃ ৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে পুণ্ড্র বর্ধণ (মহাস্থান) ভ্রমণ করেন। তিনি রাজা শশাঙ্ককে কর্ণসুবর্ণের (মুর্শিদাবাদ) অধিপতি বলে উল্লেখ করেন। পরিব্রাজক 'হিয়েন সিয়াং' রাজশাহীর দক্ষিণতম সীমান্তে গোদাগাড়ী ও নবাবগঞ্জের মধ্যবর্তী কোন এক স্থানে গঙ্গা অতিক্রম করে পুণ্ড্র বর্ধণে প্রবেশ করেছিলেন। পৌণ্ড্র বর্ধণ ভ্রমণ কালে তিনি সেখানে শতাধিক দেবালয় এবং ২০টি সংঘারামে তিন সহস্রাধিক মহাস্বামী-হিনযানী ভিক্ষু দেখতে পান।

পাল বংশের রাজত্ব কাল :

৭৫০ থেকে ১১৬০ শতক পর্যন্ত পৌণ্ড্র বর্ধণে পালরাজবংশ রাজত্ব করেন। রাজশাহীর ইতিহাসে পালদের রাজত্বকাল এক গৌরবময় যুগ। কেননা তাঁরা এই বরেন্দ্র অঞ্চলেই (পৌণ্ড্র

বর্ধণে) বসবাস করতেন। এই অঞ্চলই তাঁদের প্রশাসনের প্রাণ-কেন্দ্র ছিল। আমরা এ পর্যন্ত পাল বংশের ১৭ জন রাজার কথা জানতে পারি। রাজা গোপালদেব পাল, পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম রাজা। সম্ভবতঃ মদন পাল এই বংশের সর্বশেষ অধিপতি।

রাজা গোপালদেব পালের পুত্র ধর্মপাল এক শক্তিশালী অধিপতি ছিলেন। তিন তাঁর পিতার ন্যায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। রাজা ধর্মপাল বিক্রমশীলার বিখ্যাত বৌদ্ধ মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বরেন্দ্র ভূমির সোমপুরীতে বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। যার ধ্বংসবশেষ রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরে আজও বিদ্যমান। ধর্মপাল একজন খ্যাতনামা লেখক ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। ধর্মপালের পুত্র দেবপালও একজন ক্ষমতাশালী ও সুযোগ্য রাজা ছিলেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠ পোশাক ছিলেন।

পালবংশের দ্বাদশ রাজা দ্বিতীয় মহীপাল এক জন স্বেচ্ছাচারী ও অযোগ্য রাজা ছিলেন। একাদশ শতকের মধ্য ভাগে তাঁর স্বেচ্ছাচারিতা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে চতুর্দিকে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠে। এই বিদ্রোহের নেতৃত্বে ছিলেন দিব্যোক নামে এক কৈবর্ত। সামন্ত বীর দিব্যোকের নেতৃত্বে মহীপালের সামন্তদের সঙ্গে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মহীপাল পরাজিত ও নিহত হন। যুদ্ধে মহীপাল নিহত হলে, সামন্তগণ ও অন্যান্য প্রজারা দিব্যোককে গৌড় সিংহাসনে (১০৭৫ খ্রীঃ) অভিষিক্ত করেন। দিব্যোক মহীপালের পিতার প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তারপর দিব্যোকের ভ্রাতুষ্পুত্র ভীম বরেন্দ্রীর অধিপতি হন।

পরে অবশ্য মহীপালের ভ্রাতা রামপাল কৈবর্ত রাজের হাত থেকে আবার সিংহাসন উদ্ধার করেন। এই রামপালের আমলেই বৌদ্ধ ধর্মের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়।

পাল বংশের রাজারা ধার্মিক ও ন্যায় পরায়ণ ছিলেন এবং তাঁরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি তাঁদের অনাদর ছিল না।

সেন আমলের পৌণ্ড্রবর্ধণ : (১১৬০-১২০৪ খৃঃ)

দাক্ষিণ্যতা কর্ণাটদেশীয় চন্দ্রবংশীয় সামন্তসেন বৃদ্ধ বয়সে পশ্চিম বাংলার 'রাঢ়' দেশে গঙ্গা নদীর তীরে আগমন করেন। সামন্ত সেনের পুত্র হেমন্ত সেন। হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেনই সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা ও সর্ব প্রথম রাজা। তিনি পাল বংশের মদন পালদেরকে বিতাড়িত করেন। রাজা বিজয় সেন রাজপুর বোয়ালিয়া থেকে গোদাগাড়ীর দিকে ৯ মাইল দূরে বিজয়নগরে তাঁর রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। বিজং নগরের ধ্বংসাবশেষটিতে রাজা বিজয় সেনের রাজধানী নির্দেশিত হয়ে থাকে। পরে অবশ্য তাঁর উত্তর সুরীরা লক্ষণ বতী বা গৌড়ে তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

বিজয় সেনের পর তাঁর পুত্র বল্লাল সেন এবং তৎপুত্র লক্ষণ সেন ১২০৩ শতক পর্যন্ত গৌড় বঙ্গে রাজত্ব করেন। পালেরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু সেনেরা বৌদ্ধ ধর্মের পরিবর্তে হিন্দু ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতে লাগলেন। এই বল্লাল সেনই গৌড় বঙ্গের ব্রাহ্মণ কায়স্থগণের কুল প্রথা প্রবর্তন করেন। সেন বংশের শেষ রাজা লক্ষণ সেন ১১৭৮ সাল থেকে ১২০৬ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি একজন বিদ্যোৎসাহী ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি জয় দেবের এক জন বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

বারেন্দ্র অঞ্চলে সেনদের রাজত্বকাল খুব বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খালজী বরেন্দ্র ভূমি জয় করলে সেন বংশের রাজত্বের অবসান ঘটে।

মধ্য যুগ (১২০১-১৫৭৫) : সুলতান আমলের বঙ্গদেশ :

মালিক ইখ্‌তিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখ্‌তিয়ার খালজী অকস্মাৎ আক্রমণ চালিয়ে লক্ষণ সেনকে পরজিত করেন। বাংলার বৃদ্ধ হিন্দু রাজা লক্ষণ সেন পূর্ব বাংলায় পালিয়ে যান (১২০৩ খৃঃ) এবং ১২০৬ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত অবস্থান করেন। তার পর মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী ঐতিহাসিক গৌড় শহরসহ বরেন্দ্র অঞ্চল দখল করেন। তিনি তাঁর নামে খোৎবা পাঠ করান এবং রাজমুদ্রা প্রচার করেন। তৎপর তিনি রাজধানীতে মসজিদ, মাদ্রাসা, বিশ্রাম স্থল প্রভৃতি স্থাপন কবেন। ডঃ কানুনগোর মতে মালিক ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখ্‌তিয়ার খলজীই বাংলাব মধ্য যুগের ইতিহাসের স্রষ্টা।

বিজিত রাজ শাসন ব্যবস্থার সুবিধের জন্য বখতিয়ার রাজ্য মধ্যে দুটি ভাগ করেন। বরেন্দ্র ভূমি নিয়ে এক ভাগ যার রাজধানী ছিল দেবীকোট বা দেব কোট (বর্তমানে পশ্চিম দিনাজপুর) এবং অন্য ভাগের বাজধানী ছিল লাখনেতিতে (লক্ষণাবতী)। সম্ভবতঃ বরেন্দ্র ভূমির অংশ হিসেবে এই রাজশাহী ভূমিভাগের বহুলাংশ দেবী কোর্ট শাসন কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১২০৭ সালে মুহম্মদ বখ্‌তিয়ার খালজীর মৃত্যুর পর মুহম্মদ শিরন খলজী নামক তাঁর এক জন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে লক্ষণাবতী বা গৌড়ের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। সুলতান আলাউদ্দিন নাম ধাবণ করে তিনি স্বাধীন ভাবে বাজ্য পরিচালনা করেন। কিন্তু তিনি এক বছরের বেশী গৌড়ের ওপব কর্তৃত্ব রাখতে পারেননি।

মাত্র এক বছর পর আলী মর্দান দিল্লীর সুলতান কুতুব উদ্দিন আইবেকের কাছ থেকে গৌড়ের রাজ প্রতিনিধিত্ব লাভ করেন। কিন্তু সুলতানের মৃত্যুর পর আলী মর্দান সুলতান আলাউদ্দিন উপাধি ধারন করে স্বাধীন ভাবে রাজ্য পরিচালনা করেন। তাঁর স্বেচ্ছাচারিতায় বিরক্ত হয়ে তাঁর বিরোধী আমীরগণ তাঁকে হত্যা করেন এবং হুসামুদ্দিন ইউয়াজ খলজীকে তাঁদের শাসন কর্তা নিযুক্ত করেন। তিনি সুলতান গিয়াস উদ্দিন ইউয়াজ খলজী নাম ধারণ করে প্রায় ১৪ বছর লক্ষণাবতী রাজ্য শাসন করেন। তিনি দেবী কোট থেকে গৌড়ে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ১২২৭ সালে তিনি সুলতান ইলতুৎমিশের পুত্র নাসিরুদ্দিনের হাতে পরাজিত ও নিহত হন।

১২২৭-১২৮১ সাল পর্যন্ত ১৪ জন গভর্ণর লক্ষণাবতীতে ক্ষমতাসীন থাকেন। সুলতান বলবন ব্যক্তিগত ভাবে বাংলা আক্রমণ করেন এবং সর্ব শেষ গভর্ণর সুলতান মুগীসুদ্দিন তুগরীলকে পরাজিত ও হত্যা করেন। তিনি তাঁব কনিষ্ঠ পুত্র বুগরা খানকে বাংলার গভর্ণর নিযুক্ত করেন। কিন্তু বুগরা খান স্বাধীনতা ঘোষণা করে সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহ নাম ধারন করেন। লক্ষণাবর্তী ১৩২৪ সাল পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ভাবে স্বাধীনতা ভোগ করতে থাকে। পরে সুলতান গিয়াস উদ্দিন তোঘলক বাংলাকে একটা প্রদেশে রূপান্তরিত করেন।

১৩৪২ সালে হাজী ইলিয়াস শাহ্ স্বাধীন সুলতান হিসেবে লক্ষণাবর্তীর সিংহাসনে আরোহন করেন। মুহম্মদ তোঘলকের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সোনার গাঁয় ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ্, এবং পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গে আলাউদ্দিন আলী শাহ্ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই ভাবে বঙ্গদেশ দুই সুলতানের অধীন দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। ১৩৪৩ সালে ইলিয়াস শাহ্ স্বীয় প্রভু আলাউদ্দিন শাহ্‌কে হত্যা করে পূর্ব বঙ্গ দখল করেন এবং উভয় বঙ্গ যুক্ত করেন। তাঁর বংশ ইলিয়াস শাহী বংশ নামে পরিচিত। ইলিয়াস শাহ্ রাজধানী পাণ্ডুয়াতে পরলোক গমন করেন। এই বংশের সুলতান গিয়াস উদ্দিন আযম শাহ্ এক জন পরম ধার্মিক ও ন্যায় পরায়ণ নৃপতি

ছিলেন। 'ইলিয়াস শাহী' বংশের সুলতান শামসুদ্দিনকে পরাজিত করে ভাতুরিয়ার রাজা গনেশ বঙ্গদেশ দখল করেন। অতঃপর তাঁর পুত্র যদুনাথ রাজা হন। যদুনাথ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে জালাল উদ্দিন মুহম্মদ শাহ্ নাম ধারণ করেন। জালাল উদ্দিন পাণ্ডুয়া থেকে গৌড়ে রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন। এবং সেখানে তিনি একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এই বংশের সুলতানগণ ১৪৮৬ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতানগণ আবিসিনিয়া থেকে হাবসী ক্রীতদাস আমদানী করে তঁদেরকে উচ্চ রাজ পদে অধিষ্ঠিত করেন। ১৪৮৭ সালে জনৈক হাবসী ক্রীতদাস ইলিয়াস শাহী বংশেব শেষ সুলতান জালাল উদ্দিন ফতেহ্ শাহকে হত্যা করেন এবং সুলতান শাহজাদা বারবক শাহ্ নাম গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহন করেন। চাব জন হাবসী সুলতান মাত্র ৬ বছর রাজত্ব করেছিলেন। তাঁদেব রাজত্ব কালে শান্তি শৃঙ্খলার যথেষ্ট অবনতি ঘটে।

শেষ হাবসী সুলতান শামসুদ্দিন মুজাফফর শাহ্কে হত্যা করে জনগণ সৈয়দ বংশীয় মন্ত্রী আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্কে সিংহাসনে বসান। তাঁর সুশাসনে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসে। তিনি এক জন উদার ও বিদ্যোৎসাহী সুলতান ছিলেন। তাঁর উৎসাহে বাংলা ভাষার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় সুলতান ছিলেন এবং তাঁর রাজত্ব কালে হিন্দুরা সরকারী উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ তাঁর এক অবিস্মরণীয় কীর্তি। তাঁব রাজত্ব কালকে ইতিহাসের 'স্বর্ণ যুগ' বলা হয়ে থাকে।

সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের পুত্র নাসিরুদ্দিন নুসবৎ শাহ (১৫১৯—৩২) গৌড়ের সিংহাসন উপবেশন করেন। তিনি তাঁর পিতার ন্যায় অত্যন্ত ধার্মিক ও দানশীল নৃপতি ছিলেন। তিনি রাজশাহী জেলার বাঘা মসজিদ নির্মাণ করে।

হোসেন শাহী বংশের শেষ সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহ্কে পরাজিত করে শের খাঁ ১৫৩৬ সালে গৌড় দখল করেন। অতঃপর চৌসার যুদ্ধে হুমায়ূনকে পরাজিত করে শের খাঁ শেব শাহ্ নাম ধারণ করে দিল্লীর সিংহাসন অরোহন করলে বাংলা দিল্লী সাম্রাজ্যেব অন্তর্ভুক্ত হয়। পাঠান শের শাহের বংশ 'শুর বংশ' নামে পরিচিত।

শুরদের পর কররানী বংশ (১৫৬৪-১৫৭৬) বঙ্গদেশ শাসন করেন। বিহারের শাসন কর্তা সুলেমান কররানী ১৫৬৪ সালে বাংলা ও বিহার অধিকার কবেন। তাঁর রাজত্ব কালে বঙ্গদেশ এক শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। তিনি ১৫৬৫ সালে গৌড় থেকে 'টাণ্ডাতে' (গৌড়ের দক্ষিণ পশ্চিমে) রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। বিখ্যাত কালা পাহাড় তাঁর সেনাপতি ছিলেন। সমাজের অত্যাচারে বিরক্ত হয়ে কালা পাহাড় হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে ছিলেন। কররানী বংশের শেষ সুলতান দাউদ খাঁ (১৫৭২-১৫৭৬) দিল্লীব সম্রাট অকববের সেনাপতি মুনীম খানের নিকট ১৫৭৪ সালে পরাজিত হন। অতঃপর মহামারীতে হঠাৎ মুনীম খানের মৃত্যু হলে, ১৫৭৬ সালে রাজমহালের যুদ্ধে আকবরের সেনাপতি খান-ই-জাহানের কাছে দাউদ খাঁ আবার পরাজিত ও নিহত হন। এর পর বাংলদেশ মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয় এবং বাংলার স্বাধীন সুলতানী আমলের অবসান ঘটে।

মধ্যযুগে সুলতানী আমলের বাংলাদেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক দিক দিয়ে বাংলাদেশের একটি নিজস্ব সত্বা ছিল এবং আছে। তাই প্রাচীন কাল থেকেই এই দেশ স্বাধীন থেকে নিজস্ব ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে চেষ্টা করেছে। মধ্যযুগে সুলতানী আমলেও বাংলা অধিকাংশ সময় স্বাধীন ছিল। ইলতুৎমিশ, মুহম্মদ বিন তোঘলোক প্রভৃতি কয়েকজন শক্তিশালী দিল্লীর

সুলতান অতিকষ্টে অল্প কালের জন্য বাংলাকে পদানত রাখলেও দিল্লীর অধিকাংশ সুলতানের আমলে বাংলা স্বাধীন ছিল। ১৩৩৮ সালে ফকর উদ্দিন মোবারক শাহের স্বাধীনতা ঘোষণার পর থেকে ১৫৩৮ সালে গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহের উচ্ছেদ পর্যন্ত এই 'দু' শো বছর বাংলা অবিচ্ছিন্ন ভাবে স্বাধীনতা ভোগ করে। বাংলার কতিপয় সুলতান দিল্লীর অনেক সুলতান অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ছিলেন। মুসলিম বাংলার এই যুগ এক গৌরবময় যুগ। মুসলিম আমলের এই রাজশাহীর ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে কাজী মোহাম্মদ মিছের বলেছেন, এই যুগের কত বিচিত্র সমারোহে, কত জয়ের, কত কীর্তির, কত গৌরবের কাহিনী বাংলার পথে ঘাটে ছড়াইয়া আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। দুঃসাহসী ফকর উদ্দিন মোবারক শাহ্, স্বাধীনতা প্রিয় সিংহ প্রতীম সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ্, গৌড়ের বিখ্যাত আদিনা মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা সেকেন্দার শাহ্, বুলবুলে বাঙলা গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ্, রাজা গনেশের পুত্র যদু (পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে জালাল উদ্দিন), বিদ্যা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক রুকনউদ্দিন বারবাক শাহ্, এবং লৌহ কঠিন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্ তৎপুত্র নশরৎ শাহ্ প্রভৃতি সুলতান গণের আবির্ভাবে এই যুগ সমৃদ্ধ। এই বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত যুগের সুলতানগণ নিজেদের যোগ্যতা, শক্তি ও ঐশ্বর্যের মধ্যে দিয়া মুসলিম ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্রাটগণের অন্যতম হইয়া উঠিয়া ছিলেন। বাংলার প্রায় জেলা তাঁহাদের নানা কীর্তি সেই স্বর্ণ যুগের স্বাক্ষর বহন করিতেছে। কেবল তাই নয়, এই যুগের ধর্ম যোদ্ধাদের নানা কথা ও অলৌকিক কাহিনী মুসলিম বাংলার ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই যুগ এবং পরবর্তী যুগের যে সব স্থাপত্য শিল্প নিদর্শন রাজশাহী ভুখণ্ডে রহিয়াছে তাহা আজও রাজশাহী বাসীর মনে প্রাণে প্রতি পদে পদে প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে।

মোগল আমল (১৫৭৪-১৭৫৬) :

১৫৭৪ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৭২৭ সল পর্যন্ত বঙ্গভূমিতে প্রায় ২৯ জন মোগল গভর্ণর রাজত্ব করেন। তন্মধ্যে মানসিংহ, ইসলাম খাঁ যুবরাজ মোহম্মদ সূজা, মীর জুমলা, নওয়াব শায়েস্তা খান ও নওয়াব মুর্শিদ কুলীর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। দিল্লীর সম্রাটের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নওয়াব মুর্শিদ কুলী খাঁ অনেকটা স্বাধীন ভাবেই রাজ্য পরিচালনা করেন। এবং তাঁর ৪ জন উত্তর সূরী সুজাউদ্দিন মোহাম্মদ হাদী, শরফরাজ খান, আলীবর্দী খাঁ ও নবাব সিরাজউদদৌলা কার্যতঃ স্বাধীন ভাবেই বাংলার শাসন কার্য পরিচালনা করেন। মোগল আমলের এই দুশো বছরের প্রশাসনে রাজশাহী অনেকটা সুখ সমৃদ্ধির মুখ দেখতে পায়।

পরাক্রমশালী গভর্ণর নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁর আমলে (১৭০৩-১৭২৬ খ্রীঃ) রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে এক নতুন পদ্ধতির উদ্ভব হয়। কোন জমিদার যথা সময়ে রাজস্ব দিতে ব্যর্থ হলে তাঁর জমিদারী চলে যেত, এবং নবাবের ইচ্ছামত তাঁর স্নেহ পুস্টদের কাছে জমিদারী হস্তান্তর করা হোত। এই ভাবে অনক পুরাতন জমিদারের জমিদারী চলে গিয়ে তা অনেক নতুন রাজার কাছে হস্তান্তরিত হয়। এই নতুন রাজাদের মধ্যে নাটোর রাজাদের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

নাটোর রাজের পত্তন :

নাটোর রাজারা বরেন্দ্র ব্রাহ্মণদের মৈত্র পরিবার ভুক্ত। মৈত্র পরিবারের কামদেব মৈত্র রাজশাহী জেলার পুঠিয়ার জমিদরের একজন কর্মচারী ছিলেন। কামদেবের দ্বিতীয় পুত্র রঘুনন্দন ঢাকার নবাব দরবারের পুঠিয়ার রাজার একজন উকীল ছিলেন। সেই সময় ঢাকা ছিল বাংলার মোগল সরকারের প্রশাসন কেন্দ্র। ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁর আমলে ঢাকা থেকে

মুর্শিদাবাদে মোগল রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। এই সময় রঘু নন্দন 'দেওয়ানের' পদ মর্যাদা লাভ করেন এবং রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে নওয়াবের ক্ষমতার অধিকারী হন। অনেক জমিদার যথা সময়ে খাজনা দিতে না পারায় তাঁদেরকে জমিদারী থেকে বঞ্চিত করা হয় এবং বেশীর ভাগ জমিদারী রঘু নন্দনের বড় ভাই রামজীবনের হাতে চলে যায়। 'রাজশাহী চাকলার' অধিকারী হয়ে তিনি রাজশাহীর মহারাজা হন। ক্রমশঃ আরও অনেক জমিদারী তাঁর হস্তগত হলে রাজশাহীতে এক বিরাট জমিদারীর পত্তন হয়। এক কালে একে ৫২ সাখের এস্টেট বলা হতো।

৭২৬ সালে নওয়াব মুর্শিদ কুলী খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জামাই সুজা খাঁ বাংলার মসনদে আরোহন করেন। রাজশাহীর এই বিরাট জমিদারী মহারাজা রামজীবন পরিচালনা করতেন। ১৭৩০ সালে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দত্তক পুত্র মহারাজা রামকান্ত এবং তাঁর প্রিয় সঙ্গিনী রাণী ভবনীর নিকট রাজশাহীর জমিদারী উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তরিত হয়। ১৭৪৮ সালে মহারাজা রামকান্তের মৃত্যুর পর সমস্ত জমিদারী রাণী ভবানীর হাতে চলে আসে। রাণী ভবানী অত্যন্ত দক্ষতার সাথে প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে বহু ঝড় ঝঞ্জার মধ্য দিয়ে এই বিরাট জমিদারী পরিচালনা করেন। এই পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস বাংলার এক দুর্যোগের ইতিহাস। এই সময়েই পলাশী, উদয়নালা, বক্সারের যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং এক ভযাবহ দুর্ভিক্ষে বাংলার প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক অনাহারে অকাল মৃত্যু বরণ করে।

মারাঠা বর্গীদের হামলা :

নবাব আলীবর্দী খাঁর আমলে মুর্শিদাবাদ তথা পশ্চিম বঙ্গ মারাঠা বর্গী কর্তৃক আক্রান্ত হয়। ফলে রাজশাহীর রাজশাহীর বরেন্দ্র ভূমিকে নিরাপদ মন করে মুর্শিদাবাদ, ধর্মমান, বীরভূম, নদীয়া প্রভৃতি স্থান থেকে রাঢ়ী ব্রাক্ষণ পরিবার, কংস মিল্লী, ও বহু মুসলমান সওদাগর গঙ্গা মহানন্দার সঙ্গম স্থলে বর্তমান নবাবগঞ্জ ভূখণ্ডে বসতি স্থাপন করে। নবাব আলীবর্দী খাঁ সাময়িক ভাবে তাঁর রাজধানীর মূল্যবান জিনিষ পত্র, টাকা পয়সা, পরিবারবর্গ ডেপুটি গভর্ণর নোযাজেস মোহাম্মদ খাঁর অধীনে গোদাগাড়ী গ্রামের অদূরে 'বাড়ই পাড়া' গ্রামে স্থানান্তরিত করেন। বর্গীদের অত্যাচার, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, জুলুম ও নারী নির্যাতন থেকে আত্মরক্ষার নিমিত্তে হাজার হাজার চাষীকুলও পদ্মা পার হয়ে রাজশাহীর সীমান্তে এসে বসবাস আরম্ভ করে এবং অনেকে রাজশাহীর স্থায়ী অধিবাসী হয়ে যায়।

১৭৫৬ সালে নবাব আলীবর্দী খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দৌহিত্র নবাব সিরাজউদদৌলাহ্ বাংলার সিংহাসনে আরোহন করেন। কিন্তু তাঁর রাজত্বকাল অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৭৫৭ সালে বিখ্যাত পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদদৌলাহ্‌কে পরাজিতকরে বাংলার ক্ষমতা দখল করে। ১৭৫৭ সাল থেকেই মুসলিম শাসিতবাংলার স্বাধীনতার অবসান ঘটে। মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমের কাছ থেকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলার দেওয়ানী লাভ করে এবং রাজশাহী জেলার কর্তৃত্ব কোম্পানীর হাতে চলে যায়। বাংলার দেওয়ানী লাভের পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তেমন কোন পরিবর্তন সাধন করেনি।

সেই সময় রাজশাহী জেলা নাটোর রাজাদের ব্যক্তিগত সম্পতিতে পরিনত হয়। তাঁরা কোম্পানীকে কেবল মাত্র নির্ধারিত হারে রাজস্ব দিত। তখন এই এস্টেটের আয়তন ছিল প্রায় ১৩,০০০ বর্গ মাইল এবং খাজনা হিসেবে কোম্পানীর বৎসরিক দাবী ছিল প্রায় ২৭,০২,০০০ সিকা। কিন্তু রাণী ভবানীর বদান্যতার দরুন রাজস্ব আদায় একেবারে কমে যায়। তা ছাড়া ১৭৬৯-৭০ সালের (বাংলা ১১৭৬) ঐতিহাসিক মন্বন্তরে রাণী ভবানীর রাজকোষ দান খয়রাতে

প্রায় শূন্য হয়ে যায়। প্রজাবৃন্দের দুঃখ দুর্দশা দেখে তিনি একেবারে ভেঙ্গে পড়েন। অবশেষে দত্তক পুত্র বামকৃষ্ণের একজন ধর্ম নিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। লর্ড কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে রাজা রামকৃষ্ণের তালুকদারগণ কোম্পানীর সঙ্গে বন্দোবস্ত করায় তিনি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হন। তা ছাড়া রামকৃষ্ণের অযোগ্যতা ও সরলতার সুযোগ নিয়ে আমলাগণ প্রজাবৃন্দকে নানা ভাবে উৎপীড়ন করে এবং খাজনা আদায় করে তা আত্মসাৎ করে। অর্থের অভাবে যথা সময় রাজস্ব পরিশোধ করতে না পারায় বহু পরগনা নীলাম হয়ে যায়। এমনকি কোম্পানী সরকারের দেনার দরুন ১৭৯৩ সালে ৬ই মার্চ রাজ রামকৃষ্ণকে কারাবাসে যেতে হয়েছিল। রাজা রামকৃষ্ণ বিশ্বনাথ ও শিবনাথ নামে দুই পুত্র রেখে বৃদ্ধ বয়সে পরলোকগমন করেন। যে নাটোর রাজ্য রাজা রামকান্ত ও রাণী ভবানীর সময় বাংলার শ্রেষ্ঠ জমিদারী ছিল, সে রাজ্য রামকৃষ্ণের সময় ধ্বংস হয়ে অতি ক্ষুদ্র জমিদারীতে পরিণত হলো।

রাজশাহীতে ফকির ও সন্ন্যাসীর উপদ্রব ও প্রজা বিদ্রোহ :

ব্রিটিশ বাজত্বের প্রাবম্ভে রাজশাহী জেলা ফকির ও সন্ন্যাসীর হামলার শিকার হয়। ১৭৬৯-৭০ এর ঐতিহাসিক মন্বন্তরে মানুষ অন্নাভাবে দিশেহারা হয়ে যেখানে সেখানে লুট তরাজ ও চুরি ডাকাতি আরম্ভ করে। পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে রাজশাহীতে ফকির ও সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হয়। মুসলিম সম্প্রদায় ফকিরদের খাতির যত্ন নেহাৎ কম করত না। তা ছাড়া তাদের খাওয়া দাওয়া ও যাতায়াতের ব্যাপারেও তারা উদার নীতি গ্রহণ করে ছিল। এই সব ফকির ও সন্ন্যাসী অভিনব উপায়ে জন সাধারণের যথা সর্বস্ব লুণ্ঠন করত। কেউ ব্যবসায়ী, কেউ তীর্থযাত্রী, কেউ বা ভদ্রবেশী ও বহুরূপী সেজে সুযোগমত চুরি ডাকাতি কবত। কখনও বা নিরীহ মানুষকে পশুর মত হত্যাও কবত। ১৭৭৩ সালে ওযারেন হেষ্টিংসের আমলেই এই সন্ন্যাসীদের হামলা চরম আকার ধারণ করে। এই সন্ন্যাসীদেব কোন স্থায়ী ঘরবাড়ী বা পরিবার বর্গ ছিলনা। তারা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে স্বাস্থ্যবান শিশুদের চুরি করে, তাদের এই চুরি ডাকাতির কাজে ব্যবহাব করত।

উপরন্ত ওয়ারেন হেষ্টিসের আমলে জমিদারদের মধ্যে বেশী বাজস্বে নতুন ইজারার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে জমিদারদেব মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয়। তাবা প্রজার কাছ থেকে অনেক বেশী হারে খাজনা আদায় কবতে থাকে। ফলে প্রজাদেব মধ্যেও অসন্তোষ দেখা যায়। তা ছাড়া যুদ্ধেব ক্ষতি পূবণ স্বরূপ ইংবেজগণ অমানুষিক অত্যাচার ও জুলুম করে পাইকারী হারে খাজনা আদায় করতে থাকে। ফলে কোম্পানীর কর্মচারীব বিরুদ্ধে উত্তব বঙ্গে প্রজা বিদ্রোহের উদ্ভব হয়।

১৭৬৯-৭০ সালে দুর্ভিক্ষের পর পরই উত্তর বঙ্গের প্রজা বিদ্রোহ প্রকট আকার ধারণ করে। প্রজাদের খাওয়া দাওয়ার কিছুই ছিল না। এমন কি তাদের জমি চাষের জন্য কোন বীজ পাওয়াও দুষ্কর হয়ে পড়ে ছিল। এক দিকে প্রজা বিদ্রোহ, অন্য দিকে ফকির ও সন্ন্যাসীর উপদ্রব ও অত্যাচারে দেশে অরাজকতার সৃষ্টি হয়। দেশের আইন কানুন অচল হয়ে পড়ে। গ্রেজারের (glazier) মতে দিনাজপুর ও রংপুরের দক্ষিণ এবং বর্তমান বগুড়ার পশ্চিম অঞ্চলের যেন কোন মালিকই ছিলনা। তিনি এই এলাকাকে 'নো ম্যানস ল্যান্ড' বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই এলাকাতেই ডাকাতদের উৎপাত ও অত্যাচার খুব বেশী ছিল। সেখানে আইন শৃঙ্খলা কিছুই ছিলনা। এই ডাকাতদলের মোকাবিলা করার জন্য ১৭৮৭ সালে লেফটেন্যান্ট ব্রেনানকে (Lt. Brenan) নিয়োগ করা হয়। লেফঃ ব্রেনান একজন হাবিলদার ও কিছু সংখ্যক সিপাই নিয়ে

ডাকাতদলের নেতা ভবানী পাঠক ও তার দলবলের ওপব হামলা চালায়। এই হামলায় ভবানী পাঠক নিহত হয় এবং তার সবসঙ্গীরা অনেকে নিহত ও আহত হয়। অনেককে আটকও করা হয়। গোলাবারুদসহ প্রায় ৭টি নৌকা হস্তগত হয়। তার সঙ্গী সাথীবা প্রাযই অবাঙ্গালী ছিল। বিখ্যাত ফকির নেতা ফকির মজনু শাহ্‌র সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। ফকির মজনু শাহ্ গঙ্গা নদীর দক্ষিণ দিক থেকে হামলা চালাত বলে প্রকাশ। লেঃ ব্রেনান আরও একজন মহিলা নেত্রীর কথাও উল্লেখ করেছেন। তার নাম দেবী চৌধুরাণী। সেও দলবল নিয়ে নৌকায় বাস করতো এবং পাঠকের সাথে তার যোগসূত্র ছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই সব চুরি ডাকাতি বন্ধ করে রাজশাহীতে শান্তি ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হয়।

ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময় এদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজস্ব আদায়ের নতুন ব্যবস্থা প্রচলিত হলে রাজশাহীর কার্য তদারকের জন্য ১৭৮৩ সালে মিঃ জর্জ ডালেস (George Dallas) রাজশাহী জেলার কালেক্টর নিযুক্ত হয়। ১৭৮৬ সালে মিঃ ডালেস পদত্যাগ কবলে তদস্থলে মিঃ পিটার স্পেক (Peter speke) কালেক্টর হন। ১৭৮৭ সালে তিনি জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট পদেও উন্নীত হন। তিনি কলেক্টর, জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে মাসিক বেতন ও বাড়ী ভাড়া বাবদ মোট ১,৫০০ টাকা পেতেন। তাঁর দু'জন সহকারীও ছিল। তাদের একজন মাসে ৫০০ টাকা ও অন্য জন ৪০০ টাকা বেতন পেত।

রাজশাহী জেলার পূর্ণগঠন ও সীমানা পরিবর্তন :

১৭৯৩ সলের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব পর্যন্ত রাজশাহী বাংলার এক বিরাট প্রশাসনিক বিভাগ ছিল। ১৭৮৬ সালে রাজশাহীর জমিদাবীর আয়তন ছিল প্রায় ১৩,০০০ বর্গ মাইল। বর্তমান রাজশাহী জেলার প্রায় ৫ জন, অর্থাঃ জেলা মালদহ, পাবনা, বগুড়া এবং রংপুর ও দিনাজপুরের বহুলাংশ এই রাজশাহীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। লর্ড কর্ণ ওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর এই সুবিস্তৃত জেলা। দক্ষিণে পদ্মা ও পূর্বে যমুনা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত) এক জন কালেক্টরের অধীন সমাজ রূপে সুশাসিত হওয়া দুষ্কর হয়ে ওঠে। তা ছাড়া এত বড় অঞ্চলের রাজস্ব আদায় করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে ১৭৯৩ সালে প্রথম বারের মত রাজশাহী জেলার সীমানা পরিবর্তিত হয়। গঙ্গা নদীর দক্ষিণ দিকের বিবাট অঞ্চল রাজশাহী থেকে কেটে মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও যশোহরের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়। তা ছাড়া আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, রাজস্ব আদায় ও সমগ্র জেলা পূর্ণ নিয়ন্ত্রনের সুবিধার্থে জেলাকে ক্ষুদ্রতর করা বিবেচিত হওয়ায় ১৮১৩ সালে রাজশাহী থেকে চাঁপাই ও রহনপুর থানা বিচ্ছিন্ন করে তৎসহ পূর্ণিয়া ও দিনাজপুর থেকে আরও কয়েকটি থানা সংযোজন করে বর্তমান মালদহ জেলা গঠিত হয়।

১৮২১ সালে আদম দীঘি, নোয়াকিলা, শেরপুর এবং বগুড়া থানা রাজশাহী থেকে পৃথক হয়ে রংপুরের ২টি এবং দিনাজপুরের ৩টি মোট ৯টি থানা নিয়ে বর্তমান বগুড়া জেলা গঠিত হয়। ১৮৩২ সালে শাহাজাদপুর, খেতুপাড়া, রায়গঞ্জ, মথুরা ও পাবনা এই ৫টি থানা রাজশাহী থেকে পৃথক হয়ে, যশোহরের আরও ৪টি থানা নিয়ে বর্তমান পাবনা জেলা গঠিত হয়। এই ভাবে রাজশাহী জেলা ক্রমশঃ ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়।

১৮২৫ সাল পর্যন্ত রাজশাহী জেলার সদর দপ্তর নাটোরে ছিল। ১৯২৫ সালের পর নাটোরের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থেকে রাজশাহী জেলার সদর দপ্তর রামপুর বোয়ালিয়ায় স্থানান্তরিত করা হয়। ১৮২৯ সালে নাটোর স্বতন্ত্র মহকুমা এবং ১৮৭৭ সালে নওগাঁ মহকুমা গঠিত হয়।

আজাদী আন্দোলন :

রাজশাহীতে সিপাহী বিদ্রোহ ও নীল বিদ্রোহ :

ইংরেজী ১৮৫৭ সালের মার্চ মাসে বহরমপুরে সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হলেও প্রতিবেশী জেলা রাজশাহীতে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি। তবে সমগ্র ভারত ব্যাপী দেশীয় সিপাহীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ শুরু করলে, রাজশাহী মেসার্স রবার্ট ওয়াটশন কোম্পানী নিজেদের আত্মরক্ষা ও ফ্যাক্টরী সমূহ রক্ষার জন্য একটি সেনা বাহিনী গঠন করে। ১৯৫৭ সালের কোন এক সময় আজাদী আন্দোলনের অগ্রদূত হিসেবে মুক্তি যোদ্ধার ক্ষুদ্র একটি দল মুর্শিদাবাদ থেকে রাজশাহী গমন করে। তারা পদ্মা অতিক্রম করে রামপুর বোয়ালিয়া ও সরদা রাস্তার মধ্য স্থলে একটি ঘাঁটি স্থাপন করে। রাতের অন্ধকারে কুঠিয়ালদের উক্ত সেনা বাহিনী তাঁদের ওপর অতর্কিতে হামলা চালায় ফলে মোজাহিদগণ এক রকম বিনা শর্তেই আত্ম সমর্পণ করে।

ইংরেজী ১৮৫৮ সালের ১লা নভেম্বর এক ঘোষণার দ্বারা মহারাণী ভিক্টোরিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে ভারতের শাসন ভার গ্রহণ করলে সিপাহী বিদ্রোহ কিছুটা প্রশমিত হয়। তখন থেকেই কোম্পানীর শাসনের অবসান ঘটে।

নীল বিদ্রোহ :

সিপাহী বিদ্রোহের পর এদেশের চাষী মজুরেরা নীল করদের বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠে। ১৮৫৯-৬০ সালে সমগ্র বাঙলা ব্যাপী যে নীল বিদ্রোহ শুরু হয় তাতে রাজশাহীর প্রজাকূল অংশ গ্রহণ করে এক স্মরণীয় ইতিহাসে রেখে গেছে। বিদ্রোহী প্রজা সাধারণ রাজশাহীর গুরুদাসপুর, লালপুর, পুঠিয়া, শিবগঞ্জ, গোমস্তাপুর ও ভোলাহাট থানার প্রায় ২৫টার মত নীলকুঠিতে ও রেশম কুঠিতে আক্রমন চালিয়ে নীলকুঠির কয়েকজন ইংরেজ দেওয়ান ও বহু কর্মচারীকে হত্যা করে। নীল বিদ্রোহের সময় দক্ষ প্রশাসনের মিলিত প্রত্যেক জেলার কালেক্টরদের পরিবর্তন করে যোগ্যতর ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু তবুও বিদ্রোহ প্রশমিত হলো না। নীল বিদ্রোহের পরই সমগ্র দেশে প্রজা বিদ্রোহ আরম্ভ হলো। এবারের প্রজা বিদ্রোহ কেবল ইংরেজ কুঠিয়ালদের বিরুদ্ধেই নয়, দেশী রাজা-জমিদারের বিরুদ্ধেও।

ইংরেজ কোম্পানীর আমলে হেষ্টিংসের সময় নতুন ইজারা প্রবর্তনের ফলে উত্তর বঙ্গে যে প্রজা বিদ্রোহ দেখা দেয় তার সূত্র ধরেই পরবর্তী কালে পাবনা-রাজশাহীতে প্রজা বিদ্রোহের উদ্ভব হয়। বাজে জমা আদায় ও নতুন জরিপের নামে খাজনা বৃদ্ধি, কবলিয়াত গ্রহণ ইত্যাদি কারণে এই বিদ্রোহের সুত্রপাত হয়। ফলে জমিদার ও প্রজাগণের মধ্যে বাদানুবাদ চলে। প্রজাগণ খাজনা দেয়া বন্ধ করে দেয়। এবং দলবদ্ধ হয়ে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

দুবোলহাটির প্রজা বিদ্রোহ :

পাবনা প্রজা বিদ্রোহের ঢেউ পরবর্তীকালে রাজশাহীর বহু জমিদারকে নাজেহাল করে। দুবোলহাটির বিদ্রোহী নেতা আস্তান মোল্লার নেতৃত্বে রাজশাহীতে প্রজা আন্দোলন গড়ে ওঠে। কম মাপকাঠি দিয়ে মেপে নতুন করে জমা ও খাজনা বৃদ্ধি করায় জমিদার ও প্রজা বর্গের মধ্যে বাদানুবাদ চলতে থাকে এবং পরে তারা খাজনা বন্ধ করে দেয়। দুবোলহাটির রাজার বিশ্বস্ত প্রজা আস্তান মোল্যার নেতৃত্বে প্রায় ৫০ হাজার প্রজা একত্রিত হয়ে রাজা হরনাথের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তারা তিন দিন ধরে রাজ বাড়ী অবরোধ করে রাখে। অবশেষে

ম্যানেজার শশীভূষণ রায়ের ক্ষমা প্রার্থনা ও রাজা হরনাথের স্ত্রী দ্বয়ের আকুল আবেদনেও আস্তান মোল্লার প্রধান সহকারী নারু মোল্লার সহায়তায় প্রজাদের সাথে আপোষ নিষ্পত্তি হয়। এই বিদ্রোহ প্রায় ৫ বছর ধরে চলে। রাজা হরনাথ খাজনা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করেন। দুবোলহাটির এই শোচনীয় পরাজয় দেখে মহাদেবপুর, চৌগ্রাম, কানসাট প্রভৃতি জমিদারগণ নতুন জরিপ করা তাদের জমা ও খাজনা বৃদ্ধির সংকল্প পরিত্যাগ করেন। প্রজা বিদ্রোহের ফলেই ১৮৮৫ সালে "বঙ্গীয় প্রজা সত্ব" আইন প্রবর্তিত হয়।

নওগাঁর দুবোলহাটির প্রজা বিদ্রোহের সময়েই নাটোরে একটি 'কৃষক সম্মেলনী' সংগঠিত হয়। এই সম্মেলনী কেবল জমিদার নয়, বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করেছিলো এই সম্মেলনীর মধ্যে সেই ঐক্যবদ্ধ কৃষক প্রজা জমিদার ও বৃটিশ সরকারের অবিচার, অত্যাচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ জানিয়েছিল। এই সম্মেলনীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মুন্সী মহাম্মদ মহ্সেন উল্লাহ 'বুড়ীর সূতা' নামক সমালোচনা মূলক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করে প্রজা সাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করতে সহায়তা করেছিলেন।

বর্তমানকালের রাজশাহীর রাজনৈতিক ইতিহাস :

বর্তমানকালে রাজশাহী জেলার রাজনৈতিক ইতিহাসকে মোটামুটি ভাবে চার ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম ভাগে রাজশাহী জেলার প্রজা-চাষীদের বিদ্রোহ ঘোষণার কথা বলতে হয়। জমিদার ও পরে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধীনে প্রজাগণের ওপর যখন নানা অনাচার, অবিচার, নিপীড়ন ও নির্যাতন চল্তে থাকে তখন এই জেলার চাষী প্রজারাই তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং আন্দোলন গড়ে তোলে। এই আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল নওগাঁ ও নাটোর। নওগাঁর "মোহামেডান এসোসিয়েশান" ও নাটোরের 'কৃষক সম্মেলনী' চাষীদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার্থে এই আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করে।

এর দ্বিতীয় স্তরে আসে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের কথা। লর্ড কার্জনের আমলে ১৯০৫ সালে বাঙলার বর্তমান রাজশাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ ও আসাম নিয়ে একটি নতুন মুসলিম প্রধান প্রদেশের সৃষ্টি হয়। শিক্ষা-দীক্ষা, চাকরি, ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলা ও আসামের সুযোগ-সুবিধে ও উন্নয়ন কল্পে এবং প্রশাসনিক সুবিধার্থে এ প্রদেশের জন্ম হয়েছিল। মুসলিম প্রধান এই নতুন প্রদেশের সৃষ্টি হওয়াতে কংগ্রেস এর ঘোর বিরোধীতা করে। ১৯০৬ সালে প্রধানতঃ রাজশাহীর হিন্দু সম্প্রদায় এই প্রদেশ সৃষ্টির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। এবং তারা বাঙলাকে এক দেশ ও বাঙালীকে এক জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালায়। কংগ্রেসের এই বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের মুখে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ বাতিল হয়ে নতুন প্রদেশের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

অসহযোগ ও খিলাফত আনেদালন :

অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন রাজশাহীর রাজনৈতিক ইতিহাসের তৃতীয় অধ্যায়। এই যুগে বৃটিশ শক্তি টল টলায়মান হয়ে পড়ে ছিল। এই যুগেই দেশের আজাদী ত্বরান্বিত হয়। এই যুগকে বিপ্লবী যুগ বলা হয়।

১৯১১-১২ সালে বৈপ্লবিক কর্মী হিসেবে ত্রৈলোক্য নাথ চক্রবর্তী তার জন্মস্থান ময়মনসিংহের কুলিয়া চর থেকে রাজশাহী আগমন করলে রাজশাহীতে বৈপ্লবিক কার্যকলাপ ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর বৈপ্লবিক পার্টি 'অনুশীলন সমিতির' একটি শাখাও রাজশাহীতে স্থাপন করা

হয়। বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য আন্দোলন চালিয়ে যাবার জন্যই এই সমিতি গঠিত হয়েছিল। রাজশাহীর যে কয়জন বিশিষ্ট হিন্দু নেতা এই অনুশীলন সমিতিতে যোগদান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রভাস চন্দ্র লাহড়ী নরেন্দ্র কিশোর ভট্টাচার্য, জিতেশ লাহিড়ী, ও ধীরেন ঘটকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরে শুধাংশ চৌধুরী, ধীরেন্দ্র নাথ সরকার, সৈয়দ আলী সরকার প্রমুখ যোগদান করেন।

১৯১৪-১৮ সালের প্রথম বিশ্ব যুদ্ধব পর রাজশাহীতে বৈপ্লবিক কার্যকলাপ তীব্র আকার ধারণ করে। এদিকে কংগ্রেস নেতারা কংগ্রেসের আদর্শ প্রচাব করতে থাকেন। এবং কংগ্রেসের সংগঠন গ্রাম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে ১৯২০ সালে প্রখ্যাত ভ্রাতৃদ্বয় মাওলানা শওকত আলী ও মাওলানা মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে খিলাফত আন্দোলন আরম্ভ হয়। জেলার হিন্দু ও মুসলিম নেতারা এই আন্দোলনের ডাকে রাজশাহী অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী কর্মীগণ কংগ্রেস দলের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিভিন্ন স্থানে আন্দোলন পড়ে তোলেন।

১৯৩০ সালে রাজশাহীতে আনুষ্ঠানিকভাবে এক কংগ্রেস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের প্রথম সভায় সভাপতিত্ব করেন বিপিন চন্দ্র গাঙ্গুলী এবং স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নেতৃত্ব কবেন সুধাংশু চৌধুরী ও বীরেন্দ্র নাথ সরকার। এই সময় চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সন্দেহে সম্মেলনে যোগদানকারী অনুশীলন সমিতির কর্মী মহারাজ ত্রৈলক্য নাথ চক্রবর্তী কেরু চৌধুরী, পুতুল চৌধুরী প্রমুখ গ্রেপ্তাব হয়ে রাজশাহী জেলে নীত হয়। সম্মেলন কোন রকমে শেষ হয়।

অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়লে উত্তর বঙ্গেব প্রজা আন্দোলনের অগ্রদূত নেতা বগুড়ার মরহুম মওঃ রজীব উদ্দিন তরফদারের নেতৃত্বে নাটোরে কৃষক প্রজা আন্দোলন গড়ে ওঠে। রাজশাহী সদরের খান বাহাদুব এমাদ উদ্দীন, জনাব হাজী লাল মোহাম্মদ নওগাঁ অঞ্চলের মৌঃ মোসলেম আলী মোল্লা, নবাবগঞ্জ অঞ্চলের মৌঃ ইদ্রীস আলী আহমদের নেতৃত্বে এই আন্দোলন বাজশাহীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ও প্রজা নেতা আবু হোসেন সরকাব সমগ্র বাংলায় এই আন্দোলনেব নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। অতঃপর দেশে মুসলিম লীগ আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠলে অন্যান্য আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে।

চতুর্থ স্তরে আসে রাজশাহী জেলা মুসলিম লীগের কথা। ১৯০৬ সালে ঢাকায় নওযাব স্যার সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগের আনুষ্ঠানিক জন্ম হয়। ১৯৩৬ সার থেকে মুসলিম লীগ বাংলা পাক ভাবত উপমহাদেশে মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের জন্য জোর আন্দোলন চালাতে থাকে। তদানুসারে ১৯৩৭ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী রাজশাহীতে আগমন করেন এবং শহরের দরগা প্রাঙ্গনে এক সভার অধিবেশনে শহরের গন্য মান্য লোকদের নিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে মুসলিম লীগেব একটি শক্তিশালী কমিটি গঠিত হয়। এই সংগঠনে মৌঃ আব্দুল হামিদ সভাপতি ও মৌঃ মাদার বকস সাহেব সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৪০ সালে লাহোব প্রস্তাবের পর ভারতে মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক আবাস ভূমির দাবী আবও জোরদার হয় এবং মুসলিম লীগের সংগঠন গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট তৎকালীন পাকিস্তানের জন্ম হলে মালদহ জেলার ৫টি থানা নবাবগঞ্জ ভোলাহাট, শিবগঞ্জ, নাচেল, গোমস্তাপুর ও পুরাত দিনাজপুরেব ৩টি থানা ধামরহাট, পত্নীতলা ও পোরশা মোট এই ৮টি থানা রাজশাহী জেলার সঙ্গে যুক্ত হয়।

নাচোল বিদ্রোহ :

নাচোল বিদ্রোহের মূল কারণ ছিল জমিদাবদের বিরুদ্ধে প্রজাকুলের বহু দিনের পূঞ্জীভূত

ক্ষোভ ও অসন্তোষ। বহু দিন ধরে প্রজার উপর জমিদারদের অনাচার, অবিচার, উৎপীড়ন ও অত্যাচার নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যে কৃষক প্রজাবা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, খেয়ে না খেয়ে জমি চাষ করে জমিতে সোনার ফসল ফলাতো, তাবা তাদের ন্যায্য অংশ পেতনা। সেখান থেকেই তে-ভাগা (দু-ভাগ প্রজাব ও এক ভাগ জোতদারের) আন্দোলনের জন্ম। জমিদারদের বিরুদ্ধে এই তে-ভাগা আন্দোলন বাংলাদেশেব প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারত বিভাগের পর (অর্থাৎ পাকিস্তান সৃষ্টির পর) ১৯৪৯ সালের শেষের দিকে এই তে-ভাগা আন্দোলন জোরদার হয়। লক্ষ লক্ষ চাষী সে দিন ভূমিহনি কৃষকের ভাগ্য নিয়ন্ত্রনে এই অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য লড়েছিল। তারা চেয়ে ছিল জোতদারী, মহাজনী প্রথা উচ্ছেদ করতে এবং জমিদারী প্রথা নির্মুল করতে। নাচোলে এই তে-ভাগা আন্দোলন শুরু হলে সংগঠনের প্রধান ও প্রাথমিক দায়িত্ব পড়লো অনিমেষ লাহিড়ী, বৃন্দাবন, মাতলা, মাতলা মাঝি, চিন্তু চক্রবর্তী, শিবু ও আজাহার হোসেনের উপব। এবং এই নাচোল বিদ্রোহেব নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কলকাতা শহরের শিক্ষিতা যুবতী ইলা মিত্র। বিবাহ সূত্রে তিনি নবাবগঞ্জ এসেছিলেন। নবাবগঞ্জ মহকুমার রামচন্দ্রপুরের বাবু রমেন মিত্রের (হাবু বাবু) সঙ্গে ইলা মিত্রর বিবাহ হয়। বমেন মিত্ররা জোতদার ছিলেন। কৃষ্ণ গোবিন্দপুর হাই স্কুলে ইলা মিত্র শিক্ষিকা হিসেবে যোগদানও করেছিলেন। কিন্তু তিনি জোতদারেব স্ত্রী হয়েও তেজাদারী প্রথা নির্মূল কবাব জন্য বিক্ষুদ্ধ মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

১৯৫০ সালের জানুয়াবী মাসের প্রথম দিকেই কৃষকেবা বিদ্রোহ করবে নেতাদেব এই ছিল নির্দেশ। কৃষকেরা সমস্ত ধান কেটে ঘরে তুলবে। কাস্তেতে শান দিয়ে তৈবী হলো সবাই। ভীত সন্ত্রস্ত্র হয়ে জোতদাব জমিদাব শোষক শ্রেণী সরকারের সাহায্য চাইলে পুলিশেব দারোগা, জামাদার ও কনস্টেবল এসে কেন্দুয়া ঘাসুবা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক দল লোককে আটক করে ধান কাটা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছিল। চতুর্দিকে খবর ছড়িয়ে পড়ল। ৪/৫ হাজাব মেয়ে পুরুষ লাঠি, সোঠা, তীর ধনুক নিয়ে কেন্দুয়া ঘাসুরা স্কুল ঘিরে ফেললো। ভীত সন্তস্ত পুলিশেরা হতভম্ব হয়ে গেল, অস্ত্র ব্যবহার কবতে পারল না। তাদের অস্ত্র কেড়ে নেয়া হলো। মাবধর পাইকারী হাবে পড়তে লাগলো। গণ পিটুনীর শিকার হলো তিন জন পুলিশের লোক।

এ খবর ছড়িয়ে পড়লো। পুলিশ এসে সমস্ত এলাকা ঘিরে ফেললো এবং এই বিদ্রোহ কঠোর ও নির্মম ভাবে দমন করা হলো। ইলা মিত্র সাঁওতাল যুবতীব ছদ্ম বেশে পালিয়ে যাবার সময় রহনপুর রেল স্টেশনে ধরা পড়লেন। রাজশাহী কোর্টে বিচার হলো। বিচাবে অনিমেষ লাহিড়ী, ইলা মিত্র, মাতলা মাঝি ও আজাহাব হোসেনের বিশ বছব করে জেল হয়ে গেল। ইলা মিত্রকে চিকিৎসার জন্য প্যাবোলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে অবশ্য তাকে কোলকাতায় পাঠিয়ে দেয়া হয়।

এই বিদ্রোহে প্রায় ২৫০ জন কৃষক কর্মী (প্রধানতঃ সাঁওতাল) আত্মাহতি দিয়েছিলেন, প্রায় ২৫০০ জন গ্রেপ্তার হয়ে নির্যাতিত হয়েছিলেন। শত শত কৃষক কর্মী দেশত্যাগ করে প্রাণে রক্ষা পেয়েছিলেন।

পাকিস্তানের সৃষ্টি জাতি গঠনের ইতিহাসে এক অভিনব পরীক্ষা বলা যেতে পারে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ভাষার, সংস্কৃতির, ভৌগোলিক অবস্থান ও অথনৈতিক ক্ষেত্রে কোন সাদৃশ্যই ছিলনা। এক মাত্র ধর্মের ভিত্তিতেই পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছিল। যে আদর্শ ও চিন্তা ধারায় উদবুদ্ধ হয়ে পূর্ববাংলার মুসলমানেরা পাকিস্তান সৃষ্টির ব্যাপারে আত্মত্যাগ করেছিলেন, ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত এই ২৪ বছরেও তা

বাস্তবায়িত হয়নি। শোষণ ও শাসনের যাঁতা কলে এই পূর্ব বাংলার লোক নিষ্পেশিত হয়েছিল। তজ্জন্য অবশ্য পশ্চিম পাকিস্তানের (বর্তমানে পাকিস্তান) স্বার্থান্বেষী মহলের ষড়যন্ত্র ও আমলা তান্ত্রিক প্রশাসনই দায়ী। তাই তারা পূর্ব বাংলার মানুষের মাতৃ ভাষার উপর আঘাত হেনে ছিল ১৯৫২ সালে। এই ২৪ বছর ধরে বাংলাদেশ বাসী তাঁদের ন্যায্য অধিকার ও সুযোগ সুবিধে আদায়ের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে। কিন্তু তা জোর পূর্বক দাবিয়ে রাখা হয়েছিল। অতঃপর হোসেন শহীদ সহরাওয়ার্দীর বিশিষ্ট শিষ্য শেখ মজিবর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ বাসীর স্বাধিকারের সংগ্রাম আরও জোরদার হয়। উৎপীড়িত ও নির্যাতিত মানুষের নায্য দাবী আদায়ের জন্য ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশের আপামর জনসাধরণ শেখ মজিবর রহমানের নেতৃত্বে এক ঐতিহাসিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে শেখ মজিবর রহমানের দল আওয়ামী লীগ তৎকালীন পাকিস্তানের জাতীয় সংসদের ৩১৩টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসনে জয়লাভ করে।

এই ভাবে শেখ মজিবর রহমান আওয়ামী লীগের ৬ দফা ও ছাত্রদের ১১ দফার ভিত্তিতে দেশের শাসনতন্ত্র গঠন করার জন্য জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করেন। বাংলাদেশের জনগণ তাদের ন্যায় সঙ্গত দাবী দাওয়া আদায়ের জন্য সাংবিধানিক প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন। কিন্তু তৎকালীন পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী বাংলাদেশের জনগণকে তাঁদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার প্রয়াস চালায়। এবং ১৯৭০ সালের এই ঐতিহাসিক নির্বাচনকে বানচাল করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। পাকিস্তানের তদানিন্তন প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৭৯ সালের ১লা মার্চ জাতীয় সংসদের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করে।

জেনারেল ইয়াহিয়া খানের এই অগণতান্ত্রিক কর্মের বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালের ২রা মার্চ থেকে শেখ মজিবর রহমান শান্তিপুর্ণ অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তিনি রেসকোর্সের ময়দানে এক বিরাট জনসভায় ঘোষণা করেন, "এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চল্‌তে থাকে। জীবনের প্রতি স্তরের মানুষ তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে এই আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করেন। তারপর আসে সেই ভয়াল রাত্রি ২৫শে মার্চ, ১৯৭১ সাল। পাকিস্তানের বর্বর সেনাবাহিনী ব্যারাক থেকে বের হয়ে এসে ঢাকার নিরস্ত্র ও নিরীহ জনগণের উপর ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘের মত ঝাপিয়ে পড়ে। রাজশাহীতেও সেই রাত কম ভয়াল ছিল না। রাজশাহীর কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতা ও তাঁদের সন্তান ও আত্মীয় স্বজনদের ধরে নিয়ে গিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। সেই রাতেই দখলদার বাহিনী কর্তৃক শেখ মজিবর রহমান গ্রেপ্তার হয়ে বিচারের অজুহাতে পশ্চিম পাকিস্তানে নীত হন।

২৮শে মার্চ, ১৯৭১ রোববার রাজশাহীর পুলিশ লাইনে পাকসেনা বাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হয়। সমস্ত দিন ধরে পাকবাহিনী ও পুলিশের মধ্যে গোলাগুলি চলতে থাকে। শান্তির নামে সাদা পতাকা উড়িয়ে পাক-বাহিনী পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল সি-এণ্ড-বি'র মোড় থেকে তারা আক্রমণ চালায়। অস্ত্রের ঝন-ঝনানিতে সমস্ত শহর কেঁপে ওঠে। সান্ধ্য আইনজারী করে তারা এই আক্রমণ চালিয়েছিল। বিকেল তিনটের দিকে দু-ঘণ্টার জন্য সান্ধ্য আইন প্রত্যাহার করা হলে, দলে দলে মানুষ পুলিশ লাইনের দিকে ধাবিত হয়। দেখ্‌তে পায় ধরায় লুণ্ঠিত রক্তাক্ত পুলিশের মৃত দেহ এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে। এক ঘণ্টার মধ্যেই কোন রকমে ১৮ জন পুলিশের লাশ দাফন করা হয়। মাতৃভূমির জন্য তাঁদের এই ত্যাগ এক বিরল দৃষ্টান্ত। তৎকালীন ডি,আই,জি জনাব মামুন মাহমুদ ও পুলিশ সুপার জনাব আব্দুল

মজিদকেও পাক-বাহিনী নির্মমভাবে হত্যা করে।

তারপব ৩০শে মার্চ, ১৯৭৯ মঙ্গলবার দিবাগত রাত্রে বি,ডি, আর (তৎকালীন ই,পি, আর) ক্যাম্পে আগুন লাগিয়ে দেয় বর্বর পাক-বাহিনী। বি,ডি, আরের বিদ্রোহের ভয়ে তাদের হৃদকম্প পূর্বেই আরম্ভ হয়েছিল। তাই বি,ডি,আর, ক্যাম্পের গোলা-বারুদ জ্বালিয়ে দিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল পাক-বাহিনী। ক্যাম্পের গোলাবারুদের শব্দ ও আগুনের লেলিহান শিখা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লে মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। জীবন বাঁচাতে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতে লাগলো। সে আগুনে অবশ্য জান মালের তেমন কোন ক্ষয় ক্ষতি না হলেও রাজশাহী বাসীর মনে যে ভয়ের সঞ্চার হয়েছিল, তা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে অম্লান হয়ে থাক্‌বে।

এরপর ভীত সন্তস্ত্র হয়ে মানুষ দলে দলে রাজশাহী শহর ছেড়ে যেতে আরম্ভ করলো। কেউবা গেল নিজ বাড়ীতে, কেউবা গ্রামাঞ্চলে গিয়ে কুঁড়ে ঘরে আশ্রয় নিল এবং রেডিওর মরফত যুদ্ধের খবরাখবর রাখ্‌তে লাগলো। ৩রা ও ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৭৯ পাক-বিমান বাহিনীর দুটো জেট বিমান এসে নওদা পাড়ার দিকে বি,ডি, আর জোয়ান, পুলিশ, মুক্তিবাহিনী ও জনসাধারণের উপর গোলা-বর্ষণ করে গেল। তারপর থেকেই বিপুল সংখ্যায় মানুষ রাজশাহী শহর ছেড়ে পালিয়ে যেতে লাগলো। চরণ-যুগলই একমাত্র ভরসা। যান বাহন হিসেবে গরুর গাড়ী, টম্‌টম্‌ ও রিক্‌সা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। রাজশাহী থেকে নবাবগঞ্জ যেতে আমাদের রিক্‌সা ভাড়া লেগেছিল ২০/০০ টাকা ও রিক্‌সাওয়ালাকে কিছু নাস্তা খাবার। সময় লেগেছিল প্রায় ৫ ঘণ্টা। এপ্রিল মাসের ৫ তারিখ থেকে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ জোরদার হলে পাক-বাহিনী রাজশাহী ক্যানটোনমেন্টে কোনঠাসা হয়ে থাকে। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে রাজশাহীর নিয়ন্ত্রণ ও প্রশাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে মুক্তি বাহিনীর হাতে চলে আসে।

১৩ই এপ্রিল, ১৯৭১ পাক-বাহিনীর শত শত সেনা রাতের অন্ধকারে অতর্কিতে রাজশাহী শহর ঘিরে ফেলে। পাক-সেনা আগমণের কথা শুনে শঙ্কিত হয়ে যেসব শান্তিপ্রিয় শহরবাসী অতি প্রত্যুষে রাজশাহী ছেড়ে ভারতে কিম্বা রেল লাইন অতিক্রম করে গ্রামে চলে যেতে চেয়েছিল তাদেরকে পদ্মার বালিচরে ও রেল লাইনের আশে পাশে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। রাজশাহীর নিয়ন্ত্রণ ও প্রশাসন ব্যবস্থা আবার পাকবাহিনীর হাতে চলে গেল। এরপর নাটোর, নওগাঁ ও নবাবগঞ্জে সমানভাবে হত্যাযজ্ঞ, অগ্নি সংযোগ ও রাহাজানি চল্‌তে লাগ্‌লো। এইভাবে রাজশাহী তথা সমগ্র বাংলাদেশে চল্‌তে থাকে হত্যাকাণ্ড, লুণ্ঠন, অগ্নি সংযোগ, নারী ধর্ষণ ও পাইকারী হারে ধরপাকড় ও জিজ্ঞাসাবাদ। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশের নির্বচিত প্রতিনিধিরা কুষ্টিয়া জেলার অন্তর্গত মেহেরপুরের মুজিবনগরে (মেহেরপুর মহকুমার ভারত সীমান্তের কাছ এক আম্র কাননকে মুজিব নগর নাম দেয়া হয়েছিল) এক অস্থায়ী সরকার গঠন করেন। সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট ও তাজ উদ্দিন আহমদকে প্রধান মন্ত্রী করে এই সরকার গঠিত হয়। অন্যান্য যাঁরা মন্ত্রী হন তাঁদের মধ্যে, রাজশাহীর সন্তান আ,ক,ম, কামরুজ্জামানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরপর ছাত্র, পুলিশ, আনসার, বি,ডি, আর বেঙ্গল রেজিমেন্টের জোয়ানেরা ও জনসাধারণ মুক্তিবাহিনীতে নাম লিখান এবং জেনারেল ইয়াহিয়া খানের বর্বর সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে মোকাবেলা করেন। রাজশাহীতেও বর্বর পাক-বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চল্‌তে থাকে।

১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসে বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী বাংলাদেশের বিভিন্ন ফ্রন্টে দখলদার বাহিনীর উপর আক্রমণ চালায় এবং কয়েক দিনের মধ্যেই সফলতা লাভ করেন। তাঁরা কয়েকটা সীমান্ত ফাঁড়ি দখল করেন। অন্যদিকে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত ও পল্লী অঞ্চলের

অধিকাংশই মুক্তিবাহিনীর দখলে এসে যায়। ভারতের সেনাবাহিনী মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে নেমেছে এই অজুহাতে পাকিস্তান ১৯৭১ সালের ৩রা ডিসেম্বর ভারত আক্রমণ করে। এরপর মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনা-বাহিনী যৌথভাবে বাংলার মাটিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালায়। এই সময় রাজশাহী জেলার নবাবগঞ্জ মহকুমার নবাবগঞ্জ ও শিবগঞ্জ থানায় মুক্তিবাহিনী ও পাক-বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। নবাবগঞ্জ ও শিবগঞ্জ থানার ভারত সীমান্ত থেকে যুদ্ধ আরম্ভ হলে ক্রমশঃ পাক-বাহিনী পিছু হট্‌তে আরম্ভ করে। আমাদের বীর মুক্ত যোদ্ধারা জনসাধারণের সহায়তায় আস্তে আস্তে সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে এবং নবাবগঞ্জ শহরের সন্নিকটে এসে পড়ে। সপ্তাহ ব্যাপী এই যুদ্ধে বহু নিরীহ নাগরিক ও মুক্তিযোদ্ধা অকাল মৃত্যু বরণ করেন এবং পাক-বাহিনীর যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হয়। পাক-বাহিনী শেষ পর্যন্ত কোণঠাসা হয়ে নবাবগঞ্জ ছেড়ে রাজশাহীর দিকে পালিয়ে আস। পথিমধ্যে অনেক পাক-সেনা নিহত হয়। শেষ পর্যন্ত ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিনা শর্তে বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ কমান্ডের কাছে পাকিস্তানের সেনা-বাহিনী আত্মসমর্পণ করে। রাজশাহী ক্যানটোনমেন্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের জোহা হলে অবস্থানরত পাক সেনারা নাটোরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল।

'ন' মাসের এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে রাজশাহী তথা সমগ্র বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ নিহত হয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। কোটি কোটি লোক গৃহহারা হয়ে আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে, হাজার হাজার নারী ধর্ষিতা হন এবং বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এক অপূবনীয় ক্ষতি সাধিত হয়। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকবাহিনীর আত্ম সমর্পনের পর পরই এই বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয় এবং স্বাধীন ও স্বার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের জন্ম হয়। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের শেষ দিকে বাংলাদেশ সরকারের সদর দপ্তর মুজিব নগর থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত করা হয়। শেখ মজিবর রহমান ১৯৭২ সালের ৭ই জানুয়ারী পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন, এবং তিনি লন্ডন-দিল্লী হয়ে ১০ই জানুয়ারী, ১৯৭২ স্বাধীন ও সর্বভৌম বাংলার পবিত্র মাটিতে পদার্পন করেন। ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে তিনি রাজশাহী সফর কবেন।

গ্রন্থপঞ্জী :

০১। Bangladesh District gazetteers, Rajshahi, (Dacca-1976) Edited by Dr Ashraf Siddiqui

০২। মিছের, কাজী মোহাম্মদ-রাজশাহীর ইতিহাস ১ম ও ২য় খণ্ড (ঢাকা—১৯৬৫)

০৩। হামিদ, এম,এ, চলন বিলের ইতিকথা

০৪। Bangladesh Population Census-1974

০৫। বসু, অমিয় (সম্পাদিত) বাংলায় ভ্রমণ-প্রথম খণ্ড (কলিকাতা— ১৯৪০)

০৬। Ahmed, Dr Nafis-East Pakistan, (London-1968)

০৭। Hunter, W.W, A Statistical Account of Bengal, Rajshahi (London, 187).

০৮। Ghosh, Rai Sahib Jamini-Sanyasi and Fakir Raiders in Bengal (Calcutta-1930)

০৯। নূর মোহাম্মদ, আবুল কালাম শেখ—নবাবগঞ্জ পরিচিতি (রাজশাহী— ১৯৬৬)

রাজশাহী জিলার ভাষা-প্রসঙ্গ

মুহম্মদ আবূ তালিব

"পশ্চিমে গঙ্গা (মহানন্দা), পূর্বে করতোয়া নদী বিধৌত পুন্যতমা... অঞ্চলকে খ্রীষ্টীয় দশম শতকের সংস্কৃত (রামচরিতম কাব্যের) কবি সন্ধ্যাকর নন্দী 'বরেন্দ্রী' বা "বরেন্দ্র মন্ডল চূড়ামনি" নামে অভিহিত করেছেন।[১] সন্ধ্যাকর অবশ্য সমকালীন গঙ্গা ও করতোয়া নদীদ্বয়ের নাম করেছেন, পরে এই ধারার সঙ্গে পদ্মা ও মহানন্দার ধারাও যুক্ত হয়েছে। মোট কথা, 'বরেন্দ্রী' বলতে সাবেক বঙ্গ প্রেসিডেন্সীর রাজশাহী বিভাগ বুঝাতো, যার সঙ্গে— রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, রংপুর দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও মালদহ যুক্ত ছিল (কুচবিহার সহ)। এই ববেন্দীর শিরোভূষণ পৌণ্ড্র বর্ধণ বা পৌণ্ড্র বর্ধণপূরকে বলা হত "বসুধা শির" বা পৃথিবীর শিরোভূষণ স্বরূপ।

বর্তমান রাজশাহী জিলা তারই একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। কিন্তু রাজশাহীর অবস্থান ও গুরুত্ব বিচার করলে আজও তাকে বরেন্দ্রীর শিরোভুমি অথবা তার 'হৃদয়' বলা যেতে পারে। আমরা বাজশাহীর ভাষা সম্পর্কে আলোচনা করব।

প্রথমেই বলে রাখা ভালো, জীব জন্মের মত ভাষা বা সাহিত্য সংস্কৃতির জন্মের কোন নির্দিষ্ট দিন ক্ষণের উল্লেখ করা যেতে পারেনা। কাল প্রবাহের বিশেষ কোন ক্ষণে প্রকৃতির নিয়মে এর জন্ম হয় এবং প্রাকৃতিক নিয়মেই সে বেড়ে ওঠে ও নিজের পরিচয় তুলে ধরে। বাংলা ভাষা সম্পর্কেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

বরেন্দ্রী ভাষা :

বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত আল্লামা ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ জানিয়েছেন, প্রাচীন কালে যখন বাংলা ভাষা বা সাহিত্যের জন্মও হয়নি, এমনকি বাংলাদেশ নামেও কোন দেশ বা সমৃদ্ধ নগরীর উদ্ভব হয়নি; তখন "বারেন্দ্রী ভাষা" নামে একটি স্বতন্ত্র ভাষা বা উপভাষার জন্ম হয়েছিল। প্রাচীন "প্রাকৃত পিঙ্গল" গ্রন্থের বিখ্যাত টীকাকার রবিকরের বরাত দিয়ে তিনি এই ভাষার নমুনাও দিয়েছেন। যেমন—

"মানিনি মানহি" কাঁই পল এওজে
চরন পড় কন্ত।
সহজে ভূঅঁগম জই নমই
কিঙ করিত্র মনি মত্ত ॥"[২]

মানে, (আধুনিক বাংলায়)—
ওগো মানিনি, মানে কি ফল?
এই যে কান্ত চরণে পতি।
সহজে ভূজঙ্গম যদি নত হয়
মনি মন্ত্রে কি করে?

যতদূর জানা যায়, এই বারেন্দ্রী ভাষাই বাংলা ভাষার আদি জননী।

বাংলা ভাষার উদ্ভবকাল ও সিদ্ধাচার্য কাহ্নপার আবির্ভাব :

আমাদের ভাষাতত্ত্ববিদ পণ্ডিতদের মতে, বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদ বা চর্যা গীতাবলীর উদ্ভব হয় খ্রীষ্টীয় সপ্তম—দশম শতকের মধ্যে। এর উর্ধতম সীমা দিয়েছেন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। তিনি বলেন, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকেই বাংলা ভাষার আদি কবি মীননাথের আবির্ভাব হয়। ফরাসী পণ্ডিত সিলর্ভা লেভীর বরাত দিয়ে তিনি প্রমান করতে চেয়েছেন যে, ৬৫৫ খ্রীষ্টব্দের দিকে মীননাথ নেপালের রাজা নরেন্দ্র দেবের সভায় হাযির হয়েছিলেন; অতএব এই সময় থেকেই চর্যাপদের উর্ধতম সীমা নির্ণয় করা যেতে পারে। ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষীগণ এই সীমাকে নবম—দশম শতক পর্যন্ত বিস্তৃত করতে চান। তাই বলে তারা চর্যাপদকে বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন বলতে কুণ্ঠিত নন। অবশ্য এরূপ দাবী উড়িয়া, মৈথিলী, অসমীয়া, এমনকি হিন্দীওয়ালাদেরও। উল্লেখ্য যে, প্রাচীন চর্যাপদের সর্ব প্রধান লেখক কাহ্নপা ওরফে কানুপা ছিলেন মীননাথের শিষ্য। মীননাথ ছিলেন প্রাচীন বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ, মানে বর্তমান বরিশাল জিলার বাসিন্দা। যতদূর জানা যায়, কানুপা ও তদীয় গুরু জালন্ধরী পা ওরফে হাড়িপা প্রাচীন সোমপুরী বিহারের বাসিন্দা ছিলেন। এই সোমপুরী বিহার বর্তমান রাজশাহী জিলার নওগাঁ মহাকুমা অবস্থিত পাহাড়পুর নামে চিহ্নিত হয়েছে। সমকালীন গৌড় রাজ ধর্মপাল দেব খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে এই সোমপুরী বিহার নামক মহাবিদ্যাপীঠ নির্মান করেন (৭৮০ খ্রীঃ)। মহাপণ্ডিত, রাহুল সংকৃত্যায়নের মতে, কানুপা ধর্মপাল দেবের 'কায়স্থ' বা লেখক ছিলেন, এবং তিনি তদীয় গুরু জালন্ধরী পা-এর সঙ্গে সোমপুরী বিহারে অবস্থান করতেন।[৩]

কানুপা তাঁর একটি চর্যাপদে তাঁর গুরু জালন্ধরী পা ওরফে হাড়িপার নাম উল্লেখ করেছেন—

"শাখী করিব জালন্ধরী পা-এ"।

(৩৬ নং পদ)

জালন্ধরী-শিষ্য কাহ্নপর নামান্তর 'বিরূআ' (=বিরূপ)। 'বিরূপা' নামে একজন চর্যাকরেব একটি পদও আমাদের হস্তগত হয়েছে (৩নং)। জালন্ধরী হাড়িপা বা সিদ্ধাহাড়ি নামে পরিচিত ছিলেন। উত্তরাঞ্চলে সিদ্ধাহাড়ির গান সুপরিচিত। শুধু তাই নয়, চর্যাপদের বেশ কয়েক জন লেখকও ছিলেন বরেন্দ্রী অঞ্চলের, এ-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। যার মধ্যে সর্ব প্রধান লেখক কাহ্নপা ও তাঁর গুরু জালন্ধরী পা নিঃসন্দেহে রাজশাহী জিলার বাসিন্দা ছিলেন। তাই রাজশাহীর প্রাচীনতম ভাষার নিদর্শন বলতে গেলে চর্যাদকেই বলতে হয়। সুধী সমাজের অবগতির জন্য কাহ্নপা লিখিত একটি চর্যাপদ উদ্ধৃত করা যাচ্ছে—

'নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহরি কুড়িআ।
ছোই ছোই যাহসি ব্রাহ্মণ নাড়িআ ॥
আলো ডোম্বি তোএ সম করিব মো সাঙ্গ।
নিঘিন কাহ্ন কাপালি জোই লাঙ্গ ॥
এক সো পদমা চৌ্ট্ঠী পাখুড়ী।
তহিঁ চড়ি নাচই ডোম্বী বাপুড়ী ॥
হালো ডোম্বী তো পুছমি সদভাবে।
আইসসি জাসি ডোম্বি কার্হেরি নাবেঁ ॥

তান্তি বিকনহ ডোম্বি অবর মোঁ চাঙ্গিড়া
তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড় পেড়া ॥
তু লো ডোম্বী হাঁউ কাপালী।
তোহহোর মন্তরে মোএ ঘালিলি হাড়েরি মালি ॥
সরবর ভাহিআ ডোম্বী থাহ মোলান।
মারমি ডোম্বী লেমি পরাণ ॥

আধুনিক বাংলায় ...

নগরের বাইরে. রে ডোমনী, তোর কুঁড়ে ঘর।
তুই নেড়ে বামুনের (মনকে) ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাস।
ওরো ডোমনী, আমি তোকে সাঙ্গা (নিকে) করব।
আমি কানু কাগালিক যোগী নিঘৃণ এবং উলঙ্গ।
একটি পাদ্মের চৌষট্টি পাপড়ি, তার পরে চড়ে
বেচারী ডোমনী নাচে।
ওলো ডোমনী, তোকে সদ্‌ভাবে জিজ্ঞেস করি,
'তুই কার নায়ে (নৌকায়) আসা-যাওয়া করিস'?
তুই তাঁত ও চাঙ্গরী বেচিস, আমি তোরই
জন্যে নলের পেটরা কেনা ছেঁড়ে দিয়েছি।
তুই ডোমনী, আমি কাপালিক, তোর জন্যে
হাড়ের মালা পরেছি। সরোবর ভেঙ্গে ডোমনী,
তুই মৃনাল খাস। আমি তোকে মেরে তোর প্রাণ নেবো।

বলাবাহুল্য, আধুনিক রাজশাহী জিলার কোন কোন অঞ্চলের লোক ভাষায় (উপভাষায়) অবিকল কানুপার এই গানটির প্রতিধ্বনি শোনা যায়— কি ভাষায়, কি আবহে! বিশেষ করে রাজশাহীর নবাবগঞ্জ— নওগাঁ এলাকার কথ্য ভাষায়, এই রূপটি অত্যন্ত স্পষ্ট।

শুধু তাই নয়— সমগ্র বরেন্দ্রী এলাকায় আজও এই ধরনের তোহোর মোহর, নাড়িআ, কুড়িআ, যাহছি, চাহাছি, হাটত, বাটত, ঘরোত, খালত ইত্যাদি শব্দ ও বিভক্তি হুবহু ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। তাই কানুপার চর্যার ভাষাকে রাজশাহী জিলারও প্রাচীনতম ভাষার লিখিত নমুনা বলা যেতে পারে। তুলনীয়— বিশ শতকের গোড়ার দিকে লিখিত আব্দুল জব্বর রোকনীর 'নিদান ঘড়ি' বই-এর ভাষা :

"ছিঁড়া গাজী গাজী টাকা রাখিলে ঘরোত।
কাঁয় দিবে সেই টাকা তোমার গোরোত।"[৪]

আবার আঠারো শতকের—
রঙ্গপুর জিলার কবির—

দুই সন্ধ্যা রন্ন যত্তনে খাওয়াইব।
জাইতে বাহিরে তোমাক কদাসচ না দিব ॥
বিরহের অগ্নিতপে প্রাণ হত্যা হওঁ।
এহোলেকে পরলোকে পুরুষ না পাওঁ ॥
(শাকের মামুদের 'মধুমালা-মনুহর' কাব্য থেকে)।[৫]

শেষোক্ত উদ্ধৃতির সঙ্গে বিখ্যাত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কার বড়ু চণ্ডীদাসের কবি-ভাষার আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। প্রথমটিতে আছে চর্যাপদের। স্পষ্টই বোঝা যায়, চর্যার ভাষা "শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন কাব্যের ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখলাম, কাহ্নপার ভাষা ও বরেন্দ্রী এলাকার ভাষার সাদৃশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট। শুধু তাই নয়, কারূপা স্বয়ং, উক্ত এলাকারই বাসিন্দা। তা হলে কি রবিকর বরেন্দ্র এলাকার ভাষাকেই বরেন্দ্রী ভাষা বলেছেন? আপাত দৃষ্টিতে তাই-ই তো মনে হয়।

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, প্রাচীন বাংলা ভাষা "বাংলা" নামেই পরিচিত ছিল না। এমনকি আধুনিক যুগের শুরুতে রাজা রামমোহন রায় বাংলা ভাষার যে ব্যাকরণ লেখেন (১৮৩৩ খ্রীঃ), তার নামও বাংলা না দিয়ে, দিয়েছিলেন "গৌড় ভাষার ব্যাকরণ"। মানে, গৌড় নামক প্রদেশের বা দেশের ভাষা। ঐতিহ্য সূত্রে আরও জানা যায়, বাংলা ভাষার 'বাঙ্গলা' বা 'বাঙ্গালা' নামকরণ হয়েছে ইংরাজী 'Bengal' শব্দ থেকে। ইংরাজী ভাষায় রচিত ও প্রথম মুদ্রিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ কার মনীষী ন্যাথানিয়েল ব্রাসী হ্যালহেডও তাঁর এই গ্রন্থের নাম রেখেছিলেন— A Grammer of the Bengal Language" বা বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ (১৭৭৮ খ্রীঃ)। রামমোহন তাঁর ব্যাকরণের নাম বাঙ্গলা বা বাঙ্গালা না রাখার কারণও তাই বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়।

বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও নামকরণ :

বাংলা ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে ভাষাতত্ত্ববিদ গ্রীয়ার্সনের বিখ্যাত উক্তিটি এখানে স্মরণ করা যায়—

"Goudi is the parent of Bengali of North Bengal and of Assamese, spreading to the south-east, Magadhi developed into Bengali of Gangetic Delta, and still further towards the rising sun Dhakki (or the Magadhi of Dacca) became the modern eastern Bengali."[৬]

মানে, গৌড় বা গৌড় দেশীয় ভাষা হ'ল উত্তর বাংলার এবং অসমীয়া ভাষার মূল উৎস, দক্ষিণ পূর্বে দিকে মাগধী গাঙ্গের বদ্বীপ এলাকায় বাংলায় রূপান্তরিত হয়, এবং সূর্যোদয়ের দিকে আরও অগ্রসর হয়ে ঢাকী (=ঢাকা অঞ্চলীয় উপভাষা) পুর্বাঞ্চলীয় আধুনিক বাংলার জন্ম দেয়।

রাজশাহী জিলার শিবগঞ্জ থানায় আজও এই প্রাচীন গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। উল্লেখ্য যে পূর্বোক্ত বারেন্দ্রী ভাষা এই গৌড়ীয় ভাষার উত্তরাধিকার ব্যতীত নয়। গ্রীয়ার্সন যাকে 'গৌড়ী' ভাষা বরেছেন, এই "বারেন্দ্রী" তার সমার্থক হতে পারে, কেননা বরেন্দ্রী এলাকাই ছিল তখন গৌড় তথা পুণ্ড্র দেশের স্নায়ু কেন্দ্র। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেব আরও বলেছেন—"প্রাচীন গৌড় এবং বঙ্গে বা বর্তমান পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম রাজত্বের পূর্বেই বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তি ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। গৌড় হইতে গৌড়ী প্রাকৃত (দণ্ডী, কাবাদর্শ, ১/৩৫) এবং গৌড় অপভ্রংশের (মার্কণ্ডেয় প্রাকৃতিক সর্বস্ব) নামকরণ হইয়াছিল। আমীর খুসরুও (১৩৩৭ খ্রীষ্টাব্দ) দেশীয় ভাষাগুলির মধ্যে গৌড় ও বঙ্গালের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।" তাই বলতে দ্বিধা নেই, বারেন্দ্রী ভাষাও বারেন্দ্রী এলাকার প্রাচীন দেশীয় ভাষার নাম। কৌতুহলের ব্যাপার এই যে, পশ্চিম বঙ্গীয় পণ্ডিতগণ পশ্চিম বঙ্গে প্রাচীন বাংলা ভাষার উৎপত্তি স্থল বলে আজও কোন আঞ্চলিক ভাষার নমুনা পাওয়া যায় নি। পক্ষান্তরে 'গোড়ী', 'বারেন্দ্রী', 'মাগধী', 'ঢক্কী' ইত্যাদি উপভাষার নাম পাওয়া যাচ্ছে।

রাজশাহীর ঔপভাষিক ব্যাকরণ :

এবার রাজশাহী তথা বারেন্দ্রী ভাষার ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করা যাচ্ছে।

স্যার জর্জ গ্রীয়ার্সন বাংলাদেশের রাজশাহী, পূর্ব মালদহ, দিনাজপুর, বগুড়া এবং পাবনা জিলার উপভাষাগুলিকে পাশ্চাত্য বিভাগের উদীচ্য শাখা ভুক্ত করেছেন এবং রঙ্গপুরের উপভাষাকে "রাজবংশী" বা "রঙ্গপুরী" নামে আলাদা একটি শাখাভুক্ত করতে চেয়েছেন। কিন্তু আসলে রঙ্গপুরী বাংলা উদীচ্য শাখারই একটি উপশাখা। এটি প্রধানতঃ রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার (পশ্চিম বঙ্গ) এবং আসামের গোয়াল পাড়াতেও কথিত হয়। বলা বাহুলা, আমাদের আলোচ্য, রাজশাহীর লোক ভাষার বৈশিষ্ট্যও এই। সুধী সমাজের অবগতির জন্য অঞ্চল ভিত্তিক রাজশাহীর লৌকিক ছাড়া ও প্রবাদের সাহায্যে এই এই ভাষা বৈশিষ্ট্যের একটু নমুনা পেশ করা যাচ্ছে। যথা :

০১. রাজশাহী সদর :

রৌদ হৈছে ম্যাগ হৈছে
খ্যাক শেয়ালীর বিহ্যা হৈছে।
চনচন্যা রৈদ উঠ—
চনচন্য রৈদ উঠ ॥

তুলনীয় :

রৈদ উঠ রৈদ উঠ
তোর ভাগনা বহকে
জাড় ল্যাগ্যাছে।
রৈদ উঠ, রৈদ উঠ ॥

—নবাবগঞ্জ।

০২. নওগাঁ :

অদও হচে পানিও হচে
খ্যাক শেয়ালীর বিয়া হচে
আবার
দেওয়ার মাও মরে আচে
কুলা দিয়া ঝাঁপা আছে
অ'দ উট
অ'দ উট ॥

০৩. নাটোর :

টিয়ার বেটির বিয়া
লাল শাড়ীখান দিয়া
কাল অন্তর লিয়া যাবে
ঢাকত বাড়ী দিয়া ॥
তুং
টিয়ার বেটির বিয়া
লাল শাড়ী থান দিয়া
আগে যায় ঝামুর ঝুমুর

পাছে যায় বিয়া (টিয়া?)
কজলের শউর গায়
ধারায় মুরত দিয়া ॥
নওগাঁ।[৮]

অবশ্য ছড়াগুলি রাজশাহী এলাকা থেকে সংগৃহীত হলেও এ গুলি দেশের সর্বত্রই প্রচলিত। তাই এর ভাষাকে নির্বিঘ্নে রাজশাহীর আঞ্চলিক ভাষা বলা যেতে পারেনা; তবে রাজশাহীর আঞ্চলিক ভাষায় কথিত বলে এর বিশেষ মূল্য দিতেই হয়। এবং কৌতূহলজনক এই যে, ইতিপূর্বে চর্যাপদ ও বারেন্দ্রী ভাষার যে সব বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে, এই ভাষাতে তার বিশেষ বিশেষ লক্ষণ বিদ্যমান। যেমন, পদের আদিতে 'র'লোপ, এবং 'র' এর স্থানে 'অ' এর ব্যবহাব, 'অদ' (রোদ); বিভক্তি 'তে' স্থানে 'ত্', 'কে' স্থানে 'ক' এর ব্যবহার। যেমন, ঢাক্‌ত মুরত্ ইত্যাদি এতদ্ব্যতীত হিন্দী শব্দ-হ্যামি, হামাক; তুম্হি, তোমাক; ইড্ডি-উত্তি (হিঃ ইস্‌তরফ, উস্ তরফ) ইত্যাদি; কন্টে, কোন্ঠে (কোথায়?) ইত্যাদি সর্বনাম ও অব্যয়ের ব্যবহারও এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে। 'রাজশাহীর ছড়া' বই-এর সম্পাদক অধ্যাপক আলমগীর জলীল এই ভাষা— ক্রিয়ার কালের নিদর্শনে কিছু নুতনত্বের সন্ধান পেয়েছেন। "(Present Continuous Tense) যেমন— বাহাছি (বাহিতেছি); যাহাছি (যাইতেছি) চাহাছি (চাহিতেছি) ইত্যাদি।

পুরাঘটিত বর্তমান কালের রূপ : (Present Perfect Tense) সাজালে (সাজাইয়াছে), গেইলচে (গিয়াছে), বুইলচে (বলিয়াছে) ইত্যাদি।"[৯]

এই বৈশিষ্ট্যকে বারেন্দ্রী ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে। চর্যপদেরও এই বৈশিষ্ট্য। কাহ্নপা-এর চর্যাপদে 'যাহছি' (ছোই ছোই যাহছি) ইত্যাদির ব্যবহার মিলেছে। উল্লেখ্য, বর্তমান রাজশাহী সদরে যে 'যাছি', 'বুলছি' ইত্যাদি শব্দ (ক্রিয়া পদ) পাই, এ তারই অপভ্রংশ। এব ব্যুৎপত্তি) যাহছি>যাছি; বুইলাছি> বুইলচি> বুলছি। এ-ভাবে-আইলচে, গেইলচে। উল্লেখ্য যে, এখানে মহাপ্রাণ 'ছ' অল্পপ্রাণ 'চ'-এ পরিনত হয়েছে। এইরূপ আরও আছে। যেমন— শাক>শাগ; কতটি> কড্ডি ইত্যাদি। অধ্যাপক জলীল যথার্থই বলেছেন, "নওগাঁ ও নাটোর অপেক্ষা রাজশাহী সদর ও নবাবগঞ্জের আঞ্চলিক ভাষা সাধু ভাষার অধিক নিকটতর।" অবশ্য নবাবগঞ্জের ভাষা সম্পর্কে সর্বত্র এ-কথা খাটেনা। কেননা রাজশাহী সদরের চেয়ে নবাবগঞ্জ অধিকতর রক্ষণশীল। তিনি আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করেছেন,— রাজশাহীর ভাষায়— "আনুনাসিকের ব্যবহার কম,. অপর পক্ষে বেশীব্যবহৃত হয় 'হ'। বিহ্যা, যাহালচি ইত্যাদিতে।" অনুনাসিক উচ্চারণ এই এলাকার ভাষার একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলেও রাজশাহীতে এর ব্যবহার কম। এর বেশী ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়, রংপুর-দিনাজপুরে। আগেই তার ব্যবহার দেখানো হয়েছে। অধ্যাপক জলীল রাজশাহীর উপভাষাকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করেছেন—। তাঁর মতে,— "রাজশাহী সদর ও নবাবগঞ্জ মহকুমার ছড়া গুলোতে পশ্চিম বঙ্গের মালদহ—মুর্শিদাবাদের প্রভাব রয়েছে যথেষ্ট। জেলার একেবারে উত্তরাংশের ছড়াগুলোতে পূর্ব বগুড়া ও দিনাজপুরের উপভাষার নিদর্শন রয়েছে। আর বাকী নাটোর মহকুমার ছড়া গুলোর ভাষা পাবনা ও দক্ষিণ বগুড়ার কথ্য ভাষার আত্মীয় বলে বোধ হয়।"[১০] কিন্তু বলা হয়েছে, রাজশাহী জিলা প্রাচীন বরেন্দ্রভুমির উত্তরাধিকারী।

খ্রীষ্টীয় আঠারো শতকেও রাজশাহী জমিদারী (নাটের) বলতে সমগ্র বঙ্গ-প্রেসিডেন্সীর এক তৃতীয়াংশ বোঝাতো। কথিত আছে, একজন ভ্রমণকারীর জন্য এটি ছিল পয়ত্রিশ দিনের

ভ্রমণপথ। সাবেক রাজশাহী বিভাগ ছাড়াও ঢাকা, ফরিদপুর, যশোর, মুর্শিদাবাদ, ছোট নাগপুর, ভাগলপুর ও পুর্নিয়াও (বিহার প্রদেশ) রাজশাহী জমিদারীর অন্তর্গত ছিল। রাণী ভবানীর রাজত্বকালে রাজশাহীর অন্তর্গত পরগনার সংখ্যা ছিল ১৬৪ এবং মোট রাজস্ব ছিল ১৮,৫৩,৩২৫/০০ টাকা মাত্র। ইংরেজ রাজত্বের গোড়ার দিকে এত বড় জমিদারী শাসনের অসুবিধার জন্য প্রথমে পঞ্চ-বার্ষিকী ও পরে ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতায় সঙ্কুচিত হয়ে রাজশাহী জিলায় পরিণত হওয়ার কালেও (১৭৮৭) রাজশাহী যে আকার হয়, তা ছিল বর্তমান রাজশাহী জিলার পাঁচগুণ। পরবর্তীকলে মূলতঃ রাজশাহী জিলা থেকেই মালদহ, পাবনা, বগুড়া ইত্যাদি জিলার উৎপত্তি হয়। উৎপত্তিকাল যথাক্রমে— ১৮১৩, ১৮২৮ ও ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দ। ইতিপূর্বেই নিজ চকলা রাজশাহীসহ পরগণে লস্করপুর ও তাহিরপুর মুর্শিদাবাদ জিলার সঙ্গে যুক্ত হয়। পাকিস্তান ভারত বিভক্তির সময়ে লস্করপুর তাহিরপুর পুনরায় রাজশাহীতে ফিরে আসে। নিজ চাকলা রাজশাহী এখনও ভারত বাংলার মুর্শিদাবাদ জিলার অন্তভুক্ত রয়েছে। এ-ছাড়া বর্তমান রাজশাহীর অন্তর্গত নবাবগঞ্জ সহ সমগ্র মালদহ জিলাটিই ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়েও বিহার প্রদেশের ভাগলপুর জিলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৪৭ সালের বঙ্গ বিভক্তির ফলে দিনাজপুরের পোরশা, পত্নীতলা ও ধামুর হাট এবং মালদহের নাচোল, নবাবগঞ্জ, গোমস্তাপুর, শিবগঞ্জ ও ভোলার হাট থানা সমূহ রাজশাহী জিলার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে নবাবগঞ্জ নামে স্বতন্ত্র একটি মহকুমার সৃষ্টি করতে হয়েছে। আরও উল্লেখ্য যে মূল মালদহ জিলার গঠনকালে রাজশাহী থেকে চাঁপাই ও রোহনপুর বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে দিনাজপুর ও পুর্ণিয়া জিলার কিছু অংশ তাতে যুক্ত করে মালদহ জিলা গঠিত হয় (১৮১৩)। পুর্ণিয়া জিলাও বিহার প্রদেশের অন্তর্গত ছিল।

রাজশাহী থেকে আদমদীঘি, শেরপুর ও নওখিলা নিয়ে তার সঙ্গে রঙ্গপুরের দেওয়ানগঞ্জ এবং দিনাজপুরের লাল বাজার, ক্ষেত লাল ও বদল গাছি যুক্ত করে বগুড়া জিলা (১৮২১), এবং রাজশাহীর শাহজাদপুর, খেতুর পাড়া, রায়গঞ্জ, মথুরা ও পাবনা এবং যশোর থেকে চারটি থানা নিয়ে পাবনা জিলার পত্তন হয় (১৮২৮)। তাই রাজশাহী জিলা শুধু বাংলার নয়— আংশিক ভাবে বিহার (মগধ) রাজ্যেরও প্রতিনিধি। এতদিন রাজশাহীর সদর নাটোরেই অবস্থিত ছিল, ১৮২৫ সালে স্বাস্থ্যগত কারণে নাটোর থেকে সদর অফিস রামপুর-বোয়ালিয়া, মানে বর্তমান রাজশাহী শহরে স্থানান্তরিত হয়। অদ্যবধি সেই ব্যবস্থাই চালু আছে। তাই রাজশাহীর ভাষায় শুধূ পশ্চিম বঙ্গীয় কেন, বিহারী, মৈথিলী, অসময়িা ইত্যাদির মিশ্রণ ঘটবে তাতে আশ্চর্যের কিছুই নেই।

প্রাচীন বারেন্দ্রী ভাষার বিবর্তন, সোমপুরী থেকে রাজশাহী :

খ্রীষ্টীয় সতেরো শতকের বিখ্যাত কবি শুকুর মামুদের 'গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস' কাব্যে রামপুর বোয়ালিয়ার উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে (রচনা ১১১২ সাল=১৭০৫ খ্রীঃ)।[১১] কবি রামপুর বোয়ালিয়ার অন্তর্গত সিন্দুর কুসুমী গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। সুধী সমাজের অবগতির জন্য শুকুর মামুদ সহ আরও দু-এক জনের কাব্য থেকে সমকালীন আঞ্চলিক ভাষার নমুনা দেওয়া যাচ্ছে। বলাবাহুল্য, সাহিত্যিক ভাষার নমুনা হলেও তাতে সমকালীন আঞ্চলিক ভাষার আভাস মিলবে। যেমন—

ক. পৈথরেতে পানি নাই পাহাড় কেন চোবে।
অঞ্চলে দোকান দেয় খরিদ করে কালে ॥

ভরিল ইন্দুরে নাও বিড়াল কাণ্ডারী।
সুতিয়া আছেন ব্যঙ্গ ভুজঙ্গ প্রহরী ॥
বলদ প্রসব হইল গাই হইল বাঞ্জা।
বাছুরেক দোহাএ দিন তিন সাঞ্জা ॥
হুঞ্চার পানি ফুটি টুঞ্জি করিয়া ধাত্র।
সুয়া পক্ষী বসিয়া বিড়াল ধরিয়া খাএ ॥
শৃগাল হইয়া সিংহের সঙ্গে যুজে।
কুটিকের মধ্যে গুটিকে তাহা বুঝে ॥
—(গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস। শুকুর মামুদ)[১২]
তুলনীয় ঢেন্‌ডন পাদের চর্যা— (নং ৩৩)—

খ. "টালত মোর ঘর নাহি পড় বেসী।
হাড়ীতে ভাত নাহি নিতি আবেশী।
বেঙ্গসঁ সাপ চঢ়িল জাই।
দুহিল দুধু কি বেন্টে সামাই ॥
বলদ বিআএল পবিআ বাঁঝে।
পিটা দুহিএ এতিনা সাঁঝে ॥
জো সো বুধি সোই নিবুধি।
জো সো চোর সোই সাধী ॥
নিতি নিতি সিআলা সিহে সম জুঝই।
ঢেন্‌ডন পাত্রর গীত বিরলে বুঝই ॥

আধুনিক বাংলায়—

টিলার উপরে আমার ঘর কোন পড়শী নেই।
হাড়ীতে ভাত নেই কিন্তু নিত্যই অতিথির আগমন।
ব্যাঙের সঙ্গে সাপ বর্ধিত হয়।
দোহা দুধ কি বাটে প্রবেশ করে?
বলদ প্রসব করল (বাচ্চা) কিন্তু গাই বাঝাঁ।
তিন সন্ধ্যা পাত্রে দোহা হচ্ছে।
যে বুদ্ধিমান সেই নির্বোধ, যে চোর সেই সাধু।
নিত্য নিত্য শৃগাল সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করে, ঢেন্‌ঢন পাদের
গীত বিরলে (খুব কম লোকেই) বুঝে।

কৌতুহলের ব্যাপার এই যে, অবিকল একই ধরনের ভাববানী মিলছে হিন্দী ষোড়শ শতকের কবি কবীরের দোহায়। গানটি এই :

গ. "আব কেযা গান গাঁব কুতুয়ালা।
শ্বমাংস পসারি গীথ রাখওয়ালা ॥
মুসা কি নও বিড়াল কাড়ার্।
সোএ মেড়ূক নাগ পহারী ॥
বলদ বিয়াওয়ে গাতি ভই বান্‌ঝা।

বাছুরি দোতওয়ে দিন তিন সান্ঝা ॥
নিতি ২ শৃগালা সিংহ সনে জুঝে।
কহে কবীরে বিরল জনে বুঝে ॥"[১৩]

মানে,

কি গান করছে গ্রাম কোতোয়াল?
কুকুর দিয়েছে মাংসের পসাব, নজর রাখছে গৃধ্র।
ব্যাঙ শুয়েছে, পাহরাওয়ালা নাগ।
বলদ বিয়ালো, গাই হ'ল বাঁঝা;
বাছুর দোহা হচ্ছে দিনে তিন বার।
নিত্য ২ শৃগাল সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করে,
কবীর কহেন অল্প লোকেই বোঝে ॥

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, সারা বাংলা-ভারত জুড়ে একই গানের ও ভাবের পসার জমেছিল, সেখানে জাত-পাতের কোন ভেদ ছিল না। প্রাচীন রাজশাহী তথা বরেন্দ্র ভূমিতেও তার ঢেউ জেগেছিল।

কবি শুকুর মামুদেরও প্রায় তিনশত বৎসর আগের কথা। হযরত নূর উদ্দিন নূরুল হক কুত্‌বি আলম নামক এক বিখ্যাত দরবেশের আবির্ভাব হয় বরেন্দ্রী এলাকায় (ওফাতঃ ৮১৮ হিজরী ১৪১৬ খ্রীঃ)। সকলেই তাঁকে একজন আধ্যাত্ম সাধক বলেই জানেন। সমকালীন ফারসী ভাষার তিনি একজন নামকরা লেখকও ছিলেন। কিন্তু তিনি যে বাংলা ভাষাতেও কাব্য-রচনা করেছিলেন, এ-কথা আমাদের একেবারেই জানা ছিলনা। সম্প্রতি ফারসী ও বাংলা ভাষা মিলিয়ে একশ্রেণীর 'রেখতাহ্' বা মিশ্র কবিতার লেখক হিসেবে তাঁকে জানা যাচ্ছে। অবশ্য এই শ্রেণীর কবিতা একটির বেশী পাওয়া যায়নি। কিন্তু কৌতুহলের ব্যাপার এই, একটি মাত্র কবিতায় তিনি সমকালীন বাংলা ভাষায় তার যে অসাধারণ দখলের পরিচয় দিয়েছেন,তার তুলনা নিতান্তই বিরল। একটু নমুনা দিই :

"ওহ্ চে কর্দম রা-এ তু দিদম
উমত পাগল ভেলুঁ।
হম চু মজনুঁ বাহ্‌রে লায়লী
ভাবত বেকল তৈলুঁ ॥
মু-এ কুশাদী জানম বুর্দি
বলিআ পিটালু মোরে।
শব ন খুপতম রোষ ন খেদিম
কতেক পোড়সি মোরে॥"[১৪]

মানে,— আঃ কি করলাম মুখ তোমাব দেখলাম,
উন্মত্ত পাগল হ'লাম।
যেন মজনুঁ আমি লায়লীর জন্য
ভাবে বিকল হ'লাম ॥
(হে আমার প্রিয়া), চুল এলিয়েছ পরাণ কেড়েছো
সবলে পিটালে মোরে।

রাতে না ঘুমালাম দিনে না খেলাম
কতবা পোড়াস আমারে ॥

বাংল ভাষায় এই শ্রেণীর কবিতা ইতিপূর্বে আর রচিত হয়নি। যতদূর জানা যায়, এরও শতাধিক বৎসর আগে উর্দু ও ফারসী মিশিয়ে এই শ্রেণীর কবিতা লিখেছিলেন বিখ্যাত সঙ্গীত-সাধক ও ঐতিহাসিক আমীর খসরুও (১৩৩৭)। খসরুও বাংলাদেশেও এসেছিলেন বলে জানা যায়। বাংলা ভাষায় মুত্‌বি আলমই 'রেখতাহ্‌' কবিতার উদ্ভাবক। সেই হিসেবে এর ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। কিন্তু আমাদের কাছে তার ভাষাতাত্ত্বিক মুল্যও অপরিসীম মনে হচ্ছে। বিশেষ করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সৃষ্টির সেই ঊষালগ্নে পারসী ভাষা ও বাংলা মিলিয়ে তিনি এই অপূর্ব কবিতাটি লিখেছেন। এবং লক্ষ্য করবার বিষয়, এতে সমকালীন চর্যাপদের পূর্ণ আবহও বিদ্যমান রয়েছে। পূর্বোদ্ধৃত কাহ্নপা ওরফে কানুপার বর্ষাপদটির সংগে যার তুলনা দেওয়ার প্রলোভন এড়ানো গেলনা। কানুপার পদটি শুরু হয়েছে এ-ভাবে—

"নগর বাহিরি রে ডোম্বী তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই যাহসি বামহন নাড়ি আ ॥

আধুনিক বরেন্দী তথা রাজশাহীর ভাষায় এর রূপান্তর করলে দাঁড়ায়

'নগর বাহিরে রে ডোমনী তোহোর কুড়িআ।
ছোঁই ছোঁই যাহছে বামহন নাড়িআ ॥

এতে ভাষাতাত্ত্বিক পরিবর্তন বড় একটা হয় না। পক্ষান্তরে আধুনিক (পশ্চিম বঙ্গীয়) ভাষায় রূপান্তর করলে এর সমগ্র চেহারাটাই বদলে যাবে। যেমন—

"নগরের বাইরে যে ডোমনী তোর কুঁড়ে।
ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে বামুন নেড়ে ॥

কৌতুহলের ব্যাপার এই যে, চর্যাপদের 'কুড়িআ' 'নাড়িআ' পশ্চিম বঙ্গে গিয়ে 'কুঁড়ে', 'নেড়ে' ইত্যাদি হয়েছে; কিন্তু সহস্রাধিক বৎসর পরেও উত্তরাঞ্চলের গ্রামবাসীর মুখে আজও তা অবিকল রয়েছে। রাজশাহীতেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। শুধু তাই নয়— চর্যাপদীয় তোহর, মোহর, যাহসি, করোছে, হামাক, তোমাক, ইত্রাদি শব্দের তেমন ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তনও ঘটেনি। এর কারণ কি? অনুসন্ধানের বিষয় নয় কি? এবার নূর কুত্‌বি আলমের কবিতাটিব পাশে রেখে বিষয়টি আরও একটু বিশ্লেষণ করা যায়।

"উহ্‌চে কর্দম রূ-এ তু দিদম
উমত পাগল ভৈলুঁ।
হামচু মজনু বাহরে লায়লী
ভাবত বেকল তৈলুঁ ॥"

বলেছি, চরণের প্রথমার্ধ ফারসী এবং দ্বিতীয়ার্ধ বাংলা। তাই দ্বিতীয়ার্ধ সম্পর্কেই বিচার্য।

তুলনীয় অন্য একটি চর্যার—

"উমত শবর পাগল শবর
মা করু গুলি গোহারি।
তোহোর নিজ ঘরিনী
নামে সহজ সুন্দরী ॥
(শবর পা—চর্যা নং ২৮)

আধুনক বাংলার :

রে উন্মত্ত শবর পাগল শবর
করিসনে গোলমাল নালিশ।
তোর নিজ ঘরনী
নামে সহজ সুন্দরী ॥

আবার কুত্‌বি আলমের—

গর তু রিয়াঈ ষিন্দাঃ শওম
মঁই শিশ ধরুঁ তোর পাএ।
মরল মুহব্বত আয্‌ শর জোওম
তুঝে জানাঁ তার নাঞি ॥
গব তোরা ব-গুযারাম খলক চে গোয়ন্দ
নেহা কেহ্নে তো সনে কৈলুঁ।
মা যা দর্দত পা কোশায়েম
এলায়ত কেনে না মেলুঁ ॥

আধুনিক বাংলায়—

যদি তুমি আসো বেঁচে যাই
আমি মাথা রাখি তোমার পায়।
অমুরাগ প্রেম মাথা দিয়ে চাই
তোমাতে তো তার জ্ঞান নেই ॥
যদি আমি তোমায় ছাড়ি
লোকে কি বলবে।
কেন তোমার সঙ্গে আমি
নেহা (=প্রেম) করলাম।
আমি তোমার জন্যে পা বাড়াই
এর থেকে কেন না মরলাম ॥

উদ্ধৃত অংশের নিম্নরেখ শব্দ ও বিভক্তি গুলিতে প্রাচীনত্বের স্বাক্ষর রয়েছে; এবং সেই স্বাক্ষর চর্যাপদেরই সমতালীয়। কবিতার লেখকের কালও চর্যাপদের অব্যবহিত পরবর্তী। তাঁর জন্মকাল জানা না গেলেও মৃত্যুকাল ৮১৮ হিঃ= ১৪১৬ খ্রীষ্টাব্দ। তাই চর্যাপদের ভাষা ও ভাব ধারার সঙ্গে তার বচনার ভাব ভাষায় সাযুজ্য থাকা আশ্চর্য নয়। তদুপরি তিনিও একজন বিখ্যাত সুফী দরবেশ ছিলেন। পরবর্তী কবি শুকুর মামুদ সম্পর্কেও একই কথা বলা যেতে পারে।

রাজশাহী জিলার ভাষা-সমস্যা :

আমাদের লক্ষ্য অবশ্য রাজশাহী জিলার ভাষাতত্ত্ব, সেদিক দিয়ে কাহ্নপা ওরফে কানুপার চর্যাপদ থেকে আধুনিক আঞ্চলিক ভাষার যে সব নমুনা পেশ করা হয়েছে, আশা করি, তা থেকে এ-কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, রাজশাহী তথা বারেণ অঞ্চলের ভাষাই বাংলা ভাষার আদি জননী বা উৎসভূমি। কিন্তু আফসোসের বিষয়, আমাদের ভাষাতত্ত্ববিদগণ এ-দিকে আদৌ দৃষ্টিপাত করেননি; ফলে বাংলা ভাষার আদি জননী হওয়ার গৌরব থেকে সে ভাষা বঞ্চিতা হয়েছে। অথচ, সত্যি কথা বলতে কি, প্রাচীন চর্যাপদের উত্তরাধিকারীত্ব নিয়ে প্রায় অর্ধ শতাধিক বৎসর ধরে বাঙালী-বিহারী-উড়িয়া-মৈথিলী ও হিন্দীওয়ালের মধ্যে যে ভয়ানক লড়াই

চলছে, আমাদের বিশ্বাস, রাজশাহী জিলার প্রাচীন ভাষা-সমস্যার মীমাংসা হলে তার মীমাংসাও সহজসাধ্য হত।

আমরা দেখেছি, কিভাবে যুগে যুগে রাজশাহী জিলার সীমানার রদ-বদল ঘটেছে। কখনও বিহার, কখনও ছোট নাগপুর, কখনও মিথিলা-বঙ্গের সীমানা জুড়ে তার ভাঙ্গাগড়া চলেছে। এখনও তার নববগঞ্জ-নওগাঁর অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে সাবেক বিহার তথা মগধ রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকা। তারই পাশ দিয়ে চলেছে প্রাচীন মিথিলা রাজ্য (বর্তমানে ত্রিহুত জিলা) বাংলা ভাষার জন্মকালে এদের সম্পর্ক ছিল আরও নিবিড়। তাই রাজশাহীর জেলার ভাষায় যে প্রাচীন বিহারী-মৈথিলী ভাষার প্রভাব থাকবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এবং তা আছেও। আমাদের ভাষাতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণও স্বীকার করেছেন যে, প্রাচীন চর্যাপদে মৈথিলী, ওড়িয়া ইত্যাদি ভাষার প্রভাব আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ আমাদের পণ্ডিত-সমাজের শুভ দৃষ্টির অভাবে রাজশাহী তথা বরেন্দ্রী এলাকার, শুধু ভাষাতাত্ত্বিক নয়, নৃতাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক, এমনকি রাজনৈতিক ইতিহাসেরও বহু জট উন্মোচিত হওয়াব সুযোগ মিলছেনা।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভাষা :
রাজশাহীর হযরত শাহ মখদুম জীবনী প্রসঙ্গ :

শুধু প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষা নয়, আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেও রাজশাহী তথা বারেন্দ্র এলাকার অবিস্মরণীয় অবদান রয়েছে। কিন্তু আফসোসের বিষয়, এই অবদান আজও বিশ্লেষিত হয়নি। আমরা এখানে রাজশাহী শহর থেকে সাম্প্রতিক আবিষ্কৃত একটি মাত্র গদ্য-গ্রন্থের কথা বলব, যাব ভাষা আধুনিক বাংলা গদ্যসাহিত্যের প্রাচীনতম নমুনা নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য, অথচ আধুনিক ভাষা-সাহিত্যের ইতিহাসে গ্রন্থখানি উপেক্ষিত। বলাবাহুল্য, বইখানি রাজশাহীর বিখ্যাত দরবেশ হযরত শাহ মখদুম রুপোশ (রহঃ) এর জীবনী সংক্রান্ত। লেখক অজ্ঞাত, তবে তার রচনাকাল ১২৪৫ সাল=১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ। অর্থাৎ বাংলা গদ্যের জনক নামে কথিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচিত "বেতাল পঞ্চবিংশতি" ও টেকচাঁদ ঠাকুর ওরফে প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলাল রচনা ও প্রকাশের যথাক্রমে ৯ (নয়) ও ২০ (বিশ) বৎসর পূর্বে রচিত ও সংরক্ষিত। উল্লেখ্য যে, শেষোক্ত দুখানি গ্রন্থকে আধুনিক বাংলা গদ্য-সাহিত্যের দিশারী পুস্তক বলে মনে করা হয়। সুধী-সমাজের অবগতির জন্য এখানে শাহ মখদুম জীবনী-গ্রন্থের প্রারম্ভিক কয়েকটি বচন উদ্ধৃত করা যাচ্ছে।

"রামপুর বোয়ালিয়া ও বর্তমান দরগাপাড়া।বহু রকম দেও এর প্রতিমূর্তি ও বহু মঠমন্দির পূর্ণ ছিল। কতক লোকে বলে একটি দেওএর নামানুসারে এই স্থান রামপুর বোয়ালিয়া নামে অভিহিত। জন শ্রুতিতে প্রকাশ বোয়ালিয়ার নিকট স্থানে সভ্য হিন্দু আগত হইয়া প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করায় স্থানকে রামপুর বলা হয়। এবং দরগা পাড়াকে মহাকালগড় বলা হইত। লোকাচারে নানারূপ উক্তি শোনা যায়। ইহার প্রকৃততা স্থির করা কঠিন।"[১৫]

অথবা

"কয়েক দিবস পর মথদুম প্রেরিত মওলাং ফকির দরবেশ গাজীগণ আসিয়া দেও আলয় ঘিরিয়া ফেলিলেন। বহু দেও ধর্মাবলম্বিগণ সমবেত হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। অনেক দৈত্য ধর্মাবলম্বি মারা পড়িল। ফকিরগণও কতক শহিদ হইল। শেষ দিনের যুদ্ধে নেতা দরবেশগণের ঘোড়া শহিদ হইয়া গেল অবস্থায় মখদুম নগরে উপস্থিত হইলেন। ঐ ঘোড়া শহিদের স্থান ঘোড়ামারা নামে খ্যাত।" উল্লেখ্য যে, এই গ্রন্থ রচনার বৎসরেই ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র

চট্টপাধ্যায়ের জন্ম হয় চব্বিশ পরগনা জিলার (পশ্চিম বঙ্গ) কাঁঠাল পাড়া গ্রামে। এর মাত্র তিন বৎসর আগে বাঙ্গালী হিন্দু সম্প্রদায়ের বিশেষ আবেদনে রাজভাষা ফারসী পরিবর্তন করে ইংরাজির প্রবর্তন হয় (১৮৩৫)। এবং বলা হয়েছে, এর অব্যবহিত পরেই বিদ্যাসাগর রচিত "বেতাল পঞ্চবিংশতি" গ্রন্থ রচিত প্রকাশিত হওয়ায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে নতুন যুগান্তর উপস্থিত হয়। কিন্তু এরই পাশাপাশি যে শাহ মখদুম জীবনীর মত সুললিত বাংলা গ্রন্থ রচিত হল, তার কোন হদিস এ-যাবত মিলেনি। তাই এ-গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে বাংলা দেশের (উভয় বাংলার) সুধী মহলে বিশেষ কৌতুহলের সৃষ্টি হয়। পশ্চিম বঙ্গের বিশিষ্ট পণ্ডিত ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন,— "সে যুগে যে এমন গদ্য লিখিত হইত তাহা নিঃসন্দেহে বিস্ময়ের বিষয়। এই বই খানির ঐতিহাসিক মূল্য আছে। বাংলায় সুফী ধর্ম প্রচারের ইতিহাস রচনায় এর একটি বিশেষ স্থান স্বীকৃত হইবে"।[১৬] বঙ্গ ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেব কথাটি আরও একটু স্পষ্ট করে বলেন,— বই খানি শুধু এক দরবেশের জীবনীই নয়, বরং রাজশাহীর ইতিহাসের একটি বিস্মৃত অধ্যায়ের আবিষ্কার।" তিনি আরও বলেন,— পীর সাহেবের জীবনী মূলে ফারসী ভাষায় লিখিত। কিন্তু তাহার বঙ্গানুবাদ হয় ১২৪৫ সালে। আমাদের জ্ঞানানুসারে বর্তমানে ইহাই মুসলিম বঙ্গের প্রাচীনতম গদ্য রচনা। সুতরাং ইহাকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় বলিতে হয়।"[১৭]

ডক্টর সাহেব অবশ্য সাধারণ ভাবে কথাগুলি বলছেন, কিন্তু বিশেষভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, গ্রন্থ খানি শুধু মুসলিম বঙ্গের নয়, সারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেরই প্রাচীনতম গদ্য-রচনা। তাই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসেও বই খানির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। পরিতাপের বিষয় এই যে, প্রাচীন বাংলার মত রাজশাহীব আধুনিক আঞ্চলিক ভাষারও কোন মূল্যায়ন আজও হয়নি। আমবা এ বিষয়ে ঐতিহাসিক, ভাষাতত্ত্ববিদ ও সুধী সমজেব আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

পরিশিষ্ট :

রাজশাহী উপভাষার সর্বনাম ও ক্রিয়ার রূপ :

ক. সর্বনাম— আমি, তুমি, সে = হামি, তুমি, তাঁই

এক বচন বহু বচন

১মা— হামি, মুই, তুই, উঁই, তাঁই।— হামরা, তোরা, অরা।

২য়া— হামাক, মোঁক, তোক, ডাক— হামগক, তোমগক, আরগক।

৩য়া— মোঁক দিয়ে, তোক দিয়ে— হামাক দিয়ে, তোমগক দিয়ে

অক দিয়ে অরগক দিয়ে।

৪র্থী— দ্বিতীয়ার মত — দ্বিতীয়ার মত

নিমিত্তার্থে-'ত'।

৫মী— হামার থিনি, মোর থিনি— হামাগে থিনি, তোরগে থিনি,

তোর থিনি, অর থিনি অরগে থিনি।

৬ষ্ঠী— হামার, মোর, তোর

তুরি, অর, অরি — হামগে, তোমগে, অবগে।

৭মী— হামাক, মোঁক ইত্যাদি — দ্বিতীয়ার মত।

খ. বলা (কওয়া) ক্রিয়ার রূপ :

অনুজ্ঞা— তুই ক।

বর্তমান— হামি কই, কঁচি, কচি,— কয়ে আওচি।

(উত্তম পুরুষ এক বচন)

মুঁই কঁও,— কচুঁ, কঁচো, কয়ে আওচো।

অতীত— মুঁই কচুঁনুঁ, হামি কচোনো।

(উত্তম পুরুষ এক বচন)

ভবিষ্যত—

(উত্তম পুরুষ এক বচন) মুঁই ক'মুঁ, ক'তেই থাকমুঁ।

হামি কমোঁ, কতেই থাকমোঁ ইত্যাদি

(মধ্যম পরুষ এক বচন- তুমি করমিন।[১৮]

পাদটীকা :

০১. The Rama Caritam of Shandhyakara Nandi Edited with sanscrit Commentaris and English translation by Dr R C Majumdar, Dr. Radhagovinda Basak and Pandit Nanigopal Banerjee The V.R.M Rajshahi 1939, P. 143

০২. পূর্ব পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সম্পাদিত। ১ম খণ্ড। বাংলা একাডেমী। ঢাকা, ১৯৬৫। পৃ: ছ।

০৩. বাংলা সাহিত্যের কথা। প্রথম খণ্ড। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। রেনেসাঁ প্রিন্টার্স। ঢাকা ১৯৬৩। পৃ: ১—৮।

০৪. উত্তর বঙ্গে সাহিত্য সাধনা। মুহম্মদ আবুতালিব। রাজশাহী, ১৯৭৫। পৃ: ২৯।

০৫. পূর্বোক্ত। পৃ: ২৯।

০৬. The Linguistic survey of India Part I vol 5 Sir G A Grierson Delhi, 1968, P 5,

০৭. শহীদুল্লাহ। পূর্বোক্ত। পৃ: ঞ।

০৮,৯,১০. রাজশাহীব ছড়া। অধ্যাপক আলমগীর জলীল সম্পাদিত। ঢাকা, ১৩৭০=১৯৬৩। ভূমিকা দ্রষ্টব্য। পৃ:১-৫৩।

১১. গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস।এ,কে, যাকারিয়া সম্পাদিত। বাংলা একাডেমী। ঢাকা, ১৯৭৪। পৃ: ১৮৩।

"১১ সও ১২ সালে দিন সাত ষষ্ঠী।
তখনি যুগান্ত পুস্তক ভুমে হৈল সৃষ্টি।"

১২. পূর্বোক্ত। পৃ: ১৮০/১৮১।

১৩. ইসলামি বাংলা সাহিত্য। ডক্টর সুকুমাব সেন। বর্ধমান, ১৩৫৮। ১ম নং। পৃ: ৪।

১৪. ইসলাম প্রসঙ্গ। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। ঢাকা, ১৯৬২। পৃ: ১০৩/১০৯।

১৫. হযরত শাহ মখদুম রূপোশ (রহ) এর জীবনোতিহাস। মুহম্মদ আবুতালিব সম্পাদিত। পাকিস্তান বুক কর্পোবেশন, ঢাকা, ১৯৬৯। পৃ: ৫২। সম্প্রতি এব দ্বিতীয় সংশোধিত সংস্কবণ বেবিয়েছে। ঢাকা, ১৯৭৯।

১৬. মাসিক 'বই'। ঢাকা কার্তিক, ১৩৭২। পৃ: ২৯। (মুখপত্র, জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র, ঢাকা)।

১৭. তালিব। পূর্বোক্ত। পবেশকক (আশীর্বাণী)।

১৮. আলমগবি জলীল সম্পাদিত 'বাজশাহীর ছড়া' গ্রন্থেব ভূমিকা প্রদত্ত তালিকা অনুসবণে।

রাজশাহীর লোক সংস্কৃতি ও লোক সাহিত্য

এস. এম. আবদুল লতিফ

'সংস্কৃতি' শব্দটি ইংরেজী 'কালচার'-এর প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করতে দেখা যায়। তবে ইংরেজী 'কালচার' অপেক্ষা বাংলা 'সংস্কৃতি' শব্দের ব্যঞ্জনা আরো ব্যাপক। যখন কোন ব্যক্তির আচর-আচরণে অমার্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায় তখন তাকে 'অনকালচার্ড' বলে অভিহিত করা হয়। কাজেই 'কালচার' শব্দের সঙ্গে অলক্ষ্যে জড়িয়ে আছে মার্জিত রুচি এবং আচরণের প্রশ্ন। অপর পক্ষে 'সংস্কৃতি' ক্ষেত্র কেবল মাত্র পরিমার্জিত জীবন চারণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। 'সংস্কৃতি'তে প্রতিফলিত হয় মার্জিত-অমার্জিত সব কিছুর সমন্বয়ে এটি জাতির ভাব-সাধনা ও জীবন চর্চার সামগ্রিক রূপ। মোট কথা সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে :

০১. জীবন যাত্রার নিয়ম পদ্ধতি অর্থাৎ রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, শিক্ষা-দীক্ষা, খেলা-ধুলা, আমোদ-প্রমোদ, ধর্ম-কর্ম প্রভৃতি;

০২. জীবন যাপনের প্রয়োজনে ব্যবহৃত বস্তু ও উপকরণাদি, যেমন ঘরবাড়ী, আসবাসপত্র, খাদ্য-দ্রব্য, বস্ত্র-অলংকার, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি,

০৩. মানসফসল অর্থাৎ শিল্প-সাহিত্য, সঙ্গীত, দর্শন-বিজ্ঞান প্রভৃতি।

অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি লোক সংস্কৃতিকে ইংরেজী 'ফোকলোর'-এর সার্থক প্রতিশব্দ বলে মনে করেছেন। এ সম্পর্কে বিতর্কের জটিল আবর্তে না গিয়ে আলোচনার সুবিধার্থে আমরা সংস্কৃতিকে দুই ভাগে ভাগ করে নিতে পারি :

০১. লোক সংস্কৃতি এবং ০২. নগর সংস্কৃতি।

এখানে উল্লেখ্য যে, ক্রমপরিবর্তন সাধিত হয়ে সমাজ জীবন প্রধানতঃ দুটো ভাগে বিভক্ত হয়েছে : (১) লোক সমাজ এবং (২) নাগরিক সমাজ। এই দুই সমাজের রুচি বোধের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। লোকজীবন যাত্রার ধারা এবং নাগরিক জীবন যাত্রার ধারা যেমন এক নয় তেমনি লোক সংস্কৃতি ও নগর সংস্কৃতির মধ্যেও অনেক পার্থক্য বিদ্যমান। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এবং বিদেশী প্রভাবে প্রভাবিত নাগরিক জীবন যাপনের প্রয়োজনে ব্যবহৃত বস্তু ও উপকরণাদির সঙ্গে লোক জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বস্তু ও উপকরণাদির তুলনামূলক একটু আলোচনা করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। নাগরিক জীবনে যেসব উপকরণ বা দ্রব্যাদি ব্যবহৃত হয় তা হচ্ছে পাকাবাড়ী, ডাইনিং রুম, টেবিল, চেয়ার, বোনপ্লেট, আলমারী, ইলেকট্রিক লাইট, ফ্যান, রান্নাঘরে গ্যাসের চুলো বা হিটার, ডিনারের টেবিল সুপ, ফ্রাই, কোরমা, কাপ, প্লেট, কাঁটা চামচ, ইত্যাদি। অপর পক্ষে লোক জীবন যাপনে ব্যবহৃত হয় কাঁচাবাড়ী, ডাইনিং রুমের পরিবর্তে রান্নাঘরে বা অন্য কোন ঘরের বারান্দায় খাবার কাজ সেরে নেওয়া হয়। ডাইনিং টেবিলের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় ঘরের মেঝে, আর চেয়ারের পরিবর্তে পিঁড়ে, মাদুর বা পার্টি। বোন প্লেটের স্থলে কখনো বা দস্তরখানা ব্যবহার করতে দেখা যায়। আলমারীর পরিবর্তে কাঠের বাকস, ঘরের তাক অথবা শিকা, ইলেকট্রিক লাইটের পরিবর্তে কুপি বাতি বা লণ্ঠন, বৈদ্যুতিক পাখার পরিবর্তে তালপাতার অথবা বাঁশের নির্মিত হাতপাখা, রান্নাঘরে গ্যাসের চুলো বা হিটারের পরিবর্তে খড়ির চুলো; বুফে পদ্ধতিতে ডিনারের পরিবর্তে মজলিস বসে এবং মজলিসে প্লেটের স্থলে কলার পাতা বা পদ্মপাতা ব্যবহার করা হয়। এসব মজলিসে সুপ-ফ্রাই,

নাটোরের উত্তরা গণভবন (দীঘাপতিয়া রাজবাড়ী)
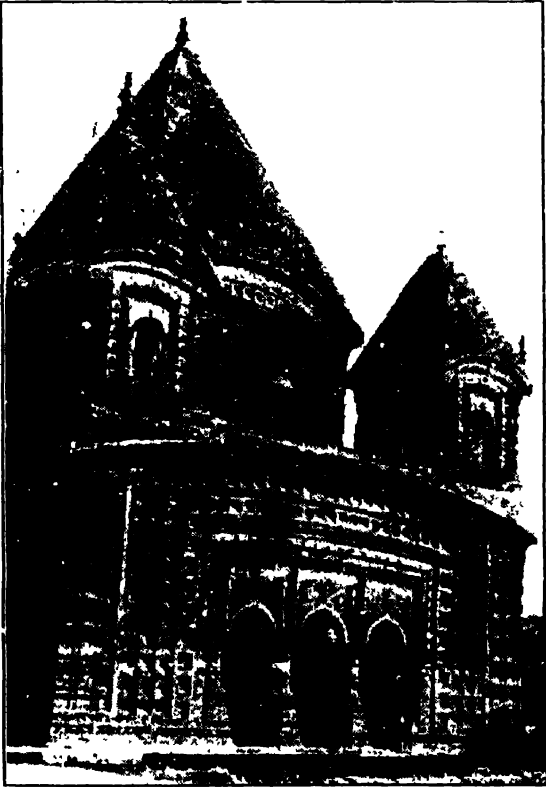
পুঠিয়া রাজের বিখ্যাত মন্দির

কোরমা পুডিং-এর ব্যবস্থা থাকেনা, থাকে সব্জি, মাছের ঘণ্ট বা মাংস, ডাল টক ইত্যাদি। নাগরিক জীবন এবং লোকজীবনের মধ্যে পার্থক্য শুধু এসব উপকরণাদি বা সামগ্রীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, জীবন যাত্রার নিয়ম পদ্ধতি এবং সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতিতেও পার্থক্য রয়েছে। নগর সংস্কৃতিকে আমরা অভিজাত সংস্কৃতি এবং লোক সংস্কৃতিকে গণসংস্কৃতি নামে অভিহিত করতে পারি।

একথা সত্য যে, রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে বা বৈদেশিক অধিকারের প্রভাবে শুধু সামাজিক জীবনেই পরিবর্তন ঘটেনা সাংস্কৃতিক জীবনেও তার ঢেউ এসে লাগে। তবে এদেশে অনেক রাজনৈতিক বিপ্লব বা পরিবর্তন ঘটলেও তার প্রভাব যতটা পড়েছে নগর জীবনে, লোক সংস্কৃতির আবাসভূমি নিভৃতি-শান্ত-শ্যামল পল্লী জীবনে সে প্রভাব ততটা আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেনি। তাই যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে নগর সংস্কৃতির অনেক পরিবর্তন সাধিত হলেও লোক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য বা মৌলিকতা আজও প্রায় অক্ষুন্ন রয়েছে।

লোক সংস্কৃতির নানা উপাদান ও উপকরণে রাজশাহী অঞ্চল সমৃদ্ধ। রাজশাহীর লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির সামগ্রিক রূপটিই চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কারণ রাজশাহী বাংলাদেশেরই একটি বিশিষ্ট অংশ। কাজেই বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানের লোকসংস্কৃতির সঙ্গে রাজশাহীর লোকসংস্কৃতির সাধারণ মিল থাকা স্বাভাবিক তবু রাজশাহীর লোকসংস্কৃতিতে কিছু অঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বা নতুনত্ব পাওয়া যাবেনা এমন নয়।

রাজশাহীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী মুসলমান। অন্যান্য অধিবাসীর মধ্যে বিশিষ্ট স্থানের অধিকাবী হিন্দু। বাকী বসবাসকারীরা খ্রীষ্টান, সাঁওতাল ও রাজবংশী। সাঁওতাল এবং রাজবংশীরা বৃটিশ রাজত্বকালে জীবিকা অন্বেষনে এসে রাজশাহীর বিভিন্ন-অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। সাঁওতালরা আসে বিন্ধ্যপর্বত ও রাজমহল পাহাড় অঞ্চল থেকে। আর রাজবংশীরা হিমালয়ের পাদদেশ এবং তার উত্তরপূর্ব পাহাড়ী অঞ্চল থেকে এসে এতদঅঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। এছাড়া রাজশাহীর কোন কোন এলাকায় কিছু ওঁরাও নামক উপজাতি বসবাস করে। এরা মূলতঃ ছোটনাগপুরের অদিবাসী ছিল। রাজশাহীর লোক সংস্কৃতিও বাংলাদেশের লোক সংস্কৃতির ন্যায় এসব নানা জাতি উপজাতির সংমিশ্রণে গঠিত লোক সমাজ থেকে উদ্ভুত আর সে কারণেই তাদের মিলিত গণজীবনদারীর পরিচয় লোক সংস্কৃতিতে সুস্পষ্ট।

রাজশাহীর বিস্তীর্ণ এলাকা 'বরিন্দ' অর্থাৎ 'বরেন্দ্র' নামে পরিচিত। পদ্মা, মহানন্দা, বড়াল, আত্রাই ইত্যাদি এ অঞ্চলের প্রধান নদ-নদী। বিল এবং জলাভূমির মধ্যে চলন বিল বিখ্যাত। সমগ্র রাজশাহী অঞ্চলের প্রকৃতি, আবহাওয়া এবং পরিবেশ প্রায় এক এবং অভিন্ন। এখানকার অধিকাংশ অধিবাসী কৃষি নির্ভরশীল। অবশিষ্ট ব্যক্তিরা বিভিন্ন বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। তাদের জীবন-জীবিকার সঙ্গে লোক সংস্কৃতির নিবিড় সংযোগ রয়েছে। বিভিন্ন বৃত্তির প্রয়োজনে বা জীবন-যাপনের তাগিদে গণমানুষের উদ্ভাবিত এবং গণজীবনে ব্যবহৃত নানা প্রকার সামগ্রী বা উপকরণাদিকে বস্তুধর্মী বা বস্তুকেন্দ্রিক লোক সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। রাজশাহী অঞ্চলের কৃষকদের ব্যবহৃত বস্তুধর্মী লোক সংস্কৃতির মধ্যে লাঙ্গল, জোয়াল, মই, মাথাল, কোদাল, হেঁসে, কাচি, দাউলি, কুড়াল, খুন্তি, গরুর মুখের ঠুসি বা গুমাই, হুঁকো, কল্কি, বুঁদি, গরু-মোষের গাড়ী, টোপর বা ছই, ধামা, কাঠ, চাকি প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কৃষকের খড়ের ঘরে, গোলাঘরে, পোয়াল পালায়, জেলের জালবোনার সাজ-সরঞ্জামে, মাঝির

নৌকায় এবং নৌকার হাল, পাল, মাস্তুল, সেঁউতী, গুণ, লগি প্রভৃতিতে কামারের হাপর-হাতুড়িতে; ছুতার মিস্ত্রীর হাতুড়ি-বাটালে, রেঁদা-করাতে; কুমারের চাকা-ছিলকায় এবং তাদের নির্মিত হাঁড়ি-পাতিলে লোক সংস্কৃতির পরিচয় সুস্পষ্ট। এ ছাড়াও গণজীবনে ব্যবহৃত নানা বস্তু যেমন ডালা কুলা, পাতি, ডোল, ঢেঁকি, ঢেঁকীর চুরুন বা মোনাই; হুগোল, জাাত, দড়িপাকানো টাকরিস, মাছ ধরা জাল, পলো, খলসুন, খাদোন, টুকসা, দোয়াড়, কোঁচ, পাঁচা, জুতি, জাঁকই, বানা, থালুই;গরুর গোবরে তৈরী ঘুটা, দেলী বা নুন্দা, চাপড়া (এগুলো জ্বালানি রূপে ব্যবহৃত হয়); বাঁশের তৈরী চালুন, খলপা বা চাটাই প্রভৃতি লোক সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য উপাদান। রাজশাহীতে এখনো টম টম অর্থাৎ ঘোড়ার গাড়ীর ব্যাপক প্রচলন আছে। এককালে ঘোড়ার গাড়ী এখানে অভিজাত সংস্কৃতির উপকরণ রূপে বিবেচিত হলেও বর্তমান লোকসংস্কৃতিব স্তবে উপনীত হয়েছে।

মৃৎশিল্প, অলঙ্কার শিল্প, নানা প্রকার খেলনা, পুতুল, কাঠশিল্প, সূচিকর্ম, লোকনৃত্য, লোকচিত্র এবং অনুরূপ নানাবিধ লোকশিল্পের মাধ্যমে রাজশাহীর গণমানুষের শিল্পপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রধানতঃ কুমার, কামার, স্বর্ণকার, ছুতার, তাঁতি, কাঁসারি, ল'লে বা ললে প্রভৃতি লোকশিল্পীরা রাজশাহীর লোক-শিল্প ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদান রেখেছে। অশিক্ষিত কারিগরের তৈরী এসব সামগ্রী গোটা সমাজ বা দেশের প্রয়োজনীয় সামগ্রীরূপে পরিগণিত হয়েছে।

হাড়ি, কলস, পাতিল ইত্যাদি মাটির বাসন-পত্র বিশেষ করে 'সখের হাড়ি' নির্মাণে রাজশাহী কুম্ভকারদের শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। মাটির সাহায্যে নানা প্রকার ক্ষুদ্র মূর্তি, পুতুল এবং দেব-দেবীর মূর্তি তৈরীর ক্ষেত্রেও অশিক্ষিত কারিগরের শিল্প প্রতিভার পরিচয় সুস্পষ্ট। তেমনি কর্মকারের লোহা ও ইস্পাতে নির্মিত হাতিয়ারে, স্বর্ণকারের নির্মিত সোনা-রূপার অলঙ্কারে, ছুতার মিত্রীর কাঠের তৈরী আসবাবপত্রে শিল্প-দক্ষতার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা প্রশংসনীয়।

কামার তৈরী নানা প্রকার বাসনপত্রের জন্য রাজশাহী জেলার চাঁপাই নবাবগঞ্জ এবং নাটোর মহকুমার কলম ও বুধপাড়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছে। রেশমী কাপড়ের জন্যও রাজশাহীর খ্যাতি রয়েছে। রাজশাহী জেলার নওগাঁ মহকুমার রানীনগর থানা মাদুর শিল্পের জন্য বিখ্যাত। এখানকার তৈরী মাদুর দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হয়। রাজশাহী অঞ্চল তৈরী খেজুর পাতার পাটি, নলের তৈরী ডোল, পাটি ও চাটাই এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। গণজীবনে এসব সামগ্রীর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। হাড়ি, পাতিল, মাদুর, পাটি ইত্যাদি প্রয়োজনমূলক (utilitarian) লোক-শিল্প (folk Art)।

নানা উৎসব অনুষ্ঠানে হিন্দু মেয়েরা ঘরের মেঝেতে, দেওয়ালে বা উঠনে রেখা চিত্রের মাধ্যমে মনোরম আল্পনা এঁকে থাকে। একে আমরা আচারমূলক (Ritualistic) লোক-শিল্প বলতে পারি। চাউলের গুঁড়া পানিতে গুলে সাদা রং তৈরী করে আলপনা আঁকা হয়। বহু প্রাচীনকাল থেকে আজ অবধি আল্পনা আঁকার প্রথা চালু আছে।

রাজশাহী অঞ্চলের মেয়েরা সাধাণতঃ শাড়ী, সায়া ও ব্লাউজ পরিধান করে। মাথায় লম্বা চুল রাখে এবং নানা প্রকারে তা বিন্যাস করে থাকে। তারা সাধারণতঃ চুলের খোপা বাঁধে অথবা বেণী বেঁধে পেছনে ঝুলিয়ে রাখে। কখনো বা এলো চুলেও থাকতে দেখা যায়। মেয়েরা চুলে লাল নীল রূপালী ইত্যাদি নানা রংয়ের ফিতা এবং খোপায় খোপা বাঁধা কাঁটা ব্যবহার করে। সাঁওতাল মেয়েদের চুলের খোপায় ফুল গুঁজতে দেখা যায়।

আঞ্চলিক লোকনৃত্যের মধ্যে রাজশাহীর সাঁওতাল নাচ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এবং লোকসংস্কৃতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নারী-পুরুষ একত্র হয়ে সাঁওতালী বাঁশীর বোলে এবং খোল মাদলের তালে যখন তারা বিশেষ ছন্দে ও ভঙ্গীতে নাচ শুরু করে তখন দর্শকের মনে এক অপূর্ব রসের সঞ্চার করে এবং আনন্দের দোলা লাগায়। সাঁওতালী নাচ ছাড়াও বিয়ের উৎসবে গ্রাম্য মেয়েরা নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গীতে লোক নৃত্যের মাধ্যমে আমোদ প্রমোদ করে থাকে। সাঁওতালদের বেশ ভূষায়, তাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত আসবাব পত্রে, হাতিয়ারে, এবং সাঁওতাল মেয়েদের অলঙ্কারে লোকসংস্কৃতি তথা লোক শিল্পের পরিচয় বিদ্যমান।

রাজশাহী জেলার সীমন্তবর্তী পাহাড়পুরে প্রাচীন সংস্কৃতির অনেক নমুনা নিদর্শন পাওয়া যায়। যেখানে আবিষ্কৃত পোড়ামাটির ফলক-চিত্রগুলো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ফলকগুলো ৮ম শতকের বলে মনে করা হয়। এগুলো তদানীন্তন গ্রামীণ শিল্পের একটি উৎকৃষ্ট নির্ভরযোগ্য আলেখ্য। এই লোকায়ত শিল্পের বিষয়বস্তু যেমন বিচিত্র তেমনি প্রাণাবেগ পূর্ণ। মনে হয় এসকল শিল্প নির্মাণকালে শিল্পীরা তাঁদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। ফলে শিল্পীরা বিষয়বস্তুর প্রাচুর্যে ও মহত্বে চরম উৎকর্ষতা দেখাতে পেরেছিলেন। শিল্পীরা তাঁদের দৈনন্দিন জীবনে দৃশ্যমান সমস্ত অভিজ্ঞতাকেই শিল্পের বিষয়বস্তু করে নিয়েছিলেন। পোড়ামাটির এই শিল্পেও কৃষ্ণলীলার দৃষ্টান্ত প্রচুর এবং এখানে সাধারণ মানুষ রূপেই তিনি চিহ্নিত হয়েছেন। "পঞ্চমন্ত্র" ও "বৃহৎকথা" প্রভৃতি লোক সাহিত্যের আখ্যান বস্তুও এই লোক শিল্পে অত্যন্ত সজীব হয়ে উঠেছে। রাজকীয় আড়ম্বর পূর্ণ সূক্ষ্ম শিল্পবোধ অপেক্ষা লোক মানসের চরিত্র চিত্রণই পাহাড়পুর পোড়ামাটির ফলক চিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বৈচিত্র্যপূর্ণ এই লোকায়ত শিল্পে প্রকৃতি ও মানুষ স্থিতিশীলতা ও গতিবেগে এবং সম্ভব অসম্ভব সকল ভঙ্গীতেই শিল্পায়িত হয়ে এক অপূর্ব মহত্ব লাভ করেছে। সহজ সরল এই সকল গ্রামীণ শিল্পীরা পুকুরের বা নদীর সহজ লভ্য এঁটেল মাটি দিয়েই তাঁদের শিল্প-মানসের রূপ দিতেন। কাজেই এই সকল শিল্পে উচ্চ স্তরের শিল্প উৎকর্ষতার অন্বেষণ বৃথা। কিন্তু তবুও এই শিল্পে প্রকৃতি, মানুষ ও জীবজন্তুর জীবনালেখ্য শিল্পায়নে শিল্পীদের সুক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার প্রকাশ অনস্বীকার্য। বাস্তবিক সে যুগের বাংলার সমাজ চিত্রনে পোড়ামাটির ফলক চিত্রের মত উৎকর্ষতা লাভ আর কোন শিল্পে দেখা যায়নি। বাংলা দেশের প্রত্যন্ত সীমায় বসবাসকারী আদিম উপজাতিদের স্ত্রী পুরুষ সকলেই উপজাতীয় সকল বৈশিষ্ট্য নিয়ে এই শিল্পে উপস্থিত। এছাড়া জীবজন্তু, কিন্নর কিন্নরী ও গন্ধর্ব প্রভৃতির মূর্তিও পাহাড়পুর পোড়ামাটির ফলকে যথাযথ ভাবে স্থান পেয়েছে। উপবিষ্ট মনুষ্য মূর্তি, ব্যায়ামবিদের হাতের উপর দেহের ভারসাম্য রক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন শারীরিক কৌশল, সন্তান ক্রোড়ে জননী, কূপ হতে পানি উত্তোলন কারিনী বা কলসী কাঁখে নারী. স্ত্রী ও পুরুষ যোদ্ধা, রথারোহী, তীরন্দাজ, কঙ্কালসার কুব্জদেহ কাঁধে ঝুলায়মান বোঝা ও মুখে লম্বা দাড়ি বিশিষ্ট লাঠি হাতে পথিক সন্ন্যাসী, পুজারত ব্রাহ্মণ, লাঙ্গল কাঁধে কৃষক ও বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রসহ স্ত্রী পুরুষ, গায়ক গায়িকার প্রতিকৃতি অতি দক্ষতা ও সজীবতার সঙ্গে ফলকে চিত্রায়িত হয়েছে। এছাড়া রয়েছে সমস্ত জন্তু-জগৎ, গাছ, লতা-পাতা ও ফুল প্রভৃতি। সিংহ, ব্যাঘ্র, মহিষ, হরিণ, শৃগাল, হস্তী, শূকর বানর, বেজী, খরগোস, সর্প এবং টিকটিকি প্রভৃতি সরিসৃপও নিজস্ব ভঙ্গীমায় অত্যন্ত স্বাভাবিকতার সঙ্গে ফলকচিত্রে শিল্পায়িত হয়েছে। অনুরূপভাবে রাজহংস, পাতিহাঁস, মাছ ও কচ্ছপ প্রভৃতিকেও তাদের নিজস্ব চলনভঙ্গীমায় আমরা পাহাড়পুর

পোড়ামাটির ফলকে দেখতে পাই।[১]

এতদঅঞ্চলের নানা স্থানে প্রাপ্ত লোক শিল্পের অনেক নমুনা নিদর্শন রাজশাহী বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

নানা ধরনের কাঁথা তৈরী রাজশাহী জেলার অন্যতম লোক শিল্প। এ সব কাঁথা গুলো পুরাতন শাড়ী এবং অব্যবহার্য কাপড় চোপড় দিয়ে নিপুণ সূচী কর্মের সাহায্যে মজবুত করে তৈরী করা হয়। নবাবগঞ্জ মহকুমার নকসী কাঁথায় মেয়েদের অসাধারণ শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। 'তৈরী হবার পর নকসী কাঁথাকে দেখায় একখানি মনোরম বর্ণাঢ্য ছবির মত। নানা ছাঁদের নকসা সজ্জা, গাছ, লতা-পাতা, ফুল ও ফল, মানুষ পশুপাখীর ছবি সূঁচ সুতোয় কাঁথায় ফুটিয়ে তোলা হয়। ছবিগুলির বিষয় বস্তু গ্রাম জীবনেরই টুকরো বিশেষ, শিল্পীর নিজের চোখে দেখা, নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আহরণ করা।[২]

এসব নকসী কাঁথা 'সুজনী' নামেও পরিচিত। সুজনী কাঁথা সাধারণতঃ উৎসবাদিতে গালিচা হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

এছাড়া বালিশের নানা প্রকার নকসা করা ওয়াড়, আয়নার আবরণী, কোরান শরীফ জড়িয়ে রাখার আবরণী, জায়নামাজ, দস্তরখানা, টেবিলের চাদর, রুমাল, কাপড়ের তৈরী হাত পাখা প্রভৃতিতেও মেয়েদের সুন্দর সূচীকর্মের এবং শিল্পী মনের স্বাক্ষর বিদ্যমান। মেয়েদের তৈরী 'শিকা' এবং নকসা করা নানা ধরণের পিঠাতেও লোক শিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায়।

রাজশাহী অঞ্চলে যে সব লোক খেলার প্রচলন আছে তন্মধ্যে পুরুষদের হাডুডু, বদন, খাটিগুড়, লাঠি খেলা, নৌকা বাইচ, ডাংগুলি এবং মেয়েদের কানামাছি, নোস্তা, ছিবুড়ী, এক্কা-দোক্কা গোল্লাছুট বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা লুকোচুরি, কুমীর কুমীর, আগডুম বাগডুম, ইকড়ি মিকড়ি প্রভৃতি নানা প্রকার খেলা করে থাকে।

রাজশাহীর জন সাধারণের মধ্যে নানা রকম বিশ্বাস বা সংস্কার রয়েছে। যে গুলোকে আমরা লোক বিশ্বাস বা লোক সংস্কার বলে অভিহত করতে পারি। যেমন :

০১. মাথার উপর দিয়ে কাক কা কা রবে ডেকে গেলে বা বাড়ীর আঙ্গিনায় বসে অনবরত ডাকতে থাকলে প্রিয় জনের মৃত্যু সংবাদ বা অমঙ্গল জনক কোন কিছু আশঙ্কা করা হয়।

০২. পেচার ডাক অমঙ্গল সূচক বলে মনে করা হয়।

০৩. যখন বৃষ্টির কোন সম্ভাবনা দেখা যায়না তখন ব্যাঙ বিয়ে দিলে বা ঢেঁকী উল্টা করে পুতে রাখলে বৃষ্টি হয়।

০৪. একটির সঙ্গে অপর একটি জোড় লাগা কলা খেলে যমজ সন্তান হয়।

০৫. দুধ দিয়ে ধুপি অর্থাৎ ভাপা পিঠা খেলে সে গরুর দুধ শুকিয়ে যায়।

০৬. যার বংশে কেউ পান বা সুপারি গাছ লাগায়নি তেমন ব্যক্তি পান সুপারির গাছ লাগালে তার সমূহ ক্ষতি হয়।

০৭. যার বংশে কেউ ইটের ভাটায় আগুন দেয়নি তেমন ব্যক্তি ইটের ভাটায় আগুন

১. ডঃ নাজিমুদ্দীন আহম্মদ— পাহাড়পুর (প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত-১১৭৫), পৃ. ২৫-২৬।
২. মুখলেসুর রহমান—বাংলার লোকশিল্প-নকসী কাথা (কাজী আব্দুল মান্নান সম্পাদিত ববেন্দ্র সাহিত্য পবিষৎ পত্রিকা— ১৬৬৭), পৃ. ৯৩।

দিলে তার বংশ নিপাত যায় বা কুষ্ঠ রোগে অক্রান্ত হয়।

৮. কেউ কথা বলার সময় 'টিক টিক' করে টিক টিকি ডাকলে তার বক্তব্য ঠিক ঠিক বলে মনে করা হয়।

৯. কোথাও যাত্রাকালে টিক টিকির ডাক অমঙ্গল সূচক। তেমনি যাত্রাকালে কেউ পিছু ডাক দিলে বা হাঁচি দিলেও যাত্রা অসিদ্ধ হয়।

১০. কোন পিঠা তৈরীর সময় অমঙ্গল আশঙ্কায় প্রথম পিঠা প্রথম সন্তানকে খেতে দেওয়া হয় না।

১১. সকালে ঘব-বাড়ী ঝাড়ু দেবার আগে ঘর থেকে ভিক্ষুককে ভিক্ষা বা অন্য কাউকে কিছু দিলে সংসারের আয় উন্নতি হয়না।

১২. সকালে ঘুম থেকে উঠে যাদের সন্তানাদি হয়নি এবং হওয়ার সম্ভাবনা নেই এমন আঁটকুড়ে নারী পুরুষের মুখ দর্শন অমঙ্গল সূচক।

১৩. গলায় দড়ি দিয়ে কেউ আত্মহত্যা করলে তার ভূত হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

১৪. মেয়েদের স্বামীর নাম মুখে উচ্চারণ করা অশুভ। এমনকি কোন মহিলার স্বামীর নামের সঙ্গে কোন বস্তুর নামের মিল থাকলেও উক্ত মহিলা বস্তুটিকে অন্য নামে অভিহিত করে। যেমন স্বামীর নাম কলম প্রামানিক হলে লেখার কলমকে 'লেখার খোঁচা', কলাকে 'আকাশী' বা স্বামীর নাম চিনি মণ্ডল হলে চিনিকে 'সাদা গুড়, ইত্যাদি রূপে বলতে শোনা যায়। শ্বশুব ভাশুবের নামের ক্ষেত্রেও উক্ত নিয়ম পালন কবা হয। এছাড়াও আরো নানা প্রকার লোক সংস্কার বা লোক বিশ্বাস রয়েছে।

চোবা-চুন্নি বা ভূত-প্রেতের ভয়ে আতুঁড় ঘবের দরজা জানালার ফাঁক এবং বেড়ার ছিদ্র সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ করা হয। আবার সূতিকাগাবের এক পার্শ্বে মরা গরুর মাথা, মুড়া ঝাঁটা, বাড়ুন, ছেঁড়া জুতা ইত্যাদিও বেঁধে রাখতে দেখা যায়। প্রসূতি বাইরে আসার প্রয়োজন হলে লোহার এটা কিছু হাতে রাখে এবং বাইরে থেকে ঘরে প্রবেশ করার পর প্রসূতিকে কখনো বা মুড়া বাড়ুন দিয়ে ঝেড়ে দেওয়া হয়। নবজাত শিশুর শিয়রেব পাশেও লোহা, গরুর হাড় এবং ছেঁড়া জুতা রাখা হয়।

বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার ন্যায় রাজশাহী অঞ্চলেও নানা প্রকার লোক চিকিৎসার প্রচলন আছে। ঝাড়া, ফুঁক, তেল পড়া, পানি পড়া বা মন্ত্র-তন্ত্রের সাহায্যে অনেক রোগের চিকিৎসা করা হয। কোন মেয়েকে ভুতে বা জিনে ধরলে ওঝা এসে মন্ত্র-তন্ত্র এবং বিভিন্ন কলা কৌশলের মাধ্যমে ভূত বা জিন তাড়ানোর ব্যবস্থা করে। সাপের ওঝাও মন্ত্র-তন্ত্রের সাহায্যে সাপে কাটা রুগীর চিকিৎসা করে থাকে। পেটের অসুখে পানি পড়া, বাতের ব্যথায় তেল পড়া এবং চোখের অসুখে ঝাড়া ফুঁক দিয়ে চিকিৎসা করতে দেখা যায়।

এ প্রসঙ্গে এতদঅঞ্চলের লোকসমাজে প্রচলিত বিশেষ অর্থবহ কিন্তু শব্দের উল্লেখ করা যেতে পারে। রাজশাহীর কোন কোন অঞ্চলের (বিশেষ করে নাটোর মহুমার) লোকাচারে নিজ স্ত্রীকে অপরের কাছে নিজ মুখে স্ত্রী বলে পরিচয় না দিয়ে 'স্ত্রী'র পরিবর্তে 'বাড়ী' অথবা 'পবিবার' শব্দ ব্যবহার করতে দেখা যায়। যেমন 'ডাক্তারের বেটা আমার বাড়ীর জ্বর' বা 'আমার পবিবারের জ্বর'। এখানে 'বাড়ী'; বা 'পরিবার' অর্থে স্ত্রী। আর 'ডাক্তারের বেটা' অর্থে ডাক্তার নিজে, ডাক্তারের ছেলে নয়। অনুরূপভাবে 'মাষ্টারের বেটা' বা 'মণ্ডলের বেটা' বলতে

মাষ্টার বা মণ্ডলকেই বোঝায়। আবার স্বামী তার স্ত্রীকে এবং স্ত্রী তার স্বামীকে কাছে ডাকার সময় 'শুনুকতো' বা 'আসুকতো' বলে ডাকতে শোনা যায়।

মোট কথা রাজশাহী অঞ্চলের লোক মানুষ বা গণ মানুষের জীবন যাপন পদ্ধতি, তাদেব আচার আচরণ, উৎসব অনুষ্ঠান, খেলা-ধুলা, যান বাহন, স্থাপত্য, শিল্প, ভাস্কর্য, লোক জীবনে ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রী, লোক সংস্কার বা লোক বিশ্বাস, লোক চিকিৎসা, লোক নৃত্য, লোক সাহিত্য ইত্যাদির সমন্বয়েই গড়ে উঠেছে রাজশাহীর লোক সঙস্কৃতি।

লোক সাহিত্য লোক সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ; লোক জীবনেব নানা অংশের, নানা কর্মের এবং নানা চিন্তার অভিব্যক্তি ঘটে লোক সাহিত্যে। অশিক্ষিত জনগণেব এ-সাহিত্য ছড়ায় গানে, প্রবাদে কবিতায় মুখে মুখেই এগিয়ে চলেছে লোক পবম্পবায়। 'লোক মুখ থেকে লিখিত রূপ এবং লিখিত রূপ থেকে আবার লোক মুখে এ-সাহিত্যের যাতাযাত থাকতে পারে।'[৩] নানা প্রকার ছড়া, সারি, জারী, গম্ভীরা, কবি বা ছন্দ, হাপ্, জাগ, মেয়েলী গীত বা বিয়ের গান, বারমাসী, আলকাপ প্রভৃতির দ্বারা রাজশাহীর লোক সাহিত্য ভাণ্ডার পূর্ণ। লোক কবিদের রচিত এসব ছড়ায় ও গানে প্রতিফলিত হয়েছে লোক-মানস এবং তাদেব পারিপার্শ্বিকতা।

ছড়া :

ছড়া লোক সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট সম্পদ। তবে এ গুলো দেশের কোন বিশেষ অঞ্চলের সম্পদ নয়। কারণ এমন প্রচুর ছড়া রয়েছে যে গুলোর জন্ম যেখানেই হোক না কেন লোকের মুখে মুখে কোথাও কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হলেও বিস্তার লাভ করেছে দেশের সর্বত্র। অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় রাজশাহী অঞ্চলেও নানা শ্রেণীর ছড়া প্রচলিত আছে। যেমন ছেলে ভুলানো ছড়া, খেলার ছড়া, প্রকৃতি বিষযক ছড়া, প্রভৃতি।

শিশুদের খাওয়ানোর সময়ে, ঘুমের সময়ে বা শান্ত করার প্রয়োজনে রাজশাহী অঞ্চলের মেয়েদেরও নানা প্রকার ছড়া আবৃত্তি করতে দেখা যায়। ছেলে ভুলানো ছড়াগুলো যে কোন সুদূরাতীতে কাদের দ্বারা রচিত তার নির্দেশ কস্মিনকালেও পাওয়া যাবে না। এ সব ছড়া চঞ্চল শিশুমনের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। বাস্তবতার মাপকাঠি নিয়ে শিশুমন যেমন কোন কিছুর বিচার করেনা তেমনি বাস্তবতার মানদণ্ড হাতে নিয়ে এ গুলোর বিচার করা চলেনা।

০১.

ঘুম পড়ানি মাসিপিসি আমার বাড়ী এসো।
খাট নাই পালঙ্ক নাই খোকার চোখে বসো ॥
বাটা ভরা পান আছে দুয়ারে বসে খেও।
খিড়কী দুয়ার খুলে দিব ফুড়ৎ করে যেও ॥
(নাটোর)।

০২.

আয় আয় চাঁদমামা আয়
চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা।

---

৩. ড মযহারুল ইসলাম-সাহিত্যিকী (শহীদুল্লাহ সংখ্যা শরৎ), ১৩৭২— পৃ. ২৩
* পাঠান্তর গরু। পাঠান্তর বাটি।

কালো গাইয়ের দুধ দিব।
দুধ খাবার খোরা দিব,
মাচার তলে জাগা দিব।
সানকি ভরা খাবার দিব,
চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা। (নাটোর)

সরল প্রাণ কবি এখানে ঘুম পাড়ানি মাসিপিসিকে বাটা ভরা পান এবং চাঁদকে কালো গাইয়ের দুধ, দুধ খাবার খোরা (বাটি), সানকি (মাটির থালা) ভরা খাবার প্রভৃতি এমন দ্রব্যদির প্রলোভন দেখিয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন যা সত্য সত্যই দেওয়া সম্ভব। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'আমরা হইলে বোধ করি পাকিজাতের মুধু, রজনীগন্ধার সৌরভ, বৌকথা-কওয়ের গান, মিলনের হাসি, হৃদয়ের আশা, নযনের স্বপ্ন, নববধুর লজ্জা প্রভৃতি বিবিধ অপূর্ব জাতীয় দুর্লভ পদার্থের ফর্দ করিয়া বসিতাম অথচ চাঁদ, তখনো যেখানে ছিল এখনো সেই খানেই থাকিত, কিন্তু ছড়ার চাঁদকে ছড়ার লোকেরা মিথ্যা প্রলোভন দিতে সাহস করিতনা— খোকার কপালে টিপ দিয়া যাইবার জন্য নামিয়া আসা চাঁদের পক্ষে যে একেবারেই অসম্ভব তাহা তাহারা মনে করিতনা। এমন ঘোরতর বিশ্বাসহীন সন্ধিগ্ন নাস্তিক প্রকৃতি তাহারা ছিল না। সুতরাং ভাণ্ডারে যাহা মজুত আছে, তহবিলে যাহা কুলাইয়া উঠে, কবিত্বের উৎসাহে তাহা অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক কিছু স্বীকার করিয়া উঠিতে পারিত না।'[8]

০৩.

ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এলো দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে?
ধান ফুরালো পান ফুরালো খাজনার উপায় কি?
আর কটা দিন সবুর কর রসুন বুনেছি।

উদ্ধৃত ছড়াটির মধ্যে দেশে বর্গীদের উৎপাতের কথা প্রকাশ পেয়েছে।
খেলার সময়েও নানা প্রকার ছড়া আবৃত্তি করতে দেখা যায়।

০১.

হামার খেড় কে মালিরে
কোন্‌টে মাটি দিলিরে
বইর ঝাড়ের তলে রে
বইর ঝমাঝম পড়েরে
টিক্‌রী আছে খোলাতে
তেড়ে যাব জোলাতে। (নবাবগঞ্জ)

০২.

আতালি পাতালি নিম চাতালি ঘর
আগুন নাই পানি নাই দাও চাট্‌টে ভাত।
আজ আমার গবর হাত

8. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব— লোক সাহিত্য (১৩৫২) পৃ. ২৭-২৮

কাল দিব সোনার থালা
দই দিয়ে ভাত। (রাজশাহী সদর)

০৩.

ঐ ছেলেটাকে ধরব
পুল্লাভাজি করব
তেল নাই নুন নাই
ক্যাঁৎ করে গিলব। (নাটোর)

০৪.

ছি গুডাগুড্ ক্যামন খেলা
দশ বার ডাক পাড়ে ফেলা---।
(নওগাঁ)

রোদ বৃষ্টি একসঙ্গে হলে রাজশাহী অঞ্চলের ছেলে মেয়েদের ছড়া কাটতে শোনা যায় :

ক.

রোদও হচ্ছে, পানিও হচ্ছে
খেক্‌শিয়ালের বিয়া হচ্ছে।
(নবাবগঞ্জ)

একই ছড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে এমনকি কখনো একই জেলার বিভিন্ন এলাকায় কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে পাওয়া যায়। যেমন রোদ-বৃষ্টির উদ্ধৃত এই ছড়াটিও রাজশাহী জেলার বিভিন্ন মহকুমার ছেলে মেয়েরা ভিন্ন ভিন্ন রূপে আবৃত্তি করে থাকে।

খ.

অদন্ত হচে পানিও হচে,
খ্যাকশিয়ালীর বিয়া হচে। (নওগাঁ)

গ.

রোদে রোদে বৃষ্টি হয়,
খ্যাঁক শিয়ালের বিয়া হয়। (নাটোর)

ঘ.

রৌদ হৈছে ম্যাগ হৈছে
খ্যাকশেয়ালীর বিহ্যা হৈছে---। (রাজশাহী সদর)।
আমের সময় ছেলে মেয়েরা আম গাছের নীচে দাঁড়িয়ে ছড়াকাটে :
বাড়ি আইলে কড়ি দিব,

পাঠান্তর আন্যাভাজি

আম পড়লে টাকা দিব। (নবাবগঞ্জ)
ঘুড়ি উড়ানোর সময়েও ছেলেরা ছড়া বলে :
পবনের বেটা হনুমান,
ক্ষুদ খাস তো মালই আন।
মালই ধরে দিব টান,
হড়হড়াতে বাতাস আন। (নাটোর)

০৫.
গপ্‌টি গুড়ু চপ্‌টি লাল
এক চাপটে ভাঙ্গব গাল
ভাঙ্গব গাল, ভাঙ্গব গাল।--- (নাটোর)।

সামাজিক পরিবেশ, আচার-আচরণ, লোক লৌকিকতা এবং স্থানীয় উচ্চারণের তারতম্য বা লোকেব মুখে মুখে রূপান্তরিত হওয়ার ফলে ছড়া গুলোর বিভিন্ন পাঠ বা রূপ পরিলক্ষিত হয়।

উল্লেখিত এসব ছড়া বাতিরেকেও রাজশাহী অঞ্চলের লোককে আরো নানা প্রকার ছড়া বলতে শোনা যায় :

ধান সস্তা পান সস্তা
আরও সস্তা মুড়ি।
আবা ছোঁড়া লিকা করল
চামড়া ঢিলা বুড়ি। (নাটোর)।

এছড়ায় বয়স্কা মেয়েকে বিয়ে করার প্রতি কটাক্ষপাত করা হয়েছে।

কাজী বাড়ীর খানা,
তিন বাগুনের চানা।
মধ্যে একটু আল,
চেরুৎ চুরুৎ ডাল।
সজি হ'ল খাট্টা,
কাজী হ'ল খাপ্পা। (নাটোর)

কোন 'কাজী বাড়ীর খানা'কে কেন্দ্র করে রচিত এটি একটি বিদ্রূপাত্মক ছড়া।

লেখা জানেনা পড়া জানেনা
সুদা এক হাকিম।
ঢাল নাই তরাল নাই
নিধুরাম সরদার। (নাটোর ও রাজশাহী সদর)।

এছড়াটিতে অসঙ্গতি পুর্ণ আচরণ বা কার্যকলাপের প্রতি ব্যঙ্গ করা হয়েছে)।

মাছের মা,
শাকের ছা।
কচি পাঁঠা,
বুড়ো মেষ।

পাঠান্তব 'পানি'। আবার 'বিষযটি' ও বলতে শোনা যায।

দইয়ের মাথা,
ঘোলের শেষ।

যে সব খাদ্য খাবারে মজা পাওয়া যায় সে সম্পর্কে এ ছড়ায় বলা হয়েছে। এ জাতীয় ছড়া পরবর্তী পর্যায়ে প্রবাদে পরিণত হতে দেখা যায়।

এক শ্রেণীর লোক গ্রাম্য হাট বাজারে বা মেলায় ঘুঙুর পায়ে নেচে নেচে এবং মুখে ছড়া কেটে কেটে তাদের বাক্সের ভিতরে ছবি দেখিয়ে টাকা রোজগার করে। বাক্সের সম্মুখ ভাগে চোখ লাগিয়ে এ সব ছবি দেখতে হয়। ছবি দেখানোর সময় যে সব ছড়া কাটে তার নমুনা নিম্নে দেওয়া হলো :

হ্যা রে দাদা দেখ ভাল,
গান্ধীরাজার মেয়ে এল।
কি চমৎকার দেখা গেল,
দাদার বাহার লেগে গেল। ইত্যাদি।

কখনো বা এক জন ঘুঙুর পায়ে নাচে এবং ছড়া কাটে আর তার সঙ্গী লোকটি বা সঙ্গীরা ছড়ার মাঝে মাঝে 'আহা বেশ বেশ' বলতে থাকে :

যমের কাচারী আমার দাদা দেখতে পায়
আহা বেশ বেশ।
যমের মাথায় শিং উঠেছে কেমন দেখা যায়
আহা বেশ বেশ।
আছে কিনা কয়ে যাবেন কত্তা মহাশয়
আহা বেশ বেশ।

এ সব ছড়াকে তারা 'মক্কা-মদীনার ছড়া নামে অভিহিত করে থাকে। অবশ্য বর্তমানে এ ভাবে ছড়া গেয়ে ছবি দেখানোর প্রচলন প্রায় লোপ পেতে বসেছে। এ প্রসঙ্গে রাজশাহী অঞ্চলে প্রচলিত ধাঁধা, প্রবাদ এবং খনার বচন গুলোও উল্লেখ যোগ্য।

উড়তে পাখী উমর ঝুমর
পড়তে পাখী খোঁদা,
আহার করতে যায় পাখী,
লেজ থাকে তার বাঁধা।
উত্তর—মাছ ধরা জাল।

এতটুকু গাছে লাল পেয়াদা নাচে।
উত্তর— লঙ্কা।

এক গাছে এক ফল
পেকে আছে টলমল। উত্তর— আনারস।

ইল বিল শুকায়ে গেল গাছের আগায় পানি।
উত্তর— ডাব।

ইল বিল শুকায়ে গেল ঢিলের আগায় পানি।
উত্তর— তরমুজ।

লাল বুড়ী হাটে যায় গালে মুখে চড় খায়।
উত্তর— হাড়ি পাতিল।

তিন অক্ষরে নাম তার পানিতে বাস করে
মধ্যের অক্ষর কেটে দিলে আকাশে উড়ে।
উত্তর— চিতল, চিল।

প্রবাদ বা প্রবচন :

কোন উল্লেখযোগ্য সামাজিক ঘটনা অথবা কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির সারগর্ভ উক্তি ক্রমে ক্রমে প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়। লোক প্রচলিত কোন ছড়া ও কাহিনীর বিশেষ বিশেষ জনপ্রিয় অংশও কিছু কাল পরে প্রবাদ বাক্যে পরিণত হতে পারে। এ ভাবে লৌকিক ছড়া, রূপকথা, এবং রসকথা থেকে অসংখ্য প্রবাদের সৃষ্টি হয়েছে।[৫]

০১.

শাশুড়ী মল সকালে
খেয়ে দেয়ে যদি বেলা থাকেত কাঁদব আমি বিকালে।
(নাটোর)।

এখানে বিদ্রূপাত্মক কটাক্ষ পাতের মধ্য দিয়ে শাশুড়ী বৌয়ের সম্পর্ক ফুটে উঠেছে। শাশুড়ীর মৃত্যুর পরেও বৌয়ের যখন কাঁদবার সময় নেই তখন এথেকে শাশুড়ী বৌয়ের সম্পর্ক বুঝতে মোটেই কষ্ট হয় না। শাশুড়ী বৌয়ের সম্পর্কের এ চিত্র আমাদের সমাজে একেবারে বিরল নয়। এতদঅঞ্চলে এ জাতীয় অনেকপ্রবাদ প্রবচন চালু আছে। যেমন—

০২.

ভাত দেওয়ার ভাতার না
কিল দেওয়ার গোঁসাই। (নাটোর)
পাঠান্তর :
ভাত দেওয়ার ভাতার নাই
কিল দেওয়ার মরদ আছে। (রাজশাহী সদর)

০৩.

অল্প আগুনে তামাক খাওয়া
আর আগরি সম্পর্কে শ্বশুর বাড়ী যাওয়া। (নাটোর)।

প্রবাদে সাধারণতঃ রূপক বা বক্রোক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। তবে সকল সময়েই যে বক্রোক্তি বা রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করা হয় এমন নয়। কখনো কখনো প্রত্যক্ষ ভাবেও উপদেশ এবং নীতিবাক্য ব্যক্ত হতে দেখা যায়। যেমন—

অগ্নি, ব্যাধি, ঋণ এই তিনের রেখোনা চিন।
দেহ ছাড়া ব্যাধি নাই, শত্রু ছাড়া শরীর নাই।
অভাবে স্বভাব নষ্ট।

পাঠান্তর 'একটু খানি'।
৫. ড. অজিত কুমার ঘোষ— বঙ্গ সাহিত্যে হাস্যরসের ধারা (১৪৬৭), পৃ. ২১৭।
পাঠান্ত; 'আড়ার আগুন,।
পূর্ব সম্পর্কে।

অতি পিরীত যেখানে, অতি বিচ্ছেদ সেখানে।
অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।
অতি চালাকের গলায় দড়ি, অতি বোকার গায়ে বেড়ি।
সকালে শুয়ে সকালে উঠে, তার কড়িনা বৈদ্য লুটে। ইত্যাদি।
খনার বচনে অনেক প্রত্যক্ষ উপদেশ পাওয়া যায়।

'প্রবাদ লোক সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ততম বাহন; বিস্তৃত জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার পরিচয় ইহাতে একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যের মধ্যে সংহত হইয়া থাকে। সংক্ষিপ্ততা ও সর্বজনীন মানবিক ভিত্তির জন্যই ইহা যেমন নিজস্ব সমাজের মধ্যে সহজেই বাপক প্রচার লাভ করে, তেমনই দেশান্তরেও ইহা সহজেই বিস্তার লাভ করিতে পারে। ইহাদের সংক্ষিপ্ততার গুণের জন্যই ইহারা নিরক্ষর লোক-সমাজের স্মৃতির উপর কোনও অনাবশ্যক ভার-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইতে পারেনা।'[৬]

০১. মরদকা বাত, হাতীকা দাঁত।
০২. বাপকা বেটা, সিপাইকা ঘোড়া
কুছ নেহি তভি থোড়া থোড়া।

ডাক ও খনার বচন :

রাজশাহী অঞ্চলে প্রচলিত ডাক ও খনার বচন নামে পরিচিত কিছু প্রবচনের নমুনা নিম্নে দেওয়া হলো :

ডাকের বচন :

০১.
কাখে কলসী পানিকে যায়।
হেট মুণ্ডে কাকেও না চায়।
যেন যায় তেন আইসে।
বলে ডাক গৃহিণী সেই সে।

০২.
ঘরে আখা বাহিরে রান্ধে।
অল্প কেশ ফুলাইয়া বান্ধে॥
ঘন ঘন চহে উলটিয়া ঘাড়।
বলে ডাক এ নারী ঘর উজাড়॥

০৩.
বলে ডাক এ সংসার,
আপনি মইলে কিসের আর।

৬. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য— বাংলার লোক সাহিত্য (প্রথম খণ্ড— ১৯৫৭), পৃ. ৫১৪।

০৪.

মাগ মরলে শ্বশুর বাড়ী যায়।
সে কান্দিয়া রাত্রি পোহায় ॥ ইত্যাদি।

খনার বচন :

০১.

রুয়ে কলা না কেট পাত।
তাতেই কাপড় তাতেই ভাত ॥

০২.

খাটে খাটায় লাভের গাঁতি।
তার অর্ধেক কাঁধে ছাতি ॥
ঘরে বসে পুছে ভাত।
তার কপালে হাভাত ॥

০৩.

হাত বিশ কবি ফাঁক।
আম কাঁঠাল পুঁতে রাখ ॥
গাছাগাছি ঘন সবেনা।
ফল তাতে ফলবেনা ॥

০৪.

যদি বর্ষে মাঘের শেষ।
ধন্য রাজার পূণ্য দেশ ॥
যদি বর্ষে ফাগুনে।
চিনা কাউন দ্বিগুনে ॥

০৫.

ভরা হতে শূন্য ভাল যদি ভরতে যায়।
আগে হতে পিছে ভাল যদি ডাকে মায় ॥

এ সব বচন গুলোও 'ছড়ার মতো করেই আবৃত্ত হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে।'

লোক সঙ্গীত লোক সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ। লোক সংস্কৃতির সাধারণ উপকরণ গুলো লোক সঙ্গীতের মধ্যে পাওয়া যায়। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার বিচিত্র অনুভূতির সুব লোক সঙ্গীতে অনুরণিত হয় বলেই এর সুর মনে জাগায় এক অপূর্ব দোলা হৃদয় আপ্লুত হয় এর রস মাধুর্যে।

কর্মসঙ্গীত বা সারিগান রাজশাহী অঞ্চলে নানা প্রকার লোক সঙ্গীতের প্রচলন আছে। কৃষক তার নিত্য কৃষিকর্ম সমাধা করতেও গান গেয়ে থাকে। ধান-পাট নিড়ানো বা কাটা, ছাদ

পেটা প্রভৃতি কর্মের তালে তালে বা নৌকা বাইচের সময় চাষী, শ্রমিক এবং মাঝি মাল্লারা সমবেত কণ্ঠে যে সমস্ত গান গেয়ে থাকে এ গুলোই সাধারণত কর্মসঙ্গীত বা সারিগান নামে পরিচিত। রাজশাহী জেলাতেও এই কর্মসঙ্গীত বা সারিগান প্রচলিত আছে।

নদ-নদী, খাল-বিল পরিবেষ্টিত রাজশাহী অঞ্চল বিশেষ করে নাটোর মহকুমার চলন বিল এবং সাঁতৈল বিল এলাকায় বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে এককালে আকর্ষণীয় নৌকা বাইচ অনুষ্ঠান হতো। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরষ্কার বিতরণের প্রথাও প্রচলিত ছিল। এসব অনুষ্ঠানে নৌকা চালক্‌রা যখন নৌকার দুই পাশে কাতার বেঁধে বসে নৌকা বাইচ অর্থাৎ এক নৌকার সঙ্গে অপর নৌকার পাল্লা শুরু করতো তখন বেঠার তালে তালে তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হোত :

হেঁইয়ারে হেঁইয়া
জোর সামালে চোট চাপটে
চলরে নাও বাইয়া।
হেঁইয়ারে হেঁইয়া। ---
--- --- --- ইত্যাদি।

'হেঁইয়ারে হেঁইয়া' অংশটুকু দোহার গণের সমবেত কণ্ঠে উচ্চারিত ধূয়া।

প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদল পরাজিত নৌকা চালকদের নানা প্রকার বিদ্রূপ করে গান ধরতো :

ওলো সুন্দরী লো সুন্দরী, তোর ক্যানে আজ মনভারী,
তোর হাতের চুড়ি কে ভাঙ্গলো, ওলো সুন্দরী --- ইত্যাদি।

অনুরূপ ভাবে পরাজিত নৌকা চালকরাও বিজয়ীদের প্রতি বিদ্রূপবাণ ছুঁড়ে মারতো :

মরি হায়রে হায়, দুঃখে পরাণ যায়,
মাগী হয়্যা মরদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গা খায়।
--- ইত্যাদি।

শ্রমিকগণ কোন ভারী বস্তু স্থানান্তরে সরাতে হলে বা ঘরের চালা উপরে উঠাতে হলে বলে থাকে :

ঐরে মার ঠেলা (সমবেত কণ্ঠে) হেঁইও
আরও জোরে --- হেঁইও।
সাবাস্ জোয়ান ---- হেঁইও
একটু আরও --- হেঁইও
ঐ ঠেলার চোটে --- হেঁইও।
---।

জারী :

রাজশাহীর বিভিন্ন অঞ্চলে জারী গান প্রচলিত আছে। করুণ এবং মর্মস্পর্শী কারবালা কাহিনীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ অবলম্বনে অধিকাংশ জারী গান রচিত। জারী ফারসী শব্দ। এর অর্থ বিলাপ। কাজেই জারী গানকে বিলাপের গান বা মাতমের গান বলা যায়। মহরমের সময় ইমাম হোসেন সম্পর্কিত জারী গান গুলো রাজশাহী অঞ্চলে ব্যাপক ভাবে গীত হতে দেখা যায়। এগুলো মহরমের জারী নামে খ্যাত :

ধূয়া : আল্লা হায় হায়দারের শোকে পরাণ জ্বলে।
আছগর বালক পিয়াসে লুটেন হোসেনজীর কোলে ॥
হোসেনজী কোলে লইয়া শিশু আপনার ॥

পানি মাংগিতে যান ফোরাতের কিনার ॥

ধুয়া : আল্লা হায় ---

যদি আল্লার বান্দা আর নবীর উম্মত হও ॥

এক কাতরা পানি আমার শিশুর মুখে দেও ॥

পানি বন্ধ করি তোমরা সবে পানি খাও।

পানির কারণে আমার ছাওয়াল মারা যায় ॥

ধূয়া : আল্লা হায় হায়দারের শোকে পরাণ জ্বলে।

আছগর বালক পিয়াসে লুটেন হোসেনজীর কোলে ॥

-- -- -- --

জারী গানে একজন প্রধান গায়েন থাকে। পায়ে নুপুর বেঁধে সে প্রায় সমস্ত গানই গেয়ে চলে এবং সঙ্গীতের ভেতর দিয়ে কাহিনী বর্ণনা করে আর তাব সঙ্গীরা গানের মাঝে মাঝে ধূয়া ধরে। এর মূল গায়েনকে 'বয়াতী' বলা হয় এবং তার সঙ্গীরা সাধারণতঃ 'দোহার' নামে পরিচিত। দোহারগণ যখন ধুয়া ধরে সেই ফাঁকে বয়াতী একু বিশ্রাম লাভের অবকাশ পায়।

পরবর্তীকালে মহররম সম্পর্কিত বিষয়বস্তু ছাড়াও রাজনৈতিক বা সামাজিক কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে জাবী গানের সুরে রচিত এবং গীত গানকেও জারী আখ্যা লাভ করতে দেখা যায়।

গম্ভীরা :

উত্তবাঞ্চলের বিশেষ করে রাজশাহী জেলার ভোলাহাট, গোমস্তাপুর, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ প্রভৃতি এলাকার অতি জনপ্রিয় লোক সঙ্গীত গম্ভীরা গান। নাচ-গান এবং নানা-নাতীর কৌতুকাভিনয়ের মাধ্যমে গম্ভীরা গানে সমসাময়িক উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী পর্যালোচনা করা হয় এবং বাঙ্গ-বিদ্রুপেব কষাঘাতে দোষ-ক্রটির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করতে দেখা যায়। 'এ গানেব মুল উদ্দেশ্য-সত্য ভাষণ বা গুমর ফাঁক করা'।

গম্ভীরা গানের ওস্তাদ বা প্রবর্তনকারী শেখ সফিউর রহমান সুফি মাস্টার নামে খ্যাত। তিনি ১৮৮৭ বা ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের মালদহ জেলায় ফুলবাড়ী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শেখ বিসারত। শৈশবকালে তিনি পিতৃহারা এবং মাতৃহারা হয়ে লেখা পড়ায় বেশী দুব অগ্রসব হতে পারেন নি।

'১৯০৭ সালে ডাক বিভাগে প্যাকারের চাকুরী দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় এবং গানের জন্য শেষ পর্যন্ত খুলনায় পোষ্ট মাষ্টার পদে উন্নীত হয়ে ১৯৫১ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।' [৭] বর্তমানে সুফি মাষ্টার রাজশাহী জেলার রোহনপুরে বসবাস করছেন।

'সুফি মাস্টার' শুধু গান রচনাই করতেন না— তার সূর, নাচের ছন্দ ভঙ্গিও শেখাতেন। এক সময়ে গম্ভীরা গান এত তীব্রতা লাভ করে যে ব্রিটিশ সরকার শঙ্কিত হয়ে উঠে এবং তাঁকে নজর বন্দী করে রাখে।' [৮] তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৭ বা ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে সুফি মাষ্টারকে একটা সোনার মেডেল উপহার দিয়েছিলেন। ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাজশাহী থেকে 'মাদার বখশ সাহিত্য-সংস্কৃতি পুরস্কার' লাভ করেন। রাজশাহীর 'উত্তরা সাহিত্য মজলিস' থেকেও গম্ভীরা গানের উদ্ভাবক হিসেবে সুফি মাস্টার পুরস্কৃত হন। তঁকে এ পুরস্কার (উত্তরা

৭. মাদার বখশ্ সাহিত্য-সাংস্কৃতিক পুবস্কার এবং সম্পন্দন সংসদ পুবস্কার' ৭৮ প্রদান উপলক্ষে প্রকাশিত বিশেষ স্মারকপত্র (স্পন্দন সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সংসদ, রাজশাহীব পক্ষে তসিকুল ইসলাম কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত-জানুয়ারী, ১৯৭৮) দ্রষ্টব্য।

সাহিত্য মজলিস পুরস্কার' ৭৬) প্রদান করা হয় ২৬শে মার্চ, ১৯৭৭ তারিখে।

গম্ভীরা গানের উৎকর্ষ ও বিকাশ সাধনে চাঁপাই নবাবগঞ্জের কুতুবুল আলম এবং রকিবুদ্দিনের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তাঁরা এ গান রচনায় ও পরিবেশনায় যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা এ প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে স্মরণীয়।

কবি গান :

কবি গান বা ছন্দ্ গান রাজশাহী অঞ্চলের বিশিষ্ট লোক সঙ্গীত। নাটোর মহকুমার কোন কোন এলাকায় কবি গানকে বলা হয় 'ছন্দ্গান'।' কবি গানে কবিয়ালরা পবস্পরে বাকযুদ্ধ কবে থাকেন ছন্দে আবদ্ধ বাক্যে। কাজেই ছন্দ থেকেই লোক সমাজে 'ছন্দ্' কথটি চালু হয়েছে।

প্রথম দিকে কবি গানের বিষয় ছিল বাধা কৃষ্ণের প্রেমগীতি।

'কবিয়ালদের মধ্যে কেহ রাধা এবং কেহ কৃষ্ণের পক্ষ অবলম্বন করিয়া পরস্পরের প্রতি তীক্ষ্ম যুক্তি তর্কের বাণ নিক্ষেপ করিতেন।' [৯] পরবর্তীকালে কবি গানে সামাজিক বিষয়বস্তুও স্থান লাভ করেছে।

কবি গানে দুটো দল থাকে। একদল অন্যদলকে প্রশ্ন করে, বিরোধীদল তার উত্তর দেয়। আসরে দাঁড়িয়ে মুখে মুখে গান বেঁধে এই আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণের মধ্যে যে বাক্ চাতুরী এবং উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় তা শ্রোতৃবৃন্দের মনে চমক না লাগিয়ে পারেনা।

হাপুগান :

রাজশাহী জেলার বিভিন্ন এলাকায় হাপুগান নামক এক শ্রেণীব লোক সঙ্গীত প্রচলিত ছিল। হাপুগান গাওয়াব পদ্ধতি একটু অদ্ভুত ধরণেব। মূল গায়েনের হাতে ছোট একটি লাঠি থাকে। সে গান করার সময় মঝে মাঝে মুখে এক প্রকার শব্দ করে এবং নিজের পিঠে নিজেই লাঠির আঘাত করে। সঙ্গীরা গানের ধূয়া ধরে এবং বগল বাজায়।

হাপুগানের নমুনা :

০১.

হাপু হাপু হাপু গাবের বিচি খাবু-তো
লাল পেয়াদা রে গেলে
কার দুয়ারে যাবু।
-- -- -- হেইলাম ফুঁতো—৩।
হেইরে এক পয়সার নুনতো
বিয়ার কথা শুনতো।
হেইলাম ফুঁতো—৩।
হেইরে এক পয়সার খই
বিয়ার কথা কই।
হেইলাম ফুঁতো— ৩।
হেইরে এক পয়াসর হরদি
বিয়া হবি জলদি।

ড. অজিত কুমাব ঘোষ— বঙ্গ সাহিত্যে হাস্যরসের ধারা (১৪৬৭), পৃ ২৪৬।

হেইলাম ফুঁতো—৩।
ইত্যাদি।[১০]

০২.

-- -- -- -- --

আল্লা আল্লা বুলোরে বান্দা ভাত নাইক ঘবে।
টুপি দিয়া ইমান ঢ্যাক্যা বাগুন চুরি করে ॥
তারে ধর্‌ব কেমন করে ॥
নিমক হারাম প্যটের ক্ষুধা নাইরে সরম তার।
দু'দিন বাদে নিভ্‌লে বাতি তামাম অন্ধকার ॥
সঙ্গ কিবা তার ॥[১১]

'টুপি দিয়া ইমান ঢ্যাক্যা বাগুন চুরি করে' পংক্তিতে ধর্মের মুখোশ পরা দুর্নীতি পরায়ণ ব্যক্তিদের প্রতি কটাক্ষপাত করা হয়েছে। বর্তমানে এতদ্ ঞ্চলে হাপু গান করতে দেখা যায় না।

বিয়ের গান :

রাজশাহী অঞ্চলে মেয়েলী গীতের মধ্যে বিয়ের গান বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বর-কনের গায়ে হলুদ এবং মুখে ক্ষীর দেওয়ার সময় পল্লী বালারা যখন বিয়ের গান ধরে তখন সমগ্র পল্লী মুখরিত হয়ে ওঠে। কোন কোন বাড়ীতে বিয়ের এক সপ্তাহ পূর্ব থেকেই মেয়েলী গীত শুরু হয়।

০১.

কুণ্ঠি গেল বরের বাপরে—
পান আনিয়া দাওরে— রে পান (ধূয়া)।
পান বিনে ভাঙ্গলো গলার সুর।
কুণ্ঠি গেল বরের দাদারে—
সুপরি আনিয়া দাওরে— রে পান।
পান বিনে ভাঙ্গরো গলার সুর।
কুণ্ঠি গেল বরের ভাইওরে
চুন আনিয়া দাওরে— রে পান।
পান বিনে ভাঙ্গলো গলার সুর।
'রে পান' অংশ টুকু উল্লেখিত গানের ধুয়া।

০২.

কাঞ্চা দুধে পাকাইলাম ক্ষেরেসা
উঠিয়া ক্ষেরেসা খাও।
মায়ে ডাকিল ওঠরে বানেরা
উঠিয়া ক্ষেরেসা খাও।
ক্ষেরেসা কইয়া গেরেদা লাগাইয়া

১০. নাটোর মহকুমার দয়ারামপুর নিবাসী ওসমান অলী সবকাবেব নিকট থেকে সংগ্রহীত।
১১. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য—বাংলার লোক সাহিত্য-প্রথম খণ্ড (১৯৫৭) থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ২৯০।

কতই নিদ্র যাও।
বাপে ডাকিল ওঠরে বানেরা
উঠিয়া ক্ষেরেসা খাও
ভাইয়ে ডাকিল---
ইত্যাদি।

হলুদ মাখার সময় বা তার পরে মেয়েরা যে সব বিয়ের গান গেয়ে থাকে তাতে মূল গানের সঙ্গে কখনো কখনো না-রে-কে, আ-রে-কে, কি-না-রে প্রভৃতি অতিরিক্ত শব্দ গুলো যোগ করে ধুয়া ধরতে দেখা যায়।

ও বিবি, তোর-না বাপেরা বড়াই-না করাছিল
ও ঘরে দিবনা বিটিক বিয়া নারে কে।
তোর-না ভাইয়েরা বড়াই-না কর্যাছিল
ও ঘরে দিবনা বোনেক বিয়া নারে-কে।
বড় ঘর দেখ্যা নারে বিবি যাচ্যা দিয়া গেল
তোকে বিয়া না-রে কে।
গোয়াল ভরা গরুনা দেখ্যা খুইজ্যা দিয়া গেল
তোকে বিয়া নারে-কে।
তোর-না চাচারা বড়-ই-না করাছিল
ও ঘরে দিবনা ভাস্তির বিয়া নারে কে।
গোলা ভরা ধ্যান-না দেখ্যা য্যাচা দিয়া গেল
তোকে বিয়া নারে-কে।
বাকস ভরা গয়না-না দেখ্যা খুইজ্যা দিয়া গেল
তোকে বিয়া নারে-কে।
গুদাম বোঝাই পাট-না দেখা সাধ্যা দিয়া গেল
তোকে বিয়া নারে-কে। ---

ব্যাঙ বিয়ের গান :

বৃষ্টি না হলে রাজশাহীতে ব্যাঙ বিয়ের প্রচলন আছে। এ উপলক্ষ্যে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা একত্রিত হয়ে বাড়ী বাড়ী চাল, পয়সা ভিক্ষা করার সময় সমবেত কণ্ঠে গান ধরে :

দেরে আল্লা দে পানি।
মতিরানী চাল পানি,
শাগের ভুঁইয়ে চির চিরানি,
ধানের ভুঁইয়ে হাটু পানি,
দেরে আল্লা দে পানি। (রাজশাহী সদর)।

জাগ গান :

জাগ গান নামে পরিচিত এক প্রকার লোকসঙ্গীত রাজশাহীর পল্লী অঞ্চলে বিশেষ করে নাটোর মহকুমায় প্রচলিত আছে। রাত জেগে এ গান গাওয়া হয় বলে এর নাম জাগ গান। জাগ গান

সাধারণত অলৌকিক ঘটনাবলীতে পূর্ণ। অধিকাংশ গানে সোনাপীরের মহিমা কীর্তন শোনা যায় :

- - - - - - -

হাতে আশা মাথায় তাজরে খড়ম রাঙ্গা পায়।
ধীরে ধীরে দুটি ভাই গোয়াল নগর যায়।

- - - - - - - -

কালু ঘোষের বাড়ীত যায়া জিগার হাকিল
ঘর হতে কারুর নারী ভিক্ষা আনিল।
ওরে— ভিক্ষা লওয়ার ফকির নয়রে ভিক্ষা লয়ে যাব।
সোয়াসের দুগ্ধ দিলে খায়ে দোয়া দিব।
ওরে— এক মুষ্টির ফকির নয়রে দুই মুষ্ঠি চাস
কোন বা মুখ খান লিয়া তুইরে গাভীর দুগ্ধ খাস।
ওরে— সোনাপীর উঠিয়া বলে মানিক পীররে ভাই
এসেছি গোয়াল নগর জাহির করে যাই।

- - - - - - - - - - -

ওরে— ওখন হতে দুটি ভাই বাড়ীর বাহির হলো
পালের পরধান গাভী টলিয়া পড়িল।
ওরে— কান্দেরে গোয়ালের নারী হাতে লয়ে লোটা
পালে ম'ল সাত শ গাভী ঘরে মল বেটা।
ওরে— কান্দেরে গোয়ালের নারী হাতে লয়ে দাও
পালে মল সাত শ গাভী ঘরে মল মাও।
ওরে— কান্দেরে গোয়ালের নারী হাতে লয়ে ঘটি
পালে মল সাত শ গাভী ঘরে মল পতি।
ওরে— কান্দেরে গোয়ালের নারী হাতে রয়ে মশুর
পালে মল সাত শ গাভী ঘরে মল শ্বশুর।

- - - - - - - - - - -

ওরে—সোনাপীর উঠিয়া বলে মানিক পীররে ভাই
মাইরেছি রাখালের ধন+ জীলায়++ দিয়া যাই।
জিন্দা চার যুগের সার
মারিয়া জীলাতে পার মহিমা তোমার।
ওরে— সরসর বলিয়া পীর বসল গিয়া খাটে
সাত দিনকার মরা গাভী জল খায় ঘাটে।
ওরে— সরসর বলিয়া পীর মারে আশার বাড়ি
সাত দিনকার মরা গাভী করে লড়া লড়ি।
ওরে— হাঁসেরে গোয়ালের নারী হাতে লয়ে লোটা।
পালে জীলায় সাত শ গাভী ঘরে জীলায় বেটা।
ওরে— হাঁসেরে গোয়ালের নারী হাতে লয়ে দাও
পালে জীলায় সাত শ গাভী ঘরে জীলায় মাও।

+ পাঠান্তর গরীবের ধন। ++ পাঠান্তর জীয়ায়।

ওরে— হাঁসেরে গোয়ালের নারী হাতে লয়ে ঘটি
গালে জীলায় সাত শ গাভী ঘরে জীলায় পতি।
ওরে— হাঁসেরে গোয়ালের নারী হাতে লয়ে মগুর
পালে জীলায় সাত শ গাভী ঘরে জীরায় শ্বশুর।
- - - - - - - - - - - - ইত্যাদি।[১২]

উদ্ধৃত গানটির অনুরূপ অপর একটি জাগ গান :

আশা হাতে তাজ গো মাথে সোনার খড়ম পায়
হেলিতে দুলিতে পীর-রে গোয়াল নগর যায়।
(কোরাস) : ও পীর কাল জামা গায়
হেলিতে দুলিতে পীর-রে গোয়াল নগব যায়।
লাইলাহা কলেমা পড়ি ছাড়িল জিকির
বাড়ীত ছিল কালুর মা-রে দেখিল ফকির।
(এ হে) ভাঙ্গা কুলার আগায় লয়ে এক মুঠি চাউল
ভিক্ষা লয়ে কালুর মারে বা'র বাড়ী দাঁড়ায়।
ভিক্ষা লওয়ার ফকির লয়মা ভিক্ষা লিয়া যাব
শিকার উপর খোয়া দুধ মা দুই ফকিরে খাব।
গাছ তলার ফকির তোরা গাছতলাতে বাসা
আমার ঘরের দুধ খাবিরে এতই করিস আশা।
এ কথা শুনিয়া পীর-রে বাড়ীর বাহির হ'ল
পালে ছিল দোয়াল গাইরে পড়িয়া মরিল।
(কোরাস) : ওরা দুই ভাই ফকির হইয়া
জগৎ মঞ্জালোরে, ওরা দুই ভাই।
কন্দেরে গোয়ালের নারী হাতে করে কাচি।
গাভীর বদলে ক্যানে না মরিল চাচী।
কান্দেরে গোয়ালের নারী হাতে ক'রে দাও
গাভীর বদলে ক্যানে না মরিল মাও।[১৩]

পরিশেষে গোয়ালের নারী ফকিরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং দুধ ভাত খাওয়ায়। অতঃপর ফকিরের কেরামতিতে মৃত গাভী প্রাণ ফিরে পায় ইত্যাদি কাহিনী গানটির পরিশিষ্ট অংশে বর্ণিত হয়েছে।

সমস্ত পৌষ মাস ধরে কৃষক বালকগণ দল বেঁধে রাত জেগে বাড়ী বাড়ী জাগ গান গেয়ে ভিক্ষা করে বেড়ায়। তাদের এই সখের ভিক্ষা লব্ধ চাউল এবং অর্থ দিয়ে পৌষ সংক্রান্তির দিন বিপুল সমারোহে মাঠের মধ্যে ভোজের বা শিরনির আয়োজন করে।

সোনারায় বা সোনাপীর, কারুগাজী, মানিকপীর, সত্য পীর প্রভৃতির নামে নানা প্রকার জাগ গান গাওয়া হয়। বর্তমানে এ ভাবে জাগগান গাওয়ার প্রথা প্রায় লোপ পেতে বসেছে।

পাঠান্তব গরীবের ধন। পাঠান্তর জীযায়।

১২. নাটোব মহকুমাব দয়াবামপুর নিবাসী ওসমান আলী সবকারের নিকট থেকে সংগৃহীত।

১৩. এম এ. হামিদ—চলন বিলের ইতিকথা (১৯৬৭) থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ৪৩৫-৪৩৬।

আলকাপ :

রাজশাহীর অপর এক জনপ্রিয় লোক সঙ্গীত আলকাপ গান। আলকাপ গানে অভিনয়ের মাধ্যমে যে হাস্যরসের সৃষ্টি করা হয় তা উপভোগ্য। নবাবগঞ্জ মহকুমায় এ গানের প্রচলন বেশী। আলকাপ গানে অনেক সমাজ চিত্র পাওয়া যায়।

রাজশাহীর কোন কোন অঞ্চলে একদিল নামক এক প্রকার পালাগান প্রচলিত ছিল। এ গানে সমাজ জীবনের শঠতা ও প্রবঞ্চনার অনেক চিত্র প্রতিফলিত হোত :

ভাই বড় দুষমুন
ভাই নিল ষোল কাঠা
আমক দিল দুই মুন। ইত্যাদি।

মাদারের গান :

এতদ্ অঞ্চলে প্রচলিত মাদারের গান এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। লোক সমাজে অসুখ-বিসুখে মাদার পীরের গান মানত করতে দেখা যায়। মাদার একজন কামেল পীর বলে পরিচিত। এ গানের প্রধান চরিত্র দুটি : মাদার পীর ও তাঁর শিষ্য জুমল।

যোগীগান :

রাজশাহী জেলার বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ করে নাটোর অঞ্চলে এককালে যোগী গান আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। যোগী একজন সংসার ত্যাগী হিন্দু সিদ্ধ পুরুষ। বাপ মা শৈশব কালেই তাঁকে বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু স্ত্রীর যৌবন লাভের পূর্বেই তিনি সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হন। যৌবন প্রাপ্তির পর তাঁর স্ত্রী স্বামীর অভাব বোধ করেন এবং যোগিনী বেশে বেরিয়ে পড়েন স্বামীর সন্ধানে। পরে সাক্ষাৎ ঘটে তাঁদের উভয়ের। যোগী তাঁর স্ত্রীকে চিনতে পারলেও যোগিনী ঠিকমত চিনতে পাবেন না তাঁব স্বামীকে। তাই নানা প্রকার প্রশ্ন করে যোগিনী যাচাই করেন যোগীকে। যেমন যোগিনী প্রশ্ন করেন :

'চার কালো দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ'।

যোগী জবাব দেন :

'কাক কালো, কোকিল কালো, কালো ফিঙের বেশ।
তাহার অধিক কালো, কন্যে, তোমার মাথার কেশ।'
যোগিনী এ জাতীয় আরো অনেক প্রশ্ন করেন :
'চার হিম দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ'
জবাব : 'হিম জল, হিম স্থল, হিম শীতল পাটি।
তাহার অধিক হিম, কন্যে, তোমার বুকের ছাতি।'

এভাবে অনেক সওয়াল জবাবের পর অবশেষে মিলন ঘটে তাঁদের।

বারোষা বা বারমাসী : রাজশাহীর প্রায় সকল এলাকাতেই বারোষা বা বারমাসী নামে পরিচিত একক কণ্ঠ সঙ্গীত শোনা যায়। এ সঙ্গীতে প্রধানত প্রেম স্পর্শ-কাতর বিরহ বিদগ্ধ নারী-হৃদয়র ব্যথা-বেদনার সূব ধ্বনিত হয় :

আগুন মাসে নুতন খানা, পৌষ মাসে নাইওর মানা রে,
মাঘ মাস্যিা শীত গেল নারীর বুকেতে—

বিদেশেতে রইলা প্রাণ বন্ধুরে।
- - - - - - - - ইত্যাদি।

বিভিন্ন বারমাসী-সঙ্গীতে সাধারণতঃ অগ্রহায়ণ থেকে মাস গণনা করতে দেখা যায়।

ধড় বিচারী বা ফকিরী গান :

গুপীযন্ত্র বা একতারা সহযোগে যে সব দেহতত্ত্ব মূলক বা মারফতী গান গাওয়া হয় সে গুলেকে এতদ্ অঞ্চলে ধড় বিচারী বা ফকিরী গান বলে। কখনো দুই গায়কের মধ্যে ধড় বিচারী বা মারফতী গানের পাল্লা (বাহাস) চলে। এই দেহতত্ত্ব মূলক বা আধ্যাত্মিক গান গুলো গুপীযন্ত্র হাতে দঁড়িয়ে নাচের ভঙ্গিতে গাওয়া হয়।

ধুয়া :

প্রকৃত পক্ষে ধূয়াগান বলে অতীতে পৃথক কোন গান ছিল না। গানের যে অংশ দোহারগণ পুনরাবৃত্তি করে তাকেই ধুয়া বলা হয়। জারী, সারি, কবি, মেয়েলী প্রভৃতি গানে সুরকে জাগিয়ে রাখার জন্য ধুয়া অর্থাৎ অতিকথিত একটি বিশেষ পদ বা অংশ বারবার আবৃত্তি করা হয়ে থাকে। অবশ্য পরবর্তী কালে বন্যা, ঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা কোন ব্যক্তি বিশেষের বা সমাজের কোন বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত কহিনী গানের ছন্দে-সুরে রচিত হয়েছে সে গুলোকেও ধুয়া বলতে দেখা যায়। যেমন 'কমেদ পাঠকের ধুয়া,' 'রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ডক্টর মোহাম্মদ শামসুজ্জোহার শহীদের কবিতা' বা ধুয়া, 'শহীদে ডাঃ ছালাম' 'ঝড়ের ধুয়া' 'বানের ধুয়া' এ ধরণের শত শত ধূয়া রাজশাহীর গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে রয়েছে। জারী-গানের ঢঙে রচিত এই ধুয়াগুলো একক কণ্ঠে এক বিশেষ সুরে পঠিত বা গীত হয়।

ধুয়া গানের নমুনা :

ডক্টর জোহার শহীদের ধূয়া :
প্রথমে বন্দিলাম প্রভু নিরাকার
নি গুণে কর কৃপা পরোয়ার দেগার।
শোনেন ভাই সকলে
শোনেন ভাই সকলে শোনেন দুঃখের ঘটনা,
ঘটনার কথা লিখতে লাগলে কলম চলেনা।
হল রাজশাহীতে—
হল রাজশাহীতে আছে তাতে ডক্টর জুহা নাম,
ভারসিটিতে লেকচার দেওয়া তাহার ছিল কাম।
তিনি তাহা ছাড়াও - - - - -
ইত্যাদি।[১৪]

শহীদে ডাঃ ছালাম :

ও প্রথমে আল্লা বলো কলম খানি হাতে তুলে নিয়া
পিতা মাতা গুরু পদে সালাম করিয়া, পরে বলে যাই।
-- -- -- --
জেলা রাজশাহীতে ২ আছে তাতে বাগাতী পাড়া থানা
মামলারো ব্যাপারে ভাই এ সব গেল জানা।

গ্রাম দয়ারাম পুরে ২ বসত করে ছালাম ডাক্তার,
হাতেমের তুল্য ছিল ব্যবহার তিনার।
বহু জমাজমি নহে কমি টাকা অফুরান,
গরিবো কাঙ্গাল দেখে সদাই করেন দান।
তিনি এবাদতে ২ বন্দেগিতে এতই পরহেজগার
ডাইরীতে মিলেনা তাঁর নামাজ কাজার,
করেন ডাক্তারী, তাবেদারী দেশেরও এলাকার
ভিলেজ পলেটিকস শুরু করিলেন ফের।
লোকের ভাল করা, সুবিধা করা ছালামের কাম
দ্বিতীয় হাতেম যেন দেশেরও সুনাম।
রাখি এ সব কথা ২ বলি হেথা খুনের বিবরণ
-- -- -- -- -- --
ইত্যাদি।[১৫]

বানের ধূয়া :

নতুন একখানা ধুয়া আমি করি বর্ণনা, আপনারা শুনেন দশজনা-
কথা মিথ্যা হবে না। এবারকার বন্যা অইস্যা প্রাণত বাঁচেনা।
আউস কোষ্টা সব ডুবে গেল দেখ বিধির ঘটনা,
আল্লাহ্ বুঝি বান্দার পরে নিদয়াল হল,
মুখে আল্লাহ রসুল বল। -----
ইত্যাদি। [১৬]

লোক কবিদের রচিত এ সব ধূয়া কখনো লিখিত রূপ থেকে লোক মুখে বহুল প্রচার লাভ করে, আবার কখনো মুখে মুখে রচিত হয়ে মুখে মুখেই লোক সমাজে ছড়িয়ে পড়ে বা লোক মুখ থেকে লিখিত রূপ লাভ করে। তবে ধুয়া গুলো সাধারণতঃ দীর্ঘস্থায়ী অবেদন সৃষ্টি করতে পারেনা।

সাধারণত মানুষের জীবন যাত্রা এবং পারিপার্শ্বিকতা থেকেই লোক কবিরা সংগ্রহ করেছেন লোক সাহিত্যের নানা উপাদান ও উপমা। বিভিন্ন ছড়ায় এবং গানে প্রতিফলিত হয়েছে সহজ-সরল লোক মানস-রূপায়িত হয়েছে সমাজ-জীবনের খণ্ড-বিচ্ছিন্ন নানা চিত্র।

---

১৪. রাজশাহী জেলাব আবদুলপুব পোস্ট অফিসেব অন্তর্গত চংধুপইল গ্রামেব শ্রী বর্ণজিৎ কুমাব নবকাব রচিত।
১৫. রাজশাহী জেলাব আত্রাই পোস্ট অফিসেব অন্তর্গত পুনঘইব গ্রামেব মোঃ অছিম উদ্দীন দর্জি বচিত।
১৬. এম এ. হামিদ চবন বিলেব ইতিকথা (১৯৬৭), পৃ. ৪২৮ দ্রষ্টব্য।

গ্রন্থপঞ্জী

০১. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য— বাংলার লোক-সাহিত্য (প্রথম খণ্ড—কলিকাতা : ১৯৫৭)।

০২. ঐ, ঐ (দ্বিতীয় খণ্ড— কলিকাতা : ১৯৬৩)।

০৩. ডক্টর অজিত কুমার ঘোষ— বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা (কলিকাতা : ১৩৬৭)।

০৪. অধ্যাপক আলমগীর জলিল (সম্পাদিত)— রাজশাহীর ছড়া (বাঙলা একাডেমী, ঢাকা : ১৩৭০)।

০৫. অধ্যাপক হাসান হাফিজুর রহমান ও আলমগীর জলিল (সম্পাদিত)— উত্তর বঙ্গের-মেয়েলী-গীত (বাঙ্লা একাডেমী, ঢাকা : ১৩৬৯)।

০৬. এম.এ. হামিদ— চলন বিলের ইতিকথা (পাবনা : ১৯৬৭)।

০৭. গোলাম সাক্লায়েন— বাংলায় মর্মীয়া সাহিত্য (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় : ১৯৬৪)।

০৮. মুখলেসুর রহমান—বাংলার লোক-শিল্প-নকসী কাঁথা (কাজী আবদুল মান্নান সম্পাদিত বরেন্দ্র সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা— রাজশাহী ১৩৬৭)

০৯. মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাশিম পুরী—লোক-সাহিত্যে নাইয়া গান (বাঙ্লা একাডেমী পত্রিকা-প্রথম বর্ষ-তৃতীয় সংখ্যা-পৌষ-চৈত্র ঢাকা-: ১৩৬৪)।

১০. অধ্যাপক এবাদত হোসেন— বাঙালীর জীবন ধারা ও লোক সাহিত্য (ডক্টর মযহারুল ইসলাম সম্পাদিত সাহিত্যিকী-শহীদুল্লাহ সংখ্যা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় : শরৎ, ১৩৭২)।

১১. মুহম্মদ আবদুল খালেক— রাজশাহীর লোক-সংস্কৃতি (দৈনিক বার্তা— রাজশাহী : ২০শে মার্চ ১৯৭৯ ও ২৩শে মার্চ, ১৯৭৯)।

১২. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য— বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস (কলিকাতা : ১৯৭০)।

১৩. ড. নাজিমুদ্দীন আহম্মদ— পাহাড়পুর (প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর বিভাগ কর্তৃক প্রকশিত, ঢাকা : ১৯৭৫)।

১৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর— লোক সাহিত্য (কলিকাতা : ১৩৫২)।

১৫. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ —পল্লী-সাহিত্য (ভাষা ও সাহিত্য-ঢাকা : ১৯৪৯)।

১৬. ডঃ ওয়াকিল আহমদ— বাংলার লোক-সংস্কৃতি (বাংলা একাডেমী, ঢাকা : ১৯৭৪)।

১৭. ডঃ দুলাল চৌধুরী— বাংলার লোক সাহিত্য ও সংস্কৃতি (কলিকাতা : ১৩৭৬)

১৮. ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী— লোক সাহিত্য (ঢাকা : ১৯৬৩)।

রাজশাহীর সাহিত্য ও সাহিত্যিক

মুহম্মদ মজিরউদ্দীন

রাজশাহী জেলার লেখক পরিচয় দিতে গিয়ে 'রাজশাহীর ইতিহাস'-কার এই জেলায় এক শত লেখক-লেখিকার সন্ধান পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন।[১] ঐতিহাসিকের এ তথ্য লেখক লেখিকার নামের সাময়িক পঞ্জী— কালের বিবর্তনে এবং নতুন তথ্যের সন্ধানে ও নতুন লেখক-লেখিকার আবির্ভাবে সংখ্যার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। এ জেলার সাহিত্যসাধনা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সমুহে তেমন গুরুত্ব লাভ করেনি, তাছাড়া সাহিত্যের আঞ্চলিক ইতিহাস[২] রচনার ব্যাপারেও এখানে কোন পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায় না— যদি শিক্ষা-অর্থনীতি-পূরাকীর্তি, পত্র-পত্রিকা-নাট্যচর্চ্চা ও কীর্তিত সাহিত্যিকদের পদরেণুতে জেলার মাটি ধন্য হয়েছে। কথিত অছে বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাগীতির একটি অংশ এই জেলায় রচিত, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়েছিল রামপুর বোয়লিয়া থেকে প্রকাশিত 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকায়, তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন এর 'প্রসন্ন আকাশ' [৩] নাগর নদীর মন্থর স্রোত তার এক তীবের দরিদ্র লোকালয় গোয়াল ঘর, ধানের মরই বিচালির স্তূপ, অন্যতীরের বিস্তীর্ণ ফসল কাটা শস্য খেত'[৪] দেখে দেখে। যন্ত্রযুগের কবি জীবনানন্দ দাসের প্রাণে চমক লাগিয়েছিল 'নাটোরের বনলতা সেন'। তাই এর আকাশ-মাটি, সুর-বৈচিত্র্য, মনন-চেতনা কবি-শিল্পী ঐতিহাসিকের লুব্ধ আকর্ষণের সামগ্রী।

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন এবং মধ্য যুগের অবদান গবেষণা ও অনুসন্ধানের ব্যাপার। বরেন্দ্র অঞ্চলকে, ইদানিং কেউ কেউ বাংলা ভাষার আদি নীড় বলে দাবি করছেন।[৫] বৌদ্ধ, নাথধর্ম, বৈষ্ণব-প্রভাব এবং পুথি-সাধনায়— প্রাচীন ও মধ্য যুগে, উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় যে কাব্য-সাহিত্য গড়ে উঠেছিল, রাজশাহী জেলায় তার কিছু কিছু নমুনা মিলছে। এই জেলায় বেশ প্রাচীন কাল থেকে মুসলমান আউলিয়াদের কর্মকাণ্ড এবং ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্রের সংবাদ পাওয়া গেলেও মধ্যযুগে সুফী সাহিত্যের পরিচয় এ অঞ্চলে পাওয়া যায় না। ইদানিং অকস্মাৎ দু-একটি রচনা আবিষ্কৃত হয়েছে যার ফলে মনে হচ্ছে অনুসন্ধান ও গবেষণয় নতুন তথ্যের সন্ধান মিলতে পারে। অধ্যাপক আবু তালিব আবিষ্কৃত হযরত শাহ মখদুমের জীবনী তোয়ারিখ বা অধ্যাপক মোজ্জামেল হক কর্তৃক আবিষ্কৃত বাশু দেওয়ান সম্পকিত পার্সী পাণ্ডুলিপি এ বিষয়ে নতুন আলোক সম্পাৎ করেছে। মখদুম জীবনীও মুলে পার্সীতে ছিল।

আধুনিক যুগে, প্রাচীন সাহিত্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং ঐতিহ্যের অনুসন্ধানে বরেন্দ্র অনুসন্ধ্যান সমিতির কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে একটি আন্দোলন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিকে রাজশাহীর এসিয়াটিক সোসাইটি বলা চলে। ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্র, রমা প্রসাদ চন্দ্র, গোলাম ইয়াজদানী, মৌলভী শামসউদ্দীন এবং প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি শরৎ কুমার রায়ের অবদানে সমিতি ইতিহাসের যে বিস্মৃত অধ্যায়কে উদঘাটিত করেছে তা বিস্ময় ও কৌতুহলে অপরূপ। উনিশ শতকের প্রারম্ভে পাশ্চাত্য-সংশ্রবে কলকাতা কেন্দ্রিক যে-সাহিত্য জীবনের সূত্রপাত হয়, রাজশাহীতে তার প্রভাব পড়তে বিলম্ব হয়েছিল, তবে সে কোন কোন ক্ষেত্রে নব্য শিষ্ট-সংস্কৃতির অংশভাগী হয়েছিল— শোনা যায় দেশীয় উদ্যোগে ইংরেজি প্রথায় মঞ্চাভিনয় রাজশাহীতেই প্রথম আরম্ভ হয়। বেঙ্গল স্পেকটেটর (১৮৪২) এ খবর দিয়ে [illegible] 'Vidya Sunder Yatra on English fashion'[৬] প্রযোজনা

করেছিলেন হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, বোয়ালিয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রী শারদা প্রসাদ বসু।

বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা, অভিনয় মঞ্চ স্থাপন, সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা জেলার সাংস্কৃতিক কর্মযজ্ঞে অবদান যুগিয়েছে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের ফলে রাজশাহী জেলার আয়তন বৃদ্ধি পায়। মালদহ জেলার কিয়দংশ নিয়ে নবাবগঞ্জ মহকুমার গঠিত হয় এবং পশ্চিম দিনাজপুরের কিছু অংশ জুড়ে দেয়া হয় নওগাঁ মহকুমার সঙ্গে; এই আয়তন বৃদ্ধির কারণে সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও কিছু সংযোজন ঘটে— নতুন এলাকায় আলকাপ-গম্ভীরা প্রভৃতি লোকসঙ্গীত এবং আধুনিক সাহিত্যে নতুন ক্রিয়াকাণ্ড লক্ষিত হয়।

'সৃষ্টিশীল সাহিত্যে' এ জেলার অবদান অনুসন্ধান করতে গিয়ে খানিকটা হতাশ হই; কোন অবিস্মরনীয় কীর্তি লক্ষ্য করিনা। কিন্তু 'যা আছে তাই আগলে বসে রই' আমার জন্ম ভূমির গৌরবে। কালানুক্রমিক অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণে তার পরিচয় উদঘাটিত হবে। তবে 'গবেষণামুলক কাজে' আমাদের সত্যিকার গৌরব করবার কারণ আছে বলে মনে করি— বিশ্রুত প্রতিভার অধিকারী স্যার যদুনাথ সরকার, একনিষ্ঠ সাধক অক্ষয় কুমার বা বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামের অন্যতম গবেষক রমাপ্রসাদ চন্দ্রের (জন্ম নবাবগঞ্জ মাতুলালয়ে") উত্তরাধিকার আমাদের পরম গর্বের বিষয়। আধুনিক সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে; অর্থনীতি এবং সমাজ বিজ্ঞানের নানাক্ষেত্রে যে গবেষণা এ জেলার কৃতি সন্তানরা করে যাচ্ছেন তা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের প্রেরণার উৎস হতে পারবে।

বাংলা সাহিত্যের কালপরম্পরা রক্ষা করেই এ জেলার সাহিত্য সাধনা অগ্রসর হয়েছে। আদি পর্ব বা প্রাচীন যুগ ঘটনাক্রমে এ জেলাকে গৌরব দান করেছে; মুসলিম যুগ বা মধ্য যুগে এর ইতিহাস গুরুত্বহীন নয়, ইংরেজ আমলের ব্যাপক পরিসরেই বস্তুত এর সাধনাও খানিকটা ব্যাপক হয়ে উঠেছে। এমনিভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা রাজশাহী জেলার সাহিত্য সাধনায় সুষ্ঠু অগ্রগতি অবলোকন করি।

আদি পর্ব :

বাংলা সাহিত্যের আদি পর্ব বা প্রাচীন যুগ শিল্প নিদর্শনে সমৃদ্ধ নয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত দোঁহাকোষ এবং 'চর্যাগীতিকা'-ই এর প্রধান নিদর্শন। প্রাক-তুর্কী আমলকে যদি প্রাচীন যুগ বলে গ্রহণ করা যায় তবে দীনেশচন্দ্র সেন ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এঁদের মতে ডাকার্ণব খনার বচন বা লোককথা একালের সাহিত্যিক নিদর্শন বলে পরিগণিত হতে পারে। চর্যাগীতি ছাড়া অবশিষ্ট টুকু সবই 'ওয়াল ট্রাডিশনে'র অন্তর্ভূক্ত। লোকমুখে প্রচলিত এ অঞ্চলের বচন ও কথা উপেক্ষনীয় নয়। মন্ত্রতন্ত্র, কথা-কাহিনী, প্রাচীন ডাক ও খনার বচন ব্রতকথা এ অঞ্চলে প্রচলিত আছে— আজ তা লোক-সংস্কৃতি পর্যায়ে স্বতন্ত্র মূল্যে সংবর্ধিত হচ্ছে।

অতি প্রাচীন কাল থেকে রাজশাহী জেলার উত্তরাঞ্চল বৌদ্ধ শ্রমণ ভিক্ষুদের বিচরণ ক্ষেত্র বলে পরিচিত। নওগাঁর হলুদ বিহার, জগদ্দল মহাবিহার এবং পাহাড়পুর স্তূপ, ইত্যাদি ছিল তাঁদের সাধনার ক্ষেত্র। দিগন্ত বিসারী মাঠ, ছায়া ঘেরা শান্ত জনবিরল অঞ্চলকে তাঁরা সম্ভবত সাধনপীঠ হিসেবে অনুকূল বিবেচনা করেছিলেন। এই সব বিহারে বসে বৌদ্ধ সাধক সম্প্রদায় একদা সাধনমন্ত্রোচ্চারণ করেছিলেন তারই কোন কোন অংশ বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শনরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে। রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় কারণে ভিক্ষুরা উত্তর ভারত এবং নেপালের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেছিলেন বলে মনে হয়। বাঙালি বৌদ্ধরা কুলীন সেন আধিপত্যের দাপটে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন কিন্তু মহাকাল তাঁদের কীর্তিকে অংশত রক্ষা করেছে।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মনে করেন চৌরাশি সিদ্ধার অন্যতম এবং চর্যাগীতর অন্যতম লেখক কাহ্নপা ধর্মপালদেবের রাজত্বকালে নির্মিত (৭৭০ খ্রী: ৮১০ খ্রী:) সোমপুর বিহারে অবস্থান করতেন। নওগাঁ মহকুমার অন্তর্গত পাহাড়পুরে প্রাপ্ত সিলমোহরে উক্ত আছে : 'শ্রীসোমপুরে শ্রীধর্ম পালদেব মহাবিহারীয়ার্য ভিক্ষু সংঘস্য'।[৭] এই ঐতিহাসিক সূত্রে বলা চলে নওগাঁস্থ পাহাড়পুরে বসেই কানুপা বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যা রচনা করেছিলেন। কানুপা প্রাকতুর্কী যুগেই আবির্ভূত হয়েছিলেন।

চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়ে কানুপা, কৃষ্ণাচার্যপাদ, কৃষ্ণপাদ কৃষ্ণব্রজের ভনিতা দৃষ্টে ডক্টর অসিত কুমাব বন্দোপাধ্যায় মনে করেন বিভিন্ন সময়ে একাধিক কবি কৃষ্ণাচার্য নামে অভিহিত হতেন। একজন কৃষ্ণ সোমপুর বিহারে অবস্থান করতেন বলে তিনিও স্বীকৃতি জানাচ্ছেন।[৮] 'সোমপুর অধিবাসী' কাহ্নপা সর্বাধিক সংখ্যক (১২টি) চর্যাপদ রচনা করেছিলেন। সেগুলো বাংলাপদ। সুতরাং প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শনের অন্তত কয়েকটি পদ এই জেলায় রচিত।

মধ্যযুগ : মুসলিম আমল :

সাধরণত তুর্কী বিজয় (১২০১ খ্রী:) কাল থেকেই বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ গণনা করা হয়। বৌদ্ধ যুগের অবসান, ব্রাহ্মণ্য (সেন) আধিপত্যের বিলয় এবং ইসলামের আগমন বাংলার ইতিহাসের এক সন্ধি যুগ। মুসলিম রাজত্বের প্রতিষ্ঠা উত্তর কালে, দেড়শত বছর, বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন প্রচুর নয়। তবে সুলতানী পৃষ্টপোষকতা বাংলা সাহিত্যের জন্য ঐতিহাসিক সাফল্যের যুগ। অতঃপর চৈতন্যোত্তর বাংলা সাহিত্যের ধারা ও বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র মহিমায় মণ্ডিত। সারা বাংলায় বৈষ্ণব প্রেমের বান ডেকেছিল নবদ্বীপ ও বর্ধমান থেকে প্রেমতলী পর্যন্ত এলাকায় বৈষ্ণব সাধক এবং আচার্যদের বিশেষ বিচরণ ভূমি হয়ে উঠেছিল। খেতুরীব মহোৎসব (১৫৮৩-৮৪?) বৈষ্ণব ইতিহাসের এক স্মরণীয় অধ্যায়।

ষোড়শ শতকের শেষভাগে বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলী যে প্রাণ প্রাচুর্যের সৃষ্টি করেছিল নরোত্তম দাস সে ক্ষেত্রে শক্তিশালী সাধক ও শিল্পী। তাঁর পিতৃনিবাস ছিল বাজশাহী জেলার পদ্মাতীরবর্তী গোপালপুর,[৯] জন্মস্থান গোদাগাড়ী থানার কুমারপুর,[১০] সাধনপীঠ ছিল খেতুর গ্রাম।

নরোত্তম-এর জন্ম ১৫৩১ খ্রী: মৃত্যু ১৬১১ খ্রী:। পিতার নাম কৃষ্ণনন্দ মাতাব নাম নারায়নী। ভক্ত নরোত্তম, নরোত্তমদাস নরোত্তম ঠাকুর এবং নরোত্তম দাসঠাকুর নামে পবিচিত ছিলেন। তিনি বৃন্দাবনে লোকনাথ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং জীবগোস্বামীর নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যায়ন করেন। নরোত্তম পদাবলী লেখক এবং তত্ত্বনিবন্ধকার ছিলেন— তিনি অসাধারণ চরিত্রবান এবং পণ্ডিত ছিলেন; তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল ভক্তি-রস-মধুর। ডক্টর সুকুমার সেন তাঁর রচনাবলী : নিম্নোক্ত তালিকা প্রদান করেছেন :

প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা, সাধনভক্তি চন্দ্রিকা (বা ভক্তি উদ্দীপন), সাধ্যপ্রেম চন্দ্রিকা রসভক্তি চন্দ্রিকা (বা সিদ্ধভক্তি চন্দ্রিকা), চমৎকার চন্দ্রিকা, উপাসনাপটল (বা গুরু শিষ্য সংবাদ পটল) স্মরণ মঙ্গল, স্বরূপ কল্পতরু, দেহকড়চ, প্রেমভক্তি চিন্তামনি, ছয়তত্ত্ব মঞ্জরী, ছয়তত্ত্ববিলাস, বস্তুতত্ত্ব, বস্তুতত্ত্বসার, ভজন-নির্দেশ, নবরাধাতত্ত্ব, রাগমালা, ভক্তিলতাবলী, প্রেমবিলাস, আশ্রয় নির্ণয়, ভক্তিসারাৎসার। অধিকাংশ পুথি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সংরক্ষিত আছে। এর মধ্যে কিছু লেখা নরোত্তমের নাও হতে পারে বলে ডঃ সেন সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তবু মনে হয় নরোত্তম মধ্য যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত কবি ছিলেন। প্রেম ভক্তি চন্দ্রিকা কবির শ্রেষ্ঠ রচনা—

সরল সুললিত ভাষায় তিনি ত্রিপদী ছন্দে ভক্ত হৃদয়ের অনুরাগ প্রকাশ করেছেন :

যাবৎ জনম মোর অপরাধে হইনু ভোর
বিষ্কপটে না ভজিনু তোমা
তথাপি তুমি সে গতি না ছাড়িহ প্রাণপতি
আমা সমা নাহিক অধমা।

নরোত্তমের নিবন্ধাবলী বৈষ্ণব রসতত্ত্বের আকর। তাঁর পদাবলীর মধ্যে প্রার্থনা এবং ভজন পদের সংখ্যাই অধিক। সেগুলো বৈষ্ণব সাধকদের উদ্দেশ্য লিখিত হলেও "ভাবের সার্বজনীনতা এবং আন্তরিকতা সাধারণ পাঠকশ্রোতারও চিত্ত আর্দ্র করে।"

উত্তর বঙ্গের চিন্তার ক্ষেত্রে নাথধর্ম একটি বিশিষ্ট দর্শন। এই ধর্মদর্শনকে কেন্দ্র করে বহু কাব্য সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল। এর অধিকাংশের লেখক মুসলিম কবি-শিল্পীরা। বৈষ্ণব পদ রচনা করে যেমন মুসলমান কবি বৈষ্ণব হয়ে যায়নি তেমনি নাথ সাহিত্য রচনা করেও মুসলমান কবি নাথধর্মাবলম্বী হয়ে যায়নি। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে আবদুল শুকুর ওরফে সুকুর মামুদ অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। কবির জন্মস্থান এবং পরিচয় নিয়ে বিতর্ক আছে, তবে, ইদানীং সে বিতর্কের মোটামুটি একটা সমাপ্তি ঘটেছে বলে মনে হয়। ডক্টর এনামুল হক মনে করেন শুকুব মামুদ ত্রিপুরার কবি'[১১] ডক্টর মযহারুল ইসলাম তাঁকে পাবনার গুলে বকাওলী রচয়িতার সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করেন, [১২] ডক্টর সুকুমার সেন মনে করেন রংপুরের সাকের মামুদ এবং শুকুর মামুদ অভিন্ন।[১৩] কিন্তু ডক্টর নলিনী কান্ত ভট্টশালী লিখেছেন যে সুকুর মামুদের যে পুথি তাঁর নিকট ছিল তাতে কবির নিবাস পাওয়া যায় সিন্দুর কুসুমী গ্রাম (রামপুর বোয়ালিয়াব উত্তরে।)।[১৪]

এ. কে. এম যাকারিয়া সম্পাদিত 'সুকুর মামুদেব গোপী চন্দ্রের সন্ন্যাস' (বাংলা একাডেমী ১৯৭৪) সূত্র জানা যাচ্ছে ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে পুঁথি সমাপ্ত হয়। কবির পিতার নাম শেখ আনার (আনোয়ার)? ফকির। এ থেকে কবির আবির্ভাবকাল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ বলে মনে করা চলে। অধ্যাপক আবু তালিব বলেছেন : 'বর্তমান রাজশাহী শহর থেকে মাত্র ৫/৬ মাইল দূবে (সিন্দুর কুসুমী) গ্রামে শুকুর মামুদের বাস্ত ভিটাব নিদর্শন অদ্যাপি বিদ্যমান।[১৫] আবদুস শুকুর বা শুকুর মামুদ নামক একজন কবি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রামপুর বোয়ালিয়ার অদূরে সিন্দুর কুসুমীতে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস, মৃগুল শহরের কাহিনী ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন সে সম্পর্ক সন্দেহ নেই। তিনি মধ্যযুগের অন্যতম শক্তিবান কবি ছিলেন।

ইংরেজ আমলের বিশিষ্ট সাহিত্যিকবৃন্দ :

ইংরেজ বিজয়ের পর ক্রমাগত যে নতুন সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠতে থাকে, যে সাংস্কৃতিক রূপ ও রুচি সৃষ্টি হতে থাকে তা বাঙালির সমগ্র জীবন ধারাকে নাড়া দিয়ে ছিল একথা সত্য কিন্তু রাজধানী কলকাতায় উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত স্থুল রসরুচি দেশীয় জীবনে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। কাব্য সাহিত্যে মধুসুদনের আবির্ভাবের পুর্বে আধুনিক সূক্ষ্মরুচি ও নগর সংস্কৃতির সুষ্ঠু রূপ দেশীয় জীবনে প্রতিফলিত হয়নি। সাহিত্য ক্ষেত্রে, অষ্টাদশ শতাব্দী অতিক্রান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে নতুন ধারায় আকস্মিক পরিবর্তন ঘটেনি, বরং উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বেশ কিছুকাল অনুবর্তন চলেছিল। রাজশাহীর সাহিত্যে সেই পূর্বানুবৃত্তি অনেকটাই সহজলক্ষ্য। বিষয়বস্তু, নির্মাণকলা এবং দৃষ্টিভঙ্গি কোন কোন ক্ষেত্রে অনেকদিন যাবৎ অনুবর্তিত হয়েছে। স্মরণীয় যে, পুথিকার সামির মণ্ডল (মৃঃ ১৮২৩) দোস্ত মোহাম্মদ মিয়াজী, কবি নাট্যকার করিম বকস (১৮৭৬-১৯৩০) ইত্যাদি সেই বিড়ম্বিত জীবনও, পূর্বানুবৃত্তির ধারক। ভূমির নতুন বন্দোবস্তে সামন্তবাদী ব্যবস্থাই কায়েম ছিল। জীবনে মুক্তি ছিলনা।

একদিকে সামন্তবাদী শোষকদের অত্যাচার এবং দম্ভ, অন্যদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার বিলম্বে হলেও অতীত মুখিতা দূর হতে থাকে। আত্রাইতে খাদি প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন, বিলমাড়িয়ার প্রজা বিদ্রোহ (১৯২১), বীরকুৎসা প্রজা আন্দোলন (১৯৩১), নওগাঁর আস্তান মোল্লার বিদ্রোহ (১৮৮৩-৮৮), মীর্জা ইউসুফের বিদ্রোৎসাহিনী সমিতি স্থাপন ইত্যাদি নবচেতনার পরিচয় বহন করে। আপন ঐতিহ্য, গৌরবময় অতীত অনুসন্ধানের বাসনা শিক্ষিত মানসে তীব্রতর হতে থাকে। শিলালেখ, রাজমালা পরিচয় নবাব ও রাজাদের মানবকল্যাণ ও দেশত্ববোধ আবিষ্কার এবং জাতীয় কলংক ভঞ্জনে এই জেলার শিল্পী, সাহিত্যিক, প্রত্নতাত্ত্বিকদের বিশ্বস্ত প্রয়াস পূর্ণজাগরণের দ্যোতক। পত্র পত্রিকা প্রকাশ সাহিত্য সাধনার মধ্যে কখনো অস্ফুট, কখনো উচ্চকণ্ঠে জাতীয় জাগরণের সুর ধ্বনিত হয়েছিল—কান্তকবির দেশাত্মবোধক সঙ্গীত তাৎপর্যবহ রচনা। বাংলাদেশ বা ভারতবর্ষের কোন কোন অঞ্চলের ব্রিটিশ আমলের সম্প্রদায়িক ঘটনাবলী কল্যাণবোধ সম্পন্ন মানুষকে লজ্জিত ও দুঃখিত করে—রাজশাহী সাম্প্রদায়িকতার রাহু গ্রাস থেকে চির দিনই মুক্ত— অক্ষয় কুমারের ইতিহাস চর্চা শুধু সাম্প্রদায়িক ভারসাম্যই রক্ষা করেনি; হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সমঝোতা এবং জাতীয় গৌরব সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছিল। ধামুর হাটের নফর উদ্দীনের নাটক উপন্যাস ধর্মনিরপেক্ষ মানব কল্যাণে উদ্বুদ্ধ, মীর্জা ইউসুফ, দেওয়ান নাসির উদ্দীন মুসলিম সমাজকে জাগ্রত করবার সাধনা করলেও তাঁরা ছিলেন সামগ্রিক মানব কল্যাণে সচেতন। তৈয়ব উদ্দীন চৌধুরী সামাজিক গ্লানির বিরুদ্ধে ছিলেন উচ্চকণ্ঠ—। এমনি ভাবে সামাজিক মূঢ়তা, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক জড়ত্ব, ধর্মীয় কুসংস্কার কাটিয়ে উঠবার প্রবণতা আমাদের শিল্পীদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষ্য করা গেছে। এটা সৌভাগ্যর কথা যে আমাদের কবি-শিল্পীরা অনেকেই সমাজ-নিরপেক্ষ আত্মনিমগ্নতা পরিহার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শিল্পীর মহান দায়িত্ব তাঁরা পালন করেছিলেন। জেলাব কয়েক জন বিশিষ্ট সাহিত্যিকের পরিচয় এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাচ্ছে :

সামির মণ্ডল :

রাজশাহী জেলার (সাবেক মালদহ জেলার অন্তর্গত) বসনটোলা গ্রামের অধিবাসী। গোলে বকাওলী জাতীয় উপাধ্যান নিয়ে বাক্য চর্চ্চা করেছিলেন। তাঁর দুখানি পুঁথি অধ্যাপক আবু তালিবের হস্তগত হয়েছে। কবির মৃত্যু হয় ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের দিকে।[১৬] সামির মণ্ডলের কাব্য যে অষ্টাদশ শতাব্দীর পুঁথি সাহিত্যের অনুবৃত্তি তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

দোস্ত মোহাম্মদ নিয়াজী :

পোরশার অধিবাসী ছিলেন। ঊনিশ শতকের শেষ ভাগে তিনি মিরাতোল আখবার, খয়বরের জঙ্গ, খয়রুল বাসার ইত্যাদি পুঁথি লিখে যশস্বী হয়েছিলেন।

মৌলভী এনায়েত কাজী :

তানোর থানার লবলবী গ্রামের অধিবাসী। তিনি পয়ার ছন্দে পুঁথি লিখতেন। 'কলকাতার বয়ান' ও 'সকের মেলা' তাঁর পুঁথি। কবি উনিশ শতকের শেষ দিকে জীবিত ছিলেন। এনায়েত কাজীর পুঁথিতে বিষয় বস্তু নতুন হলেও নির্মাণকলা গতানুগতিক, তবে তিনি অবশ্যই খানিকটা সমাজ সচেতন ছিলেন।

আলহাজ করিম বক্‌স সরদার :

(১৮৭৬-১৯৩০)—মহাদেবপুর থানার অন্তর্গত জোয়ানপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। যৌবনে সঙ্গীত ও নাট্যপ্রিয় করিম বক্‌স নিজ গ্রামে থিয়েটার পার্টি গঠন করেছিলেন এবং তিনি

রচনা করেছিলেন সোহরাব বধ, গাজীকালু ইত্যাদি নাটক। পুঁথির বিষয়কে তিনি নাটকে রূপায়িত করেন। তাঁর রচনা একান্তই দুস্প্রাপ্য।

অজ্ঞাতনামা গদ্য লেখক :

অধ্যাপক আবু তালিব দাবী করেছেন যে অজ্ঞাত নানা মুসলমান লেখক গদ্য ভাষায় শাহ মখদুমের জীবনী রচনা করেছেন। উক্ত জীবনী গ্রন্থের রচনাকাল ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ। তিনি এই গ্রন্থের একমাত্র পাণ্ডুলিপি রাজশাহী শহরের দরগা পাড়া থেকে উদ্ধার করেন। শাহ মখদুমের এই জীবনী গ্রন্থের গদ্য সবল সুডৌল এবং বিদ্যাসাগরী গদ্যের পূর্ববর্তী ও তা থেকে উন্নত বলে আবিষ্কারক দাবী করেছেন।[১৭] তার দাবী অনুসারে বলা যায় যে বাংলা গদ্যের নির্মাণে রাজশাহীর এই অবদান একটি ঐতিহাসিক, স্মরণীয় ঘটনা।

কালীনাথ চৌধুরী :

প্রথম রাজশাহী জেলার ইতিহাস রচনা করেন। লেখকের জন্ম হয়েছিল আত্রাই থানায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আরও কয়েকজন লেখক ইতিহাস জাতীয় গ্রন্থ বচনা করেছেন। গিরিশ চন্দ্র লাহিড়ী এবং দুর্গাদাস লাহিড়ী জীবনেতিহাস রচনা করেছিলেন। গিরিশ চন্দ্র পুঠিয়ার অধিবাসী ছিলেন— তিনি উনিশ শতকের প্রথমার্ধে জন্ম গ্রহণ করেন। 'মহারাণী শরৎকুমারী'র জীবনী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ। দুর্গাদাস লাহিড়ী 'রানী ভবানী'র জীবনী রচনা করেছিলেন। এই জীবনী গ্রন্থগুলো উত্তরকালে ইতিহাসের মর্যাদা লাভ করেছে— গ্রন্থগুলোতে সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার পরিচয় আছে।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় :

(১৮৬১-১৯৩০) : জন্ম নদীয়া জেলায়। কিন্তু তাঁর ছাত্র জীবন ও আইন ব্যবসায়ীরূপে কর্ম জীবন অতিবাহিত হয় রাজশাহীতে। অক্ষয়কুমার বাংলার অন্যতম বিখ্যাত ঐতিহাসিক। "সবদেশের ঐতিহাসিক সত্য উদঘাটন" করা ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। বিদেশী ঐতিহাসিকরা বাংলার বীর নায়কদের উপর যে কলঙ্ক আরোপ করেছিল তিনি অক্লান্ত গবেষণার মাধ্যমে তা মোচন করেন। তাঁর 'সিরাজদ্দৌলা' এবং 'মীর কাশিম' বাঙালীর প্রাণে নতুন আশা এবং এষনার সূচনা করে। তাঁর 'সৌর লেখমালা' (১৩১৯) বাঙালীর গৌরবময় অতীতের উদ্ঘাটন। লেখকের 'ফিরিঙ্গী বণিক, অজ্ঞেয়বাদ, সমরসিংহ, সীতারাম, বিখ্যাত গ্রন্থ। তার রচনায় ঐতিহাসিক সত্য এবং শিল্প প্রসাদের সমন্বয় ঘটেছে। তিনি ত্রৈমাসিক 'ঐতিহাসিক চিত্র' ১৯০৪ এবং মাসিক শিক্ষা পরিচয় এর সম্পাদক ছিলেন।

বিনোদ বিহারী রায় :

(১৮৬২-১৯৪৫) : রাজশাহী শহরের বাসিন্দা ছিলেন। 'পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব' নামক একখানি গ্রন্থ লিখে তিনি খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

আচার্য যদুনাথ সরকার :

(১৮৭০-১৯৫৮) : সিংড়া থানার করচমারিয়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি স্বীয় পাণ্ডিত্য ও প্রতিভাবলে কলকাতা বিশ্ববিদালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন উৎর্গীত প্রাণ গবেষক। পাটনার খুদাবক্শ লাইব্রেরীতে তিনি গবেষণা করতেন। আচার্য যদুনাথ মোগল সাম্রাজ্যের পতন, শিবাজীর উত্থান, আওরঙ্গজেবের বিচিত্র জীবন, মোগল প্রশাসন

ইত্যাদি বিষয়ে যে মৌলিক গবেষণা করেছেন তাতে শুধু রাজশাহী বা বাংলার মুখোজ্জ্বল হয়নি, সমগ্র ভারত উপসহাদেশের মুখোজ্জ্বল হয়েছে। আচার্য বহু গ্রন্থ প্রণেতা— তাঁর Fall of the Moghal Empire, Aneodotes of Auranzib (1925), Shivaji and His Times (1920), Studies in Moghal India (1919), India of Auranzib, Economics of British India, Essays Social and Literary, History of Auranzib (পাঁচ খণ্ড), Moghal Administration (1924) Hisotry of Bengal vol. II, India through the ages, Chaitanya's Life and Teachings (2nd Ed. 1922) ইত্যাদি বিশেষভাবে স্মরণীয়।

শরৎকুমার রায় :

(মৃত্যু ১৯৪৫) : দিঘাপতিয়ার তৃতীয় কুমার শরৎ কুমার রায় ছিলেন ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক। তিনি ছিলেন বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির (১৯১০) প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। তাঁর 'মোহনলাল' গ্রন্থ একটি স্মরণীয় অবদান। 'তৌলিক জাতি' নামে একটি পুস্তকও তিনি লিখেছিলেন।

মৌলভী শামস্ উদ-দীন আহমদ

(জন্ম ১৯১৬)। রাজশাহীর বাসিন্দা। অবিভক্ত ভারতের অন্যতম পুরাতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ। আরবী পারসী শিলালিপির পাঠ-উদ্ধার পারদর্শী। এক সময় কলকাতা যাদু ঘরের অধ্যক্ষ ছিলেন। পরে পাকিস্তানের পুরাতত্ত্ব বিভাগের ডাইরেক্টর হন। Inscriptions of Bengal (৪র্থ খণ্ড, ১৯৬০) তাঁর অমর কীর্তি।

কৃষ্ণেন্দ্র রায় :

(১৯৩৪-৯৮): বলিহারের রাজা কৃষ্ণেন্দ্র রায় রাজশাহী জেলার উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ লেখক। খাজুরা গ্রামের লাহিড়ী বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বলিহারের রাজা শিব প্রসাদ রায় নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগমন করলে তাঁর প্রথম পত্নী হরসুন্দরী দেবী কৃষ্ণেন্দ্রকে দত্তকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। রাজা কবি, নাট্যকার, সঙ্গীতজ্ঞ, ধার্মিক ও পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর পৌত্র বিমলেন্দু রায় ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে রাজার দুখণ্ড গ্রন্থাবলী প্রকাশ করেছেন। রাজার ১০ খানা গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায় :

০১. এখন আসি ('গীতিকাব্য' নাটকাকারে লিখিত) ১২৮৪, পৃ: ৭৯।
০২. জয়ন্ত পরাজয় (" ") ১২৯২, পৃ: ১০০।
০৩. বৃত্র সংহার (" ")" পৃ: ১৯৮।
০৪. বাণ পরাজয় ('গীতিকাব্য নাটক্যকারে লিখিত) ১২৯২, পৃ: ১২৯।
০৫. সুখভ্রম ১২৯৫, পৃ: ৬৩।
০৬. সীতাচরিত ১২৯৯, পৃ: ১৫৯।
০৭. স্বভাবনীতি ১৪০২, পৃ: ১৩০।
০৮. গীতাবলী ১৩০৪, পৃ: ৯৬।
০৯. সীতাশরণ পাঁচালী ১৩০৪, পৃ: ৩৪।
১০. অদ্ভুত নাটক ১৩০৪, পৃ: ১৬৪।

প্রথম চারখানা গ্রন্থকে লেখক 'গীতিকাব্য' বললেও সেগুলো অমিত্রাক্ষর বা গৈবিশ ছন্দে এবং গদ্য-সংলাপে রচিত নাটক। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন : "তাঁহার অধিগত শব্দ সম্পদ সামান্য ছিল না। গদ্য ও গদ্য উভয় রচনাতেই তাঁহার নৈপূণ্য ছিল। --- নানা সুরের গান, উপদেশ পূর্ণ গদ্য প্রবন্ধ, গীতিকাব্য, নাটক, উপদেশাত্মক কবিতা, পদ্য আখ্যায়িকা প্রভৃতি নানাবিধ রচনা তাঁহার লেখনি হইতে নিঃসৃত হয়েছে।"

মহম্মদ আবদুল করিম :

(জন্ম : ১৮৫৪) : জন্মস্থান নবাবগঞ্জের শ্যামপুর-বাজিতপুর। তাঁর 'জগৎমোহিনী' নাটক (১৯৭৫) এবং আত্মজীবনী 'আশাবৃক্ষ' (১৯৯৯ বঙ্গাব্দ) বাংলা সাহিত্যের স্মরণীয় রচনা।

মির্জা মোহাম্মদ ইউসফ আলী :

(১৮৫৮-১৯৪০) : দুর্গাপুর থানার (লটী পুকুর, পরবর্ত্তীকালে নামকরণ) আলিয়াবাদ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ছিলেন উৎসাহী সমাজকর্মী এবং বিশ্বস্ত শিল্পী, ধর্মপ্রাণ ও স্বজাতি প্রেমিক। উনিশ শতকের শেষার্ধে মুসলিম জাগরণে তিনি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন— ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে, রাজশাহী শহরে মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে 'আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলাম' নামক যে সংগঠন স্থাপন করা[১৮] হয় তার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও উদ্যোক্তা ছিলেন তিনি। সমিতির মুখপত্র 'নূর-অল-ই মান' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মির্জা ইউসুফ আলী।

মির্জা ইউসুফ ছিলেন বহু গ্রন্থ প্রণেতা— তাঁর 'দুগ্ধসরোবর' বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। তিনি ইমাম গাজ্জালীর কিমিয়ায়ে সাদাৎ-এর বঙ্গানুবাদ করেছিলেন 'সৌভাগ্য স্পর্শমণি' নামে। 'ইসলামতত্ত্ব' তাঁর অন্যতম গ্রন্থ।

রজনীকান্ত সেন :

(১৮৬৫-১৯২৪) : কান্ত কবি রজনীকান্ত সেন পাবনা জেলার আঙাবাড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর শিক্ষাজীবন এবং কর্ম জীবন অতিবাহিত হয় রাজশাহী শহরে। বস্তুত তিনি রাজশাহী শহরের স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছিলেন। তিনি একাধারে কবি, সঙ্গীতজ্ঞ এবং গীতিকার ছিলেন। রজনীকান্ত সেন জাতীয় আন্দোলনে অন্যতম চারণ কবিরূপে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর বাণী, অভয়া, কল্যাণী, আনন্দময়ী, বিশ্রাম, অমৃত বাংলা গীতিকাব্যের অমর সম্পদ। তাঁর "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়/মাথায় তুলে নেরে ভই" স্বদেশী সঙ্গতি রূপে "রাজশাহীর আকাশ বাতাসকে মুখরিত" করে তুলেছিল।

মোহাম্মদ মোহসেন উল্লাহ্ :

নাটোরের বাসিন্দা তিনি 'বুড়ির সূতা' নামক একখ্যা গণচেতনামুলক বই প্রকাশ করেছিলেন ১৩১৬/১৯০৯ সাল্লোনা অজুহাতে জমিদারের অকথ্য প্রজীড়নের খণ্ড-ক্ষুদ্র কাহিনী আছে এই বইতে। গ্রন্থের উদ্দেশ ছিল জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজাকে জাগ্রত করা এবং জমিদারের অপকীর্তির তীব্র সমালোচনা করা।

রাজা জগদীন্দ্রনাথ রায় :

(১৮৬৮-১৯২৫) : নাটোর বড় তরফের জমিদার— খ্যাতিবান লেখক ও সাংবাদিক। 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকার দীর্ঘকাল সম্পাদনা করে তিনি সুধী সমাজের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছিলেন। 'নুরজাহান', শ্রুতিচিত্র (ঐতিহাসিক সংবলিত) এবং সন্ধ্যাতারা কাব্য তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ।

হাজী কেয়ামতুল্লাহ্ খোন্দকার :

(১৮৭০-১৯৬০) : তাহের পুরের অধিবাসী। ইসলামী গজল, পুঁথি ও ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি ৫০ খানা মতান্তরে ৫৪ খানা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। একটি গণ্ড গ্রামে বসে দীর্ঘকাল

এমন নীরবে সাহিত্য সাধনার উদাহরণ বিরল। তিনি শুধু রাজশাহী জেলার নন, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের অন্যতম বহু গ্রন্থ প্রনেতা। কবির রচনাবলীর একটি তালিকা নিম্নে পেশ করা গেল :

আখলাকোল নেছা, তালিমে ছ্যালাত, উন্মুল কোরান, হারুফে মামুন, খোতবা মস্তফা, কেয়ামতি দোয়ায়ে জামিলা, তালিমে এলাম, উর্দু মৌলুদ শরীফ, মধুর আড়ৎ, এমাম হোসেনের জঙ্গী খতনমা, সত্য নাটক, বিবাহ বিধি, চাষীর ক্ষেদ, শব্দের খেলা— ১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড; ফুল্লরামা, আনন্দমালা, কাচের গান, ওঝা, শাহাদৎনামা, তইছিলে উর্দু কায়দা, শিশু শিক্ষা, তারিকল হজ্জ্ব, খায়রন কালাম, খোতবা, বাংলা পাঠ— ১ম, ২য়, খণ্ড; আমির হামজা, স্বর্গযাত্রা, পরশমণি, গোলজারে মোছমিন ইত্যাদি। এই সব নাম থেকে কোনটা সাহিত্য হয়েছে এমন কথা বলা যায়না। এগুলোর অধিকাংশই দু-চার-আট-দশ পৃষ্ঠার পুস্তিকা। এর মধ্যে হাতেখড়ি থেকে কেফামত পর্যন্ত সব কিছুরই অল্প বিস্তর বয়ন আছে।

মেহের উদ্দীন খান :

১৮১৭-'৯৮ সালের দিকে আত্রাই থানার মহাদীঘি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি রাজশাহীতে মোক্তারী করতেন। কামাল পাশার জীবনী অবলম্বনে মেহের উদ্দীন 'তুর্কবীর' নামক এক খানা নাটক লিখেছিলেন। গ্রন্থে প্রকাশকাল নেই। পুস্তকখানি মুদ্রিত হয়েছিল রাজশাহী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ প্রেসে সম্ভবত ১৩৩৫-এর মধ্যে। লেখক নিজে এ নাটকের অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কাজিরগঞ্জ ওয়াই, এম,এ ক্লাবে নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল।

নফর উদ্দীন আহমদ :

(১৮৯৭-১৯৭৪) : ধামুর হাট থানার শ্যমপুর গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি বিচিত্র জীবনের অধিকারী এবং বহু গ্রন্থ প্রণেতা ছিলেন। তাঁর 'ভাগ্যলিপি' (১৯২৩) ও ভাগ্যচক্র (১৩৩২), ঐতিহাসিক উপন্যাস; কারবালা (রচনা ১৯২৫, প্রকাশ ১৯৭০), এজিদ বধ (রচা ১৯২৮, প্রকাশ ১৯৬২), রাখী ভাই (রচনা ১৯৩১-৩২); প্রকাশ ১৯৬৪) প্রকাশিত গ্রন্থ। এ ছাড়া অনেকগুলো নাটক এবং একাংকীকা অপ্রকাশিত রয়েছে। বসুমতী, সওগাত, হিতবাদী, নায়ক, মোসলেম দর্পণ ইত্যাদি পত্রিকায় নফরউদ্দীরের বহু রচনা ছড়িয়ে আছে। তিনি ইতিহাস-অনুরাগী এবং ধর্ম নিরপেক্ষ দৃষ্টি ভঙ্গির অধিকারী ছিলেন। নফরউদ্দীনের ভাষা সুডৌল সুন্দর, প্রকাশ রীতি গতিশীল।

শেখ জুমন উদ্দীন :

নাটোরের তেবাড়িয়ার অধিবাসী। তিনি ছিলেন নাটের মুন্সেফ আদালতের একজন পেয়াদা। কিন্তু তাঁর শিল্প প্রতিভা সুখী জনকে মুগ্ধ করেছে। জুমনউদ্দীন ছিলেন ধর্ম পরায়ণ, সমাজ সচেতন ও হৃদয় বান মানুষ। তাঁর মহামানব (কাব্য), মুক্তিপথ, জহুরা, কর্মবীর, এসকে মওলা, গৃহদর্পণ (প্রকাশিত) অপূর্ব তাজমহল (অপ্রকাশিত) তাঁর প্রতিভার পরিচয় বহন করছে। কবি-ঔপন্যাসিক জুমনউদ্দীন শক্তিবান শিল্পী হয়েও চির উপেক্ষিত এবং অনালেচিত থেকে গেছেন। উনিশ শতকের শেষ দিকে তিনি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।

হাসার উদ্দীন কবিরত্ন :

(জন্ম : নাটোর ১৯০৭ খ্রী:)— নাটোরের বাসিন্দা। সত্তর-উর্ধ্ব বয়স্ক হাসার উদ্দীন এখনো কিছু কিছু লিখছেন। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'সন্ধানে' কাব্যনাট্য প্রকাশিত হয়েছিল প্রাক-সাতচল্লিশে।

তিনি বেশ কয়েকখানি গ্রন্থের লেখক : সৌভাগ্য সোপান, মোড়লের বিচার (গীতি-নক্‌সা); অপ্রকাশিত হিজরত, দ্বাদশী, শুক্তিমালা, বিষকুম্ভ, হিলাল, বেণুবন, কীটদৃষ্ট ইত্যাদি।

মৌলানা দেওয়ান নাসিরউদদীন :

নওগাঁর শিকারপুরের বাসিন্দা। বর্তমান শতকের প্রারম্ভে রাজশাহীর ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম শক্তিশালী কর্মী; বাগ্মী লেখক নাসির উদ্দীন ধর্মীয় বিষয়ে বিশেষ ১৯ খানা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তন্মধ্যে পতিভক্তি, ঐতিহাসিক গল্প, বিদায়, উর্দু শিক্ষা বিশিষ্ট। অশিক্ষিত দরিদ্র হীনমন্য মুসলমান সমাজকে আত্মবিশ্বাসী শক্তিশালী জাতি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য যাঁরা সেকালে লেখনী ধারণ করেছিলেন তিনি তঁদের অন্যতম। দীর্ঘ দিন তিনি 'সোলতান' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

কুমুদাথ দাস :

নওগাঁর অধিবাসী ছিলেন— জন্ম ১৮৯৮ সালের দিকে। ১৯১৩ সালে তিনি কে, ডি হাই স্কুল থেকে ম্রাট্রিক পাশ করেন। বি,এ ডিগ্রি নিয়ে তিনি আজীবন সেই স্কুলের শিক্ষকতা করেন। সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী কুমুদনাথ ইংরেজী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর 'সাহিত্য জিজ্ঞাসা' (১৩৫৯), A History of Bengali Literature, Rabindranath, His Mind and Art and other Essays (1922), জ্যোতির সন্ধানে, গ্রন্থ উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছে।

মোবারক আলী :

(জন্ম: ১৯০০—মৃত্যু ১৯৫৫ : নওগাঁ শহরের বাসিন্দা মোবারক আলী ছিলেন স্বাধীন চেতা সাংবাদিক, শক্তিশালী প্রাবন্ধিক ঔপন্যাসিক এবং রাজনৈতিক কর্মী। তাঁর ভাষা বেগবান, তাঁর ভাবনা উদার মানব কল্যাণ মুখী। তৎসম্পাদিত সাপ্তাহিক 'দেশের বানী' দীর্ঘকাল জনগণের মুখপত্র হিসেবে কাজ করেছে। শেষ পর্যন্ত আয়ুবী-রোষে তার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। তাঁর সুফিয়া (উপন্যাস), কামাল আতাতুর্ক (জীবনী), মরুনির্ঝর ইত্যদি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল।)

তৈয়ব উদ্দীন চৌধুরী :

বদলগাছি থানার চাকরাইল গ্রামে ১৮৯৩-৯৪ সালের দিকে জন্ম গ্রহণ করেন। নিজে জমিদার এবং সমাজপতি হয়েও 'নকসা' (১৯৫২) কাব্য গ্রন্থের মাধ্যমে গ্রাম সমাজের মাতবর, পীর, মুন্‌সী, বাবুদের তীব্র সামলোচনা করেছেন। তাঁর 'ভিক্ষাদান' ৭.৮ বৎসর পূর্বে, অধ্যক্ষ ইবরাহীম খাঁ-র ভূমিকাসহ প্রকাশিত হয়।

কালীপদ চক্রবর্তী :

উনিশ শতকের শেষদিকে নওগাঁর গাঁজা মহলের শেরপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি 'গাঁজার গল্প' নামক একশত পৃষ্ঠার একটি রস রচনা প্রকাশ করেছিলে। গ্রন্থটি ক্ষুদ্র হলেও জীবনের স্থানিক রূপাঙ্কনে (Local colouring) তাঁর কৃতিত্ব সাধারণ নয়।

মোজাফফর হোসেন খাকী :

নওগাঁ শহরের কাজী পরিবারে এই শতকের গোড়ার দিকে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৩৪ সালে তাঁর প্রথম কাব্য গ্রন্থ 'চাঁদনী চক' প্রকাশিত হয়। বেশ কিছু রচনা অপ্রকাশিত রেখে তিনি অকালপ্রয়াণ করেন।

মজিবর রহমান :

নববগঞ্জ মহকুমার চক আলমপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। অন্ধকূপ হত্যা সম্পর্কে গবেষণা করে তিনি সিরাজের কলংক মোচন করেন।

প্রমথনাথ বিশী :

বর্তমান শতকের অন্যতম শক্তিবান লেখক— কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক ও গবেষক প্রমথনাথ বিশী বড়াইগ্রাম থানার জোয়াড়ী গ্রামের বিশী পরিবারের যশস্বী সন্তান। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। বর্তমানে বালিগঞ্জ এলাকায় নিজ বাড়িতে অবসর জীবন যাপন করছেন। অধ্যাপক বিশী রবীন্দ্র-স্নেহধন্য এবং রবীন্দ্র সাহিত্যের অন্যতম স্বীকৃতি বিশেষজ্ঞ। রবীন্দ্রনাতের ছোটগল্প, রবীন্দ্র সাহিত্য বিচিত্রা, বাংলার লেখক; শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব, কেরী সাহেবের মুন্সী, লালকেল্লা, জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার, পদ্মা, ঋণং কৃত্বা ইত্যাদি তাঁর গ্রন্থ। তিনি 'মাইকেল মধুসূদন রচনা সম্ভার' সম্পাদনা করেছেন। অধ্যাপক বিশী অবসর জীবনেও প্রচুর লিখছেন, তিনি বহু গবেষণা নিবন্ধের পরিচালক ও বিচারক। অবসর জীবনে তিনি, ইন্দিরা সরকার আমলে, কংগ্রেসের মনোনীত এম.পি. ছিলেন।

গজেন্দ্রনাথ কর্মকার :

নাটোরের সাংবাদিক কবি গজেন্দ্রনাথ কর্মকার সম্প্রতি প্রয়াত (১৩৮৪)। তিনি দীর্ঘদিন কাব্য চর্চা করে বাংলাদেশ আমলে রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন। 'খতিয়ান' ও 'হীরক জয়ন্তী' তাঁর বিখ্যত কাব্যগ্রন্থ।

ফজর আলী :

রাজশাহী শহরের মালোপাড়া এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। কর্মজীবনে ফজর আলী ছিলেন পুলিশ বিভাগের কর্মচারী, দারোগা। তবে তাঁর মধ্যে ছিল স্বাভাবিক কাব্য প্রেরণা। তাঁর 'জম জম' গীতিকাব্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে। 'হামদাম' নামক তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থ অপ্রকাশিত রয়েছে। কবি ফজর আলী ৮৫ বৎসর বয়সে কয়েক বছর আগে পরলোক গমন করেছেন। তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৮৯৫ সালের দিকে।

ডকটর সিরাজ উদ্-দাহার :

রাজশাহী জেলার অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তি। ৮৪ বৎসর বয়সে সম্প্রতি ইন্তেকাল করেছেন। সিরাজ উদ-দাহার একাধারে কবি, প্রাবন্ধিক, শিশু সাহিত্যিক এবং ভাষাবিদ, পণ্ডিত ও জ্যেতির্বিদ ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ. এবং কলরোডা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী সাহিত্যে পি, এইচ,ডি এবং হোমিওপাথিক শাস্ত্রে এম.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। আজীবন তিনি সরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। । তিনি নানাবিদ্যা অনুশীলন করে সংস্কৃতে 'পঞ্চদশ তীর্থ' উপাধি লাভ করেন।

সিরাজ উদ-দাহার প্রচুর লিখেছেন কিন্তু গ্রন্থাকারে কিছুই প্রকাশিত হয়নি। মুসলমানদের মধ্যে তিনিই প্রথম রবীন্দ্রনাথের এ সমালোচনামূলক বই লিখেছিলেন তার 'কবি-রবীন্দ্র' একরামুদ্দীন (১৮৮০-১৯৩৫) এর 'রবীন্দ্র প্রতিভা' (১৯২৬) এর পূর্বে ১৯২০ সালে লিখিত হয়। আজো তা অপ্রকাশিত। শিশু সাহিত্যে তিন অসাধারণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁর অপ্রকাশিত 'অঞ্জলি' (১৯২২) থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি দেওয়া যাক :

আচ্ছা দিদি, কোকিল পাখী
রাত্তিরে রয় কোন্ খানে,
আঁধার এলে ভূতের ভয়ে
ওরো কি হয় ভয় প্রাণে!
আচ্ছা দাদা, কাক কোকিল কি
আধার ধরে গায় মাখে,
বকগুলো কি পাখার মাঝে
চুনের জল আর দুধ রাখে?
আচ্ছা মাগো, বাচ্চা হরিণ
ধরলে কি কেউ ফাঁদ পেতে,
সন্ধ্যাকালে বনের মাঝে
মরবে ওর মায় কেঁদে?

আবদুস সামাদ :

জন্ম : রাজশাহী ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ। সামাজিক-সাংস্কৃতিক সেবা-মুলক তৎপরতায় নিষ্ঠাবান ব্যক্তিত্ব। সাপ্তাহিক রাজশাহী বার্তার সম্পাদক হিসেবে তিনি সমধিক পরিচিত। তিনি গান, কবিতা ও রসরচনা লিখে থাকেন।

তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'তরুণের গান' নাম গীতি সংকলন। বইটিতে ৫১টি জনজাগরণমূলক গান স্থান পেয়েছে। আব্দুস সামাদ-এর 'দাড়ি' রসরচনাটি প্রকাশিত হয় একই প্রেস থেকে ১৯৩৮ সালে। তিনি সাংবাদিকতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে চলেছেন। পাক্ষিক রাজশাহী বার্তা (১৯৫৮) এবং অধুনালুপ্ত পাক্ষিক 'প্রবাহ' পত্রিকা (১৯৬৬), পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ১৯৬৯ সাল থেকে তিনি সাপ্তাহিক রাজশাহী বার্তার সম্পাদকরূপে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

রাজশাহী থেকে প্রকাশিত কিছু কিছু গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু সেগুলোর অধিকাংশ দুষ্প্রাপ্য—বইগুলো এবং সংশ্লিষ্ট লেখকদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি পাওয়া যায়নি। এ ক্ষেত্রে সর্ব প্রাচীন শাহাবুদ্দীন আহমদ-এর 'দেওয়ান দবির উদ্দীন সাহেবের উক্তি'-প্রকাশ রাজশাহী ১৯২৯। এর পর বছর (১৯২২) প্রকাশিত মজির উদ্দীনের 'গোলজারে মজির'। গ্রন্থখানির সন্ধান দিয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক জনাব আবদুর রাজ্জাক।[১৯] রাজশাহীর সাহিত্যিকদের তালিকায় সংযোজিত নাম মনীন্দ্র মোহন চৌধুরী, রায় বাহাদুর ধরনী মোহন মৈত্র, কবি শেখর আবদুর রহমান আব্বাসী, শাহ জামান মিয়া, ইদ্রিশ আহমদ, ময়েন উদ্দীন ফকির, প্রিয়নাথ খাঁ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

ধর্মীয় সাহিত্য :

রাজশাহী সুফী-দরবেশ-আউলিয়াদের পীঠস্থান। প্রাচীনকাল থেকেই এ অঞ্চলের মানুষের এবং শিল্পীদের ভাবনায় ধর্মীয় প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ইসলামের তত্ত্ব-দর্শন, নাথ ধর্মের পরিচয়, বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের নানা আলোচনা এতদঞ্চলের লেখক শিল্পীদের অন্যতম প্রিয়-প্রসঙ্গ হতে পেরেছে। পূর্বোক্ত নরোত্তম, সুকুর মামুদ, হাজী কেয়াম-তুল্লাহ্, মির্জা ইউসফ, শেখ জুমন উদ্দীন, সেওয়ান নাসিরুদ্দীন প্রমুখের রচনায় সেই ঐতিহ্যের পরিচয় বিদ্যমান আছে।

আরও কিছু অপ্রধান লেখকের নাম এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। নওগাঁ শহরের কাজী ইউসুফ

আলী বাংলায় 'মিলাদ শরীফ' নামক একখানা পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন। নওগাঁর পরলোকগত পীর সৈয়দ আফতাব হোসেন রচনা করেছিলেন 'মিলাদে মোযতবা' (১৩৫৩)[২০]। তিনি বহু ইসলামী গান ও গজল লিখেছেন। ধর্মগুরু বা পীর হিসাবে জীবন অতিবাহিত করলেও শিল্পের ললিত প্রেরণায় তাঁর হৃদয় উদ্বুদ্ধ ছিল।

হেলাল উদ্দীন আহমেদ :

রাজশাহীর আইন ব্যবসায়ী (মোক্তার) ছিলেন। তিনি গদ্যেপদ্যে পারশী থেকে বাংলায় কিছু অনুবাদ করেছেন। তাঁর অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি "কওলুল আউলিয়া" রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবু তালিবের নিকট সংরক্ষিত আছে। লেখক সম্প্রতি বৃদ্ধ বয়সে ইন্তেকাল করেছেন।

রাজশাহী নিবাসী মোহাম্মদ ইসহাক বি.এল দার্শনিক ইমাম গাজ্জালীর কিমিয়ায়ে সাদাতের সংক্ষিপ্তসার 'জ্ঞানসিন্ধু' রচনা করেন। বদলগাছি থানার কোলাগ্রামের অধিবাসী ইব্রাহিম হোসেন তর্কবাগীশ 'উত্তর বঙ্গে আউলিয়া প্রসঙ্গ' নামে একখানি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। ইসলাম ও আধুনিক জ্ঞান বিষয়ে তিনি নানা প্রকার আলোচনায় ব্যাপৃত আছেন। তিন খ্যাতিবান বাগ্মী। নবাবগঞ্জের রাজারামপুর নিবাসী পীর মরহুম ফয়তুদ্দীন 'সিলসিলাতুজ্জহাব' নামে একটি ধর্মীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন দাদনকে চক্র নিবাসী ইদরিস আহমদ মিয়া 'কোরানের আলো' নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। বাংলায় কোরান চর্চার ক্ষেত্র এ এক আদর্শ উদ্যোগ। শেখ জুমন উদ্দীনের 'মহামানব' হযরত মোহাম্মদের জীবনের কাব্যরূপ। রাজশাহীর কাজী জসিম উদ্দীন 'দীন ও দুনিয়া' নামক একখানা ধর্মীয় গ্রন্থ লিখিছিলেন। গ্রন্থখানি তৎকালীন হিন্দু প্রভাবিত মুসলিম সমাজে বিশেষ উপকারে লেগেছিল।

রাণী নগরের খান সাহেব মোহাম্মদ আফজালের 'ইসলামী নাম, এবং 'আজমীর পথে' এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অশিক্ষিত কুসংস্কার গ্রন্থ মুসলিম সমাজে সন্তানের নামকরণ হাস্যকর অবস্থায় পৌছেছিল— 'ইসলামী নাম' গ্রন্থে তার নিরসন কামনা লক্ষণীয়। 'আজমীর পথে' ভ্রমণ কাহিনী হলেও এতে লেখকের ধর্মানুরাগের পরিচয় আছে।

সম্প্রতি পরলোকগত (জুলাই ১৯৭৮) রবীন্দ্র সান্নিধ্য ধন্য কবি মীর আজিজুর রহমানের 'মাস্তানা' (১৯৪০) সুফী চেতনার প্রতিবিম্বন। চিশ্‌তিয়া তরিকা-অনুসারী কবির চিত্তে একদিকে অধ্যাত্ম-অনুরাগ, অন্যদিকে সামাজিক কুসংস্কার ও ধর্মের নামে যে অধর্মানুষ্ঠান হচ্ছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। পারস্যের সুফী কবিদের রুবাইয়াতের অনুসৃতি ঘটেছে একাব্যের ভাব ও অলংকরনে। ১৯৪২ সালে কবি মঈন উদ্দীন চিশতীর 'দিউয়ান' এর বঙ্গানুবাদ করেছিলেন। মীরের আত্মজীবনী অপ্রকাশিত রয়েছে। আত্রাইয়ের আনিছুর রহমান খোন্দকার ১৩৩৪ সালে কলকাতা থেকে 'কোরানের দোয়া' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। সম্প্রতি অধ্যাপক মজিবুর রহমান 'মোহাদ্দেস প্রসঙ্গ' নামে এটি পুস্তক প্রকাশ করেছেন— তাঁর অনুবাদ গ্রন্থ 'ইসলামে ধর্ম নিরপেক্ষতা' (মূলঃ গোলাম মকসুদ হিলালী)।

হিন্দু লেখকগণ তাঁদের ধর্মীয় বিষয় অবলম্বনে কিছু কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন। রাজা কৃষ্ণেন্দ্র রায়ের 'সীতাহরণ' পাঁচালী হিন্দু সম্প্রদায়ের পবিত্র গ্রন্থ। তিনি বহু অর্থব্যয়ে 'সন্ধ্যা' উপাসনা গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। নবাবগঞ্জের জ্ঞানেন্দ্রশরী গুপ্ত ভীষ্ম, পৌরানিক উপাখ্যান প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। শ্রীমনীন্দ্র নাথ সাহা অমিত্রাক্ষর ছন্দে গীতার অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন এ গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছিলেন। তাঁর 'রামকৃষ্ণলীলা' গ্রন্থ সম্ভবত অপ্রকাশিত রয়েছে।[২১] আতাইকালা নিবাসী উমেশচন্দ্র মৈত্রয় 'আত্মবোধ' ও 'রামায়ণের

সমালোচনা'; লিখেছিলেন। এ প্রসঙ্গে এস.এম. ইসহাক আলীর কোরানের কাহিনী (১৩৫৬) পয়গম্বব সহধর্মিনী (দ্বি-স ১৯৫২), হজরত সোলায়মান, মুহাম্মদ গোলাম মোয়াসযম-এর কোরানে বিজ্ঞান (১৯৬৭), খোন্দাকার আখতার আলীর হজরত শাহ মখদুম ও মহাকাল গড়ের ইতিহাস (১৯৬৮), মোহাম্মদ আবদুল খালেকের 'তৌহিদ সাগর (১৯৭৬), মোহাম্মদ আবুল হামিদের সহজ আমপারা (১৩৭৬ হিজরী), The Devine Qur-an ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। 'ধর্ম-ভিত্তিক সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে' মওলানা আল হোসায়নী বাসুদেবপুরীর নাম উল্লেখযোগ্য।[২২]

মহিলা সাহিত্যিকবৃন্দ :

শিল্প সাহিত্য এবং স্বদেশের মুক্তি আন্দোলনে রাজশাহীর কতিপয় মহিলার অবদান ঐতিহাসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। স্মরণীয় যে শিক্ষাদীক্ষায় অনগ্রসরতা ও কঠিন অবরোধ প্রথার কারণে এক্ষেত্রে তাঁদের আবির্ভাব চরমভাবে বিঘ্নিত হয়েছে।তবু যে পুণ্য ভূমিতে রাণীভবাণী মহারাণী শরৎ কুমারী-র মত বিদুষী এবং করিৎ কর্মা মহিলাব কীর্তি ছড়িয়ে আছে; বিপ্লবী রাজনৈতিক কর্মী মীরা মৈত্রেয়, হেমনলিনী বিশীর কীর্তি যে ভূমির মুখোজ্জ্বল করেছে[২৩] তার ভগ্নি কন্যারা তাঁদের প্রেরণাকে নানা ভাবে উজ্জীবিত রেখেছেন। ডাক্তার রাজিয়া সালাম, মিসেস মনোয়ারা রহমান প্রমুখ শিল্প ও সমাজ কর্মের লালনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন।

এক কালের ভারত সুন্দরী এবং ঘনিষ্ঠ নজরুল সহচরী মনাকশার জাহানারা চৌধুরী যুদ্ধোত্তর বাংলা সাহিত্য-আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তৎসম্পাদিত 'রূপরেখা' ও 'বর্ষবানী' পত্রিকা খ্যাতি লাভ করেছিল। ১৩৩৯ সালের পৌষ থেকে 'রূপরেখা' প্রকাশিত হয়। 'বর্ষবানী' প্রকাশিত হয় ১৩৪০ সালে। ১৩৪৬ সালের এর পঞ্চম সংখ্যা প্রকাশের পর বন্ধ হয়ে যায়। এর লেখক সূচিতে নজরুল ইসলাম 'শরৎ চন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, প্রমথ বিশী, শৈলজানন্দ, অচিন্ত্য কুমার সেন গুপ্ত রাধারাণী, প্রভাবতীদেবী সরস্বতী প্রমুখর নাম দেখা যায়। 'ছায়াবীথি নামক একটি পত্রিকাও জাহানারা চৌধুরী সম্পাদনা করতেন। পত্রিকা গুলো মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত কলকাতা থেকে।[২৪]

'জল খাবার' ও 'বরেন্দ্র রন্ধন' প্রভৃতির লেখিকা কিরণ লেখা রায় এ জেলার এক জন উল্লেখযোগ্য শিল্পী। এ-মহিলা তাঁর আপন স্বভাব কর্মের মধ্য দিয়ে স্বীয় জন্মভূমির পরিচয় দানের প্রয়াস পেয়েছেন। নওগাঁর মোসাম্মৎ জোবেদা খাতুনের 'বাহাদুরাবাদ ঘাটের কুলি' (১৩৬৯) গল্প গ্রন্থটা হৃদয় গ্রাহী রচনা, আত্রাই খাদি প্রতিষ্ঠানের অন্যতম পরিচালক রঞ্জন দত্তের স্ত্রী কবিতা দত্ত রচিত 'এলো ঐ আহ্বান' (কাব্য) এবং 'আমি যখন কৃষক বধু হয়ে' নামক পুস্তক দুখানি কল্যাণ ও জীবন রসে স্নিগ্ধ।

নবাবগঞ্জের আজিজা এন. মোহাম্মদ বিভিন্ন সাময়িকীতে কবিতা লিখে যশস্বী হয়েছেন। তিনি নবাবগঞ্জ সাময়িকীর সম্পাদিকা হিসেবেও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। জোয়াড়ীর বিশী পরিবারের মেয়ে চিরশ্রী বিশী ১৯৭০ সালে, 'রবীন্দ্র গদ্য ভাষার বিবর্তন (১৮৮৭-১৯০০), বিষয়ে অভিসন্দর্ভ লিখে, পিএইচ, ডি ডিগ্রি লাভ করেছেন। তিনি কলকাতা বাসিনী। কলা-অনুষদে তিনিই বোধ হয় রাজশাহীর প্রথম মহিলা পিএইচ ডি। রবীন্দ্র সাহিত্যে তো বটেই।

কাজীহাটা নিবাসী চৌধুরী শাসসুন্নাহার বকুল একাধিক উপন্যাস ও কয়েক খানা ধর্ম গ্রন্থের লেখিকা। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'ঢেউয়ের পরে ঢেউ'ডক্টর সুবোধ সেন গুপ্তের ভূমিকাসহ প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ সালে। তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস সিক্ত আঁখি' (১৯৬১)। তাঁর 'জান্নাতিন' (৫খণ্ড), তৌহিদের মসলা, নয়াজামানার নক্সা, ঝরাপাতা, দিন না যাইতে, গন্থগুলো যন্ত্রস্থ

বলে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। রাজশাহী শহরের হোসেনীগঞ্জ নিবাসী অ্যাডভোকেট আলী আজম সাহেবের স্ত্রী আখতারুন্নেসা খানম (জন্ম ১৯১৯) 'আল ইসলাম' (শান্তি প্রগতির বিশ্বজনীন ধর্ম : প্রথম প্রকাশ ১৯৬৬) গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৩৭৪ বঙ্গাব্দে গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। মোহসেনা কায়ুম রচিত 'অচিরা চরিত' (১৯৫৬) একটি অভিনব উপন্যাস বলে পরিচিত।

চাকরাইলের কবি তালিম হোসেনের সহধর্মিনী মাফরুহা চৌধুরী আমাদের সাহিত্যে একটি সুপরিচিত নাম। তিনি পেশায় সাংবাদিক। অনুবাদ ও ছোট গল্পের ক্ষেত্রে তাঁর চর্চা অব্যাহত রয়েছে। 'অরণ্য গাথা ও অন্যান্য গল্প' (প্রথম প্রকাশ ১৯৭৬) তার নির্বাচিত গল্পের সঙ্কলন। 'চেনা আছে জানা নেই'। (অনুবাদ) এবং 'একটি ফুলের জন্য' (ছোটদের গল্প) তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ।

রাজশাহীর সেলিনা হোসেন (জন্ম : ১৯৪৭) ছোট গল্প এবং উপন্যাস লিখেন। তার ছোট গল্প সংকলন 'উৎস থেকে নিরন্তর' প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ সালে। উত্তর সারথী (১৯৭৯), জলোচ্ছ্বাস (১৯৭১), জোৎস্নায় সূর্য জ্বালব (১৯৭৩) তাঁর প্রকাশিত উপন্যাস। পথের পরশ, বধুর লাগিয়া ইত্যাদি উপনাসের লেখিকা গাইবান্ধার বাসিন্দা হলেও পৈতৃক সূত্রে রাজশাহীর মেয়ে। তিনি উত্তর পঞ্চাশের শক্তিশালী কথা শিল্পী। সমাজ সমীক্ষা (দুই খণ্ড) তাঁর গবেষণা নিষ্ঠার পরিচয়। ডাক্তার রাজিয়া সালাম (জ: ১৯৩০) জন্ম সূত্রে বগুড়ার মেয়ে হলেও রাজশাহীর স্থায়ী বাসিন্দা। পেশায় চিকিৎসক কিন্তু নেশায় সাহিত্যিক- তাঁর 'শ্রমিক বউ' একটি সুখপাঠ্য উপন্যাস; রাজশাহীর লুৎফন আরা আলম, মল্লিকা সরকার, ইয়াকুতী ইসলাম, নওগাঁর শেফালী খানম— ইত্যাদি পত্র পত্রিকায় লিখছেন।

সাম্প্রতিক বিচিত্র ধারা :

বাংলা সাহিত্যের বিচিত্র বিকাশে আমাদের কবি সাহিত্যিকদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

কাব্য :

বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক কালের শক্তিবান কবি, ইসলামী রেনেসাঁর অন্যতম প্রবক্তা তালিম হেসেনের কবি-শক্তি বিভাগ পূর্ব কালেই সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল— তাঁর দিশারী (১৯৫৬) এবং শাহীন (১৯৬২) বাংলা কাব্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। তিনি দীর্ঘকাল 'মাহেনও' পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন। আকা.শ. নুর মোহাম্মদ লিখেছেন 'পাকিস্তানের গান' এবং 'বুনো মেঘ কথা কয়' নামক দুটি কাব্য গ্রন্থ। চাকরাইলের কবি আবদুস সামাদ চৌধুরীর (জঃ ১৯২৯) 'কও মিয়াত' (১৩৭৫), উত্তর অন্বেষা (১৩৭৭) এবং 'স্বাধীন বাংলার গান' (১৯৭১) যথাক্রমে সমাজ চেতনা, আত্মনিবেদন এবং দেশ প্রেমের তপ্ত আবেগের ফসল। শাহ্ আলম চৌধুরীর 'সর্পিল আলোর রেখা' (১৯৭২) খোন্দকার আজিজুল হকের 'অনুপম দিনগুলির মাঠে স্বর্ণ ঘোড়া' (১৯৭৩) মুস্তাফিজুর রহমানের 'নিরবধি আলোকে আধারে' ইত্যাদি আমাদের কাব্যে মনোজ্ঞ সংযোজন।

চারঘাট থানার উদপুর গ্রমের বাসিন্দা আবদুল আজিজ সরকার 'মনের বনে' নামক একটি কাব্য-সংকলন প্রকাশ করেছিলেন।[২৫] রাজশাহী শহরের বাসিন্দা তরুণ-অধ্যাপক শেখ আতাউর রহমান' একজন হত্যাকারীর গল্প' নামক কাব্য গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন— শেখের কবিতা মেজাজে এবং শরীরে বাস্তবিকই সাম্প্রতিক। মুস্তাফিজুর রহমান পত্র পত্রিকায় কবিতা লিখেন। নতুনদের মধ্যে 'স্পন্দন সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ'-পুরস্কার প্রাপ্ত জামিল রায়হান (জন্ম : ১৯৫৬); কৌশিক আহমদ, আতাউল হক সিদ্দিকী, আবু তাহের প্রমুখ সম্ভাবনাময়।

কথা সাহিত্য :

ছোট গল্প এবং উপন্যাসের ক্ষেত্রে এ জেলার অবদান যেমন নগণ্য তেমনি প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষরও তেমন নেই। পুর্বোল্লিখিত মাফরুহা চৌধুরীর গল্প এবং সেলিনা হোসেনের গল্প ও উপন্যাস উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক খোন্দকার আজিজুল হক বেশ কিছু গল্প লিখেছেন— পশ্চিম বঙ্গের অমৃত ও সঞ্চালন পত্রিকায় তাঁর গল্প প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর গল্প 'হয়তো নক্ষত্র নয়' (১৯৬৫) আমাদের গল্প সাহিত্যের ধারায় উল্লেখযোগ্য সংযেজন। জন্ম (১৯৩৬) বগুড়ায় হলেও তিনি রাজশাহীর স্থায়ী বাসিন্দা। তিনি গবেষণামূলক রচনাও লিখেন। ১৯৭১-এ পরলোকগত মিযাজান আলী (লেখক-নাম 'মিঞাজী')-র 'সাধু সংবাদ' দুই পর্ব, মকবুল হোসেনের 'ফল্গুধারা' আবুল আহ্‌সান (নবাবগঞ্জ) এর 'কালোমুখোশ', মেহ্‌দি (নবাবগঞ্জ)-এর "পথ যারা পায়নি' মণীন্দ্র নাথ সাহা (আড়ানী-র তমালতলার হাট, জলতবঙ্গ, মনহারালো যে, আতাউর রহমানের সূত্রপাত (১৯৫৬) ইত্যাদি ব্যতীত উল্লেখ করবার মত অবদান নেই। তবে প্রমথনাথ বিশীর বিখ্যাত উপনাস সমূহ এবং বদরুন্নেসা আবদুল্লাহ্‌র মনোজ্ঞ রচনাগুলেকে আমরা এই জেলার আওতায় ফেলতে পারি।

নাটক :

রাজশাহী জেলার নাট্যকারের সংখ্যা নেহাত কম নয়। মৌলিক নাটক এবং অনুবাদের ক্ষেত্র আমাদের সমৃদ্ধ না হলেও সুন্দর ঐতিহ্য বর্তমান। নাটোর নিবাসী কবীন্দ্র মজুমদারের রূপান্তর, শৈলেশনাথ বিশীর 'সলোমে' (অসকার ওয়াইল্ডের 'সলোমে'র অনুবাদ) এবং 'নেতাজী' (সুভাষ বসুর জীবনী অবলম্বনে লেখা); মোসলেম উদ্দীন মাহমুদের তীতুমীর (৩৬৯), আবদুল হক (চৌডালা)-এর অদ্বিতীয়া (১৯৫৬), ফেরদৌসী; ১৩৭১) অন্নদা মোহন বাগচী (নাটোর)-র মেঘের 'পরে মেঘ, কাদামাটির দুর্গ (১৯৬৪), ঝড়, মুক্তি (১৯৬০), কেদার মাস্টার (১৯৬৭), বন্ধন (১৯৬৮), রিক্তের বেদন (১৯৬২) শেষ প্রহর, সূর্য মুখী, দুই পক্ষ, দেশের মাটি; আবদুল গনি (রাজশাহী) র পিচ্ছিল পৃথিবী, বিভ্রম (১৯৬৪); দাদুর স্বপ্ন, রাজার ছেলে (১৯৬৮) সি-এস-পি জামাই (১৯৬২), মিয়াজান আলীর 'পাক শিক্ষায় ঘূর্ণিপাক (১৯৬২), পাক ভ্রমণে বিপাক (১৯৩৭৫) বিশ্বরূপ; মীর আতাউর রহমান (নাটোর)-এর খেলাঘর (১৯৬২), শেষ চাওয়া, চাওয়া পাওয়া ইত্যাদি সার্থক রচনা। এ-সব নাটকের আমাদের সমাজ ও জীবনের নানা সমস্যা রস মূর্তি লাভ করেছে। শফি উদ্দীন সরদার, মসিউর আলম, নুরুল ইসলাম কাব্য বিনোদ ইত্যাদি কিছু নাটক লিখেছেন। রাজশাহীর বেতার থেকে নিয়মিত যে সব নাটক প্রচারিত হয়ে থকে তন্মধ্যে রাজশাহীর লেখকের সংখ্যা গরিষ্ঠতা এ-ক্ষেত্রে একটি শুভ লক্ষণ।

অনুবাদের ক্ষেত্রে আবদুল হক এবং মুস্তাফিজুর রহমানের ভূমিকা প্রশংসনীয়। অবদুল হক ইবসেনের 'এ ডল্‌স হাউস' (পুতুলের সংসার ১৯৬৬), 'দি মাস্টার বিল্ডার' (মহাস্থপতি ১৯৬৬), 'ঘোস্ট' (প্রেতাত্মা); এবং মুস্তাফিজুর রহমান আল বেয়ার ক্যামুর 'কালিমুলা' জাঁপল সাঁত্রের 'নিঃশব্দ নরকে' ম্যাক্সিম গোর্কীর' ওরা থাকে নীচে' অনুবাদ করে বাংলা সাহিত্যের দিগন্ত প্রসরে সাহায্য করেছেন।

প্রবন্ধ ও গবেষণা :

সাম্প্রতিক প্রবন্ধ ও গবেষণা সাহিত্যে রাজশাহীর অবদান স্মরণযোগ্য। সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে রাজশাহীর পণ্ডিত সমাজ অনুশীলন অব্যাহত রেখেছেন। আমাদের পুর্বসূরী আচার্য যদুনাথ, অক্ষয় কুমার, দুর্গাদাস, প্রমথ বিশী প্রভৃতির

সাধনার পথে প্রচুর উত্তর সাধক পদচারণা করেছেন। এখানে কয়েক জনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হলো খান সাহেব মোহাম্মদ আফজলঃ জন্ম রানীনগর ১৮৯৫ মৃত্যু নওগাঁ ১৯৭৫। তাঁর 'নওগাঁ মহকুমার ইতিহাস' একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। লেখকের 'মহাস্থান গড়ের ইতিহাস, প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পর বগুড়া জেলা পরিষদ কর্তৃক (তাঁর 'ইসলামী নাম' ও আজমীর পথে-র উল্লেখ পূর্বেই করেছি) খান সাহেব এতদঞ্চলের একজন নামকরা সাংবাদিক ছিলেন। তিনি অনেক বছর ধরে 'নবদিগন্ত মাসিকের সম্পাদনা করেছেন।

ড. কাজী আবদুল মান্নান :

জন্ম : মালদা ১৯৩০; বর্তমান নিবাস নওগাঁ শহর। গবেষক ও নিবন্ধকার হিসাবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। আধুনিক বাংল সাহিত্যে মুসলিম সাধনা (১৯৬৯), Emergence and Development of Dobhashi Literature in Bengal (১৯৬৬), ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৯৭০) তাঁরগ্রন্থ। দেশের প্রতিনিধিত্বশীল পত্রিকায় তাঁর মৌলিক প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হয়েছে এবং শিকাগো থেকে Resources in Bengali Studies এর নানা বিষয়ে পঁচিশটি প্রবন্ধ বিশ্বের সুখী মণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। দুষ্প্রাপ্য মশাররফ রচনাবলী তাঁর সম্পাদনায় 'মশাররফ রচনা সম্ভার' নামে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে।

আলহাজ্জ্ব আবদুল হামিদ (গুরুদাসপুর) :

বিজ্ঞানের অধ্যাপক হয়েও তিনি আজীবন বাংলায় সাহিত্য চর্চা করেছেন। তাঁর 'চলন বিলের ইতিহাস', 'কর্মবীর সেরাজুল হক' পশ্চিম পাকিস্তানের ডাইরী ইত্যাদি গ্রন্থ প্রশংসা অর্জন করেছে। তাঁর সাম্প্রতিক প্রকাশিত গ্রন্থ 'হজের সফর', 'আমাদের গ্রাম' ও 'শিক্ষার মশালবাহী রবিউল করিম' উল্লেখযোগ্য। তিনি রসায়ন বিষয় সম্পর্কেও ছাত্রদের উপযোগী বই রচনা করেন। প্রায় এক যুগ ধরে তিনি 'আমাদের দেশ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

এস.এম. আবদুল লতিফ (দয়ারামপুর, ১৯৩৩) :

পত্র পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। তার 'ছন্দ পরিচিতি' (১৯৬৫), Problems of College Education (1971), A Report on Field Trip to the Academy for Rural Development (1971).

আলমগীর জলীল (মথুরাপুর, বদলগাছী) :

বিভিন্ন পত্রিকায় তিনি গবেষণামূলক রচনাবলী প্রকাশ করেছেন। উত্তর বঙ্গের মেয়েলী গীত (১৩৬১), রাজশাহীর ছড়া (১৩৭০), মুসলিম মানস ও লোক সংস্কৃতি (১৩৭৫) ইত্যাদি তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ।

আবদুল হক (চৌডালা ১৯২০) :

নাট্যকার ও প্রাবন্ধিক। তাঁর ক্রান্তিকাল (১৯৬২), সাহিত্য ঐতিহ্য মুল্যবোধ (১৯৬৭), বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ (১৯৭৩) ইত্যাদি প্রকাশিত গ্রন্থ।

আবদুল গণি চৌধুরী (রাজশাহী) :

প্রকাশিত রচনাবলী 'ফেলে আসা দিন', বাংলার গণহত্যা, দুঃখে যাদের জীবন গড়া, ইত্যাদি। ইনি রাজশাহী শহরের বাসিন্দা।

ড. মুহম্মদ মজিরউদ্দীন (জন্ম : উদপুর ১৯৩৯) :

বর্তমান নিবাস মমিনপুর-লালপুর। প্রকাশিত গ্রন্থ : বাংলা সাহিত্যে মুসলিম মহিলা (১৯৬৭), বাংলা নাটক মুসলিম সাধনা (১৯৭০), সাহিত্য শিল্পী বজলুর রশীদ (১৯৭৩), শহীদ সাহিত্যিক (১৯৭৩), নজরুল গদ্য সমীক্ষা (১৯৭৮), রবীন্দ্র ছোটগল্প সমাজ ও স্বদেশ চেতনা (থিসিস যন্ত্রস্থ)। বাংলা একাডেমী পত্রিকা, নজরুল একাডেমী পত্রিকা, ভাষা সাহিত্য পত্র, সাহিত্যিকী ইত্যাদি গবেষণা পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

ড. আবদুর রহীম খোন্দকার (নবাবগঞ্জ) :

Portugese Contribution to Bengalı Prose grammar and Lexicography (1976)। গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেন।

শামসুল হক কোরায়শী :

কুষ্টিয়ায় জন্ম হলেও বর্তমানে রাজশাহী শহরের বাসিন্দা। তিনি কবি ও প্রাবন্ধিক। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হচ্ছে। তিনি 'প্রতীতি' সাহিত্য-পত্রের সম্পাদক। 'গোধুলির কান্না' (১৯৭০) তাঁর প্রকাশত কাব্য গ্রন্থ।

ডাক্তার শেখ মোঃ আবুল হোসেন (জঃ ১৯২৪) :

পেশায় হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। প্রকাশিত পুস্তক 'পূর্বপাকিস্তানে আওলিয়া দরবেশ (১৯৬৯), বিশ্ব সৃষ্টি রহস্য, বিশ্বধর্মের রূপরেখা (১৯৭৭) তৌহিদের আলো, মারেফত দর্পণ ইত্যাদি। ধর্ম ও দর্পণ তাঁর সাহিত্যের উপজীব্য। রাজশাহী শহরের বাসিন্দা ডাক্তার হোসেন ধর্মানুরাগী ব্যক্তি। তিনি কাদেরীয়া তরিকায় আস্থাবান। তাঁর সাহিত্য সাধনা অব্যাহত রয়েছে।

ইতিহাসের গবেষণা এবং অধ্যাপনার মাধ্যমে বেশ কয়েকজন সুধী যশ অর্জন করেছেন। লালপুর নিবাসী ড. শামসুদ্দীন মিয়া (গ্রন্থ : The Reign of Al Motawakkil, 1969) তন্মধ্যে প্রবীন এবং বিশেষ খ্যাতিমান। আত্রাইয়ের ড. কছিম উদ্দীন মোল্লা (জ: ১৯৪০) The New Provınce of Eastern Bengal and Asam, নওয়াব খাজা সলিমুল্লাহ প্রভৃতি গ্রন্থ এবং বাঙলা ও ইংরেজীতে গবেষণা প্রবন্ধ লিখেছেন বিভিন্ন সাময়িকীতে। নওগাঁর অধ্যাপক ওয়াজেদ আলী, অধ্যাপক ইমরুল কায়েশ চৌধুরী, রাজশাহীর মিসেস শামসুন্নাহার[২৬], শেখ লুৎফর রহমান, ড. শমসের আলী, অধ্যাপক মজিবর রহমান, ড. নাজিম উদ্দীন আহমদ প্রমুখ অনেক গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেছেন।

বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান এবং নৃতত্ত্বে কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তি উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। তন্মধ্যে কতিপয়ের পরিচয় দেয়া যাচ্ছে :

ড. এ.কে. এম নুরুল ইসলাম (জন্ম ১৯২৮) :

নওগাঁর বাসিন্দা। উদ্ভিদ তত্ত্ব সম্পর্কে বহু মৌলিক প্রবন্ধ লিখেছেন।[২৭] তিনি প্রথম জীবনে বাংলা সাহিত্যের চর্চা করতেন। তাঁর বহু কবিতা এবং প্রবন্ধ মোহাম্মদী, সওগাত, আজাদ ইত্যাদি পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। অধ্যাপক হবার পর ঐক্যান্তিকভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছেন। বিদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে। তিনি 'বাংলাদেশ বোটানিক্যাল জার্নাল' এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্ট্যাডিজ সম্পাদনা করেন। যশোর সাহিত্য সংঘ তাঁকে 'সাহিত্য রত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেছে।

ড. আনিসুর রহমান (আত্রাই ১৯৩৯) :

লন্ডনের কিংস কলেজ থেকে পিএইচ. ডি করেছেন ১৯৭৩ সালে।[২৮] নেদারল্যান্ড, হাঙ্গেরী ও কানাডার বিভিন্ন বিজ্ঞান সাময়িকীতে তার মৌলিক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

ড. এবনে গোলাম সামাদ (রাজশাহী ১৯৩৩) :

উদ্ভিদ বিদ্যা, নৃতত্ত্ব এবং শিল্পকলা সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ : শিল্পকলার ইতিকথা (১৯৫৬), উদ্ভিদ সমীক্ষা (১৯৬৬), উদ্ভিদতত্ত্ব (১৯৬৮), জীবাণুতত্ত্ব (১৯৬৮), নৃতত্ত্ব (১৯৭৩ দ্বি-স) ইত্যাদি।

ড. জহুরুল হক (রাজশাহী ১৯২২) :

প্রকাশিত গ্রন্থ— মনুবর্ণালী (১৯৬৩), জীবন (১৯৬৮) তড়িৎ কৌশল (১৯৭২) ইত্যাদি।

বাণিজ্য শিল্প, অর্থনীতি সংক্রান্ত গবেষণায় আত্মনিয়োগ করে কেউ কেউ নিবন্ধাদি রচনা করেছেন। (এম, ফিল সাউদাম্পটন,[৩০] ডক্টর আশরাফ চৌধুরী, ডঃ আজহার উদ্দীন (নবাবগঞ্জ),[৩১] সনৎ কুমার সাহা (রাজশাহী) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। অর্থনীতি-বিজ্ঞান-ইতিহাস গবেষণা সাহিত্যের পরিধিগত কিনা এ নিয়ে গ্রন্থ উঠতে পারে, কিন্তু মননশীল কর্মে প্রতিভার অবদানরূপে মানব কল্যাণে নিয়েজিত হয় এবং তাতে জীবনেরই নানা জিজ্ঞাসা নিহিত থাকে তাই আজকে ঔষধের বিজ্ঞাপনকেও 'লিটারেচার' বলে অভিহিত করা হয়। আমাদের পণ্ডিতদের সাধনা মানব কল্যাণ মূলক হলে এবং জাতীয় সমস্যা সমাধানে সমর্থ হলে দরিদ্র বাংলাদেশে তা অনেক মূল্যে সংবর্ধিত হবে।

প্রবাসী সাহিত্যিকবৃন্দ :

রাজশাহী জেলার সাহিত্যিক পরিচয় অনুসন্ধান করতে গিয়ে এমন বহু সাহিত্যিকদের নাম মনে আসবে যাঁরা এখানে বসে সাহিত্য চর্চা করেছেন বা করছেন তাঁরা জন্মসূত্রে এ জেলার সন্তান নন। কিন্তু কর্ম এবং নানা সূত্রে এ জেলার সঙ্গে— এর মাটি এবং মানুষের সঙ্গে তাঁদের এবং তাঁদের সৃষ্টির সম্পর্ক হয়েছে অবিচ্ছেদ্য, তাই এ প্রসঙ্গে তাঁদের সম্পর্কে কিছু বলা আবশ্যক মনে করি।

রাজশাহীর সাহিত্যের প্রাচীন যুগের এক মাত্র লেখক কানুপা ছিলেন সম্ভবতঃ বিহারের অধিবাসী। সোমপুর বিহারে তিনি ছিলেন প্রবাসী। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ জমিদারীর কার্যোপলক্ষে পতিসরে দীর্ঘদিন অবস্থান করেছিলেন; ১৮৯৪-৯৫ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত সময়ে তিনি বহুবার এখানে এসেছেন এবং বাস করেছেন। সেই অবসরে চিত্রার সুখ, এবার ফিরাও মোরে, চৈতালী কাব্যের বহু কবিতা পতিসর এবং বামপুর বোয়ালিয়ায় বসে লিখেছেন। রাজশাহীর মাটির সঙ্গে তার প্রবল ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল।

অন্নদা শঙ্কর রায় ১৯৩২-৩৩ সালে নওগাঁ মহকুমা প্রশাসক এবং ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজশাহীর জেলা প্রশাসক হিসেবে কাজ করেন।[৩২] অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কার্যব্যাপদেশে একদিন এ জেলায় ছিলেন। ডক্টর সুবোধ সেনগুপ্ত এবং ড. শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় রাজশাহী সরকারী কলেজে অধ্যাপনা করেন। ড. বন্দোপাধ্যায়ের 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' প্রথমে রাজশাহী কলেজ বার্ষিকীতে ধারাবাহিকভাবে কিছু অংশ প্রকাশিত হয়েছিল। ঔপন্যাসিক ঋত্বিক ঘটক দীর্ঘকাল রাজশাহীতে অবস্থান করেছিলেন— হুমায়ুন কবির নওগাঁয় ছিলেন স্কুল ছাত্র জীবনে; কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক মনসুর উদ্দীনও কিছুকাল কর্মব্যাপদেশে নওগাঁয় ছিলেন। গবেষক

সাহিত্যিক ড. সুরেশ চন্দ্র মৈত্রের বাল্য-কৈশোর কেটেছে নাটোর মাতুলালয়ে।

একালে ডক্টব মুম্মদ শহীদুল্লাহ ড. মুহম্মদ এনামূল হক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই, ডক্টর গোলাম মকসূদ হিলালী রাজশাহী কলেজে শিক্ষকতা করেছেন। ডক্টর মযহারুল ইসলাম, অধ্যাপক আবু তালিব, ডক্টর গোলাম সাক্‌লায়েন, গোলাম রসুল, কবি, আতাউর রহামন, হাসান আজিজুল হক, আবু বকর সিদ্দিক, ডক্টর আবদুল খালেক, কবি বন্দে আলী মিয়া, ড. গোলাম মুরশিদ, আবদুর রাজ্জাক, ড. সুনীল মুখার্জি, ড. মুস্তফা নুরুল ইসলাম, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, বদরুদ্দীন উমব প্রমুখ চাকুরী ব্যাপদেশে এলেও রাজশাহীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করেছেন।

আধুনিক সাহিত্যের উন্নতি এবং বিচিত্র বিকাশের ক্ষেত্রে বাজশাহী যে ভূমিকা গ্রহণ করেছে তা যথোচিত বলে আত্মপ্রসাদ লাভের অবকাশ নেই। বিভাগীয় প্রশাসনিক প্রধান কার্যালয় হিসেবে— রাজনৈতিক-শৈক্ষিক-প্রশাসনিক দিক থেকে এ জেলার গুরুত্ব যথেষ্ট। সে হিসেবে সহিত্য গুরুত্ব লাভ করেনি। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, সংবাদ পত্র, বেতার চাকুরী হিসেবে এখানে সাহিত্য ব্যবহৃত হচ্ছে কিন্তু জীবিকা-উপাজীবিকা হিসেবে এখানে এর কোন মূল্য স্বীকৃত নয়। শিল্প সাহিত্যের বিকাশে রাজশাহীর গতিহীনতার কারণ এখানে বা এ অঞ্চলে সাহিত্য আন্দোলন হিসেবে সক্রিয় নয়, মুদ্রণ শিল্প সেকেলে পর্যায়ে রয়েছে, মুদ্রণ-প্রকাশনার আনুসঙ্গিক দ্রব্যাদি এখান দুর্লভ এবং সামগ্রিকভাবে শিল্প সাহিত্যের অনুকুলে মূল্যবোধ সচেতন নয়। জাতীয় অর্থে পোষিত শিল্প-সাহিত্য সংস্থা সমূহ এদিকে যথার্থ সহযোগিতার হস্তপ্রসার করেনি। এসব প্রতিকূলতা দূরীভুত হলে রাজশাহীর সাহিত্য শিল্পের সুষমা বিকাশ নিশ্চিত হয়ে উঠবে।

তথ্যসংকেত

০১. মিছের, কাজী মো : রাজশাহীব ইতিহাস ২য় খণ্ড, ১৯৬৫, পৃ: ৩২২।

০২. যেমনটি হয়েছে অন্যক্ষেত্রে। শাহেদ আলী 'বাংলা সাহিত্যে চট্টগ্রামব অবদান' আ. ন. ম আবদুস সোবহানের ফরিদপুরের কবি সাহিত্যিক, (১৩৭৬) প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য।

০৩. চিত্রার সুখ, এবার ফিরাও মোবে (রামপুব বোয়ালিয়া), সন্ধ্যা (পতিসর), দ্র. ববীন্দ্র রচনাবলী প্রথম খণ্ড শত বার্ষিকী সংস্করণ পৃ: ৪৬৬, ৪৭২, ৪৭৩।

০৪. চৈতালী, সূচনা, ঐ।

০৫. আবু তালিব, মুহম্মদ : উত্তর বঙ্গের সাহিত্য সাধণা; বাংলা ভাষাব আদি নীড়, ববেন্দ্র ভূমি ও তার ভাষা, বরেন্দ্র একাডেমী পত্রিকা দ্বি-স॥

০৬. Bengal Spectator 1st part number 6. August 1942 দ্র. ডক্টর সুবেশ চন্দ্র মৈত্র বাংলা নাটকের বিবর্তন, কলকাতা ১৯৭৩, পৃ: ২০৯।

০৭. শহীদুল্লাহ, ড. মুহম্মদ : বাঙলা সাহিত্যের কথা প্র. খ, নতুন সং ১৯৬৩, পৃ: ৩৬।

০৮. বন্দোপাধ্যায়, অসিত কুমার? বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম খণ্ড তৃ-স, ১৯৭০, পৃ: ১০৯।

০৯. সেন, ড. সুকুমার : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড, দ্বি-স, ১৯৪৮, পৃ: ৩১৪।

১০. পূর্বোক্ত রাজশাহীর ইতিহাস, পৃ: ৩২২।

১১. মুসলিম বাংলা সাহিত্য, পৃ: ২৫৩।

১২. সাহিত্য পথে, পৃ: ২৭।

১৩. পুর্বোক্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ: ৯২৮।

১৪. তদেব, পাদটীকা, পৃ: ৯২৮।

১৫. আবু তালিব : উত্তর বঙ্গে সাহিত্য সাধনা, ১৯৭৫, পৃ: ২৯১।

১৬. তদেব, পৃ: ৩৩৭।

১৭. আবূ তালিব, শাহ্ মখদুমের জীবনী তোয়ারিক, সাহিত্যিকী তৃ-খ ১৩৭২ শরৎ।

১৮. আবদুল মান্নান, ডক্টর কাজী : আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা। ১ম খণ্ড, ১ম-সং ১৯৬১, পৃ: ২৬৫-৬৬।

১৯. আবদুর রাজ্জাক : ইসলামী গ্রন্থপঞ্জী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা ১৯৭৮ দ্র.।

২০. আফতাব হোসেন বগুড়া জেলায় জন্ম গ্রহণ করলেও নওগাঁয় স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। এবং এখানেই তিনি ইন্তেকাল করেছেন। তাঁর 'অশ্রুরেখা' উপন্যাস (১৩৩৪) কলকাতা মোহাম্মদী প্রেস থেকে, 'বেনুবন' ও 'মন্দা' কাব্য কলকাতা বিদ্যোদয় লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

২১. নুর মোহাম্মদ, আ. কা. শ : নবাবগঞ্জ পরিচিতি ১৯৭৩।

২২. মুস্তাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'স্মরণিকা' রাজশাহী ১৯৭৭, পৃ: ৫০।

২৩. পূর্বোক্ত, রাজশাহীর ইতিহাস, পৃ: ৩১১।

২৪. পূর্বোক্ত, নবাবগঞ্জ পরিচিতি ১৩৭৩ পৃ: ৭৯।

২৫. 'পথের সন্ধানে' নাম দিয়ে একটি আত্মজীবনীমুলক গ্রন্থও তিনি প্রকাশ কবেছিলেন।

২৬. লন্ডনের এম. ফিল। ইতিহাসেব অধ্যাপিকা। প্রকাশিত নিবন্ধ। The Communal Riots in North India 1885-1892, JASP. AM 1968. The Ilbert bill Controversy, Rajshahi University Studies, vl III. (1970), The Agrarian uprising of Titumir, IBS Jouranal 1976 ইত্যাদি।

২৭. পিএইচ. ডি (১৯৬০) মিসিগান স্টেট ইউনিভারসিটি থিসিস : A Rivision of Stigeoclonium and critical Studies of related genere প্রকাশ ১৯৬৩, পশ্চিম জার্মানী থেকে। তাঁর তিনকানা বই পশ্চিম জার্মানী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ডঃ ইসলাম পাকিস্তান, বাংলাদেশ, পঃ জার্মানী, ফ্রান্স এবং U.S.A-ব বিভিন্ন বিজ্ঞান সাময়িকীতে ১৯৬০ থেকে অদ্যাবধি ৭০টি মৌলিক নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন। তাঁর প্রায় সব মৌলিক গবেষণাই ইংরেজিতে।

২৮. অভিসন্দর্ভ Genetical Studies of Ultraviolet Mutants of Corpinus Lagopus and the Effiect of visible light on viability

২৯. পশ্চিম জার্মানী : ফ্রাংকফুর্ট থেকে Injuitrial Finance in Pakistan and Germany বিষয়ে পিএইচ. ডি. লাভ করেছেন।

৩০. অভিসন্দর্ভ : Some Aspects of measurement of Profit and valuation of assets with reference ot India and Pakistan (অপ্র.) প্রকাশিত গ্রন্থ উৎপাদন ব্যয় হিসাব নিকাশ ১ম ও ২য় খণ্ড, হিসাব বিজ্ঞান নীতি ও প্রয়োগ ইত্যাদি।

৩১. 'অভিসন্দর্ভ : Regional Dualism-A case study of Pakistan · 1949-50-1969-70'

৩২. লেখকের নিকট মি: রায়ের ব্যক্তিগত পত্র ২৫শে নবেম্বর ১৯৭৩।

রাজশাহীর রাজা-জমিদার

শাহ আনিসুর রহমান

আরবী 'জমিন' ও পারশী 'দার' শব্দ দুটি নিয়ে 'জমিদার' কথাটির উদ্ভব। এ দুটি শব্দেব অর্থ বিশ্লেষণ করলে যা দাঁড়ায় তা হলো ভূমির যারা অধিকারী তারাই হলেন জমিদাব। কিন্তু ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে এই উপমহাদেশে মুসলমানদের রাজত্ব কালে যাদেব 'জমিদার' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে আসলে তারা কোন ভূমির মালিক ছিলেন না। সে সময় 'জমিদারের' শাসকের প্রতিনিধি হিসেবে মহাল ও রাজস্বের তত্ত্বাবধান করতেন। শাসকের সন্তুষ্টি বিধান 'করতে পারলে তাদের' অনেকই বংশানুক্রমিক ভাবে 'জমিদার' পদে অধিষ্ঠিত হতেন। কিন্তু কালক্রমে তারা শাসকদের একটা নির্দিষ্ট বার্ষিক কর দিয়ে এক অর্থে ভূমির মালিক হয়ে বসেন। তারা প্রজাদের কাছ থেকে কেবল খাজনাই আদায় করতেন না গোটা জমিদারীর মঙ্গালামঙ্গল নির্ভর করেছে তাদের উপরই।

জমিদারী প্রথার সম্পূর্ণ ইতিহাস এই স্বল্প পরিসারে তুলে ধরা মোটেও সম্ভব নয়। কেবল এটুকুই বলা চলে যে, এই উপমহাদেশে মুসলমান শাসনের অবসানের পর ইংরেজরা জমিদারদের ইংল্যণ্ডের ভূম্যাধিকারীদের মত ভূমির সত্ত্বাধিকারী করা প্রয়োজন বলে মনে করেন। এর ফলে ১৭৯০ খ্রষ্টাব্দে বাঙ্গলায় এবং তার পরবর্তী বছর বিহার ও উড়িষ্যায় জমিদারদের সাথে ইংরেজদের দশ বৎসরের জন্যে রাজস্বের বন্দোবস্ত হয়। এটাই ইতিহাসে দশ শালা নামে খ্যাত। এই বন্দোবস্ত মোতাবেক জমিদারদের ভূসত্ত্বাধিকারী হিসেবে স্বীকার করে নেয়া হয়। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনরেল লর্ড কর্ণওয়ালিশ এই বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হিসবে ঘোষণা করেন। এই বন্দোবস্তে জমিদারদের স্বত্ব ও স্বার্থ কতটুকু সংরক্ষিত হয় তা ইংরেজদের লেখা থেকেই জানা গেছে। জনৈক হ্যারিটন সাহেব লিখেছেন : জমিদার জমিদারী মহলের সত্ত্বাধিকারী। জমিদারী সত্ব পুরুষানুক্রমে উত্তরাধিকারীও পাইবে। জমিদার দান, বিতরণ, উইল প্রভৃতির দ্বারা স্বীয় জমিদারী হস্তান্তর করিতে পারিবেন। মহালের উপর নির্ধারিত রাজস্ব যথানিয়মে সরকাব বাহাদুরকে দিতে জমিদার বাধ্য। জমিদারীর অন্তর্গত প্রজাগণের নিকট হইতে কিংবা ভূমির উৎকর্ষ সাধন জন্য যাহা কিছু সরকার আইন অনুসারে তাহা তিনি প্রাপ্ত হইবেন। তাহা হইতে রাজস্ব বাদ দিয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে, তৎসমস্তই তিনি ভোগ করিতে পারিবেন। ভবিষ্যতে সরকার বাহাদুর রায়ত কিংবা অন্য প্রজাগণের স্বত্ত্ব ও স্বার্থ রক্ষা এবং তাহাদিগকে অন্যায় অত্যাচার ও উৎপীড়ন হইতে রক্ষার নিমিত্ত কোন আইন করিলে জমিদারকে তাহা মানিয়া লইতে হইবে।

এ ভাবে ইংরেজ শাসিত ভারত বর্ষে আধুনিক অর্থে জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব হয়। তাবা কি ভাবে জমিদারী চালিয়েছেন তার স্বাক্ষী ইতিহাস। অনেক জমিদার যেমন অত্যাচারী ছিলেন তেমনি আবার অনেক জমিদার ছিলেন প্রজা বৎসল এবং সত্যিকারের দেশ হিতৈষী। এরা বিত্তের পাহাড় গড়ে তুললে প্রজাদের উপকারের জন্যে তাদের দুয়ার সব সময়ের জন্যেই খোলা ছিল। দেশ ভাগের পর ১৯৫৯ সালে আইন অনুসারে এ দেশ থেকে জমিদারীপ্রথা উচ্ছেদ হলেও জমিদারের অনেক কীর্তি এখনো রয়ে গেছে।

রাজশাহীতে ইংরেজ আমলে অনেক ছোট-বড় জমিদারই দেখা গেছে। বস্তুতঃ পক্ষে বাঙ্গালার অন্য কোন জেলায় এত অধিক সংখ্যক জমিদার আর ছিল কিনা সন্দেহ। এই জেলার

নাটোরের জমিদারেরা ছিলেন বিখ্যাত। তাদের জমিদারীর সীমানা ছিল বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। নাটোরের বেশ কয়েক জন জমিদার 'রাজা' 'মহারাজা' উপাধি পেয়েছেন। নাটোরের পরেই ছিল দীঘাপতিয়া রাজাদের স্থান। তবে দান-দাক্ষিণ্য দীঘাপতিয়ার জমিদাররা নাটোরের জমিদারদের ছাড়িয়ে গেছেন। তবে এ জেলার আদি জমিদারী নাটোর নয় দীঘাপতিয়াও নয়। ঐতিহাসিকেরা বলেন তাহিরপুরের জমিদারই এখানকার আদি। এর পরেই প্রাচীনত্বের দিক থেকে পুঠিয়ার জমিদারদের নামোল্লেখ করতে হয়। এই নিবন্ধে রাজশাহী জেলার খ্যাতনামা জমিদারদের বংশ পরিচয় তুলে ধরার প্রয়াস পাব।

তাহিরপুর রাজবংশ :

পঞ্চদশ শতকে তাহিরপুর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কামদেব ভট্ট। কামদেব কি ভাবে এখানে তার আধিপত্য বিস্তার করেন এ সম্পর্কে নানা ব্যাক্তির নানা অভিমত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, তাহিরপুর পুর্বে তাহির খান নামে একজন পাঠান জয়গীরদারের অধীনে ছিল। পরে কামদেব তাকে বিতাড়িত করে তার সম্পত্তি অধিকার করেন। আবার কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে পরগণে তাহিরপুর নামে বিরাট জমিদারীটি কামদেব ভট্টের নামেই বন্দোবস্ত হয়। এই কামদেব কে ছিলেন তা নিয়েও সংশয় কম নেই। কোন কোন গ্রন্থে তাহিরপুর রাজবংশের পূর্ব পুরুষ হিসেবে কিছু কালের জন্যে যিনি গৌড়ের অধিপতি ছিলেন সেই রাজা গণেশের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এটা সত্য নয়। মুসলমান ঐতিহাসিকদের তথ্যানুযায়ী গণেশ দিনাজপুরের (দিনাজের) অধিপতি ছিলেন। সুতরাং এদিক দিয়ে তাহিরপুর রাজ বংশের উৎপত্তি কোন ভাবেই সম্ভব নয় বলে মনে হয়। যাহোক, কামদেব ভক্ত তার বাজধানী স্থাপন করেন তাহিরপুরের বারনই নদীর ওপারে রামরামায়। বর্তমানে এখানে একটি ভাঙ্গা দালানের কিয়দংশ, দুর্ভেদ্য জঙ্গল ও কয়েকটি পুকুর ছাড়া আর কিছু নেই। তবে রাজধানীর চারি দিকে যে গড়খাই ছিল তা চারিদিকে ভালভাবে তাকালেই সেটা বোঝা যায়।

কামদেব ভট্টের বংশীয় গণের মধ্যে রাজা উদয়নারায়ণের নাম উল্লেখযোগ্য। বলা হয় যে, গৌড়েরশ্বরের আদেশ অমান্য করার অপরাধে তার অধীনস্ত সকল পরগণাই কেড়ে নেওয়া হয়। পরে কেবলমাত্র তাহিরপুর পরগণা ছেড়ে দিলে তিনি নদীর এপারে উঠে এসে রাজবাড়ী নির্মাণ করেন। উদয় নারায়ণের পৌত্র হচ্ছেন ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজা কংস নারায়ণ। তিনি খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ এবং ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এ অঞ্চলে প্রবল বিক্রমে রাজত্ব করেন। রাজা কংশ বারভূঁইয়াদের অন্যতম ছিলেন বলে জানা গেছে। তিনি মগদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন। তার পিতার নাম ছিল হরিনারায়ণ। কথিত আছে যে, রাজা কংশ নারায়ণ গৌড়ের সুলতান সিহাব-উদ-দীন বায়েজিদ শাহ ও তার উত্তরাধিকারী আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহকে হত্যা করে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কংস নারায়ণ বাংলায় আধুনিককালের দুর্গোৎসবের প্রবর্তক। এ সম্পর্কে একটি সুন্দর কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। এতে বলা হয় যে, পরিণত বয়সে রাজা কংস একটি মহাযজ্ঞ সম্পাদনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু তাতে বাধা দেন তার রাজ্যের পণ্ডিতেরা, তারা বলেন যে, কংস সামন্ত রাজা বিধয়ে তিনি যজ্ঞ করার অধিকারী নন। এ ছাড়া কলিকালে অশ্ব বা গোমেধ যজ্ঞ নিষিদ্ধ। এ কারণে রাজাকে রামচন্দ্রের মত শরৎকালে দুর্গাপূজা পালন করার জন্যে শাস্ত্রজ্ঞরা পরামর্শ প্রদান করেন। এরপর সাড়ে আট লাখ টাকা ব্যয়ে কংস নারায়ণ মহাসমারোহে দুর্গাপূজা সম্পন্ন করেন। এই পূজার পর থেকেই বাংলদেশে শরৎকালে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠানের রেওয়াজ চলে আসছে। কংস নারায়ণ বরেন্দ্র ব্রাহ্মণগণকে কুলীন, কাপ ও শ্রোতিয় এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন।

রাজা কংসনরায়ণের প্রপৌত্র লক্ষীনারায়ণের কন্যার সাথে-নাটোর রাজা রাম জীবনের পুত্র কালিকা প্রসাদের বিবাহ হয়। ইতিহাসে তিনি 'কারু কোঙর' নামে খ্যাত। এই বংশের অন্যতম রাজা নরেন্দ্র নারায়ণ। তিনি একমাত্র কন্যা উমাপতী দেবীকে রেখে মৃত্যুবরণ করেন। তার বিবাহ হয় আনন্দীরামের সাথে। আনন্দীরামের মৃত্যুর পর তার ভ্রাতা বিনোদরাম রায় এই বংশের উত্তরাধিকারী হন। বিনোদরাম রায়ের বংশধরই হলেন তাহেরপুর রাজ্যের শেষ জমিদার রাজা শশি শেখর রায়। তিনি বিদ্যান, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক ছিলেন।

তাহিরপুর রাজবাড়ীটি এখন ভগ্ন প্রায়। এর গা থেকে ইট খসে পড়ছে। বর্তমানে এটা তাহিরপুর কলেজের অধীনে। তবে এখানকার কয়েকটি মন্দির আজো ভাল অবস্থায় রয়েছে। এগুলো প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষণের ব্যবস্থা হলে তাহিরপুর ইতিহাসবিদ ও ইতিহাস অনুরাগী ব্যক্তিদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সাঁতৈল রাজবংশ :

সিংড়া থানার কাছে আত্রাই ও করতোয়া নদীর সঙ্গম হলে সাঁতৈল বা সাঁতুল রাজার রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। এর নিকটেই রয়েছে সাঁতুলের বিল। বিলটি বিখ্যাত চলন বিলের সাথে সংযুক্ত।

সাঁতুল রাজ্যের সৃষ্টি হয় রাজা গণেশের সময়। তখন সেখানে একজন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ প্রবল হয়ে ওঠেন এবং তপ্পে ভাতুড়িয়া ও ১৩টি পরগণা তার অধিকার ভুক্ত হয়। ভাতুড়িয়া ও সরকার পিঞ্জিরার অন্তর্গত এই জমিদারীর বার্ষিক আয় ছিল ২৪১৯৭ টাকা।

আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম-উস-সান যখন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় শাসনকর্তা যে সময় রাজা সীতানাথ সাঁতুলের জমিদার। পরিনত বয়সে তিনি তার কনিষ্ঠ সহোদর রামেশ্বরের উপর সমস্ত বিষয় কর্মের ভার দিয়ে সংসার থেকে দূরে থাকেন। তাকে অনেকে পঞ্চপাতকী হিসেবে নির্দেশ করেছেন। এই মহাপাপের জন্যই নাকি তার বংশ লোপ পেয়েছে।

যাহোক, পরবর্তীকালে রামেশ্বরের পুত্র রামকৃষ্ণ সীতুলের রাজা হন। তার পত্নী রাণী সর্বানী দান-ধ্যানের জন্যে সুনাম অর্জন করেন। তিনি বগুড়ায় ভবানীপুরে একটি পীঠ প্রতিষ্ঠা করেন। এই পীঠটি এখনো বর্তমান থেকে রাণীর নাম নীরবে প্রচার করে চলেছে। ১৭১০ খৃষ্টাব্দে রাণী সর্বানীর মৃত্যুর পর রামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র বলরাম সাঁতুলের রাজা হন। কিন্তু নাটোরের রঘুনন্দন বলরামের বিরুদ্ধে সত্য মিথ্যা নানা প্রচারণা চালিয়ে নবাবের নিকট থেকে সমস্ত ভাতুড়িয়া পরগণা নিজেদের নামে বন্দোবস্ত নেন। সেই সাথেই সাঁতুল রাজবংশ লোপ পায়। সাঁতুল রাজবংশ লোপ পাওয়ার পর রানী সর্বানীর বিভিন্ন কীর্তি নষ্ট হওয়ার উপক্রম হলে নাটোরের রানী ভবানী সেগুলোর সংস্কার সাধর করেন।

পুঁঠিয়া রাজবংশ :

সরকার বারবাকাবাদের অন্তর্গত একটি পরগণার নাম পরগণে লস্করপুর। জনাব কে,এম, মিছের রচিত 'রাজশাহীর ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, পদ্মার উভয় তীরে মুর্শিদাবাদ ও রাজশাহী জেলায় এই জমিদারী বিস্তৃত ছিল। এর সদর ছিল পুঁঠিয়ায়। এর অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল চারঘাট থানার আলাইপুর গ্রামে। ষোড়শ শতাব্দীতে এই পরগণার বার্ষিক রাজস্ব ছিল ২৫৫০৯০ দাম। পুঁঠিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন বৎসরাচার্য নামক জনৈক ঠাকুর।

বৎসরাচার্য কিভাবে এই পরগণা লাভ করেন সে সম্পর্কে একটি কাহিনী চালু আছে। লস্করপুর পরগণা তখন পাঠন জায়গীরদার লস্করী খানের অধীনে। কিন্তু তিনি বিদ্রোহী হয়ে মোগল সম্রাটকে

রাজস্ব প্রদান বন্ধ করে দিলে বাদশাহ আকবর অন্যান্যদের সাথে তাকেও দমন করার জন্যে বহু সৈন্যসহ সেনাপতি মানসিংহকে প্রেরণ করেন। মানসিংহ লস্করী খানকে পরাজিত করে তার জমিদারী বৎসরাচার্যের নামে বন্দোবস্ত দেন। কেউ কেউ বলেন যে, বৎসরাচার্যের বিষয়-সম্পত্তির প্রতি স্পৃহা না থাকায় মানসিংহ পরবর্তীকালে তার পুত্র পীতাম্বরকে উক্ত জমিদারী তুলে দেন। পীতাম্বরকে মোঘল দরবার থেকে 'সহর মন্ডল' উপাধিও প্রদান করা হয়।

লস্করী খান তার জমিদারী হারিয়ে আলাইপুরে কিছুদিন অতিবাহিত করার পর মৃত্যুবরণ করেন। আলাইপুর এখনও তার বংশধরেরা জীবিত আছেন।

পীতাম্বর খুব বেশীদিন জমিদারী ভোগ করতে পারেননি। তার মৃত্যুর পর তার ভ্রাতা নীলাম্বর সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হন। বাদশাহ জাহাঙ্গীর নীলাম্বরকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করেন। বৈবাহিক সূত্রে নীলাম্বর তাহিরপুর রাজ্যের অর্দ্ধেক ভূসম্পত্তি লাভ করেন। নীলাম্বরের দুই পুত্র রতিকান্ত ও আনন্দ রাম। রতিকান্ত জ্যেষ্ঠ হলেও পিতার অপ্রিয় হওয়ায় তিনি পিতৃ সম্পত্তির অধিকারী হননি। নীলাম্বরের জীবদ্দশাতেই আনন্দরাম 'রাজা' উপাধি পান।

রতিকান্তের পুত্রের নাম রামচন্দ্র। রাম চন্দ্রের তিন পুত্র। তাদের নাম নরনারায়ণ, দর্পনারায়ণ ও জয় নারায়ণ। নরনারায়ণ ঠাকুরের সময় নাটোর রাজ স্থাপয়িতা রঘুনন্দনের পিতা কামদেব লস্করপুরের অন্তর্গত বারুইহাটি গ্রামের তহসিলদার ছিলেন। দর্পনারায়ণ ঠাকুরের সময় রঘুনন্দন তাকে পূজোর ফুল সংগ্রহ করে দিতেন। কিন্তু তার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়ে নবাব দরবারে তাকে পুঁঠিয়া রাজের পক্ষে উকিল নিযুক্ত করা হয়। উকিল হবার পর থেকেই রঘুনন্দনের সৌভাগ্যের দুয়ার খুলে যায়। কিন্তু সে ইতিহাস পরে উল্লেখ করা হবে।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলে লস্করপুর পরগণা পুঠিয়া রাজের অন্যতম বংশধর আনন্দ নারায়ণের নামে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়। তার এক উত্তরাধিকারী রাজেন্দ্র নারায়ণ বৃটিশ সরকার থেকে 'রাজা বাহাদুর' উপাধি পান।

এর আগে পুঁঠিয়ার রাজা ভূবনেন্দ্র নারায়ণ নতুন জমিদারী খরিদ করেন। তার পুত্র জগন্নারায়ণ ১২১৪ বঙ্গাব্দে ময়মনসিংহ জেলার পুখরিয়া, রাজশাহী জেলার কালীগাঁও, কালীসুরা ও কাজীহাটা এবং নদীয়া জেলার ভবানন্দ দিয়াড় পরগণাগুলো খরিদ করে জমিদারীর যথেষ্ট আয় বাড়ান। তিনি কাশী এবং আরো নানা স্থানে অতিথি শালা নির্মাণ করেন। তিনি 'রাজা বাহাদুর' উপাধি লাভ করেন। তার মৃত্যুর পর তার স্ত্রী ভুবনময়ী দেবীও বহু দান করে খ্যাতি অর্জন করেন।

পরে পুঁঠিয়ার জমিদারী কয়েক তরফে বিভক্ত হয়ে যায়। এদের মধ্যে পাঁচ আনী তরফই জমিদারীর ঠাঁট বাট বজায় রাখে। এই তরফের কৃষ্ণেন্দ্র নারায়ণ ও তার পুত্র ভৈরবেন্দ্র নারায়ণ রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণেন্দ্র নারায়ণ অতি স্বজন জমিদার ছিলেন। তিনি লালগোলায় রাণী ভবানীর পক্ষে জামিন হন। কিন্তু রাণী দত্তক পুত্র অসিদ্ধ হলে তার উপর ওয়াসীলাৎ বাবদ দেড়লক্ষ টাকারও অধিক ডিক্রী হয়। একই কারণে তার পুত্রেরও বহু সম্পত্তি নীলাম হয়ে যায়। কিন্তু এতে তিনি বিচলিত না হয়ে সানন্দে জমিদার হিসেবে কাজ চালিয়ে গেছেন। কিন্তু তবু শেষ রক্ষা করতে পারেননি। নানা মামলা-মোকদ্দমায় তিনি ঋণভারে জর্জরিত হয়ে পড়েন। পরে সমুদয় সম্পত্তি হস্তান্তর করা ছাড়া তার আর কোন উপায় থাকে না।

পুঁঠিয়ার রাজাদের মধ্যে পরেশ নারায়ণের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি বেশীদিন জীবিত না থাকলেও প্রজাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে খুব আগ্রহী ছিলেন। তার আমলেই পুঁঠিয়া, বোয়ালিয়া, কাপাসিয়া, জামিরা, বানেশ্বর, আড়ানী এবং আরো কয়েকটি স্থানে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজা জগন্নারায়ণ রায়ের পৌত্র রাজা যোগেন্দ্র নারায়ণও ছিলেন একজন প্রজাবৎসল জমিদার। তার সময়ে ছিল নীলকরদের প্রচণ্ড দাপট। নীলকররা নীল চাষের জন্যে কৃষকের উপর কি সীমাহীন

অত্যাচার চালিয়েছে তা বর্ণনা করা যায় না। রাজা যোগেন্দ্র নারায়ণ নীলকরদের হাত থেকে তার প্রজাদের রক্ষা করার জন্যে সব সময়ই চেস্টা করে গেছেন। তার পত্নী রাণী শরৎসুন্দরী স্বামীর মতই অশেষ সদ্‌গুণের পরিচয় দেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি সমস্ত ভোগ বিলাসকে পদদলিত করে পরোপকারের জন্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। বৃটিশ সরকার তাকে 'মহারাণী' উপাধিতে ভূষিত করলেও তিনি তা গ্রহণ না করে বলেছেন, তিনি বিধবা। সুতরাং এ সম্মান গ্রহণ করা তার সাজে না। ১২৯৩ বঙ্গাব্দে ২৫শে ফাল্গুন কাশীতে এই দানশীলা রমনীর মৃত্যু হয়। তারদত্তক পুত্র যতীন্দ্র নারায়ণের স্ত্রী হেমন্তকুমারী শ্বাশুড়ীর মত দান-ধ্যান খ্যাত নাম্নী ছিলেন।

পুঁঠিয়ার রাজাদের শেষ খুব ভাল যায় নি। নিজেদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ হওয়ার খবর আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। শেষের দিকের অনেক রাজ্য জমিদারীর কাজ-কর্ম ছাড়া মদ ও নারীতে আসক্ত হয়ে পড়েন। এতে তাদের পৈতৃক সম্পত্তি দিনের পর দিন বিনষ্ট হতে থাকে।

পুঠিয়া আজ নীরব। কেবল পাঁচ আনী জমিদার বাড়ী ছাড়া সবগুলো জমিদার বাড়ী ধ্বংস হয়ে গেছে। তবে কয়েকটি টেরাকোটা সমৃদ্ধ মন্দিব আজো ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে চলেছে। এগুলো সংরক্ষণের জন্যে আরো অধিক মনোযোগ দেয়া হলে অদূর ভবিষ্যতে পুঁঠিয়া একটি পর্যটক কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রযেছে।

নাটোর রাজবংশ :

অষ্টাদশ শতকে নাটোর রাজের উৎপত্তি। এই রাজবংশ এক কালে অর্দ্ধবঙ্গের অধীশ্বর ছিলেন। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দুই ভ্রাতা— রঘুনন্দন ও রামজীবন।

নাটোর রাজ পরিবার বরেন্দ্র ব্রাহ্মণদের মৈত্র শাখা হতে উদ্ভূত। অতীতে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ কনোজ থেকে বাংলাদেশে আগমন করেন তাদের অন্যতম হলেন সুষেন মণি। সুষেন মণির পয়ত্রিশতম অধ্যঃস্তন পুরুষ হলেন কামদেব মৈত্র তিনি পুঠিয়া রাজার অধীনে তহশীলদারের কাজ করতেন— একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। কামদেবের তিন পুত্র— রামজীবন, রঘুনন্দন ও বিষ্ণুরাম। বিষ্ণুরাম পিতার জীবদ্দশাতেই মারা যান। দ্বিতীয় পুত্র রঘুনন্দন পিতার মতই পুঁঠিয়া রাজার অধীনে চাকুরী নেন। তবে তার কাজ ছিল রাজার পুজার ফুল তুলে দেয়া। কথিত আছে, একদিন পূজার ফুল তুলতে গিয়ে রঘুনন্দন ঘুমিয়ে পড়লে একটি সাপ তার মুখের উপর ফনা বিস্তার করে তাকে রৌদ্র থেকে রক্ষা করে। পুঁঠিয়ার রাজা দর্পনারায়ণ এ খবর পেয়ে ঘোষণা করেন যে, কালে রঘুনন্দন রাজা হবে। তিনি রঘুনন্দনকে ডেকে বলেছিলেন : তুমি প্রতিজ্ঞা কর, রাজা হলে আমাব বংশকে রাজ্যচ্যুত করতে পারবে না। রঘুনন্দন রাজা হবার পর এই প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলেছেন।

রাজা দর্পনারায়ন রঘুনন্দনকে পুঁঠিয়া রাজাদের উকিল নিযুক্ত করে ঢাকার নবাব দরবারে প্রেরণ করেন। অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার দরুণ রঘুনন্দন অল্প দিনের মধ্যে সমস্ত মুসলমানী নিয়ম কানুন শিখে ফেলেন। নবাবের সকল কর্মচারীর সাথে তার পরিচয় হয়। পরে কানুনগো পদ লাভ করে ঢাকা থেকে রঘুনন্দন মুর্শিদকুলী খাঁর সাথে মুর্শিদাবাদে আগমন করেন। মুর্শিদকুলী খাঁ তাকে দর্পনারায়ণের অধীনে নায়েব কানুনগো পদ প্রদান করেন। সে সময় কানুনগোর দস্তখত ছাড়া কোন হিসাব-নিকাশের কাগজ পত্র বাদশাহের দরবারে গৃহীত হতোনা। আজিম-উস-সানের সাথে মুর্শিদ কুলী খাঁর মনোমালিন্য ঘটলে বাদশাহের পক্ষ থেকে সকল কানুনগোকে কাগজপত্রে দস্তখত না দেয়ার জন্যে বলা হয়। মুর্শিদকুলী খাঁ পড়েন বিপদে। কিন্তু রঘুনন্দন এ বিপদ থেকে তাকে রক্ষা করেন। তিনি বাদশাহের নির্দেশ অমান্য করে মর্শিদকুলী খাঁর নিকাশী কাগজপত্রের স্বাক্ষর দেন। এর পর থেকেই মুর্শিদকুলী খাঁর অত্যন্ত প্রিয় পাত্র হয়ে ওঠেন

রঘুনন্দন। দর্পনারায়নের মৃত্যুর পর রঘুনন্দন দেওয়ান ও রায়রায়াঁন পদপান। এই সময় বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যায় রাজস্ব আদায়ের ভার ছিল মুর্শিদকুলী খাঁর দৌহিত্রীপুত্র সৈয়দ রেজা খাঁর উপর। তিনি জমিদারদের উপর নির্মম অত্যাচার চালিয়ে রাজস্ব আদায় করতেন। তিনি অনেকের জমিদারী কেড়ে নিয়ে সেগুলোর আবার নতুনভাবে বন্দোবস্তুও দিয়েছেন। এ সময়েই রঘুনন্দন বহু জমিদারী হস্তগত করে নেন। নিজ ভ্রাতা রামজীবন ও ভ্রাতুষ্পুত্র কালু কোঙরের নামে ১১১৩ বঙ্গাব্দে পরগণা বাণগাছি, ১১১৭ বঙ্গাব্দে সাঁতৈলের রাণী সর্বানীর নামে পরগণা ও ভাতুড়িয়া, ১১২১ বঙ্গাব্দে উদিত নারায়ণের অধিকারভুক্ত সমগ্র রাজশাহী চাকলা এবং ১১২২ বঙ্গাব্দে নলদী পরগণা ও রাজা সীতারামের মৃত্যুর পর ভূষণা ও ইব্রাহিমপুর পরগণা বন্দোবস্ত নেন। এর পরেও হাবেলী মহম্মদপুর, শাহ উজীয়াল, তুজ্ঞী, স্বরূপপুর ও জামালপুর পরগণাও রামজীবনের অধিকারে আসে। এরপর রঘুনন্দন লস্করপুর পরগণার অধীনে কানাইখালীর অন্তর্গত নাটোরে পরিখাবেষ্টিত সুরম্য রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেন। লস্করপুর, তাহিরপুর ও বারবাকপুর পরগণা ব্যতীত সমগ্র রাজশাহী, পাবনা ও বগুড়া জেলা এবং ঢাকা, ফরিদপুর, যশোহর সাঁওতাল পরগণা, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, রঙ্গপুর ও ভাগলপুরের অনেক জমিদারী রামজীবনের অধিকারভুক্ত হয়। তখনকার নাটোর রাজের অধীনে ভূ পরিমান ১২০০০ বর্গমাইলেরও অধিক ছিল। রঘুনন্দনের মোট ১৩৯টি পরগণার রাজস্ব ধার্য ছিল ১৭৪১৯৮৭ টাকা। ১৭০৬ সালে মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ রাজ রামজীবনকে রাজা বাহাদুর সনদ ও ২২ খানি খিলাত এবং রাজছত্র ও দণ্ড প্রভৃতি ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করেন। রামজীবন ও রঘুনন্দন উভয়েই তাদের রাজ্যের নিরাপত্তার জন্যে সৈন্যবাহিনী রাখতেন। তারা দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারও করতেন। রাজা রামজীবন বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তার দরবারে সংস্কৃতজ্ঞ কবি শ্রীকৃষ্ণ মর্যাদার আসন পেয়েছিলেন। রাজ্যের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্যে তিনি দেওয়ান নিযুক্ত করেন।

রাজা রামজীবন অতুল বৈভবশালী হলেও বংশমর্যাদায় তিনি ছিলেন হীন। পরে নানা কৌশল অবলম্বন করে তাহিরপুরের রাজা লক্ষীনারায়ণকে বশীভূত করে তার কন্যার সাথে রামজীবন তার এক মাত্র পুত্র কালিকা প্রসাদের বিবাহ দেন। এই বিবাহ হতেই নাটোর রাজবংশের সামাজিক ও পদগৌরব বৃদ্ধি পায়।

১৭২৫ খৃষ্টাব্দে প্রথমে রাজা রঘুনন্দন পরে রামজীবনের পুত্র ক্যাল্কা প্রসাদ ও রঘুনন্দনের একমাত্র শিশু সন্তান ইহলোক ত্যাগ করেন। রাজা রামজীবন রাজ্য রক্ষার জন্যে একান্ত বাধ্য হয়ে চৌগ্রামের রসিক রায়ের পুত্র রামকান্তকে দত্তক হিসাবে গ্রহণ করেন। এজন্যে রসিক রায়কে রাজশাহী জেলার পরগণা চৌগ্রাম ও রঙ্গপুর জেলার পরগণা ইসলামাবাদ ছেড়ে দিতে হয়। চৌগ্রামে রসিক রায়ের বংশধরের চৌগ্রামের রাজা হিসাবে পরিচিত হন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে রামজীবনের মৃত্যু হলে বালক রামকান্ত রাজা হন। কিন্তু তার নাবালক অবস্থায় রাজকার্য পরিচলনা করেন নাটোরের দেওয়ান দীঘাপতিয়ার দয়ারাম।

১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে রামকান্ত ১৮ বৎসর বয়সে পদার্পণ করলে রাজ্যভার তিনি স্বহস্তে গ্রহণ করেন। তার আমলে ১৬৪টি পরগণা নাটোর রাজের অধিকারভুক্ত হয়। এর জন্যে তাকে রাজস্ব দিতে হতো ১৮৫৩৩২৫ টাকা। রামকান্ত যে বিষয় কর্মে পাকা ছিলেন রাম জীবনের সময় থেকে ২২টি পরগণা বৃদ্ধিই তার প্রমাণ। রামজীবনের জীবদ্দশাতেই বগুড়া জেলার ছাতিয়ান গ্রাম নিবাসী আত্মারাম চৌধুরীর কন্যা ভবানীর সাথে রামকান্তের বিবাহ হয়। ঐ কন্যাই ইতিহাস প্রসিদ্ধা রাণী ভবানী। রাজ্য প্রাপ্তির পর প্রথম দিকে রাজা রামকান্ত রাজকাজে বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দেন। এ সময় তাকে পরামর্শ দিতেন দেওয়ান দয়ারাম। কিন্তু পরবর্তীকালে তার নানা কুসঙ্গী জুটে। ফলে নবাবের রাজস্ব বাকী পড়তে থাকে। দয়ারাম

উপায় না দেখে নবাব আলিবর্দী খাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে রামকান্তের সমুদয় বিষয় তাকে অবগত করান এবং তারই পরামর্শে নবাব রামকান্তকে রাজ্যচ্যুত করে রামজীবনের কনিষ্ঠ বিষ্ণুরামের পুত্র দেবীপ্রসাদকে রাজ্য প্রদান করেন। শোনা যায়, এ সময়ে রামকান্ত রাণী ভবানীসহ মুর্শিদাবাদে জগৎশেঠের আশ্রয় গ্রহণ করেন। জগৎশেঠের চেষ্টায় তিনি আবার হারানো রাজ্য ফিরে পান। দয়ারাম পুনরায় দেওয়ান নিযুক্ত হন।

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে রাজা রামকান্ত স্ত্রীভবানী ও একমাত্র কন্যা তারাকে রেখে পরলোকগমণ করেন। বিশাল নাটোর রাজ্যের ভার পড়ে রাণী ভবানীর উপর। তারার বিবাহ হয় রঘুনাথ লাহিড়ীর সাথে। রাণী ভবানীর ইচ্ছা ছিল রাজ্যের ভার তার জামাতার হাতে তুলে দেয়ার। এজন্যে নবাব সরকারের কাছে জামাতার নাম জারীও করেছিলেন। কিন্তু ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে হঠাৎ তার জামাতার মৃত্যু হওয়ায় তার সে ইচ্ছা পূরণ হয়নি।

রাণী ভবানীর রাজত্বের সময় এর উন্নতি লক্ষ্য করে গ্রাণ্ট সাহেব লিখেছেন :

'Rajshahi, the most unwiedly, extensive Zamindary in Bengal. Perhaps in all india, Intersected in its whole by the Great Ganges on its leser branches, with many othe navigable rivers and fertilizing waters, Producing within the limits of its Jurisdictions at least fourth fifth of all the silk, saw or manufactured, used in or, exported from the Empire of Hindusthan, with a Supera-bundance of all the other richest Productions of nature and art to be found in the wormer climates of Asia, fit for Commercial Purposes; enclosing its circuit, and benefited by the industry and Population of the over-grown Capital of Murshidabad, the Principal factories of Kasim Bazar Beauleah, Kumarkhali etc. and bordering on almost the other great Provincial cities manufacturing towns and Public markets of the Subah or Governorship.' (Grant's analysis of the Finances of Bengal, 1786)

গ্রান্টের এই বিবরণে প্রকাশ, রাণী ভবানীর সময় রাজশাহী কেবল বাঙ্গালায় নয় সারা উপমহাদেশে একটি বৃহৎ জমিদারী বলে গণ্য হতো। অন্য একজন ইংরেজ হলওয়েল সাহেব লিখেছেন :

'At Natore about ten days travels North-East of Calcutta resids the family of the most ancient and opulent of the Hindu Princes of Bengal, Raja Ramkanto who deceased in the year 1748, was succedd by his wife, named Bhabani Rani, whose Dewan or minister was Daya Ram, they Possess a tract of country about 35 days travels and under a Settled Government, their Stipulated annual rent to the Crown was seventy laks of Sicca Rupees, the real revenues about one krore and a half.'

হলওয়েল সাহেবের বিবরণ হতে জানা যায়, ৩৫ দিনের পথ ব্যাপী ছিল রাণী ভবানীর রাজ্য। এর দেয় রাজস্ব ছিল ৭০ লাখ টাকা এবং খাজনা আদায় হতো প্রায় দেড় কোটি টাকা। কেবল গ্রান্ট অথবা হলওয়েল সাহেবই নয় হেসটিং এবং আরো অন্যান্য ইংরেজ সাহেব নাটোরের জমিদারী বিশেষ করে রাণী ভবানীর আমলের জমিদারী নিয়ে অনেক কথাই লিখে গেছেন।

রাণী ভবানীমাত্র ৩২ বছর বয়সে বিধবা হন। এত অল্প বয়সে জমিদারী পরিচালনার কাজ হাতে নিলেও তিনি পরিচয় দেন অসামান্য প্রতিভার, বুদ্ধিমত্তার। তিনি ছিলেন ধর্মনিষ্ঠ এবং পরের দুঃখে কাতর। রাণী ভবানী তার জমিদারীতে জন সাধারণের দুঃখ-কষ্ট লাঘবের জন্যে কত যে পূণ্য কাজ করেছেন এবং কত লোক যে তার কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছেন তার সংখ্যা নিরূপণ করা কঠিন। শুধু তার জমিদারীতেই নয় রাণী ভবানী কাশী এবং আরো অন্যান্য স্থানে

তার কীর্তি স্থাপন করেছেন। তার সময়েই বাঙ্গালার বিখ্যাত সাতাত্তরের দুর্ভিক্ষ হয়। এ সময় তিনি প্রজাদের জন্যে তার রাজকোষ একরকম খুলে দিয়েছিলেন বলা চলে। কিন্তু পরবর্তীকালে ইংরেজদের দুর্ব্যবহারে ব্যথিত হয়ে দত্তকপুত্র রামকৃষ্ণের উপর জমিদারীর ভার ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র বসবাস করতে থাকেন।

রাণী ভবানীর সময় অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে গেছে। আলীবর্দীর মৃত্যুর পর তার দৌহিত্র তরুণ সিরাজ-উদ-দৌলা নবাব হন। কিন্তু প্রথম থেকেই তিনি শত্রুতার সম্মুখীন হন ইংরেজদের। তার পরিষদ বর্গও গোপনে এমনকি প্রকাশ্যেও তাব বিরুদ্ধাচারণ করা শুরু করে। এ সময় নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত পরিষদ বর্গের কাছে এক চিঠিতে রাণী ভবানী লিখেছিলেন—"নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা সামান্য বালক মাত্র। অল্প দিন হয় তিনি বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার মসনদে বসেছেন। তাকে আপনারা সুচারুরূপে রাজ্য পরিচালনার সুযোগ দিন। আপনারা প্রত্যেকেই অভিজ্ঞ রাজপুরুষ। ইংরেজরা মুর্শিবাবাদ আক্রমণে প্রস্তত হয়েছে। এখন তরুণ নবাবের বিপন্ন অবস্থা। এখন তাকে সাহায্য করলে সে সাহায্য শুধু নবাবকেই করা হবেনা বরংচ বাংলা আর বাঙ্গালীকে রক্ষা করা হবে। দিল্লীর বাদশাহ তো আমাদের নাম মাত্র শাসক। বাংলার নবাবইতো বাংলাদেশের হিন্দু মুসলমানের ভাগ্য বিধাতা। আমি আমার শাঁখা সিঁদুরের দোহাই দিয়ে বলতে চাই আপনারা নবাবের প্রতি বৈরীভাব পরিত্যাগ করুন।" রাণী ভবানী এই চিঠির সাথে তার শাঁখা-সিঁদুরও নাকি পাঠিয়েছিলেন। তিনি নবাবকে ইংজেদের বাণিজ্য করার অনুমতি দিতে বারণ করেছিলেন প্রজাদের প্রতি রাণী ভবানীর দরদের পরিচয় পেয়ে ফকির আন্দোলনের নেতা মজনু শাহ তাকে অপরিসীম শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। ফকিরদের সাথে সংঘর্ষে ইংরেজ বহু ফকির হত্যা করলে মজনু শাহ রাণী ভবানীর কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। এসব কারণে রাণী ভবানীর উপর ইংরেজরা ক্রমেই বিরক্ত হয়ে ওঠে। 'ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার অব ইণ্ডিয়ায়' একবার লেখা হয় :

"Unfortunately, however, for the natore famıly, the estale fell under the management of a woman, the celebrated Rani Bhabani, whose charitable garants of rent free land Permanently impoverished her ancestral Possessıons"

রাণী ভবানীর দত্তক পুত্র রামকৃষ্ণ ছিলেন কিন্তু রাজকার্য পরিচালনায় ছিলেন অনুপুযুক্ত। আর এ কারণেই সারা রাজ্য জুড়ে দেখা দেয় অরাজকতা। তালুকদারেরা কোম্পানীর সাথে তাদের জমিজমার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে নেন। অন্যদিকে জমিদারীর খাজনাও বাকী পড়তে থাকে। ফলে জমিদারীর বিভিন্ন অংশ নিলামে বিক্রি হওয়া শুরু হয়। এভাবে নাটোর জমিদারীতে যখন ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে তখন রাণী ভবানী আবার জমিদারী নিজের হাতে তুলে নিতে চান। কিন্তু কোম্পানী তার সে আবেদনের সাড়া দেয়নি। রাণী ভবানী অতঃপর রামকৃষ্ণের নাবালক পুত্র বিশ্ব নাথকে জমিদারীতে বসিয়ে তার অভিভাবকরূপে কাজ চালাতে থাকেন। কিন্তু ততদিনে সময় পেরিয়ে গেছে অনেক। জমিদারদের ক্ষমতা আর আগের মত ছিলনা। ফলে রাণী ভবানীর সব উদ্যমই পর্যবসিত হয় ব্যর্থতায়। আর এই ব্যর্থতা নিয়ে বার্ধক্যের চাপে নুয়ে পড়ে রাণী ভবানী পরলোক গমণ করেন ৫৮ বৎসর বয়সে ১৮০২ খৃষ্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে।

রাণী ভবানীর পর রামকৃষ্ণের দুই পুত্র বিশ্বনাথ ও শিবনাখের উপর জমিদারী পরিচালনার দায়িত্ব পড়ে। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, মহারাজ রামকৃষ্ণে সময় অধিকাংশ সম্পত্তি বিনষ্ট হলেও তখনও দেবোত্তার সম্পত্তি যথেষ্ট পরিমাণ ছিল। জ্যেষ্ঠ বিশ্বনাথ অবশিষ্ট পিতৃরাজ্য এবং শিবনাথ দেবোত্তর সম্পত্তি পেয়ে সেবাইত রাজা হন। এভাবে জ্যেষ্ঠ হতে বড় তরফ ও কনিষ্ঠ হতে ছোট তরফের সৃষ্টি হয়। নাটোর রাজবংশ এতদিন ছিল শাক্ত। রাজা বিশ্বনাথ তার দুই পত্নীসহ বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু তৃতীয় পত্নী রাণী জয়মণি শাক্তমত পরিত্যগে অস্বীকার করে মুর্শিদাবাদ যেয়ে বাস করতে থাকেন।

মহারাজ বিশ্বনাথ ১২২০ বঙ্গাব্দে পরলোকগমণ করেন। তিনি নিঃসন্তান থাকায় তার জ্যেষ্ঠ স্ত্রী কৃষ্ণমণি নওগাঁ মহকুমাব আটগ্রামের গোবিন্দ চন্দ্রকে পোষ্য নেন। তারও পুত্র সন্তান না হওয়ায় তিনি দীঘাপতিয়ার গোবিন্দ নাথকে দত্তক গ্রহণ করেন। তিনিও একজন দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। তার নাম মহারাজা জগদীন্দ্র নাথ।

জগদীন্দ্র নাথ ছিলেন নাটোর রাজবংশের গৌরব। তিনি ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। তার রচিত গীতিকাব্য 'সন্ধ্যাতারা' ও ইতিহাস গ্রন্থ 'নূর জাহান' বাংলা সাহিত্যে দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। 'নূর জাহান' বিশ্ববিদালয়ে এককলে পাঠ্য তালিকায অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি সঙ্গীত প্রিয় ও সমালোচকও ছিলেন। জগদীন্দ্র নাথ 'মানসী ও মর্মবাণী' নামক মাসিক সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। রবি ঠাকুরের সাথে তার সখ্যতা ছিল। তিনি রাজনীতিতেও অংশ গ্রহণ করেন। তারই উদ্যোগে ১৮৮৪ সালে নাটোরে প্রতিষ্ঠিত হয় মহাবাজা হাই স্কুল। ১৩০১ বঙ্গাব্দে মহারাজা জগদীন্দ্র নাথের মৃত্যু হয়। তার কন্যা ও পুত্রের নাম ছিল যথাক্রমে বিভবরী ও যোগীন্দ্রনাথ।

ছোট তরফের রাজা শিবনাথ দত্তক পুত্র আনন্দনাথ ও কন্যা আনন্দময়ীকে বেখে প্রাণত্যাগ করেন ১২২৪ বঙ্গাব্দে। রাজা আনন্দনাথ 'রায় বাহাদুর' ও সি এস আই উপাধি পান। তার চার পুত্র ছিল। এরা হলেন চন্দ্রনাথ, কুমুদনাথ, নগেন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রনাথ। দুই কন্যার নাম স্বর্ণময়ী ও মুক্তালতা। ১৮৬৬ সালে আনন্দ নাথ মারা যান। তার জ্যেষ্ঠ পুত্র চন্দ্রনাথ ভারত সরকারেব অধীনে বৈদেশিক দফতরে যোগ দেন। তিনি 'রাজা বাহাদুর' ও কে সি আই খেতাবে ভূষিত হন। ১২৮২ খৃষ্টাব্দে তার মৃত্যু হয। তার স্ত্রী রাণী বাসন্তীকুমারী দেবী দানশীলা মহিলা ছিলেন। রাজা চন্দ্রনাথের পর তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রায় বাহাদুর যোগেন্দ্রনাথ রাজা হন। তিনি নাটোরে পানি সরবরাহ কেন্দ্র, বহু পুকুর ও সংস্কৃত টোল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩০১ সালে তার মৃত্যুর পর তার পুত্র জীতেন্দ্রনাথ রাজা হন। কিন্তু তিন বৎসর পরে তার মৃত্যু হলে তার স্ত্রী হেমাঙ্গিনী দেবী জমিদারীর ভার নেন এবং স্বামীর স্মৃতি রক্ষার্ধে নাটোরের নারদ নদীর উপর একটি ব্রীজ নির্মাণ ছাড়াও বহু দাতব্য প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন।

দীঘাপতিয়া রাজবংশ :

নাটোর রাজবংশের কাহিনী লিখতে গিয়ে যে দেওয়ান দয়ারামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তিনিই দীঘাপতিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। দয়ারাম লেখাপড়া বিশেষ না জানলেও তিনি যেমন ছিলেন বুদ্ধিমান তেমনি ছিলেন লোক চরিত্র বোঝার অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী। তার এই ক্ষমতা ছিল বলেই তিনি সামান্য একজন কর্মচারী থেকে দেওয়ান পদে উন্নীত হন। মুর্শিদাবাদ অবস্থান কালে নবাব বিদ্রোহী রাজা সীতারামকে শায়েস্তা করার জন্যে যে জমিদার সেনা বাহিনী প্রেরণ করেন তার অধিনায়ক ছিলেন এই দয়ারাম। দয়ারাম সীতারামকে কেবল পরাজিত করেননি তাকে বন্দীও করেন। নবাব এতে সন্তষ্ট হয়ে তাকে 'রায়রয়ান।' উপাধি দেন এবং কতগুলো জমিদারীও প্রদান করেন।

রাজা দয়ারাম যে সব এলাকার জমিদারী লাভ করেন সেগুলো হলো পরগণা ভাতুড়িয়ার অন্তর্গত তরফ নন্দকুজা, জেলা বগুড়া ও ময়মনসিংহের অগ্রগত তরফ ডুমরাই, জেলা যশোহরের তরফ মাউল কালনা এবং পাবনার তরফ সিলিমপুর ও রাজা সীতারামের অধিকারভুক্ত কয়েকটি তরফ। এর সাথে তিনি আরো কয়েকটি জমিদারী ক্রয় করেন। এতে দয়ারাম বিপুল ধন সম্পত্তির অধিকারী হলেও নাটোর রাজাদের অধীনে দেওয়ানদের পদ তিনি ছাড়েন নি। নাটোরের জমিদারদের উপর তার ছিল অগাধ প্রভাব। দয়ারামের পরামর্শ ছাড়া নাটোর জমিদারীর কোন কাজই সম্পন্ন হতোনা।

নিজের জমিদারীতে দয়ারাম জনসাধারণের উপকারের জন্যে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পুকুর

প্রতিষ্ঠা করেন। তার মৃত্যুর পর পুত্র জগন্নাথ রায় অল্পদিনের জন্যে রাজ্য ভোগ করেন। তিনি পরলোকগমণ করলে দীর্ঘাপতিয়ার জমিদার পদে অধিষ্ঠিত হন তার পুত্র প্রাণনাথ। দান-ধ্যানে তিনি ছিলেন মুক্ত হস্ত। তার কোন পুত্র সন্তান না থাকায় প্রসন্ননাথকে তিনি দত্তক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি সাবালক হওয়ার আগেই প্রাণনাথের মৃত্যু হয়। প্রসন্ননাথ প্রথম দিকে কুপথে চললেও ক্রমে তার চৈতন্যোদয় ঘটে এবং রাজকাজে মন দেন। বহু সৎকাজের সাথে রাজা প্রসন্ননাথ জড়িত ছিলেন। তারই উদ্যোগে দীঘাপতিয়া হতে রাজশাহী এবং বগুড়া যাওয়ার রাজপথ নির্মিত হয়। দীঘাপতিয়া হাই স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয়ে তিনি প্রচুর টাকা সাহায্য করেন। ১৮৫৫ সালে তিন রাজা বাহাদূর' উপাধি লাভ করেন। প্রসন্ননাথ একজন উঁচুদরের শিকারীও ছিলেন। তার কোন পুত্র সন্তান না হওয়ায় তিনি প্রমথনাথকে দত্তক হিসেবে গ্রহণ করেন।

১৮৬১ সালে রাজা প্রসন্ননাথের মৃত্যু হলে প্রমথনাথ নাবালক থাকায় দীঘাপতিয়ার সব সম্পত্তি যায় কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীনে। কলিকাতায় থেকে রাজা প্রমথনাথ লেখাপড়া শেখেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে তিনি তার জমিদারী স্বহস্তে গ্রহণ করেন। ১৮৭৯ সালে প্রমথনাথ 'রাজা বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি রাজশাহী, হুগলী, যশোহর ও নদীয়া জেলার অনেকগুলো জমিদারী খরিদ করেন। রাজা প্রমথনাথ দেশী শিল্পের যথেষ্ট কদর করতেন এবং এ কারণে দেশীয় শিল্পের পুনরুদ্ধারের জন্যে বিদেশ থেকে বহু শিল্পী নিয়ে আসেন।

প্রমদানাথ, বসন্তকুমার, শরৎকুমার ও হেমন্তকুমার এই চারি পুত্র ও এক কন্যা রেখে রাজা প্রমথনাথ ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। রাজা প্রমদানাথ দীঘাপতিয়ার জমিদারীভুক্ত সব সম্পত্তি প্রমদানথকে এবং খরিদ করা জমিদারী অপর তিন পুত্রকে সমান ভাগে ভাগ করে দিয়ে যান। রাজা প্রমদানাথের চার পুত্ররা সবাই ছিলেন শিক্ষিত। কুমার শরৎকুমার প্রত্নতত্ত্বে ছিলেন অসাধারণ উৎসাহী। তারই উদ্যোগে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি ও বরেন্দ্র গবেষণা যাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজা প্রমদানাথ ছাড়া অন্য তিনভাই দীঘাপতিয়ার অদূরে দয়ারামপুরে নতুনরাজবাড়ী নির্মাণ করে বাস করতেন।

রাজা প্রমথনাথ রায় সম্পর্কে আরো কিছু না লিখলে অনেক কথাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। প্রমথনাথ রায় রাজশাহী পুরাতন হাসপাতালের জন্যে হাজার টাকা ব্যয়ে একটি সুন্দর ভবন নির্মাণ করে দেন। নাটোর রাজশাহী সড়ক সংস্কারের জন্যে তিনি প্রচুর টাকা সাহায্য করেন। ১৮৬৮ সালে তিনি রাজশাহীতে পি.এন গার্লস হাই স্কুল এবং বগুড়া জেলার অন্তর্গত নওখিলায় (চন্দনবাইশা) তিনি একটি দাতব্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তারই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় রাজশাহী এসোসিয়েশন। রাজশাহী কলেজকে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করার পশ্চাতেও তার দান ছিল। রাজা প্রমথনাথ বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য ছিলেন।

রাজা প্রমদা নাথ রায় জমিদারী হাতে নেয়ার পর জনসেবা মূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি রাজশাহী হাসপাতালের জন্য ২৫,০০০ টাকা, নাটোর দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য ৭,০০০ টাকা, দীঘাপতিয়া পি,এন হাই স্কুলের ভবন নির্মাণের জন্য ১৫,০০০ টাকা ও লেডী ডাফরিন ফান্ডে ২০,০০০ টাকা দান করেন। এছাড়াও দীঘাপতিয়া হাই স্কুল পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ভারই তিনি গ্রহণ করেন। মহারাণী ভিটোরিয়ার হীরক জুবিলীর স্মরণে রাজশাহীতে সেরিকালচার স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি ২৪ বিঘা জমি এবং রাজশাহী কলেজের জন্যে ২৫ হাজার টাকা মূল্যের মূল্যবান সম্পত্তি দান করেন। বগুড়ার নওখিলায় (চন্দ্রনবাইশা) তার উদোগে একটি হাই স্কুল স্থাপিত হয়। অভাবীদের সাহায্যের জন্যে তিনি সব সময়ই ছিলেন উদার হস্ত। তিনি অনেক দুঃস্থ প্রজার খাজনাও মাফ করে দেন। ১৯৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি 'রাজা' উপাধি পান।

রাজা প্রমদা নাথের আরো অনেক কীতি রয়েছে। তার পিতামহী রাণী ভবসুন্দরীর নামে রাজশাহী হাসপাতালে তিনি মেয়েদের একটি ওয়ার্ড নির্মাণ করে দেন। পিতার নামে তিনি

রাজশাহী কলেজে একটি ছাত্রাবাস নির্মাণ করা ছাড়াও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে কয়েকটি বৃত্তি চালু করেন। রাজা প্রমদা নাথ পূর্ব বঙ্গ-আসাম আইন সভার রাজন্য বর্গের প্রতিনিধি নির্বাচিত হন এবং ১৯৯১ সালে দিল্লীর দরবারে তিনি অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

কুমার বসন্ত কুমার রায়ও খ্যতনামা ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সমগ্র উপমহাদেশ পর্যটন করেন। রাজশাহী কলেজের ছাত্রাবাস নির্মাণের জন্যে তিনি প্রচুর অর্থ দান করেছেন। কুমার শরৎ কুমার রায়ের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। কনিষ্ঠ ভ্রাতা হেমেন্দ্রে কুমার রায় ছিলেন একজন চিত্র শিল্পী। তিনি ইউরোপের বহু দেশ পরিদর্শন করেছেন। রাজশাহী টাউন হলটি তার দানেই নির্মিত হয়।

রাজা প্রমদানাথ রায়ের ছয় পুত্র— প্রতিভানথ, বিজনেন্দ্রননাথ, শৈলেন্দ্রনাথ, চঞ্চল কুমার, তুষাব কুমার ও শুভেন্দু এবং দুই কন্যা— উষা প্রভা ও নীলিমা প্রভা। দীঘাপতিয়ার রাজবাড়ী এখন উত্তরা গণভবন। রাজশাহী জেলাব বহু প্রতিষ্ঠানেব সাথে নাটোর ও দীঘাপতিয়ার স্মৃতি বিজড়িত রয়েছে।

দুবলহাটি রাজবংশ :

নওগাঁ মহকুমার অন্তর্গত দূবলহাটি রাজবংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি কাহিনী চালু আছে। এই কাহিনীতে বলা হয় যে, মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত যজ্ঞেশ্বরপুর গ্রামে জগৎরাম নামে এক শৌন্ডিক জাতীয় ধনী বণিকের বাস ছিল। একবার পণ্য বোঝাই নৌকা সহ জল পথে তিনি বর্তমান দুবলহাটি গ্রামের কাছে উপস্থিত হন। স্থানটি তার ভাল লেগে যাওয়ায় তিনি সেখানে রাম রাজেশ্বরী দেবীর মন্দির স্থাপন করে তার সেবাইত রূপে বাস করতে থাকেন। পরে আশে পাশের কয়েকটি গ্রাম তার অধিকার ভুক্ত হয়। জগৎরামের পরবর্তী কয়েক পুরুষের নাম জানা যায়নি। নবাবী আমলে এই বংশের তুলশীরাম প্রমথ 'রায় চৌধুরী' উপাধি লাভ করেন। তুলশীরামের পর 'রায় চৌধুরী' উপাধিধারী দুই ভ্রাতা যুক্তারাম ও কৃষ্ণরামের নাম পাওয়া যায়। এই বংশের রাজা হরনাথকে বৃটিশ সবকার প্রথম 'রাজা' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। রাজা হরনাথ বহু পূণ্য কাজ করে গেছেন। তিনি রাজশাহীর প্রাচীনতম পত্রিকা হিন্দু রঞ্জিকা প্রকাশের জন্যে একটি মুদ্রাযন্ত্র দান করেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে তিনি জমিদারীর ভার নেন।

নবাবী আমলে দূবলহাটি জমিদার এক রকম নিষ্কর জমিদারী ভোগ করতেন। এসম্পর্কে বলা হয় যে, নবাব একবার দুবলহাটির জমিদারের নিকট রাজস্ব তলব করলে তিনি বলেছিলেন, তার রাজ্য অতিক্ষুদ্র এবং জঙ্গলময়, প্রজার কর অতি কম। সুতরাং নবাবের রাজস্ব দিতে গেলে জমিদারীর কিছুই থাকবে না। নবাব এ কথায় বিশ্বাস করে তার কর প্রতি বছর ২২ কাহন কই মাছ নির্দিষ্ট করে দেন এবং বংশের চিহ্ন স্বরূপ তুরী ও ডঙ্কা ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করেন। ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দেবসেতর সময় কৃষ্ণনাথ রায় চৌধুরীর সাথে জমিদারী বন্দোবস্ত হয় এবং লর্ড কর্ণ ওয়ালিস বার্ষিক ১৪৪৯৫।/০ জমা বর্ষ করে কৃষ্ণরামের নিকট হতে কবুলিয়ত করেন। রাজা হরনাথ পার্শ্ববর্তী কয়েকটি জেলায় নতুন জমিদারী ক্রয় করে তার জমিদারীর আয় বৃদ্ধি করেন। তার মৃত্যুকাল ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ। তার দুই পুত্র— কুমার ধনদানাথ রায় চৌধুরী ও কুমার ক্রীঙ্কার নাথ রায় চৌধুরী।

কাজী মিছের তার 'রাজশাহীর ইতিহাস' গ্রন্থে 'রাজশাহীর জমিদারী বন্দোবস্তু' অধ্যায়ে লিখেছেন, দুবলহাটির জমিদারেরা প্রকারান্তরে মুসলমান বিরোধী ছিলেন এবং খাজনার রেট ও পত্তনী জমির অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি করে প্রজাদের উপর উৎপীড়ন চালাতেন। এ কারণেই হাসাই গাড়ীর মৌলবী আস্তান মোল্লার নেতৃত্বে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে প্রায় ৫০ হাজার প্রজা বিদ্রোহী হয়ে ৭ বৎসর যাবৎ খাজনা বন্ধ করে দেন। পরে হাতীর পিঠে চড়ে রাজা হরনাথের দুই স্ত্রী প্রজাদের কাছে ক্ষমা চান এবং সেটেলমেন্ট অফিসারের মাধ্যমে প্রজাদের সাথে আপোষ নিষ্পত্তি হয়।

বলিহার রাজ বংশ :

প্রাচীন গ্রন্থে বলিহার কুড়মইল নামে খ্যাত। কুড়মইলের একজন প্রধান কুলীন বলে গণ্য হতেন অনন্ত। অনন্তের প্রপৌত্র গোপাল। গোপালের পুত্র কৃষ্ণদেব, প্রাণ কৃষ্ণ ও রামরাম। এই প্রাণ কৃষ্ণ থেকেই বলিহার রাজ বংশের উৎপত্তি।

জানা গেছে, রংপুরের ভিতর বন্দ ও বাহির বন্দ পরগণার রাণী সত্যবতীব ভগ্নির সাথে কৃষ্ণদেবের বিবাহ হয়। এই সূত্রে প্রাণ কৃষ্ণ ও রামরাম রাণী সত্যবতীর জমিদারীতে প্রবেশ করে তার প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। পরে দুই ভাই নানা কৌশল অবলম্বন করে ভিতর বন্দ পরগনা অধিকার করে তা নিজেরা ভাগাভাগি করে নেন। প্রাণকৃষ্ণের প্রপৌত্র রাজেন্দ্র রায় নাটোরের রাজ রামকৃষ্ণের কন্যাকে বিবাহ করে প্রচুর ভুসম্পত্তি লাভ করেন। রাজেন্দ্র রায়েব পৌত্র বলিহারের প্রসিদ্ধ রাজা কৃষ্ণেন্দ্র বাহাদুর। তিনি সুকবি ও সুলেখক ছিলেন। শোনা যায় যৌবন কালে তিনি নানা পাপ কাজ করে পরিণত বয়সে অনুতপ্ত হন। তার 'সবভাব নীতি' নামক গ্রন্থে তার নিজের জীবনের কথাই বলে গেছেন। মাহদেবপুর ও নওগাঁর মধ্যবর্তী স্থানে বলিহার জমিদার বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ আজো দেখতে পাওয়া যায়।

রাজশাহী জেলার অন্যান্য হিন্দু জমিদার বশের মধ্যে তালন্দের মৈত্রেয় ও কাশিমপুরেব লাহিড়ী বংশের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। মহাদেবপুর ও কানসাটের জমিদাররাও এতঅঞ্চলে বিখ্যত ছিলেন। এদের পূর্ব পুরুষেরা মোগল সম্রাটদের অনুগ্রহে জমিদারী লাভ করেন বলে জানা গেছে। রাজশাহী জেলার আরো কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু জমিদার ছিল। নাটোরের শুকুল, জোয়ারীর চৌধুরী ও চৌগ্রামের ভাদুড়ী প্রভৃতি জমিদার বংশের নামোল্লেখ করা যায়।

এই জেলায় মুসলমান জমিদারদের সংখ্যা খুব একটা বেশী দেখা যায় না। যে সব মুসলমান এককালে পরগণার অধিপতি ছিলেন নানা কারণে তাদের পরগণা তাদের হাত থেকে বের হয়ে গেছে। এটা আমরা আগে উল্লেখ করেছি। পরে ইংরেজ আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তেব সময় ছোট-বড় সব জমিদারই তুলে দেয়া হয় হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের হাতে। এ অবস্থাতেও যে সব মুসলমান ছোট ছোট তালুক অথবা জোতদারী খরিদ করে অত্যন্ত শান-শওকতের সাথে দিন কাটিয়ে গেছেন তাদের মধ্যে নাটোরের চৌধুরী ও কাজী পরিবার, তারোটিয়ার শেখ পরিবাব, মনাকসষার চৌধুরী পরিবার, ফারসীপাড়ার চৌধুরী পরিবার, পোরশার শাহ পরিবার ও রামরামার দেওয়ান পরিবারের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এ সব পরিবারেব সন্তানেবা শিক্ষিত ছিলেন। পাকিস্তান আমলে এদের কেউ কেউ সরকারী উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কেউ কেউ 'আইন' সভার সদস্যও হন। নদী মরে গেলেও তার রেখা থাকে এই প্রবাদ বাক্যের মতই এসব সম্ভান্ত পরিবারেব বংশধরেরা আজো বেঁচে আছেন।

তথ্যপঞ্জী :

০১. বিশ্বকোষ (১৩১২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত)

০২. রাজশাহীর ইতিহাস

০৩. নাটোবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

০৪. দীঘাপতিয়ার রাজ পরিবার

০৫. রাজশাহী গেজেটিয়ার

০৬. এ. কে. এম অলিউজ্জামান খান প্রণীত নাটোরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

০৭. বাংলায় রেল ভ্রমণ (১৯৪২ সালে প্রকাশিত)

রাজশাহীর আউলিয়া দরবেশ ও সাধু-সন্ন্যাসী

শামসুল হক কোরায়শী

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স:) এর জন্মভূমি ও কর্মক্ষেত্র আরব দেশই ইসলামের প্রাণকেন্দ্র। এই আরব ভুমি হতেই ইসলাম ধর্মের মহান আদর্শ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। কালক্রমে বাংলাদেশেও তার প্রচার ঘটে।

এ দেশের উত্তরাঞ্চলে, বিশেষ করে রাজশাহী জেলায় ও ইসলাম প্রচারের জন্য বহু আলে ও দরবেশদের শুভাগমন ঘটেছিল। তারা শহর-গ্রাম-লোকালয়ে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও সংস্কারের জন্য নিরলসভাবে কাজ ক'রে গেছেন। এজেলায় ইসলামী জীবন-যাপনের পরিবেশ সৃষ্টি এবং সামগ্রিকভাবে হিন্দু-মুসলমান জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষের কল্যাণ সাধনে এই সমস্ত পীর-আওলীয়া-দরবেশদের অমর অবদান চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বহিরাগত দরবেশ অলদির আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে ধর্মীয় প্রচার কেন্দ্র মসজিদ-হুজরাখানা-আস্তানা ইত্যাদি স্থাপন ছাড়াও জেলার বিভিন্ন স্থানে মক্তব-মাদ্রাসা এবং ইসলামের আদর্শে উদ্বুদ্ধ পীর-আউলিয়া-দরবেশ-আলেম ও বুজর্গ ব্যক্তিগণ রাজশাহীতে ধর্মপ্রচার ছাড়াও বিভিন্ন সময়ের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবহের উত্থান-পতন, সামাজিক বিবর্তন, সভ্যতা সংস্কৃতির প্রচার ও পৃষ্ঠপোষকতার সাথে জড়িত ছিলেন। ধর্মপ্রাণ এই দরবেশ ব্যক্তিগণ অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। বেশীর ভাগ সময়ই লোকালয়ের কলহ-কোলাহল হ'তে সযত্নে দূরে থেকে নির্জনে কোন মসজিদ বা হুজরাখানায় আল্লাহ তায়ালার এবাদতে কালাতিপাত কবতেন। তাঁরা ছিলেন মনে প্রাণে আত্মপ্রচার বিমুখ। সে কারণে এবং অবাঙ্গালী দরবেশদের আরবী-ফারসী ভাষায় রচিত রোজনামচা বা লিখিত দলিলপত্র সংরক্ষণের লোকের অভাবে এবং বাংলদেশের আবহাওয়ার কাবণে তাদের সম্পর্কে লিখিবার উপকরণ ও প্রমাণ তথ্য বেশীর ভাগই বিনষ্ট হয়েছে।

হজরত শাহ মুখদুম রুপোশ (র:) :

প্রাচীনকালে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে ইসলাম প্রচারের নিমিত্ত যে সমস্ত আউলিয়া ব্যক্তি আগমন করেন তন্মধ্যে রাজশাহী রামপুর বুয়ালিয়াতে আগমনকারী তাপস হযরত শাহ মখদুম রুপোশ (র:) এর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি সাধরণতঃ হযতর শাহ মখদুম (র:) নামেই পরিচিত। তাঁর প্রকৃত নাম কি ছিল তা সঠিকভাবে বলা যায়না। তবে মখদুম অর্থে জ্ঞানী বা ধর্মীয় নেতাকে বুঝায়। রূপোশ শব্দটি ফারসী— এর অর্থ হচ্ছে মুখাচ্ছাদনকারী। একটি ফারসী ভাষায় বর্ণিত বিবরণীতে তাঁর নাম হযরত শাহ্ মখদুম রুপোশ নামে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার কোন কোন লেখকের মতে তাঁর প্রকৃত নাম হযরত শাহ্ মখদুম আবদুল কুদ্দুস রুপোশ (ব:)। প্রখ্যাত গবেষক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ জনাব মৌলভী শামসুদ্দিন আহমদ তাঁর 'INSCRIPTIONS OF BENGAL' গ্রন্থে তাঁকে 'শাহ দরবিশ' নামে অভিহিত করেছেন। হযরত শাহ্ মখদুম (র:) সাহেবের সমাধি ভবনের প্রবেশ পথে মীর্জা অলী কুলী বেগ কর্তৃক স্থাপিত শিলালিপিতেও 'শাহ্ দরবিশ' নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

মখদুম অর্থে জ্ঞানী বা ধর্মীয় নেতা এবং এ কারণেই হয়তো মহাজ্ঞানী অলী-দরবেশদের

নামের পূর্বে এ ধরনের সম্মানসূচক উপাধি ব্যবহার করা হ'য়ে থাকে। অলী-দরবেশগণ নিঃসন্দেহে অশেষ জ্ঞান এবং পাণ্ডিত্যের অধিকারী। তাছাড়া তাঁরা ধর্মীয় নেতা তো বটেই। এসব কারণেই হয়তো বাংলাদেশে এমনকি উত্তরাঞ্চলে একাধিক মখ্দুম নামধারী আউলিয়া এবং তাঁদের মাযারের পরিচয় পাওয়া যায়। পাবনা জেলার শাহজাদপুরে শাহ্ মখদুম নামীয় অপর একজন আউলিয়ারও সমাধি আছে।

কিন্তু ইতিহাস, সংশ্লিষ্ট দলিলপত্র দ্বারা প্রমাণিত হয় যে— রাজশাহীর হযরত শাহ্ মখমদুম (র:) ভিন্ন ব্যক্তি।

রাজশাহীতে তাঁর আগমনকাল-সন-তারিখ সম্পর্কে মত-পার্থক্য র'য়েছে। অধিকাংশ লেখকের মতে ১২৮৭ খ্রিষ্টাব্দে (৬৮৫ হি:) তিনি বাংলাদেশে আগমন করেন। নোয়াখালী জেলার শ্যামপুর দায়রা শরীফে রক্ষিত বিবরণ অনুযায়ী রাজশাহীর রামপুর বুয়ালিয়াতে আগমনকারী এবং শ্যামপুর দায়রাশরীফে অবস্থানকারী শাহ্ মখদুম (র:) যদি একই ব্যক্তি হন তবে তিনি দুই বৎসরকাল শ্যামপুরে তদীয় সহোদর ভ্রাতা দরবেশ হযরত সৈয়দ আহমদ তন্মুরী (র:) এবং অন্যান্য আউলিয়াদের সাথে সেখানে অতিবাহিত করার পর রাজশাহী জেলার বাঘাতে আগমন করেন এবং সুদীর্ঘ তেইশ বৎসর বাঘা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ইসলাম প্রচার এবং আল্লাহ্তায়ালার এবাদতে কাটিয়ে দেন। এবং তাঁর নামেই বাঘার নাম মখদুম নগর রাখা হয়। তিনি ১৩২৬ খ্রীষ্টাব্দে (৭২৬ হি:) রাজশাহীর মহাকালগড় জয় করেন। ইসলাম প্রচার ও জাতি ধর্ম নির্বিশেষে অসহায় মানুষের খেদমত করার পর রামপুর বুয়ালিয়ায় তিনি ৭৩৯ হিজরী (১৩৩১ খ্রী:) পরলোকগমন করেন।

রাজশাহীর রামপুর বুয়ালিয়াতে তাঁর আগমন সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনীটি এই যে অতীতে রাজশাহী শহর এলাকা "মহাকাল গড়" নামে একটি রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল। এই রাজের জনৈক হিন্দু রাজা অত্যন্ত মুসলমান বিদ্বেষী ছিলেন। তিনি দরিদ্র প্রজাদের উপর অহেতুক নির্যাতন করতেন।উক্ত রাজা অংশুদেও চান্দভণ্ডী গুর্জভোজ এবং তদীয় ভ্রাতা অংশুদেও খেঞ্জুর চন্দ্রখগড় বর্মগুজ্জ ভোজ দেবতার তুষ্টির জন্য নরবলি দিতেন। জনৈক নাপিতের একমাত্র সন্তানকে এই তান্ত্রিক রাজা বলি দেবার উদ্যোগ নিলে নাপিত দম্পতি হযরত শাহ্ মখদুম (র:) সাহেবের সাহায্য প্রার্থনা করে। রাজশাহীতে হযরত শাহ্ মখদুম (র:) সাহেবের আগমনের বেশ কয়েক বৎসর পূর্বে হযরত তুরফান শাহ্ (র:) তাঁর কিছু সংখ্যক অনুচরসহ ইসলামী প্রচারের নিমিত্ত এই এলাকায় আগমন করেছিলেন। মহাকাল গড়ের এই তান্ত্রিক রাজার আদেশেই তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করা হ'য়েছিল। সম্ভবত এসব কারণই হযরত শাহ মখদুম (র:) সাহেবকে মহাকাল গড়ের রাজার বিরুদ্ধে তৈরী ভাবাপন্ন ক'রে তুলেছিল।

বর্তমান বুয়ালিয়া থানার সন্নিকটে ঘোড়ামারা নামক স্থানটিতে হযরত শাহ মখদুম (র:) সাহেবের সাহসী অনুচর মুজাহিদদের সাথে রাজার সেনাবাহিনীর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হ'য়েছিল। অশ্বারোহী সৈনিকদের অনেক ঘোড়া এই যুদ্ধে মারা গিয়েছিল বলেই স্থানটির নাম ঘোড়ামারা। কোন কোন গ্রন্থাকার এই যুদ্ধবিগ্রহের বছরটিকে ৭২৭ হিজরী ইংরেজী ১৩২৬ খ্রীষ্টাব্দ বলে উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ এই যুদ্ধ জয়ের বছরটিকে ৭২৬ হিজরী ইংরেজী ১৩১৯ খ্রীষ্টাব্দ বলেও মত পোষণ করেন। যুদ্ধে রাজা পরাজিতও নিহত হয় এবং হাকাল গড় রাজ্য হযরত শাহ্ মখদুম (র:) কর্তৃক বিজিত হয়।

নোয়াখালী জেলার শ্যামপুর দায়রা শরীফে রক্ষিত বিবরণী যাই-ই হোক না কেন কেউ কেউ মত পোষণ করেন যে— শ্যামপুর দায়রাতে অবস্থানকারী হযরত শাহ্ মখদুম (র:)

সাহেবের সাথে রাজশাহী জেলার বাঘা বা মখদুম নগরের কোন যোগাযোগ ছিলনা। মখদুম নগরে তিনি আদৌ অবস্থান করেন নাই। তিনি রাজশাহীর রামপুর বুয়ালিয়াতে (বর্তমান 'দরগা' পাড়ায়) নির্জনে এবাদত বন্দেগী, ইসলাম ধর্মের প্রচার এবং মানবতার সেবা ক'রেই জীবন অতিবাহিত করেছিলেন।

যুগ যুগ ধরে জাতিধর্ম নির্বিশেষে রোগ-শোকে পীড়িত, বিপদগ্রস্থ্ নরনারীগণ পরম আস্থা এবং নিশ্চিত নির্ভরতার সাথে বিপদমুক্তির আশায় তাঁর মাযারে দোওয়া কামনা করে থাকে। মাযারে তাঁর ব্যবহৃত পবিত্র পাগড়ী, ছড়ি, খড়ম ও কোরান শরীফ রক্ষিত আছে।

হযরত শাহ্ মখদুম (র:) অতি সম্ভ্রান্ত এবং পবিত্র বংশের সন্তান ছিলেন। তিনি গওছল আযম বড়পীর হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (র:) সাহেবের বংশধর। গওছল আযম কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হয়েই তিনি রাজশাহীর রামপুর বুয়ালিয়াতে ইসলাম প্রচারের জন্য আগমন করেছিলেন। কোন কোন লেখকের মতে তিনি ১৪৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ইয়ামনে জন্ম গ্রহণ করেন এবং বিখ্যাত নিশীপুরে শিক্ষা লাভ করেন।

পারস্য সম্রাট শাহ আব্বাসের সৈনাধ্যক্ষ আলীকুলীবেগ কর্তৃক হযরত শাহ মখদুম (র:) সাহেবের সমাধিভবনের প্রবেশ পথে অশেষ মর্যাদার চিহ্ন স্বরূপ তথ্যবহুল শিলা লিপি স্থাপন একটি স্মরণীয় ঘটনা। শিলা লিপিটি ফারসী ভাষায় লিখিত যার বঙ্গানুবাদ হচ্ছে :

"অতি উচ্চ মর্যাদা ও গুণ সম্পন্ন মহানুভব সুলতানের শ্রেষ্ঠ সুলতান, শ্রেষ্ঠ পয়গম্বরের বংশধর, পুরুষানুক্রমে সুলতান ও বাদশাহ ইউসুফ আলী খাজা সুরা সুবিচার সুদক্ষ আব্বাসীয় শাসনামলের হোসায়েনীর শ্রেষ্ঠতম দাস, ইরানের সেনাধ্যক্ষ বারো ইমামের প্রচারক অলৌকিক ক্ষমতা যুক্ত হযরত রসুল করিমের (সা:) পরেই লোকশ্রেষ্ঠ আমিরুল মোমেনীন ধর্মভীরু গণের ইমাম আলী ইবনে আবু তালিবের আস্তানার ফুকুর ভাগ্যবান ও সাহায্যপ্রাপ্ত আদর্শ স্থানীয় আলী কুলী বেগ কর্তৃক আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য লাভকারী আমার সৈয়দ ক্ষমতাশালী মরহুম মগফুর শাহ্ দরবেশের পবিত্র মাযারের উপর ১০৪৫ হিজরীতে এই গুম্বজ নির্মাণের তওফিক ঘটলো। পৃথিবীর কিছুরই অস্তিত্ব বাকী থাকবেনা ব'লে আমাদের স্মৃতি রক্ষার্থে এই নকশা অংকিত হ'লো। ১০৪৫ হিজরী (১৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দ)"।

দরগাপাড়ায় হযরত শাহ মখদুম (র:) সাহেবের সমাধিভবন, হুজরাখানা, মসজিদ ইত্যাদির স্থাপত্য কৌশলই এর প্রাচীনত্বের পরিচয়বহ। হজরাখানাটির দৈর্ঘ্য ১৪ ফুট, প্রস্থ্ ১৩ ফুট এবং উচ্চতা ১১ ফুট। সমাধিভবনের পার্শ্বে প্রাচীন রীতিতে গঠিত ৪০ ফুট দীর্ঘ এবং ১৬ ফুট প্রস্থ্ একটি মসজিদ ছিল। ১৯৭১ সালে মুসল্লীদের স্থানাভাব দূর করার নিমিত্ত পুরাতন মসজিদটির সংস্কার ক'রে একটি বৃহৎ মসজিদ তৈরী করা হয়েছে। সমাধিভবনের মধ্যে হযতর শাহ মখদুম (র:) এবং তাঁর নিকট আত্মীয় হযরত শাহ নূর (র:) সাহেবের পবিত্র মাযার আছে।

হযরত শাহ নূর (র:)

হযরত শাহ নূর (র:) ছিলেন হযরত শাহ মখদুম (র:) সাহেবের নিকট আত্মীয়। তাঁর জীবদ্দশায় দেওয়া নির্দেশ মোতাবেক তাঁর স্নেহ ভাজন হযরত শাহ্ নূর (র:) কে মাযারের পশ্চিম পার্শ্বে সমাহিত করা হয়েছে।

হযরত শাহ নূর (র:) একজন মহাপণ্ডিত এবং কামেল দরবেশ ছিলেন। তিনি ছিলেন গওছল আযম হযরত বড় পীর (র:) সাহেবের পবিত্র মাজারের খাদেম এবং হযরত শাহ্ মখদুম (র:) সাহেবের বংশের একজন সুলতান। কথিত আছে একদা তিনি গওছল আযম (র:) কর্তৃক

স্বপ্নাদিষ্ট হন বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার রামপুর বুয়ালিয়াতে সমাহিত তাঁর পূর্বপুরুষ দরবেশ হযরত শাহ্ মখদুম (র:) সাহেবের মাযারে উপস্থিত হয়ে তথায় অবস্থান ও ইসলাম প্রচারে মনোনিবেশের জন্য। হযরত শাহ্ মখদুম (র:) সাহেবও তাঁকে স্বপ্নে রাজশাহীর রামপুর বুয়ালিয়াতে আগমনের জন্য আহ্বান জানান।

হজরত শাহ মখদুম (র:) সাহেবের ওফাতের প্রায় আড়াইশ বছর পরে তিনি রাজশাহী আগমন করেন— এ ব্যাপারে অধিকাংশ লেখক একমত পোষণ করেন। তিনি ৯৭৯ হিজরী ১০ই মহরম এন্তেকাল করেন— কোন কোন গ্রন্থে তা উল্লেখ করা হয়েছে। হজরত শাহ মখদুম (র:) সাহেবের ন্যায় হযরত শাহ নূর (র:) সাহেবও রাজশাহীতে আগমনের পূর্বে বাঘায় উপস্থিত হয়েছিলেন।

তাঁর বাঘা উপস্থিতির সময় প্রখ্যাত অলী এবং বুজর্গ মখদুম আব্দুল হামিদ্ দানিশ মান্দ (র:) সাহেব জীবিত ছিলেন এবং তিনি হজরত শাহ নূর (র:) সাহেবকে অত্যন্ত সমাদরের সাথে গ্রহণ করেছিলেন। হজরত শাহ নূর (র:) হজরত শাহ মখদুমের খেদমতগার এবং বংশধর হিসাবে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত হন। ৯৭৯ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। হজরত শাহ মখদুমের মাজারের পাশেই তার মাজার। তাঁর শেষ বংশধর হজরত শাহ মহীউদ্দিন ১০৭৬ হিজরী পর্যন্ত দরগা পাড়ায় জীবিত ছিলেন।

হজরত মখদুম সাহেবের মাজারের নামে লাখেরাজ সম্পত্তি প্রদানেব ব্যাপারে বাদশা হুমায়ুনের সাথে তাঁর যোগাযোগের ফলেই সম্ভব হয়েছিল। তাঁর সাথে হজরত বড় পীর (র:) সাহেবের মাজারে রাজ্যচ্যুত বাদশার পরিচয় হয়। কথিত আছে হজরত শাহ নূর (র:) সাহেবের দোওয়ার বরকতে বাদশা হৃতবাজ্য ফিরে পান। আউলিয়ার দোয়ার ফলে সাফল্য লাভ করায় তিনি ভূসম্পত্তি দান করেন।

হজরত তুরফান শাহ (র:) শহীদ

হজরত তুরফান শাহ (র:) হজরত শাহ মখদুম (র:) সাহেবের আগমনের বেশ কিছু কাল পূর্বেই ইসলাম প্রচারের জন্য মহাকাল গড় রাজ্যে এসে ছিলেন। দুঃখের বিষয় তিনি তৎকালীন মুসলিম বিদ্বেষী মহাকাল গড়ের হিন্দু রাজার নির্দেশে নির্মম ভাবে নিহত হন।

এই শোচনীয় ঘটনাটি ১২৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ৬৮৭ হিজরীতে ঘটে। অধ্যাপক আবু তালিবের মতে এই ঘটনা ঘটে ১২৭৭-১২৮৭ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে (৬৭৭ হ'তে ৬৮৭ হিজরী)। কারণ ৬৮৭ হিজরীতে এই অন্যায় হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যই হযতর শাহ্ মখদুম (র:) বাগদাদ হ'তে রামপুর বুয়ালিয়াতে আগমন করেন।

হযরত শাহ্ মখদুম (র:) সাহেবের মাযারের অদূরে রাজশাহী সরকারী কলেজ হোষ্টেলের প্রাচীর সংলগ্ন স্থানে হজরত তুরফান শাহ্ (র:) সাহেবের মাযার আছে। ৯৪১ সি.এস. খতিয়ানের ৯ নম্বর দরগাপাড়া মৌজায় (জে.এল নম্বর ২০৪) তঁর মাজার অবস্থিত।

একজন নিরাপরাধ ধর্ম প্রচারককে অন্যায় ভাবে হত্যার কৈফিয়ৎ তলবের জন্য গওছ পাক বড় পীরের নির্দেশে রামপুর বুয়ালিয়া আগমনের পর হিন্দু রাজার সথে হযরত শাহ মখদুম সাহেবের অনুচরদের ভয়াবহ যুদ্ধ হয়েছিল। আবার এ প্রসঙ্গে ভিন্ন মত হচ্ছে হযরত শাহ তুরফান শহীদ হযরত শাহ্ মখদুমের (র:) অন্যতম বিশ্বস্ত অনুচর হিসাবে মহাকাল গড়ের রাজার সাথে ঘোড়ামারার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে শহীদ হন।

হযরত তুরফান শাহ্ (র:) সাহেবের হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্যই যদি এই যুদ্ধ বিগ্রহ সংঘটিত হ'য়ে থাকে তবে অনুমান করা যায় যে রাজশাহীতে বহিরাগত অলী-দরবেশদের মধ্যে

হজরত তুরফান শাহ্ (র:) সাহেবেরই প্রথম ব্যক্তি। যিনি ইসলাম প্রচারের জন্য রাজশাহী আগমন করেছিলেন।

হজরত শাহ্ আব্বাস (র:)

হযরত শাহ্ আব্বাস (র:) হযরত শাহ্ মখদুম (র:) সাহেবের একজন অত্যন্ত স্নেহ ভাজন এবং বিশ্বস্ত অনুচর ছিলেন। সুদূর বাগদাদ হ'তেই তিনি এদেশে এসেছিলেন। কথিত আছে যে তাঁকে হযরত শাহ্ মখদুম মখদুম নগর বা বাঘার খলিফা নিযুক্ত করেছিলেন। হযরত শাহ্ আব্বাস (র:) সাহেবের কর্ম বহুল জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী লোক পরম্পরায় শোনা গেলেও তাঁর আগমন কাল, মৃত্যুর তারিখ বা অন্যান্য ঘটনার কোন সঠিক সাল উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে তিনি হযরত শাহ্ মখদুম (র:) সাহেবের সমসাময়িক ব্যক্তি তাতে সন্দেহ নাই। বাঘার বিখ্যাত দরবেশ হজরত শাহ দৌলা (র:) র পিতার নামও ছিল শাহ আব্বাস। তবে মখদুম নগরের খলিফা শাহ আব্বাস ছিলেন ভিন্ন ব্যক্তি।

হজরত শাহ সুলতান (র:)

ইনি হজরত শাহ মখদুম (র:) সাহেবের সঙ্গে রাজশাহী আগমন করেছিলেন। তাঁর নির্দেশে গোদাগাড়ী থানায় সুলতানগঞ্জে ইসলাম প্রচার কেন্দ্র গড়ে তোলেন। দরবেশের নামানুসারেই এলাকাটির নাম সুলতানগঞ্জ হয়েছে।

প্রতি বছর মাঘ মাসে গোদাগাড়ীর সুলতানগঞ্জেই আউলিয়ার মাজারের পাশে বিরাট মেলার আয়োজন হয়ে থাকে। হজরত শাহ সুলতান সাহেবের মাজার হিন্দু মুসলমান উভয় জাতির নরনারীর কাছেই অতি পবিত্র স্থান হিসেবে বিবেচিত হ'য়ে আসছে। তাঁর মাজারের সন্নিকটে আরও দু-একজন ব্যক্তির মাজার আছে কিন্তু তাঁদের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না।

হজরত করম আলী (র:)

রাজশাহী নাটোর পাকা রাস্তার পাশে বিড়ালদহ নামক স্থানে হজরত শাহ করম আলী (ব:) র মাজার অবস্থিত। সম্ভবত ১৬৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পাকা সমাধি ভবন এবং হুজরাখানা নির্মিত হয়। কেউ কেউ বলে থাকেন তিনি হজরত শাহ মখদুম (র:) র সাথে আগমন করেন। আবার কোন কোন গ্রন্থকার তাঁকে বাঘার হজরত শাহ দৌলা (র:) র সঙ্গে আগমনকারী পাঁচজন আউলিয়ার একজন হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

হযরত দিলাল শাহ্ বোখারী (র:)

ইনি হযরত শাহ মখদুম (র:) সাহেবের সাথে রাজশাহী এলাকায় আগমনকারী প্রধান চারিজন শিষ্যের অন্যতম। রাজশাহী জেলার চারঘাট থানার আলাইপুর নামক স্থানে পদ্মা নদীর তীরে তাঁর মাযার ছিল। সম্ভবতঃ পদ্মার গর্ভে তাঁর মাযার কালক্রমে বিলীন হ'য়ে গেছে। পাঠান শাসকদের সময় এই স্থানটি সমৃদ্ধিশালী নদীবন্দর এবং সামরিক ঘাঁটি ছিল।

হযরত শাহ্ মোকাররম (র:)

ইনি একজন বিখ্যাত অলী ছিলেন। বাংলাদেশে বিশেষ করে রাজশাহীতে বৈষ্ণব মতবাদের প্রচার ও প্রস্তাবে অন্যান্য ধর্মের লোকেরা অতিমত্রায় প্রভাবান্বিত হ'য়ে পড়েছিল। সেই সময়ে এই অঞ্চলে হযরত মোকাররম শাহ (র:) ইসলামকে পুনর্জীবিত করার জন্য সচেষ্ট হন। তাঁর প্রচার এবং পাণ্ডিত্যের জন্যই বৈষ্ণব প্রভাবানিব্বত মুসলমানদের মনে পুনরায় জাতি

সত্তা এবং ধর্মীয় চেতনাবোধ ফিরে আসে।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রধান শিষ্য এবং বৈষ্ণব মতবাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা নরোত্তম ঠাকুরের সাথে তাঁকে পরোক্ষভাবে ধর্মীয় আদর্শে'র লড়াইয়ে অবতীর্ণ হ'তে হয়। নরোত্তম ঠাকুরের প্রধান আখড়া খেতুর। তাঁর পৈতৃক আবাসস্থল হ'তে দুই মাইল দূরে কুমার পুরে একটি উঁচু টিলার উপর হযরত শাহ মোকাররম (র:) ইসলাম প্রচার কেন্দ্র বা আস্তানা গড়ে তোলেন। হযরত মোকাররম শাহ সাবকে কেন্দ্র ক'রে বহু জ্ঞানী-গুণী-আলেম তাঁর চারিদিকে একত্রিত হ'তে থাকে। আধ্যাত্মিক ক্ষমতায় বলীয়ান এই দরবেশ হিন্দু-মুসলমান-বৈষ্ণব সকলেরই হৃদয়-মন জয় করতে সক্ষম হন।

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে হযরত শাহ্ মখদুম (রা:) সাহেবের সমাধিভবনের প্রধান ফটকে শিলালিপি স্থাপনকারী মীর্জা আলী কুলি বেগই হচ্ছেন কুমারপুরে সমাহিত হযরত শাহ মোকাররম (র:)। তিনি বাংলাদেশে হযতর শাহ্ মুখদুম (র:) সাহেবের মাযার জেয়ারত করতে এসে তাঁর 'রুহানী ফয়েজ' লাভে সমর্থ হন। পরে বিষয়-সংসার বিবাগী আল্লার পথের ফকির হিসেবে রাজশাহীতেই থেকে যান। পার্থিব জীবনের চেয়ে আধ্যাত্মিক এবং ধর্মীয় জীবনই তাঁকে অধিক মাত্রায় আকৃষ্ট করে।

দীর্ঘদিন ধরে তিনি হযরত শাহ মখদুম (র:) সাহেবের মাযারের খেদমত এবং আল্লার এবাদতে মশগুল থকেন। পরে হযরত শাহ মখদুম (র:) সাহেব কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হ'য়ে রাজশাহী শহর হ'তে ১১/১২ মাইল দূরে কুমরপুরে ইসলাম প্রচার কেন্দ্র বা আস্তানা স্থাপন করেন।

অনুমান ইং ১৬৬২ সালে তিন কুমরপুরে এন্তেকাল করেন। তাঁর মাযার গাত্রে একটি কৃষ্ণ প্রস্তরে পবিত্র কোরান শরীফের আয়াত সূরা'আর রহমান' উৎকীর্ণ করা আছে। প্রতি বছর ফাল্গুন মাসে তাঁর মাযারে বাৎসরিক ওরশ ও ওয়াজ-নছিয়তের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

হজরত শাহ মহীউদ্দিন (র:)

গোদাগাড়ী থানার সুলতান গঞ্জে হজরত সুলতান (র:) র মাজারের অপর পাশে রাজশাহী নবাবগঞ্জ রোডের ধারে তাঁর মাজার অবস্থিত। তিনি হজরত শাহ মখদুম (র:)র বংশধরের হজরত শাহ নূর (র:)র নিকট আত্মীয় ছিলেন। তাঁর হাতের লাঠিতে কোন কিছু বেঁধে রাখায় সম্ভবত পথ চলার সময় ঝুন ঝুন শব্দ হ'ত। অজ্ঞজন সাধারণ তাঁর প্রকৃত পরিচয় না জেনে অথবা অজ্ঞ লোকদের প্রচলিত স্বভাব অনুযায়ী তাঁকে ঝুনঝুনি পীর বলে পরিচিত করার প্রয়াস পেয়েছে।

হযরত শাহ নেয়ামতুল্লাহ্ (র:)

হজরত শাহ্ নেয়ামতুল্লাহ (র:) সুদূর কাশ্মীর থেকে এদেশে আগমন করেন। তিনি অলী-এ-কাশ্মীর নামেও পরিচিত। কথিত আছে প্রথম জীবনে তিনি একজন সেনাধাক্ষ ছিলেন। তাঁর জন্মকাল সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায়না। তবে বেশ কিছু সংখ্যক গ্রন্থে মৃত্যুকাল ১৬৬৪ খ্রীঃ বলে উল্লেখ আছে। কাশ্মীরের নরওয়াল নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মীর আতাউল্লাহ্। তৎকালীন জনাকীর্ণ গৌড়ের ফিরোজবাদ শহরে শাজাহান পুত্র শাহ সুজা তাঁকে তোহাখানা নামক ঐতিহাসিক ভবনে তাঁর বসবাসের সুবন্দোবস্তু করেন। এখানে একটি বারো দূয়ারী চতুঃস্কোণ ভবনে তাঁর পবিত্র মাযার অবস্থিত। এই ঘরের বাহিরের দিক ৪৯ ফুট এবং যেখানে মাযার আছে সেই কক্ষটি ২১জত(১,২) ফুট।

শাহ শুজা তাঁর এই গুরুকে ২৯২১ একর লাখেরাজ ভূ-সম্পত্তি দান করেন। এই সম্পত্তি প্রদানের সম্পাদিত দলিলে মালদহ সাবেক কালেকটরী ২৫২ নম্বর হাল খতিয়ান ১৯২/৮ ফ্রি

মহল গরগণে দড় সড়ক ইত্যাদি উল্লেখ আছে। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে এই লাখেরাজ সম্পত্তি নিয়ে মালদহ মুন্সেফ কোর্টে একটি মামলা হয। উক্ত মামলার নম্বর ১০৯৬।

দলিলপত্রে তাঁর অধঃস্তন ১২ পুরুষের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতি বছর ভাদ্র মাসের শেষ শুক্রবার এবং ১লা মহরম মাযারে ওরস অনুষ্ঠিত হয়। মাযারে 'রক্ষিত একটি কাঠের বাকসে তাঁর জীবদ্দশায় ব্যবহৃত পাগড়ী, খের্কা, জামা, একটি লোহার হেল্‌মেট ইত্যাদি আছে।

আরবী ভাষায় লিখিত তাঁর 'ক্বাশীদা-ই-নেয়ামতুল্লাহ্' বা নেয়ামতুল্লার ভবিষ্যত বাণী এক অতি উন্নত মানের আধ্যাত্মিক জ্ঞান যা শক্তির পরিচয়বহ। কোরান শরীফে যতগুলি শব্দ আছে ততগুলি ফারসী শব্দ ব্যবহার ক'রে তিনি পবিত্র কোরানের সার্থক অনুবাদ করেছেন।

হজরত শাহ্ মাওলানা মোয়াজ্জেম দ্দৌলা দানিশমান্দ (র:)

ইনি ছিলেন অত্যন্ত উঁচু স্তরের অলী এবং সাধক। তিনি উচ্চ বংশদ্ভূত খলিফা হারুণ অর রশীদের আত্মীয় এবং বাগদাদের অধিবাসী। তাঁর বাঘায় আগমনকাল ৯২৪-২৫ হিজরী (১৬১৮ খ্রী:)। তাঁর পিতা হজরত শাহ্ আব্বাসও ছিলেন একজন উচ্চ স্তরের বুজর্গ ব্যক্তি। রাজশাহীতে তাঁর আগমন কাল নিয়ে মতভেদ আছে। তিনি হিজরী ১৩০ সালে (১৫২৪ খ্রী:) বাঘার বিখ্যাত মসজিদ নির্মাণ করেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

বাঘা এক সময় জঙ্গলাকীর্ণ এবং বন্য জীবজন্তুতে পরিপূর্ণ স্থান ছিল। বন্য জীবজন্তু বিশেষ করে প্রচুর ব্যাঘ্র এই এলাকায় বাস করতো ব'লে স্থানটি বাঘা নামেই পরিচিত। আবার প্রচলিত কাহিনী এই যে হজরত মোয়াজ্জেম দ্দৌলা দানিশমান্দ (র:) ব্যাঘ্র পৃষ্ঠে আরোহন করে এই স্থানে আগমন করেন। চলা ফেরার জন্য ব্যাঘ্রই তাঁর বাহন ছিল। এ ছাড়া তাঁর আস্তানার চতুর্দিকে অনেকগুলি অনুগত ব্যাঘ্র সদাসর্বদা পাহারা রত অবস্থায় দৃষ্টি গোচর হ'ত বলেই জায়গাটির নাম বাঘা রাখা হয়েছে।

হজরত শাহ্ মোয়াজ্জেম দ্দৌলা (র:)· তার বংশধরগণ সুদীর্ঘকাল ধরে এখানে বসবাস এবং ইসলামের খেদমত করেছেন। তিনি বাঘার তৎকালীন মুসলিম সেনাপতি মতান্তরে জায়গীরদার আল্লাহ বকশ বরখ্‌দারের সুশিক্ষিতা কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। অভাবমুক্ত হয়ে যাতে আল্লার সাথে কালাতিপাত করতে পারেন সেজন্য এ পণ্ডিত ওলীকে ভাতুড়িয়া ও লস্করপুর পরগণায় ৪২টি মৌজা মোগল বাদশা জাহাঙ্গীর মতান্তরে সাজাহান দান করেন। বর্তমান চারঘাট লালপুর থানা ও নাটোরের কিছু অংশ নিয়ে উপরোক্ত পরগণা দু'টি বিস্তৃত ছিল। ১০৩৩ হিজরীর ১৯শে শবান এই মদদ মাঘ সম্পত্তি দান করা হয়েছিল।

সম্রাট জাহাঙ্গীরকে কেন্দ্র করে এই মদদ মাঘ দান সংক্রান্ত কাহিনী হচ্ছে বিদ্রোহ দমনের জন্য সম্রাট জলপথে পূর্ব বঙ্গে যাবার পথে বজরা থামিয়ে হযরত শাহ দ্দৌলার (র:) আস্তানায় এই পীরের সাথে সাক্ষাৎপ্রার্থী হ'য়ে দোয়া কামনা করেন। দরবেশ বাদশাকে দোয়া করেন এবং জয় সুনিশ্চিত বলে আশ্বাস দেন। আশ্চর্যের বিষয় পীরের আস্তানায় অবস্থান কালেই বাদশাহর নিকট যুদ্ধ জয়ের সুসংবাদ পৌছে। সম্রাট জাহাঙ্গীর অত্যন্ত খুশী হন এবং প্রচুর সম্পত্তি মদদ মাঘ হিসাবে দান করেন।

হযরত মৌলানা মোয়াজ্জেম দ্দৌলা দানিশমান্দ (র:) সাহেব শেরেক-বেদাত এবং অনৈসলামিক কার্য-কলাপ দূর ক'রে মুসলমান সমাজকে কুসংস্কার মুক্ত করেন। বাঘার মক্তব-মাদ্রাসা স্থাপন এবং এবাদতের জন্য বাঘার ঐতিহাসিক মসজিদ নির্মাণ ক'রে জঙ্গলাকীর্ণ বাঘাকে ইসলামিক শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র এবং সভা মানুষের আবাসস্থলে পরিণত করেন।

বাঘার বিখ্যাত মাদ্রাসায় কোরান হাদীস আরবী-ফারসী-ফেকাহ ইত্যাদি বিষয়ে পাঠদান করা

হ'ত। এই মাদ্রাসা হ'তেই বিখ্যাত কারী ও কোরানের হাফেজ প্রতি বছর ডিগ্রী নিয়ে বের হ'ত। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির খ্যাতি বাংলার বাইরে ও দেশে-বিদেশে ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা বিভাগের একটি জরিপে বাঘার বিখ্যাত মক্তবের কথা উল্লেখ আছে। শিক্ষা বিভাগের তৎকালীন পরিচালক মিঃ এ্যাডাম এই মাদ্রাসার কথা রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা ১৩০৪ সালে এক ভয়াবহ ভূমিকম্পে মাদ্রাসাটি ধ্বসে পড়ে।

বাঘা এতদঞ্চলে ইসলামিক শিক্ষার সুপ্রাচীন বিদ্যাপীঠ বলা চলে। এখানে একটি ইসলামিক গ্রন্থাদির পাঠাগারও ছিল। হযরত মৌলানা মোয়াজ্জেমদ্দৌলা (র:) সাহেবের দূর দৃষ্টি এবং শিক্ষানুযাগের ফলেই এই মহৎ কীর্তি সম্ভবপর হয়েছিল।

প্রখ্যাত আলেম ও মহাজ্ঞানী, পণ্ডিত হযরত শের আলী (র:) সাহেব এই মাদ্রাসার মুদাররেস-এ-আওয়াল বা অধ্যক্ষ ছিলেন।

হযরত আবদুল হামিদ দানিশমান্দ (র:)

ইন হযরত মৌলানা মোয়াজ্জেমদ্দৌলা দানিশ মান্দের (র:) যোগ্য সন্তান ছিলেন। পিতার ন্যায় তিনি কামেল দরবেশ ও বুজর্গ আলেম ছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্য, ধর্ম প্রাণতা মানুষের হৃদয় জয় করতে সক্ষম হয়েছিল। তাঁর পিতার প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাকে তিনি নিজামিয়া কলেজে উন্নতি করেন। পরবর্তী সময়ে ইসলামী শিক্ষার সুব্যবস্থার জন্য গৌড়ের স্বাধীন মুসলমান সুলতান নশরত শাহ অর্থবরাদ্দের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। ১৫২৩ খ্রীষ্টাব্দে (মতান্তরে ১৫২৪ খ্রীষ্টাব্দে) নশরত শাহের দ্বারা পীরের আস্তানায় বিশাল মসজিদ তৈরী এবং দীঘি খনন করা হয়।

মৌলানা আব্দুল হামিদ দানিশমান্দ (র) সাহেবের পুত্রশাহ হযরত আব্দুল ওহাব সাহেবও একজন কামেল পীর ছিলেন। মৌলানা আব্দুল ওহাবের পুত্র মৌলানা মহাম্মদ রফিক এর বংশধরগণ রইস-ই-বাঘা হিসাবে মর্যাদা পেয়ে আসছেন। এই বংশের শেষ রইস খন্দকার মনিরুল ইসলাম সাহেব জীবিত আছেন।

বাঘার ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছাড়াও দেশের উত্তরাঞ্চলের জন সাধারণের নিকট বাঘা একটি পবিত্র তীর্থস্থান বিশেষ। প্রতি বছর ঈদুল ফিতরের দিনে দূর দূরান্তরের ভক্তগণ এ স্থানে পীর-দরবেশ-বুজর্গদের মাযার জেয়ারত ক'রে থাকে। ঈদ উপলক্ষে বিরাট মেলা বসে।

বাঘার অন্যান্য অলী দরবেশগণ

হযরত শাহ শের আলী (র:)

ইনি বাঘার জগদ্বিখ্যাত মাদ্রাসার মুদাররেস-এ-আওয়াল বা অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি হযরত আব্দুল হামিদ দানিশমান্দ (র:) সাহেবের ওস্তাদ ছিলেন। বুজর্গ ও কামেল ব্যক্তি হিসাবে তাঁর সম্বন্ধে বহু অলৌকিক কথা-কাহিনী প্রচলিত আছে। বাঘার মসজিদ বা কবরস্থানের এলাকায় প্রবেশ পথের প্রথমেই তাঁর মাযার আছে।

মাস্তান শাহ (র:)

ইনি একজন কামেল দরবেশ ছিলেন। বাঘায় তাঁর পবিত্র মাযার আছে।

বাগদাদী দরবেশ :

বাঘার বিশাল দীঘির সিঁড়ির পার্শ্বে প্রাচীর বেষ্টিত অবস্থায় দু'জন বাদগাদী পীরের মাযার আছে। তাঁরা বাগদাদ হ'তে বাঘায় এসেছিলেন।

কাজী সাহেব :

চান্দা বাড়ী নামক স্থানে তাঁর মাযার আছে। ইনি একজন বুজর্গ ব্যক্তি ছিলেন।

জহর খাকী পীর :

ইনি একজন যথার্থ আউলিয়া ছিলেন। জহর বা বিষ পানেও তিনি নাকি বেঁচে থাকতে পারতেন। মসজিদের বারান্দায় তাঁর পবিত্র মাযার আছে।

লোহা শাহ :

উত্তপ্ত লোহা চিবিয়ে খেতে পারতেন এ রকম ঘটনায় পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে অজ্ঞ লোকেরা আসল নাম-ধাম না জেনে লোহা শাহ নামে অভিহিত করে। বাঘার ১ মাইল পূর্বে তার মাজার আছে।

বাঘা অঞ্চলে আরও অনেক পীরের সম্পর্কে নানা কথা শোনা যায়। শাস্ত্রে (রাধাকেষ্টপুর) গ্রামে বদর পীরের 'আস্তানা' আছে। এখানে কোন মাজার নেই। লোকে এখানে মানত দেয়, খাদেম সেগুলো ভোগ করে।

পাকুড়িয়া গ্রামে 'পাগল মা' নামে এক 'জেনান' পীরের মাজার আছে। এখানে আরও কতকগুলো মাজার আছে। সবই মাটির কবর। এখানে লোকেরা মানত দেয় এবং জেয়ারত করে। এর সময়কাল সঠিকভাবে জানা না গেলেও ৭০/৮০ বছর আগে সম্ভবত তিনি জীবিত ছিলেন।

এছাড়া লবু দেওয়ান, বাশু দেওয়ান, গাঁজা পীর, ন্যাংটা পর এমন যে-সব নাম শুনা যায় তার সমর্থনে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। আড়ানীর সন্নিকটে জহরুল আল বরখী, পান্নাপাড়ায় খায়রুল্লাহ দেওয়ান বলখী এবং নাটোরে হজরত কবীর শাহর মাজার আছে। স্থানীয় জনগণ এঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকেন।

শাহ জংলী পীর (র:)

রাজশাহীর বর্তমান আদালত ভবন হ'তে তিন চার মাইল উত্তর-পশ্চিম দিকে দামকুড়া হাটের নিকট খাড়ী নদীর পার্শ্বে আজগবী তলায় (বলোকপুর মৌজা, থানা গোদাগাড়ী) এই পীরের মাযার আছে। তাঁর মাযার হ'তে বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম প্রবক্তা এবং শ্রীচৈতন্য দেবের প্রধান শিষ্য নরোত্তম দাস এবং তাঁর শিষ্যদের আখড়া খেতুর এবং গৌরাঙ্গবাড়ী মাত্র কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত।

হযরত শাহ জংলী পীর (র:) সাহেব জঙ্গলে নির্মাণে আল্লার এবাদতে মগ্ন থাকতেন ব'লে অজ্ঞ জনসাধারণ তাঁকে জংলী পীর বলে আখ্যায়িত করতো। শুধু রাজশাহীতেই নয় ঢাকার মতিঝিল কলনীর নিকট হযরত পীর জংলী (র:) নামে অপর একজন বুজর্গ ব্যক্তির মাযার আছে। আউলিয়া ব্যক্তিগণ লোকালয়ের কলহ-কোলাহল হ'তে দূরে বনে-জঙ্গলে একাগ্রচিত্তে আল্লাহ তায়ালার উপাসনা করতেন ব'লে অনেক আউলিয়া ব্যক্তিরই সঠিক নাম-পরিচয় না জনে জংলী পীর নামে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তাই দেশের বিভিন্ন জেলায় এই নামে বেশ কিছু সংখ্যক বুজর্গ ব্যক্তির মাযার দেখা যায়।

অনুমান তিনি ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে জীবিত ছিলেন। এই পীরের নামে বহু লাখেরাজ সম্পত্তি ছিল। পরবর্তী সময়ে লোভী জমিদার এবং তাঁদের কর্মচারীগণ বিভিন্ন সময়ে টাকার বিনিময়ে কৌশলে আশে-পাশের লোকদের নামে পত্তনি দেয়। বর্তমানে অল্পকিছু পীরপাল সম্পত্তি আছে মাত্র।

হযরত বুলন্দ শাহ (র:)

হযরত বুলন্দ শাহ (র:) এতদাঞ্চলে বড় পীর নামে পরিচিত। রাজশাহী জেলার আমনুরা রেল ষ্টেশনের নিকট ঝিলিম নামক গ্রামে পুকুর পাড়ে তাঁর পবিত্র মাযার আছে। বৈষ্ণব মতবাদের প্রাবল্যে যে সময়ে মুসলমানদের ধর্মীয় চেতনাবোধ এবং অস্তিত্ব বিপন্ন প্রায় সেই দুঃসময়ে তিনি মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে এবং শেরেক-বেদাত-কুসংস্কার দূর করতে সচেষ্ট হন।

হজরত সাদাই ফকির (র:)

রাজশাহীর রহনপুর এলাকায় ইসলাম প্রচারের জন্য তাঁর যথেষ্ট অবদান আছে। তাঁর উপস্থিতি এবং কর্মপ্রচেষ্টার ফলে এই এলাকায় ক্রমশঃ মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। রহনপুর বাজার মোহন্তজীর আখড়ার পার্শ্বে মুর্শিদাবাদ নবাবের বংশধর আহমদী বেগমের জমিদারী এলাকায় তাঁর পবিত্র মাযার আছে।

পীর মুল্লুক জাহান (র:)

পোরশা থানার নিকটে বিষ্ণুপুরে এই দরবেশের পবিত্র মাজার আছে। বহু নীচু স্তরের দরিদ্র হিন্দু তাঁর কাছে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। চারু চন্দ্র বর্মন নামে জনৈক হিন্দু বর্তমানে তাঁর মাজারের খেদমতগার হিসাবে কর্মরত আছেন।

পীর গহর উদ্দিন (র:) এবং সদরুদ্দিন (র:)

পীর গহর উদ্দিন (র:) একজন প্রকৃত দরবেশ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর ভ্রাতা পীর সদর উদ্দিন (র:) সাহেবও নওগাঁ এলাকায় ইসলাম প্রচারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। নওগাঁ মহকুমার নজীপুর বাজার হ'তে দেড় মাইল দূরে কাঞ্চন নামে একটি গ্রামে তাঁর মাজার আছে।

হজরত মাওলানা আতা (র:)

নওগাঁ মহকুমার নজীর থেকে কিছু দূর গগনপুর গ্রামে তাঁর মাজার অবস্থিত। ইনি দিনাজপুরের মাওলানা আতা নন বলে মনে হয়।

হজররত শাবুদ শাহ (র:)

নওগাঁয় বদলগাছি বাজারে তাঁর মাজার আছে। গৌড়ের স্বাধীন সুলতানদের আমলে ইনি নওগাঁ এলাকায় ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। হিন্দু জমিদারগণ কর্তৃক তাঁকে প্রদত্ত প্রচুর পীরপাল সম্পত্তির প্রমাণমূলক কাগজ পত্র-সনদ ইত্যাদি পাওয়া যায়।

পাঁচ পীর

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে পাঁচ পীরর ভিটার খবর পাওয়া যায়— তবে পীরদের কোন ঐতিহাসিক পরিচয় পাওয়া যায় না। অচিন ঘাটে পাঁচজন পীরের মাজার আছে। লোকমুখে তাঁদের পরিচয় যা পাওয়া যায় তাতে তারা হচ্ছেন : হজরত গিয়াস উদ্দিন, হজরত শামসুদ্দিন, হজরত সেকেন্দার, হজরত কালু ও গাজী। এখানে একটি প্রাচীন মসজিদ এবং মাত্র দু'জন বুজর্গ ব্যক্তির মাজার পাওয়া যায়। বাকী তিন জনের মাজারের পরিচয় আপাততঃ পাওয়া যায় না। তঁদের মাযার কালক্রমে মৃত্তিকা গর্ভে মিশে গেছে এমনও হতে পারে।

এখানে মসজিদ স্থাপনের ব্যাপারে একটি শাহী ফরমানের সন্ধান পাওয়া গেছে। রাজশাহীর প্রাচীন লেখক শুকুর মামুদ রচিত পুস্তকে এই জায়গাটিকে মৃওল শহর নামে বর্ণনা করা হয়েছে।

হজরত নানু শাহ্ ফকির (র:)

মান্দা থানার কুস্‌ম্বা গ্রামে ঐতিহাসিক কুসুম্বা মসজিদ অবস্থিত। এখানে সোনাবিবির মসজিদ এবং কুসুম্বা মসজিদের পার্শ্বে ১২৫০ ফুট লম্বা এবং ১০০ ফুট গ্রস্থ্ একটা বিশাল দীঘি আছে। এই দীঘি পাড়ে হযরত নানু শাহ্ ফকির এবং আরও কতিপয় কামেল ফকিরের মাযার আছে।

কুসুম্বার মসজিদ ৯৯৬ হিজরীতে ১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়ে সুলতান গিয়াস উদ্দিন বাহাদুর শাহের আমলে নির্মাণ করার কথা উল্লেখ আছে। হযরত নানু শাহ্ ফকিরও গৌড়ের মুসলমান শাসনামলের লোক ব'লে মনে করা যেতে পারে। মসজিদটির পাশেই মুসলমান সাধকদের বেশ কটি হুজরাখানা দৃষ্টে মনে হয়। একদা এ স্থানে বহু মুসলিম সাধকদের সমাবেশ এবং কর্মক্ষেত্র ছিল।

হযরত তকীউদ্দিন আরাবী (র:)

মাহী সন্তোষে হযরত তকীউদ্দিন আরাবী সাহেবের (ব:) মাযার আছে। নামের শেষে আরাবী দেখে মনে হয় ইনি সুদূর আরব দেশ হ'তেই এদেশে ধর্ম প্রচারের জন্য এসেছিলেন। এখানে প্রাপ্ত কয়েকটি পুরাতন কামান, তলোয়ার, আরবী অক্ষর সম্বলিত মুদ্রা, মসজিদের ধ্বংসাবশেষ স্থানটির অতীত ঐতিহ্য এবং সমৃদ্ধির কথা প্রমাণ করে। তিনি আরবী শিক্ষার জন্য এখানে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। হযরত তকীউদ্দিন আরাবী (র:) ছাড়াও এখানে সোহরাওয়ার্দী তরিকাব কতিপয় বুগর্জ ব্যক্তির মাযার আছে।

হজরত দেওয়ান সৈয়দ জয়নাল আবেদীন (র:)

ইনি ছিলেন আরব দেশের অধিবাসী। বদলগাছি থানার হাজিপুরে তাঁর মাযার আছে। তিনি একাধারে আলেম ও মুজাহিদ ছিলেন। বিপদাপন্ন মানুষকে রক্ষার্থে প্রবলের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারনে তিনি দ্বিধা করেন নি। হিন্দু মুসলিম উভয় জাতির লোকই তার ভক্ত ছিল।

হযরত দেওয়ান হামিদুল্লাহ শাহ (র:)

বদলগাছি থানার নন্দহার গ্রামে এঁর পবিত্র মাযার আছে। এতদব্যতীত নওগাঁ মহকুমায় ধামৈর হাট থানার শংকরপুর এবং পত্নীতলা থানার নোধনী গ্রামে মাদারী তারিকার পীর-দরবেশদের মাযার-আস্তানা আছে।

হলুদ বিহারের দুই মাইল উত্তর দিকে কেশল গ্রামে একজন কামেল নারীর মাযার বা দরগাহ আছে। এছাড়া হলুদ বিহারের উত্তর পশ্চিম দিকে হদড়া কুড়ী গ্রামে হযরত একদীল্ (র:) সাহেবের দরগাহ আছে।

হযরত গওস-এ-দেওয়ান (র:)

ইনি আল্লার প্রেমে দেওয়ান ব্যক্তি ছিলেন। সিংড়ার কাছে চলন বিলের মধ্যে তাঁর মাযার আছে। নব গঙ্গার তীরে বর্ষায় বিল ভরে গেলেও তাঁর মাযার ডুবে না। মযারের উপরে পূর্বে খড়ের চাল ছিল। বাড়িয়া গ্রামের হিন্দু জমিদার কামিনী মোহন বাগচী পরে টিনের চাল ক'রে দেন। নওগাঁর কাশিমপুরের জমিদার মোহিনী কান্ত চৌধুরী এবং দীর্ঘাপতিয়ার রাজা প্রতিভানাথ রায় এই পীরের নামে পীরপাল সম্পত্তি দান করেন। গোবিন্দপু'র হজরত সাগর (সগীর?) দেওয়ানের ও নিমগাছিতে হযরত ভোলা দেওয়ানের মাজার আছে।

হযরত শাহ্ অলী আহমদ ফকির (র:)

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটে রেলপথের পার্শ্বে জামালপুর এলাকায় হযরত অলি আহমদ (র:) সাহেবের পবিত্র মাযার আছে। তাঁর অনেক অলৌকিক কাহিনী লোকমুখে শোনা যায়।

জীবদ্দশায় তাঁর সাক্ষাৎ পেয়েছেন এরকম ভক্ত দু'একজন বৃদ্ধ লোক এখনও পার্শ্ববর্তী এলাকায় জীবিত আছেন। তাঁর মাযারটি বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার মধ্যে পড়েছে।

হযরত বোরহান উদ্দিন (র:)

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সদর গেটের সম্মুখে হযরত বোরহান উদ্দিন (র:) নামক একজন বুজর্গ ব্যক্তির আস্তানা বা দরগাহ্ ছিল। পরবর্তী সময়ে তাঁর ভক্তগণ সংস্কার ক'রে সমাধি ভবনের ন্যায় নতুন ভাবে আস্তানাটি নির্মাণ করেছেন। অধিকাংশ লোকের মতে তাঁর মাযারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকায় পড়ায় খেলার মাঠ তৈরীর জন্য হয়তো বা ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে।

একই স্থানে হযরত মতি শাহ (র:) নামে অপর একজন দরবেশ ব্যক্তির মাযার বা আস্তানা আছে ব'লে স্থান নির্দেশ করা হয়। তাঁদের মাযারের স্থান নির্ণয় নিয়ে তর্কের অবকাশ রয়েছে। তবে ভক্তদের মতে বিশ্ববিদ্যালয় গেটের সম্মুখেই তাঁদের উভয়ের মাযার অবস্থিত।

হযরত বোরহান উদ্দিন সাহেবের নামে ৩২ শতক জমি পীরগাল হিসাবে দানের প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং উক্ত নামের দরবেশ ব্যক্তি এখানে ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

হযরত মন্দির শাহ (র:)

রাজশাহী শহরের টিকাপাড়া গোরস্থানে মন্দির শাহ'র মাজার আছে। স্থানীয় জনসাধারণ তাঁকে মন্দির বাবা বলে থাকে। এখানে হযরত আমির শাহ্ নামক অন্য একজন পীরের মাজার আছে। শহরের রামচন্দ্রপুর নাটোর রোডের ধারে হজরত শাহ্ ইসমাইল নামক একজন মশহর পীরের মাজার আছে।

রাজশাহীর অন্যান্য পীর আউলিয়া

এ জেলার নানা স্থানে অসংখ্য পীর আউলিয়ার সংবাদ পাওয়া যায়— এদের বিষয়ে ঐতিহাসিক তথ্য দুর্লভ। কিংবদন্তী নির্ভর কয়েকটি মাজার আস্তানার নাম দেওয়া হলো : রাজশাহী শহরের অদূরে বুধপাড়া অধিবাসী শেখ আবু সালেক সাহেবের মাজার আছে হেতেম খাঁ গোরস্থানে। ললিত নগর রেল স্টেশনের নিকট সমাহিত তেলাপীর, আবদুলপুর ও গোপালপুর রেল পথের পাশে দু'জন বুগর্জ ব্যক্তির মাজার, আদার কোঠা বা খোলাবুনার বুড়া পীর সাহেবের মাজার, ভুষণার পীরের মাজার উজির পুরের পীরের মাজার, বাঘধানীর নিকটে তুরাপুর এবং বসন্ত পুরের মাজার। মেহের চণ্ডী-ঘড়খড়ির পীরের মাযার, জিউপাড়ার পীরের মাযার, তানোর থানায় পাঁচন্দ গ্রামে মুণ্ডুমালা হ'তে দেড় মাইল দক্ষিণ পূর্ব দিকে চাঁদপীরের দর্গা (এই দগার নামে ৪০ বিঘা পীরপাল সম্পত্তি আছে)। তানোরের দেবীপুরে পাঁচপীরের মাযাব, তানোরের জুমার পাড়ার পীরর মাযার, এখানে পাঁচ পীরের উত্তরে 'আড়া-দীঘির' উত্তর পাড়ে পীরের দর্গা, তানোর-নেয়ামতপুর থানার সীমানায় মাদারীপুর বাজারে পীরের মাযার। তানোরের শিবরামপুরে পীরের আস্তানা; এই থানার জোতগরীবের পীরের মাযার, চাতরা দীঘির পীরের মাযার, সাঁই পাড়ার দর্গার পীর (এই পীরের দর্গায় কৃষ্ণ প্রস্তরে সুরা ইয়াসিন উৎকীর্ণ ছিল)। সুরাইয়াসিন লিখিত এই সুন্দর শিলালিপি থানাতে সিঁদুর ইত্যাদি দিয়ে স্থানীয় হিন্দু

নরনারীরা দেবতার কোন সামগ্রী ভেবে ভ্রমবশত পূজা করতো। বর্তমানে শিলালিপি খানা জুমার পাড়া মসজিদে সুরক্ষিত আছে।

গোদাগাড়ী থানার বালিয়া ঘাটার বিলের পূর্ব দিকের মাযার, নবাবগঞ্জ মহকুমা শহরের নিকট বলিয়া সাহেবের মাযার হযরত শাহ নেয়ামতুল্লাহ (র:) সাহেবের মাযারের নিকট প্রখ্যাত বুজর্গ আলেম শাহ ওয়াজেদ আলী (র:) সাহেবের মাযার, তালন্দ গ্রামের বটবৃক্ষের নীচে পীরের মাযার, পোরশা থেকে ৭ মাইল উত্তরে নিশ্চিন্তপুরে পীরের মাযার এবং ৮ মাইল পশ্চিমে, কুরমন ডাঙ্গার পীরের মাযার, রাজশাহী নওহাটা রোডে বায়ার কাছে পীর জায়েদ আলী সাহেবের মাযার প্রভৃতি বুজর্গ ব্যক্তিদের কথা উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত অলী-দরবেশদের পবিত্র মাযার রাজশাহী জেলাবাসীর সুখ-সৌভাগ্য সভ্যতা-সংস্কৃতির সথে স্মরণীয়।

হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসী :

রাজশাহী হিন্দু সমাজে বহু সাধু-সন্ন্যাসী এবং অলৌকিক ক্ষমতা-সম্পন্ন ভক্ত পুরুষের আবির্ভাব ঘটেছিল। তাদের কর্ম বহুল জীবনের ঘটনাবলীর প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায়।

নরোত্তম ঠাকুর :

শ্রীচৈতন্য প্রেমে উদ্বুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা নরোত্তম ঠাকুরের জন্মস্থান রাজশাহী জেলা। তিনি একজন সাধক এবং মানব দরদী ধর্ম প্রচারক ছিলেন। উদার দৃষ্টিভংগী সহজ সরল আচরণের জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধাভক্তি অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি ১৫৭০ হ'তে ১৬৪০ খ্রীঃ কালের বৈষ্ণব মতবাদ প্রচারে তৎপর ছিলেন।

রাজশাহী শহর হ'তে ছয় ক্রোশ দূরে গড়ের হাট পরগণায় খেতুরী গ্রাম অবস্থিত। বর্তমানে গ্রামটি তার অতীত গৌরব হারিয়ে ফেললেও নরোত্তম ঠাকুরের পবিত্র জন্মভূমি বা কর্মক্ষেত্র হিসাবে এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। এখানে উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ বংশের দু'জন রাজা ছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন কৃষ্ণানন্দ দত্ত এবং তাঁর ছোট ভাই পুরুষোত্তম দত্ত। বড় ভাই কৃষ্ণানন্দের পুত্র হচ্ছেন নরোত্তম ঠাকুর। শ্রী চৈতন্যের জীবদ্দশায় মাঘী পূর্ণিমার গৌধুলী লগ্নে রাজা কৃষ্ণানন্দের ঔরশে শ্রীমতী নারায়নীর গর্ভে যে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে সেই পুত্রই নরোত্তম ঠাকুর। রাজার ছেলে হয়েও তিনি শৈশবকাল হতেই ছিলেন সংসার বিবাগী। তাঁর রচিত বেশ ক'খানা ভক্তিমূলক বই রয়েছে। আচার্য শ্রী নরোত্তম ঠাকুর এবং শ্যামানন্দ গোস্বামী সমগ্র বাংলাদেশে এবং উৎকলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি নিজে কায়স্থ কুলোভব হ'লেও শ্রীজীব গোস্বামী কর্তৃক ঠাকুর উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি গরান হাটী কীর্তন নামে বিশেষ ধরণের সংকীর্তন লীলার প্রবর্তন করেন। তারই উদ্যোগে খেতুরী গ্রামে তৃতীয় বৈষ্ণব মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এতে রাঢ় উৎকল এবং বরেন্দ্র এলাকার এবং বাংলার বাইরের শত শত বৈষ্ণব নরনারী দলে দলে যোগদান করেন।

শ্রীকৃষ্ট খ্যাপা বা কৃষ্ণ খ্যাপা :

আড়ানী হাই স্কুলের পাশে তাঁর বিখ্যাত আখড়া আজও বিদ্যমান রয়েছে। শোন যায় এই সাধন পীঠেই নাকি তিনি সিদ্ধ লাভ করেছিলেন এবং এখানেই হিন্দু ধর্মের প্রচারের জন্য কালাতিপাত করেন। তাঁর সম্পর্কে বহু অলৌকিক কথা-কাহিনী শোনা যায়।

রাজশাহী শহরে হনুমানজীর আখড়া, গোবিন্দজীর আখড়া, লালপুর থানার রামকৃষ্ণপুরের

মঠ এবং জেলার অন্যান্য স্থানে এই জাতীয় মন্দির আখড়া দেখে মনে হয় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন হিন্দু সাধকদের কেন্দ্র করেই এ ধরনের ধর্মীয় আখড়া গ'ড়ে উঠেছিল।

সহায়ক রচনাপঞ্জী : বাংলা

০১. পূর্ব পাকিস্তানের সুফী সাধক : ডঃ গোলাম সাকলয়েন।
০২. রাজশাহীর ইতিহাস : কাজী মিছের, ১ম, ২য় খণ্ড।
০৩. উত্তর বাঙ্গলার আউলিয়া প্রসঙ্গ : দেওয়ান মুঃ ইব্রাহীম হোসেন তর্কবাগীশ।
০৪. মুসলিম বিশ্ব পরিভ্রমণ হজ্জ্ব ও জিয়ারত : হাজী তমিজ উদ্দিন।
০৫. গৌড় ও পাণ্ডুয়া : শ্রী কালীপদ লাহিড়ী।
০৬. রুদে কাওসার : ডঃ শেখ মোহাম্মদ আকরাম।
০৭. মুসলিম বাংলা গদ্যের প্রাচীনতম নমুনা : মুহম্মদ আবু তালিব
০৮. উত্তর বঙ্গের ইসলাম প্রচারের গোড়ার কথা : মুহাম্মদ আবু তালিব
০৯. বাংলার মুসলিম ধর্মীয় আন্দোলন : সৈয়দ মুরতজা আলী।
১০. বঙ্গ আসামের পীর আউলিয়া কাহিনী : মৌলানা রুহুল আমিন।
১১. পূর্ব পাকিস্তানে আউলিয়া দরবেশ : ডাঃ শেখ মোঃ আবুল হোসেন কাদেরী।
১২. বাংলার ইতিহাস : রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৩. বাংলার পুরাবৃত্ত : শ্রী পরেশ বন্দ্যেপাধ্যায়।
১৪. ফুরফুরা শরীপের পীর কেবলার জীবনী : মৌলানা রুহুল আমিন।
১৫. গৌড় লেখমালা : অক্ষয় কুমার মৈত্র।
১৬. বরেন্দ্র একাডেমী পত্রিকা ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১৯৭৮।
১৭. অখণ্ড অমিয় শ্রী গৌরাঙ্গ : অচিন্ত্য কুমার সেন গুপ্ত।
১৮. ঠাকুর শ্রী শ্রী নরোত্তম : শ্রী স্বপন কুমার সাহিত্য বারিধি।
১৯. বরেন্দ্র একাডেমী পত্রিকা : ২য়, ৩য় ও সম্মেলন সংখ্যা ১৯৭৮।
২০. বঙ্গে সুফী প্রভাব : ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক।

সহায়ক রচনাপঞ্জী : ইংরেজী

01. Inscriptions of Bengal Vol. IV : Shams Ud-Din Ahmed.
02. History of Bengal vol. II, Dacca University
03 The Memoirs of Gour and Pandra : Khan Shahib Abid Ali Khan.
04. Rajshahi Gazetteer : O'Mely.
05. The Indian Mussulman : W. Hunter
06. Statistical Account of Rajshahi District : Do.
07. Cunningham's Report vol. XV.
08. Do. Archaeological Survey vol XV.
09. Five Thousand years of Pakistan : M. Wheeler
10 Muslim Architecture in Bengal : Dr Ahmed Hasan Dani.
11. A History of Sufi-ism in Bengal : Dr Md. Enamul Haq.

রাজশাহীর প্রসিদ্ধ ও ঐতিহাসিক স্থান

মোঃ মজিবর রহমান

সভ্যতার অগ্রগতি ও ক্রমবিকাশে আমরা প্রায়ই লক্ষ্য করি যে যুগে যুগে এক একটি স্থান ইতিহাসের আলোকে উদ্ভাসিত হয় এবং আবার তা বিস্মৃতির আড়ালেও চলে যায়। তাই একটি বিস্তৃত এলাকার ইতিহাস জানার জন্য সে অঞ্চলে অবস্থিত শহর ও বন্দর, গ্রাম ও গঞ্জের এবং মসজিদ ও মন্দিরের ইতিহাসও জানতে হয়। এ উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি রাজশাহী জেলার প্রসিদ্ধ ও ঐতিহাসিক স্থানগুলির।

রাজশাহী জেলার তথা উত্তর বঙ্গের প্রাণকেন্দ্র রাজশাহী একটি বিখ্যাত শহর। আর এ শহরকে কেন্দ্র করেই আমাদের শিক্ষা দীক্ষা, সংস্কৃতি রাজনীতি ও অর্থনীতি গড়ে উঠেছে এবং উঠছে। তাই এ শহরকে আমাদের জীবনের সকল কর্মকাণ্ডের উৎস বললে অত্যুক্তি করা হবেনা বলে আমাদের বিশ্বাস।

কাজেই রাজশাহী শহরের গুরুত্ব ও ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। আমরা যেমন মিশরকে বলি "নীল নদের দান" তেমনি রাজশাহী শহরকেও চারটি নদীর দান বলে উল্লেখ করা যায়,— উত্তরে হোজা, পূর্বে মুসাখান, পশ্চিমে জামদহ এবং দক্ষিণে পদ্মা। অবশ্য এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে শুধু পদ্মা ছাড়া আর তিনটি নদীর অস্তিত্ব মাত্র আছে। কাজই রাজশাহী শহর যে ভূমির উপর দাঁড়িয়ে আছে তা নতুন ভূমি, পুরাতন ভূমি নয়। যতদূর জানা যায় পনের 'শ শতকের শুরু থেকে এখানে মানুষের আনাগোনা, বসতি বিস্তার ও বন্দর বাজারের সূচনা হয়েছে। তারপর আস্তে আস্তে রাজশাহী শৈশব কৈশোর ও যৌবন অতিক্রম করেছে। রাজশাহী শহর গড়ে উঠেছে দুটি পল্লীকে কেন্দ্র করে রামপুর ও বোয়ালিয়া। তাই জেলা শহরের নাম হয় রামপুর-বোয়ালিয়া।

রাজশাহী কলেজের দক্ষিণ পূর্ব কেণে একটি দ্বিতল ইমারত মাথা উঁচু করে দাড়িয়ে আছে পদ্মার তীরে। গঠন কৌশলের দিক দিয়ে সাদা মাটা হলেও এর একটি বৈশিষ্ট্য আছে যা সাধারণতঃ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই ইমারতই রাজশাহীর বড়কুঠি বলে পরিচিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই রামপুরে রেশমের কারবার খুব বেড়ে যায় ফলে ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজরা এখানে কুঠি স্থাপন করে। 'বড়কুঠি' ওলন্দাজরাই এ সময়ে স্থাপন করেছিল। এতে মোট বারটি কামরা আছে। নীচের কামরাগুলি কিছুটা অন্ধকার। খুব সম্ভব এগুলি রেশমের গুদাম হিসাবে ব্যবহার করা হতো।

বড় কুঠিকে ওলন্দাজরা দুর্গ হিসাবেও ব্যবহার করত। এখানে বেশ কয়েকটি কামান ছিল। পরে ইংরেজরা এগুলি বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যায়। এদের মধ্যে দু'টি পুলিশ লাইনে ও একটি পুলিশ সুপারের বাসায় রাখা হয়েছে।

ওলন্দাজরা ১৮৩৩ সালের দিকে এ কুঠি ছেড়ে গেলে তা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে চলে যায়। ১৮৩৫ সাল থেকে দীর্ঘদিন ধরে, মেসার্স রবার্ট ওয়াট্‌সন এণ্ড কোম্পানী রেশম ও নীলের কারবারে এ কুঠি ব্যবহার করে। সিপাহী বিদ্রোহের সময় এ কুঠি ইংরেজদের বিশেষ হেড কোয়ার্টার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল।

ঐতিহাসিক ছোট সোনা মসজিদ
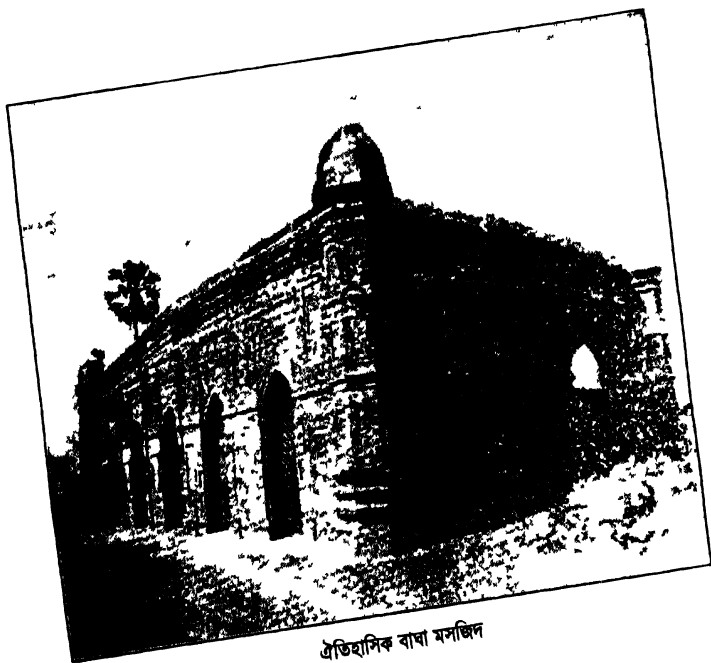
ঐতিহাসিক বাঘা মসজিদ

রাজশাহী কলেজের দক্ষিণ পাশে পদ্মার তীরে দরগা মসজিদ অবস্থিত। মসজিদের পাশেই ওলি-আল্লাহ হজরত শাহ মখদুম সাহেবের মাজার। এই সমাধি সৌধের প্রবেশ পথের উপরে একটি ফারসী শিলা লিপি রয়েছে। রাজশাহীর গেজেটিয়ার প্রণেতা ও'মেলী সাহেবের কাছে মখদুম সাহেবের দরগা ছিল উপেক্ষিত। রাজশাহীর এক সুসন্তান জনাব শামসুদ-দিন আহমেদ তাঁর Inscription of Bengal গ্রন্থে প্রথম এই শিলা লিপির পাঠোদ্ধার করেন। শিলা লিপির অর্থ অনুসারে বলা যায়— এটি রচনা করেছিলেন জনৈক আলী কুলী বেগ ইংরেজী ১৬৩৬ সালে এবং তিনিই হয়তো হজরত মখদুম সাহেবের সমাধি সৌধের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। রাজশাহী থেকে ৮/৯ মাইল পশ্চিমে কমরপুর বা কুমার পুরে আলী কুলী বেগের মাজার অবস্থিত। হজরত শাহ মখদুম আমাদের কাছে একটি পবিত্র নাম। তাঁর জীবনী ও কার্যাবলী রাজশাহীর ইতিহাসে একটি জ্বলন্ত অধ্যায়।

১৯১০ সালে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পর শুরু হয় তাদের সংগ্রহ অভিযান। তার পর একটি মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার ধারনা কুমার শরৎ কুমার রায়ের মনে দেখা দিতে থকে। ইতিমধ্যে প্রত্নতত্ত্বের অনেক নিদর্শন দেওয়াড়া, পালপাড়া, মালফি, তালাই, কুমাবপুর, মাড়ইল, বিজয় নগর ও খেতুর থেকে সংগ্রহ করা হয়। ১৯১২ সালে রাজশহীব বিভাগীয় কমিশনারের নির্দেশে কুমার শরৎকুমার রায় ও রমাপ্রসাদ চন্দ দার্জিলিং গিয়ে বাংলার গভর্ণরের সাথে দেখা করে প্রস্তাবিত মিউজিয়ামের বিষয় আলোচনা করেন। ঐ বছরের আগষ্ট মাসে লর্ড কার্মাইকেল রাজশাহী আসলে তাঁকে সংগৃহীত নিদর্শন গুলি দেখান হয়। তিনি খুবই প্রীত হন এবং ১৯১৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের একটি চিঠিতে রাজশাহীতে মিউজিয়াম প্রতিষ্টার অনুমতি দেন। রাজা প্রমথনাথ রায় এব্যাপারে আগে থেকেই প্রতিশ্রুত ছিলেন। তিনি এক খণ্ড জমি কিনে সমিতিকে দান করেন। ১৯১৬ সালে লর্ড কারমাইকেল মিউজিয়াম ভবনের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং ১৯১৯ সালে বাংলার তদানিন্তন গভর্ণর লর্ড রোনাল্ডসে উহা আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করেন। ভবনটি তৈরী কবতে খরচ হয়েছিল ৬,৩০০০ টাকা। বর্তমানে বরেন্দ্র মিউজিয়াম ও গ্রন্থগার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। অধ্যাপক ডক্টর মুখলেছুর রহমান মিউজিয়াম ও গ্রন্থাগারটির পরিচালনার দায়িত্ব পালন করছেন।

১৮২৫ সালে রাজশাহীর জেলা সদর দপ্তর রাজশাহীতে স্থানান্তরিত হলে জেলখানাও নাটোর থেকে রাজশাহীতে স্থানান্তরিত হয়। এই জেলখানাই বর্তমানে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার নামে পরিচিত। ১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস গভর্ণর জেনারেল হয়ে এলে বাংলাদেশের জেলাগুলির বিন্যাস শুরু হয়। ১৭৮২ সালে তিনি প্রত্যেক জেলা সদরে ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালত স্থাপন করেন। ১৭৯৩ সালে নাটোরের রাজবাড়ী থেকে জেলখানা স্থানান্তরিত হয়ে তে-বাড়িয়াতে স্থাপিত হয়। এই জেলখানাই রাজশাহীর প্রথম সরকারী জেলখানা এবং ইহা এখন নাটোরের চৌধুরী পরিবারের সম্পত্তি আমবাগানে পরিণত। জেলখানার সেই বিরাট ইন্দারার চিহ্ন আজও লক্ষ্য করা যায়। ১৮৭৫ সালে মুর্শিদাবাদ জেলা প্রেসিডেন্সী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হলে রাজশাহীর বিভাগীয় দপ্তর রামপুর বুয়ালিয়াতে চলে আসে এবং ১৮৮৮ সালে উহা জলপাইগুড়িতে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বিভাগীয় দপ্তর এখানেই অবস্থিত ছিল, পরবর্তী কালে রাজশাহীতে চলে আসে। এ সময় থেকে রাজশাহী জেলখানা কেন্দ্রীয় কারাগারে পরিণত হয়। প্রকৃত পক্ষে এ পরিবর্তন ১৯১৪ সাল থেকেই শুরু হয় এবং দীর্ঘ মেয়াদী কয়েদিদের এখানেই রাখা হয়ে থাকে। রাজশাহীর কেন্দ্রীয় কারাগারকে একটি আধুনিক জেলখানায় পরিণত করা হয়েছে। বিভাগ সহ এখানে হাসপাতাল, গ্রন্থাগার

এবং ছোট একটি কুটির শিল্প ইউনিটও আছে। কয়েদিদের দ্বারা তৈরী জিনিষ পত্র জনসাধারণের কাছে বিক্রয় করার জন্য কারাগারের একটি বিক্রয় কেন্দ্রও আছে। তৈরী জিনিষ পত্রের মধ্যে পাটের জায়নামাজ, দড়ির মোড়া, নাইলনের পাতির মোড়া ও পাটের গালিচার নাম করা যেতে পারে।

জেলা পরিষদ (District Council) :

১৮৮৬ সালে ২২ জন সরকারী ও বেসরকারী সদস্য নিয়ে 'রাজশাহী জেলা পরিষদ' গঠিত হয়। মিঃ এ.এইচ রডক্ রাজশাহী জেলা পরিষদের প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন। পরবর্তীকালে স্বায়ত্ব-শাসিত আইন সংশোধিত হলে ১৯২০ সালে এপ্রিলে বেসরকারী সদস্য হিসেবে জেলা পরিষদের প্রথম চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন জনাব এমাদুদ্দীন আহ্‌মদ (পরে খানবাহাদুর)। পাকিস্তান আমলে ১৯৫৮ সালে ১০ই নভেম্বর তদানীন্তন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট খান মুহাম্মদ শামসুর রহমান (C.S.P) বোর্ডের শেষ চেয়ারম্যান জনাব মুহাম্মদ আব্দুস সামাদ (অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ও সম্পাদক-রাজশাহী বার্তা) এর নিকট থেকে জেলা পরিষদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এ সময় থেকেই বেসরকারী চেয়ারম্যান পদের বিলুপ্তি ঘটে। ১৮৭৪-'৭৫ সালে বর্তমান কাচারী প্রাঙ্গণে বাঁশের কাঠামোর উপর টালীদ্বারা চৌচাল ও ক্ষুদ্র জানালা বিশিষ্ট একটি 'কাচা-পাকা' ছোট ঘরনির্মিত হয়েছিল-রোডসেস আদায়ের জন্য উহাই জেলা কাউন্সিলের আদি ভবন। পরে জেলা বোর্ড গঠন হবার পর ১৮৯৬-'৯৭ সালে ৫,২৪৫ টাকা ব্যয়ে বর্তমান জেলা কাউন্সিল ভবনটি নির্মান করা হয়।

রাজশাহী পৌরসভা :

গভর্ণর জেনারেল লর্ড লিটনের আমলে ১৮৭৬ সালে 'রাজশাহী মিউনিসিপ্যালিটি' গঠিত হয়। ১৮৮৪ সালের 'বেঙ্গল মিউনিসিপ্যালিটি অ্যাক্ট' এর বিশেষ ধারা মতে রাজশাহী পৌরসভায় মনোনীত ও নির্বাচিত কমিশনারের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে সাত ও চৌদ্দজন। পৌরসভার প্রথম বেসরকারী চেয়ারম্যান ছিলেন বাবু হর গোবিন্দ সেন। পৌরসভার বর্তমান ভবনটি ১৯২১ সালে নির্মিত হয়।

এখন আমরা রাজশাহী শহরের পূর্ব দিকে অবস্থিত কযেকটি প্রসিদ্ধ ও ঐতিহাসিক স্থানের উপর আলোকপাত করতে চেষ্টা করবো।

সরদহ :

প্রথমে আমরা সরদহ সম্পর্কে বলব। সরদহ একটি অতি প্রাচীন গ্রাম। রাজশাহী শহর থেকে ১৩ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পদ্মার উত্তর পাড়ে অবস্থিত। অতীতে এর গড়ে ওঠার পেছনে রেশম ও নীলের অবদান অনস্বীকার্য। এখানে কোম্পানীর একটি বাণিজ্য কুঠি ছিল। এই কুঠিই আজকের বিখ্যাত সরদহ পুলিশ ট্রেনিং কলেজ। ১৮৯২ সালে বাংলা সরকার মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানীর কাছ থেকে এই কুঠি কিনে নিয়ে পুলিশ ট্রেনিং কলেজ স্থাপন করেন। পুরাতন সরদহের নতুন বেশ এবং সেই সঙ্গে নামেরও কিছু বিবর্তন বা পরিবর্তন— সরদহ থেকে হল সারদা।

এখানে একটি পাইলট স্কুল, একটি দাতব্য চিকিৎসালয় এবং একটি বিশ্রামকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। সরদহের রাস্তা ঘাট, হাট বাজার পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও ছায়াঘেরা। ১৯৬৪ সালে এখানে একটি ক্যাডেট কলেজ স্থাপন করা হয়েছে।

চারঘাট :

সরদহের কাছেই পদ্মা নদী এবং সেখান থেকেই বড়াল নদী উঠেছে। এ নদীর অপর পাড়েই চারঘাট গ্রাম এ অঞ্চলের একট বাণিজ্য কেন্দ্র। চারঘাট রাজশাহী সদর মহকুমার একটি বিরাট থানা— খুবই প্রাচীন এবং গুরুত্বপূর্ণ। চারঘাটের কারখানায় প্রচুর খয়ের তৈরী হয়। কিন্তু এ শিল্পের আধুনিকী করণের কোন ব্যবস্থা বা পরিকল্পনা আজ পর্যন্ত নেওয়া সম্ভব হয়নি। চারঘাটে প্রচুর হলুদ উৎপন্ন হয়।

বাঘা :

চারঘাট থেকে ১১ মাইল দক্ষিণ পূর্বে এবং রাজশাহী শহর থেকে ২৫ মাইল দক্ষিণ পূর্বে বাঘা অবস্থিত। এখানেই বাঘার বিখ্যাত মসজিদ কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি প্রকাণ্ড পুকুরের পাড়ে। ডঃ আবু ইমামের মতে, মসজিদটি ১৫২৬ সালে নির্মিত হয়। তখন গৌড়ের সিংহাসনে আসীন ছিলেন সুলতান নসরৎ শাহ (১৫১৯-১৫৩২)। মসজিদটি সম্পূর্ণ ইটের তৈরী। পশ্চিম দিকের দেয়ালে তিনটি অলংকৃত মেহরাব আছে। আযতক্ষেত্রাকৃতি এই মসজিদটির দেয়ালগুলি সাতফুট প্রশস্ত এবং ছাঁচে তৈরী কারুকাজ ও টেরা কোট্টার অলংকরণে সজ্জিত ও সমৃদ্ধ। মসজিদের প্রাঙ্গণে হজরত শাহ্ মৌলানা মোয়াজ্জিমদ্দৌলা দানিশমন্দ এর মাজার অবস্থিত।

রাজশাহী তথা উত্তরাঞ্চলে ইসলাম প্রচারের প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে আমরা উল্লেখ করেছি বোয়ালিয়ার হযরত শাহ্ মখদুম এর নাম। এ ব্যাপরে দ্বিতীয় নামটি হলো বাঘার হযরত মৌলানা শাহ দ্দৌলা। এখানে বলে রাখা ভাল যে হজরত শাহ্ মখদুম বোয়ালিয়ায় আসার আগে কিছুদিন মখদুম নগরে অবস্থান করেছিলেন। তখন বাঘার কোন অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায় না। তখন ছিল মখদুম নগরের পশ্চিম দিকে গভীর জঙ্গল— ফলে তা ছিল জনমানবশূণ্য ও হিংস্র জানোয়ারের লীলাক্ষেত্র। ঠিক এমনি সময়ে সুদূর বাগদাদ থেকে কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে বাঘারজঙ্গলে হাজির হলেন মৌলানা সাহেব। তারপর তাঁর ভক্তের সংখ্যা বাড়তে থাকে, জঙ্গল পরিষ্কার হতে থাকে এবং ধীরে ধীরে মানুষের বসতি শুরু হয। "বাজার বন্দরের কোলাহলে শিক্ষা-সংস্কৃতির জৌলুসে 'বাঘার আড়া' কসবে বাঘার খ্যাতিলাভ করল। শুরু হলো বাঘার সুদীর্ঘ ইতিহাস— শিক্ষা দীক্ষা ও প্রচারের ইতিহাস।" মৌলানা সাহেব প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা ও খানকা দীর্ঘদিন ধরে এ অঞ্চলের মানুষের আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মিটিয়ে ছিল।

পুঠিয়া :

রাজশাহী থেকে ১৯ মাইল পূর্বে এবং নাটোর থেকে ১১ মাইল পশ্চিমে নাটোর রাজশাহী সড়কের পাশে থানা সদর পুঠিয়া অবস্থিত। পুঠিয়ার রাজবংশ বিখ্যাত। বর্তমানেও রাজবাড়ীটি রয়েছে। এখানে স্কুল, কলেজ, থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্র, থানা পর্যায়ের সকল অফিস রয়েছে। জেলার মধ্যে ডাব-নারিকেলের জন্য বিখ্যাত।

তাহিরপুর :

রাজশাহী শহর থেকে প্রায় ২৯ মাইল উত্তর পুর্বে বারানই নদীর তীরে তাহিরপুর অবস্থিত। রাজশাহী জেলার প্রাচীন রাজপরিবারের মধ্যে তাহিরপুর জমিদার পরিবার অন্যতম। মুসলিম বাঙ্গালার রাজনৈতিক ইতিহাসে তাহিরপুরের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহিরপুর বর্তমানে

একটি বিখ্যাত ব্যবসা কেন্দ্র। এখানে প্রচুর পেঁয়াজ আমদানী হয়। বর্ষার সময় নদীনালা স্ফীত হলে এখানে ব্যবসার উদ্দেশ্যে বহু নৌকা যাতায়াত করে। এখানে একটি কলেজ, একটি উচ্চ বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসাকেন্দ্র আছে।

দীঘাপতিয়া :

নাটোর শহর থেকে সামান্য একটু উত্তরে দীঘপতিয়া গ্রাম অবস্থিত। এখানেই বাস করতেন দীঘাপতিয়ার রাজ পরিবার এই বংশের রাজারা দানে ছিলেন মুক্ত হস্ত। রাজশাহী শহরের বহু প্রতিষ্ঠান তাঁদের দানে গড়ে উঠেছিল। রাজ প্রাসাদের চারিদিকে একটি সুন্দর চৌকি আছে এবং এর তোরণ দ্বারটি দেখার মতো। বর্তমানে দীঘাপতিয়ায় পোস্ট অফিস, টেলিগ্রাফ অফিস উচ্চ বিদ্যালয় ও একটি চিকিৎসা কেন্দ্র আছে। দীঘাপতিয়া রাজ বাড়ীই এখন উত্তরা গণভবনে রূপান্তরিত হয়েছে।

নাটোর :

রাজশাহী জেলার একটি মহকুমা শহর এবং রাজশাহীর জেলা সদর দপ্তর থেকে ৩০ মাইল পূর্বে নারদ নামে একটি লুপ্ত প্রায় নদীর তীরে অবস্থিত। ইংরেজ আমলের শুরু থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত নাটোরে রাজশাহী জেলার সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখানে একটি ডিগ্রী কলেজ ও উল্লেখযোগ্য রেলওয়ে ষ্টেশন আছে। নাটোরের কাচা গোল্লা বিখ্যাত।

দয়ারামপুর :

নাটোর মহকুমা শহর থেকে প্রায় ১২ মাইল দক্ষিণ পূর্বে এবং মালঞ্চি রেলওয়ে স্টেশন থেকে ৫ মাইল পূর্বে দয়ারামপুর গ্রাম অবস্থিত। দয়ারামপুর দীঘাপতিয়া রাজের ছোট তরফ বলে পরিচিত। রাজশাহীর বরেন্দ্র মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠাতা কুমার শরৎ কুমার ও তাঁর দুই সহোদর কুমার বসন্ত কুমার ও কুমার হেমন্ত কুমার এখানে বাস করতেন। গঠন কৌশলের দিক দিয়ে এখানকার রাজপ্রসাদ আধুনিক প্যাটার্নে তৈরী ও সুন্দর। এখানকার গ্রন্থাগারে অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও আসবাবপত্র ছিল। এখানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রকৌশল শাখার একটি ক্যান্টনমেন্ট গড়ে তোলা হচ্ছে।

গুরুদাসপুর :

গুরুদাসপুর নাটোর মহকুমার পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত একটি উল্লেখযোগ্য স্থান। চলনবিল অঞ্চলের দস্যুবৃত্তি দমনের জন্য ১৯৯৭ সালে এখানে একটি থানা কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। একটি ডিগ্রী কলেজ, ছয়টি উচ্চ বিদালয়, একটি ফাজেল, একটি দাখেল মাদ্রাসা ও একটি চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। একটি উচ্চ মাধ্যমিক কলেজও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গুরুদাসপুরের 'থানা শিক্ষা সঙসদ' একটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান। নিকটবর্তী অঞ্চলে চাঁচকৈইর ও নাজিরপুর গ্রাম দুটি মুসলমান প্রধান স্থান। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতি মনোরম।

কলম :

নাটোর মহকুমার অধীন শিংড়া খানার কলম একটি মশহুর গ্রাম। এই গ্রাম চলন বিলের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। মাছ ও তামা-কাঁসার তৈজসপত্রের জন্য কলম বিখ্যাত। ইহা একটি

ব্যবসা কেন্দ্র ও জনবহুল গ্রাম। বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চলে একটি প্রবাদ আছে— 'গাঁ দেখতো কলম, বিল দেখতো চলন আর শিব দেখতো তলম'। চলন বিলের উত্তর পশ্চিমে তলম একটি গ্রাম এবং এখানে একটি বিরাটকায় শিব মন্দির আছে। একটি উচ্চ বিদ্যালয় একটি ডাকঘর ও একটি চিকিৎসা কেন্দ্র এখানে অবস্থিত।

এবার আমরা রাজশাহী শহরের পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত কিছু ঐতিহাসিক ও প্রসিদ্ধ স্থানের নাম করবো। এ পর্যায়ে আমরা প্রথমে গোদাগাড়ী সম্পর্কে কিছু বলব।

গোদাগাড়ী :

রজশাহী থেকে ১৯ মাইল উত্তর পশ্চিমে পদ্মার তীরে গোদাগাড়ী একটি প্রসিদ্ধ স্থান ও থানার প্রধান কেন্দ্র। ইহা একটি উল্লেখযোগ্য ব্যবসাস্থল।

বর্গীর হাঙ্গামার সময় মুর্শিদাবাদ থেকে বিতাড়িত ও আতঙ্কিত বহু মানুষ গোদাগাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিল। এ সময় ডেপুটি গভর্ণর নওয়জিশ মোহাম্মদ খাঁন পদ্মা অতিক্রম করে নিজ পরিবার ব্যক্তিগত আসবাব পত্র ও ধনদৌলত নিয়ে এখানে কিছু দিন বাস করেছিলেন। নবাব আলিবর্দী ও তাঁর পরিবার ও জিনিষ পত্র পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কিল্লাহ বারুই পাড়াতে। সিয়ারে মুতাক্ষেরীন গ্রন্থে তার পরিষ্কার উল্লেখ আছে। কিল্লাহ বারুই পাড়া তার স্মৃতি এখনও বহন করছে। গোদাগাড়ীতে অনেক প্রাচীন স্মৃতি চিহ্ন বর্ত্তমান। দেওপাড়াতে একটি অতি প্রাচীন পুকুর আছে। এখানে দু'টি স্তুপ দেখা যায়— উপর বাড়ীতে খৃষ্টীয় অষ্টম থেকে একাদশ শতকে তৈরী একটি বৌদ্ধ বিহার এবং মকরামাতে একটি প্রাচীন কবর আছে। কুমার পাড়াতে একটি প্রাচীন ঐতিহ্যের ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্য করা যায়। এর পার্শ্ববর্তী এলাকা বিজয় সেন এর সাময়িক রাজধানী বিজয়নগর বলে পরিচিত। কুমার পাড়ার সোজা দক্ষিণে অলি শাহ মোকাররমের কবর বিদ্যমান। উক্ত কবরটি ৭টি কাল পাথরে ঢাকা। গোদাগাড়ীতে একটি থানা কেন্দ্র ছাড়াও পোঃ অফিস, টেলিগ্রাম অফিস, রেলওয়ে ষ্টেশন, ষ্টিমার স্টেশন, উচ্চ বিদ্যালয় প্রাথমিক বিদ্যালয়, পরিদর্শন বাংলো ও চিকিৎসা কেন্দ্র বিদ্যামান। এ ছাড়াও এখানে এক সময় একটি রেলষ্টেশন ও ষ্টিমার ঘাট ছিল।

নওয়াবগঞ্জ :

মহানন্দার তীরে অবস্থিত নওয়াবগঞ্জ রাজশাহী জেলার আর একটি মহকুমা শহর। নয়াবগঞ্জের বিপরীত দিকে বারোঘরিয়া অবস্থিত। বারোঘরিয়াও একদিন রেশম ও পাটের করবারের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। ১৯০৩ সালে নওয়াবগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হয়। ১৯৪৭ সালে নওয়াবগঞ্জ একটি মহকুমা শহরের মর্যাদা লাভ করে। নওয়াবগঞ্জ শহর আমবাগানে পরিবেষ্টিত। এখানে স্কুল, কলেজ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান আছে। রেল ষ্টেশন, রেশম বীজাগার এখানকার গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে। 'লাক্ষা' চাষ প্রকল্পটি শহরের অদূরেই অবস্থিত। নওয়াবগঞ্জ আম, কাঁসা-পিতল নকসী কাঁথার জন্য বিখ্যাত।

খেতুর :

রাজশাহী থেকে ১৩ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত খেতুর গ্রাম আব্দুলপুর রোহনপুর শাখার একটি রেলওয়ে স্টেশন। এর দুই মাইল দক্ষিণে রাজশাহী-গোদাগাড়ী রাস্তায় প্রেমতলী। এই খেতুর গ্রামেই বাস করতেন বৈষ্ণব সাধু নরোত্তম ঠাকুর। তিনি ছিলেন শ্রী চৈতন্যদেবের শিষ্য

তাঁর পিতা কৃষ্ণচন্দ্র জমিদার ছিলেন। জানা যায় যে নরোত্তম ঠাকুর ১৬ বছর বয়সে গৌতম বুদ্ধের মত সংসার বিবাগী হয়ে বৃন্দাবন চলে যান। শ্রী চৈতন্যের তিরোধানের পর তিনিই তাঁর স্থলাভিসিক্ত হন। জাতিতে কায়স্থ হলেও বহু ব্রাহ্মণ তার শিষ্য হয়েছিলেন। প্রতি বৎসর অক্টোবর মাসে খেতুরে বৈষ্ণব বৈরাগীদের একটি ধর্মীয় মেলার অনুষ্ঠান হয়। এখানে শ্রী চৈতন্যদেব তাঁর স্ত্রী বিষ্ণু প্রিয়া ও শিষ্য নিত্যানন্দের স্বর্ণমূর্তি ছিল।

চাঁপাই :

মহানন্দা নদীর তীরে দাঁড়িয়ে চাঁপাই একটি প্রাচীন গ্রাম। এখানে নবাবী আমলের একটি সুন্দর মসজিদ আছে। এককালে চাঁপাইয়ে পুলিশ স্টেশন ছিল কিন্তু পরে তা গোমস্তাপুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এখানকার পোঃ অফিস ও নওয়াবগঞ্জে স্থানান্তরিত হয়েছে। ১৯০৩ সালে নওয়াবগঞ্জে মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হলে চাঁপাই শ্রীহীনা হয়ে পড়ে। এককালে চাঁপাইয়ে একটি বন্দরও ছিল। বর্তমানে একটি মৃত প্রায় ষ্টিমার ঘাট আছে।

শিবগঞ্জ :

নওয়াবগঞ্জ থেকে ১২ মাইল পশ্চিমে পাগল নদীর তীরে অবস্থিত শিবগঞ্জ একটি প্রাচীন স্থান। এক সময় এখানে একটি মুন্সেফ কোর্ট ছিল। পরে তা নওয়াবগঞ্জে স্থানান্তরিত হয়েছে। এখান থেকে মাত্র ২ মাইল দূরে তরতীপুর পাট কেনাবেচার একটি বিখ্যাত বন্দর ছিল। বর্ষার সময় এখানে ষ্টীমার যাতায়াত করে। এখানে একটি পুলিশ স্টেশন আছে। শিবগঞ্জের রেশমী শাড়ী বহুকাল থেকেই বিখ্যাত। বহু প্রাচীন বিবরণে শিবগঞ্জের উল্লেখ পাওয়া যায়।

দাদনচক :

দাদনচকে 'আদিনা ফজলুল হক কলেজ' উচ্চ বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও বালিকা বিদ্যালয় আছে। সেসব প্রতিষ্ঠান যার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত তিনিই সেই সংগ্রামী পুরুষ মরহম ইদরিস আহমদ। জনাব ইদরিস শেরে বাংলা এ,কে, ফজলুল হকের রাজনৈতিক শিষ্য ছিলেন। এ অঞ্চলে কৃষক শ্রমিক দলকে জনপ্রিয় করার ব্যাপারে তার অবদান অনস্বীকার্য। মনাকষার বিখ্যাত হাট দাদনচকের কাছেই অবস্থিত। মনাকষায় একটি প্রাচীন বনিয়াদী মুসলমান পরিবার আছে। এই পরিবারের কৃতি পুরুষদের মধ্যে মরহম জহর আহমেদ চৌধুরী ডাঃ জিল্লুর আহমেদ চৌধুরী ও মুরতেজা রেজা চৌধুরীর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। বিনোদপুর, মনাকষা ও দাদনচক লাক্ষা শিল্পের বিখ্যাত স্থান।

ভোলাহাট :

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমল থেকেই ভোলাহাট রেশম শিল্পের জন্য বিখ্যাত। এখনও এখানে প্রচুর তুঁতের চাষ হয়। এখানকার প্রাচীন দালান কোঠা গৌড়ের ইটের দ্বারা নির্মিত। ভোলাহাটের পাকা রাস্তাটি খুবই প্রাচীন। এ অঞ্চলের কয়েকটি গ্রামে কিছু আরবী-ফারসী শিলালিপি দেখা যায়। এখানে প্রাচীন মুদ্রা ও কারুকার্য খচিত ইট পাওয়া গিয়েছে। অধুনা কয়েকটি সরকারী অফিস, উচ্চ বিদ্যালয় ও একটি পুলিশ ষ্টেশন রয়েছে।

পোরশা :

নওয়াবগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত এবং রোহনপুর রেল ষ্টেশন থেকে প্রায় ২০ মাইল উত্তরে অবস্থিত পোরশা একটি বিখ্যাত গ্রাম ও পুলিশ ষ্টেশন। অবশ্য পোরশা থানা এখন নীতপুরে

অবস্থিত। পোরশার শাহ পরিবার একটি বিখ্যাত মুসলিম পরিবার। এরা ধনী ও শিক্ষিত। জমিদার না হলেও এরা জোতদার হিসাবে বিশেষ পরিচিত। শাহদের গোলায় সব সময় প্রচুর ধান মজুত থাকে। পোরশার পূর্ব প্রান্তে 'লড়াই ডাঙা'র মাঠ ইংরেজদের সঙ্গে একটি সংঘর্ষের ইতিহাস ও স্মৃতি বহন করছে। পোরশার অধিকাংশ বাড়ীগুলিই খুব মজবুত। খুব সম্ভব নিরাপত্তার জন্যই বাড়ীগুলি এমন ভাবে তৈরী করা হয়েছে। এখানকার দ্বিতল মাদ্রাসা ও মসজিদ পোরশার সৌন্দর্য্য বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। এখানে একটি সিনিয়র মাদ্রাসা, একটি মুসাফির খানা ও একটি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে।

ছোট সোনা মসজিদ :

সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯) গুয়ালী মুহাম্মদ নামে এক ব্যক্তি এই মসজিদটি নির্মাণ করেন বলে জানা যায়। মসজিদটি অপরূপ সৌন্দর্য্য। ইহার গঠন কৌশলে বাংলাদেশের স্থাপত্য শিল্পের ছাপ অতি স্পষ্ট এবং অভ্যন্তর ভাগ আদিনা মসজিদের অনুকরণে তৈরী। মসজিদের শীর্ষদেশে ১৫টি গম্বুজ শোভা পাচ্ছে। মসজিদে মহিলাদের নামাজ পড়ার জন্য একটি আলাদা মাচান আছে। প্রধানতঃ একটি ইষ্টক নির্মিত মসজিদ হলেও এর অংশ বিশেষ প্রস্তর দ্বারা আবৃত। মসজিদের ভেতরের দেয়ালে বৈচিত্রময় লতাপাতার কারুকার্য্য বিদ্যমান। অধ্যাপক ডঃ আবু ইমামের মতে এটিকে সোনা মসজিদ বলা হয় কারণ এর গম্বুজ ও আভ্যন্তরীন অলংকরণ ছিল সোনালী রংয়ের। মসজিদের কাছে দু'টি কবর দেখা যায় কিন্তু কবরগুলি কার তা লেখা নেই। ক্রেইটনের মতে একটি কবর মসজিদ প্রতিষ্ঠাতা ওয়ালী মুহাম্মদের এবং অপরটি তাঁর কোন নিকট আত্মীয়ের। কিন্তু জনশ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে মূলতঃ কবর দু'টি অলীক—মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা এগুলোর ভেতর তাঁর অর্জিত ধন সঞ্চিত রেখেছিলেন।

দারস বাড়ী মসজিদ :

মাহদিপুর এবং ফিরোজপুরের মাঝামাঝি একটি জায়গা দারস্‌বাড়ী নামে পরিচিত। 'দরস্‌' শব্দের অর্থ পাঠ। বহুকাল থেকেই জনসাধরণ এ স্থানটিকে দরস্‌বাড়ী বলে থাকে। এখন অঞ্চলটি একেবারে জনশূন্য। কিন্তু অনুমান করতে বোধহয় দোষ নেই যে একদিন এখানে একটি মাদ্রাসা ছিল। তবেই 'দর্সবাড়ী' বা 'দারসবাড়ী' নামের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায়। ইটের তৈরী এবং পাথরের স্তম্ভ বিশিষ্ট এই দারসবাড়ীর মসজিদ ১৪৭৯ সালে সুলতান শাসুদ্দীন ইউসুফ শাহ নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু মসজিদটির ছাদ এবং আভ্যন্তরীন অনেক কারুকার্য নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ছোট সোনা মসজিদের মত এখানেও পুরমহিলাদের নামাজ পড়ার জন্য উত্তর পশ্চিম কোণে একটি মাচান ছিল। এর পরিচয় পাওয়া যায় একটি মেহরাব থেকে যার অস্তিত্ব এখনও বজায় আছে। এই মসজিদটি মুসলিম বাংলার স্থাপত্যশিল্পের একটি চমৎকার নিদর্শন। মসজিদ সংলগ্ন একটি ধ্বংসস্তুপের ভেতর থেকে মুনশী এলাহী বকস ১৮৭৬ সালে তোগরা অক্ষরে উৎকীর্ণ একটী শিলালিপি আবিষ্কার করেন। এই লিপিটি এখন কলকাতা মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

নওগাঁ :

সান্তাহার রেলওয়ে জংশন থেকে তিন মাইল পশ্চিমে অবস্থিত নওগাঁ রাজশাহী জেলার একটি অন্যতম মহকুমা ও উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট শহর। বন্দর হিসাবেই নওগাঁর সৃষ্টি। ১৭৮২ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একটি রেশম ও নীলকুঠির এখানে প্রতিষ্ঠা হয়। সুলতানগঞ্জ

রেলওয়ে ষ্টেশন (সান্তাহার) স্থাপিত হলে নওগাঁর উন্নতি হতে শুরু করে। বিত্তবান মানুষ, সওদাগর ও ব্যবসায়ীরা আস্তে আস্তে নওগাঁয় আস্তানা গড়ে তোলেন। এর পর নওগাঁতে গাঁজার চাষ শুরু হলে তার নাম সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। নওগাঁর উন্নতির মূলে গাঁজার অবদানকে অস্বীকার করা যায় না। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে গাঁজার অর্থে গড়ে তোলা হয়েছে নওগাঁর সবচেয়ে সুন্দর মসজিদটি।

১৮৭৭ সালে নওগাঁকে মহকুমা শহরে উন্নীত করা হয়। ১৮৮৪ সালে নওগাঁর প্রথম উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। তদানীন্তন এস, ডি, ও সাহেবের সহায়তায় বিদ্যালয়টি স্থাপন করা হয়েছিল বলে তার নাম (বাবু কৃষ্ণধন) অনুসারে বিদ্যালয়টি কে, ডি, হাই স্কুল নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। বাবু সতীশচন্দ্র কুণ্ডু এখানে বহুদিন ধরে প্রধান শিক্ষকের কাজ করেছেন। অধ্যাপক-রাজনীতিবিদ হুমায়ুন কবির এখান থেকেই ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯১০ সালে শ্রী প্যারী মোহন সান্নাল প্রথমে নওগাঁর 'পারীমোহন লাইব্রেরী' স্থাপন করেন। এখানে বেশ কিছু প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ আছে। ১৯২১ সালে 'গাঁজা সোসাইটি'র অর্থে গড়ে উঠে 'কো অপারেটিভ ক্লাব' ও 'কো অপারেটিভ লাইব্রেরী'। অবশ্য ১৯৫৮ সাল থেকে উক্ত লাইব্রেরী একটি সাধারণ গ্রন্থাগারে রূপ নিয়েছে। এখানে বেশ কয়েকটি স্কুল, কলেজ রয়েছে।

দুবলহাটি :

দুবলহাটি গ্রাম নওগাঁ থেকে ৫ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। দুবলহাটির রাজ পরিবার রাজশাহী জেলার প্রাচীন পরিবারের অন্যতম। এঁদের বিরাট রাজপ্রাসাদ এ গ্রামেই অবস্থিত। দুবলহাটির রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা জগৎ রামরায়। বর্তমানে দুবলহাটীতে একটি উচ্চ বিদ্যালয়, একটি পোঃ অফিস ও একটি দাতব্য চিকিৎসালয বিদ্যমান আছে। দুবলহাটির রাজপাসাদটি এখন ভগ্নপ্রায় অবস্থায় বিরাজ করছে।

কাশিমপুর :

রানীনগর রেলওয়ে স্টেশন থেকে ৩ মাইল পশ্চিমে কাশিমপুর গ্রাম অবস্থিত। এখানে লাহিড়ী জমিদার পরিবার বাস করতেন। বাবু রাম কিশোর লাহিড়ী এ বংশের প্রথম পুরুষ। তাঁর পুত্র বাবু কাশীশংকর লাহিড়ী। এ বংশের তৃতীয় পুরুষ রায় বাহাদুর গিরীশচন্দ্র লাহিড়ী একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। তিনি দানশীল এবং প্রজাবৎসল জমিদার ছিলেন।

বলিহার :

নওগাঁ থেকে ১১ মাইল পশ্চিমে বলিহার অবস্থিত। এখানে বাস করতেন বলিহার রাজ পরিবার। বাবু প্রাণকৃষ্ণের উত্তর পুরুষরা বলিহার রাজ পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর প্রপৌত্র রাজেন্দ্র রায় নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণের মেয়েকে বিয়ে করে প্রচুর ধন সম্পত্তি লাভ করেছিলেন। রাজা কৃষ্ণেন্দ্র রায় শিব প্রসাদ রায়ের দত্তকপুত্র ছিলেন। যৌবনে উচ্ছৃংখল জীবন যাপন করে পরে বিশেষভাবে অনুতপ্ত হন। তাঁর রচিত কয়েকটি গ্রন্থের মধ্যে 'স্বভাবনীতি' উল্লেখযোগ্য। তিনি রাজবাড়ীতে একটি গোলাপফুলের বাগান তৈরী করেছিলেন।

মহাদেবপুর :

নওগাঁ শহর থেকে ১৩ মাইল উত্তর পশ্চিমে মহাদেবপুর অবস্থিত। এখানে একটি পুলিশ ষ্টেশন আছে। মহাদেবপুর থানার অদূরে রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখতে পাওয়া যায়। কথিত আছে যে মহাদেবপুর জমিদার পরিবার দিল্লীর বাদশাহের অধীনে স্থানীয় পরগণা

জাহাঙ্গীরপুরের মনসবদার ছিলেন। কোন এক যুদ্ধে মোগল বাদশাহের পক্ষে যুদ্ধ করে জয়লাভ করেছিলেন এরা।

বদলগাছি :

কাটা যমুনার তীরে অবস্থিত বদলগাছি একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে একটি পুলিশ ষ্টেশন আছে। আক্কেলপুর স্টেশন থেকে ৭ মাইল পশ্চিমে এবং নওগাঁ থেকে ১০ মাইল উত্তর পশ্চিমে বদলগাছিতে সাবুদ শাহ্ নামে এক দরবেশের মাজার আছে। অষ্টদশ শতকে এটা দিনাজপুরের অন্তর্গত, ১৮২৯ সালে বগুড়ার এবং ১৮৯৭ সালে রাজশাহী জেলার অধীনে আসে। মার্টিনের মতে, এখানকার জঙ্গলে এক প্রকার গাছ পাওয়া যেত যা থেকে চিনি তৈরী হত। আর এ থেকেই নাকি এর নাম 'বদলগাছি' হয়েছে। এখানে একটি উচ্চ বিদ্যালয় ও একটি বালিকা বিদ্যালয় আছে। এখানে একটি পোঃ অফিসও আছে।

কুশুম্বা :

নওগাঁ মহকুমার অধীন মান্দা থানার ৩ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত এই প্রাচীন গ্রামটি। এখানেই একটি সুন্দর পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই বিখ্যাত কুশুম্বা মসজিদ। রাজশাহী জেলার মধ্যে সবচেয়ে পুরাতন ও সুন্দর এ মসজিদটি ইষ্টক নির্মিত কিন্তু উপরে পাথরের আবরণ। এখানে যে দু'টি শিলালিপি আছে তার একটির বয়ান অনুসারে মসজিদটি নির্মিত হয় ১৫৫৮ সালে জনৈক সোলায়মান কর্তৃক সুলতান দ্বিতীয় গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহের আমলে আর দ্বিতীয়টির বয়ান অনুসারে (তারিখ ১৫০৩ সাল) মসজিদটি নির্মিত হয়েছে সুলতান হুসেন শাহের আমলে (১৪৯৩—১৫১৯)। টেরাকোট্টার সুক্ষ্ম কারুকার্য্য বিশিষ্ট পাথরের তৈরী এ মসজিদের ভেতরে লতাপাতাও ফুলের বিচিত্র শিল্প সম্ভার এটাকে একটি বিশিষ্ট স্থান দিয়েছে। এর সৌন্দর্য্য আজও অম্লান আছে।

কুশম্বা মসজিদের মাত্র ২০০ গজ দূরে আর একটি ভগ্নপ্রায় মসজিদ দেখা যায়। জনশ্রুতি অনুসারে সোনাবিবি এর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সোনা বিবিকে কেউ সোলায়মান অথবা সবরখানের স্ত্রী বলে উল্লেখ করেছেন। এর পাশেই একটি মজে যাওয়া প্রাচীন দীঘি আছে যা সোনারদীঘি নামে পরিচিত।

পাহাড়পুর

জামালগঞ্জ স্টেশন থেকে ৩ মাইল পশ্চিমে রাজশাহী জেলার অন্তর্গত পাল যুগের সভ্যতা ও কৃষ্টির পরিচায়ক সোমপুর বিহার অবস্থিত। অষ্টম শতক থেকে দ্বাদশ শতকের উপমহাদেশের সব চেয়ে বড় বৌদ্ধ বিহারের পরিচয় ও ধ্বংসাবশেষ এই সোমপুর বিহার। প্রকৃতপক্ষে পাহাড়পুর কিন্তু আধুনিক নাম। দূর থেকে এ স্থানটিকে পাহাড়ের মত দেখায় বলেই এর পাহাড়পুর নাম দেওয়া হয়েছে। এখানে প্রাপ্ত মাটির 'সীল' থেকে নিশ্চিত প্রমাণ মিলেছে যে পাহাড়পুরই ধর্মপাল প্রতিষ্ঠিত বিশাল সোমপুর বিহার। এর পাশেই ওমপুর নামে একটি গ্রামের অবস্থান বর্তান সিদ্ধান্তকে সন্দেহাতীত ভাবে জোরদার করেছে।

আত্রাই

আত্রাই নদীর তীরে অবস্থিত একটি প্রাচীন ব্যবসা কেন্দ্র। এখানে একটি পুলিশ স্টেশন ও রেলওয়ে স্টেশন আছে। রেলওয়ে স্টেশনটি আগে 'আতাই ঘাট' নামে পরিচিত ছিল।

আত্রাইয়ের পাশেই আহসানগঞ্জ একটি বিখ্যাত গ্রাম। এখানকার মোল্লা পরিবার উল্লেখযোগ্য। কৃতিপুরুষদের মধ্যে মরহুম আহসান মোল্লা, মোসলেম আলী মোল্লা ও আবুল কালাম আজাদ মোল্লার নাম করা যেতে পারে। জনাব আহসান মোল্লা ছিলেন পাট ব্যবসায়ী এবং আত্রাইয়ে প্রতিষ্ঠিত 'র‍্যালী ব্রাদার্স কোম্পানীর তিনি ছিলেন একজন প্রতিনিধি। মরহুম মোসলেম আলী মোল্লা ছিলেন রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ী। এ দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর অবদান অস্বীকার করা যায় না। তাছাড়া তিনি ছিলেন পরোপকারী ও দাতা। মরহুম আবুল কালাম আজাদ পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য ছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টাতেই আত্রাইঘাট রেলওয়ে স্টেশনটি আহসানগঞ্জে রূপান্তরিত হয়। এখনকার আজাদ মেমোরিয়াল কলেজ তাঁরই স্মৃতি বহন করছে। আহসানগঞ্জের হাটটি একটি বিখ্যাত ব্যবসা কেন্দ্র।

আহসানগঞ্জ থেকে ৭ মাইল দক্ষিণ পূর্বে নাগর নদীর তীরে অবস্থিত একটি সাধারণ গ্রাম পরিসর। কিন্তু বর্ষায় এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আকর্ষনীয়। তাই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতি বর্ষায় একবার করে আসতেন এ গ্রামে। এখানে বসেই তিনি রচনা করতেন কবিতা, গান ও কাব্য। 'কল্পনা' কাব্যের অনেক কবিতাই পতিসরে বসে লেখা। পতিসরে 'ঠাকুর এস্টেটের' একটি বিরাট কাচারী ছিল। এখানকার পুকুর, ফুলের বাগান ও ইমারত ছিল মশহুর। কবিপুত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে একটি উচ্চ বিদ্যালয় এখনও বিদ্যামান। পতিসর থেকে মাত্র ৩ মাইল উত্তর পূর্বে অবস্থিত আর একটি ছোট্ট গ্রাম নাম করচমারিয়া। এখানেই জন্মগ্রহণ করেন উপমহাদেশের একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক আচার্য যদুনাথ সরকার।

তথ্য নির্দেশনা :

০১. Rajshahi Gazetteer

০২. Rajas of Rajshahi, Calcutta Review, 1873

০৩. Bengal-past and present, 1923

০৪. Statistical accounts of Bengal- W W Hunter,

০৫. The Rajshahi College Magazine, Feb, 1934

০৬. Memoirs of Gaur and Pandua
Khan Shaheb Abid Ali Khan

০৭. Reactions and Reconcilement- Mr Abu Hena.

০৮. Inscriptions of Bengal-
Moulvi Shamsuddin Ahmed

০৯. রাজশাহীর ইতিহাস (১ম ও ২য় খণ্ড) কাজী মোহাম্মদ মিছের।

১০. বরেন্দ্রী— ড. আবু ইমাম।

১১. Imperial Gazetteer of India, Provincial Series, Bengal

১২. The Ancient Monuments of Vorendra

রাজশাহীর শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

মুরাদুজ্জামান

হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগে দেশের অন্যান্য স্থানের মতো রাজশাহীতে বৌদ্ধ মঠ ও ব্রাহ্মণ্য মতবাদ প্রচার উদ্দেশ্যে কোন বিদ্যালয় ছিল কিনা তা ব্যাপক অনুসন্ধান সাপেক্ষ। তবে নওগাঁ মহকুমার পাহাড়পুরে অবস্থিত বৌদ্ধ মঠ ও মন্দিরে নিদর্শন পাওয়া যায়। উইলিয়ম এডামের শিক্ষা জরীপ কর্ম থেকে রাজশাহী জেলার নাটোর থানার শিক্ষা সম্পর্কে কিছুটা তথ্য পাওয়া যায়। ইংরেজ আমলের পূর্বে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বিশেষ উৎকর্ষতা পরিলক্ষিত না হলেও শিক্ষার প্রতি যে মানুষের অনুরাগ ছিল তা নাটোরের ধরাইল গ্রামস্থ পারিবারিক উদ্দ্যোগে স্কুল পরিচালনার দৃষ্টান্ত থেকে অনুমান করা যায়।

ম্যাক্স মুলার কিম্বা এডামের সূত্র মোতাবেক জানা যায় যে বাংলাদেশের আশি হাজার বা একলক্ষ স্কুল-টোল-মাদ্রাসা দেশের সর্বত্রই কম বেশী বিদ্যমান ছিল। রাজশাহী জেলাতেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল বলে আমরা ধরে নিতে পারি। এ সম্পর্কে রাজশাহীর দরগাপাড়া ও হেতেম খাঁ মসজিদে কোরান স্কুলের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। এ ছাড়া নওগাঁ 'ফাসী পাড়া'গ্রামটির কথাও মনে আসা স্বাভাবিক।

১৮৫৪ খ্রীঃ উড ডিস্‌পাসের সুপরিশ অনুসারে 'গ্রান্ট ইন এইড্' প্রথা চালু হওয়ায় এদেশে অনেক গুলি প্রাথিমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। তবে ছাত্রদের নিকট থেকে বেতন আদায় করায় দরিদ্র অভিভাবকগণ শিক্ষা বিষয়ে নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে। ১৮৫৫ খ্রীঃ ইংরেজ সরকার পূর্ব বঙ্গের কয়েকটি জেলায় সার্কেল পদ্ধতি চালু করেন। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি সর্কেল গঠিত হয় এবং পনরো টাক বেতনে নিযুক্ত প্রতি সার্কেলে একজন করে সরকারী শিক্ষক সার্কেলের গুরুদেবকে শিক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতেন। ১৮৫৮ সালের দিকে পূর্ব বঙ্গে প্রায় ষাটটি বিদ্যালয় সার্কেল পদ্ধতিতে চালু ছিল। সম্ভবত এই ব্যবস্থায় রাজশাহী জেলার পত্নীতলা একটি সার্কেল হিসেবে গণ্য হতো। সার্কেল প্রথায় প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের পাশাপাশি নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রচলন করা হয়। রাজশাহী শহরের বুয়ালিয়াতে ১৮৬৫ সালে গুরুট্রেনিং স্কুল স্থাপিত হয় এবং দেখাদেখি ১৮৬৯ সালে একটি ফ্যামেল নর্মাল স্কুল বালিকা পাঠশালার শিক্ষয়িত্রীদের ট্রেনিং এর জন্য স্থাপিত হয়েছিল। বালকদের জন্য গুরু ট্রেনিং স্কুলটি প্রথম শ্রেণীর নর্মাল স্কুলে পরিণত হয়। এই স্কুলটি স্থানান্তরিত হয়ে পরে রংপুর চলে যায়।

রাজশাহীতে প্রাথমিক শিক্ষা :

ভারত বিভাগের পরও এদেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রচলিত রীতিই মেনে চলতে হয়। রাজশাহীর প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাস সন্ধান করলে দেখা যায়—১৯৪৫ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর মাসে ডিষ্ট্রিক স্কুল বোর্ড গঠন করা হয়। ২-৮-১৯৪৭ সালে বোর্ডের সাব কমিটির এক বৈঠক বসে। সাব ডিভিশনাল এডুকেশন কমিটির রিপোর্ট এবং নতুন প্রকল্পের উপর নির্ভর করে সাব কমিটি সরকারের মঞ্জুরীর ভিত্তিতে জেলায় ৮৮২টি স্কুল স্থাপনের সুপারিশ করেন। পূর্ব্ববর্তী এই প্রকল্পে এই সংখ্যা ছিল ১২১০টি কিন্তু পরবর্তী নতুন প্রকল্পের সহিত অতিরিক্ত স্কুল যোগ হওয়ায়

প্রাথমিক স্কুলগুলির সংখ্যা দাঁড়ায় ১২২৬টি। স্কুল বোর্ড স্থাপনের পর কিছু সংখ্যক স্কুল উচ্চতর স্কুলে রূপান্তরিত হওয়ায় এই সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য ১৯৪৬ সালে মূল বাজেট ছিল তিন লক্ষ সাতানব্বই হাজার চার শত চার টাকা। তন্মধ্যে এই খাতে ব্যয় বাদে পয়ষট্টি হাজার একশত এক টাকা উদ্বৃত্ত ছিল। রাজশাহী জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো সংখ্যার ভিত্তিতে বন্টনের জন্য ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারীতে সাবকমিটির এক বৈঠক বসে। মৌলভী মোবারক আলী খানের সভাপতিত্বে এই সভায় ১৩০০ ফ্রি প্রাইমারী স্কুল থানা সমূহের মধ্যে বন্টন করা হয়।

নিম্নে ১৯৫০ সালে মহকুমা ও থানা ভিত্তিক প্রাথমিক বিদ্যালয় সমুহের তালিকা দেখানো হলো :

মহকুমা	সংখ্যা	মহকুমা	সংখ্যা	মহকুমা	সংখ্যা	মহকুমা	সংখ্যা
রাজশাহী সদর	৩২৮	নাটোর	২৫৩	নওগাঁ	৩৫৩	নবাবগঞ্জ	২১০
বুয়ালিয়া	৫	নাটোর	৫৩	নওগাঁ	১১	নবাবগঞ্জ	৬১
পবা	৪৪	বাগাতিপাড়া	১৭	বদলগাছি	১১১	শিবগঞ্জ	৭০
চারঘাট	৫২	গুরুদাসপুর	৭৪	রাণীনগর	৩২	ভোলাহাট	১৫
বাগমারা	৬৭	লালপুর	৩১	নিয়ামতপুর	৫১	নাচোল	২৭
পুঠিয়া	৩১	সিংড়া	৭৮	মহাদেবপুর	৫৩	গোমস্তাপুর	৩৭
তানোর	৩৪			আত্রাই	৩৯		
মোহনপুর	২৪						
গোদাগাড়ী	৪৪						
পত্নীতলা সার্কেল	১৫৬	পত্নীতলা	৫৩	ধামোইরহাট	৪৯	পোরশা	৬২

১৯৫০ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত রাজশাহী জেলায় প্রাথমিক শিক্ষার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছিল কিনা তা বিচার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। তবে ১৯৬৭ সালের পূর্ব পাকিস্তান সরকারের ডি.পি. আই এর নিকট রাজশাহী জেলা শিক্ষা অফিসার কর্তৃক দাখিলকৃত একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায় এ সময় রাজশাহী জেলায় সর্বমোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১,৫৮৪টি। তার মধ্যে ১০৮টি ছিল বালিকা বিদ্যালয়। ১৭ বছরে বিদ্যালয় বৃদ্ধির সংখ্যা ২৬৪টি। ১৯৬৯-'৭০ সালে রাজশাহী জেলার লোক সংখ্যা ছিল ২৮,১০,৯৬৪ জন। ৬-১১ বছর বয়স পর্যন্ত স্কুলে যেতে পারে এমন শিশুর সংখ্যা ছিল ৩,৬১০০০ জন। এ সময় ৬৬৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন পরিকল্পনাধীন আনা হয়। বিদ্যালয়ে শিশু হাজিরা ৬৭.৭১ এবং ছাত্র ওশিক্ষক সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২,৬২৮৮৬ ও ৫৮০২ জন। পৌর বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬৯টি এবং মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৬০১টি। পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় ৩ বছরে ৩৭টি বিদ্যালয় বৃদ্ধি পায়।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭২ সালে রাজশাহী জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬৫২টি। এ সময় সর্বমোট ছাত্র সংখ্য ছিল, ২,৪০,৪৩৬ জন এবং শিক্ষক সংখ্যা ছিল ৬,২৯৩ জন। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ সরকার সমগ্র দেশে ৬৫০৯টি নতুন বিদ্যালয় মঞ্জুর করেন। এর মধ্যে রাজশাহী জেলার জন্য ৩৪৮টি বিদ্যালয় বরাদ্দ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষানীতি অনুসারে এ সময় পূর্বের প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনার পদ্ধতির আমূল

পরিবর্তন ঘটে। দেশের সমুদয় প্রথমিক বিদ্যালয়কে সরকারী বলে ঘোষণা করা হয়। এ সময় রাজশাহী জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা দু'হাজারে বৃদ্ধি পায়। শিক্ষক সংখ্যা ৮৬২৬ জন। এ সময় রাজশাহী জেলায় কিছু অতিরিক্ত স্কুল স্থাপন করার দরুণ অতিরিক্ত শিক্ষকও নিয়োগ করা হয়। ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত রাজশাহী জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা সর্বমোট ২০৪৪টিতে উন্নত হয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব সরকার স্বহস্তে গ্রহণ করলেও রাজশাহী জেলায় স্থানীয় উদ্যোগে কিছু সংখ্যক বিদ্যালয় গ'ড়ে উঠেছে। বেসরকারী উদ্যোগে স্থাপিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৮৮টি।

১৯৭৮ সালের মহকুমা ও থানা ভিত্তিক প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহেব তালিকা দেখান হলো :

মহকুমা	সংখ্যা	মহকুমা	সংখ্যা	মহকুমা	সংখ্যা	মহকুমা	সংখ্যা
বাজশাহী সদর	৫৩৩	নাটোর	৩৯৩	নওগাঁ	৬৮৯	নবাবগঞ্জ	৪২৯
বোয়ালিয়া	৩০	নাটোর	৯১	নওগাঁ	১০৩	নবাবগঞ্জ	১২৪
পবা	৭১	সিংড়া	১০৮	মহাদেবপুব	৮২	শিবগঞ্জ	১১৮
পুঠিয়া	৪৯			মান্দা	৯৭		
চারঘাট	৮১	লালপুর	৬০	নিয়ামতপুর	৭০	ভোলাহাট	২০
বাঘমারা	৯৮	বড়াইগ্রাম	৫৭	পত্নীতলা	৭৮	গোমস্তাপুর	৫২
গোদাগাড়ী	৭৩	গুরুদাসপুর	৪৭	বদলগাছি	৭৩	নাচোল	৩৬
তানোর	৪৭			খামোইরহাট	৬১		
মোহনপুর	৪৪	বাগাতীপাড়া	৩০	রাণীনগর	৫৮	পোবশা	৭৯
দুর্গাপুর	৪৩			আত্রাই	৬৭		

রাজশাহীতে উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন

দেশ বিভাগের পূর্বে রাজশাহীর শিক্ষাক্ষেত্রে রাজশাহীর রাজা-জমিদারদের মধ্যে দিঘাপতিয়ার রাজাদের অবদান সর্বজন বিদিত। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্যান্য জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান ব্যাপারেও উক্ত রাজাদের দান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করতে হয়। নাটোর রাজবংশ, পুঠিয়ার রাণী ও দুবলহাটির জমিদারদের শিক্ষা বিভাগের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। এ ছাড়া রাজশাহীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু জমিদার ও ভূপতিগণ স্থানীয়ভাবে শিক্ষা সম্প্রসারণ ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। প্রথম দিকে মুসলমানগণ শিক্ষাদীক্ষায় পিছিয়ে থাকলেও পরিবর্তীত পরিস্থিতির সাথে তাল মিলিয়ে তারাও অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। আধুনিক যুগের শুরু অর্থাৎ ১৮০৯ সাল থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত এই একশ বছরে রাজশাহী জেলায় মাত্র ৮টি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। স্বাধীন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চ শিক্ষা তথা আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের জোয়ার প্রবাহ শুরু হয়। বলা বাহুল্য এই ৮টি উচ্চ বিদ্যালয়ই হিন্দু জমিদার ও রাজাদের মহৎ প্রচেষ্টা ও অর্থানুকুল্যে স্থাপিত হয়েছিল। এই বিদ্যালয় গুলি হলো ঃ রাজশাহী কলেজিয়েট হাই স্কুল (১৮২৮/৩৬) দিঘাপতিয়া হাই স্কুল) ১৮৫২), দুবলহাটি হাই স্কুল (১৮৬৪), পুঠিয়া পি.এন. হাই স্কুল (১৮৬৫), নাটোর মহারাজা হাই স্কুল (১৮৮৪), রাজশাহী পি.এন. গালর্স হাই স্কুল (১৮৮৬), নগর কুসুম্বী হাই স্কুল, (নওগাঁ, ১৮৯২), 'হরিমোহন ইনসটিটিউট' (নবাবগঞ্জ

১৮৯৫) ও বি.বি. এইচ একাডেমী (১৮৯৮)।

১৯০০—১৯৪৭ সাল অর্থাৎ প্রায় অর্ধ শতাব্দী কালের ব্যবধানে রাজশাহী জেলার সর্বত্র ৮৫টি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। এ সময়ের উচ্চ বিদ্যালয় গুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন বিদ্যালয় হলো ঃ নওগাঁ, পি, এম গালর্স হাই স্কুল (১৯০৯ সালের স্থাপিত)। বিশ শতকের গোড়ার দিকে অর্থাৎ ১৯০১-১৯২৬ সালের মধ্যে রাজশাহী জেলায় ২৬টি বিদ্যালয় গ'ড়ে উঠে। তন্মধ্যে সদর মহকুমায় ৫টি। এগুলো হলো ঃ বাঘমারা হাই স্কুল (১৯৯৭), লোকনাথ হাই স্কুল (১৯২৯), আড়ানী হাই স্কুল (১৯২৬), বিনসেয়ার হাই স্কুল (১৯২৬) ও বিরকুৎসা হাই স্কুল (১৯২৬)। একই সময়ে নওগাঁ মহকুমায় ১৫টি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাধিক্যে নওগাঁর অবস্থান যে শীর্ষে ছিল তা বেশ অনুমান করা যায়। বলতে গেলে নওগাঁ শিক্ষাক্ষেত্রে জেলার অন্যান্য অংশ থেকে অনেকটা অগ্রগামী ছিল। নিম্নে নওগাঁর উল্লিখিত সময়ের বিদ্যালয় গলির নাম ও প্রতিষ্ঠাকাল উল্লেখ করা হলো :

ক্রমিক নং	বিদ্যালয়ের নাম	থানা	প্রতিষ্ঠাকাল
১	পি,এম,গালর্স হাই স্কুল	নওগাঁ	১৯০৯
২	কামতা হাই স্কুল	রাণীনগর	১৯১৩
৩	রাতোয়াল আর এন হাই স্কুল	"	"
৪	বালুভরা হাই স্কুল	বদলগাছি	১৯১৪
৫	চকাতিথা হাই স্কুল	নওগাঁ সদর	"
৬	ইউনাইটেড হাই স্কুল	"	১৯১৭
৭	চাকলা হাই স্কুল	"	১৯২১
৮	ভিমপুর হাই স্কুল	"	"
৯	মহাদেবপুর এম,এম হাই স্কুল	মহাদেবপুর	"
১০	কীর্তিপুর হাই স্কুল	নওগাঁ সদর	১৯২২
১১	আশানগঞ্জ হাই স্কুল	আত্রাই	১৯২৬
১২	সেন্ট্রাল গার্লস হাই স্কুল	নওগাঁ সদর	"
১৩	জাতি গাম হাই স্কুল	বদলগাছি	"
১৪	মঙ্গলবাড়ী হাই স্কুল	ধামোইর হাট	১৯১৭
১৫	হামিদপুর	মহাদেবপুর	১৯২০

এ সময়ে স্থাপিত নাটোর মহকুমার ৫টি বিদ্যালয় হলো চৌগ্রাম (১৯১২), চামারী (১৯২১), কলম (১৯২৪), মীর্জাপুর দীঘা (১৯২৬) ও পাঁচ বাড়ীয়া হাই স্কুল (১৯১১)। স্থানীয় জমিদারদের দ্বারা বিদ্যালয় গুলির গোড়াপত্তন হয়েছিল। নবাবগঞ্জের ভোলাহাট হাই স্কুল (১৯১৭) ও কানসাট হাই স্কুল ১৯১৯ সালে স্থাপিত হয়েছিল।

১৯২৬ সালের পর ভারত বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত রাজশাহী সদর মহকুমায় মাত্র ১১টি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই বিদ্যালয় হলো ঃ সরদা পাইলট হাই স্কুল (১৯২৯), চারঘাট থানার ইউসুফপুর (১৯৩০) ও মীরগঞ্জ হাই স্কুল (১৯৪৭), তনোর থানার সরোজয় (১৯৪২) ও

তালান্দ হাই স্কুল (১৯৩৭), বাঘমারা থানার মহনগঞ্জ (১৯৪৭), বড়বিহানালী (১৯৪২) ও হাট গঞ্জপুর হাই স্কুল (১৯৪৫), দুর্গাপুর থানার দাউদকান্দী হাই স্কুল (১৯৪১), পবা থানার দামকুড়া হাট হাইস্কুল (১৯৪৭) ও বুয়ালিয়া থানার মুসলিম হাই স্কুল (১৯৪৭)।

১৯৪৭ সালের পর সুদীর্ঘ দুই যুগের ব্যবধানে রাজশাহী সদর মহকুমায় সর্বাধিক ৭২টি উচ্চ বিদ্যালয় সম্পূর্ণ বেসরকারী উদোগে গড়ে উঠে। রাজশাহী জেলার ৭টি সরকারী বালক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৪টি বিদ্যালয়ই জেলা সদর রাজশাহী শহরে অবস্থিত। বিদ্যালয় ৪টি হলো ঃ রাজশাহী কলেজিয়েট হাই স্কুল (১৮২৮—১৮৩৬) রাজশাহী সরকারী মাদ্রসা (১৯৭৪) রাজশাহী ল্যাবরেটরী হাই স্কুল (১৯৬৬) ও সিরোইল গভর্ণমেন্ট হাই স্কুল (১৯৬৬)। রাজমাহী সদর মহকুমায় বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৪টি। তন্মধ্যে রাজশাহী শহরে ৮টি এবং অপর ৫টি বালিকা বিদ্যালয় গোদাগাড়ী, চারঘাট ও পুঠিয়া থানায় অবস্থিত। বালিকা বিদ্যালয়গুলির মধ্যে শহরের দু'টি বিদ্যালয় সরকার পরিচালনাধীন। তার একটি পি.এন.গার্লস হাই স্কুল অপরটি হেলেনাবাদ সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় (১৯৬৭)।

নওগাঁ মহকুমার ৩টি থানা নিয়ামতপুর, পত্নীতলা ও মান্দা থানায় বিশ শতকের প্রথম ভাগে এমনকি তৃতীয় দশকেও কোন হাই স্কুল স্থাপনের খবর পাওয়া যায় না। এ থেকে ধারনা হয় যে শিক্ষা ক্ষেত্রে এলাকাবাসী অনেকটা পিছিয়ে ছিল। নিয়ামতপুর থানার প্রথম হাই স্কুল স্থাপিত হয় ১৯৪২ সালে 'বীর জোয়ান হাই স্কুল'। পত্নীতলা থানার প্রথম হাই স্কুল 'নজিপুর হাই স্কুল' ১৯৩১ সালে এবং ১৯৩৭ সালে স্থাপিত হয় মান্দা থানার 'ফতেপুর হাই স্কুল'। এর পর ভারত বিভাগের পূর্বে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত নওগাঁয় আরো ৩২টি উইবদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। পাকিস্তান শাসনের ২৪ বছরে নওগাঁয় ৮৬টি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর অতিরিক্ত ৮টি বিদ্যালয় স্থাপনের পরিচয় পাওয়া যায়। নওগাঁ মহকুমায় বালিকা বিদ্যায়ের সংখ্যা ৪টি। বিশ শতকের প্রথম দিকে ১৯০৯ সালে নওগাঁ পি.এম গালর্স হাই স্কুল ও ১৯২৬ সালে নওগাঁ সেন্ট্রাল গালর্স হাই স্কুল স্থাপিত হবার দুদীর্ঘ কালের ব্যবধানে ১৯৬৮ সালে সদর থানার মারচুলা গালর্স হাই স্কুল ও ১৯৭০ সালে পত্নীতলা থানার নাজিরপুর গালর্স হাই স্কুল স্থাপিত হয়।

সঠিক তথানুসন্ধান ব্যতীত বর্তমান শিক্ষাক্ষেত্রে নওগাঁর অগ্রগতি সম্পর্কে মন্তব্য যথার্থ হবেনা। তবে এ সম্পর্কে ১৯১৮ ও ১৯৭৪ সালের একটি তথ্য পরিবেশন করা যেতে পারে। ১৯১৮ সালে হিন্দু মুসলমান মিলে নওগাঁ মহকুমায় গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা ছিল মাত্র ৮ জন। ১৯৭৪ সালে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর মিলে দুই হাজার শিক্ষিত লোক ছিল। এ সময় পি,এইচ, ডি ডিগ্রী প্রাপ্ত লোকের সংখ্যা ছিল ৮ জন। শুধু স্নাতকোত্তর ছিল চারশ জন।

নবাবগঞ্জ শিক্ষাক্ষেত্রে মালদহ জেলার অংশ হিসাবে কিছুটা উন্নত ছিল। মালদহ জেলার অংশ হিসেবে নবাবগঞ্জের অধিবাসীরা ছিল গোঁড়া মুসলমান। আরবী ফারসী শিক্ষা ছাড়া ইংরেজী শিক্ষার প্রতি তাঁদের তেমন আকর্ষণ ছিলনা। ১৯৭২ সালের পূর্বে এই মহকুমায় কোন ইংরেজী স্কুল ছিলনা বললেই চলে। 'জর্জ ক্যাম্বেলে'র পরিকল্পনা অনুসারে প্রদেশের অন্যান্য স্থানের মতো নবাবগঞ্জেও একটি এম.ই স্কুল স্থাপন করা হয়। মহকুমার মধ্যে এটাই সবচেয়ে পুরাতন স্কুল। পরবর্তীকালে 'আলীনগর' ও 'শিবগঞ্জে' জেলাবোর্ডর অধীন দু'টি এম,ই স্কুল স্থাপন করা হয়েছিল।

নবাবগঞ্জ রাজশাহী জেলার অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা শিক্ষাক্ষেত্রে বেশ কিছুটা পিছিয়ে ছিল। এ সময়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতা থেকে তা অনুমান করা যায়। ১৮০১-১৯০০ সালের

মধ্যে দীর্ঘ এক শতাব্দী ধরে নবাবগঞ্জে মাত্র একটি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল[৭]। পরবর্তী অর্ধ শতাব্দী কালের ব্যবধানে অর্থাৎ ভারত বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত মহকুমায় ৬টি হাই স্কুল, ২টি সিনিয়র মাদ্রাসা, ৯টি জুনিয়র হাই স্কুল, ১৩টি এম-ই স্কুল এবং ৯১টি পাঠশালা ও ২১টি মক্তব ছিল। এসময় দদনচকে একটি কলেজ ১টি টেকনিক্যাল স্কুল ও একটি গুরু ট্রেনিং স্কুল ছিল। ভারত বিভাগের পর শিক্ষা ক্ষেত্র পশ্চাৎপদ নবাবগঞ্জ বাসী আধুনিক শিক্ষা জগতের সহিত দ্রুত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন। এসময় অধিবাসীদের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবল ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। বিভাগ পূর্বকালে যেখানে মাত্র ৬টি উচ্চ বিদ্যালয় ছিল বিভাগোত্তর কালে এসে আমরা দেখছি স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি বর্গের প্রচেষ্টায় মহকুমার বিভিন্ন স্থানে ৫০টি বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর বর্তমান পর্যন্ত নবাবগঞ্জে অতিরিক্ত ২৮টি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। এ সময় জেলার অন্য কোন অঞ্চলে নবাবগঞ্জের মতো এত অধিক সংখ্যা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়নি। অন্যান্য মহকুমার সহিত শিক্ষাক্ষেত্রে নবাবগঞ্জের পার্থক্য এখানেই। শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রাগ্রসরতা সত্ত্বেও ১৯৬১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট অনুসারে নবাবগঞ্জ জেলার অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা পিছিয়ে ছিল। এসময় নবাবগঞ্জের মোট জন সংখ্যা ছিল ৬২৬১৮৮ জন এবং শিক্ষার হার ছিল ১৪.১। রাজশাহী জেলার অন্যান্য অঞ্চলের সহিত এ সময়ে একটি তুলনা মুলক খতিয়ান দেখান হলো :

এলাকা	মোট জনসংখ্যা	শিক্ষার হার পুরুষ/মহিলা	মোট শিক্ষার হার	স্থান
রাজশাহী সদর	৭,২৮,৩৭২	২৪.৪ ৭.৭	১৬.৫	২
নাটোব	৫,৬৫,৮৪৭	২০.৭ ৮.৩	১৫.২	৩
নওগাঁ	৯,১০,৫৫৭	৩১.১ ৮.৮	২০.২	১
নবাবগঞ্জ	৬,২৬,১৮৮	২০.৮ ৭.৩	১৪.১	৪

১৯৫১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট অনুসারে নবাবগঞ্জের শিক্ষার হার ছিল মাত্র ৭.২৩। '৬১ সালের সেন্সাস অনুসারে শিক্ষার হার প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে নবাবগঞ্জ জেলার অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা অধিক অগ্রগামী। শিবগঞ্জ থানার দাদন চকে আদিনা ফজলুল হক কলেজ স্থাপিত হবার পর নবাবগঞ্জবাসীর জন্য উচ্চ শিক্ষার দ্বার অনেকটা উন্মোচিত হয়। এই কলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্বে শিক্ষানুরাগী বিত্তশালী পরিবারের সন্তানদের পক্ষেই কেবল উচ্চ শিক্ষা লাভ করা সম্ভব ছিল। দীর্ঘদিন যাবত কলেজটি নবাবগঞ্জ মহকুমার মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের প্রয়োজন মিটিয়ে আসছে। এদিক থেকে কলেজটির যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। স্থানীয় ইদ্রিস আহম্মদ মিয়ার প্রচেষ্টায় ১৯৩৮ সালে কলেজটি স্থাপিত হয়।

বর্তমানে নারী শিক্ষার প্রতি নবাবগঞ্জ অধিক আগ্রহশীল। এক সময় নারী শিক্ষার ব্যাপারেও এই অঞ্চল পশ্চাৎপদ ছিল। ভারত বিভাগের পূর্বে এমন কি স্বাধীনতার অব্যবহৃতি পরেও নবাবগঞ্জে দু'টি বালিকা বিদ্যালয় বিদ্যমান ছিল। রাজারামপুর হাচিনা গালর্স হাই স্কুল নামে এই বিদ্যলয়টি ১৯৪০ সালে স্থাপিত। রাজারামপুর বালক উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনের পূর্বেই বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়েছিল। স্কুলের স্থাপয়িতা মাহতাব উদ্দিন সরকার এর মাতার নামে স্কুলটির নাম করণ হয়। প্রথম অবস্থায় বিদ্যালয়টি বালিকাদের নিমিত্তে একটি মাদ্রাসা ছিল। বিদ্যালয়টি খড়ের চালাঘর থেকে বর্তমানে দ্বিতল পাকা বাড়িতে পরিণত হয়েছে।

১৯৩৮ সালে স্থাপিত নবাবগঞ্জ থানার কৃষ্ণগোবিন্দ বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। বালিকা বিদ্যালয় গুলির মধ্যে এটিই সবচেয়ে প্রাচীন। এ দু'টি বালিকা বিদ্যালয় ছাড়াও নবাবগঞ্জে ১৪টি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ও ৩টি জুনিয়র বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। মহকুমায় জুনিয়র বালক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৮টি।

রাজশাহী জেলার সদর দপ্তর ছিল নাটোরে। রাজা-জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় নাটোর শিক্ষাদীক্ষায় শিল্প-সাহিত্যে উন্নতি লাভ করে। শিক্ষাক্ষেত্রে দীঘাপতিয়া রাজবংশ ও নাটোর মহারাজার পৃষ্ঠপোষকতা ও অকাতরে অর্থ ব্যয় রাজশাহীর ইতিহাসে স্মরণীয় অধ্যায়। এককালে নাটোর সংস্কৃত শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র ছিল। নাটোরের বিভিন্ন স্থানে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য অসংখ্য টোল ও চতুষ্পাঠী স্থাপিত হয়েছিল। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানে ধর্ম ন্যায়শাস্ত্র ব্যাকরণ টীকা ইত্যাদি ছাড়াও সংস্কৃত-সাহিত্য শিক্ষা দেয়া হতো। বিখ্যাত পণ্ডিতদের দ্বারা শিক্ষা-দান কম পরিচালিত হতো। এসব পণ্ডিতদের মধ্যে আগদিয়ার ভট্টাচার্য বংশের পণ্ডিত গদাধর ভট্টাচার্য, পুরুষোত্তম দেবতকালঙ্কার, শিবচন্দ্র সিদ্ধান্ত, রামনাথ তর্কালংকার প্রমুখের নাম স্মর্তব্য। চতুষ্পাঠী গুলির ভার বহনের জন্য মহারাণী ভবানী কালেক্টরকে রাজস্ব প্রদানের সময় একই সঙ্গে নির্ধারিত বৃত্তির টাকা প্রদান করতেন।

১৮৩৫ সালে উইলিয়াম এডাম নাটোরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর জরিপ চালিয়ে তৎকালীন গভঃ জেনারেলের নিকট এক রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্ট অনুসারে তখন নাটোরে বাংলা স্কুল ছিল ১০টি এবং স্কুল সমূহে ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৬৭ জন। ১০-১৬ বছর বয়স পর্যন্ত ছাত্রগণ স্কুলে ভর্তি হতো। শিক্ষকগণ ছিল সরল প্রকৃতির যুবক, দরিদ্র ও অনভিজ্ঞ। শিক্ষকতা কাজকে তাঁরা সম্মানজনক জ্ঞান করতেন। নাটোরে পারস্য এবং আরবী শিক্ষা হতো। পারস্য স্কুলের সংখ্যা ছিল ৪টি, এতে ছাত্র সংখ্যা ছিল ২৩ জন। সাড়ে ৪ বছর থেকে ১৩ বছর বয়স পর্যন্ত ছাত্রগণ স্কুলে ভর্তি হতো। ১৭ বছর বয়স অতিক্রান্ত হতেই তারা স্কুল ত্যাগ করতো। বিদ্যাবুদ্ধিতে পারস্য স্কুলের শিক্ষকগণ বাংলা স্কুলের শিক্ষক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

এডাম ধরাইল গ্রাম সম্পর্কে মন্তব্য করেন, এখানে কয়েকটি পারিবারিক স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। গ্রামের কয়েকটি বিত্তশালী পরিবার কর্তৃক তাঁদের তিন চারটি ছেলেমেয়ের জন্য নিজ বাড়ীর বৈঠক খানায় শিক্ষক রেখে পড়ার বন্দোবস্ত করা হতো। শিক্ষক অল্পই বেতন পেতেন। পুষিয়ে নেবার জন্য শিক্ষককে বাইরের ছাত্র ভর্তি করার অনুমতি দেয়া হতো। মাত্র কয়েক আনা ছাত্র বেতন ছাড়া শিক্ষক মাঝে মাঝে ছাত্রদের নিকট থেকে কিছু কিছু উপঢৌকন পেতেন।

পরবর্তীকালে ইংরেজ সরকারের প্রবর্তিত শিক্ষানীতি অনুসারে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় নাটোরেও স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণের প্রচেষ্টায় কিছু সংখ্যক এম,ই, স্কুল গ'ড়ে ওঠে। ১৯৫২ সালের পূর্বে নাটোরে কোন উচ্চ বিদ্যালয় ছিলনা। এই মহকুমার প্রথম উচ্চ বিদ্যালয় দিঘাপতিয়ার রাজা প্রসন্ননাথ রায় কর্তৃক 'দিঘাপতিয়া প্রসন্ননাথ রায় উচ্চ বিদ্যালয়' ১৯৫২ সালে স্থপিত হয়। রাজশাহী জেলার এটি দ্বিতীয় উচ্চ বিদ্যালয়। নাটোর মহকুমার দ্বিতীয় উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৮৮৪ সালে নাটোর মহারাজার প্রচেষ্টায়। ১৮৬৪ সালে স্থাপিত অপর একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। এই বিদ্যালয়টি নাটোর থানার জনাধনবাটী 'খাজুরা উচ্চ বিদ্যালয়' নামে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে বিদ্যালয়টি কখন উচ্চ বিদ্যালয় হিসাবে আত্ম প্রকাশ করেছে সে ইতিহাস আপাতত অজ্ঞাত। যদি সত্যিকার অর্থেই এটি উল্লিখিত সালে স্থাপিত হয়ে থাকে তাহলে মহারাজা জে,এন উচ্চ বিদ্যালয়ের পূর্বেই এ বিদ্যালয়টির নাম

করতে হয়। উল্লিখিত উচ্চ বিদ্যালয় ৩টি স্থাপিত হবার পর উনিশ শতকের মধ্যে নাটোরে অন্য কোন উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনের নিদর্শন পাওয়া পায় না। বিশ শতকের গোড়ার দিকে সমগ্র নাটোর মহকুমায় মাত্র ৫টি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। বিদ্যালয় ৫টি হলো ঃ চৌগ্রাম (১৯১৩), কলম (১৯২৪), চামারী (১৯৯১), মির্জাপুর দিঘা (১৯২৬) ও দয়ারামপুর উচ্চ বিদ্যালয় (১৯২৮)। সমগ্র নাটোর মহকুমায় বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭৬টি, এর মধ্যে ১টি স্কুল সরকার পরিচালনাধীন। বালিকাদের জন্য নাটোরে ৭টি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় আছে। তার মধ্যে ৩টি সদরে অবস্থিত। সদরে একটি সরকার পরিচালিত বালিকা বিদ্যালয় রয়েছে।

উনিশ শতকের শুরু থেকে বিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত নাটোরে উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৬টি। ভারত বিভাগের পর স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত নাটোরে ৫৪টি উচ্চ বিদ্যালয় স্থানীয় দানশীল ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয়েছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার ৮/৯ বছরের মধ্যে নাটোরে ৫টি নতুন বিদ্যালয় স্থাপনের কথা জানা যায়।

আধুনিক যুগের সূচনা থেকে প্রায় দেড়'শ বছরের কাছাকাছি সময়ের মধ্যে নাটোর মহকুমার ৩টি খানা, গুরুদাসপুর বড়াইগ্রাম ও লালপুর বাসীদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে উল্লেখযোগ্য সাড়া পাওয়া যায়না। এই দীর্ঘ দেড় শতাব্দী কালের মধ্যে বড়াই গ্রাম থানায় কোন উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনের পরিচয় মেলেনি। এই থানার প্রথম উচ্চ বিদ্যালয় রাজাপুর উচ্চ বিদ্যালয় ১৯৫৬ সালে স্থপিত। পরবর্তী কালে ফসলের উন্নতির ফলে এলাকাবাসীর মধ্যে আর্ধিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধিপায়। শহরের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য রাস্তাঘাট ও মহাসড়ক নির্মানের ফলে দৃষ্টি ভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এ ছাড়া এই অঞ্চল থেকেই কিছু কিছু সন্তান উচ্চ শিক্ষার আলোকে বর্হিদৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে এলাকাবাসীর অজ্ঞতা মোচন কর'র ও শিক্ষা বিমুখ চেতনায় ক্ষীণ হলেও সাড়া জাগাতে সক্ষম হন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অনেক পরে হলেও ১৯৫৮-১৯৭০ সালের মধ্যে এই এলাকায় মোট ১২টি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। বর্তমানে এই অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার প্রতি প্রবল আগ্রহ ও বিপুল সাড়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

গুরুদাসপুর থানা বিলচলন এলাকার মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী। থানার চাচকৈড় ও গুরুদাসপুর নদী বিধৌত এলাকা বহুকাল থেকেই ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ। যথেষ্ট সম্ভাবনা সত্ত্বেও বিল অঞ্চলের অন্যান্য স্থানের মতো এখানে শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালিত হয়নি। ১৯৩৯ সালের পূর্বে গুরুদাসপুর থানায় কোন উচ্চ বিদ্যালয় ছিলনা। প্রায় একই সময়ে চাচকৈড় ও গুরুদাসপুরে দু'টি বিদ্যালয় স্থাপনের ইতিহাস জানা যায়। স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতায় তৎকালীন নাটোর মহকুমা প্রশাসক এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যথেষ্ট পরিশ্রম করেন। বিদ্যালয় দু'টি স্থাপিত হবার পরবর্তী ৩০ বছরে এই থানায আরো ৮টি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। ১৯৬৯ সালে শহীদ শামসুজ্জোহা কলেজ স্থাপন শিক্ষাক্ষেত্রে বিল অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য কীর্তি।

রাজশাহীতে কলেজ স্থাপন :

১৮৭৩ সালের পুর্বে রাজশাহী জেলায় কলেজ স্থাপনের প্রচেষ্টা ছিল কিনা জানা যায় না। ১৮৭২ সালে গভর্ণর জেনারেল নর্থ ব্রুকের সময়ে দুবোলহাটির জমিদার হরনাথ রায় উচ্চ শিক্ষা কল্পে রাজশাহীর বোয়ালিয়াতে একটি কলেজ স্থাপনের উদ্দেশ্যে কোম্পানীর কাগজে সর্ব প্রথম ৫০০০ টাকা বাংলা সরকারে'র হাতে প্রদান করেন। নর্থব্রুক জমিদার হরনাথ রায়ের দান

আগ্রহের সহিত অনুমোদন করেন। এর পর ১৯৭৩ সালে বুবোয়ালিয়া ইংলিশ স্কুলে ১লা এপ্রিল ৬ জন ছাত্র নিয়ে ফার্স্ট আর্ট'স্ ক্লাস শুরু হয়। কলেজটিকে একটি উন্নত শ্রেণীর কলেজে পরিণত করার মানসে দিঘাপতিয়ার রাজা প্রমথনাথ রায় একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা রাজশাহী সভার মাধ্যমে দান করেন। ১৮৭৮ সালে এই কলেজে বি,এ ক্লাশ খোলা হয় এবং একই বছরে কলেজটিকে তার নিজস্ব আবাস ভূমিতে স্থানান্তর করে রাজশাহী কলেজ নাম করণ করা হয়। ১৮৮১ সালে এই কলেজে এস,এ এবং ১৮৮৩ সালে আইন ক্লাশ চালু করা হয়। পরবর্তী কালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কারিকুলাম' অনুযায়ী কলেজ থেকে এম.এ ও 'ল' ক্লাশ তুলে নেয়া হয়। ১৯৭৫ সালে এই কলেজ থেকে ৭ জন ছাত্রকে ফাইনাল পরীক্ষার জন্য অংশ গ্রহণ করতে দেয়া হলে মাত্র দু'জন ছাত্র উত্তীর্ণ হন, একজন প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি লাভ করেন। স্থানীয় জমিদার ও বিত্তশালী ব্যক্তিগণের দানে ১৮৮৪ সালে ৫৬১,৭০৩ টাকা ব্যয়ে কলেজের মূল ভবন নির্মিত হয়েছিল। রাজশাহী কলেজে তার অবয়বে ও কৃতিত্বে উপমহাদেশের একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এই প্রতিষ্ঠান এত কৃতি শিক্ষক ও কৃতিছাত্রের সমাবেশ ঘটেছিল যে তাকে 'প্রাচ্যের অকস্‌ফোর্ড' বলে অভিহিত করা হয়।

'রাজশাহী কলেজ' প্রতিষ্ঠার পর অর্ধ শতাব্দীর অধিককাল অতিক্রান্ত হবার পরও রাজশাহী জেলায় উচ্চ শিক্ষার জন্য নতুন কোন কলেজ স্থাপনের নিদর্শন মেলেনা। এক মাত্র ১৯৩৮ সালে স্থাপিত আদিনা ফজলুল হক কলেজের পরিচয় পাওযা যায়। ভারত বিভাগের পর নওগাঁ 'সি,এম,সি কলেজ' নাটের 'এন, এস কলেজ' নওগাঁ ডিগ্রী কলেজ ও রাজশাহী সিটি কলেজ (নৈশ বিভাগ) স্থানীয় পৃষ্ঠ পোষক ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণের প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয়েছিল। পাকিস্তান সৃষ্টির প্রায় ১২ বছরের মধ্যে এই কলেজগুলি গড়ে উঠে। রাজশাহী জেলায় মোট কলেজের সংখ্য ৫৭টি।

স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তী ২৪ বছরে রাজশাহী জেলায় ২৮টি কলেজ এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরবর্তী ৪ বছরের মধ্যে (১৯৭২-১৯৭৪) এবং জেলার আরো ২৫টি কলেজ বেসরকারী উদ্যোগে গড়ে উঠে। স্থানীয় বিত্তবান, জোতদার ও বিদ্যোৎসাহী জনগণের মহত্ত প্রয়াস ও উদ্যোমের ফলেই এই কলেজগুলি স্থাপিত হয়েছিল। এর মধ্যে কযেকটি ডিগ্রী কলেজ ছাড়া অধিকাং কলেজেই উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে চালু রয়েছে।

শিল্প বিদ্যালয় :

রাজশাহীতে শিল্প শিক্ষা বিষয়ক বিদ্যালয়ের পরিচয় বর্তমানে পাওয়া যায় না। অথচ এক দিন 'ডায়মণ্ড জুবিলী ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল স্কুল' নামে একটি বিখ্যাত বিদ্যালয় ছিল। উত্তর বঙ্গের রেশম শিল্পের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য ১৮৯৮ সালে এই বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়েছিল। রাজশাহী জেলা বোর্ড কর্তৃক বিদ্যালয়টি পরিচালিত হতো। স্থানীয় রাজা জমিদারদের আর্থিক সাহায্যে বিদ্যালয়ের গোড়া পত্তন হয়। এই বিদ্যালয়ের জন্য নাটোরের মহারাজা ৫ হাজার টাকা, কাশিমপুরের রায় কেদার প্রসন্ন লাহিড়ী বাহাদুর ১৫ হাজার টাকা, রাণী হেমন্ত কুমারী ৬ হাজার টাকা, দুবোলহাটির রানীদ্বয় ২ হাজার টাকা, রাণী মনেমোহিনী ৫ হাজার টাকা, চৌগ্রামের রাজা রমনীকান্ত রায় ৫ শত টাকা এবং ভূবন মোহন মৈত্র ৩ হাজার টাকা তদানীন্তন জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যানের নিকট দান করেন। দিঘাপতিয়ার রাজা প্রমদানাথ বিদ্যালয়ের 'নির্ধারিত স্থানটি নিজ স্বত্ব ত্যাগ করে বিদ্যালয়ের জন্য দান করেন। বাংলা সরকারের কৃষি বিভাগ থেকে এই বিদ্যালয়ের জন্য উল্লেখযোগ্য সাহায্য বরাদ্দ ছিল। এই বিদ্যালয় থেকে গুটি পোকার বীজ

প্রস্তুত করে দেশ বিদেশে পাঠান হতো। এই বিদ্যালয়ে সূতা রং করা, সুতা প্রস্তুত করা এবং মট্‌কার কাপড় বুনান শিক্ষা দেয়া হতো। বাবু সীতানাথ গুহ এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। 'দুই বছরের মধ্যে বিদ্যালয়ের খ্যাতি দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে।' এখান থেকে গুটি পোকার বীজ, জাপান, ইতালী, ইংল্যাণ্ড এবং ভারতের নানা স্থানে চালান দেয়া হতো। এই বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন স্বর্গীয় অক্ষয় কুমার মৈত্র। রেশম শিল্পের অবনতির সাথে সাথে এই বিদ্যালয়টিরও অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

বর্তামনে এই বিদ্যালয় ভবনেই ১৯৫৫ সাল থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড সার্ভে স্কুল চালু করা হয়। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান রাজশাহী জেলায় মাত্র একটি রয়েছে। এখান থেকে সাভওভারসিয়ার, সার্ভে কানুনগো প্রভৃতি বিষয়ে ডিপ্লোমা নিয়ে বহু ছাত্র বৃত্তিমূলক নানা পেশায় নিয়োজিত রয়েছে।

কৃষি বিদ্যালয় :

রাজশাহীতে বর্তমানে উল্লেখযোগ্য কোন কৃষি বিদ্যালয় নেই। দিঘাপতিয়া ও আব্দুলপুরের মতো দু'একটি কলেজে কৃষি বিভাগ খোলা হয়েছে মাত্র। বহু বছর পূর্বে রাজশাহী কলেজে বসন্ত কুমার কৃষি ইনষ্টিটিউট স্থাপিত হয়েছিল। দিঘাপতিয়ার ছোট তরফ বসন্ত কুমার রায় কৃষি কলেজের ব্যয় ভার বহনের জন্য বাংলা সরকারের হাতে ৪ লক্ষ ৫ হাজার ৩ শত টাকার একটি দান পত্র প্রদান করেন। ১৯৩৪-৩৫ সালে স্থাপিত হয়ে কলেজটি ৬ বছর চলার পর বন্ধ হয়ে যায়।

মেডিক্যাল স্কুল :

রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের পূর্বে ১৯৪৯ সালে রাজশাহীতে একটি মেডিক্যাল স্কুল স্থাপিত হয়। অন্যান্য আয় ব্যতীত অলকা ও কল্পনা সিনেমা হলের টিকিটের উপর স্কুলের জন্য ধার্যকৃত চাঁদা, জেলা বোর্ডের এককালীন দান, রাজশাহী মটর ইউনিয়ন এবং ডিষ্ট্রিট মাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে বিভিন্ন লাইসেন্স ধারীদের উপর চাঁদা ধার্য করে মেডিক্যাল স্কুলের তহবিল গঠন করা হতো। এই প্রতিষ্ঠানের সুনির্দিষ্ট কোন ভবন ছিলনা। সাবেক ইবনেসিনা মেডিক্যাল হোস্টেল, টি,বি কন্ট্রোল ও রাজশাহী মিউজিয়াম অভ্যন্তরের একটি কক্ষে উক্ত স্কুলের ক্রাশ নেয়া হতো। বর্তমান 'আল হেলাল' আল হেলালের সংলগ্ন পশ্চিম ধারের বাড়ী, স্কুল ডাক্তারের ডিস্পেনসারী ঘরের সম্পূর্ণ উপর তলা, ছাত্রদের হোস্টেল হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ইবনেসিনা মেডিক্যাল হোস্টেলের উত্তর ধারে একটি বাড়ীতে ছাত্রীদের হোস্টেল ছিল। ১৯৪৯-১৯৫২ সাল পর্যন্ত স্কুলটি বেসরকারী পরিচালনাধীন ছিল। ১৯৫৩ সাল থেকে সরকার স্কুলটির পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ সময় 'মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটে'র পরিবর্তে 'মেডিক্যাল স্কুল' নাম করণ করা হয়। পদাধিকার বলে সিভিল সার্জন স্কুলের সুপারেনটেনডেন্ট নিযুক্ত হতেন। প্রথম অবস্থায় স্কুলে প্রতি বছর গড়ে ১শ জন ছাত্র ভর্তি হলেও সরকার নিয়ন্ত্রনাধীন চলে গেলে প্রতি বছর গড়ে ৫৫ জন ছাত্র এই স্কুলে ভর্তি হবার সুযোগ লাভ করতো।

রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ :

উত্তরাঞ্চলের জন সাধারণের চিকিৎসা বিষয়ক সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির এবং অত্র অঞ্চলের জন্য ১৯৫৮ সালে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ স্থপিত হয়। ১০২ একর জমির উপর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও অন্যান্য ভবন নির্মিত হয়েছে। কলেজ ও হাসপাতালের কাজ

একই সাথে শুরু হয়। ২কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই প্রতিষ্ঠানের সুরম্য ও সুবৃহৎ ভবনগুলি নির্মিত হয়।

১৯৫৯ সালে প্রথম বছরে কলেজে আসন সংখ্যা ছিল ৫০টি। তার মধ্যে ২ জন ছাত্রী সহ মোট ৪৬ জন ছাত্র-ছাত্রী কলেজে ভর্তি হয়েছিল। ১৯৬৩ সালে প্রথম চূড়ান্ত পরীক্ষায় ৯ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশ গ্রহণ করেন। উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৪ জন। এরা হলেন এ জেড এম হায়দার, সুধাংশু কুমার পাল, শরিফা বেগম ও শিশির কুমার সরকার। প্রতি বছর গড়ে ১ হাজার ছাত্র-ছাত্রী এই কলেজে লেখা পড়া করে।

মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রদের পঠিত বিষয় বস্তুর মধ্যে রয়েছে— এনাটমি, ফিজিওলজি, ফার্মাকোলজি, পাথোলজি, হাইজিন, সার্জারী মেডিসিন, মিড্ওয়াইফারী, আই, ই,এন,টি, রেডিওলজি, ফিজিক্যাল মেডিসিন, এনেসথেসিয়া, রেডিওথেরাফি, মেডিক্যাল জুরিসপুডেন্স, স্কিন ডিজিস। এ সব বিভাগের জন্য ৭০ জন শিক্ষক নিয়োগের প্রভিশন রয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন বিভগের জন্য কার্যরত শিক্ষকের সংখ্যা মাত্র ১৬ জন। কলেজে ছাত্রীদের জন্য ১টি হোস্টেল সহ মোট হোষ্টেল সংখ্যা ৮টি। ৬৫০ জন ছাত্র ও ৯১৮ জন ছাত্রীর হোষ্টেলে থাকার সুবিধা আছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় :

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন রাজশাহীর ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ১৯৫০ সালের ১৮ই অক্টোবরে মেডিক্যাল স্কুলে ছাত্র ভর্তির ব্যাপারে সিলেকশন কমিটির এক চা চক্রে বসে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সরকারী কর্মকর্তাদের সামনে রাজশাহী কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ ডঃ ইতরাত হোসেন জুবেরী রাজশাহীতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করেন। যে বীজ তিনি উপ্ত করেছিলেন তাই অনুকূল আবহাওয়ায় বৃদ্ধি পেয়ে আজকের বিশাল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ব্যাপার রাজশাহীর সর্বস্তরের মানুষের অবদান রয়েছে। ১৯৫৩ সালের ৩১শে মার্চ জাতীয় বাজেট অধিবশনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বিল পাশ হয়। ৬ই জুলাই ডঃ জুবেরী প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

প্রতিষ্ঠা পর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব কোন ভবন ছিল না। প্রথম অবস্থায় সার্কিট হাউজ এবং বসন্তকুমার ইনস্টিটিউটে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শুরু করা হয়। এ বছরেই পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাশে ছাত্র ভর্তি শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্বে অনার্স পড়ান হতো না। অনার্স পড়ার জন্য ছাত্রদের রাজশাহী কলেজে ভর্তি হতে হতো। ১৯৬০ সালের বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিক রিপোর্ট থেকে জানা যায়—এ সময় পূর্বভাগে (বিভিন্ন বিভাগ মিলে) ছাত্র সংখ্যা ছিল ২৯৯ জন ও শেষ বর্ষে ছিল ৯৮৮ জন।

পি.টি.আই ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় :

রাজশাহী জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দানের জন্য সরকার প্রতি মহকুমায় ১টি করে মোট ৪টি প্রাইমারী ট্রেনিং ইনসষ্টিটিউট স্থাপন করেন। ১৯৫৫ সালে সাবেক পূর্বপাকিস্তান সরকার ১৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাজশাহীতে শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেন। প্রথম বছরে ৩ জন মহিলা সহ ৬৪ জন ছাত্র প্রশিক্ষণের জন্য ভর্তি হন। এই কলেজে প্রথমাবস্থায় আসন সংখ্যা ছিল ১০০টি, বর্তমানে এই সংখ্যা ৪৫০ টিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৫৭ সালে এখানে ডিপ্লোমা কোর্স চালু ছিল। ১৯৬২ সালে এম.এড্ কোর্স খোলার

জন্য সরকারের অনুমোদন লাভ করে। অজ্ঞাত কারণে এম.এড্ কোর্স এখান থেকে উঠে যায়। কলেজে প্রশিক্ষণ দাতা শিক্ষকের সংখ্যা ১৮ জন্। এযাবত সাড়ে পাঁচ হাজার ছাত্র এই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে বেরিয়েছেন।

পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট :

রাজশাহী জেলার ছাত্রদের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় উৎসাহ ও সুযোগ সৃষ্টির জন্য ১৯৬৩ সালে ১৪.৬৯ একর জমির উপর সাবেক পূর্বপাকিস্তান সরকার ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয় (ষ্টেডিয়ামের উত্তর দিকে) পলিটেনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠানে টেকনিক্যাল বিভাগের বিভাগের দু'টি বিষয় মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিকাল, কমার্স বিভাগে—শর্টহ্যাণ্ড ও একাউন্টিং এবং ট্রেড কোর্সে শিক্ষা দেয়া হয়। ১৯৬৩ সালে টেকনিক্যাল বিভাগ, ১৯৬৫ সালে কমার্স ও ১৯৬৯ সালে ট্রেড কোর্সে ছাত্র ভর্তি শুরু হয়। প্রথমবারে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণকারী ১৭ জন ছাত্রর মধ্যে ১৪ জন পাশ করে। শুধু রাজশাহী বিভাগের ছাত্র বিভিন্ন বিভাগে অধ্যয়ন করে ৫১২ জন। এই প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত বেশীরভাগ ছাত্র রাজশাহী জেলায়।

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ :

উত্তরাঞ্চলে প্রকৌশল শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির জন্য ১৯৬৪ সালে সাবেক পূর্ব পাকিস্তান সরকার রাজশাহী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পশ্চিম ভাগে কাজলাঃ ১৭২ একর ভূমির উপর এই প্রতিষ্ঠানটি অবস্থিত। স্টাফ কোয়ার্টার ছাড়াই ছাত্রদের হোষ্টেল সহ ২৩টি সুরম্য বিলডিং কলেজেব যাবতীয় কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই প্রতিষ্ঠানের ৩টি হোষ্টেল ৩৫০ জন ছাত্র একত্রে বাস করতে পারে। কলেজে ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল ও সিভিল এই তিনটি বিভাগেই শিক্ষা দেয়া হয়। প্রতিষ্ঠা বর্ষে এই কলেজে ১২৩ জন ছাত্র ভর্তি হয়েছিল। ভর্তি সংক্রান্ত প্রাথমিক কাজ রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে সমাধা করা হয়েছিল। ৪ বছব পর চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশ গ্রহণকারী ছাত্রের সংখ্যা ছিল ৬৬ জন। সিভিলে অংশ গ্রহণ করে ২৮ জন। তার মধ্যে ১০ জন প্রথম শ্রেণী এবং ৭ জন দ্বিতীয় শ্রেণী প্রাপ্ত হয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ১০ জন রেফার্ড পেয়ে পরে পাশ করেন। ইলেকট্রিক্যালে ১৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৮ জন প্রথম শ্রেণী এবং ৯ জন দ্বিতীয় শ্রেণী প্রাপ্ত হন এবং মেকানিক্যালে ২০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১১ জন প্রথম শ্রেণী ও ৯ জন দ্বিতীয় শ্রেণী প্রাপ্ত হন।

রাজশাহী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে বর্তমানে কিছু কিছু ছাত্রী ভর্তি হতে শুরু করেছে। ১৯৭৬ সালের চূড়ান্ত পরীক্ষায় একজন ছাত্রী মেকানিক্যাল গ্রুপ থেকে পরীক্ষা দিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। ১৯৭৭/৭৮ শিক্ষাবর্ষে ১ জন ছাত্রী ভর্তি হয়েছিল। বর্তমান শিক্ষাবর্ষে ৬ জন ছাত্রী এই কলেজে অধ্যয়ন করছেন। ১৯৭৮/৭৯ শিক্ষা বর্ষে এই কলেজে ছাত্র ভর্তির সংখ্যা ১৭৩ জন তার মধ্যে ৪২ জন ছাত্র রাজশাহী জেলার সন্তান। আশা করা যায় ভবিষ্যত এই সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাবে। ৩৬ জন শিক্ষক বর্তমানে শিক্ষকতায় নিয়োজিত রয়েছেন।

পাঠাগার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান :

১৮৫৪ সালে তাহিরপুর জমিদার চন্দ্র শিরেশ্বর রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'সদাশ্রম', দিঘাপতিয়ার রাজা প্রসন্ননাথ রায়ের দানে ১৮৬৫ সালে রাজশাহী 'সদর হাসপাতাল' ১৮৭৮ সালে 'রাজশাহী সভা' ১৮৮৪ সালে নাটোরের রাজা চন্দ্রনাথ রায়ের স্থায়ী সাহায্যে রাজশাহী 'পাবলিক লাইব্রেরী'

এবং পারিবারিক লাইব্রেরী হিসেবে দয়ারামপুর শরৎ কুমার রায় বাহাদুরের লাইব্রেরী, দিঘাপতিয়ার রাজ লাইব্রেরী ও যদুনাথ সরকারের লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১০ সালে ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, কুমার শরৎ কুমার রায় ও রমা প্রসাদ চন্দ্ এই মৈত্রয়ী কর্তৃক বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি গঠন রাজশাহীর ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। পরবর্তীকালে এই সমিতির মাধ্যমে উল্লেখিত ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসলরূপে ১৯১৬ সালে স্থাপিত হয়েছিল 'One of the most finest and smallest Museum ın Asia' রাজশাহী মিউজিয়াম।

শিক্ষিত মুসলিম চিন্তাবিদদের সমাজ সেবামূলক ও সাংস্কৃতিক চিন্তাভাবনার উন্মেষ লক্ষনীয়। ১৮৯১ সালে মীর্জা ইউসুফ আলী কর্তৃক গঠিত হয় 'আঞ্জুমানে হেমায়েত ইসলাম' ও 'নুর উল ইমান' সমিতি। এর পূর্বেই ১৮৮৪ সালে মোহামেডান এসোসিয়শনে'র জন্ম হয়েছিল। নাটোরের খান বাহাদুর এরশাদ আলী চৌধুরী ও খান বাহাদুর এমাদদ্দীন ছিলেন এই এসোসিয়েশনের সভাপতি ও সম্পাদক। ১৯০৭ সালে সরদার হাজী লাল মহাম্মদ কর্তৃক 'আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম' হবার পর ১৯১৮ সালে 'রাজশাহী মুসলমান শিক্ষা সমিতি', ১৩৩২ সালে 'খাদেমুল ইসলাম', ও ১৯২৯ সালে 'রাজশাহী মুসলিম ক্লাব' স্থাপিত হয়। এই 'মুসলিম ক্লাবই' পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর 'জিন্নাহ্ ইসলামিক ইনস্টিটিউটে, রূপান্তরিত হয়। বর্তমানে শাহ মখদুম ইনস্টিটিউট নামে পরিচিত।

রাজশাহী জেলায় সরকার অনুমোদিত পাঠাগারের সংখ্যা সর্বমোট ১৫টি। পাঠাগারগুলি জেলার শহর ও পল্লী উভয় স্থলেই অবস্থিত। পল্লীতে অবস্থিত পাঠাগারগুলির মধ্যে নওগাঁ মহকুমাব চাকরাইল 'রেজওয়ান লাইব্রেরী' ও ভাতসাইল 'প্রগতি সংঘ পাঠাগার' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'চকরাইল লাইব্রেরী' স্থাপিত হয় ১৯৩৬ সালে বদলগাছি থানার চাকরাইল নামে একটি সুন্দর পল্লীতে। নিভৃত পল্লীগ্রামে বহু মূল্যবান গ্রন্থ মালায় সজ্জিত এই পাঠাগার 'আনন্দ ও বিস্ময়ের' সঞ্চার করে। স্থানীয় কিছু সংখ্যক সংস্কৃতিবান ব্যক্তি এই প্রতিষ্ঠানটির গোড়া পত্তন করেন। এই গ্রন্থাগারে অনেকগুলি দুষ্প্রাপ্য হস্ত লিখিত পুঁথির পাণ্ডুলিপি এবং 'নবনুর' 'কোহিনুর' ও বাসনা প্রভৃতি প্রাচীন মাসিক পত্রিকা সংরক্ষিত আছে। এই লাইব্রেরী সম্পর্কে নওগাঁ মহকুমার ইতিহাসে মন্তব্য করা হয়েছে 'বাংলা সাহিত্যের অনেক অলিখিত ইতিহাস সমৃদ্ধ গ্রন্থের বিপুল সমাবেশ রহিযাছে এই গ্রন্থাগারে।' 'ভাতসাইল' চাকরাইলের অদূরে একটি বর্ধিষ্ণুগ্রাম। স্থানীয় সংস্কৃতি সেবীগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৫০ সালে 'ভাতসাইল প্রগতি সংঘ' পাঠাগার স্থাপিত হয়। প্রাচীন পুঁথির ৬৭ খানা পাণ্ডুলিপি, বহু মূল্যবান গ্রন্থ ও পত্র পত্রিকা সংগ্রহ করে পাঠাগারটির শ্রী বৃদ্ধি করা হয়েছে।

বরেন্দ্র একাডেমী :

সম্প্রতি রাজশাহীতে বরেন্দ্র একাডেমী নামে ১৯৭৭ সালে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। রাজশাহী বিভাগের ৫টি জেলার ইতিহাস-শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে গবেষণা, পত্র-পত্রিকা, গ্রন্থ প্রকাশ, লোক সংস্কৃতির উপর বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ ও সংগ্রহশালা স্থাপন ইত্যাদি একাডেমীর কর্মসূচীর পরিধির মধ্যে রয়েছে। বরেন্দ্র একাডেমী পত্রিকা' নামে একাডেমী একটি গবেষণা পত্রিকা প্রকাশ করে থাকে। বর্তমানে একাডেমী উত্তরাঞ্চলের জেলা সমূহের উপর পর্যায়ক্রমে জেলা পরিচিতি পুস্তক প্রনয়ণের কাজ শুরু করেছে। সাংবাদিক আবদুল হোসেন মালেকের উদ্যোগে এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা এবং তিনি এর প্রথম অবৈতনিক নির্বাহী পরিচালক হন।

চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় :

রাজশাহীতে চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় স্থাপন রাজশাহী বাসীর অপর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। এই মহাবিদ্যালয় স্থাপনকালে প্রস্তুতি পর্বের প্রথম পর্বের প্রথম বৈঠক বসে বরেন্দ্র একাডেমী কার্যালয়ে। স্থানীয় সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিবর্গ সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের অত্যুৎসাহী ও সংস্কৃতিবান কর্মকর্তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়েছে। ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশের প্রখ্যাত শিল্পী কামরুল হাসান কলেজটির উদ্বোধন করেন। এই কলেজের নিজস্ব কোন ভবন নেই। অস্থায়ী ভাবে রাজশাহী শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠানটির কাজ শুরু করা হয়। এম.এ. কাইয়ুম, সাংবাদিক ও তরুণ সমাজকর্মী আবুল হোসেন মালেক, ছাত্র-শিল্পী আসাদুল ইসলাম আসাদ এবং স্থানীয় কতিপয় শিল্পী ও সমাজ কর্মীর প্রচেষ্টায় এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বরেন্দ্র একাডেমীতে প্রথম প্রতিষ্ঠা সভায় দৈনিক বার্তার সম্পাদক কামাল লোহানীকে সভাপতি করে একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

এক নজরে রাজশাহী জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠান	সরকারী	বেসরকারী	মোট
০১.	প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০৪৪	৩৮৮	২৪৩২
০২.	জুনিয়র বালক বিদ্যালয়	-	১৭৭	১৭৭
০৩.	ঐ বালিকা বিদ্যালয়			
০৪.	উচ্চ বালক বিদ্যালয়	৭	৪০৪	৪১১
০৫.	ঐ বালিকা বিদ্যালয়	৫	৩১	৩৬
০৬.	মাদ্রাসা	-	-	৫৮২
০৭.	কলেজ (পুরুষ)	২	৫০	৫২
০৮.	ঐ (মহিলা)	১	৪	৫
০৯.	পলিটেকনিক	১	-	১
১০.	সার্ভে ইনস্টিটিউট	১	-	১
১১.	ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	১	-	১
১২.	ভকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার	১	-	১
১৩.	সঙ্গীত বিদ্যালয়			
১৪.	চারু ও কারুকলা মহাবিদালয়	—	১	১
১৫.	ক্যাডেট কলেজ	১	-	১
১৬.	পুলিশ ট্রেনিং কলেজ	১	-	১
১৭.	আইন মহাবিদ্যালয়	-	১	১
১৮.	নার্সিং ট্রেনিং সেন্টার	১	-	১
১৯.	লেডী হেলথ ভিসিটার্স	১	-	১
২০.	মেডিক্যাল কলেজ	১	-	১
২১.	শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	১	-	১

২২.	পি.টি. আই	৪	-	৪
২৩.	সিল্ক রিসার্চ	১	-	১
২৪.	অন্ধ-মূক-বধির	৪	১	৫
২৫.	এতিম খানা	-	-	১
২৬.	বি.সি.এস. আই আব	১	-	১
২৭.	লাক্ষা গবেষণা কেন্দ্র	১	-	১
২৮.	কৃষি কলেজ	-	-	-
২৯.	বিশ্ববিদ্যালয়	-	-	১
৩০.	কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	-	-	-
৩১.	ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়	-	-	-

তথ্য নির্দেশ :

০১. কে.এম. মিছের— রাজশাহীর ইতিহাস।

০২. আ.ফ.ম. আবদুল বাবী (পি.এইচ.ডি) আমাদের শিক্ষার ইতিহাস।

০৩. Regulation Book for District School Board, 1945.

০৪. রাজশাহী জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শকের কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে।

০৫. জেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত উক্ত স্কুলসমূহের উপর লেখকের সংগৃহীত তথ্যের উপর ভিত্তি করে।

০৬. খান সাহেব মোহাম্মদ আফজাল, নওগাঁর ইতিহাস।

০৭. আবুল কালাম শেখ নূর মোহাম্মদ, নবাবগঞ্জ পরিচিতি।

০৮. সৈয়দ আহমেদ, নবাবগঞ্জ পরিচিতি।

০৯. কালীনাথ চৌধুরী, রাজশাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

১০. জেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে।

১১. রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের কলেজ শাখা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে।

১২. রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ অফিস সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য।

২৩. ১৯৬০ সালে বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্ট।

রাজশাহীর কৃষি

মোঃ আবুবকর সিদ্দিক

ভূমিকা :

মূলতঃ রাজশাহী একটি কৃষি প্রধান জেলা। প্রাচীন কাল থেকেই জেলার মোট জনসংখ্যার অধিকাংশই (অস্যুন ৮০%) তাদের জীবন যাপনের জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল সুতরাং জেলার সামগ্রিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণের কথা চিন্তা করলে প্রথমেই কৃষির উন্নতির কথা এসে যায়। তাই রাজশাহীর কৃষি এতদঞ্চলের উন্নযনের পূর্বশর্ত হিসাবেই বিশেষ আলোচনার দাবী রাখে। বর্তমান নিবন্ধ রাজশাহীর কৃষি সন্বন্ধে স্বল্প পরিসরে আলোচনার একটি ক্ষুদ্রতম প্রয়াস মাত্র। সত্যিকার অর্থে রাজশাহীর কৃষি আলোচনার জন্য যে বিশেষ প্রজ্ঞা, পারিদর্শিতা ও বিশেষত্বের দরকার তা নিবন্ধকারের নেই বললেই চলে। তাই বর্তমান প্রবন্ধকে একটি সীমিত আলোচনা বললে ভুল হবে না।

কৃষি জোতের সাধারণ অবস্থা :

বৈশিষ্ট্যের তারতম্য হেতু রাজশাহী জেলার কৃষি ভূমিকে মোটামুটি তিনটি অংশে ভাগ করা যায় :

০১. গোদাগাড়ী, তানোর, মান্দা মহাদেবপুর এবং সিংড়া থানার উত্তরাঞ্চল নিয়ে প্রথম অঞ্চল গঠিত। এই অঞ্চলের ভুমি অপেক্ষাকৃত উঁচু এবং শক্ত কাদা মাটি দ্বারা গঠিত। ইহা বরেন্দ্র ভূমি নামে পরিচিত। সারা বৎসরে এই অঞ্চলে একটি মাত্র ফসল (রোপা আমন) উৎপাদিত হয় এবং ইহা প্রধানত বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল। তবে কোন কোন সময় অনাবৃষ্টি দেখা দিলে পুকুর, ডোবা বা নালা থেকে কৃত্রিম সেচের সাহায্যে ফসল উৎপাদন করা হয়। যে সব জমি উপরোক্ত জলাশয় সমূহের অতি নিকটে শুধু সে সব জমিতেই এই সেচ ব্যবস্থা সম্ভব। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এ সব অঞ্চলে প্রচুর পুকুর ছিল। কিন্তু কালের আবর্তনে এসব পুকুরের অধিকাংশই মজে গিয়ে ভরাট হয়ে যায়। ফলে বর্তমানে এ অঞ্চলে কৃত্রিম সেচ ব্যবস্থা অত্যন্ত সীমিত পর্যায়ে বিদ্যমান। অনাবৃষ্টিতে কৃষকের পক্ষে প্রকৃতির করুনার উপর নির্ভর করা ছাড়া কোন গতান্তর থাকে না। অনেক সময় চাষীগণ জমিতে পানি ধরে রাখার জন্য জমির চারিদিকে উঁচু-বাধ নির্মাণ করে থাকে।

০২. পদ্মা নদীর অববাহিকা নিয়ে রাজশাহী জেলার দ্বিতীয় অঞ্চল গঠিত। পদ্মার তীরবর্তী অঞ্চল সমূহ অর্থাৎ রামপুর, বোয়ালিয়া চারঘাট এবং লালপুর থানা জুড়ে এই অঞ্চল বিস্তৃত। ইহা বরেন্দ্র ভূমি অপেক্ষা নিম্ন। মাটি বাদামী ও দোআঁশ প্রকৃতির। এখানে বিভিন্ন ফসর উৎপাদন করা সম্বব। আউশ ও আমন প্রধান ফসল হলেও গম ডালবীজ ও তৈলবীজও এই অঞ্চলে বেশ ভাল জন্মে। পদ্মা প্লাবিত বন্যার জল ও বৃষ্টিপাতের সাহায্যে এ সব ফসল উৎপাদিত হয়।

০৩. জেলার অবশিষ্ট এলাকা নিয়ে তৃতীয় অঞ্চল গঠিত। নওগাঁ, বাগমারা পুঁঠিয়া, আত্রাই,

নাটোর, বড়াইগ্রাম এবং পদ্মা তীরবর্তী থানা সমূহের কিছু অংশ নিয়ে এই অঞ্চল গঠিত। ইহাকে নিম্ন অঞ্চল আখ্যা দিলে অত্যুক্তি হবেনা। কারণ পুরো অঞ্চলটি বিল, ঝিল, খাল, ও নালায় পরিপূর্ণ। কোন অঞ্চলে বিলগুলি কম গভীরতা সম্পন্ন আবার কোথাও বা এগুলি অধিক গভীরতা সম্পন্ন। কোন এলাকা (আত্রাই থানায় প্রায় সম্পুর্ণ এলাকাই) আবার বৎসরের প্রায় ছয় মাসই পানির তলায় থাকে। এই এলাকাকে তরা বা নিম্ন এলাকা বলে। আমন, আউস, বোরো ও কিছু শীত কালীন ফসল (যেমন : গম, বার্লি) এই অঞ্চলে উৎপাদিত হয়।

ভূমির ব্যবহার :

রাজশাহী জেলা প্রাচীন কাল থেকেই উদ্বৃত্ত খাদ্য অঞ্চল হিসাবে খ্যাত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এ জেলার অনেক অঞ্চল ঘন জংগলে পরিপূর্ণ ছিল। কাল ক্রমে বর্ধিত জনসংখ্যাব চাপে অনেক অনাবাদী এলাকাই আবাদী জমিতে পরিণত হয়। শুধু তাই নয় আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে অনেক এলাকাতে এখন বৎসরে একাধিক ফসল উৎপাদিত হচ্ছে। ১৯৭৬-৭৭ ও ১৯৭৭-৭৮ সালে রাজশাহীর ভূমি ব্যবহারের তথ্য নিম্নের সারণীতে লিপিবদ্ধ হলো :

সারণী : ১

রাজশাহী জেলার ভূমি ব্যবহারের তথ্য (০০০ একরে) :

	১৯৭৬-৭৭	১৯৭৭-৭৮
জেলার মোট আয়তন	২৩৩৯	২৩৩৯
অনাবাদী জমি :	৫০৩	৫০৩
বন :	৭	৭
আবাদ যোগ্য অনাবাদী জমি :	৭২	৭২
পতিত জমি :	৫৯	৫৯
এক ফসলী এলাকা :	১২৫৮	১২৭২
দুই পসরী এলাকা :	৩৫৭	৩৬৯
তিন ফসলী এলাকা :	৮৩	৬৫
নীট চাষ কৃত এলাকা :	১৬৯৮	১৬৯৭
মোট চাষ কৃত এলাকা :	২২২০	২১৮৮

প্রধান প্রধান শস্যাদি :

ধান এই জেলার প্রধান খাদ্য শস্য। জেলার শতকরা প্রায় ৮০ ভাগের অধিক আবাদী জমিতে ধান উৎপন্ন হয়। এই জেলায় প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর ধান জন্মে। আউস, আমন ও বোরো ধান। বরেন্দ্র অঞ্চলে মূলত রোপা ও আমন জন্মে। কোথাও কোথাও বোনা আমনও জন্মে। বোরো ধান শীতকালীন ফসল হিসাবে বিভিন্ন শ্রেণীর জলাশয়, বিল, হাওর এবং চর এলাকায় উৎপন্ন হয়। ধান ছাড়া গম এই অঞ্চলের দ্বিতীয় প্রধান খাদ্য শস্য। এ ছাড়া জোয়ার, বাজরা, যব প্রভৃতির চাষও হয়। ডাল ও তৈলবীজের মধ্যে ছোলা, মশুর, খেসারী, মুগ মাসকলাই, অড়হর শরিষা তিল মসিনাও এই জেলায় জন্মে। অর্থকরী ফসলের মধ্যে পাট, ইক্ষু, তামাক গাঁজা, বাদাম, হলুদ, আদা প্রভৃতি এই জেলায় উৎপাদিত হয়। নিম্নের তুলনামূলক

বর্ণনায় ১৯৬৪-৬৫—১৯৬৯—৭০ সময় কালে বিভিন্ন ফসলের আওতায় জমির পরিমাণ দেখান হলো।

সারণী : ২

রাজশাহী জেলায় ১৯৬৪-৬৫ ও ১৯৬৯-৭০ সালে বিভিন্ন ফসলের অওতায় জমির পরিমাণ :

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	চাষকৃত এলাকা (একরে)	
		১৯৬৪-৬৫	১৯৬৯-৭০
০১	আউস	৩৮৯৫০০	৪,৭৪০৪০
০২	আমন	১১৫৮০০০	১১,১১৪২০
০৩	বোরো	৩৪৬০০	৯০,৩৬০
০৪	গম	৩৩২০	৩৮,১০০
০৫	বার্লি	১৪৭৫০	১৮০৮০
০৬	ভুট্টা	১৪৫০	১৭১৫
০৭	ছোলা	১৯৬০০	২৩,৯৭৫
০৮	মসুর	৩৪০০০	৩০,৪৭০
০৯	মাসকলাই	১০৭২০	১৩,০৩০
১০	খেসরী	১১৩৮০	১৫,৪৬৫
১১	কারো কলাই	১৫০	৩৫০
১২	মটর	১৬৭৮০	১৬,৮১০
১৩	মসিনা	৪১০০	৩৮২০
১৪	গ্রীষ্মকালীন তিল	৫৬০০	৫,৯০০
১৫	শীতকালীন তিল	২৩৭০	৩,৪২০
১৬	সরিষা	৩৪,৫০০	৪৪,৭৩৫
১৭	বাদাম	১৭০	১,৩৫৫
১৮	নরিকেল	৬৯০	১,৭০০
১৯	মরিচ	২৭৫০	৩৫৬৫
২০	পেঁয়াজ	৫১০০	৫৩৫০
২১	রসুন	১২১০	১৪৫৫
২২	আখ	৬৪,৪০০	৯২০৬০
২৩	পাট	১,০০,৭০০	১,১৭,০৯৫
২৪	তামাক	১৩০০	১৫৭৫
২৫	গাঁজা	৩৫	৬০
২৬	শুপারী	৬০	১২০
২৭	পান	২৩০০	৩১০৫
২৮	আম	২১৪৪৯	২৩,৭৩৫
২৯	কলা	৪,০০০	৪,১১০

৩০	আনারস	১৫০	৪৩০
৩১	লেবু	৪০০	-
৩২	কাঁঠাল	২২০০	২৯৩৫
৩৩	পেঁপে	৪৩০	৫৮৫
৩৪	তরমুজ	১,০০০	৯৭৫
৩৫	লিচু	২৫০	৮২৫
৩৬	পশু খাদ্য	১৯০০	২,১১৫
৩৭	তুঁত	১,৩০০	১১৫৫
৩৮	গোল আলু	১৬,৮০০	২০,৩০১
৩৯	অড়হর	৯৯০	১০০০
৪০	মুগ	৭০০	৮৪০

সাম্প্রতিক কালে সরকার ও কৃষকদের যৌথ প্রচেষ্টায় এই জেলায় কিছু কিছু উচ্চ ফলনশীল ধান এর চাষ পরিলক্ষিত হচ্ছে। ১৯৭৬-৭৭ও ১৯৭৭-৭৮ সালে এই জেলায় যথাক্রমে ১,১০,০০০ একর ও ১,০০,০০০ একর জমি উচ্চ ফলনশীল ধান চাষের আওতায় আনা হয়। এসব উচ্চ ফলনশীল ধানের মধ্যে ইরি, বিপ্লব-৩ প্রভৃতি প্রধান।

রাজশাহী জেলায় উৎপাদিত বিভিন্ন ফসলের পঞ্জিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো :

জানুয়ারী : বার্লি, গম ও মটর বপন, শীতকালীন আখ এর চাষ, গাঁজা. রবি ইক্ষু সরিষা, আমন ধান ও সরিষার মাঠ থেকে সংগ্রহ পূর্বক মাড়াই, ঝাড়াই ও গোলাজাতকরণ, বোরো ধানের চারার জন্য বীজতলায় বীজ বপন।

ফেব্রুয়ারী : তুঁতের জমি প্রস্তুত করণ, রবি ইক্ষু রোপণ, গম কলাই ও তৈলবীজের সংগ্রহ গাজা সংগ্রহ, ও প্রস্তুত করন, বোরো ধানের চারা রোপণ।

মার্চ : গম, কলাই ও তৈলবীজের সংগ্রহ, হলুদ সংগ্রহ, বোরো দানের চারা রোপণ, পাট বপন।

এপ্রিল : আউস ও আমন ধান বপন, হরুদ সংগ্রহ, রবি ফসল সংগ্রহ ও পাট বপন।

মে : আউস ও আমন বপন সমাপ্ত। হৈমন্তিক ধানের বীজ বীজ তলায় বপন, জমি থেকে বোরো সংগ্রহ।

জুনঃ হৈমন্তিক ধান রোপন সমাপ্ত, বোরো সংগ্রহ আউস নিড়ানো।

জুলাই : গাঁজার জমি প্রস্তুত, পাট ও আউসের জমি নিড়ানো।

আগষ্ট : পাট ও আউস সংগ্রহ, তিল বপন, বীজ তলায় গাঁজা বপন এবং গাঁজার চারা রোপন।

সেপ্টেম্বর : আউস ফসল তোলার কাজ সমাপ্ত, রবি ফসল বপন, পুরুষ গাঁজার চারা উপড়ানো শুরু।

অক্টোবর : রবি ফসল বপন, গাঁজার জমিতে সার প্রদান।

নভেম্বর : রবি ফসল বপন সমাপ্ত, ইক্ষু কাটা শুরু, তুঁতের জমি প্রস্তুত, আগুর হৈমন্তিক ধান সংগ্রহ শুরু।

ডিসেম্বর : আমন ও হৈমন্তিক ধান সংগ্রহ সমাপ্ত, ইক্ষু কর্তন ও কর্ষন, গাঁজার জমিতে সার ও সেচ প্রয়োগন।

কৃষি যন্ত্রপাতি :

শতাব্দী কাল ব্যাপী রাজশাহীর কৃষি ব্যবস্থা মূলত সনাতনী পন্থার উপর নির্ভরশীল। অধিকাংশ কৃষক প্রাচীন পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে থাকেন। তাই কৃষিতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিও মূলত সনাতন। কৃষির বিভিন্ন পর্যায়ে কৃষকগণ নিম্নলিখিত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে থাকেন। ১. হাল/লাঙ্গল ২. মই ৩. বিভা ৪. জোয়াল ৫. নাংলা ৬. যাঁত ৭. সেউতি ৮. কোদাল ৯. নিড়ানী ১০. কাঁচি ১১. কুলা।

কৃষির আধুনিকীকরণ :

(ক) খামার স্থাপন : অধুনা রাজশাহীর কৃষিকে সরকারী পর্যায়ে আধুনিকী করণের প্রচেষ্টা চলছে। তবে কৃষি আধুনিকী করণের সুবিধা মূলতঃ সরকার নিয়ন্ত্রিত খামার গুলিতে সীমাবদ্ধ। ১৯০৪ সালে সরকারী উদ্যোগে রামপুর বোয়ালিয়ায় প্রায় ৬৩ একর জমি লইয়া একটি কৃষি খামার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই খামারে বিশেষভাবে বিভিন্ন উন্নত জাতের ইক্ষু চাষের উপর জোর দেয়া হয়। এগুলির মধ্যে গান্ধেরী, ভোন্দ্রামুখী, শামসারা, খারি, বি-১৪৭ ট্যান্না প্রভৃতি ইক্ষু প্রধান।

তা ছাড়া এই খামারে গোলআলু চাষের উপরও জোর দেয়া হয়। ১৯৫৭ সালে নবাবগঞ্জ মহকুমার কল্যাণপুরে উন্নত বীজ উৎপাদন খামার প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত খামার প্রথমে কৃষি পরিচালকের নিয়ন্ত্রণে প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৯৬২ সালে ইহা বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণে আসে। এই খামারে বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে উন্নত বীজ উৎপাদন পূর্বক সাধারণ কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। মুখ্য উদ্দেশ্য হলো উৎপাদন বৃদ্ধি। খামারটি ১,০০.২৩ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত তন্মধ্যে ১০ একর ফল উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। অবশিষ্ট অংশে বিভিন্ন উন্নত জাতের কৃষি বীজ পরীক্ষা মূলক ভাবে উৎপাদিত হয়। ১৯৬৯-৭০ সালে এই খামার থেকে নিম্নলিখিত পরিমাণ বীজ সরাসরি কৃষকদের মধ্যে বিক্রয় করা হয় :

বীজ			বিতরণের পরিমাণ (মণে)
আউস	–	–	৫০-০
আমন	–	–	৩০০-০
বোরো	–	–	৬০-০
গম	–	–	৪০-০
পাট	–	–	১৬-৭

এ ছাড়া প্রদর্শন খামার এর মাধ্যমেও উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ করার জন্য জেলায় গ্রাম ও ইউনিয়ন পর্যায়ে বিভিন্ন প্রদর্শন খামার গড়ে তোলা হয়েছে। ১৯৬৯-৭০ সালে এই জেলায় ৭৫০ একর জমিতে ২৪৮ টি গ্রামীণ প্রদর্শন প্লট ও ৮০০ একর জমিতে ২৩৯৬টি গ্রামীণ প্রদর্শন প্লট গড়ে উঠেছে। উপরন্তু প্রতিটি ১০০ একর বিশিষ্ট প্রায় ২৮৪টি ব্লক প্রদর্শন খামারও গড়ে তোলা হয়েছে। এসব প্রদর্শন খামারগুলি ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকলেও কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তাগণ সময়ে সময়ে খামার মালিকদের আধুনিক কৃষি কৌশল সম্পর্কে হাতে কলমে শিক্ষা দিয়ে থাকেন এবং লব্ধ জ্ঞান কৃষকগণ জমিতে প্রয়োগ পূর্বক অধিক ফসল উৎপাদনে সক্ষম হয়।

১৯৬৯ সালে কৃষির সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজশাহীতে একটি বড় ধরনের কৃষি উন্নয়ন

এস্টেট স্থাপিত হয়। উক্ত এস্টেট রাজশাহী শহর সন্নিকটস্থ্ পবা থানায় অবস্থিত। প্রায় ৩০,০০০ একর জমি উক্ত থামারের আওতাভুক্ত। কৃষকগণ সমবায়ের মাধ্যমে ঋণ ও কৃষি উপাদান (সার, উন্নত বীজ, পানি শক্তি) প্রয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হবে এ উদ্দেশ্য সামনে রেখেই উক্ত এস্টেট স্থাপিত হয়। ফল উৎপাদনের জন্যও রাজশাহীতে সরকারী পর্যায়ে কয়েকটা ফল উৎপাদন খামার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমান এ ধরণের ৭টি খামার এ জেলায় রয়েছে। এ সব খামারে শুধু ফল উৎপাদনের উপরই প্রচেষ্টা ও কর্মকাণ্ড কেন্দ্রীভূত থাকনো। পাশ্চাত্য শাকসবজীর চারা উৎপাদন পূর্বক তা চাষীদের কাছে বিক্রয় করা হয়। এসব শাক সব্জীর মধ্যে ফুলকপি, বাঁধাকপি, লেটুস, শালগম, গাঁজর, টমেটো প্রভৃতি প্রধান। এই খামারগুলি ৬৮.৯৯ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। ৭টি খামার´এর মধ্যে ৫টি খাস মহলবাগানে প্রতিষ্ঠিত, একটি কল্যাণপুরে এবং বাকিটি রাজশাহী জেলার কোর্ট এলাকায় অবস্থিত। এসব খামারের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো :

০১. কল্যাণপুর—এস-এম ফার্ম-নবাবগঞ্জ
০২. পার কানসাট আম বাগান— শিবগঞ্জ, নবাবগঞ্জ
০৩. কানসাট রাজ আম বাগান— ঐ
০৪. রামচন্দ্রপুর আম বাগান— নবাবগঞ্জ
০৫. কাশিয়াডাঙ্গা আম বাগান— রাজশাহী
০৬. ভাটুরিয়া আম বাগান— দিগাপতিয়া, নাটোর
০৭. বিভগীয় নার্সারী হেড কোয়াটার্স— রাজশাহী কোর্ট কম্পাউণ্ড রাজশাহী।

উন্নত যন্ত্রপাতির ব্যবহার :

কৃষির বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন ভূমিকর্ষণের জন্য ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, বীজ বপনের জন্য বীজ বপন যন্ত্র, নিড়ানোর জন্য নিড়ানী যন্ত্র ও ঔষধ ছিটানোর জন্য স্প্রে মেশিন, সেচের জন্য বিভিন্ন সেচ যন্ত্র ও কাটাই ও মাড়াই এর জন্য হারভেষ্টার ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে বাংলাদেশের কৃষিতে বর্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সব ধরণের কৃষির যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্ভবপর নয়। আমাদের কৃষিতে প্রায় ৮০% লোক তাদের জীবন ধারণ ও কর্মসংস্থানের জন্য সরাসরি নির্ভরশীল। কাজেই কৃষিতে মূলধন বহুল প্রযুক্তি প্রবর্তন করলে ব্যাপক বেকারত্ব দেখা দিতে পারে। উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের দরুণ যে বর্ধিত শ্রমশক্তি কৃষি থেকে ছাড়া পাবে, তাদের কর্ম সংস্থানের নিশ্চিত ব্যবস্থা না রেখে এ ধরনের প্রযুক্তি প্রবর্তন শুভ ফল বয়ে আনবেনা। বিশেষ করে ভূমি প্রস্তুত, নিড়ানো, কাটাই ও মাড়াই কাজে আমাদের শ্রম শক্তিকে ব্যবহার করাই শ্রেয়। ভূমি প্রস্তুতে যান্ত্রিক পদ্ধতি প্রবর্তনের আর একটি বড় অসুবিধা হলো এখানকার ক্ষুদ্র আয়তন বিশিষ্ট কৃষি জোত। বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার ন্যায় রাজশাহীর কৃষি জোতও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে বিভক্ত। তাই এখানে ভূমি প্রস্তুত যন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার সম্ভবপর হয়ে উঠেনি। বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার ন্যায় রাজশাহীর কৃষিতেও সকল পর্যায়ে যান্ত্রিক চাষাবাদ প্রবর্তন সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। এখানে কৃষি যান্ত্রিকায়নের মোটামুটি দুটি পর্যায় পরিলক্ষিত হয় : ০১. ভূমি কর্ষণ ও ভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য ট্রাকটরের ব্যবহার ও ০২. সেচের জন্য বিভিন্ন সেচ যন্ত্রের ব্যবহার।

(১) ট্রাকটরের ব্যবহার :

১৯৫৯-৬০ সালে রাজশাহীতে সর্ব প্রথম ট্রাকটর এর প্রচলন হয়। মুলত ভুমি পুনরুদ্ধারের জন্যই এ গুলির প্রবর্তন করা হয়। সরকারী মালিকানাধীনে এগুলো ক্রয় পূর্বক কৃষ্ণকদেরকে ভাড়া দেওয়া হয। ১৯৫৯-৬০ সালে উচ্চ ট্রাকটর গুলোর সাহায্যে ২৫৯.৯২ একর জমি পুনরুদ্ধার পূর্বক কৃষির অধীনে আনয়ন করা হয়। ১৯৬৪-৬৫ সালে ট্রাকটরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২৯ এ দাঁড়ায় এ কৃষি জমির পরিমাণ ৩১০২ একরে উন্নীত হয়। কিন্তু ১৯৬৫-৬৬ সালে এই সংখ্যা ১৮ তে হ্রাস পায় এবং ফলশ্রুতিতে কর্ষিত জমির পরিমাণ ও হ্রাস পেয়ে ১৯৬০ একরে দাঁড়ায়। বর্তমানে রাজশাহী জেলার চিনিকল ও বিশ্ববিদ্যালয় কৃষি প্রকল্প এলাকায় ভূমি কর্ষণের জন্য টাকটর ব্যবহার করা হচ্ছে। তা ছাড়া বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থাও ভাড়ায় বেশ কিছু সংখ্যক ট্রাকটর ব্যবহার করছে।

০২. সেচ যন্ত্রের ব্যবহার :

রাজশাহীর সেচ ব্যবস্থাকে মোটামুটি দুভাগে ভাগ করা যায় :

০১. সনতনী সেচ ব্যবস্থা ও

০২. আধুনিক সেচ ব্যবস্থা।

সনাতনী সেচ ব্যবস্থা :

প্রাচীন কাল থেকেই রাজশাহীতে কৃষকগণ নিজ প্রচেষ্টায় কিছু কিছু এলাকা সেচ ব্যবস্থার সাহায্যে বোরো ধান ও শীতকালীন শাক সব্জী উৎপাদন করে আসছে। সেচ ব্যবস্থার সাহায্যে কৃষকগণ ভুস্তরের ও উপরিভাগের পানি ব্যবহার করার পদ্ধতি প্রয়োগ করে থাকে। ভুস্তরের পানি ব্যবহারের জন্য কৃষকগণ খোলাকুয়া খনন করে থাকে। রাজশাহীর নওগাঁ মহকুমায় এই সেচ পদ্ধতির ব্যাপক প্রচলন আছে। এই পদ্ধতিতে খোলা কুয়া থেকে পানি তুলে জমিতে প্রয়োগ করা হয়। ১৯৭৬-৭৭ সালে নওগাঁ মহকুমায় এই পদ্ধতির সাহয্যে প্রায় ১১,৭৩০ একর জমি সেচ করা হয়। বিভিন্ন থানায় সেচকৃত জমির পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হলো :

সারণী : ৩

নওগাঁ মহকুমায় কৃয়োর সাহায্যে সেচকৃত জমির পরিমাণ :

থানার নাম :	সেচকৃত জমির পরিমাণ (একরে)	শতকরা অংশ
০১. নওগাঁ	৮৩৪০	৭১
০২. নিয়ামতপুর	১০০০	৯
০৩. বাদলগাছি	৯০০	৮
০৪. মান্দা	৭৫০	৬
০৫. মহাদেবপুর	৬০০	৫
০৬. আত্রাই	১০০	০.৯
০৭. রানীনগর	৪০	০১
মোট	১১,৭৩০	১০০.০০

উপরিভাগের পানি ব্যবহারের জন্য যাঁত ও সেউতির ব্যবহার রাজশাহীতে প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত। যাঁত কাঠ বা টিন দ্বারা চোট নৌকার মত এক ধবনের যন্ত্র। ইহার সাহায্যে বিল, হাওর বা নীচু জলাশয় থেকে পানি সেচ করা হয়। রাজশাহী জেলার নবাবগঞ্জ ও নাটোর মহকুমার বিল অঞ্চলে এই সেচ প্রচলন আছে। সেউতি বাঁশ এর তৈরী এক ধরনের সেচ যন্ত্র। ইহাও উপরি ভাগের পানি সেচের কাজে ব্যবহৃত হয। রাজশাহীর নবাবগঞ্জ এলাকায় মেলন নামে এক ধরনের সনাতনী সেচ পদ্ধতি প্রচলিত আছে। বর্ষাব পানি নামতে শুরু করলে কৃষকগণ অনেক সময় জলাশয় বাঁধ নির্মাণ করে পানি আটকিয়ে দেয়। শুষ্ক মৌসুমে বাঁধের পার্শ্ববর্তী এলাকায় উক্ত আটকানো পানি দ্বারা সেচের কাজ করা হয়; পানির উচ্চতা জমি থেকে বেশী থাকে। তাই বাঁধ কেটে দিলেই জমিতে পানি আসে। তবে পানিব যাতে অপব্যবহার ও চুরি না হয় তার জন্য একজন পাহারাদার নিযুক্ত করা হয়। উক্ত পাহারাদার প্রত্যেকের জমিতে পানি প্রয়োগ তদারক করে। বিনিময়ে ফসল কাটার মৌসুমে তাহাকে উৎপাদিত ফসলের একটা অংশ প্রদান করা হয়।

আধুনিক সেচ ব্যবস্থা :

সনাতনী সেচ ব্যবস্থার পাশাপাশি রাজশাহীতে সম্প্রতি কালে অধুনিক সেচ ব্যবস্থাও প্রবর্তিত হচ্ছে। বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এসব সেচ ব্যবস্থা বাস্তবায়নে সেবা ও দ্রব্যের আকারে সহায়তা করে আসছে। আন্তর্জাতিক সংস্থার মধ্যে ইউনিসেফ, আই,ডি,এ,সি,সি,ডি,বি, কেয়ার, কোর প্রভৃতি সংস্থার নাম উল্লেখযোগ্য। জাতীয় সংস্থার মধ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থা, সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্ম সংস্থা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক প্রভৃতি সংস্থার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আধুনিক সেচ-ব্যবস্থায় ভূস্তরের পানি ও উপরিভাগের পানি ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। ভূস্তরের পানি ব্যবহারের জন্য গভীর, অগভীর ও হস্তচালিত নলকূপ ব্যবহার করা হয়। পক্ষান্তরে উপরিভাগের পানি ব্যবহারের জন্য শক্তি চালিত পাম্প সরবরাহ করা হয়। ১৯৬৮-৬৯ সালে রাজশাহীতে প্রথম শক্তি চালিত পাম্প সরবরাহ শুরু হয়। উক্ত সময় রাজশাহীতে ৭৪৭টি শক্তি চালিত পাম্প এর সাহায্যে ৩৬,৯০০ একর জমি সেচ করা হয়। ১৯৭৩-৭৪ সালে এই সংখ্যা ১৪৯০ এ দাঁড়ায় এবং ৬৩,৯০০ একর জমি সেচ করা হয়। ১৯৭৭-৭৮ সালে এই পাম্প এর সংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। নিম্নে রাজশাহী জেলার বিভিন্ন মহকুমার ১৯৭৭-৭৮ সালে ব্যবহৃত শক্তি চালিত পাম্প এর বিবরণ দেওয়া হলো :

সারণী : ৪

রাজশাহী জেলায় মোট ব্যবহৃত (১৯৭৭-৭৮) ও সম্ভাব্য ব্যবহারের শক্তি চালিত পাম্প এর সংখ্যা :

ক্রমিক সংখ্যা	জোন	মোট ব্যবহৃত শক্তি চালিত পাম্প এর সংখ্যা		অতিরিক্ত পাম্প যাহা ব্যবহার করা যেতে পারে দুই কিউসেক হিসাবে		মোট ব্যবহারের সম্ভাবনা দুই কিউসেক হিসাবে
০১.	নওগাঁ	১৩১	৬০২	৬৬৭.৫	১৬১.৫	৮২৯
০২.	রাজশাহী	৯৩	৩৭৭	৪২৩.৫	২৫৪	৬৭৭.৫

০৩.	চাপাই নবাবগঞ্জ	৪৮	৩৪৪	৩৬৮	২৮৮	৬৫৬
	মোট	২৭২	১৩২৩	১৪৫৯	৭০৩.৫	২১৬২.৫

গভীর ও অগভীর নলকূপ রাজশাহীতে অতি সম্প্রতি প্রচলন করা হয়েছে। ১৯৭৩-৭৪ সালে রাজশাহীতে সর্বমোট ১১৯টি গভীর নলকূপ ও ২২৪টি অগভীর নলকূপ প্রবর্তন করা হয়। বর্তমানে এগুলোর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। গভীর ও অগভীর নলকূপ ছাড়াও রাজশাহীতে ইউনিসেফ, আই. আর. ডি পি ও সি. সি. ডি. বি এর সহায়তায় ক্ষুদ্র চাষীদের মাঝে হস্ত চালিত নলকূপ সরবরাহ করা হচ্ছে।

১৯৬৭-৬৮ সাল থেকে ১৯৭৭-৭৮ পর্যন্ত রাজশাহীতে সনাতনী ও আধুনিক উভয় সেচ পদ্ধতির সাহায্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ভূমি সেচ করা হয়েছে। নিম্নে সারণীতে উহা উপস্থাপন করা হলো :

সারণী : ৫

বাজশাহী জেলায় বিভিন্ন পদ্ধতিতে সেচকৃত এলাকাব বিবরণ :

সেচ পদ্ধতির নাম	সেচকৃত এলাকা (একরে)
০১. শক্তি চালিত পাম্প	৮১,৪০০
০২. নলকূপ	১১,৫৫৫
০৩. যাঁত	১,১৩৫৩০
০৪. সেউতি	১৬৯৭৫
০৫. খাল	৩৭০
০৬. অন্যান্য	২০,৬২০
	মোট— ২,৪৪,৪৫০

সারণী : ৬

রাজশাহী জেলায় সেচ কৃত বিভিন্ন ফসলের খতিয়ান (১৯৭৭-৭৮) :

ফসলের নাম	সেচকৃত এলাকা (একরে)
০১. আউস	১৩,৭৮০
০২. আমন	৩৮,৭৬০
০৩. বোরো	১,২৭,৯০৫
০৪. গম	২০,৮৭৫
০৫. অন্যান্য খাদ্য শস্য	৯৮০
০৬. ভাল জাত শস্য	১২৮৫
০৭. তৈল বীজ	১৭২৫
০৮. গোর অলু	১৭,০২০
০৯. শাক সব্জী	৭২৮০
১০. ইক্ষু	৪৮০৫

১১. অন্যান্য	১০,০৩৫
	মোট— ২,৪৪,৪৫০

সার প্রয়োগ :

কৃষি আধুনিকীকরণে সার একটি অন্যতম উপাদান। আধুনিক উপাদান সমষ্টির মধ্যে পানি, উন্নত বীজ, সার ও কীটনাশক ঔষধ প্রধান উচ্চ ফলনশীল উপাদানাবলী হিসাবে বিবেচিত। ভূমির উর্বরতা বার বার কর্ষণ ও ফসর উৎপাদনের ফলে হ্রাস পায়। তাই উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য সার প্রয়োগ করা হয়। রাজশাহীতে প্রাচীন কাল থেকেই কিছু কিছু উন্নত ফসল (যেমন পাট, ইক্ষু, গাঁজা, তামাক ইত্যাদি) উৎপাদনে দেশী সার প্রয়োগ করা হয়। দেশী সার এর মধ্যে গোবর, ছাই ও পচামাটি উল্লেখযোগ্য। নওগাঁ মহকুমায় মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিব জন্য একটি বিশেষ সনাতনী পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। ইহাকে ভরা কাটা বলে জমিব চার পার্শ্বে নালা কাটা হয়। বর্ষায় এ সব নালা পলি মাটিতে ভরে যায়। বর্ষার পর এই নালা থেকে মাটি কেটে জমিতে প্রয়োগ করা হয়। শুধু দেশী সার অধিক ফসল উৎপাদনের চাহিদা পূরণে যথেষ্ট নয়। তাই সরকারী পর্যায়ে চাষীদের বিভিন্ন কৃত্রিম সার সরবরাহ করা হয়ে থাকে। কৃষকগণ এ সব সার প্রয়োগে বিভিন্ন ফসল এর একর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়। বাজশাহী জেলায় ১৯৭৯ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ব্যবহৃত সারের বর্ণনা অপর পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল।

সারণী : ৬

বাজশাহী জেলায় ১৯৭৯ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ব্যবহৃত বিভিন্ন সার ব্যবহারের খতিয়ান :

সারের নাম	ব্যবহৃত পবিমাণ (টনে)
ইউরিয়া	৩,১৩৭
টি-এস-পি	৯৩
এম-পি এবং ডি-এ-পি	৬০৫
এইচ-পি	১৯০
	মোট— ৪০২৫

প্রতিষেধক ও কীটনাশক ঔষধের ব্যবহার :

বিভিন্ন পোকামাকড় এর আক্রমন ও রোগে অনেক সময় শস্যের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। রাজশাহীর শস্যও এর ব্যতিক্রম নয়। অতীতে বিভিন্ন শস্য ভক্ষক পক্ষীকূল ও পোকামাকড়ের হাত থেকে শস্য রক্ষার জন্য বিভিন্ন রকম অপরিপক্ক উপায় অবলম্বন করা হতো। যে সমস্ত পাখী জমির ফসল খেয়ে ফেলে সেগুলো তাড়ানোর জন্য জমিতে খড়ের তৈরী মনুষ্য মূর্তি স্থাপন করা হতো। উহার দেহ খড়ের ও মাথা পাতিল দ্বারা তৈরী পূর্বক লাঠির উপব স্থাপন করা হতো। কখনও বা জমিতে টিনের শব্দ পূর্বক পাখী তাড়ানো হতো। আবার পোকা মাকড়ের হাত থেকে শস্যকে রক্ষার জন্য অনেক সময় পতঙ্গভুক পাখীর সাহায্যও নেয়া হতো। জমিতে মাঝে মাঝে পাখী বসার জন্য বাঁশের কঞ্চি বা পাটশলা পুঁতে রাখা হতো। কিন্তু এগুলো মূলতঃ কোন কার্যকরী পদক্ষেপ ছিল না।

অধুনা এই জেরায় বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধক ও কীট নাশক ঔষধ ব্যবহার এর প্রচলন

হয়েছে। ১৯৭৭-৭৮ সালে এই জেলায় প্রায় ২,৭৫,০০০ পাউন্ড বিভিন্ন ধরনের রোগ প্রতিরোধক ও কীট নাশক ঔষধাদি ব্যবহার করা হয়েছে।

কৃষি খামার এর আয়তন :

আয়তন অনুযায়ী মোট খামার সমূহকে শ্রেণী বিন্যাস পূর্বক জেলায় মোট খামারের সংখ্যাও উহাদের আওতায় চাষকৃত এলাকার একটি তুলনা মুলক চিত্র নিম্নে দেওয়া হলো :

সারণী : ৭

রাজশাহী জেলায় মোট খামার ও উহার অধীনে এলাকার বিবরণ।

খামার এর আয়তন	খামার এর সংখ্যা	মোট এলাকা (একরে)
.৫ একর এর নীচে	২৭,৮০০	৬,৯৪৪
০.৫—১.০০ একর	২৪২৫০	১৭,৬৬৪
১.০০—২.৫ একর	৭৩,৮৫০	১,২৭,৮৬০
২.৫—৫.০ একর	১,০৫,৬৪০	৩,৮৬,১৩৪
৫.০-৭.৫ একর	৬২,২৩০	৩,৭৭,৯০৮
৭.৫—১২.৫ একর	৪৬,৩৯০	৪,৪০,৫৬৯
১২.৫—২৫.০ একর	২৩,০০০	৩,৮৪,০১২
২৫.০—৪০.০ একর	২৮২০	৮২৯৫৮
৪০.০—একর ও উর্ধে	৪৬০	২২৯৬৪

ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা :

জমিদারী প্রথার বিলোপের পর রাজশাহী জেলায় ভূমি স্বত্ব ব্যবস্থায় কিছুটা পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। বর্তমান সরকার সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে থাকেন। জমির উপরে কৃষকের ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু কৃষকদের সার্বিক কোন কল্যাণ এখনও সুনিশ্চিত হয়নি। বিশেষ করে সাম্প্রতিককালে এই জেলায় প্রান্তিক ও ভূমিহীন চাষীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবে বড় চাষীদের প্রাধান্য ও প্রস্তাব সর্বিশেষ লক্ষনীয়। বর্তমান ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী রাজশাহী জেলার কৃষকগণকে নিম্নলিখিত কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় :

০১. অনুপস্থিত জোতদার :

এই শ্রেণীর কৃষক মূলত অবস্থা সম্পন্ন ও অধিক ভূমির জমির মালিক। তবে ভূমির সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ কোন যোগাযোগ নেই। তারা মূলত নগর কেন্দ্রিক ও কৃষি ছাড়া তাদের সহায়ক পেশা (যেমন ব্যবসায়, ওকালতি, অধ্যাপনা) রয়েছে। সমস্ত জমি ভাগ চাষীদের নিকট বর্গা দেয়া থাকে। প্রতিটি ফসল মাড়াই এর মৌসুমে এ সব জোতদারগণ জমিতে গিয়ে ভাগ চাষীর নিকট থেকে তার প্রাপ্য অংশ (অধিকাংশ ক্ষেত্রে মোট উৎপাদিত পণ্যের ৫০%) আদায় করে নিয়ে আসে। অনেক সময় জোতদার নিজে না গিয়ে তার প্রতিনিধি পাঠায়।

০২. প্রকৃত চাষী :

এই শ্রেণীর কৃষক নিজের জমিতে নিজেই চাষাবাদ করে। সে অন্যকে জমি বর্গা দেয় না বা অন্যের কাছে বর্গা নেয় না।

০৩. আংশিক চাষী :

এই চাষীকে তিন শ্রেণীতে আলোচনা করা যায় প্রথমতঃ কিছু কিছু কৃষক নিজের জমি ছাড়াও অন্যের কিছু জমি বর্গা নিয়ে চাষ করে। দ্বিতীয়তঃ কিছু কৃষক নিজের সম্পূর্ণ জমি নিজে চাষ না করে কিছু অংশ অন্যের নিকট বর্গা দেয়। তৃতীয়তঃ কিছু কৃষক নিজের আংশিক জমি অন্যকে বর্গা দেয় আবার অন্যেব কিছু জমি নিজে চাষ করে।

০৪. পুরোপুরি বর্গাদার :

এ ধবনের চাষীর নিজেব কোন চাষ যোগ্য জমি নেই। সে পুবোপুরি অন্যের জমি নিজে বর্গা ভিত্তিতে চাষ কবে।

০৫. ভূমিহীন কৃষক :

এ শ্রেণীর কৃষক রাজশাহী কৃষির সবচেয়ে নিম্ন আর্থিক সম্পন্ন কৃষক। তাদের অন্যের জমি চাষ করার মত উৎপাদনের উপকরণ নেই। তাদের আছে শুধু শাবিরীক শ্রম ও দক্ষতা যা তারা কৃষিতেই নিয়োগ করতে পারে। অন্য পেশা গ্রহণ করার মত দক্ষতা ও যোগ্যতা তাদের নেই। কৃষি শ্রমের উপরই নির্ভর করে তারা জীবিকা নির্বাহ করে। কৃষি খাতে বর্তমানে যে পদ্ধতি বিরাজমান তাতে ভুমিহীন কৃষকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেখানে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাজশাহীতে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য ছিল সেখানে বর্তমান রাজশাহীতে প্রায় ২৫% - ৩০% ভুমিহীন কৃষক বিদ্যামান। প্রতি বছর কিছু কিছু প্রান্তিক ও ভাগ চাষী ভুমিহীন কৃষকে পরিণত হচ্ছে।

কৃষিপণ্যের মূল্য :

কৃষি পণ্যের মূল্যের নিশ্চয়তা বিধান অন্যতম সবকারী নীতি হওয়া উচিত। দেশের অন্যান্য অংশের ন্যায় রাজশাহীতেও পণ্যের ক্রম বর্ধমান মূল্য বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। তবে এই বৃদ্ধি বিরতিহীন নয়। মাঝে মাঝে কৃষি পণ্যের মূল্য হ্রাস পেয়েছে আবার হয়তো বৃদ্ধি পেয়েছে। সামগ্রীক ভাবে কৃষি পণ্যের মূল্যের ধারা উর্ধমুখী। ১৮৬৬-৬৭ সালে রাজশাহীতে উন্নত ধরনের ধানের মণ প্রতি মূল্য ছিল দু'টাকা দু'আনা। ১৮৭০-৭১ এ এই মূল্য হ্রাসে পেয়ে মণ প্রতি এক টাকাতে গিয়ে দাঁড়ায়। ১৯৬৫-৬৬ সালে ধারে মূল্য বেশ বৃদ্ধি পেয়ে মণ প্রতি ৪০.০০ টাকায় উন্নীত হয়।

বর্তমান (১৯৭৮-৭৯) এই মূল্য আরও বৃদ্ধি পেযে প্রায় ১৫০ টাকায় পৌছেছে। বছরের বিভিন্ন সময় মূল্য স্তর উঠা-নামা করে থাকে। সাধারণতঃ ফসল কাটার মৌসুমে মূল্যে নিম্ন পর্যায়ে থাকে ও অন্য সময় মূল্য বৃদ্ধি পায়। সুতরাং বৃদ্ধি প্রাপ্ত মূল্যের সুবিধা মজুতদার ও অবস্থা সম্পন্ন কৃষকগণই পেয়ে থাকে।

উপসংহার :

রাজশাহীর কৃষি ব্যবস্থা প্রাচীন কালের তুলনায় বর্তমানে কিছুটা অগ্রগতি অর্জন করেছে। তবে দেশের সামগ্রীক অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনে এ অগ্রগতি যথেষ্ট নয়। বরাবরই রাজশাহী খাদ্য শস্য উৎপাদনে উদ্বৃত্ত এলাকা হিসাবে বিরাজ করেছে। দেশের ভবিষ্যৎ খাদ্য চাহিদা মিটাতে এ জেলা গুরুত্ব পূর্ণ ভুমিকা পালন করতে পারে। বিশেষ করে বরেন্দ্র এলাকাকে যদি এক ফসলীর স্থলে দুই ফসলী অঞ্চলে পরিণত করা সম্ভব হয় তবে দেশের খাদ্য ঘাটতি মোকাবেলায় যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হবে। এ জন্য দরকার পর্যায় ক্রমে কৃষিতে সার্বিক সেচ সুবিধার প্রবর্তন ও প্রয়োজনী উপকরণের সময়োপযোগী নিশ্চিত সরবরাহ। জেলার সার্বিক কল্যাণের জন্য প্রান্তিক ও ভূমিহীন চাষীদের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি সংস্কার ও কর্ম সংস্থান অত্যাবশ্যক। কৃষকদের ন্যায্য মূল্যের নিশ্চিত ব্যবস্থাও বিশেষ মনোযোগের দাবী রাখে। আশা করা যায় এ সব কর্মপন্থা অবলম্বন করলে রাজশাহীর কৃষি জেলার সামগ্রীক কল্যাণে বিশেষ ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে।

সহায়ক গ্রন্থাবলী :

০১. Hunter W W · A Statistical Account of Bengal, Rajshahi & Bogra, Vol · viii. Trubner & co. London, 1876

০২. O 'Malley' L.S.S : Bengal District Gazetteers Rajshahi. Bengal Secreatariat Book Dept , Calcutta 1916.

০৩. Siddique Ashraf : Bangladesh district Gazetters, Rajshahi Government of the People's Republic of Bangladesh-Ministry of Cabinet Affairs, Establishment division. Bangladesh Government Press, Dacca, 1976.

০৪. Monthly Statistical Buletin of Bangladesh, April, 1979, vol. viii No.4 Bangladesh Bureau of Statistics. Ministry of Planning Bangladesh Secretariat, Dacca.

০৫. Siddique, M.A.B Appropriate Agriculatural Technology. A comparative study of Dugwell and DeepTubewell Irrigation in North Bengal. (An unpublished M. phil Thesis.) Institute of Bangladesh studies, Rajshahi University, Rajshahi, Bangladesh.

রাজশাহীর শিল্প

আনোয়ারুল হাসান সুফী

বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন সভ্য এলাকা হলেও রাজশাহীতে শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহ তেমন গড়ে উঠেনি। সরকারী গেজেটে রাজশাহী জেলাকে শিল্প অনুন্নত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। বাংলাদেশের পশ্চিম সীমান্তে প্রায় ৩ হাজার ৬ শত ৫৪ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে রাজশাহী জেলা গঠিত। সরকারী হিসাব মতে এ জেলার লোকসংখ্যা ৪২ লক্ষ ৬৯ হাজার জন (প্রায়)। এদের ৮০% জন কৃষিজীবী। প্রকৃতিক সম্পদের উপব নির্ভর করেই এখানে চিনির কল, রেশম কারখানা, পাটকল, তেলের মিল গড়ে উঠেছে। স্থানীয় সম্পদের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও এখানে তেমন উল্লেখযোগ্য কুটির শিল্প গড়ে উঠে নাই। যে দু-একটি কুটির শিল্প আছে তাও আধুনিক যুগোপযোগী মানে উন্নতি হয়নি।

এই জেলার শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহ নিম্নরূপ :

চিনিকল	২টি	পাটকল	১টি
ম্যাচ ফ্যাকটরী	১টি	রেশম শিল্প কারখানা	১টি
জর্দ্দা ফ্যাক্টরী	৬টি	বড় চালকল	৩টি
অটোমেটিক রাইসমিল	২টি	বড় ফ্লাওয়ার মিল	১৮টি
ঔষধ তৈরীব কারখানা	১টি	লেখার কালির কাবখানা	১টি
আয়ুর্বেদিক কারখানা	১টি	হোমিওপ্যাথিক ঔষধ	১টি
সিল্কেব কাপড় বুনন কারখানা	১টি	অটোমেটিক ফ্ল্যাওয়ার মিল	২টি
কস্‌মেটিক ফ্যাক্টরী	৭টি	আইসক্রীম ফ্যাক্টরী	৯টি
বিস্কুট ফ্যাক্টবী (বড়)	৫টি	অটোমেটিক বিস্কুট ফ্যক্টরী	১টি
অটোমেটিক পাউরুটি ফ্যাক্টরী	১টি	শেমাই কারখানা	২টি
তেলের মিল	৩৬টি	প্রিন্টিং প্রেস	৩২টি
প্লাস্টিক কারখানা	১টি	পলিথিন ইন্ডাষ্টি	১টি
চাউলের কল	২৬৭টি	রুটি-তৈরীর কারখানা	২৯টি
বাদ্যযন্ত্রের কারখানা	১টি	স্টিল ফার্নিচার ফ্রাক্টরী	৬টি
বালতী তৈরীর কারখানা	১টি	ছাতা তৈরীর কারখানা	২টি
বিবিধ ইঞ্জিনিয়ারিং	২টি	কোল্ড স্টোরেজ	২টি
হ্যান্ডলুম কারখানা	১২টি	পাওয়ারলুম কারখানা	২টি
কাস্ট আয়রণ ইণ্ডাস্ট্রিজ	৩টি	হাল্কা ইঞ্জিনিয়ারিং	
টেকসটাইল মিল (স্পিনিং)	১টি	ওয়ার্কশপ	১১টি
কাঠের আসবাবপত্র তৈরীর কারখানা—	৭১টি।		

সম্প্রতি বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা নওগাঁ মহকুমায় একটি সিল্ক ফ্যাক্টরী এবং রহনপুর

এলাকায় একটি অটোমেটিক রাইসমিল তৈরীর জন্য ঋণ মঞ্জুর করেছে। এ দুটো কারখানার নির্মাণ কাজ অনতিবিলম্বেই শুরু হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

কুটির শিল্প :

কামার— আনুমানিক ২,০০০ জন। গরুর গাড়ী ও টমটমের চাকা তৈরীর কাজই প্রধান।

তামা, কাঁসা ও পিতলজাতদ্রব্যাদি তৈরী করেন— ১০০ জন

কুমার—	৪৬৫ জন	তাঁতী—	৫৫১৬ জন
স্বর্ণকার—	২১৭টি ইউনিট	তেলের ঘানি—	২৮১০টি
ছুতার—	৪০৪ জন		

বাঁশ ও বেতজাতদ্রব্য তৈরীর ইউনিট— ১১৮২টি

এছাড়াও গুটি পোকার চাষ, রেশম সুতা উৎপাদন, খয়ের ও লাক্ষা শিল্প এবং জাল বুনন কাজে জড়িত আছেন আনুমানিক ৩০,০০০ জন।

শিল্প শ্রমিক :

রাজশাহী জেলায় সর্ব্বমোট ৬৬টি রেজিষ্টার্ড ট্রেড ইউনিয়ন আছে এবং এসব ইউনিয়নের আনুমানিক সদস্য সংখ্যা প্রায় ৮,০০০ জন। এ ছাড়া আছে প্রায় ৫০ হাজার পরোক্ষ শ্রমিক।

রাজশাহী জেলায় যে সকর ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গড়ে উঠতে পারে :

০১. হাল্কা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ
০২. ফল প্রক্রিয়াজাত করণ ও ক্যানিং
০৩. যানবাহন মেরামত ওয়ার্কশপ
০৪. ছাপাখানা— আধুনিক ছাপাখানা ও অফসেট প্রিন্টিং
০৫. পানীয় দ্রব্যও আইসক্রীম
০৬. বিশেষ ধরণের তাঁত শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন
০৭. বরফকল স্থাপন
০৮. রেশন শিল্প
০৯. এন্ডি চাষ
১০. বেত ও বাঁশ জাতীয় দ্রব্য উৎপাদন
১১. খয়ের তৈরী
১২. লাক্ষা শিল্প
১৩. নকশি কাঁথা
১৪. পশমী কম্বল
১৫. অটোমেটিক বেকারী
১৬. সাবান কারখানা
১৭. ট্যানারী
১৮. পোষাক তৈরীর কারখানা
১৯. পুস্তক প্রকাশনা
২০. ডেয়ারী ফার্ম

২১. পিতল
২২. মশল্লা প্রক্রিয়াজাত করণ
২৩. বাবলা কাট শিল্প
২৪. গাম তৈরী
২৫. ডিষ্টিলারীর প্লান্ট
২৬. গবাদী পশুর খাদ্য
২৭. অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ।
২৮. এ্যালুমিনিয়াম
২৯. সিরামিক।
৩০. কাষ্ট আয়রন
৩১. তার
৩২. তালা
৩৩ পাট শিল্পের যন্ত্রপাতি তৈরী
৩৪. বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি
৩৫. হোটেল
৩৬. সিনেমা হল
৩৭. ড্রাই ক্লিনার্স
৩৮. ভেজিটেবল ওয়েল ইণ্ডাস্ট্রি।

রাজশাহী টেকস্টাইল মিলে বর্তমানে সুতা উৎপন্ন হচ্ছে। এই সুতার রং করে, মাড় দিয়ে শুকিয়ে চরকায় কেটে তাঁত বুনে সুন্দর কাপড় তৈরী করা যেতে পারে। পাবনা জেলায় এমন অসংখ্য তাঁত রয়েছে। এ ছাড়াও আগ্রহী ব্যক্তিরা পাওয়ার লুমের সাহায্যেও এই সুতো থেকে কাপড় তৈরী করতে পারেন।

এ ছাড়াও নওগাঁ মহকুমার নজিপুব এলাকায় পাওয়া গেছে মূল্যবান সাদামাটি। এই সাদা মাটিকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলা যেতে পারে অতিপ্রয়োজনীয় সিরামিক ইণ্ডাষ্ট্রি।

শিল্পে অনগ্রসরতার কারণসমূহ :

০১. **উপযুক্ত তথ্যের অভাব : যে কোন শিল্প স্থাপনের পূর্বে প্রয়োজন একটি ফ্যাক্ট শীটের যাতে বিস্তারিত বর্ণনা করা থাকে যে ঐ নির্দিষ্ট শিল্প স্থাপনে কতটুকু জমি, কি কি যন্ত্রপাতি, কি কি কাঁচামাল, কতজন শ্রমিক ইত্যাদির প্রয়োজন হবে এবং সর্ব্বমোট মত টাকা লাগবে। এ ধরণের ফ্যাক্টশীট রাজশাহী জেলায় শিল্প সংক্রান্ত কোন দপ্তরেই নেই। ঢাকায় বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার পরামর্শ দান দপ্তর আছে। উক্ত দপ্তরের একটি শাখা রাজশাহী জেলায় অবিলম্বে স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজনীয়।**

০২. **যাতায়াত ব্যবস্থা : রাজশাহী জেলার রেলওয়ে ব্যবস্থা ব্রডগেজ পদ্ধতির অন্যদিকে বন্দর নগরী চট্টগ্রামের রেলওয়ে ব্যবস্থা মিটারগেজ পদ্ধতির। ফলে চট্টগ্রাম থেকে কাঁচামাল পরিবহণকারী রেলওয়ে ওয়াগন সরাসরি রাজশাহী জেলায় আসতে পারে না। অন্যদিকে যমুনা নদীর উপর ব্রীজ না থাকায় ট্রাকযোগে মালামাল আনাও অসুবিধাজনক ও ব্যয় সাপেক্ষ। ফলে চট্টগ্রাম থেকে আনা কাঁচামাল দিয়ে তৈরী**

দ্রব্যের উৎপাদন মূল্য রাজশাহী জেলায় তুলনামূলকভাবে অন্যান্য জেলার চাইতে বেশী হয়। এ ছাড়াও রাজশাহী জেলাব নাটোর ও বগুড়া জেলা সংযোগকারী রাস্তাটি এখনও ভারী যানবাহনের জন্য খুলে দেওয়া হয়নি, এবং রাজশাহী—নওগাঁ সংযোগকারী রাস্তাটি তৈরী সম্পূর্ণ হয়নি, ফলে রাজশাহী জেলার দ্রব্যাদি বাজারজাতকরণে বিভিন্ন প্রকার জটিল অসুবিধা আছে। ব্যবস্থায়ীক এই সব জটিলতার কারণে শিল্প উদ্যোক্তারা রাজশাহীতে শিল্প স্থাপনে আগ্রহী হচ্ছেন না। অন্যদিকে পদ্মা নদী এবং শাখানদীগুলোও নৌ চলাচলের জন্য এক রকম অযোগ্য হয়ে থাকায় এই জেলায় শিল্প কারখানার কাঁচামাল ও উৎপন্ন দ্রব্যাদি পরিবহণে অল্প খরচের নৌ পরিবহণ ব্যবস্থা তেমন কোন উপকারে আসছেনা। পলে এই জেলা শিল্পে অনুন্নত রয়ে গেছে।

০৩. জ্বালানী সংকট : এই জেলার অধিকাংশ শিল্প কারখানাতেই জ্বালানী হিসাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। চাহিদার তুলনায় বিদ্যুৎ সরবরাহ অপর্যাপ্ত থাকায় এবং বিকল্প জ্বালানী হিসাবে গ্যাস সরবরাহের ব্যবস্থা না থাকায় এখানে শিল্প কারখানা গড়ে উঠেনি। এজন্য এখন প্রয়োজন রাজশাহী জেলাতেই কমপক্ষে একটি ৬০ মেগাওয়াটের বৈদ্যুতিক জেনারেটর বসানো এবং গ্যাস সরবরাহ চালু করা। এছাড়াও বগুড়ার জামালপুর কয়লাখনি থেকে কয়লা উত্তোলন শুরু হলে এখানে জ্বালানী সংকট কিছুটা কমবে।

০৪. বাজারজাতকরণ সমস্যা : এই সমস্যা মূলতঃ যাতায়াত সমস্যার কারণেই সৃষ্ট। এ ছাড়াও এখানে উৎপন্ন কুটির শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিদেশের বাজারের জন্য যথোপযুক্ত মানে তৈরী হচ্ছে না তাই যাতায়াত সমস্যার সমাধান করা ছাড়াও প্রয়োজন বিভিন্ন ধরণের ইন্সিটিটিউট স্থাপন যেখানে বিদেশে বাজারজাত করণের জন্য দ্রব্যাদি তৈরী শিক্ষা দেওয়া যাবে।

০৫. ভৌগলিক অবস্থান : রাজশাহী জেলা দেশের একপ্রান্তে অবস্থিত এবং এই জেলার দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিম প্রান্ত জুড়ে আছে ভারত। সেহেতু ঐ সকল সীমান্ত এলাকা দিয়ে কোন প্রকার আভ্যন্তরীণ যাতায়াত ও ব্যবসা বাণিজ্য সম্ভব নয়। এই জেলার পূর্ব দিকে পাবনা ও বগুড়া জেলা অবস্থিত। বর্তমানে শুধুমাত্র পাবনা জেলার সাথেই ভারী যানবাহন সরাসরি চলাচল করে। বগুড়া জেলার সাথে ভারী যানবাহন চলাচলে পাবনা জেলা ঘুরে যেতে হয়। দক্ষিণ দিকে পদ্মা নদী অবস্থিত হওয়ায় সরাসরি কুষ্টিয়া জেলা যাতায়াতের কোন সুবিধা নেই। সড়কপথে ভারী যান বাহন সমূহ ও পাবনা জেলার পাকশী ফেরীঘাট দিয়ে পারাপার করতে হয়। উপরোক্ত কারণেও রাজশাহী জেলা শিল্পে অনুন্নত।

০৬. সাহায্যকারী শিল্প : শিল্প কারখানা সমূহের খুচরা যন্ত্রাংশ তৈরী ও মেরামত করবার সুযোগ সুবিধা রাজশাহী জেলাতে কম। এখানে বড় কোন ওয়ার্কশপ নেই। বিসিক শিল্প এলাকায় অবস্থিত বিরাট ওয়ার্কশপটিও আজ পর্যন্ত চালু হযনি ফলে শিল্পকারখানা সমূহের যন্ত্রাংশ মেরামত ও তৈরীর জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজশাহী জেলার বাইরে যেতে হয়। যেহেতু রাজশাহী জেলাতে কাচের বা টিনের পাত্র তৈরীর কোন কারখানা নেই সেজন্যও অনেক সম্ভাবনাময় শিল্প স্থাপিত হচ্ছে না, যেমন—ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা।

০৭. ব্যাংক ব্যবস্থা : শিল্প কারখানা সমূহের জন্য ওয়ার্কিং ক্যাপিট্যাল সাধারণত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সরবরাহ করে থাকে। বর্তমানে এসব ব্যাংক রাষ্ট্রয়াত্ত করায় ঋণ গ্রহণ পদ্ধতি পূর্বের তুলনায় অনেক জটিল হয়েছে। এই সমস্যার সমাধানের জন্য রাজশাহী জেলাতেই একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় স্থাপন এবং রাজশাহী জেলার জন্যই ঋণদান সমূহ সীমাবদ্ধ রাখার নিয়ম করা যেতে পারে। তাতে এই জেলাতে ঋণ প্রদান বৃদ্ধি পাবে।

০৮. সরকারী নীতি সমূহের প্রয়োগ : সরকারী নীতিমালা যথাযথ বাস্তবায়ন বিঘ্নিত হওয়ার কারণেও রাজশাহী জেলা শিল্পে অনুন্নত। যেমন :— গত ১-৬-১৯৭৭ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয় এক বিজ্ঞপ্তিতে ৫২টি শিল্প ইউনিটের নাম উল্লেখ করা হয় এবং বলা হয় এসব শিল্প ইউনিট স্থাপন করলে কনসেসনাল ট্রারিফ ট্যাকস হলিডে, সহজ শর্তে ঋণ ইত্যাদি দেওয়া হবে। কিন্তু ৬-৭-১৯৭৭ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয় এক বিজ্ঞপ্তিতে ঐ ৫২টি শিল্প ইউনিটকে জেলাওয়ারী কোটায় ভাগ করে দেয়। ফলে রাজশাহী জেলার কয়েকটি শিল্প ইউনিটকে বিদেশ থেকে তাদের যন্ত্রপাতি আমদানীর সময় অতিরিক্ত বিড়ম্বনা পোহাতে হয়। এসব ঘটনা দেখে শুনে অনেক উৎসাহী ব্যক্তি শিল্প স্থাপনে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েন।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা :

রাজশাহী জেলাতে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার কার্যালয় আছে। এই সংস্থা আগ্রহী শিল্পপতিদের বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদান করে থাকে। সরকার প্রদত্ত সংজ্ঞানুযায়ী জমির মূল্যসহ ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্থায়ী মূলধন বিশিষ্ট (চলতি মূলধন ব্যতীত) সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানই এই সংস্থার আওতাভুক্ত। এই সংস্থা সম্ভাব্য শিল্প স্থাপনে নিম্নলিখিত সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকে :

০১. রাজশাহী শহরের সপুরা এলাকায় অবস্থিত শিল্প নগরীতে পাকা রাস্তা, পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং পয়ঃপ্রণালী সুবিধাসহ ন্যায়সংগত মুল্যে ইজারা ভিত্তিতে উন্নত জমি প্রদান।

০২. জমি খরিদ, কারখানা গৃহ নির্মাণ ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে সর্বোচ্চ শতকরা ৭০ ভাগ দেশী ও বিদেশী মুদ্রায় দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান।

০৩. মোটামুটি হিসাব, প্রকল্প বিশ্লেষণ, যন্ত্রপাতি পরিকল্পনা বিষয়ে প্রকৌশলী বিশেষজ্ঞদের সাহায্য প্রদান।

০৪. পুঁজিবিনিয়োগের পূর্বে কারিগরি ও অর্থনৈতিক সম্ভাবতা পরীক্ষা বা পুঁজিবিনিয়োগের সমস্যা বিষয়ক পরামর্শ প্রদান।

০৫. কারখানা গৃহ নির্মাণ ও যন্ত্রপাতি স্থাপন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলী সাহায্য প্রদান।

০৬. প্রতিষ্ঠিত কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কাঁচামাল, খুচরা যন্ত্রপাতি ও অন্য যে কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানীর জন্য আমদানী রপ্তানীর প্রধান নিয়ন্ত্রকের কাছ থেকে অনুমতি পত্র সংগ্রহ করে।

০৭. সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা যাতে ব্যবহার করা যায় সেই জন্য কারখানার সুষ্ঠ পরিচালনার উদ্দেশ্যে যে কোন পর্যায়ে শিল্প উদ্যোক্তাকে যে কোন প্রকার আবশ্যক সাহায্য প্রদান।

০৮. সংস্থার আওতাধীন ডিজাইন সেন্টারের মাধ্যমে শিল্প উদ্যাক্তাদের নূতন ডিজাইন সরবরাহ, বাঁশ, বেত ও মৃৎ শিল্প, চামড়ার দ্রব্য, পুতুল তৈরী, বাটিক ও অন্যান্য প্রিন্টিং ও উন্নতমানের প্যাকেজিং ইত্যাদি বিষয়ে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান।

প্রায় ১০২ একর জমি নিয়ে রাজশাহী শিল্প নগরী স্থাপিত। এই শিল্প নগরীর ৩৭২টি প্লট আছে। ইতিমধ্যে ১৬৪টি প্লট বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য উদ্যোক্তাদের মধ্যে বিলি করা হয়েছে। এর মধ্যে ২৫টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বর্তমানে চালু আছে। কিছু সংখ্যক প্রতিষ্ঠান এর কারখানা গৃহ নির্মাণাধীন আছে।

রাজশাহীতে শিল্প স্থাপন করলে সরকার নিম্নলিখিত আর্থিক সুবিধা/প্রেরণা দেবে :

০১. আমদানীকৃত সকল যন্ত্রপাতির উপর বহিঃশুল্কের হার শতকরা আড়াইভাগ ধার্য্য করা হবে। এ ছাড়াও আমদানীকৃত সকল খুচরা যন্ত্রাংশের উপর ৫ বছরের জন্য নির্দ্ধারিত হারের অর্ধেক ধার্য্য করা হবে।

০২. নগদ বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দ করা হবে।

০৩. এই এলাকায় অর্থ বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে নতুন শিল্প স্থাপনার জন্য ডেট-ইকুইটির হার হবে যথাক্রমে ৭০ এবং ৩০ ভাগ।

০৪. নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন শুরু হবার পর ৯ বৎসর পর্যন্ত কর মওকুফ করা হবে।

০৫. বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক, বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা এবং আই,সি,বি থেকে ইকুইটি ফাইনানশিং সংক্রান্ত অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিশেষ সুবিধা করে। (বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক ও বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থার শাকা রাজশাহীতে খোলা হয়েছে)।

রাজশাহী বিভাগ উন্নয়ন বোর্ড :

পল্লী শিল্পসহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে এই বিভাগীয় বোর্ড প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য দিয়ে আসছে। পল্লী শিল্প উদ্যোক্তাদের জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে দাখিলকৃত সকল সুপরিকল্পিত স্কীম এই বোর্ডের সহায়তা পাবার যোগ্য।

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী ও প্রাইভটে লিমিটেড কোম্পানী :

রাজশাহী জেলার অধিকাংশ ক্ষুদ্র শিল্প কারখানই প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী। এখানে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী নেই বললেই চলে, অথচ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী করলে বেশী শেয়ার বিক্রি করে পুঁজির পরিমাণ বেশীকরে অনেক ভাল ভাল শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যেতে পারে। যেমন :— আম ও লিচু প্রক্রিয়াজাতকরণের কারখানা রাজশাহী জেলায় গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজনীয় কিন্তু এ ধরণের কারখানায় পুঁজির পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অন্যান্য ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের চাইতে কিছুটা বেশী লাগবে বলে আজও এই শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি। অথচ এ ধরণের একটি কারখানার উৎপাদিত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা যেতে পারে। একই ভাবে শুধুমাত্র উদ্যোগ নিযে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী করে রাজশাহী জেলাতে গড়ে তোলা যেতে পারে সিগারেট তৈরীর কারখানা, ট্রানজিসটর সংযোজন কারখানা, ইত্যাদি। এছাড়াও পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী করলেই পাওয়া যাবে সহজ শর্তে সরকারী ঋণ, তথা ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরশন অব বাংলাদেশের ঋণ।

রাজশাহীর রেশম শিল্প

আবুল হোসেন মালেক

ভূমিকা :

বাংলাদেশের এক পুরাতন কৃষিজাত শিল্প রেশম শিল্প। 'বাংলাদেশের ইতিহাসে রেশম শিল্পের এক গৌরবোজ্জ্বল অতীত ঐতিহ্য রয়েছে। অবলুপ্ত ঐতিহ্যবাহী মসলিনের সমগোত্রীয় এই রেশম সম্পদ সপ্তদশ শতকের দিকে ব্যাপক প্রসার লাভ করে এবং ঐ সময় বিপুল পরিমাণ রেশমের ও রেশমজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হ'ত। ঐ সময় বাংলাদেশ রেশমের গুদামঘর বলে পরিচিত ছিল। পরবর্তী সময়ে রোগের প্রাদুর্ভাবে এবং সময়মত সরকারী সাহায্য ও সহযোগিতার অভাবে এই শিল্প ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়।

এদেশের জনবসতির এক বিরাট অংশ ইতিপূর্বে যেমন রেশম (শিল্পর) চাষ ও রেশম শিল্পের উপর নির্ভরশীল ছিলেন, এখনও তাই রয়েছেন। এর অন্যতম প্রমাণ রাজশাহী জেলার প্রত্যন্ত পল্লী এলাকা ভোলাহাট থানা, শিবগঞ্জ থানা ও চাবঘাট থানা। দেশের প্রায় সাড়ে সতের হাজার গ্রামীণ মানুষ এই শিল্পের উপর নির্ভরশীল।

রেশম শিল্প এমন একটা মাধ্যম যাতে গ্রামের ঘরে ঘরে কুটির শিল্প স্থাপন সহজ পথ করে দিতে পারে। কাঠঘাই, চরকা, রিলিং ও তাঁত স্থাপন করে এই সম্পদ দ্বারা প্রভূত পরিমাণ অর্থ উপার্জন করা যেতে পারে। এতে গ্রামীণ বেকার পুরুষ, মহিলা, যুবক-যুবা ও কিশোর কিশোরীদের পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান করা যায়। মূলতঃ এত অল্প পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে এত অধিক পরিমাণ কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা অন্য কোন শিল্পে সম্ভব নয়। এখানে উল্লেখ্য যে, যেখানে অন্যান্য কৃষি কার্যে প্রতিবিঘা জমিতে গড়ে ৬২ জন লোকের কর্মসংস্থান হয় সে স্থলে প্রতিবিঘা তুঁত জমির পাতা দিয়ে পোকা পালন ও রেশম সামগ্রী তৈরী করতে গড়ে ২২৬ জন লোকের কর্মসংস্থান করা সম্ভব। এই সম্পদ-এর উপর নির্ভর করে কোন প্রতিবন্ধকতা ব্যতিরেকেই পাশাপাশি ক্ষুদ্র, কুটির ও বৃহদাকার শিল্প গড়ে তোলার সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

ইতিহাস :

১৯৪৭ এর দেশ বিভক্তির পর এই দেশ (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) উত্তরাধিকার সূত্রে বগুড়া সদরে ও রাজশাহীর মীরগঞ্জে দুটো রেশম নার্সারী ধ্বংসাবশেষ হাতে পায়। সম্ভাবনাময় এই অর্থকরী সম্পদের উন্নতির জন্য সরকারীভাবে কোনই প্রচেষ্টা নেয়া হয় না এর পর থেকে। অবশ্য দেশ বিভাগের প্রায় বার বছর পর ১৯৫৯-৬০ সালে ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার কয়েকটি উন্নয়ন পরিকল্পনা নেয়া হয় পরে রাজশাহী বিভাগে ৭টি সহ সারা দেশে ১২টি সেরিকালচার নার্সারী, রাজশাহীতে একটি পরীক্ষামূলক সিল্ক ফ্যাক্টরী ও এটি রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট স্থাপন করা হয়। কিন্তু এ সমস্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের পর সেগুলির সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য পরবর্তী সময়ে প্রয়োজনীয় অর্থ না পাওয়া এবং প্রয়োজনীয় তত্ত্বাবধান ও সুষ্ঠু পরিচালনা সম্ভব হয় না যার ফলশ্রুতিতে রেশমের উন্নয়ন ক্ষেত্রে তেমন গতিও পরিলক্ষিত হয়নি। অধিকন্তু এই প্রকল্পগুলির পরিচালনার দায়িত্ব বার বার হাতবদলও সুষ্ঠু পরিচালনার যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতার

সৃষ্টি করে। অপরদিকে সরকার কর্তৃক রেশম সামগ্রীর উদার আমদানী নীতির ফলে দেশীয় রেশম শিল্প প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হওয়ায় এই শিল্পপ্রসারে যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটে।

১৯৭৫-৭৬ অর্থ বছরে সরকার এই অবহেলিত অথচ বিপুল সম্ভাবনাময় অর্থকরী সম্পদ রেশমের উন্নয়নের জন্য বিশেষ যত্ন নেন এবং রেশম সামগ্রীর উদার আমদানী নীতি প্রত্যাহার করেন। ফলে এ সময় থেকে রেশন শিল্প উন্নয়নের কাজের ক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী উত্তর পর্যায়ে এক নব উদ্যম ও নতুন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

সুষ্ঠু পুরিকল্পনাধীনে দেশে রেশম শিল্প উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়েছে। রেশমপোকা ও রেশমগুটিরও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছে। দ্বিচক্রী জাতের পলু রেশম-চাষীদের ঘরে ইতিমধ্যে বহুলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। পূর্বে যেখানে অপরিলক্ষিত রেশম গুটিবীজ রেশম চাষীদের মধ্যে সরবরাহ করা হতো সেক্ষেত্রে রেশম শিল্পে উন্নত অন্যান্য দেশের ন্যায় শতকরা একশো ভাগই রোগমুক্ত ডিম এখন রেশম চাষীদের মধ্যে সরবরাহ করা হচ্ছে। এতে করে উন্নত জাতের রেশমগুটি পাওয়া যাচ্ছে এবং বেসরকারী রেশমগুটি উৎপাদনকারীরা উৎসাহিত ও লাভবান হচ্ছেন। পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এন্ডিচাষও বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাধারণ চাষী ও রেশম উৎপাদনকারীদের মধ্যে এতে বেশ সাড়া পড়ে। বিশেষ করে বিভিন্ন সমাজ কল্যাণ মূলক প্রতিষ্ঠান যেমন, জাতীয় মহিলা সংস্থা, আর, ডি,আর, এস, কেয়ার, কিউকো, ইউনিসেফ, অকসফ্যাম, ক্যারিটাস, স্ব-উন্নয়ন ও ওয়ার্রর্ডশিয়ন এবং বিভিন্ন স্বনির্ভর ও গ্রাম সরকার এই প্রকল্পে খুব উৎসাহিত হয়েছেন। তারা এন্ডি পলু পালন চরকায় এন্ডি সুতা কাটার বিভিন্ন কর্মসূচীও গ্রহণ করেছেন।

তিন বছরের খতিয়ান :

রেশম শিল্পের বিভিন্ন প্রকল্পে গত ১৯৭৪-৭৫ অর্থ বছরের তুলনায় বর্তমান বছরগুলিতে কাজের উন্নতি ও অগ্রগতি আশাপ্রদ ও উৎসাহব্যঞ্জক। ১৯৭৪-৭৫ সালে যেখানে রেশন বীজ গুটি রোগমুক্ত রেশম পোকার ডিম, রেশম গুটি ও এন্ডি গুটি উৎপাদিত হয় যথাক্রমে ১৫ হাজার ৬৬ পাউন্ড, ১৫০০০টি, ৩ লক্ষ ৬৬ হাজার পাউন্ড ও ১২০০০ (বার হাজার) পাউন্ড মাত্র সেখানে ১৯৭৭-৭৮ অর্থ বছরে এই উৎপাদনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৩ হাজার পাউন্ড, ১৪,২৬,০০০ টি, ৬ লক্ষ ২৬ হাজার পাউন্ড ও ২২,০০০ পাউন্ড। অন্যদিকে যেখানে ১৯৭৪-৭৫ সলে তুঁতচাষী পরিবারের সংখ্যা ছিল ২১৩০টি এবং তুঁত জমির পরিমাণ ছিল ৮৭০ একর সেখানে ১৯৭৭-৭৮ সালে এই পরিমাণ দাঁড়ায় ২৮০০ টি পরিবার ও ১২৫০ একরে।

আবার সরকারী পর্যায়ে রেশম কারখানার অধীনে ১৯৭৪-৭৫ সালে রেশম সুতা ও রেশম বস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ যেখানে ছিল যথাক্রমে ৮ হাজার ৫ শত ২৫ পাউন্ড ও ৩৫ হাজার ২ শত গজ সেখান ১৯৭৭-৭৮ সালে তার উৎপাদন দাঁড়ায় ১২ হাজার ৬ শত গজ সেখানে ১৯৭৭-৭৮ সালে তার উৎপাদন দাঁড়ায় ১২ হাজার ৬ শত ৭৮ পাউন্ড ও ৪৯ হাজার ২৭০ গজে। একই সময়ে বেসরকারী খাতে রেশম সুতা উৎপাদিত হয় ৩৭ হাজার পাউণ্ড ও রেশম বস্ত্র উৎপাদিত হয় ২ লক্ষ ১৫ হাজার গজ।

এ ছাড়াও চলতি তুঁতচাষ মৌসুমে বাংলাদেশ সুইস যৌথ পরিকল্পনা ও সাধারণ সম্প্রসারণ কার্যক্রমের অধীনে দেশের বিভিন্ন স্থানে ৬২৫ একর জমিতে তুঁতচাষ সম্পন্ন হয়েছে। এর ফলে চলতি ১৯৭৮-৭৯ সালে বেসরকারী খাতে রেশম গুটি উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াবে ৮ লক্ষ পাউন্ডে ও তা থেকে ৭০ হাজার পাউন্ড রেশম সূতা পাওয়া যাবে।

এদিকে জমি ও উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে উৎপাদনের সরঞ্জামাদি ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার

ও উকৃত রোকের সংখ্যাও বেড়েছে। এ সময়ের মধ্যে দেশী রিলার ৩১৮টির স্থলে ৩২৫, কাঠঘাই ২২০টির স্থলে ৩৫০টি ও উন্নয়নমানের সোসিন ১২টি স্থাপন করা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে রেশম কারখানার রিলিং বেসিনের সংখ্যা ১০০টি হতে ২০০টিতে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিদ্যুৎ চালিত তাঁতের সংখ্যা ২০টি হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৪০টিতে দাঁড়িয়েছে।

নিম্ন বর্ণিত ছকে তিন বছরের কার্যক্রম দেখনো হয়েছে :

তিন বছরের কার্য্যাবলীর তুলনামূলক ছক

ক্রমিক সংখ্যা	খাতের নাম	উৎপাদন/অন্যান্য কার্য্যকাল	কার্যাবলীর নাম মন্তব্য

০১. সরকারী খাত :

ক) তুঁত জমির পরিমাণ— ১৩২ একর ১৬১-০ ১৭৯-০

খ) রেশম বীজগুটি-১৮০০০ পাঃ ১৯৭০০ পাঃ ২৩০০০ পাঃ

গ) রোগমুক্ত রেশম পোকার ডিম ১৬৭০০০টি ১০.৩১০০০টি ১৪,২৬০০০টি

ঘ) তুঁত চারা— ১,৫৭০০০টি ২,১৪০০০টি ৩,০০,০০০টি

ঙ) রেশম সুতা— ৯৫০০ পাঃ ১০৫৭০ পাঃ ১২,৬৮০ পাঃ

চ) রেশম বস্ত্র-৩৯,৫০০ গজ ৪৩,৫৬০ গজ ৪৯,২৭০ গজ

ছ) রিলিং বেসিনের সংখ্যা— ১০০টি ১০০টি ১৩০টি

জ) বিদ্যুৎ চালিত তাঁতের সংখ্যা ২০টি ২০টি ৩৪টি

০২. বেসরকারী :

ক) তুঁতজমির খাত পরিমাণ— ৯৭৫ একর ১০৯১ একর ১২৫০ একর

খ) রেশম গুটি ৪৩,৬০০০ পাঃ ৫,৪৪০০০ পাঃ ৬,২৬০০০ পাঃ

গ) এন্ডি গুটি— ১০,৮০০০ পাঃ ৮৫,০০০ পাঃ ১,৩২,৭০০ পাঃ

ঘ) রেশম সুতা ১৬,৭০০ পাঃ ২২,৫০০ পাঃ ৩৭,০০০ পাঃ

ঙ) রেশম বস্ত্র ১,৩৪,০০০ গজ ১,৮০,০০০ গজ ২,৯০,০০০ গজ

চ) রেশম চাষে নিয়োজিত লোক সংখ্যা ১৪,৪০০ জন ১৫,৩০০ জন ১৭,৫০০ জন

ছ) কাঠঘায়ের সংখ্যা ২৫০টি ২৯৫টি ৩৫০ টি

জ) উন্নতমানের ঘাইয়ের সংখ্যা ১২টি

ঝ) পদচালিত চরকার সংখ্যা— ১৮৫টি ৫০০টি

ঞ) নতুনভাবে তাঁত চাষ পলু পালন ও এন্ডি সুতা ছাটায়ের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মহিলার সংখ্যা— ৪১৫ জন ১৫০০ জন

সেরিকালচারের অপর এটি প্রকল্প গবেষণা ও ট্রেনিং ইন্সটিটিউট। এই প্রতিষ্ঠানের কাজ বর্তমানে সুনির্দিষ্ট পথে এগিয়ে চলেছে। রেশম শিল্প উন্নয়ন ও সম্প্রসারণক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠান ভবিষ্যতে যাতে সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারে সে জন্য শক্তিশালী পড়ে তোলার কাজ এগিয়ে চলেছে।

বর্তমান :

১৯৭৭-৭৮ অর্থ বছর বাংলাদেশের রেশম শিল্পের জন্য এক স্বর্ণযুগের সূচনা হয়। এই

বছর দেশের অবহেলিত অর্থকরী সম্পদ রেশমের সামগ্রীক উন্নয়নের জন্য সরকার বাংলাদেশ সেরিকালচার বোর্ড গঠন করেন। বিপুল সম্ভাবনাময় অর্থকরী এই সোনার গুটি রেশমের উন্নতি রেশম শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয় তাগিদ অনুধাবন করে গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর মাসের ২৮ তারিখে মহামান্য প্রেসিডেন্টের এক অর্ডিনান্স বলে রাজশাহীতে প্রধান অফিস করে এই বাংলাদেশ সেরিকালচার বোর্ড গঠন করেন।

বাংলাদেশ সেরিকালচার বোর্ড ইতিমধ্যেই রেশম শিল্পের ব্যাপক প্রসার ও উন্নয়নের জন্য দ্বিবার্ষিক সাধারণ সম্প্রসারণ, দ্বিবার্ষিক বাংলাদেশ-সুইস যৌথ প্রকল্প হাতে নিয়েছেন। এ ছাড়াও এক ক্রাশ প্রোগ্রাম প্রণয়ন করেছেন। এর ফলে দেশে রেশম ও রেশমজাত পন্যের উৎপাদন ৭/৮ গুণ বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ বর্তমানে ৬ লক্ষ পাউন্ড রেশম গুটির স্থলে ৪৬ লক্ষ ৫৪ হাজার পাউন্ড রেশমগুলি ও ৫০ হাজার পাউন্ড রেশমসুতার স্থলে ২ লক্ষ ৯০ হাজার পাউন্ড রেশম সুতা উৎপন্ন হবে। এই পরিকল্পনায় প্রায় গড়ে সাড়ে দশ হাজার পরিবারে ৮০ হাজার নুতন লোক কাজ কাবেন।

বাংলাদেশ-এর রেশম সম্পদের উন্নয়নের ও রেশম শিল্পের সম্প্রসারণের সাথে সাথে এই সম্পদ যাতে আন্তর্জাতিক বাজারে নিজের স্থান করে নিতে পারে তার জন্য সরকারী প্রচেষ্টা চলছে।

সামগ্রিক অবস্থা :

বাংলাদেশের রেশম সম্পদের প্রধান এলাকা রাজশাহী। এ জন্যেই রাজশাহীতে বাংলাদেশ সেরিকালচার বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। বোর্ড গঠনের পূর্বে অর্থাৎ এই নিবন্ধ লেখা পর্যন্ত (মার্চ ১৯৭৯ সাল) দেশে সরকারী খাতে ১২৫০ একর জমিতে তুঁত চাষ করা হয়। এতে বাৎসরিক রেশম গুটি উৎপাদনের পরিমান ৬ লক্ষ পাউন্ড। এন্ডি উৎপাদন হয় ১ লাখ ৩২ হাজার পাউণ্ড সিল্কের সুতা ৫০ হাজার পাউন্ড, এন্ডি সুতা ২২ হাজার পাউন্ড, রেশন ও এন্ডি পণ্য (কাপড়) উৎপাদন ৪ লাখ ১৫ হাজার গজ।

এ সময়ে দেশীয় পদ্ধতিতে সুতা উৎপাদনের কাঠঘাই এর পরিমাণ ৩৫০টি, সিল্ক হস্তচালিত তাঁত ৫০০টি, কার্য্যরত পা চালিত চরকা ১৫০০টি। এ সময়ে রেশম উৎপাদনের সংগে জড়িত লোকের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ১৬ হাজার। এর মধ্যে রেশম উৎপাদনে প্রায় ১১,৬৫০ জন ও এন্ডি উৎপাদনে প্রায় ৫ হাজার জন।

সরকারী খাতে :

এ সময়ে রেশম প্রকল্পের অধীনে ১২টি রেশম নার্সারী, রাজশাহীতে একটি সিল্ক ফ্যাক্টরী ও একটি রেশম গবেষণা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে।

রেশম নার্সারীর অবস্থান :

০১. ভোলাহাট থানা (রাজশাহী) ০২. চাঁপাই নবাবগঞ্জ (রাজশাহী) ০৩. মীরগঞ্জ (রাজশাহী) ০৪) ঈশ্বরদী (পাবনা) ০৫. বগুড়া ০৬. রংপুর ০৭. দিনাজপুর ০৮. কোনাবাড়ী (ঢাকা), ০৯. ময়নামতি (কুমিল্লা) ১০. ভাটিয়ারী (চট্টগ্রাম) ১১. চন্দ্রঘোনা (পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং ১২. খাদিম নগর (সিলেট)।

শিবগঞ্জ (রাজশাহী) একমাত্র রেশম বস্ত্র উৎপাদনের কুটির শিল্প সমৃদ্ধ এলাকা। এখানে বেসরকারী পর্যায়ের তাঁতে রেশমী বস্ত্রাদি উৎপাদন করা হয়।

বাংলাদেশ সেরিকালচার বোর্ড যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন তাতে ১৯৮১ সাল নাগাদ ৮ গুণ উৎপাদন বাড়বে এবং রেশম সামগ্রীর উন্নয়ন সাধন হবে।

এই পরিকল্পনায় বেসরকারী খাতে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা ও উন্নয়ন সাধন হবে :

ক) ৪০০ রোগমুক্ত বীজ সরবরাহ কেন্দ্র চালু হবে।
খ) ৭৫০ নতুন রিলিং বেসিন চালু করা হবে।
গ) ১০০ নতুন হস্ত চালিত তাঁত কাজ শুরু করতে পারবে।
ঘ) ১০,৫০০ নতুন পরিবার রেশম চাষের সংগে জড়িত হবে।
ঙ) ৮,৪০০ নতুন পরিবার এন্ডি চাষ করবে।
চ) ৮,০০০ নতুন পা-চরকা চালু করা যাবে।

জমি ও উৎপাদন :

ক ১ তুঁত চাষ : ৪৭৩০ একর-এ।
খ ২ রেশম গুটি (কোকন) উৎপাদন ৪৬ লাখ ৯০ হাজার পাউন্ড
গ ৩ এন্ডি কোকন উৎপাদন ৭ লাখ পাউন্ড।
ঘ ৪ রেশম সুতা উৎপাদন ২ লাখ ৯০ হাজার গজ।
ঙ এন্ডি সূতা উৎপাদন ৩২ লাখ ৪৮ হাজার গজ।
চ সিল্ক ও এন্ডি কাপড় উৎপাদন ৩২ লক্ষ ৩৮ হাজার গজ।
ছ ৪ কাঠঘাই : এর কোন বৃদ্ধি হবে না। ২৫০টি মতই থাকবে।
জ এই শিল্পে উপকৃত ও সংযুক্ত হবে—৮০,০০০ লোক।

রেশম সম্পদ ও রেশম শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসারের জন্যসরকার ব্যাপক প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। বেসরকারী উদ্যোগে এই শিল্পের সম্প্রসারণ খুবই প্রয়োজন। এটিই একমাত্র শিল্প যাতে গ্রামে-গঞ্জে স্বল্প ব্যয়ে কুটির শিল্প হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পাবে। স্ত্রী-পুরুষ, যুবা-বৃদ্ধা, পঙ্গু সকলেই এই শিল্পে-এ কাজ করতে পারে।

রেশম চাষীদের মধ্যে বাংলাদেশ সেরিকালচার বোর্ড রেশম শিল্প ঋণ ও ভতুর্কী চালু করেছেন। কৃষকরাও এখন উৎসাহী হয়ে এগিয়ে আসছেন।

সর্বোপরি রাজশাহীর রেশম সম্পদ বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতির বুনিয়াদ। সাথে সাথে দেশের অর্থনীতির সড়ক।

বিঃ দ্রঃ

০১. **তুঁত :** এক রকমের গাছ। রেশম পোকা এর পাতা খেয়ে বাঁচে।
০২. **কোকন :** রেশম পোকার মুখের লালা থেকে যে গুটি তৈরী হয় তাকেই রেশম গুটি বা কোকন বলে। সাদা ও হলুদ রংয়ের গুটি হয়। এ গুলোকে সোনার গুটি বলা যায়। কারণ, সোনার চেয়েও রেশম সুতা বেশী অর্থ আনতে পারে।
০৩. **এন্ডি :** এন্ডি এক প্রকার রেশম। দেশীয় ভেরেন্ডা বা এন্ডি পাতা খেয়ে এই পোকা বাঁচে। তা ছাড়া কাসাবা ও মিষ্টি আলুর পাতাও এই পোকার অন্যতম খাদ্য।
০৪. **কাঠঘাই : দেশীয় পদ্ধতিতে সুতা কাটা বহু পুরাতন যন্ত্র পদ্ধতিতে সুতা কাটা হয় কাঠঘাইয়ে। ভোলাহাট অঞ্চলে এগুলো চালু আছে।**

রাজশাহীর পত্র-পত্রিকা

খন্দকার আমিনুল হক

প্রকাশনা শিল্পের সংকটের ফলে রাজশাহীতে মুদ্রণ ব্যবস্থা পশ্চাদপদ। এরই ফলে এখান থেকে নিয়মিত পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করা দুরুহ ব্যাপার। নানা সমস্যায় জর্জরিত এখানের মুদ্রণ শিল্পগুলি-ফলে অনেক আশা-ভরসা নিয়ে শুরু হয়েও আশানুরূপ শেষ হয়না যাত্রা। তবুও প্রতিকুলতার মধ্য দিয়েও বহু কাল থেকেই এখানের পত্র-পত্রিকা গুলো বেরিয়েছে। আবাব বন্ধ হয়েছে-- আবার বেরিয়েছে। সমাচার দর্পণ (১৮১৮) প্রকাশের ৪৮ বৎসর পর রাজশাহী থেকে হিন্দু রঞ্জিকা প্রথম প্রকাশিত হয়ে অনেক দিন চলে ছিল। আর এ দীর্ঘ কালের মধ্যে দেশে অনেক পরিবর্তন এসেছে, চেতনার উন্মেষ ঘটেছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার জন্ম হয়েছে। এ সমস্ত পত্রিকা নিয়ে এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাচ্ছে :

হিন্দু রঞ্জিকা :

প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন মাস ১২৭২ সালে। ইংরাজী ১৯৩৬, ১লা মার্চ। সম্পাদনায় শ্রীনাথ সিংহ রায়। পত্রিকাটি ১৯৫২ সাল পর্যন্ত চলেছিল। দীর্ঘ কালের স্বাক্ষী হিসেবে অনেক স্মৃতিই পত্রিকার পাতায় বিধৃত হয়ে আছে। পত্রিকাটি যাঁদের সম্পাদনায় পরপর প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁরা হলেন : চন্দ্র মিত্র, শ্রী প্রমদা সান্যাল, শ্রী দ্বিজেষ গোবিন্দ সেন এবং সর্ব শেষে শ্রী শক্তি ভূতি চৌধুরী। প্রথম মাসিক পত্রিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও পরে ১২৭৫ এর বৈশাখ থেকে সাপ্তাহিক হিসেবে প্রকাশিত হতে থাকে।

হিন্দু জাতিকে জাগরনের উদ্দেশ্যে 'বোয়ালিয়া ধর্মসভা' (১২৬৭ সালে) প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার মুখপত্র সাপ্তাহিক হিন্দু রঞ্জিকা। প্রথমতঃ ঢাকার সুলভ প্রেস থেকে মুদ্রিত হতো। পরবর্তী কালে দুবলহাটির জমিদারের অর্থানুকুল্যে প্রেস খরিদ করে পত্রিকা ছাপা হতে থাকে। এটিই রাজশাহীর প্রথম মুদ্রণ যন্ত্র—তমোঘ্ন যন্ত্রালয়। উক্ত প্রেসটি এখনও রাজশাহী ধর্মসভা কর্তৃক পরিচালিত হয়ে আসছে।

পত্রিকায় সাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

রাজশাহী সংবাদ :

সাপ্তাহিক রাজশাহী সংবাদ প্রথম প্রকাশ, ১২৭৭। ব্রাহ্ম সমাজের খেদমত করে ১২৮২ সালে বন্ধ হয়ে যায়। সম্পাদক— শ্রী যুক্ত জগদ্বন্ধু সরকার।

জ্ঞানাঙ্কুর :

মাসিক জ্ঞানাঙ্কুর ১২৮২ সালে প্রকাশিত হয়। ৫ বৎসর চলার পর পত্রিকার রূপ বদল হয়ে সাপ্তাহিকে রূপান্তরিত হয়। জ্ঞানঙ্কুরের সম্পাদক-শ্রী কৃষ্ণদাস। এই সময়ের প্রকাশিত শ্রী রাম সর্বস্ব বিদ্যাভূষণের সম্পাদিত প্রতিবিম্ব পত্রিকাটি জ্ঞানাঙ্কুরের সঙ্গে একত্রিত হয়ে জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব নামে প্রকাশিত হতে থাকে। পত্রিকাটি ১৫/১৬ বৎসর পর্যন্ত চলেছে। এই পত্রিকাতে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও রঙ্গলালের মত শক্তিমান লেখকগণ লিখেছিলেন।

নুর-অল-ইমান :

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে নূর-অল-ইমান সমাজ গঠিত হয়। উক্ত সমাজের মুখপত্র নুর-অল-ইমান পত্রিকা। যদিও এই পত্রিকাটি মাত্র তিন মাস চালু ছিল তথাপি এই পত্রিকার প্রস্তাব অস্বীকার করা যায় না। বৈশাখ ১৩২৬ সালে পুনরায় নুর-অল-ইমান সমাজের অন্যতম সদস্য মির্জা মোহাম্মদ ইউসফ আলীর সহযোগিতায় 'মুসলমান শিক্ষা সমবায়' নামে পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বৎসরে তিনবার করে পত্রিকা প্রকাশের ওয়াদা করলেও বেশীদিন স্থায়িত্ব বা টিকেনি।

১ম সংখ্যা আষাঢ় ১৩০৭ সাল। নুর-অল-ইমান সমিতি কর্তৃক সম্পাদিত কতিপয় মৌলবী সাহেবের লিখিত ও অনুমোদিত বিষয় মির্জা মোহাম্মদ ইউসফ আলী কর্তৃক শৃঙ্খলাবদ্ধ ও মঞ্জুরীকৃত। নুর-অল-ইমান সমাজের অন্যতম সভ্য মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ কর্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা ৪নং কড়েয়া গোরস্থান রোড, রেয়াজ উল ইসলাম প্রেসে মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহম্মদ দ্বারা মুদ্রিত।

মনোগ্রাফ :

বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামের ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত ইতিহাস, শিল্প, সংস্কৃতি ও প্রত্নতত্ত্ব মূলক গবেষণা পত্রিকা।

১ম সংখ্যা, এপ্রিল ১৯২৬ সালে, এন.জি. মজুমদার এম.এ. কিউবেটার বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি কর্তৃক সম্পাদিত।

মার্কাবুল এসলাম :

বাগমারা থানার অন্তর্গত তাহেরপুর থেকে প্রকাশিত মারকাবুল এসলাম বা মোসলেম তরণী মাসিক পত্রিকা। ১৩৩০ পৌষ থেকে ১৩৪৩ সাল পর্যন্ত চলেছিল। সম্পাদক এম. মোবারক হোসেন। (প্রথমত আর.এল প্রেস নাটের থেকে মুদ্রিত। পরে হেমায়েত এসলাম সি পি প্রেস রাজশাহী থেকে মুদ্রিত। পত্রিকার পরিচালক ও প্রতিষ্ঠাতা কেয়ামতুল্লা খোন্দকার নিজস্ব হাত মেশিন সংগ্রহ করার পর থেকে নিজস্ব প্রেসে মুদ্রিত হতে থাকে। মাসিক ধর্ম ও সাহিত্য পত্রিকা)। ১ম বৎসরের পর অর্থনৈতিক কারণে পত্রিকাটি অনিয়মিত ভাবে ১৩৪৩ সাল পর্যন্ত চলেছে।

ঐতিহাসিক চিত্র :

ত্রৈমাসিক সহিত্য ও ইতিহাস সংক্রান্ত গবেষণা পত্রিকা। প্রথম প্রকাশ ১৩১১। রাজশাহী শহর থেকে প্রকাশিত। সম্পাদনায়, অক্ষয় কুমার মৈত্র। এক বছর চালু ছিল। দিঘাপতিয়া রাজ কুমার শরৎ কুমার রায়ের উপন্যাস মোহনলালের দুই অধ্যায় এই পত্রিকায় ছাপা হয়।

পল্লীবান্ধব :

মির্জা ইউসফ আলী সাহেবের স্মৃতি রক্ষার্থে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মির্জা মোঃ ইয়াকুব আলীর সম্পাদনায় ১৯২৯ সালে সাপ্তাহিক পল্লীবান্ধব প্রকাশিত হয়। নিজস্ব প্রেস হেমায়েত এসলাম ম্যাশিন প্রেস রাজশাহী থেকে মুদ্রিত। শিল্প সমবায়, স্বায়ত্ব শাসন, কৃষি, স্বাস্থ্য ও সমাজ বিষয় ফিচার প্রকাশিত হতো।

পত্রিকাটি গুরুত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। এখানে পাকিস্তান পূর্ব যুগে

ঢাকা থেকে প্রকাশিত একখানা সাপ্তাহিকের উল্লেখ আমরা প্রয়োজনীয় বলে মনে করি। আমরা শহীদ নজীর আহমদের সাপ্তাহিক 'পাকিস্তানের' কথাই বলছি। কাগজ খানা ক্ষুদ্রকায় ছিল বটে, কিন্তু মুসলিম বাঙলার সাংবাদিকতায় তার একটা মর্যাদাবান আসন পাকা হয়ে গিয়েছিল বলে আমাদের ধারণা। এ ছাড়া বাংলা মফস্বল থেকে কয়েকখানা ভালো সাপ্তাহিক পত্রের প্রকাশ দেখা গেছে— তার মধ্যে জলপাইগুড়ির 'নিশানা' সিলহটের 'যুগভেরী' এবং রাজশাহীর 'পল্লী বান্ধব' উল্লেখযোগ্য।

সাপ্তাহিক রাজশাহী সমাচার :

সাপ্তাহিক রাজশাহী সমাচারের প্রথম প্রকাশ ১২৮২ সালের বৈশাখ মাসে। সম্পাদক, বেনী মাধব। এক বছর চলার পর বন্ধ হয়ে যায়।

মাসিক 'রাজশাহী বাসী' করচমরিয়া হতে প্রকাশিত। আয়োজক রাজকুমার সরকার। মাত্র কয়েক সংখ্যা বের হয়।

শিক্ষা পরিচর :

মাসিক শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা ১২৯৬ সালে অক্ষয় কুমার মৈত্র কর্তৃক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। ৫ বছর চলার পর বন্ধ হয়ে যায়।

মাসিক চিকিৎসা :

রাজশাহী থেকে চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রথম পত্রিকার প্রকাশ ১২৯৬ (বাংলা)। মাত্র কয়েক সংখ্যা প্রকাশের পর বন্ধ হয়ে যায়। মাসিক চিকিৎসা তালন্দ কার্যালয় হতে প্রকাশিত। সম্পাদনায়, বিনোদ বিহারী রায়।

ধর্মবন্ধু :

মাসিক পত্রিকাটি ১২৯৮ সালে প্রকাশিত হয়। ২/৩ সংখ্যা প্রকাশের পর বন্ধ হয়ে যায়।

উৎসাহ :

১৩০৪ সালে সুরেশ চন্দ্র সাহ কর্তৃক সম্পাদিত আর একটি ক্ষণজীবি পত্রিকা।

উৎসব :

উৎসব ১৯১৫ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পাদনায় ব্রজসুন্দর সান্যাল। বন্ধ হওয়ার সঠিক তারিখ পাওয়া যায়নি।

মুষ্টি :

১৩২৫ সালে বয়েন উদ্দীন আহমদ কর্তৃক সম্পাদিত। চাউলের মুষ্টি দ্বারা পরিচালিত বলে পত্রিকার নামকরণ করা হয় 'মুষ্টি'।

নয়াজামানা :

সাপ্তাহিক সংবাদ সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকার প্রথম প্রকাশ ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত

জীবিত ছিল। সম্পাদনায় মুসাদ্দারুল হক। রাণীবাজারস্থ নয়াজামানা প্রেস থেকে মুদ্রিত। মুসলিম তহ্জিব ও তমুদ্দনের প্রতিফলন ঘটাতে সচেষ্ট ছিলে।

ধর্মকেন্দ্রীক পত্রিকা নিয়েই রাজশাহী তথা বাংলাদেশেব পত্রিকাব গোড়াপত্তন। হিন্দু বঞ্জিকার সংগে সংঘাতের ফলে একদিকে ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র বাজশাহী সংবাদ, অপবদিকে মুসলমান সমাজের নূর-অল-ইমান, মুসলমান শিক্ষা সমবায়, মাকাবুল এসলাম প্রভৃতি পত্রিকাব প্রকাশ ঘটে।

বরেন্দ্র মিউজিয়ামের মুখপত্র 'মনোগ্রাফ' আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পত্রিকা। বর্তমানে পত্রিকাটির নাম Joarnal of the Varendra Research Museum

রাজশাহী থেকে প্রকাশিত পূর্ববর্তী কালের পত্র পত্রিকা বিশেষভাবে সাহিত্য সংস্কৃতি ধর্মীয় ও সংবাদ পরিবেশনায় নিয়োজিত। বিভাগ পরবর্তী কালে ঢাকা থেকে কিছু কিছু পত্রিকা বেব হলেও রাজশাহী থেকে তেমন প্রয়াস দেখা যায় নি।

বিভাগ পরবর্তী কালের রাজশাহীর পত্র পত্রিকা প্রকাশ কালানুযায়ী আলোচিত হল।

ছাত্রলীগ :

সাপ্তাহিক আকাবে শেখ পাড়াস্থ মুসলিম ছাত্রলীগ অফিস হ'তে প্রকাশিত। কয়েক সংখ্যা প্রকাশের পর বন্ধ হয়ে যায়। সম্পাদনায় অধ্যাপক কাজী আবদুল মান্নান ও অধ্যাপক একবামুল হক।

দিশারী :

মাসিক সাহিত্য পত্রিকা। ১৯৫১ সালে দিশারী সাহিত্য মজলিসেব মুখপত্র হিসাবে প্রকাশিত হয়। সম্পাদনায় অ্যাডভোকেট হাবিবুর রহমান শেলী ও অধ্যাপক একবামুল হক। মাত্র কয়েক সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রবাহ :

১৯৫৪ সালে রাজশাহী থেকে সাহিত্য মাসিক হিসাবে প্রকাশিত হয়। কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশের পর বন্ধ হয়ে যায়। প্রথম সম্পাদক জনাব আবদুস সামাদ। এ.এইচ.এম. কামরু হাসান হেনা নির্বাহী সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন।

যাত্রী :

প্রথমে মাসিক, পরবর্তী সময়ে দ্বিমাসিক এবং ত্রৈমাসিক আকারে প্রকাশিত হয়েছে। বৈশাখ ১৩৬৭ হ'তে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮ পর্যন্ত চলেছিল। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ব্যক্তি সম্পাদনাব কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্য সম্পাদনায়, খোন্দকার সিরাজুল হক ও দ্বিজেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী। যাত্রী কার্য্যলয় সাগরপাড়া হ'তে প্রকাশিত। ৩য় সংখ্যার সম্পাদনায়, রওশন আলী, ৪র্থ সংখ্যা সম্পাদনায় দ্বিজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, খোন্দকার সিরাজুল হক এবং খোন্দকার আমিনুল হক। প্রধান উপদেষ্টা : ড. মজহারুল ইসলাম। ৭ম ও ৮ম সংখ্যা থেকে বাববার সম্পাদনা করেন খোন্দকাব সিরাজুল হক ও খোন্দকার আমিনুল হক (বর্তমান প্রবন্ধকার)। ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১৩৬৮ থেকে ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্র হিসাবে বের হয়। প্রধান উপদেষ্টা, ডক্টর আহমদ হোসেন। যাত্রীর অপমৃত্যুর পর যাত্রীর লেখক বৃন্দের সহযোগিতায় 'উত্তরবঙ্গ' পত্রিকা বেব হয়। মাত্র ২টি সংখ্যা

বেরিয়েছে। উত্তর বঙ্গ সাহিত্য পরিষদের ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্র 'উত্তরবঙ্গ' ১ম সংখ্যা বৈশাখ ১৩৭১। সম্পাদনায় জিয়াউল আলম মোঃ ইউসুফ খান।

পুর্বমেঘ :

শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি মূলক ত্রৈমাসিক পত্রিকা। আষাঢ়, ১৩৬৭ হতে শ্রাবণ-চৈত্র ১৩৭৭ পর্যন্ত চলেছিল। সম্পাদক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী এবং মুস্তফা নুরুল ইসলাম। ডক্টর এ.আর মল্লিক কর্তৃক কাদিরগঞ্জ রাজশাহী থেকে প্রকাশিত। দীর্ঘ ১১ বৎসর ধরে পত্রিকাটি চলেছিল। শেষের বছরগুলির গতিধারা শ্লথ হয়ে চলতে চলতে একেবারে থেমে গেছে। এই পত্রিকায় তদানীন্তন বিশিষ্ট লেখকগণ লিখতেন।

সাহিত্যিকী :

১৯৫৯ সালে প্রকাশিত হয়ে আজও গতি ধারা অক্ষুণ্ন রয়েছে। সাহিত্যিকী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগেব মুখপত্র। সাহিত্যিকী বছরে ২ বার প্রকাশিত হয়, শরৎ ও বসন্তে। গবেষণামূলক পত্রিকা হিসাবে অনন্য। পদাধিকার বলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান সম্পাদনা করে থাকেন। প্রথম সম্পাদক ডক্টর মযহারুল ইসলাম।

সাহিত্য পত্র :

রাজশাহী জিন্নাহ ইসলামিক ইনসটিটিউটের বার্ষিক মুখপত্র। বর্তমানে উক্ত প্রতিষ্ঠানের নাম, মাহ মখদুম ইন্সটিটিউট। মাত্র একটি সংখ্যা ১৩৬৬ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পাদনায় মুস্তফা নুরউল ইসলাম।

রাজশাহী বার্তা :

তৎকালীন রাজশাহী জেলা কাউন্সিলের সভাপতি খান মোহাম্মদ শামসুব রহমান সাহেবের সভাপতিত্বে ১৯৫৯ সালে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জনাব আবদুস সামাদ সদস্যের মাধ্যমে এই পত্রিকার নামকরণ হয় রাজশাহী বার্তা। রাজশাহী বার্তা ১৯৬১ সাল পর্য্যন্ত পাক্ষিক হিসাবে প্রকাশিত হয় এবং গত ১৯৬১ সালেব জুন মাসে তদানীন্তন জেলা প্রকাশক জনাব মুজিবুল হক সাহেবের উদ্যোগে প্রথম সাপ্তাহিক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। এর পর হতে বাজশাহী বার্তা জেলা পরিষদের অর্থানুকূল্যে যথারীতি সাপ্তাহিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। শুরু হতেই জনাব মুহাম্মদ আবদুস সামাদের সম্পাদনায় রাজশাহী বার্তা এই জেলা তথা উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন মুখীন উন্নয়নর গতিধারা ও এ অঞ্চলের সমস্যাদির উপর প্রবন্ধ নিবন্ধ সহ সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা সমৃদ্ধ একটি প্রাচীন সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসাবে পরিচিত। ১৮৭১ সালের বিপর্যয়ের মুখে কিছুদিন জনাব আজিজুল হক পত্রিকার সম্পাদনায় থাকলেও জনাব আবদুস সামাদ পুনরায় দায়িত্ব গ্রহণ করে পত্রিকাটি প্রকাশ করে আসছেন। বর্তমানে এই পত্রিকা নূতন ব্যবস্থাপনা বোর্ডের পরিচালনায়, নিজস্ব কম্পোজ বিভাগ ও বর্তমান জেলা প্রশাসক জনাব আমিনুল হকের ঐকন্তিক প্রচেষ্টায় জেলা পরিষদ কর্তৃক নূতন ছাপাখানার ব্যবস্থা করায়, সম্পূর্ণতা অর্জ্জন করে নূতন গতি ও আঙ্গিকে প্রকাশিত হতে চলেছে।

কেতন :

প্রথম প্রকাশ ১৯৬৫ সালের আগষ্ট মাসে। সম্পাদক কাজী আবদুল মালেক। ঈদ সংখ্যা

কেতন, ৩য় সংখ্যা, মাঘ ১৩৭২ এ বের হয় সেখানে দ্বিমাসিক সাহিত্য পত্র হিসাবে দেখানো হয়েছে। ১৩ই এপ্রিল ১৯৬৬ তারিখ থেকে পাক্ষিক। ৬ষ্ঠ-৮ম (যুগ্ম সংখ্যা) প্রকাশ কাল আগষ্ট-ডিসেম্বর, ১৯৬৬। এটিই কেতনের শেষ সংখ্যা।

বনাণী :

মাসিক পত্রিকা। ১৯৬৬ সালের ডিসেম্বর। ১ম সংখ্যা এবং জানুয়াবী ১৯৬৭ এ ২য় সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সম্পাদনায় ছিলেন তাজুল ইসলাম এবং মোঃ নুরুল আমিন। প্রকাশক মোঃ সাইফুল ইসলাম। গ্রেটার রোডস্থ অইডিয়াল প্রেসে মুদ্রিত। ১৯৬৭ সালেব মার্চ মাস (৪র্থ সংখ্যা) পর্যন্ত চলেছিল।

উত্তর অন্বেষা :

ত্রৈমাসিক সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য পত্র। ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা বৈশাখ আষাঢ়। ১৩৭৪ সম্পাদক : মযহারুল ইসলাম। কয়েক সংখ্যা প্রকাশের পব বন্ধ হয়ে যায়।

সুনিকেত মল্লার :

মোট ৪টি সংখ্যা বের হয়। সম্পাদনা মহসিন রেজা। ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২৫শে চৈত্র ১৩৭৩।

একান্ত :

শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি মূলক ত্রৈমাসিক পত্রিকা। ২টি সংখ্যা দৃষ্টি গোচব হয়েছে। প্রথম সংখ্য, কার্তিক-পৌষ ১৩৭০। আবদুল মান্নান সম্পাদিত।

সোনার দেশ :

১৯৭০ সালেব জুন মাস থেকে সাপ্তাহিক হিসাবে ২৫শে মার্চেব পর বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তী কালে রাণীবাজারস্থ কার্য্যালয়ে নিজস্ব প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক, সরদার আমজাদ হোসেন। পরবর্তী কালে ভাবপ্রাপ্ত সম্পাদক. সাঈদ উদ্দিন আহমদ। প্রকাশিকা সোনার দেশ পাবলিশিং লিমিটেডের পক্ষে মিসেস জাহানারা জামান। আওয়ামী লীগেব মুখপত্র হিসাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে বিশেষ ভাবে অংশগ্রহণ করেছে।

উত্তর বাংলা :

১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে সাপ্তাহিক আকারে প্রকাশিত হয। সম্পাদক, শাহ নজমুল হক চৌধুরী। অবহেলিত জনগণের মুখপত্র শ্লোগান দিয়ে বেবিয়ে পত্রিকাটি ৭১ এব মার্চের পর বন্ধ হয়ে যায়।

বাংলার কথা :

সাপ্তাহিক পত্রিকা। প্রথম প্রকাশিত স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যুক্ত এলাকায়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর রাজশাহী থেকে পুনঃ প্রকাশিত হয়। ১৯৭২ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিল। সম্পাদক ওবায়দুর রহমান।

নতুনকাল :

১৯৭২ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর রাজশাহী থেকে সাপ্তাহিক হিসাবে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি, আতাউর রহমান। রাজনৈতিক কারণে মাত্র ১৩টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়ে যায়।

বাংলা সাহিত্যিকী :

সাপ্তাহিক সংকলন। মাত্র তিন সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক সাইফুল ইসলাম। এই গোষ্ঠি পরে বেশ কিছু সংকলন বিভিন্ন নামে প্রকাশ করে।

আন্তরিক :

পাক্ষিক সাহিত্য সংকলন। ১৩৮২ বাংলা সনে। সম্পাদক, আবুল হোসেন সরকার। পরে নিয়মিত সাপ্তাহিক হিসাবে আন্তরিক বেশ কিছু সংখ্যা প্রকাশ পেয়েছে।

এ ছাড়াও অন্যান্য সংকলনের মধ্যে নাম পাওয়া গেছে সুর্যসুন্দর, আগামীকাল, সঙ্গী দুঃসময়, পূর্ণাশা, সম্প্রতি সাজানো, অহংকার, প্রশ্রবণ, সমুদ্র সৈকতে কল্লোল প্রভৃতি। এগুলোর বেশীর ভাগই বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী কলেজ, সিটি কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন দিবস উপলক্ষে সংকলন হিসাবে বের করেছে।

প্রতীতি :

উত্তরা সাহিত্য মজলিসের মুখপত্র প্রতীতি। ১৯৭৩ সালে ২৫শে ডিসেম্বর এ প্রতিষ্ঠানের জন্ম। মজলিস এ পর্য্যন্ত মোট ৯টি বিভিন্ন আকারের পত্রিকা বের করেছে। কবি বন্দে আলী মিয়া এই পত্রিকার বেশ কয়েকটি সংখ্যা সম্পাদনা করেছেন।

আদ দাওয়াত :

বিভাগ পববর্তীকালে রাজশাহী থেকে ধর্মীয় পত্রিকা 'রাহবার' মাত্র ২টি সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর বন্ধ হয়ে গেলে পরবর্তীকালে নিয়মিত ভাবে আদ-দওয়াত প্রকাশিত হচ্ছে। প্রথম সংখ্যা ১৩৯৬ হিঃ রমজান মাসে (১৯৭৬) প্রকাশিত হয়। সম্পাদনায়, আবুল কাসেম। প্রথম বর্ষে মোট ৯টি সংখ্যা মাসিক আদ দাওয়াত প্রকাশিত হয়। ২য় বর্ষে মোট ৯টি সংখ্যা এবং তৃতীয় বর্ষ অর্থাৎ ১৯৭৮ সালে মোট তিনটি সংখ্যা বের হয়েছে। আরবীমাস হিসাবে বর্ষ ধরা হয়েছে। ধর্ম ভিত্তিক গবেষণা মুলক লেখা প্রকাশিত হয়।

রাজশাহীর তদানীন্তন সাহিত্যিক জনাব তামসিরুদ্দিন আহমদ কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা 'পল্লী সমাজ' প্রায় ছয়বৎসরকাল প্রকাশ পায়। তৎকালীন রাজশাহী গুরু ট্রেনিং স্কুলেব শিক্ষক তামসিরুদ্দিন এই পত্রিকায় শিক্ষার মান ও উন্নয়নের গতিধারাকে তুলে ধরেছেন। ইহা মনে হয় ১৯৪০ সালে প্রকাশ পেয়ে অনিয়মিতভাব ছয় বৎসর কাল ধরে প্রকাশিত হয়।

দৈনিক বার্তা :

১৯৭৬ সালের ১৫ই অক্টোবর থেকে দৈনিক বার্তা রাজশাহী থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। উত্তরবঙ্গ থেকে এটিই প্রথম এবং একমাত্র জাতীয় পত্রিকা, এটি সরকার নিয়ন্ত্রিত দৈনিক সংবাদ পত্র।

৭৬ সালের ৬ই জুলাই তদানীন্তন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এবং পরবর্তী কালের রাষ্ট্রপতি লেঃ জেনারেল জিয়াউর রহমান রাজশাহী বিভাগ উন্নয়ন বোর্ডের প্রথম বৈঠক উদ্বোধন করতে আসেন। সেদিন অপরাহ্নে স্থানীয় সার্কিট হাউসে রাজশাহী অঞ্চলের পক্ষ থেকে কয়েকজন সাংবাদিকের দাবীর প্রেক্ষিতে দুমাসের মধ্যে রাজশাহী থেকে একটি বাংলা জাতীয় দৈনিক প্রকাশ করা হবে বলে ঘোষণা করেন।

বরেন্দ্র একাডেমী পত্রিকা :

বরেন্দ্র একাডেমীর মুখপত্র। বরেন্দ্র অঞ্চলে তথা উত্তরাঞ্চলেব পাঁচটি জেলার ইতিহাস, সাহিত্য, সংস্কৃতির উপর গবেষণা পবিচালনা, ভবিষ্যতে দেশেব এই অঞ্চলেব পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা সাহিত্য সংস্কৃতিক আন্দোলনেব সক্রিয় অংশগ্রহণের লক্ষ্যেই এই প্রতিষ্ঠানেব জন্ম। ববেন্দ্র একাডেমী পত্রিকা, ১৯৭৮, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা। সম্পাদনা আতাউব বহমান, প্রকাশনা একাডেমী ও পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক আবুল হোসেন মালেক। ১ম বর্ষ, ২য়, ৩য় ও সম্মেলন সংখ্যা ১৩৮৫। সম্পাদনায় আতাউর রহমান। এ ছাড়াও একটি স্বতন্ত্র পত্রিকা "ঝড়ের মধ্যে বসবাস"। বরেন্দ্র একাডেমির বৈশাখ সংকলন, ১৩৮৫। সম্পাদনায় সেখ আতাউর রহমান। পত্রিকাটি পরে ষান্মাসিক হিসেবে নিয়মিত প্রকাশিত হয়।

কৌশিক :

এই নামে ১৯৭৯ সালে এটি নুতন পত্রিকার যাত্রা শুরু হয়। সম্পাদক ড. কাজী আবদুল মান্নান। যুগ্ম সম্পাদক আসাদুজ্জামান। বাংলা গবেষণা সংসদ, বাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখপত্র। রাজশাহী শহর থেকে দূরে পল্লী অঞ্চল বানেশ্বর এবং বাগমাবা থানাব ভটখালি গ্রামের সাহিত্য ও সংস্কৃতমনা যুবকরা পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছেন। ৭৮এ বানেশ্বরে 'অনির্বাণ' ও ভটখালিতে 'আহত সুর' নামে।

এ ছাড়াও আরো কতকগুলি পত্রিকা ও সংকলন মাঝে মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। তারমধ্যে দাবানল, নব-প্রবাহ, সিঁড়ি, স্পুটনিক, হবি, পদ্মা, চিবাযত, প্রাচ্যবাণী, বৃক্ষ নদীব ঘাট, কৃষ্ণচূড়া চিৎকার প্রভৃতি উল্লেখ্য।

শিশু ও কিশোর পত্রিকা :

বিভাগ পূর্বকালে রাজশাহী থেকে শিশু ও কিশোব পত্রিকার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি। বিভাগ উত্তরকালে ১৯৫৬ খ্রীঃ প্রকাশিত 'কিশোর' মাসিক পত্রিকাটি মাত্র একটি সংখ্যা বের হয়েছিল। সম্পাদনায় প্রাণজ্জিত শর্মা, জগত নারায়ণ রায় ও মহেশ চন্দ্র হালদার। অধুনালুপ্ত, কুসুম কামিনী প্রেস, রাজশাহীতে মুদ্রিত।

অঙ্কুর :

ত্রিভুজ সাহিত্য সংস্থা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদনায় খন্দকার সিবাজুল হক ও বমা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়। মাসিক অঙ্কুব ২টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত ১৯৬০ সালে বৈশাখে যাত্রীর সংগে সংশ্লিষ্ট হয়ে ছোটদের বিভাগ হিসেবে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত চলেছিল।

মিতালী :

মাসিক মিতালী। ১৯৫৩ সালে মিতালী সাহিত্য মজলিস কিশোর ও তরুণদেব নিয়ে গঠিত

হয়। সংগঠনের মুখপত্র মিতালী ২টি সংখ্যা বের হয়। সম্পাদনায় আমজাদ হোসেন। এ ছাড়াও উক্ত সংগঠনের হস্ত লিখিত পত্রিকা মিতালী, চঞ্চল, কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল।

পাপড়ী :

রাজশাহী উত্তরায়ন কচিকাঁচার মেলার মাসিক মুখপত্র। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, জানুয়ারী-১৯৬২। সম্পাদক হাবিবুর রহমান। পাপড়ী মাসিক রূপে আত্মপ্রকাশ করলেও ৪র্থ সংখ্যা থেকে (এপ্রিল, ১৯৬২) পাক্ষিক রূপে বেরুতে থাকে। অষ্টম সংখ্যা, আগষ্ট ১৯৬২ থেকে জানুয়ারী ১৯৬৩ সাল (২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা) পর্যন্ত পাপড়ী আবার মাসিক পত্রিকা রূপে প্রকাশিত হয়। ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা থেকে ৪র্থ সংখ্যা পর্যন্ত দ্বি-মাসিক পত্র রূপে প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়ে যায়।

কিশোর কণ্ঠ :

স্বাধীনতা উত্তর কালে জাতীয় শিশু কিশোর সংগঠন কিশোর সেনার মুখপত্র হিসাবে কিশোর কণ্ঠ মাসিক নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে ১৯৭৭ সাল থেকে। প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক আবুল হোসেন মালেক। এটি উত্তর বঙ্গের একমাত্র শিশু কিশোর পত্রিকা। এ ছাড়া কচিকণ্ঠ উল্কা, ময়ুর পঙ্খী, অংকুর নামে বেশ কিছু শিশু কিশোর সংকলনও প্রকাশিত হয়।

নাটোরের পত্র পত্রিকা

বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী গেজেট :

এটি নাটোরের প্রথম ও প্রাচীনতম সাপ্তাহিক পত্র। ১৯২০ সালের পূর্বে এর প্রকাশ। ৩৫-৩৬ সাল (ইংরেজী) পর্যন্ত চলার পরে বন্ধ হয়ে যায়, পুনরায় নতুন আঙ্গিকে ১৯৪০-৪১ সালে 'বিপিজি' নামে পাক্ষিক হিসেবে প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালে বন্ধ হয়ে যায়। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী গেজেট বাংলা সাপ্তাহিকে, নিলাম ইস্তেহার একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল। এছাড়া সাহিত্যও সংবাদ পরিবেশিত হ'তো। সম্পাদনায় : কাজী আরিফ উদ্দিন আহম্মদ ওরফে আরিফ পণ্ডিত। পরবর্তী কালে তাঁহার মৃত্যুর পর সংক্ষেপে বিজিপি (পাক্ষিক) নামে পুনঃ প্রকাশ হয়। সম্পাদক, সূফী আব্দুল হামিদ।

নাটোর বার্তাবহ :

দ্বিতীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা। প্রকাশ কাল সম্ভবতঃ ১৯২৬ অথবা ১৯২৭ সাল। মাত্র কয়েক সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। সম্পাদক : পণ্ডিত গিরিজা কান্ত গোস্বামী।

কেয়া :

নাটোরের প্রথম মাসিক পত্রিকা। প্রকাশ কাল সম্ভবতঃ ইং ১৯২৫ সাল। এক বছরের বেশী চলেছিল। প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক, কবি রাধা চরণ চক্রবর্তী।

পঞ্চপ্রদীপ :

কেয়া পত্রিকার সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন, শ্রী রাধা চরণ চক্রবর্তী, শ্রী শচীনন্দন পাল এবং শ্রী সুরেশ চন্দ্র রায়। মতবিরোধ ঘটায় কেয়া পত্রিকা থেকে বেরিয়ে পঞ্চ প্রদীপ (মাসিক) প্রকাশ করেন।

সমাজ শক্তি :

মাসিক পত্রিকা, সম্পাদক সম্ভবতঃ ইং ১৯২৭ সাল। মাত্র কয়েক সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক শ্রী শচীনন্দন পাল, এম.এ।

মলভী :

মাসিক পত্রিকা, প্রকাশ কাল, শ্রাবণ ১৩৩২ দুই সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক : মুহম্মদ হাসার উদ্‌দীন ও কাজী আব্দুল মজিদ।

অর্ঘ্য :

হস্ত লিখিত মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক, ননী গোপাল ভট্টাচার্য্য ও আশুতোষ সান্যাল।

পল্লব :

মাসিক পত্রিকা, প্রকাশ কাল কার্তিক ১৩৫০। কয়েক সংখ্যা মাত্র প্রকাশিত হয়। সম্পাদক : গজেন্দ্র নাথ পাল ও আব্দুল ওয়াহেদ (দুদু মিয়া) খান চৌধুরী।

অর্চ্চনা :

(মাসিক পত্র) সম্পাদক অন্নদা মোহন বাগচী।

সেবক :

(মাসিক পত্রিকা) সম্পাদক, জ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ সান্যাল ও গগেন্দ্র নাথ কর্মকার

কোরক :

(কবিতায় ঋতু পত্রিকা) সম্পাদক গজেন্দ্র নাথ কর্মকার।

হেদায়াৎ :

(মাসিক পত্রিকা) সম্পাদক, আব্দুল ওয়াহেদ খান চৌধুরী।

জাগরণ :

(মাসিক পত্রিকা) সম্পাদক, গোলাম মহীউদ্দীন।

অবসর :

(মহিলা মাসিক পত্রিকা) সম্পাদিকা, বাণী লাহিড়ী।

অরবিন্দ :

(মাসিক পত্রিকা) সম্পাদক, কৃষ্ণেন্দু নারায়ন লাহিড়ী।

নির্ঝর :

(মাসিক পত্রিকা) সম্পাদক, শ্রী প্রতিভা কুমার চক্রবর্তী।

বিভাগ পরবর্তী কালে নাটোরে অনেকগুলো পত্র পত্রিকা বের হয়েছে। সেগুলো যথাক্রমে :

খাদেম :

সাপ্তাহিক পত্রিকা। ১৯৫০ সালে মাত্র ২টি সংখ্যা বের হয়েছে। সম্পাদক, মুহম্মদ ফজলুর রহমান।

মিজান :

পাক্ষিক, পত্রিকা। সম্পাদক : খোন্দকার আবুল কালাম।

অভিযান :

রাজশাহী জেলার গুরুদাসপুর থানা শিক্ষা সংঘের মুখপত্র। ১৯৫৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। সম্পাদক : মোঃ আকবব হোসেন।

দর্পন :

(পাক্ষিক পত্রিকা) সম্পাদক, মফিজ উদ্দিন আহমদ। ১৯৬২ সালে প্রকাশেব পব মাত্র কযেকটি সংখ্যা বেবিযেছে।

নবারুণ :

নাটোব মহকুমাব মৌলিক গণতন্ত্রীদের মাসিক মুখপত্র। তিন বছর চলে। 'সবুজের স্বপ্ন, 'যুগের আলো' এম এস, কলেজ বার্ষিকী, জাগরণী, উদয়াচল, শুক্তি!, কাবিকা, সূর্যোদয়, প্রভৃতি নামে কিছু সাময়িকী সংকলন ও স্মরণিকা প্রকাশিত হয়েছে। স্বাধীনতা পূর্ব ও পরবর্তীকালে।

এ ছাড়াও, নয়া জিন্দেগী নামে বড়াইগ্রাম থানা থেকে ১৯৬৫ সালে একটি সাময়িক পত্রিকা অধ্যাপক আবদুর রহমান আব্বাসীর সম্পাদনায় এবং চলন বিলের ঢেউ সম্পাদক তোফায়েল আহম্মদ, গুরুদাসপুর থেকে প্রকাশিত হয়।

ঐকতান :

নাটোর থানা সমবায় সমিতি লিঃ-এর মাসিক মুখপত্র। ১৯৫৪ ও ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হস্তলিখিত পত্রিকা 'স্মৃতির কথা' উল্লেখযোগ্য। এছাড়া নাটোরে ১৯৭১ এর স্বাধীনতা লাভের পর গঠিত সাহিত্য চক্রের মুখপত্র 'বনলতা' উল্লেখযোগ্য সাহিত্য পত্রিকা। এ পত্রিকাটির মাত্র তিনটি সংখ্যা অনিয়মিত প্রকাশিত হয় ৭৪/৭৫ সাল পর্যন্ত।

নওগাঁর পত্র পত্রিকা

১৯২৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত কোন পত্র-পত্রিকা নওগাঁ থেকে প্রকাশের সন্ধান পাওয়া যায় না। নওগাঁর প্রাচীনতম ও দীর্ঘস্থায়ী পত্রিকা 'সাপ্তাহিক দেশের বাণী' প্রায় ৩৮ বছর ধরে চলেছে (১৯২৫-১৯৬৪)। সম্পাদক ছিলেন জনাব হাবিবর রহমান।

সাপ্তাহিক বাঁকা চাদ :

১৯৫০ সালের ১৪ই আগষ্ট প্রথম প্রকাশ। ৩ বছর চলেছিল। সম্পাদক এ কে এম মালেক চৌধুরী।

সাপ্তাহিক নবযুগ :

১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। জনাব মফিজুদ্দিন এর সম্পাদক ছিলেন।

নব দিগন্ত :

এ নামে অপর একটি পত্রিকা ৬৪ সালে মৌলিক গণতন্ত্রীদেব মুখপত্র হিসাবে একটি মাসিক পত্র প্রকাশিত হত। মহকুমা প্রশাসকেব সহযোগিতায় ও খান মোহাম্মদ আফজলেব সম্পাদনায় কিছু দিন চলে বন্ধ হয়ে যায়।

এ ছাড়া দীপ্তি, বৈতালিক, পলাশের রং, অগ্নিশপথ, প্রান্তমুখ, ইস্তোহর, সমন্বয়, বহ্নিশিখা, শাওন মেঘে শংকা, স্পন্দন, স্বাবন, প্রভৃতি নামে বিভিন্ন সংকলন ও স্মরনীকা সময় সময় এই শহব থেকে প্রকাশিত হয়।

জয়বাংলা :

এ নামে ১৯৭১ সালের ৩০শে মার্চ একটি দৈনিক প্রকাশিত হয। সম্পাদক জনাব বহমত উল্লাহ, কয়েক সংখ্যা প্রকাশের পর বন্ধ হয়ে যায়।

বরেন্দ্র :

সাহিত্য সংকলন। পৃষ্ঠা ১৮৮। সম্পাদনায় অধ্যাপক নুর উল হক। ১৯৭৭ সালেব ৩০শে জুন প্রকাশিত হয়। নওগাঁ প্যাবিমোহন কোঅপারেটিভ লাইব্রেরীর মুখপত্র।

নবাবগঞ্জের পত্র-পত্রিকা

রাজশাহী জেলার ক্ষুদ্রতম মহকুমা নবাবগঞ্জেব পত্র-পত্রিকার ইতিহাস মূলত: বিভাগ পরবর্তী কালের ইতিহাস।

সাপ্তাহিক আলোর পথে :

আলোর পথে প্রেসে মুদ্রিত। মুহম্মদ মুজিবর রহমান কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। অনিয়মিত ভাবে বেশ কিছু দিন চলার পবে বন্ধ হয়ে যায।

সাপ্তাহিক নবাবগঞ্জ সাময়িকী :

১৩৭৩ সালে প্রকাশিত হয়ে অল্প দিন পরেই বন্ধ হয়ে যায়। সম্পাদনায় বেগম আজীজা এন, মোহাম্মদ।

বৈশাখী :

১লা বৈশাখ উপলক্ষে প্রতি বছর একটি সংখ্যা প্রকাশের প্রতিশ্রুতি নিয়ে গত দু'বছর ধরে বের হচ্ছে। সম্পাদনায় অধ্যাপক নওয়াব আলী। পত্রিকাটি মূলতঃ সাহিত্য ও সংস্কৃতি মূলক পত্রিকা।

তরঙ্গ :

ত্রৈমাসিক পত্রিকা, মাত্র এক সংখ্যা কয়েক বছর পূর্বে বের হয়েছে। এ ছাড়া গণপথ

নামেও একটি পত্রিকা আতুড়েই মারা যায়।

নবাবগঞ্জেও শহীদ দিবস উপলক্ষে প্রতি বছর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে পত্র-পত্রিকা প্রকাশ হয়ে থাকে। বাৎসরিক ম্যাগাজিন বের হয়। এ পত্র-পত্রিকা গুলো সাহিত্যের উন্মেষ ঘটাতে ছাত্র-ছাত্রীদের যথেষ্ট সাহায্য করে।

তথ্যনির্দেশ :

০১. দৃষ্টি কোণ— আবুল কালাম শামসুদ্দীন, পৃ: ১৬৬, প্রসঙ্গ : আমাদের সংবাদ সাহিত্য।

০২. বাজশাহীর ইতিহাস— কে. এম মেছের, পৃ: ৩২৭।

০৩. 'আন্তরিক'— ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, প্রসঙ্গ : 'রাজশাহীর পত্র-পত্রিকার জন্ম কথা'— খোন্দাকর আখতার আলী।

০৪. Statistical Accounts of Bengal, Rajshahi District, P.92.

০৫. সাময়িক পত্র জীবন ও জনমত— মুস্তাফা নুরুল ইসলাম, পৃ. ২৬৮-২৬৯।

০৬. স্মরণিকা ১৯৭৭, বাজশাহী : আহমদ সফিউদ্দীন।

০৭. নবারুণ— নাটোর ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৩৭৩।

বিস্মৃত অধ্যায়

মুহম্মদ আবদুস সামাদ

অতীতের স্মৃতি সম্ভারে গড়া রাজা জমিদার, জ্ঞানী গুণী কবি সাহিত্যিক অধ্যুষিত এই বাজশাহী জেলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করলো নতুন প্রতিষ্ঠিত ববেন্দ্র একাডেমী। রাজশাহী সাহিত্য ও শিল্পানুরাগী জেলা প্রশাসক জনাব আমিনুল হকও এগিযে এলেন। তাঁর বলিষ্ঠ চিন্তা, বরেন্দ্র একাডেমীর পরিচালক মণ্ডলীর চেতনা ও স্থানীয় সুধী শিক্ষিত লেখকের ঐকান্তিক সহযোগিতায় প্রকাশিত হলো তথ্য সমৃদ্ধ ও ইতিহাস সম্ভাবে পরিপুষ্ট 'বাজশাহী পরিচিতি'। অনেক অলিখিত কাহিনী, অনেক অজানা তথ্য, অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বলিত রাজশাহীর ইতিহাস সুধী সমাজে সমাদর লাভ করবে বলে আমরা বিশ্বাস কবি।

রাজশাহীর অতীতের কথাগুলি আজ বিস্মৃতির অতল অন্ধকারে হাবিয়ে গেছে। দেশের এই অংশের বসবাসকারি মানুষের শিক্ষা, সাহিত্য, ও শিল্পের প্রতি অনুরাগ, সামাজিক জীবন বোধ ও তার মান, রাজনৈতিক কর্ম্মকাণ্ড কি ছিল আজ তা জানবার উপায় নেই। সাহিত্যে অনন্য প্রতিভা রেখে গেছেন এ দেশেরই সুসন্তান কিমিয়ায়ে সাদাতের অনুবাদক সৌভাগ্য স্পর্শ মনির লেখক মরহুম মীর্জা ইউসফ আলী। কান্ত কবি রজনী কান্ত সেন, ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্র, শিক্ষাবিদ যদুনাথ সরকার, কুমুদিনী কান্ত ব্যানার্জ্জীর স্মৃতি রাজশাহীর মাটিতে সমৃদ্ধ। আজকের রাজশাহীর উত্তোরণের উদয় তোবণে দাঁড়িয়ে অতীতের রাজশাহীকে জানতে হলে, শতাব্দীকাল পিছিয়ে যেতে হবে।

রাজশাহী শহরের পথ ঘাট মোড় জংশন ইত্যাদিতে অনেক ইতিহাসের ছোঁয়া স্পর্শ লেগে আছে। অতীতের রাজশাহীকে স্মরণ করতে হলে নীল কুঠিয়াল সাহেবদের দৌরাত্ম ও অত্যাচার কাহিনীকে জানতে হয় যে কাহিনী নীলদর্পণের জন্ম দিয়েছে, যে কাহিনী অনেক আন্দোলনেব কাহিনী সূত্র। এদেশ তথা গোটা উত্তরাঞ্চলের মাটি সহজ সুলভ ও উর্ববা হেতু কৃষিজীবী শ্রেণী স্বভাবতই আয়াসি ফলে শিল্প সম্ভাবনার ক্ষেত্র গড়ে উঠেনি, শিক্ষা সম্প্রসাবণ প্রবণতা ও সৃষ্টি হয়নি।

সাম্প্রদায়িকতার উস্কানী বা আন্দোরনের অনেক পরিবেশ গড়ে উঠলেও স্থানীয় নেতা ও নেতৃত্বের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণে এ অঞ্চলে কোনদিন সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব কলহ বা হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের অবনতি ঘটেনি। অতীত এ দেশে যেমন নেতা ছিলেন তেমনি তাদের নেতৃত্বে ছিল জনগণের চরম বিশ্বাস ও আস্থা। মরহুম খাঁন বাহাদুর এমাদুদ্দিন, আলহাজ্ব লাল মোহাম্মদ, খান সাহেব মোবারক আলী, বাবু কিশোরী মোহন চৌধুরী, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ইত্যাদি মহান ব্যক্তিদের নাম করা যেতে পারে।

অতীতে রাজশাহীর অনেক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সভায় যাকে সম্মান দেওয়া হতো তিনি রাজশাহীর প্রখ্যাত কবিরাজ হারান চন্দ্র চক্রবর্তী। ১৯২৭ সালে পাঁচ আনীর মাঠে বিপুল জনসমাবেশে বক্তৃতা করেন, সি.আর দাস, সরোজিনী নাইডু, মওলানা আকরাম আলী খান ও ইসমাইল হোসেন সিরাজী। এ ছাড়া ১৯২৯ সালে মনে হয় রাজশাহীতে মহাত্মা গান্ধীর আগমন, সভা আয়োজন, হিন্দু মুসলমান খেলাফত কর্মীদের ভারত ছাড় আন্দোলনের পটভূমিকায়

রাজশাহীর নেতা ও নেতৃত্বের যথেষ্ট অবদান ছিল। অতিক্ষুদ্র ঘটনাকে কেন্দ্র করেই ইতিহাস গড়ে উঠে। রাজশাহীতে এমন কিছু ঘটনা ও ব্যক্তিত্বের পরিচয় আছে যেটা কালের অবক্ষয়ে আজ ম্লান। সাহেব বাজারের বিশালকায় মসজিদের পিছনের ইতিহাস, বুদ্ধমণ্ডলের কারাবরণ, রাজশাহী কলেজের অধ্যাপক মরহুম আবদুল হাকিমের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা না হলে আজকের এ মসজিদ দাঁড়িয়ে থাকতো না। তেমনি একদিন সমাজ কর্মী উমেদ আলী মিয়ার অক্লান্ত প্রচেষ্টা না থাকলে আজকের গোরস্থান কমিটির প্রাণ প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটতোনা। রাজশাহীর তৎকালীন পৌরসভার চেয়াবম্যান বাবু ভুবন মোহন মৈত্রের অবদান হিসাবে শহরের বক্ষস্থলে দাঁড়িয়ে আছে ভুবন মোহন পার্ক। আজ হতে ৩০/৪০ বৎসর পূর্বের এমনি অনেক ঘটনার সমৃদ্ধ ইতিহাসই আমাদের গর্বের ও গৌরবের ইতিহাস। এ শহরের বিত্তশালী ব্যবসায়ী হরশো ব্যানার্জি ও মোহন লালের নামে রাস্তাগুলি তাদের স্মৃতির ধারক ও বাহক। মবহুম তোফাজ্জল আলী সেরেস্তাদারের অবদানে শাহ মখদুমের দরগাহের অস্তিত্ব একদিন রক্ষা পেয়েছিল। সেই প্রখ্যাত তোফাজ্জল আলীর নামে রাস্তার নামকরণ সেদিনের স্মৃতি বহন করে।

ঘোড়ামারায় অবস্থিত ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয়ের বাসভবনে সম্ভবত ১৯৩০ সালের এক দুপুরে কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাথে কোলাকুলির স্বাক্ষর ও সাক্ষী হয়তো আজ নেই কিন্তু সে সব ঘটনাকে অস্বীকার করা যায় না।

এইরূপ অনেক লুপ্ত কথা ও কাহিনীকে পুনরুজ্জীবিত করার দায়িত্ব নিয়ে বরেন্দ্র একাডেমী এগিয়ে চলেছে যার প্রথম প্রকাশনা 'রাজশাহীর ইতিহাস'। আমরা আশা করবো- অনাগত দিনে এমনি অনেক স্মৃতি ও ঐতিহাসিক কাহিনীকে নতুন করে অতীতের অন্ধকার বন্দীশালা হতে বরেন্দ্র একাডেমী দেশবাসীব কাছে তুলে ধরবে এ জন্য আজকেই তাদের প্রয়াসকে অভিনন্দিত করছি।

লেখক পরিচিতি

অধ্যক্ষ মুহম্মদ এলতাসউদ্দিন :
রাজশাহী জেলার চাঁদলাই গ্রামে ১৯৩১ সালে জন্ম গ্রহণ কবেন। তিনি বাজশাহী কলেজ থেকে বি.এস সি. পাশ করার পর ১৯৫৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থ বিজ্ঞানে এমএস.সি এবং ১৯৫৭ সালে বি.এড.ও ১৯৫৯ সালে এম.এড ডিগ্রি লাভ করেন। উচ্চতব শিক্ষার জন্য তিনি লন্ডন ও বৃষ্টলে প্রায় দু'বছব অবস্থান কবেন। বাংলাদেশ অবজ়াবভাব সহ বিভিন্ন পত্রিকায় তাব লেখা প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে তিনি রাজশাহী টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ এবং বাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অনুষদের অধিকর্তা।

মুহম্মদ আবূ তালিব :
১৯২৮ সালের ১লা এপ্রিল খুলনা জেলার গোয়াল খালি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ পাশ। ১৯৪৯ সাল থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেব উপব গবেষণায় ব্যাপৃত। বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েব বাংলা বিভাগেব সহকারী অধ্যাপক। 'বাংলা সাহিত্যের ধারা', লালন শাহ ও লালন গীতিকা, লালন পরিচিতি, বিস্মৃত ইতিহাসের তিন অধ্যায়, ফকীর মজনু শাহ, উত্তর বঙ্গের সাহিত্য সাধনা, হযরত শাহ মুখদুম (রহঃ) উত্তব বঙ্গে ইসলাম প্রচারের গোড়ার কথা, লোক সাহিত্য প্রভৃতি তাঁর গ্রন্থ।

শামশুল হক কোরায়শী :
১৯৪০ সালের ১লা জানুয়ারী কুষ্টিয়া জেলার দৌলত খালী গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত আলেম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম মরহুম আলহাজ্ব মওলানা আফসার হোসেন এবং পিতামহ মরহুম মওলানা ইসহাক।

বাংলাদেশে এই বংশের প্রথম পুরুষ মদিনার অধিবাসী মওলানা বাজিত কোরায়শী ইসলাম প্রচারের জন্য আসেন। শামসুল হক কোবায়শী বাংলা, বাষ্ট্রনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে এম এ এবং এল এল বি পাশ করেন। 'গোধুলীব কান্না', ও 'আদর্শ পৌরনীতি' তাঁর রচিত গ্রন্থ।

এস.এম.আব্দুল লতিফ :
রাজশাহী জেলার বাগাতি পাড়া থানার দয়াবামপুব গ্রামে জন্ম। রাজশাহী সিটি কলেজে বহুদিন অধ্যক্ষ ছিলেন। বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। 'ছন্দ পরিচিতি তার প্রকাশিত গ্রন্থ। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লিখে থাকেন।

ড. মুহম্মদ মজির উদ্দীন :
১৯৩৯ সালে রাজশাহী জেলার সদর মহকুমার চারঘাট থানার উদপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। বর্তমান নিবাস নাটোর মহকুমার লালপুর থানার মমিনপুর গ্রাম।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে (১৯৬১) এম.এ. এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচডি. ডিগ্রি (১৯৭৭) লাভ করেন। তার লেখা 'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম মহিলা' 'বাংলা

নাটকে মুসলিম সাধনা' 'শহীদ সাহিত্যিক' 'নজরুল গদ্য-সমীক্ষা (সম্পাদনা)' এবং রবীন্দ্র ছোট গল্পে সমাজ ও স্বদেশ চেতনা (থিসিস) গ্রন্থ। বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। (মৃত্যু : ১৯৯৯)

শাহ্ আনিসুর রহমান :

জন্ম বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দী থানার আদবাড়ীয়া গ্রামে। ১৯৬২ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি জয়পুর হাট ডিগ্রি কলেজে তের বৎসর অধ্যাপনা করার পর ১৯৭৬ সালে দৈনিক বার্তার সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দিয়েছেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে পাকিস্তান অবজারভার 'দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার পত্রিকার নিজস্ব সংবাদ দাতা ছিলেন। ১৯৭৩-১৯৭৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সাংবাদিক সমিতির কেন্দ্রীয় পরিষদের সভাপতি ছিলেন। পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখে থাকেন। তাঁর বহু প্রবন্ধ দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। রম্যরচনা 'আড্ডা' তার প্রকাশিত গ্রন্থ। (মৃত্যু : ২০০৪)

মোঃ মজিবুর রহমান :

১৯২৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর রাজশাহী জেলার রাণী নগর থানার অন্তর্গত বরগাছা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৪৯ সালে রাজশাহী কলেজ থেকে ইতিহাসে অনার্স সহ বি.এ.পাশ করেন। ১৯৫২ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ ডিগ্রি নেন। কর্ম জীবনে অধ্যাপনা পেশায় সাতক্ষীরা ও কুষ্টিয়া কলেজে দীর্ঘ দিন ছিলেন।

মুরাদুজ্জামান :

১৯৫১ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর পাবনা জেলার রায়গঞ্জ থানাব হোড়গাতী গ্রামে জন্ম। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় বি,এ অনার্স ও এম,এ পাশ করেন। অধ্যাপক হিসাবে কর্ম জীবন শুরু হলেও তিনি কয়েকবার পেশা পরিবর্তন করেন। কলেজ ছেড়ে তিনি দৈনিক সমাচাব পত্রিকায় সহ সম্পাদক পদে যোগ দেন। অতঃপর বরেন্দ্র একাডেমীর প্রতিষ্ঠা হলে তিনি একাডেমীব সহিত সক্রিয়ভাবে জড়িত হয়ে পড়েন। একাডেমীতে তিনি কিছুদিন সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি এই প্রতিষ্ঠানেই রিসার্চ অফিসারের দায়িত্বে আছেন। তিনি বিভিন্ন পত্রিকা ও সাময়িকীতে প্রবন্ধ লিখেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

আবুবকর সিদ্দিক :

১৯৫০ সালে পাবনা জেলার রায়গঞ্জ থানার হোড়গাতী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে বি, এ অনার্স ও এম.এ. পাশ করেন। গ্রামীণ গবেষণার উপর উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য তিনি আমেরিকার হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ১৯৭৮ সালে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম ফিল ডিগ্রি অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে কর্মরত আছেন। 'Appropriate Agriculural Technology : A comparative study of Dugwell and Deep tube well Irrigation in North Bengal', Appropriate Irrigation Technology

in North Bengal' প্রভৃতি তাঁর গবেষণা লব্ধ গ্রন্থ। তিনি বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাদির উপর গবেষণা করে থাকেন।

আবুল হোসেন মালেক :

১৯৫০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর রাজশাহী জেলার বড়াইগ্রাম থানার পাঁচবাড়ীয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আলেক উদ্দীন প্রামানিক। তিনি সাংবাদিক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। গল্প কবিতা ও প্রবন্ধ লেখেন। বাংলাদেশ বেশম চাষ ও বেশম শিল্পেব উপব তথ্যপুর্ণ প্রবন্ধ লিখেছেন। বাংলাদেশ বেতার রাজশাহী কেন্দ্রের তিনি একজন সংবাদ পাঠকও। তিনি বরেন্দ্র একাডেমীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম অবৈতোনিক নির্বাহী পবিচালক। বর্তমানে বাংলাদেশ সেরিকালচার বোর্ডের গণসংযোগ অফিসাব হিসাবে কর্মবত আচেন। বাংলদেশ রেডক্রস, রাজশাহী দুঃস্থ কল্যাণ সংস্থা সহ তিনি বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানেব দায়িত্বপূর্ণ পদে রয়েছেন। তিনি জাতীয় কিশোর সংগঠন কেন্দ্রীয় কিশোব সেনার দাযিত্বপূর্ণ পদে বয়েছেন। তিনি জাতীয় কিশোর সংগঠন কেন্দ্রীয় কিশোব সেনার প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক। তিনি মুক্তি যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। রাজশাহী থেকে প্রকাশিত শিশু পত্রিকা 'কিশোব কণ্ঠেব' প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও 'রাজশাহী বার্তা।' পত্রিকাব ব্যবস্থাপনা বোর্ডের অবৈতনিক সদস্য।

আনওয়ারুল হাসান সুফি :

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় মনোবিজ্ঞান বিভাগে এম. ফিল ডিগ্রিব জন্য গবেষণা কবছেন। জন্ম ১৯৫৩ ময়মনসিংহ শহর। বরিশাল, বাজশাহী, দিনাজপুর এবং সিলেট শহবে লেখাপড়া শিখেছেন। রাজশাহী প্রেস ক্লাব সহ বহু সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানেব কার্য-নির্বাহী পবিষদ সদস্য। দি পিপ্‌ল এবং ইস্টার্ন নিউজ এজেন্সীর সাংবাদিক ছিলেন। বর্তমানে রাজশাহী বার্তাব সাথে সংযুক্ত আছেন। তিনি সমগ্র বাংলাদেশ, নেপাল এবং ভারত ভ্রমণ কবেছেন। গত দুবছর যাবত তিনি শিল্প কাবখানা সমূহ এবং বাজশাহী শিল্প ও বণিক সমিতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আছেন। শিল্প ও শিক্ষা ক্ষেত্রেব উপর তাব লেখা গবেষণামূলক প্রচুব প্রবন্ধ, সংবাদ এবং পত্র দেশের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয থেকে তিনি এম.এস.সি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান; বি.এড পরীক্ষায প্রথম শ্রেণীতে ২য় স্থান, বি.এস.সি, অনার্স পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকাব কবেন। তিনি বাজশাহীব শালবাগান এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ব প্রাক্তন ডিবেক্টব অব এ্যাকাউন্টস জনাব সাজ্জাদ আলীর পুত্র।

খন্দকার আমিনুল হক

১৯৩৬ সালের ১০ই মার্চ পাবনা জেলার তাড়াশ থানার বারুহাস গ্রামে মাতুলালয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতা খন্দকাব নুরুল ইসলাম রাজশাহী শহরের কুমার পাড়ার স্থায়ী বাসিন্দা। খন্দকার আমিনুল হক ১৯৫১ সালে ম্যাট্রিক পাশ করলেও দীর্ঘদিন পাঠ বিরতির পর ১৯৬৬ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম.এ. পাশ করেন। তিনি নন্দিগ্রাম, লালমনিব হাট বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করেন। বর্তমানে তিনি তাহিবপুর কলেজের বাংলার অধ্যাপক। বহু প্রবন্ধ, গল্প, রম্যরচনা, রূপকথা ও কবিতা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে ও হচ্ছে। তার প্রকশিত গ্রন্থ 'দিগন্ধে মেঘের ঘটা', এ ছাড়া তার 'নরক গুলজার' 'সন্ধি' 'রূপকথার মায়াপুরী'

এবং 'হাসি ও গল্প' পাণ্ডুলিপি সমূহ প্রকাশের পথে। ১৯৫২ সাল থেকে তিনি বিভিন্ন শ্রেণীর পত্র-পত্রিকার সাথে সাংবাদিক ও লেখক হিসেবে জড়িত রয়েছেন।

মুহাম্মদ আবদুস সামাদ

সাংবাদিক, সাহিত্যিক, ইতিহাসবিদ ও সমাজহিতৈষী মুহাম্মদ আবদুস সামাদ ১৯১৩ সালে রাজশাহী শহরস্থ কাজিরগঞ্জে এক সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ কবেন। তাঁর পিতা হাজী লাল মোহাম্মদ (১৮৪৮-১৯৩৬) বৃটিশ আমলে এম.এল.সি. ছিলেন। আবদুস সামাদ ১৯৩৫ সালে রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর রাজশাহী কলেজে অধ্যয়ন করেন।

তাঁর সম্পাদনায় ১৯৫২ সালে পাক্ষিক 'প্রবাহ' এবং ১৯৫৯ সালে পাক্ষিক ও ১৯৬১ সালে 'সাপ্তাহিক রাজশাহী বার্তা' প্রকাশিত হয়। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ-তরুণের গান (১৯৪৭), দাড়ি (১৯৫১), দিগ-দিগন্ত (১৯৮৪) সুবর্ণ দিনেব বিবর্ণ স্মৃতি (১৯৮৭) হারানো দিনের পুরানো কথা (১৯৯৮) ও শুভ্র রজনীগন্ধা (১৯৯৯)।

কর্মজীবনে ১৯৪১ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৪২ বছর তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে প্রথম শ্রেণীর অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৬ সালে তিনি রাজশাহী জেলা বোর্ডের সর্বশেষ নির্বাচিত চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি রাজশাহী বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে সুদীর্ঘকাল বুনিয়াদী গণতন্ত্রের আসর, গ্রাম বাংলা, সোনার বাংলা, সুখী পরিবার প্রভৃতি অনুষ্ঠানে 'বড় মিয়া'ব নাম ভূমিকায় অনুষ্ঠান পরিচালনা করে অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। সমাজসেবার পটভূমিকায় রাজশাহী মুসলিম হাই স্কুল, রাজশাহী শাহ মখদুম কলেজ, নওদাপাড়া হাইস্কুল, কাজিরগঞ্জ প্রাইমারী স্কুল, বাগমারা বালানগর আলিয়া মাদ্রাসা, মোহনপুর শাকওয়া মাদ্রাসা, মোহনপুর হাইস্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান স্থাপনে অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তাঁর ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। এছাড়াও মায়ের নামে এমামুন্নেছা মাদ্রাসা ও পিতার নামে হাজী লাল মোহাম্মদ ঈদগাহ প্রতিষ্ঠা এবং বাড়ি সংলগ্ন ওয়াক্তিয়া মসজিদটিকে বায়তুল আমান জামে মসজিদে রূপান্তরিত করণ– তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠতম কীর্তি।

মুহাম্মদ আবদুস সামাদ শৈশবকালে মহাত্মাগান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, সরোজিনী নাইডু, শেরে বাংলা ফজলুল হক, মহাকবি ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মওলানা আকরম খাঁ, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, শিল্পী আব্বাস উদ্দীন প্রমুখ মনীষীদের পরম সান্নিধ্য লাভ করেন। গুণিজন হিসেবে অবিস্মরণীয় অবদান ও কর্ম সাধনার স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে ১৯৪৫ সালে ব্রিটিশ সরকার ব্রোঞ্জ পদক ও সার্টিফিকেট, ১৯৬৭ সালে প্রেসিডেন্ট পদক এবং ১৯৬৮ সালে পাকিস্তান সিভিল এওয়ার্ড তমঘ-এ-খিদমত খেতাব প্রদান করা হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি এই খেতাব গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। এ ছাড়াও তাঁকে সাংবাদিকতায় ১৯৮০ সালে উত্তরা সাহিত্য মজলিস পুরস্কার, ১৯৮৩ সালে বরেন্দ্র একাডেমী পদক ও সংবর্ধনা এবং ১৯৯৭ সালে রাজশাহী এসোসিয়েশন স্বর্ণ পদক ও সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। তিনি ৩০ অক্টোবর ২০০৫ রবিবার প্রত্যুষে স্বীয় বাসভবনে মৃত্যু বরণ করেন এবং পারিবারিক গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।